উদ্ধৃতি-অভিধান

ড. দিলীপ কুমার মিত্র

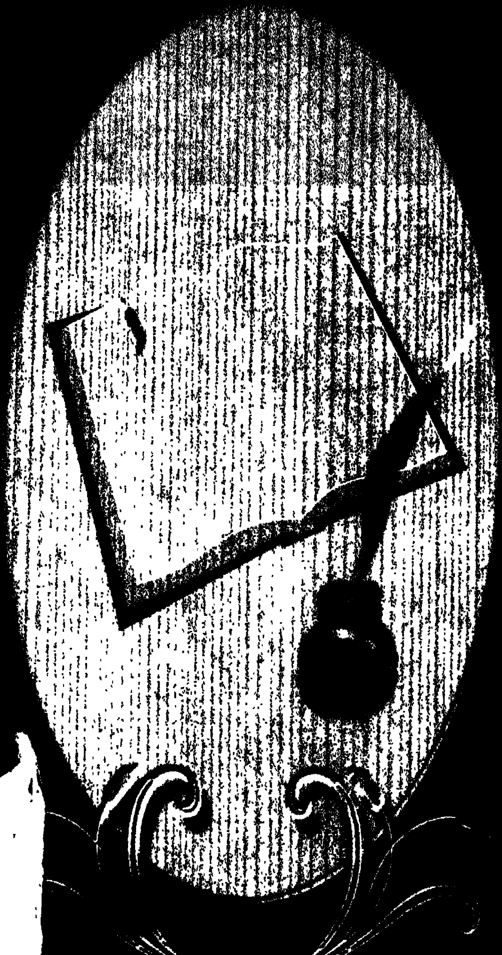

পারুল প্রকাশনী

উদ্ধৃতি-অভিধান

সম্পাদনা

ড. দিলীপ কুমার মিত্র

7063
5/7/07

পারুল প্রকাশনী

৮/৩ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯, ফোন : ২২৪১ ৬৪৭৪
১৬ আখাউড়া রোড, আগরতলা-৭৯৯ ০০১, ফোন : ২৩৮ ৬৯৪৭

Uddhriti Abhidhan
Dictionary of Quotations
by **Dr. Dilip Kumar Mitra**
Rs. 200.00

BCSC Public Library
11th FIN C... ...9063
11th FIN C... M R No. 34250

প্রকাশিকা :
শ্রীমতী রত্না সাহা
১৬ আখাউড়া রোড,
আগরতলা
দূরভাষ : (০৩৮১) ২৩৮-৬৯৪৭

প্রথম সংস্করণ :
বইমেলা ২০০৪

প্রচ্ছদ :
শিবেন্দু সরকার

বর্ণসংস্থাপক :
জ্যোতি লেজার পয়েন্ট
৬৩/২ ডি সূর্য সেন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মুদ্রক :
ইম্প্রেশন হাউস
১৫/৫/১, কে. বি. সরণী, মল রোড
দমদম, কলকাতা - ৭০০ ০৮০

মূল্য :
দুইশত টাকা

আভ্যুদয়িক

প্রত্যেক শক্তিমান লেখকেরই সৃজনসম্ভারের মধ্যে কোথাও কোথাও এক বা একাধিক হীরকখণ্ডের মতো বাক্য বা ছত্র জন্ম নেয় যার আলোক উদ্ভাস লেখাটির নির্দিষ্ট বিষয়, এমনকি দেশ ও কালকে ছাপিয়ে গিয়ে চিরযুগের বা শাশ্বতকালের স্মরণযোগ্য পংক্তিতে পর্যবসিত হয়। এই হীরকদ্যুতি একজন বাগ্মীর, একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের বা একজন ধর্মগুরুর মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহেও দেখা যেতে পারে, তখন সেই বাক্য বাণীতে পরিণত হয়। লিখিতই হোক আর মৌখিকই হোক, এই জাতীয় উক্তিগুলি প্রবাদ-প্রবচনের মতো আমাদের স্মৃতিতে গেঁথে যায় এবং আমরাও নানা প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য বা বিশদ করার জন্য কিংবা আকর্ষণীয় করার জন্য এই জাতীয় উক্তিগুলিকে ব্যবহার করে থাকি। এই অতীব মূল্যবান ও গভীর অর্থবাহী উক্তিগুলিকেই উদ্ধৃতি বলা হয় যেখানে মিতায়তন পরিসরে সীমাসংবৃতির মধ্যে গাঢ়বদ্ধ জীবনানুশাসন প্রকাশ পায়।

পরীক্ষায় বেশি নম্বর পেতে বিদ্যার্থীদের লেখায় উদ্ধৃতির ব্যবহার যেমন অতীব প্রচলিত, তেমনই তাঁর জ্ঞান শ্রোতার কাছে প্রমাণ করার জন্যও বুদ্ধিমান বক্তা ভূরি ভূরি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি ব্যবহার করে থাকেন। এমনকি, একজন লেখকও তাঁর রচনাকে যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে বা তাকে অলংকৃত করার জন্য উদ্ধৃতির আশ্রয় নিয়ে থাকেন। কিন্তু এহো বাহ্য! আসলে আমাদের জীবনেরই অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে উদ্ধৃতি। আমরা অনেক সময় আমাদের অজান্তেই প্রাত্যহিক কথাবার্তায় বহু উদ্ধৃতির ব্যবহার করে থাকি। না, নিজেদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য নয়, বস্তুত এ আমাদের বহুযুগের স্মৃতিবাহিত সংস্কার।

প্রকৃতপক্ষে সেই বাক্যই উদ্ধৃতি হয়ে ওঠে, যার মধ্যে কোনো-না-কোনো শাশ্বত সত্য বা মানবিক জ্ঞান ও বিদ্যা সংক্ষিপ্ত ও সংহত রূপে প্রকাশ পায়। উদ্ধৃতি হল লেখকের বা বক্তার অনুপ্রাণিত সৃষ্টি কিংবা বাণী। তাই, উদ্ধৃতি সংকলন আমাদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। অনেক সময় একটি উদ্ধৃতি কথনমাত্রই তার চারপাশে ভাবের এক বিস্তৃত পরিমণ্ডল রচনা করে যার মধ্যে বাচ্যার্থ অন্য দ্যোতনা পায়। আবার এক অনন্যকথন মূল রচনাপাঠেও আমাদের আগ্রহী করে তোলে, ফলে আমাদের জ্ঞানভাণ্ডারও যথার্থই সমৃদ্ধ হয়।

বর্তমান গ্রন্থটি অভিধানরূপেও উল্লিখিত। অভিধানকার জানাচ্ছেন যে অভিধান হল শব্দ ও ভাষাভাণ্ডারের চাবি ও তার সুবিশাল সৌধ অসংখ্য সুরক্ষিত বদ্ধ-কক্ষসমন্বিতবৎ। অভিধানে ভাষার স্বর্ণকুঞ্চিকা দিয়ে মণিমাণিক্যখচিত বিপুল ভাণ্ডার উন্মোচিত হয় ও প্রজ্ঞার অনন্ত মহিমা প্রকাশ পায়। অভিধান বিষয়বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতাকেও তুলে ধরে। সেই বিচারে একটি উদ্ধৃতি-অভিধান একটি বিদ্যাকোষ জাতীয় গ্রন্থও বটে যা সার্বভৌমিক জ্ঞান বা নিখিল শাস্ত্রবিষয়ক মহাগ্রন্থ হয়ে ওঠে। Encyclopaedia-র উৎস তো গ্রীক শব্দ enkuklios paideia, যার অর্থ 'all-round action' বা সর্বপ্রসারিত জ্ঞান। বর্তমান 'উদ্ধৃতি-অভিধান' গ্রন্থটিতেও প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস আছে। মধুসূদন সংহিতা-য় বলা হয়েছে যে জ্ঞান বহির্জগৎসম্বন্ধীয় বিচারশক্তি এবং বিজ্ঞান অন্তর্জগৎসম্বন্ধীয় বিচারশক্তি। আমাদের উদ্দেশ্য এই সমন্বিত প্রয়াস, কতটা তা সফল হয়েছে প্রাজ্ঞজন বিচার করবেন।

কোনো কোনো উদ্ধৃতি সংকলন যারা দেশের প্রতিষ্ঠিত রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজকে ভূমিকম্পের মতো নাড়িয়ে দেয়। যেমনটি ঘটেছিল গত শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে, লাল মলাট দেওয়া জনৈক চিনা দার্শনিক ও রাষ্ট্রনীতিবিদের উদ্ধৃতির সংকলনগ্রন্থটি সমগ্র বিশ্বের যুবমানসে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীসমূহ গভীর অধ্যাত্ম ভাবসম্পন্ন ও জীবনবোধে অনন্য; 'রামকৃষ্ণকথামৃত' গ্রন্থে সংকলিত তাঁর মুখনিঃসৃত কথাগুলি এক মহাসাধকের প্রজ্ঞানিষিক্ত ভাবনার সহজ মহিমান্বিত উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি জ্যোতির্ময় আলোকশিখার মতো উদ্দীপ্ত — সেগুলো তারায় তারায় দীপ্তশিখার অগ্নি জ্বালিয়ে চিরকালের মানুষকে পথ দেখায়। একদা গৈরিকবেশধারী এক দিব্যচেতন প্রাচ্য সন্ন্যাসীর উদ্ধৃতিযোগ্য সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও ভ্রাতৃত্বের আহ্বান ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বুকে কাঁপন তুলেছিল; সামাজিক সাম্যের পক্ষে তাঁর সংকলিত উদ্ধৃতি শতাধিক বছর পেরিয়ে আজও মানুষকে উদ্দীপ্ত করে, উদ্বুদ্ধ করে । অকালপ্রয়াত এক তরুণ কবির আগুনের মতো উক্তি পাঠকের চেতনায় নাড়া দেয়—তা পড়ে 'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে মনে হয় আমিই লেনিন'।

গ্রন্থে বাংলাভাষী লেখকদের কথাই উৎকলিত হয়েছে। সহস্রাধিক বৎসরব্যাপ্ত বাঙালির চিন্তা ভাবনার একটা ধারাবাহিক পরিচয় এতে আছে যা চিরায়ত মর্যাদায় অভিষিক্ত হবে। বাঙালি মননের অতলস্পর্শী গভীরতা, সীমাহীন বিস্তার ও অভ্রংলিহ মহিমা এতে রূপবিধৃত। 'উদ্ধৃতি-অভিধানে' অর্থনীতি-ইতিহাস ধর্ম-দর্শন রাজনীতি-সমাজনীতি শিক্ষা-সংস্কৃতি সাহিত্য-শিল্প ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ই অন্তর্ভূত হয়েছে যাদের মধ্যে জীবন তথা বিশ্ববোধের সার্বিক পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস আছে। পরিচিত প্রবীণ ও প্রাজ্ঞ মানুষদের সঙ্গে নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভাসম্পন্ন নবাগত নবীন লেখকরাও উদ্ধৃত হয়েছেন এবং সীমাসংবৃত মৃত্তিকাসন্নিকর্ষ জীবন থেকে সীমাতিক্রান্ত অনন্ত জ্যোতির্লোক পর্যন্ত বিষয় এখানে বিধৃত হবার অবকাশ পেয়েছে। অন্তত তাই আমাদের প্রয়াস ছিল। এই জাতীয় গ্রন্থের পরিকল্পনা ও প্রয়াস অত্যন্ত কঠিন ও দুঃসাধ্য।

চেষ্টা করা হয়েছে সাধ্যমত সদুক্তি নির্বাচনের, সমুদ্র থেকে রত্ন আহরণের প্রয়াস। মণিমুক্তার মতো উজ্জ্বল বাণী এতে আছে; যদিও অনেক বক্তব্যই উপস্থাপিত হয়নি, অনেক মহার্ঘ্য প্রাজ্ঞ-কথনও অনুল্লেখিত রয়ে গেছে। সাধ ও সাধ্যের সঙ্গতি রক্ষা করা যায়নি সর্বত্র। বিষয় নির্বাচনও হয়তো আরও ব্যাপ্ত আরও প্রসারিত হতে পারত, কিন্তু স্থানাভাব এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়েছে। উদ্ধৃতি সংগ্রহ করাও কঠিন কাজ, অনেক প্রয়াসে মূল গ্রন্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে। জাতীয় গ্রন্থাগার, মহাজাতি সদন গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ইত্যাদি সংস্থাসমূহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রয়াস ছাড়া এসব সম্ভব হত না। কলেজ স্ট্রিটের পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশকগণও বর্তমান সংকলককে দেখে সন্ত্রস্ত হতেন, যদিও সহযোগিতায় তাঁরা কার্পণ্য করেননি। পূর্ব প্রকাশিত দু-একটি উদ্ধৃতি সংকলন গ্রন্থ থেকে সাহায্য নিয়েছি। বিনয়েন্দ্র সিংহ সংকলিত 'রবীন্দ্র-সুভাষিত' গ্রন্থ অনেক সময় উৎস হয়েছে, পথনির্দেশকের কাজ করেছে। ড. অশোককুমার দে রচিত 'বাংলা উদ্ধৃতিকোষ' গ্রন্থটিও উল্লেখের দাবি রাখে। বঙ্কিমচন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রমুখের উদ্ধৃতির সংকলন থেকেও সাহায্য পেয়েছি।

বানান নিয়েও আমরা অনেক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি। বাংলায় একই শব্দের

একাধিক বানান প্রচলিত, এবং লেখকরা তাঁদের ভাবমতো বানান প্রয়োগ করেছেন। সাম্প্রতিককালে বাংলা আকাদেমি বাংলা বানানরীতির মধ্যে সামঞ্জস্য আনার চেষ্টা করছেন, যদিও তাদের প্রয়াস অনেক সময় বিভ্রান্তি কমায় না। কিন্তু ‘উদ্ধৃতি-অভিধান’ লেখকদের রচনাংশেরই গ্রহণ, তাই আমরা লেখকদের মূল বানানকেই গ্রহণ করেছি। তবে দেখা গেছে, লেখকরাই বানানবিধি সম্পর্কে অনেকক্ষেত্রেই উদাসীন ছিলেন, কোনো নির্দিষ্ট বানানপদ্ধতিকে তাঁরা একমাত্র গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। বিস্ময়ের কথা, একই বানান একই লেখকের শুধু ভিন্ন লেখায় নয় একই লেখায় বিভিন্নরূপে দেখা গেছে। রবীন্দ্ররচনাবলীতেও তার দুঃখজনক নিদর্শন আছে। জানিনা এসব ভূতের ছাপা কিনা; অথবা ছাপার ভূত এমনতর কাণ্ড ঘটিয়েছে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে আমরা সামঞ্জস্য আনতে ও সমতা বিধান করতে প্রয়াসী হয়েছি।

প্রুফ দেখা এক কঠিন কাজ, বিশেষত এই জাতীয় গ্রন্থের। এই দুরূহ দায়িত্ব পালন করেছেন শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষ, শ্রীহিরণ্ময় ঘোষ, শ্রীরাজকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীজয়ন্ত সুকুল এবং শ্রীরতন রায়। লিপি সংশোধনে তাঁরা আন্তরিক। গ্রন্থসংক্রান্ত বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আন্তরিক প্রয়াস সত্ত্বেও দু’একটি আকর্ষণীয় মুদ্রণ-প্রমাদ ঘটতে পারে। তবে মুদ্রণবিভ্রাট যদি কিছু ঘটেই থাকে তার জন্য সম্পাদকই দায়ী। প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন শ্রীসজল দাশগুপ্ত। প্রচ্ছদচিত্র সৃজনে ছিলেন শ্রীশিবেন্দু সরকার। এঁদের সকলকেই প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। পারুল প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীগৌরদাস সাহা পুস্তক ব্যবসায়ে নতুনত্ব আনতে ব্রতী হয়েছেন। তাঁর প্রয়াসে ও প্রেরণায় এই বৃহদায়তন ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশ সম্ভব হল। তাঁর সার্বিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধি কামনা করি। গ্রন্থটির মানোন্নয়নে যে-কোনো মতামত সাদরে গৃহীত হবে। আশা করি ‘উদ্ধৃতি-অভিধান’ গ্রন্থটি প্রাজ্ঞ রসিকজনের সহৃদয় অনুমোদন লাভে সমর্থ হবে।

দিলীপ কুমার মিত্র

Udichi, Flat - B15
P27/1 CIT Scheme VIIM
Kolkata-700054
Phone : 2355 9238

॥ ড. দিলীপ কুমার মিত্র রচিত ও সম্পাদিত কয়েকটি গ্রন্থ ॥

ইংরাজী সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
আধুনিক ভারতীয় নাটক
আধুনিক বিশ্বনাট্য সাহিত্য
একাঙ্ক নাটকের কথা
সাঁওতালী নাটকের কথা
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ভারতীয় নাটক
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়
হিন্দী সাহিত্যের পঞ্চ-সাধক
নবশ্রুতি (নতুন রীতির নটি শ্রুতি-নাটক)
নাট্যপঞ্চক (তারাশঙ্করের কাহিনী-নির্ভর পাঁচটি নাটক)
জাগ্রত প্রাণ (শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জীবনাশ্রিত দুটি নাটিকা)
অনির্বাণ অগ্নি (স্বাধীনতা গ্রামের মহানায়কদের জীবনীনাট্য)
প্রভুর শরণ (গুরু নানকের জীবনকথা ও তাঁর ভাবনাশ্রিত নাটক)
মহাসাধন (ছটি নাটক)
বিদেশী নাটক
দুই বাংলার সেরা একাঙ্ক
বিদেশী অলৌকিক কাহিনী
কিশোর একাঙ্ক সম্ভার
শ্রুতি নাট্য সংগ্রহ (১ম ও ২য়)
সেরা শ্রুতি নাটক (১ম ও ২য়)
শ্রুতি নাটকের কথা
আন্তর্জাতিক শ্রুতিনাট্য সংগ্রহ
কবি ও নারী (জীবনানন্দ ভাবনাকেন্দ্রিক কটি শ্রুত সংলাপ)
অট্টহাসির নাটক (তিনটি কালজয়ী হাসির নাটক সংকলন)
রুদ্র আলোকে এসো (স্বামীজী-বিষয়ক রচনা সংকলন)
বিশ্বের নির্বাচিত রহস্য কাহিনী
অরূপ নগরী কলকাতা
কালো কবিতা সংকলন
সোনালী ডানার চিল (জীবনানন্দ-বিষয়ক রচনা সংকলন)
সীতার বনবাস (বিদ্যাসাগর)
স্বর্ণলতা (তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়)
LEARNING WORDS
(Dictionary in Colour for Students)

মাননীয়

শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু

উদ্ধৃতি-অভিধান

অঋণী

অঋণী—দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ নামক ঋণত্রয় হইতে যাগ, যজ্ঞ, দান ও সন্তানোৎপাদন দ্বারা মুক্ত।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ঃ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

অঋণী হইব আমি তোমার বচনে।

রামেশ্বর ঃ শিবায়ন

অংশ

যিনি দেবতাগণের অভ্যর্থনানুসারে দশরথ-গৃহে অংশ চতুষ্টয়ে অবতীর্ণ হইয়া দুর্বৃত্ত দশাননের বংশ ধ্বংস করিয়াছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ বেতাল পঞ্চবিংশতি

মনে মনে প্রভুর হইল অভিলাষ।
এক অংশ চারি অংশে হইব প্রকাশ।।

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ

শ্রীরাম ভরত আর শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ।
এক অংশে চারি অংশ হৈলা নারায়ণ।।

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ

কোন পদার্থের অংশ মাত্রকে সেই পদার্থ কল্পনা করায় সত্যের বিঘ্ন হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা

অংশ নিয়েই যত বিরোধ। ঐ নিয়েই কুরুক্ষেত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঃ তপতী

আমাদের বয়ঃপ্রাপ্ত অংশ অর্থ চাহে, ভাব চাহে ; আমাদের অপরিণত অংশ ধ্বনি চাহে, ছন্দ চাহে।

রবীন্দ্রনাথ ঃ পঞ্চভূত (গদ্য ও পদ্য)

অংশকেও মানি, সমস্তকেও মানি ; কিন্তু সমগ্রবিহীন অংশ ঘোর অন্ধকার এবং অংশবিহীন সমগ্র আরও ঘোর অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ ঃ সঞ্চয় (আমার জগৎ)

অকাজ

—ওরে তুই কর্মভীরু অলস কিঙ্কর,
কী কাজে লাগিবি।
—অকাজের কাজ যত,
আলস্যের সহস্র সঞ্চয়। শত শত
আনন্দের আয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আবেদন (চিত্রা)

অকারণ

নারীর হাসি অকারণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা অনেক মন্দাক্রান্তা, উপেন্দ্রবজ্রা, এমনকি শার্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দ, অনেক ত্রিপদী, চতুষ্পদী এবং চতুর্দশপদীর আদিকারণ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৌতুক হাস্যের মাত্রা (পঞ্চভূত)

শুধু অকারণ পুলকে
ক্ষণিকের গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উদ্‌বোধন

অকারণে অকালে মোর পড়লো যখন ডাক
তখন আমি ছিলেম শয়ন পাতি।
বিশ্ব তখন তারার আলোয় দাঁড়ায়ে নির্বাক,
ধরায় তখন তিমির গহন রাতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান

ওরা অকারণে চঞ্চল।
ডালে ডালে দোলে বায়ুহিল্লোলে নব পল্লবদলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান

অকেজো

সবাই কাজের মানুষ হয়ে উঠলে পৃথিবীতে টেকা মুশকিল। অকেজো লোকদের আলসেমির দৌলতেই পৃথিবীটা বাসযোগ্য—এ কথা সবাই ভুলতে বসেছে এই ইউটিলিটির যুগে, আমরা ক্রমাগতই ভুলে যাচ্ছি যে মানুষের মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকবার পথে এই ইউটিলিটিবাদ প্রধান অন্তরায়।

বনফুল : নির্মোক

অক্রোধ

অক্রোধ পরমানন্দ মোর গৌরহরি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়,
অভিমানশূন্য নিতাই নগরে বেড়ায়॥
যারে দেখে তারে কহে দন্তে তৃণ ধরি,
আমারে কিনিয়া লহ বল গৌরহরি॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত

অক্ষর

তত্ত্বজ্ঞানবলে যখন জীবাত্মা প্রকৃতিকে ক্ষর ও মহদাদি গুণবিশিষ্ট এবং আপনারে নির্গুণ প্রকৃতি হইতে সম্যকরূপে পৃথক ও পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া অবগত হয়েন, অর্থাৎ যখন প্রাকৃত গুণসকলকে নিন্দা করিয়া পরব্রহ্মের অনুসরণপূর্বক পরমাত্মাতে মিলিত হয়েন, তখনই তাকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করা যায়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ : মহাভারত

অখিল

অখিল জীবের গতি দেব নারায়ণ।

কাশীরাম দাস : মহাভারত

অখ্যাত

এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐকতান

অখ্যাতি

অখ্যাতি—পরিচিত লোকে যখন চিনিনা বলে সেই অবস্থা।

প্রমথনাথ বিশী : কমলাকান্তের জল্পনা

অগ্নি (দ্রঃ আগুন)

অগ্নি আখরে আকাশে যাহারা লিখিছে আপন নাম,
চেন কি তাদের ভাই?
দুই তুরঙ্গ জীবন-মৃত্যু জুড়ে তারা উদ্দাম,
দুয়েরি বল্গা নাই !

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ সুদূরের আহ্বান

অগ্নিবীণা বাজাও তুমি কেমন করে!
আকাশ কাঁপে তারার আলোর গানের ঘোরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

অগ্নিশিখা, এসো এসো, আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো॥
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি, আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা, আনো নিত্য ভালো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ও রানী-২

অগ্নি ইঁহাদিগের (বাবুদিগের) আজ্ঞাবহ হইবেন—'তামাকু' এবং 'চুরুট' নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রিদিন ইঁহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। ইঁহাদিগের যেমন মুখে অগ্নি, তেমনি জঠরেও অগ্নি জ্বলিবেন এবং রাত্রি তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত ইঁহাদিগের রথস্থ যুগল প্রদীপে জ্বলিবেন। ইঁহাদের আলোচিত সঙ্গীতে এবং কাব্যেও অগ্নিদেব থাকিবেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বাবু—লোকরহস্য

অঘ্রান

আমি এই অঘ্রানেরে ভালবাসি—বিকালের এই রং—রঙের শূন্যতা
রোদের নরম রোম—ঢালু মাঠ—বিবর্ণ বাদামী পাখি—হলুদ বিচালি
পাতা কুড়াবার দিন ঘাসে-ঘাসে—কুড়ুনির মুখে তাই নাই কোন কথা।

জীবনানন্দ দাশ ঃ অঘ্রান (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

অঘ্রানের নদীটির শ্বাসে
হিম হয়ে আসে
বাঁশ পাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা!
বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা!

জীবনানন্দ দাশ ঃ পেঁচা (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা
নির্জন মাছের চোখে ; —পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

জীবনানন্দ দাশ ঃ মৃত্যুর আগে (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
.....ও মা অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

অমরার স্বর্ণ নামে ধরণীর সোনার অঘ্রানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হেমন্ত (নটরাজ)

অঘ্রানেরই সোনার রোদে পূর্ণিমারই ছন্দে
আমরা চাষ করি আনন্দে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

অঙ্গ

প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।

জ্ঞানদাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

হে প্রিয় আমার, প্রিয়তম মোর
আযোজন কাঁপে কামনার ঘোর।
কোথায় পুরুষকার?
অঙ্গে আমার দেবে না অঙ্গীকার?

বিষ্ণু দে ঃ ঘোড়সওয়ার

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি।
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (চিত্রাঙ্গদা)

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনি বহিয়া যায়।

গোবিন্দ দাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

অঙ্গুলি

যাঁহার স্নানকালে তৈলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথনকালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ লোকরহস্য

লাবণ্যশিখার মত অঙ্গুলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কঙ্কাল (গল্পগুচ্ছ)

আকুল অঙ্গুলিগুলি করি কোলাকুলি
গাঁথিছে সর্বাঙ্গে মোর পরশের ফাঁদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বন্দী (কড়ি ও কোমল)

অচেনা

ওগো আমার চির-অচেনা পরদেশী,
ক্ষণতরে এসেছিলে নির্জন নিকুঞ্জ হতে কিসের আহ্বানে।।
যে কথা বলেছিলে ভাষা বুঝি নাই তার,
আভাস তারি হৃদয়ে বাজিছে সদা
যেন কাহার বাঁশির মনোমোহন সুরে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান

অচেনাকে ভয় কী আমার ওরে?
অচেনাকেই চিনে চিনে উঠবে জীবন ভরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান

হে অচেনা, তব আঁখিতে আমার
আঁখি কারে পায় খুঁজি।
যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
আঁধারে লুকানো বুঝি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

অজ্ঞ

ন জ্ঞ যাহা হইতে, ন-বহুব্রীহি। যাহা হইতে জ্ঞানী নাই।.......যাহা হইতে অন্য বিজ্ঞ নাহি—সে অজ্ঞ হয়, চৈতন্যচরিতামৃত [কৃষ্ণদাস কবিরাজ]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ

বিজ্ঞ যেথা ভয় পায় অজ্ঞ সেথা আগে ধায়।

বাংলা প্রবাদ

অজ্ঞ দাস, বিজ্ঞতম তুমি।

মধুসূদন দত্ত ঃ মেঘনাদবধ কাব্য

অজ্ঞান

অজ্ঞান মুহূর্তগুলো তারায়
মিলিয়ে রইলো স্বচ্ছধারায়।

অমিয় চক্রবর্তী ঃ রাত্রিযাপন

অজ্ঞানতাই আমাদের আত্মিক সংকটের প্রধান উৎস।

দুলেন্দ্র ভৌমিক ঃ বইমেলার সার্থকতা

অন্ধতামিস্র (মরণ), তামিস্র (ক্রোধ), মহামোহ (গ্রাম্যভোগসুখেচ্ছা) মোহ (মনোবিভ্রম), তমঃ (অবিবেক) এই পঞ্চবিধ অজ্ঞানবৃত্তি (শ্রীমদ্ভাগবত ৩.১২.২, শ্রীধরটীকা)।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ

অঞ্চল

পাশ দিয়ে গেল চলি চকিতের প্রায়,
অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়, ...
দিয়ে গেল সর্বাঙ্গের আকুল নিশ্বাস,
বলে গেল সর্বাঙ্গের কানে কানে কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অঞ্চলের বাতাস (কড়ি ও কোমল)

গোলাপি অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিম্ববতী (সোনার তরী)

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার
মায়ের অঞ্চলসম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শৈশবসন্ধ্যা (সোনার তরী)

সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সুখ (চিত্রা)

অঞ্জন

নীল-অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায় সমবৃত অম্বর   হে গম্ভীর!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

তব আঁখিপল্লবে   দিয়ো আঁকি বল্লভে
গগনের নবনীল   স্বপনের অঞ্জন।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান —আনুষ্ঠানিক (ওগো বধূ সুন্দরী)

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী,
কদম্বরেণু বিছাইয়া দাও শয়নে,
অঞ্জন আঁকো নয়নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষামঙ্গল (কল্পনা)

মম মোহের স্বপন-অঞ্জন তব
নয়নে দিয়াছি পরায়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানস প্রতিমা (কল্পনা)

অঞ্জলি

অঞ্জলি লহ মোর সঙ্গীতে।
প্রদীপ-শিখা-সম কাঁপিছে প্রাণ মম
তোমারে, সুন্দর, বন্দিতে!
সঙ্গীতে সঙ্গীতে॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (রাগ-প্রধান)

বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ-মিনতি-মাখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুঃসময় (কল্পনা)

রহি আমি দুচক্ষুর অঞ্জলি পাতিয়া
প্রতিদিন ঊর্ধ্ব-পানে চেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রোগশয্যায়—৩২

অতিথি

ঝরা ফুল দ'লে কে অতিথি
সাঁঝের বেলায় এলে কানন-বীথি।।
চোখে কি মায়া
ফেলেছে ছায়া
যৌবন-মদির
দোদুল কায়া।
তোমার ছোঁওয়ায় নাচন লাগে দখিন হাওয়ায়,
লাগে চাঁদের স্বপন বকুল চাঁপায়,
কোয়েলিয়া কুহরে কু কু গীতি।।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (কাব্য-গীতি)

ভবনে আসিল অতিথি সুদূর।
সহসা উঠিল বাজি রুমু রুমু ঝুম্   নীরব অঙ্গনে চঞ্চল নূপুর।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (রাগ-প্রধান)

অতিথি তিথি মেনে আসে না, বেলা দেখে আসে না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : রায়বাড়ি

গৃহে অতিথি অভ্যাগত আসিলে প্রাচীনারা কৃতার্থ হইতেন, নবীনারা বিরক্ত হয়েন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : প্রাচীনা এবং নবীনা (বিবিধ প্রবন্ধ)

তোমার আসন পাতব কোথায় হে অতিথি।
ছেয়ে গেছে শুকনো পাতায় কাননবীথি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

আমি চিনি গো চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী।
তুমি থাক সিন্ধুপারে ওগো বিদেশিনী॥ . . .
আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ওগো বিদেশিনী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিমালা। শেফালি

হে ক্ষণিকের অতিথি,
এলে প্রভাতে কারে চাহিয়া
ঝরা শেফালির পথ বাহিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতমালিকা

সঙ্গে যারা তুলে দিতে এসেছিল তারা বকশিশ পেলে সবাই, পেল না কেবল অতিথি।.....ঝাপসা দেখতে পেলাম—স্টেশনের ফটকের বাহিরে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে চেয়ে আছে অতিথি।....কেবলই মনে হতে লাগল অতিথি আজ ফিরে গিয়ে দেখবে বাড়ির লোহার গেট বন্ধ,—ঢোকবার জো নেই!

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দেওঘরের স্মৃতি

ক্ষণিকের অতিথি স্বর্গ হইতে মর্ত্যে আসেন। কাঁদিয়ে দিয়ে চলে যান। এই যাওয়া-আসায় স্বর্গ-মর্ত্যের মিলন-পথ বিরহের ভিতর দিয়ে খুলে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ বর্ষণ

অতিমানব

অতিমানব সেই, যে চিন্তায় বড়, অনন্তের সঙ্গে যে নিজের আত্মাকে এক করতে পেরেছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : স্মৃতির রেখা

অতিমানবী

কোন নারী,—যদি সে সত্যিই ভাল কবিতা লেখে, সে হবে অতিমানবী ? মহামানবী নয় কেন?

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় : যমুনাবতী সরস্বতী (ভাঙা সময়ের কথকতা)

অতীত

কেউ ভোলে না কেউ ভোলে
অতীত দিনের স্মৃতি,
কেউ দুঃখ লয়ে কাঁদে
কেউ ভুলিতে গায় গীতি।

কাজী নজরুল ইসলাম : চোখের চাতক

কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও? . . .
হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে

কাজ করে যাও গোপনে গোপনে,
মুখর দিনের চপলতা মাঝে
স্থির হয়ে তুমি রও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কথা কও, কথা কও (কথা)

অতীতকাল যত বড় কালই হোক, নিজের সম্বন্ধে বর্তমান কালের একটা স্পর্ধা থাকা উচিত, মনে থাকা উচিত, তার মধ্যে জয় করবার শক্তি আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাভা-যাত্রীর পত্র

বসন-আঁচলে বুকেতে টানিয়া লয়ে—
হেসে চলে যাও আশার অতীত হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তোমরা ও আমরা (সোনার তরী)

পশ্চাতের নিত্য সহচর অকৃতার্থ হে অতীত,
অতৃপ্ত তৃষ্ণার যত ছায়ামূর্তি প্রেতভূমি হতে
নিয়েছ আমার সঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—৫

অত্যাচার

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
ধরণীরে সবচেয়ে করেছে বিক্ষত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

অত্যাচারী

মহা-বিদ্রোহী রণক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বিদ্রোহী

অত্যুক্তি

সকল জাতির মধ্যেই অত্যুক্তি ও আতিশয্য আছে। . . . . আমাদের দেশে গৃহস্থ অতিথিকে সম্বোধন করিয়া বলে, 'সমস্ত আপনারই—আপনারই ঘর, আপনারই বাড়ি।' ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ তাহার নিজের রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করে, 'ঘরে ঢুকিতে পারি কি'? এ এক রকমের অত্যুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অত্যুক্তি (ভারতবর্ষ ও স্বদেশ)

অত্যুক্তি অলস বুদ্ধির বাহ্য প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অত্যুক্তি (ভারতবর্ষ ও স্বদেশ)

মন যে দরিদ্র, তার
তর্কের নৈপুণ্য আছে, ধনৈশ্বর্য নাইকো ভাষার।

………………………………………

কখন হৃদয় হয় সহসা উতলা—
তখন সাজিয়ে বলা
আসে অগত্যাই ;
শুনে তাই
কেন তুমি হেসে ওঠ, আধুনিকা প্রিয়ে,

অত্যুক্তির অপবাদ দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অত্যুক্তি (সানাই)

কিন্তু, ওই আশমানি শাড়িখানি
ওকি নহে অত্যুক্তির বাণী।
তোমার দেহের সঙ্গে নীল গগনের
ব্যঞ্জনা মিলায়ে দেয়, সে যে কোন্ অসীম মনের
আপন ইঙ্গিত,
সে যে অঙ্গের সংগীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অত্যুক্তি (সানাই)

অদৃষ্ট

সকলই . . . অদৃষ্টের দোষ ; নতুবা, রাজার কন্যা, রাজার বধূ, রাজার মহিষী হইয়া, কে কখন আমার [সীতার] মত চিরদুঃখিনী হইয়াছে?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : সীতার বনবাস

মনে হচ্ছে ময়নাপাখির খাঁচায়
অদৃষ্ট তার দারুণ রঙ্গে ময়ূরটাকে নাচায় ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কালো মেয়ে (পলাতকা)

অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চালক (কণিকা)

অদৃষ্ট নাট্যের পঞ্চমাঙ্কের শেষ দিকটা হঠাৎ
দৃষ্ট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পয়লা নম্বর (গল্পগুচ্ছ)

ঘাটে সে কি রইবে বাঁধা,
অদৃষ্টে যাহার
আছে নৌকাডুবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরামর্শ (কণিকা)

হে অদৃষ্ট, তৃণকে তৃণ করে গড়েছ সেজন্য তোমাকে দোষ দিই নে। কিন্তু বটগাছটাকে বটগাছ করেও তাকে ঝড়ের ঘায়ে তৃণের সঙ্গে এক মাটিতে শোয়াও, এতেই বুঝেছি তোমার হৃদয়টা পাষাণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রায়শ্চিত্ত—১/৩

অদৃষ্ট যেন আমাদিগকে তীরের মতো নিক্ষেপ করিয়াছে, লক্ষ্য হইতে যদি একবার একটু বাঁকিয়া গিয়া থাকি, তবে আর যেন সহস্র চেষ্টায় লক্ষ্যের মুখে ফিরিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজর্ষি—৩৬ পরিঃ

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটেছে
সেই আমাদের ভালো।
আমাদের এই আঁধার ঘরে
সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালো।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষরক্ষা

কিসের তরে অশ্রু ঝরে
কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস।

হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হতভাগ্যের গান

অদৃষ্ট জিনিষটাই চিরদিন জীবনসংগ্রাম ও ধর্মের মাঝে অচ্ছেদ্য ও অফুরন্ত সেতুর শিকলের মত জুড়ে আছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : অপ্রকাশিত খণ্ড রচনা—২

ধর্ম ও অধর্ম (পাপ ও পুণ্য) ভেদে অদৃষ্ট দ্বিবিধ ;. . . পূর্বজন্মার্জিতং কর্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে'। অর্থাৎ পূর্বজন্মে অর্জিত কর্মকেই দৈব বা অদৃষ্ট কহে।

সুবলচন্দ্র মিত্র : সরল বাঙ্গালা অভিধান

অদ্বৈত

অদ্বৈত যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগসাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিসটা আসে কোথা থেকে, এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।. . . গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্যন্ত যাক না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে।. . . গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা, কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকে নিবিড় করার জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন—১০। চির নবীনতা

অদ্ভুত

গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না।

চতুরঙ্গ—২য় পরিঃ

আমরা নূতন যৌবনেরই দূত।
আমরা চঞ্চল, আমরা অদ্ভুত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তাসের দেশ

অধম

পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : **কপালকুণ্ডলা**

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কণিকা

অধর

চাঁদ ও চকোরে অধরে অধরে
পিয়ে সুধা প্রাণ ভরে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : আলিবাবা

কোথা সেই হাসিপ্রান্ত চুম্বনতৃষিত
রাঙা পুষ্পটুকু যেন প্রস্ফুট অধর।

কড়ি ও কোমল। মোহ

অধর করুণামাখা
মিনতি-বেদনা-আঁকা—।

কল্পনা। নব বিরহ

অধরা

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে।
ও যে সুদূর রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতিবিতান)

দাঁড়িয়েছিলে জানলায়।
অধরা ছিল তোমার দূরে-চাওয়া চোখের পল্লবে,
অধরা ছিল তোমার কাঁকন-পরা নিটোল হাতের মধুরিমায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষসপ্তক—১৩

অধিকার

নিজের ন্যায্য অধিকার দখল কর। কিন্তু অন্যকে কোনদিন ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করিস না।

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় : ভাঙা সময়ের কথকতা

অধিকার কেউ কাউকে দিতে পারে না। যোগ্যতার প্রমাণ করে ওটা নিজে নিতে হয়।

গঙ্গাপদ বসু : অংশীদার

অধিকার লাভের যে মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকার প্রয়োগকে সংযত করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চোখের বালি—৫২ পরিচ্ছেদ

অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দেশীয় রাজ্য (আত্মশক্তি)

দাও মোরে সন্তোষের মহা অধিকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—৫১

অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী-অধিকারের প্রভেদ এই যে স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশী করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মণিহারা (গল্পগুচ্ছ)

অধীন

কখনও কাহারও অধীন হইও না—এই প্রধান সৎপরামর্শ।... অধীনতা এই পৃথিবীর বিষ; অধীনতা রাশি রাশি নরকযন্ত্রণার হেতু।

কেশবচন্দ্র সেন : স্বাধীনতা

আমরা কথার অধীন, প্রথার অধীন, অসংখ্য প্রবৃত্তির অধীন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ত্যাগের ফল (শান্তিনিকেতন)

অধ্যাত্মবাদী

অধ্যাত্মবাদী দর্শনের পিছনে লোকবঞ্চনার এক আয়োজনও থেকেছে।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় : ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে

অধ্যাপক

অনেক অধ্যাপক দেখেছি, তাঁদের মুখ থেকে হাসি বের করতে হলে ডাক্তার ডাকতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ল্যাবরেটরি (তিনসঙ্গী)

অধ্যাপকরা পড়াশোনায় বুঁদ হয়ে থাকবে না তো কারা থাকবে? সায়েবরা তো উঠতি অধ্যাপকের নামই দিয়েছে রিডার। **শংকর** : যাবার বেলায়

অনন্ত

অনন্ত যে তোমার চারধারে প্রসারিত, তোমার পায়ের তলার তৃণদলের শ্যামলতায়, তোমার কোলের শিশুর মুখের হাসিতে, তোমার আঙিনায় পাখির ডাকে, সন্ধ্যায় ঝিঁঝির সুরে, নৈশ পাখির পাখার আওয়াজে—কিন্তু আমি শুনবো না, আমি দেখবো না, আমি বুজে আছি—কার এত স্পর্ধা আমার চোখ খোলে?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্মৃতির রেখা

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।
তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান-আনুষ্ঠানিক

জীবের মধ্যে অনন্তকে অনুভব করারই অন্য নাম ভালোবাসা। প্রকৃতির মধ্যে অনুভব করার নাম সৌন্দর্য-সম্ভোগ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মনুষ্য (পঞ্চভূত)

অনাদর

অনাদরের ফল কী হয়। অনাদৃত মানুষ নিজেকে অনাদরণীয় বলে বিশ্বাস করে ; মনে করে স্বভাবতই সে জ্যোতির্হীন। কিন্তু এ কথাটা তো গভীরভাবে সত্য নয় ; আত্মপ্রকাশের অভাবেই তার আত্মবিস্মৃতি। যখন সে আপনাকে প্রকাশ করবার উপযুক্ত উপলক্ষ পায় তখন সে আর আপনার কাছে আপনি প্রচ্ছন্ন থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সভাপতির অভিভাষণ (সাহিত্যের পথে)

অনাহার

অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিড়াল (কমলাকান্ত)

অনিয়ম

আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল।
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বিদ্রোহী

অনির্বচনীয়

নবজলধরমণ্ডলের সহযোগে, শিখরদেশে কি অনির্বচনীয় শোভা সম্পন্ন হইয়াছে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ সীতার বনবাস—প্রথম পরিচ্ছেদ

যখনই প্রিয়ার বদন সুধাকরে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ ও অন্তরাত্মা অনির্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ সীতার বনবাস—প্রথম পরিচ্ছেদ

বিষয়ের চেয়ে বেশীটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছন্দের অর্থ (ছন্দ)

শোভন হাতের সন্দেশ, পানতোয়া,
মাছমাংসের পোলাও ইত্যাদিও
যবে দেখা দেয় সেবামাধুর্যে-ছোঁওয়া
তখন সে হয় কী অনির্বচনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিমন্ত্রণ (বীথিকা)

যাহা মোর অনির্বচনীয়
তারে যেন চিত্ত-মাঝে পায় মোর প্রিয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সবলা (মহুয়া)

অনুকরণ

বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ "হনুকরণে" পরিণত হইয়া পড়িয়াছে।

কাজী নজরুল ইসলাম : সত্য-শিক্ষা

অনুকরণ মাত্র কি দূষ্য? তাহা কদাচ হইতে পারে না। অনুকরণ ভিন্ন প্রথম শিক্ষার উপায় কিছুই নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : অনুকরণ (বিবিধ প্রবন্ধ)

প্রতিভাশূন্যের অনুকরণ বড় কদর্য হয়। . . .অক্ষম ব্যক্তির কৃত অনুকরণ অপেক্ষা ঘৃণাকর আর কিছুই নাই। একে মন্দ, তাহাতে অনুকরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : অনুকরণ (বিবিধ প্রবন্ধ)

অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না। অর্জন না করিলে কোনো বস্তুই নিজের হয় না। সিংহচর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গর্দভ সিংহ হয়?

স্বামী বিবেকানন্দ : বর্তমান ভারত

অনুকরণ জিনিসটা শুধু যখন বাইরের নকল তখন সে ফাঁকি। তখন আকৃতিতে মিললেও প্রকৃতিতে মেলে না। কিন্তু ভেতরে-বাইরে সে যদি এক হয়েই যায় তখন অনুকরণ বলে লজ্জা পাবার ত কিছু নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শেষ প্রশ্ন

অনুতাপ

অনুতাপ যখন হয়েছে তখন পাপ আর নেই।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : তারানাথ তান্ত্রিক

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিও নিজের হাতের কাজ দেখে অনুতাপ করেন, আর যিনি আমার পাণিগ্রহণ করেছেন তাঁর মনের ভাব দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ—৫১ পরিচ্ছেদ

অনুবাদ

যে কোন ভাষা অনুবাদের মাধ্যমে পরিশীলিত হয়। কারণ অনুবাদক চেষ্টা করেন অন্য ভাষার মূল সাহিত্যকৃতিকে নিজের ভাষায় যথাসাধ্য এবং যথাযথ তুলে আনতে। অনুবাদ সেই প্রচেষ্টা যাতে ভিন্ন ভাষার বাকরীতিকে নিজ ভাষায় আত্মসাৎ করতে চান অনুবাদক। এর জন্যে অনেক সময়ে অনুবাদক নতুন শব্দ সৃষ্টি করে ভাষার প্রকাশ ক্ষমতাকে প্রবৃদ্ধ করেন। অনুবাদের মধ্যে দিয়ে বাক্য রচনার নতুন স্টাইল বা শৈলী প্রবর্তিত হয়। অনুবাদের মধ্যে দিয়েই ভিন্ন দেশের, ভিন্ন পরিবেশের, ভিন্ন জীবনচর্চার স্বাদ সঞ্চারিত হয় অন্য ভাষায় এবং সে ভাষা ও সাহিত্য পরিধিগতভাবে অনেক ব্যাপক ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

নিরূপ মিত্র : অনুবাদ সাহিত্য

সার্থক অনুবাদ নিজেই এক স্বতন্ত্র শিল্প। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে বারবারই দেখা যায় অনুবাদ যখন অনুশীলিত তখন তা স্বয়ং ভাস্বর। বহু অনুবাদ বা অনুকৃত সাহিত্যে মূল রচনার দীপ্তিকে ম্লান করে দিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপে বলা যায়, ওমরখৈয়াম বা ফিটজেরাল্ড কার লেখা উন্নততর? বাংলার গীতাঞ্জলি অনূদিত হয়ে কি আরো দৃঢ়পিনদ্ধ হয়নি? গীতাঞ্জলির অনুবাদ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু কিন্তু সেই রকম মতই প্রকাশ করেছেন।

নিরূপ মিত্র : অনুবাদ সাহিত্য

একটি ভাষার কবিতা অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে গেলে মূল কবির মনোরাজ্যের সামগ্রিক উপলব্ধি সঞ্চারিত করা তো সম্ভবই নয়, তা ছাড়াও এক ভাষার কবিতা অন্যভাষায় অনুবাদ করতে গেলে মূলের ভাষারূপের ধ্বনিশিল্পও অন্য ভাষায় আনা যায় না। মূলের শিল্পসৌন্দর্য অনেকখানিই অনুবাদে হারাতে হয় বলে একটি ইটালীয় প্রবাদে একটি মর্মান্তিক সত্য প্রকাশ করা হয়েছে—"অনুবাদক-মাত্রেই বিশ্বাসঘাতক"—Traduttore traditore.

রামেশ্বর শ' ঃ সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

অনুবাদের ভাষা প্রথমেই যে সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা হল নিজের গতিতে, নিজস্ব নিয়মে এর সম্পূর্ণ অন্য ভাষায় রূপান্তর ঘটানো। প্রত্যেক ভাষার একটি স্বতন্ত্র চরিত্র আছে। আর সেই চরিত্রের সঙ্গে ঐ ভাষার রচিত সাহিত্য অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে। তাদের বিচ্ছিন্ন করা যেন, দেহ থেকে মনকে, আধার থেকে আধেয়কে ভিন্ন করা। তাই এক ইটালিয়ান প্রবচন, "অনুবাদ মানেই বিশ্বাসঘাতকতা।" ভাষান্তর মানেই ভাষামেধ। গদ্যের তুলনায় কবিতার ক্ষেত্রে এ কথা আরো অধিক সত্য। গদ্য তাও বলিষ্ঠ পদক্ষেপে এক ভাষার প্রাঙ্গণ থেকে আর এক ভাষার রাজপথে প্রবেশ করতে পারে, কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করেও। কিন্তু স্পর্শকাতর গাছের মত, অন্তঃপুরবাসিনী কবিতা স্থানান্তরিত হলে তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করা কঠিন।

সুদেষ্ণা চক্রবর্তী ঃ অনুবাদের ভাষা (ঈক্ষণ, জানুয়ারি ২০০৩)

অনুবাদ কবিতার পক্ষে কিছুতেই বিশুদ্ধ কবিতা হওয়া সম্ভব নয়, কখনো হয়নি। কোলরিজ বলেছিলেন, একটি কবিতার সেইটুকুই বিশুদ্ধ কবিতা, যার অনুবাদ সম্ভব নয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ অন্য দেশের কবিতা

অনুভব

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব—
আধারে মিশে গেছে আর সব।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমালা

অনুভব ক্রিয়া মাত্রই সুখের, যদি না তাহার সহিত কোনো গুরুতর দুঃখভয় ও স্বার্থহানি মিশ্রিত থাকে। এমন কি, ভয় পাইতেও সুখ আছে, যদি তাহার সহিত বাস্তবিক ভয়ের কোনো কারণ জড়িত না থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৌতুকহাস্য (পঞ্চভূত)

অনুশোচনা

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে
জনমে অনুশোচনা—
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার সভা—৪/১

অসহ্য যন্ত্রণা। অনুশোচনার গন্ধ বড় কটু।
ওডিকোলনে ঘোচে না।

রাম বসু ঃ এক্সরে হয়ে গেল (সময়ের কাছে, সমুদ্রের কাছে)

অনেক

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া,
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতপঞ্চাশিকা

অনেক কথা যাও যে বলে কোন কথা না বলি।
তোমার ভাষা বোঝার আশা দিয়েছি জলাঞ্জলি।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

যাদের অনেক আছে তাদেরই অনেক আশঙ্কা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নটীর পূজা—১

অনেক দিয়েছ নাথ,
আমায় অনেক দিয়েছ নাথ,
আমার বাসনা তবু পুরিল না—
দীনদশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না,
গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না, মিটিল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (ব্রহ্মসঙ্গীত)

অন্ত

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ,
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

আশার অন্ত নাইকো বটে,
আর সকলেরি অন্ত ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লক্ষ্মীর পরীক্ষা

অন্তর

অন্তরে তুমি আজ চিরদিন ওগো অন্তর্যামী।
বাহিরে বৃথাই যত খুঁজি, তাই পাই না তোমায় আমি।।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (ভক্তি-গীতি)

আমার অন্তর যেমন করিছে
তেমনি হউক সে।

চণ্ডীদাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী (সই কেমনে ধরিব হিয়া)

অন্তর মুখদর্পণে প্রতিফলিত হয়।

নিশিকান্ত বসু রায় ঃ বঙ্গে বর্গী

অন্তর মম বিকশিত করো
অন্তরতর হে।
নির্মল করো, উজ্জ্বল করো
সুন্দর করো হে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

অন্তরে জাগিছ অন্তরযামী।
তবু সদা দূরে ভ্রমিতেছি আমি।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত—৬

অন্ধ

ওমা, তোর ভুবনে জ্বলে এতো আলো
আমি কেন অন্ধ মাগো—দেখি শুধু কালো।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভক্তি-গীতি

আমি যখন ছিলেম অন্ধ
সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাই নি তো আনন্দ।।

রবীন্দ্রনাথ ঃ গান (অরূপরতন)

এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুঃসময় (কল্পনা)

অন্ধ কিছু ভোলে না, আমার তো জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দৃষ্টিদান (গল্পগুচ্ছ)

অন্ধজনে দেহো আলো, মৃতজনে দেহো প্রাণ—
তুমি করুণামৃতসিন্ধু করো করুণাকণা দান।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত

অন্ধ হলে কি প্রলয় বন্ধ থাকে?

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ উটপাখি

অন্ধকার

অন্ধকারই আমার ঘরবাড়ি
অন্ধকারে সূর্য দিলে
তোমার বুকে
স্বপ্ন দিতে পারি।

অমিতাভ গুপ্ত ঃ গার্হস্থ্য

বসে বসে অন্ধকারে কেবল হাতড়াচ্ছে। আলোর সন্ধান কর।. . . এমন আলো দিয়ে সংসারটিকে আলোকিত কর যেটি আর কখনও নিববে না। সে আলো কি জান? ভগবৎনিষ্ঠা, ভগবৎ প্রেম।

আনন্দময়ী মা ঃ পরমাযোগিনী আনন্দময়ী মা (গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী)

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?

জীবনানন্দ দাশ ঃ অন্ধকার

হয়তো এ ব্রহ্মাণ্ডের অবিনাশ অন্ধকার ছাড়া
মানুষের ভবিষ্যতে কিছু নেই আর।

জীবনানন্দ দাশ ঃ টেবিলে অনেক বই

আবার আকাশে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে
আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত এই অন্ধকার।

জীবনানন্দ দাশ ঃ নগ্ন নির্জন হাত

এখন গভীর পবিত্র অন্ধকার ;
হে আকাশ হে কালশিল্পী
সূর্য জাগিয়ো না।

জীবনানন্দ দাশ ঃ মৃত্যু স্বপ্ন সঙ্কল্প

অন্ধকার, ওগো অন্ধকার।
জ্যোতিঃরূপ এ বিশ্বের তুমি সুনিশ্চিত মহাভবিষ্যৎ ;
অজ্ঞাত গহনে তব একদিন সমগ্র জগৎ
ছুটাইয়ে সপ্তরশ্মি—রথ
অন্ধবৎ হারাইবে পথ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ অন্ধকার (মরুশিখা)

অন্ধকারে নিজের মুখোমুখি হওয়া যায়। নিঃশব্দে কথা বলা যায়।

রতন কুমার ঘোষ ঃ আশ্রয় [শ্রুতি নাটক বার্তা ১/২]

অন্ধকারে নিকটে করে আলোতে করে দূর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অপেক্ষা (মানসী)

উদয়াস্ত দুই তটে অবিচ্ছিন্ন আসন তোমার
নিগূঢ় সুন্দর অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অন্ধকার (পূরবী)

কনকচাঁপার গন্ধ-ছোঁওয়া বনের অন্ধকারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আনমনা (পূরবী)

তারা-ছিটিয়ে-দেওয়া অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৃতজ্ঞ শোক (লিপিকা)

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
সেই তো তোমার আলো!
সকল দ্বন্দ্ববিরোধ-মাঝে জাগ্রত যে ভালো
সেই তো তোমার ভালো।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

যতবার আলো জ্বালাতে চাই
নিবে যায় বারে বারে।
আমার জীবনে তোমার আসন
গভীর অন্ধকারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি ৭২

অন্ধকারের ঝরনা থেকেই . . . জীবনের অভিষেক. . . .
অন্ধকারের নিস্তব্ধতার মধ্যে . . . মৃত্যুর আমন্ত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাভা-যাত্রীর পত্র

স্তব্ধ বাদুড়ের মতো জড়ায়ে অযুত শাখা
দলে দলে অন্ধকারে ঘুমায় মুদিয়া পাখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিশীথচেতনা (ছবি ও গান)

আলোক তো কারাগার, নিষ্ঠুর কঠিন
বস্তু দিয়ে ঘিরে রাখে দৃষ্টির প্রসর।
অন্ধকার স্বাধীনতা, শান্তি অন্ধকার,
. . . অন্ধকার মানসের বিচরণভূমি,
অনন্তের প্রতিরূপ বিশ্রামের ঠাঁই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রকৃতির প্রতিশোধ (২য় দৃশ্য)

কালো খাঁড়ার মত অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী (৪র্থ দৃশ্য)

নদীতীরে অন্ধকার নামিত নীরবে
প্রেমনত নয়নের স্নিগ্ধছায়াময়
দীর্ঘ পল্লবের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিদায় অভিশাপ

অন্ধকার নাহি যায় বিবাদ করিলে
মানে না বাহুর আক্রমণ।
একটি আলোকশিখা সম্মুখে ধরিলে
নীরবে করে সে পলায়ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মঙ্গল-গীত (কড়ি ও কোমল)

বাইরের আলোর উপর ভরসা রাখাই অভ্যাস, তাই অন্ধকার হলেই একেবারে অন্ধকার দেখি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তধারা

—কোথাও অন্ধকার কেন থাকবে।
—তাহলে যে আলোও চিনবে না, অন্ধকারও চিনবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ১

কঠিন কালো লোহার মত অন্ধকার, . . .ঘুমের মতো, মূর্ছার মতো, মৃত্যুর মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা

সেই অন্ধকারকে সাধনা করি
যার মধ্যে স্তব্ধ বসে আছেন
বিশ্বচিত্রের রূপকার, যিনি নামের অতীত,
প্রকাশিত যিনি আনন্দে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক—আট

ভোরের প্রথম কোকিল ডাকা অন্ধকারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক—উনিশ

এ ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসীকৃষ্ণ ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার ; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার!

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শ্রীকান্ত—১

যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার! মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন দুস্তর আঁধারে মগ্ন! তাই রাধার দু'চক্ষু ভরিয়া যে রূপ প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া দিল, তাহাও ঘনশ্যাম!

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শ্রীকান্ত-১

কেতকীর গন্ধে দুরন্ত,
এই অন্ধকার আমাকে কী করে ছোঁবে?

সমর সেন ঃ মুক্তি

অন্ন

মানুষ এবং কুত্তাতে
আজ সকলে অন্ন চাটি এক সাথে
আজকে মহাদুর্দিনে

আমরা বৃথা খাদ্য খুঁজি ডাস্টবিনে।
এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা,
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর—
হোটেলখানার পাশেই এরা বানিয়ে চলে আঁস্তাকুড়।

দিনেশ দাস ঃ ডাস্টবিন

অন্নচিন্তা চমৎকারা, কালিদাস হয় বুদ্ধিহারা।

বাংলা প্রবাদ

প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তার পর ধর্ম।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা, খণ্ড ৫/৩৪০

অন্ন! অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্তসুখে রাখিবেন—ইহা আমি বিশ্বাস করি না।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা ৭/১০

ক্রোর টাকা খরচ করে কাশী-বৃন্দাবনের ঠাকুরঘরের দরজা খুলছে আর পড়ছে। এই ঠাকুর কাপড় ছাড়ছেন, তো এই ঠাকুর ভাত খাচ্ছেন, তো এই ঠাকুর আঁটকুড়ির বেটাদের গুষ্টির পিণ্ডি করছেন ; এদিকে জ্যান্ত ঠাকুর অন্ন বিনা, বিদ্যা বিনা মরে যাচ্ছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী ৭/৭৯

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা।
অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা।
অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা।
অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র সবিতা।।
অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি, সর্বধর্মসার
অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওঙ্কার।
সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে।।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ আশ্চর্য ভাতের গন্ধ (আমার কবিতা)

উপার্জনের অন্ন নয়, ...প্রেমের অন্ন —হাত খালি করিয়া দিয়া অঞ্জলি পাতিয়া চাহিতে পারিলেই হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রোগীর নববর্ষ (সঞ্চয়)

অন্নের লাগি মাঠে
লাঙ্গলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ

কলিতে অন্নগত প্রাণ, দেহবুদ্ধি যায় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

অন্ন দে অন্ন দে গো অন্ন দে অন্নদা।

রামপ্রসাদ ঃ গান (শাক্ত-পদাবলী)

যাদের নিজের অন্ন নেই, সংসারে তারাই অপরের অন্নে সবচেয়ে বড় বাধা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দেনাপাওনা—২৪

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো!

সুকান্ত ভট্টাচার্য : অনুভব ১৯৪০ (ছাড়পত্র)

অন্নজল

কত কাল রবে বল ভারত রে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে।
দেশে অন্নজলের হল ঘোর অনটন—
ধর হুইস্কি-সোডা আর মুর্গি-মটন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরকুমার সভা

মহাদেব বুকের মধ্যে রেখেছেন অন্নপূর্ণাকে, আর মাথার উপরে রেখেছেন গঙ্গাকে—কাউকেই তাঁর ছাড়লে একদণ্ড চলে না—তাঁর প্রাণের অন্নজল দুই-ই সমান চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিত্রাণ—১/৩

অন্নপূর্ণা

অন্নপূর্ণা জগন্মাতার জগৎপালিকা মূর্তি। (ব্রহ্মরূপ অন্ন ধাতুর উৎপত্তির মূল আদ্যাশক্তি বা মূল প্রকৃতির নাম অন্ন, এই অন্নদ্বারা যিনি চতুর্দশ ভুবন পূর্ণ করেন)

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ করতে হবে বলেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—৭

অন্যায়

অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মদিনে—১৬

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—৭০

ন্যায় অন্যায় জানিনে, জানিনে, জানিনে—
শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি ওগো সুন্দরী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্যামা

অন্যায় অনুরোধ যে দিক থেকেই আসুক, তাকে অগ্রাহ্য করাই যথার্থ সাহস।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জাগরণ ১

অন্যায় অবিচার—একজনের প্রতি হলেও যে অকল্যাণময়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা

অপদেবতা

দেবতারা হচ্ছেন উদার-প্রকৃতির দিলদরিয়া, কেউ তাঁদের না মানলেও বড় একটা কেয়ার করেন না। কিন্তু অপদেবতারা পদবীতে খাটো বলে তাঁদের আত্মসম্মানবোধ বড়ই উগ্র, না মানলে ঘাড় ধরে তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা আদায় করেন।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) : মহেশের মহাযাত্রা

BIRCHANDRA STATE CENTRAL LIBRARY AGARTALA
7063
5/7/04

অপবাদ

নিন্দা এবং স্তুতিতে যাঁহাদের চিত্ত স্থির থাকে তাঁহারাই যথার্থ সাধু। ভগবান তাঁহার অনুগত জনের উপরে অনেক সময় মিথ্যা অপবাদাদি উপস্থিত করিয়া থাকেন তাঁহাদিগের চিত্তকে নির্মল করিবার জন্য। এই সকলকে অম্লান বদনে সহ্য করিতে পারা আবশ্যক। যাহাদের মুখ দিয়া অপবাদ উপস্থিত করেন তাহাদিগকে তোমার মনের এই শোধন কার্যের সহায়কারী মনে করিয়া তাহাদের প্রতি প্রসন্নতা সর্বদা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে ভগবান শীঘ্র তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমার বিশেষ কল্যাণ বিধান করিবেন।

স্বামী সন্তদাসজী : বাণী ও জীবনী

অপমান

একজনের সমাদরের দ্বারা অন্য সকলের অনাদরটা যেখানে বেশী করে ফুটে ওঠে সেখানে এরকম সমাদরকে আমি অপমান বলে গণ্য করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা—২০ পরিচ্ছেদ

আমি আমার অপমান সহিতে পারি,
প্রেমের সহে না তো অপমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গুপ্ত প্রেম (মানসী)

দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো ; শোধ তোলবার সখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুকুট-১ম দৃশ্য

মনকে নিজের কাছে রাখিস নে। ভিতরে যে ঠাকুরটি আছেন তাঁরই পায়ের কাছে রেখে আয়, সেখানে অপমান পৌঁছোবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তধারা

ঠিক লোকের সর্বত্র জয়। . . .ঈশ্বরের এমনও আছে যে, ঠিক লোকের কখনও কোথাও তিনি অপমান করেন না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

অপরাধ

তুমি সুন্দর, তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?
চাঁদের হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী, বলে না ত কিছু চাঁদ॥

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য-গীতি

ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ।
অসহায় মনে কেন জেগেছিল ভালোবাসিবার সাধ।

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য-গীতি

হে নিরুপমা
আঁখি যদি আজ করে অপরাধ, করিয়ো ক্ষমা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান

নিত্য তোমায় ডাকি আমি ধুলার ’পরে বসে,
নিত্যনূতন অপরাধের মাঝে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১১১

আমার অপরাধের শক্তি যত
ক্ষমার শক্তি তোমার আরো অনেকগুণ বড়ো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য—১ম দৃশ্য

ছেলেদের অপরাধকে আমরা বড়োদের মাপকাঠিতে মাপিয়া থাকি, ভুলিয়া যাই যে ছোটো ছেলেরা নির্ঝরের মতো বেগে চলে, ...বেগ যেখানে থামিয়াছে সেইখানেই বিপদ ;.....এইজন্য শিক্ষকদের অপরাধকে যত ভয় করিতে হয়, ছাত্রদের তত নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি

যে অপরাধের শাস্তি দেবার কেউ নেই, সেটা পাপ হতে পারে কিন্তু অপরাধ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

অপরাধ অত্যন্ত প্রত্যক্ষ না হলে সমাজ নিজের গরজে তাকে পাশ কাটিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবিবার (তিনসঙ্গী)

একটা সত্যকার অপরাধ অনেক মিথ্যা অপরাধের বোঝা বয়ে আনে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ গৃহদাহ—২০

সংসারে এমন অপরাধ অল্পই আছে ইচ্ছে করলে যাকে ক্ষমা করা না যায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ গৃহদাহ—৩৯

অপসংস্কৃতি

অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই হল বুর্জোয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ঃ সাতের দশকের মুক্ত মন

অপসংস্কৃতির বেসাতিওয়ালারা বিশুদ্ধ নন্দনচর্চার অজুহাতে অনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ঘোড়ার লাগাম ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃতিকে আজ বলতে গেলে চরম ধ্বংসের পারঘাটায় এনে ফেলেছে।

নারায়ণ চৌধুরী ঃ সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি

অপসংস্কৃতি আর কিছু নয়, ধনতন্ত্রের ঔরসে স্বৈরিণী বুর্জোয়া বিলাসিনীর গর্ভের এক অপজাত সন্তান।

নারায়ণ চৌধুরী ঃ সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি' গ্রন্থে

অপেক্ষা

অপেক্ষা করবে যারা দুর্বল, নির্বোধ এবং যারা অনিবার্য পরিণতি নামক কু-সংস্কারে বিশ্বাস করে।

নিরূপ মিত্র ঃ আততায়ী

অপূর্ব

অপূর্ব এক স্বপ্ন-সম
লাগতেছিল চক্ষে মম—
কী বিচিত্র শোভা তোমার,
কী বিচিত্র সাজ।
আমি মনে ভাবতেছিলেম,
এ কোন্ মহারাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৃপণ (খেয়া)

অপূর্ব তার চোখের চাওয়া,
অপূর্ব তার গায়ের হাওয়া,
অপূর্ব তার আসা-যাওয়া গোপনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমাল্য—১১

অপ্রিয়

পৃথিবীতে যেটা অপ্রিয় সেইটেরই সম্ভাবনা বেশি। ফুলগাছের চেয়ে আগাছাই বেশি সম্ভবপর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রজাপতির নির্বন্ধ—১৩

অপ্সরী

চেহারা দেখে বোধ হল অপ্সরী—যদিও অপ্সরীর চেহারা কী রকম, পূর্বে কখনো দেখিনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বশীকরণ (ব্যঙ্গকৌতুক)

অফিস

দিনের মধ্যে এক-একটা সময় আছে যে সময়টা অত্যন্ত নীরস, অত্যন্ত অনুদার। যে সময়ে ভূমা সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন থাকেন, যে সময়ে হয় আমরা একান্তই আপিসের জীব হয়ে উঠি নয়তো আহার-পরিপাকের জড়তায় আমাদের অন্তরাত্মার উজ্জ্বলতা অত্যন্ত ম্লান হয়ে আসে....।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরশরতন (শান্তিনিকেতন)

তোর মুখে যেন একটা কালো আবরণ পড়েছে। তুই অফিসের কাজ করিস কিনা তাই পড়েছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

অবকাশ

মানুষের চিত্তের চারিদিকেও একটি বিশাল অবকাশের বায়ুমণ্ডল আছে. সেইখানেই তাহার নানা রঙের খেয়াল ভাসিতেছে ; সেইখানেই অনন্ত তাহার হাতে আলোকের রাখী বাঁধিতে আসে। সেইখানেই ঝড়বৃষ্টি, সেইখানেই উনপঞ্চাশ বায়ুর উন্মত্ততা, সেখানকার কোনো হিসাব পাওয়া যায় না। মানুষের যে অতি-চৈতন্যলোকে অভাবনীয়ের লীলা চলিতেছে সেখানে যে-সব অকেজো লোক আনাগোনা রাখিতে চায়, তাহারা মাটিকে মান্য করে বটে, কিন্তু এই বিপুল অবকাশের মধ্যেই তাহাদের বিহার। সেখানকার ভাষাই সংগীত। এই সংগীতে বাস্তবলোকে বিশেষ কী কাজ হয় জানি না, কিন্তু ইহারই কম্পমান পক্ষের আঘাতবেগে অতিচৈতন্যলোকের সিংহদ্বার খুলিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আষাঢ় (বিচিত্র প্রবন্ধ)

....বৃহৎ যেখানে আছে অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়, একেবারে পরিপূর্ণ।.....প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানে কথা যেখানে থামে সেখানে সুর ভরাট।....সুর যতই বৃহৎ হয় ততই কথার অবকাশ বেশী থাকা চাই। লোকালয়ের মধ্যে যখন থাকি অবকাশ জিনিসটাকে তখন ডরাই।.....লোকালয়.....একটা নিরেট জিনিস, তারমধ্যে ফাঁক মাত্রই ফাঁকা। সেই ফাঁকটাকে কোনোমতে চাপা দেবার জন্যে আমাদের মদ চাই, তাসপাশা চাই, রাজাউজির মারা চাই, নইলে সময় কাটে না। অর্থাৎ সময়টাকে আমরা চাইনে, সময়টাকে বাদ দিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপান যাত্রী

কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে, কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড়ো দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র ১ (কালান্তর)

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিষ প্রচুর ছিল,.....সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ।.......আজকের দিনে......সেই ধ্যানের বড়ো অবকাশটি নষ্ট হল। আজকের দিনে ভারতবাসীর আর ছুটি নেই ; তার মনের অন্তরতম ছুটির উৎসাহ শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেল, বেদনায় তার সমস্ত চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র—২ (কালান্তর)

প্রজাপতি পায় অবকাশ
ভালোবাসিবারে কমলেরে।
মধুকর সদা বারোমাস
মধু খুঁজে খুঁজে শুধু ফেরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

অপরাজিতা

পরাজিত তুই সকল ফুলের কাছে,
তবু কেন তোর অ-পরাজিতা নাম?
গন্ধ কী তোর বিন্দুমাত্র আছে—
বর্ণ সেও তো নয় নয়নাভিরাম! ......

মোর ঠাঁই শুধু দেবের চরণতলে,
পূজা—শুধু পূজা জীবনের মোর ব্রত ;
তিনিও কি মোরে ফিরাবেন আঁখিজলে—
অন্তরযামী, তিনিও তোমারি মতো।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী : অপরাজিতা

অবজ্ঞা

বৈশাখে দাড়িম্ববনে যে-রাগরঙ্গিমা
যৌবনের দাপে
অবজ্ঞা কটাক্ষ হানে মধ্যাহ্নের তাপে,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নাম্নী-মুরতি (মহুয়া)

অবতার

ধনঞ্জয়-বাসুদেব,—মায়াতিমানব।
পূর্বদেহ দুই ঋষি নর-নারায়ণ।
এক আত্মা—দ্বিধাভূত ভিন্ন রূপে।
দুষ্কৃতের ধ্বংস তরে, ধর্মের রক্ষণে—
যুগে যুগে হন তাঁরা অবতার।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : নর-নারায়ণ—১/১

পৃথিবীর সর্বদেশে স্মরণাতীত কাল থেকে মানুষ অতি-জাগতিক এক লোকে অতি মানবিক এক পরমশক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করে এসেছে।......

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, সেই ঐশীশক্তি মানব শরীর গ্রহণ করে সেই অতি-জাগতিক লোক থেকে আমাদের এই জাগতিক লোকে—আমাদের এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। 'অবতরণ' করেন বলে তিনি 'অবতার' বলে অভিহিত হন। আবার জগৎকে 'ত্রাণ' বা 'তারণ' করেন বলেও তিনি 'অবতার'। তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য জগৎ-কল্যাণ, ধর্ম সংস্থাপন, দুষ্টের দমন, শিষ্টের রক্ষণ।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ : চিরন্তনী সারদা

মহাকাশ চিদাকাশ থেকে এক-একটি রূপ উঠছে দেখা যায়। অবতারও একটি রূপ। অবতারলীলা যে আদ্যাশক্তিরই খেলা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা। ঈশ্বরই যুগে যুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

তিনি মানুষ হয়ে অবতার হয়ে যুগে যুগে আসেন, প্রেমভক্তি শিখাবার জন্য। দেখ না চৈতন্যদেব। অবতারের ভিতরেই তাঁর প্রেম ভক্তি আস্বাদন করা যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

অবতার আদির জ্ঞান যেন সূর্যের আলো। ভিতর বার, ছোট বড়—তাঁরা সব দেখতে পান।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

অবলা

যে দেশে পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই, কেবল লৌকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে।
হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ বিধবাবিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তক

শাঙনগগনে ঘোর ঘনঘটা, নিশীথযামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখী কৈছে যাওব অবলা কামিনী রে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

অবসর

যেমন শ্রমের সম্ভ্রম আছে, তেমনি অবসরের সম্ভ্রম। মানুষের আসল দাম কী সে কাজ করে তাতে নয় কীভাবে অবসর যাপন করে তাতে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ বাড়ি

পুরুষমানুষের পক্ষে অবসরজীবন বড় বিড়ম্বনাময়। প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। জ্বলন্ত সলতেটি কোনও রকমে মিটমিট পিটপিট করে জ্বলছে, আলোর চেয়ে অন্ধকার জড়ো করছি যেন তার ভাগ্য—অনেকটা এইভাবে অবসর-নেওয়া মানুষদের কেটে যায়।

বিমল কর ঃ একটি বনচাঁপার গাছ ও আমার বন্ধু

অবসান

দিন যদি হল অবসান
নিখিলের অন্তরমন্দির প্রাঙ্গণে
ওই তব এল আহ্বান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান

সহজে আমি মানিব অবসান,

আজি রাতের যে-ফুলগুলি
জীবনে মম উঠিল দুলি
ঝরুক তারা কালি প্রাতের ফুলেরে দিতে প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মরণমাতা (বীথিকা)

অবিচার

খোদার রাজ্যে অবিচার হতে পারে না।

নিশিকান্ত বসু রায় ঃ বঙ্গে বর্গী

অবিবাহিত

'বোবার শত্রু নেই' যে পুরুষ বলেছিল সে নিশ্চয় ছিল অবিবাহিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংস্কার (গল্পগুচ্ছ)

অবিবাহিতা

অবিবাহিতা মেয়ে। দেহে যৌবনের সব চিহ্ন ফুটিয়াছে। সেসব ছাপাইয়া বহিয়াছে রূপের বান। বসন্তের এই উদাত্ত দিবসে মনে লাগিয়াছে বাসন্তী রঙ। প্রাণে জাগিয়াছে অজানা উন্মাদনা। পঞ্চদশী। বড়ই সাংঘাতিক বয়স এইটা। মনের চঞ্চলতা শরীরে ফুটিয়া বাহির হয়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ তিতাস একটি নদীর নাম

অবোধ

তরণী মোর নানা স্রোতের টানে
অবোধসম কাঁপিছে থরথরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নির্বাক (পরিশেষ)

অভয়

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!.....
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী—
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

অভয় দাও তো বলি আমার
wish কী—
এক ছটাক সোডার জলে
পাকী তিন পোয়া হুইস্কী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার সভা

ভয় হতে তব অভয়মাঝে নূতন জনম দাও হে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত

অভিজ্ঞতা

অভিজ্ঞতা না থাকলে ভাল কিছুই লেখা যায় না। অভিজ্ঞতা লাভের জন্য অনেক কিছুই করতে হয়। অতি ভদ্র শান্ত শিষ্ট জীবন হবে আর সমস্ত অভিজ্ঞতা লাভ হবে—তা হয় না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ চন্দননগরে আলাপ সভায়

জীবনে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু পাওয়া যায় তার নাম অভিজ্ঞতা। শুধু বই পড়ে একে পাওয়া যায় না, এবং না পাওয়া পর্যন্ত জানাও যায় না এর মূল্য কত। কিন্তু একথাও মনে রাখা উচিত যে অভিজ্ঞতা দূরদর্শিতা প্রভৃতি কেবল শক্তি দেয়ই না, শক্তি হরণও করে। তাই বয়স কম থাকতেই কতকগুলো কাজ সেরে নেওয়া উচিত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পত্রসংকলন

অভিধান

অভিধান প্রকৃতপক্ষে শব্দ ও ভাষা-ভাণ্ডারের চাবি এবং তাহার সুবিশাল সৌধ অসংখ্য সুরক্ষিত বদ্ধ-কক্ষ-সমন্বিতবৎ। এই চাবি বা কুঞ্চিকা কক্ষদ্বারগুলি অবলীলাক্রমে উন্মুক্ত করিয়া দিবার উপযোগী করিয়া নির্মাণ করিতে পারিলেই তাহার সার্থকতা। ইংরেজীতে এইরূপ চাবির নাম "master key"।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ঃ ভূমিকা—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান।

অভিধানের কাজ দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, শুধু শব্দের অভিধা বলা নয়, শব্দের স্বরূপ নির্ণয় করা এবং সেইজন্য ইহার ব্যুৎপত্তি, উচ্চারণ এবং বানান নির্ধারণ করিয়া দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, ঐতিহাসিক পদ্ধতি অর্থাৎ কালানুক্রমিকভাবে প্রয়োগের উদ্ধৃতি-সহযোগে শব্দের অর্থকে স্পষ্ট করা, ইহার বৈচিত্র্য, সূক্ষ্মতা ও ব্যাপকতা আবিষ্কার করা ; এক কথায় যতদূর সম্ভব ইহার সংজ্ঞা নির্দেশ করা।

ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত : মুখবন্ধ (জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙলা ভাষার অভিধান)

অভিধান—বর্ণানুক্রমিকভাবে সজ্জিত সরল শব্দের দুরূহ অর্থ সমন্বিত স্থূলকায় গ্রন্থবিশেষ।

প্রমথনাথ বিশী : কমলাকান্তের জল্পনা

অভিধান একাধারে ভাষার দর্পণ এবং ভাষার প্রমিতীকরণের [নির্ধারিত করা standardization] হাতিয়ার। এই দ্বৈতভূমিকা সার্থকভাবে পালন করতে হলে অভিধানকে অনড় ও স্থাণু হয়ে থাকলে চলবে না।......ভাষার পরিবর্তনগুলো ধীরে ধীরে প্রকট বা দৃশ্যমান হয়।

সুভাষ ভট্টাচার্য : সংসদ বাংলা অভিধান (৫ম সং)

অভিনয়

সকল অভিনয়ের মধ্যে সাত্ত্বিক অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ। নাট্যশাস্ত্রে বলা হয়েছে—'সত্ত্বে কার্যঃ প্রযত্নস্তু নাট্য সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিতম'—সত্ত্ব বিষয়ে চেষ্টা কর্তব্য, কারণ নাট্য সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত। সত্ত্ব আবার আট প্রকার—স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবণ্য, অশ্রু ও প্রলয় (মূর্ছা)—এই আটটি হল সাত্ত্বিক ভাব। সত্ত্ব অব্যক্ত (অব্যক্তরূপং সত্ত্বং)। কিন্তু এই অব্যক্ত ভাব আবার দেহাশ্রিত—'দেহাত্মকং ভবেৎ সত্ত্বং'। দেহাশ্রিত হয়ে সত্ত্ব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। রোমাঞ্চ, অশ্রু প্রভৃতি দেহগত বিশিষ্ট অভিব্যক্তির মধ্যে, অব্যক্ত সত্ত্ব ভাবের উদ্‌গম হয় তখন অভিনেতার রসসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা এবং দর্শকদের চিত্তে রসাস্বাদনের পরিপূর্ণতা। সুতরাং সাত্ত্বিক অভিনয়ও অনুভববেদ্য হলেও দৃশ্য।

অজিতকুমার ঘোষ : নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ

অভিনয়ের মধ্যে যে উত্তাপ তৈরী হয়, যে তীব্রতা তৈরী হয়, যে প্যাশন এবং ইনটেনসিটি তৈরী হয়, আবেগ এবং বুদ্ধির যে তীব্রতা, চৈতন্যের যে আগুন মঞ্চ থেকে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ে, সেইটা খুব মহৎ শিল্পী ছাড়া কোথাও পাওয়া যায় না।

অশোক মুখোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ অভিনয়

অভিনয় শুধু তো অভিনয়ই—জীবনদর্শন যেন। অভিনয়ের মধ্য দিয়ে শিল্পী ব্যক্ত করছেন জীবনের চরম ও পরম সত্য উপলব্ধিগুলিকে। অভিনেতার প্রকৃত অস্তিত্বকে ছাড়িয়ে গেছে অভিনীত চরিত্রের অস্তিত্বের সত্য। একদিকে যা মিথ্যা, অপরদিকে তাই সত্য। আপাত মিথ্যাকে সত্যের স্বর্ণোজ্জ্বল দীপ্তিতে ভাস্বর করে তোলাতেই শিল্পীর সৃষ্টিক্ষমতার সকল তাৎপর্য নিহিত। অভিনয়ের জগতের মিথ্যা আবরণটা কোনও বাধাই নয়।

অহীন্দ্র চৌধুরী : অভিনেতা-নাট্যকার-পরিচালক (দৃশ্যকাব্য ১৯৬৫)

নতুন সৃষ্টি মানে মনের মধ্যে নতুন প্রতিমা গড়া। যে চরিত্র অভিনয় করছি তার নূতন বাঁক, নূতন গলি, নূতন চৌরাস্তা আবিষ্কার। তার ফলে সুপরিনির্দিষ্ট চলাফেরা পালটাতে হয় না একেবারেই, পালটে যায় অভিনেতার অনুভূতি, মনোভব, দৃষ্টিভঙ্গি। তার ফলে অভিনয় হয় আরো তীক্ষ্ণ, আরো মিতব্যয়ী, আরো আবেগময়, আরো সংযত।

উৎপল দত্ত : স্তানিস্লাভস্কির পথ

ভালো অভিনয়ের জন্য অন্যান্য গুণের সঙ্গে ডায়ালেকটিকস-এর বোধ অপরিহার্য। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতারা অধিকাংশই না জেনেই ডায়ালেকটিকলি নিজের পার্ট করে গেছেন। চ্যাপলিন বলেন, হাসির মধ্যে আমি কান্না খুঁজে বেড়াই। স্তানিস্লাভস্কি দাবি করেন একই সঙ্গে সজাগ এবং বিহ্বল হতে হবে। উনিশ শতকের এডমন্ড কীন বলেন, কাব্যনাট্য একাধারে কাব্য ও কর্কশ গদ্য। ফরাসি অভিনেতা কোকলাঁ প্রবন্ধ লেখেন, অভিনেতা একই সঙ্গে দুজন মানুষ। এঁরা সবাই ডায়ালেকটিক্স প্রয়োগের নজির রাখছেন। আর আজকের ব্রেখট-শেপার্ডের যুগে ডায়ালেকটিক্স সজ্ঞানে প্রযুক্ত।

উৎপল দত্ত : থিয়েটারের ডায়ালেকটিকস

ডায়ালেকটিকস ব্যতীত কোনো সিরিয়াস পার্টকে বোঝাই সম্ভব নয়। ডায়ালেকটিকসকে বাদ দিয়ে কোনো জটিল চরিত্র অভিনয় করাই সম্ভব নয়। বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ যত চরিত্র—হ্যামলেট-ওথেলো থেকে শুরু করে ক্ষীরোদপ্রসাদের কর্ণ পর্যন্ত—ডায়ালেকটিকস প্রয়োগ না করে তাদের প্রাথমিক কার্যকলাপই বোঝা যাবে না। হ্যামলেট পাগল কিংবা পাগল নয় শেক্সপীয়ার এভাবে সমস্যাটা উত্থাপনই করেননি ; হ্যামলেট একই সঙ্গে উন্মাদ ও সুস্থমস্তিষ্ক, এটাই হচ্ছে নাটকের প্রতিপাদ্য। সে একই সঙ্গে মাকে ভালোবাসে ও ঘৃণা করে এটাই হচ্ছে কথা। সে ওফিলিয়াকে বুকে টেনে নিতে চায় আবার জীবন থেকে দূর করে দিতে চায়, এটাই হ্যামলেটের যন্ত্রণা। সে প্রেমের কথা বিশ্বাসও করে, অবিশ্বাসও করে, এটাই তার সংকট। প্রতি মুহূর্তে সে দ্বিধাবিভক্ত, অন্তর্দ্বন্দ্বে কম্পমান। ডায়ালেকটিকস-এর সাহায্য ছাড়া এ পার্ট করবে কে?

উৎপল দত্ত : থিয়েটারের ডায়ালেকটিকস

অভিনয় যাদের নেশা অন্য কিছু তাদের পেশা হতেই পারে না, এ কথা সব দেশের অভিনয়শিল্পীদের জীবন থেকেই দেখানো যেতে পারে, এমনকি, আমার নিজের জীবন থেকেও।.....নেশাটা ধরায় সৌখীন মঞ্চ, সাধারণ মঞ্চ জাগায় পেশা। একটী যেন শিক্ষাগার, অপরটী পরীক্ষার হল।

ছবি বিশ্বাস : নাট্য-শিল্প ও রাষ্ট্র (বহুরূপী-৮)

অভিনয়রীতির ক্ষেত্রে পাঁচটি মূল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হয়। এগুলি হল চরিত্র-বিন্যাস (composition), চিত্রায়ণ (picturization), গতি (movement) ছন্দ-স্পন্দন (rhythm), সংলাপহীন মঞ্চ-ক্রিয়া (pantomimic dramatization)। একে বলে পঞ্চাঙ্গ অভিনয়রীতি।

বাসন্তী চাকী : বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাট্যকার বিধায়ক

মঞ্চের সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে, অভিনয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকলে যেমন শ্রেষ্ঠ নাটক লেখা সম্ভব নয়, তেমনিই আবার সাহিত্যের পদ্ধতি কিছু জানা না থাকলে, নাট্যকারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতগুলো ধরতে না পারলে, শ্রেষ্ঠ অভিনয় সম্ভব নয়।

শম্ভু মিত্র : সন্মার্গ সপর্যা

অভিনয়—[অভি + √নী + অ (অচ্) - ভা]। ১. শ্রোতৃগণের অভিমুখে অভিনেয় বিষয়ের আনয়ন ; শরীরচেষ্টা-ভাষণাদি দ্বারা অভিনেয় বিষয়ের অনুকরণ ; অবস্থানুকরণ (সাহিত্য দর্পণ ৬.২)। "যার যখন হতেছে সঙ্গে রঙ্গভূমির অভিনয়, কাকস্য পরিবেদনা, আর তখন সে কারও নয়" (পাগলা ঝোরা—ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। ২. যাহা দ্বারা হৃদ্‌গত ভাব শ্রোতৃসমীপে নীত হয় ; হৃদগতভাবব্যঞ্জক শরীরচেষ্টাদি ; অর্থব্যঞ্জক চেষ্টাবিশেষ ; অর্থব্যঞ্জক ব্যাপার (মল্লিনাথ)।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ

অভিনেতা

অভিনেতাকে নিজের শরীর-কণ্ঠ, মন-মস্তিষ্ক ব্যবহার করেই সৃষ্টি করতে হয়—তার দক্ষতা-যোগ্যতা যতই অন্যের বক্তব্য [নাটককার] এবং অন্যের ব্যাখ্যা [নির্দেশক] দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে কাজে লাগুক—মঞ্চে তার সজীব উপস্থিতি একধরনের স্বতঃস্ফূর্ততা দাবি করে যা অনেক সময় সৃষ্টির পথ ধরে নতুন দিকও উদ্ভাসিত করতে পারে—তার নিজের কাছে এবং দর্শকের কাছেও। নাটককারের বক্তব্যকে সঠিক মাত্রায় সঠিক উপলব্ধিতে পৌঁছে দিতে যেমন নির্দেশক শুধুমাত্র তার অভিজ্ঞতা-জ্ঞান এর নির্ভর করে সুনির্দিষ্ট বাঁধা-ধরা পথে হেঁটেই নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না—কল্পনাশক্তির ওপর ভরসা করে নতুন মাত্রা নতুন অর্থব্যঞ্জনের সন্ধানে সদা-ব্যাপৃত থাকতে হয় তাকে —নাটককার এবং নির্দেশকের হাত ধরে অনেকটা পথ চলার পর অভিনেতাকেও একসময় একা ছেড়ে দিতে হয়—বিষয়-ভাবনা—ব্যাখ্যা—ছক এর মধ্যে থেকেও সে তখন নিজেই খেলতে থাকে—তার কল্পনাশক্তিকেও কাজে লাগায়।

অরুণ মুখোপাধ্যায় ঃ নির্দেশনা ঃ অভিনয় ঃ নাট্যকলা ঃ অভিনেতা ঃ নির্দেশক (স্যাস - ১৯৯৫)

অভিনয়ের মধ্যে দিয়ে অভিনেতা শুধু একটা চরিত্র সৃষ্টি করছেন না। শুধুমাত্র নাটকের এক টুকরো ভূমিকাকে আমাদের সামনে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে এবং সততার সঙ্গে হাজির করছেন না, বরঞ্চ তিনি জীবন-জগতের গভীর রহস্য বিষয়ে নিজের বোধ-বুদ্ধি-অনুভব চরিত্রের মাধ্যমে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করছেন।

অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ প্রসঙ্গ অভিনয়।

এক স্তরের অভিনেতা আছে যারা বুঝতে পারে যে মস্ত এক রহস্যময় জগতে বন্ধ দরজার সামনে তারা ঘোরাঘুরি করছে। পথ হাতড়ে মরছে। যে চাবিটায় খুলে যাবে দরজা, ঢোকা যাবে আলোছায়াময় আশ্চর্য সৃষ্টির মায়াকুঠুরিতে, সেই চাবিটা খুঁজে পায় কোটিকে গুটিক। বাকিদের কেবল খোঁজা।

অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ প্রসঙ্গ অভিনয়

মঞ্চে যদি অভিনেতা মহিমান্বিত হয়ে দেখা দিতে চান তবে ব্যক্তিগত জীবনেও তাঁকে মহিমান্বিত হতে হবে।

উৎপল দত্ত ঃ স্তানিস্লাভস্কির পথ

সুপ্ত দম্ভ অভিনেতাকে অভিনেতাই হতে দেয় না। দাম্ভিক মানুষ অভিনেতাই হতে পারে না। অভিনয়ের প্রাকশর্ত হচ্ছে নিজ সত্তা বিলোপ। নিজেকে ভুলে নাটকের চরিত্র হতে হবে। দাম্ভিক মানুষ নিজেকে ভুলতে পারে না।....দাম্ভিক মানুষের কাছে নাট্যকারের উদ্দেশ্য মূল্যহীন, গোটা নাটকটার বক্তব্য গুরুত্বহীন, তার কাছে নাটক হচ্ছে নিজেকে জাহির করার একটা বাহনমাত্র।

উৎপল দত্ত ঃ স্তানিস্লাভস্কির পথ

বেতার নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী হতে হলে তিনটি প্রাথমিক গুণ থাকা দরকার। স্বর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, সুস্পষ্ট উচ্চারণ ও যথাযথ উচ্চারণ।......এই তিন প্রাথমিক গুণের সঙ্গে দরকার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা।

জগন্নাথ বসু ঃ প্রসঙ্গ বেতার নাটক

শুধুমাত্র সুকণ্ঠ হলেই এই মাধ্যমে ভালো অভিনয় করা যায় না। শুধু সুললিত কণ্ঠ দিয়েই মস্তিষ্ক-সঞ্চালন-শূন্য যে অভিনয় তার কোনও মূল্য নেই বেতারে।

জগন্নাথ বসু ঃ প্রসঙ্গ বেতার নাটক

একজন সু-অভিনেতা......নিজের সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি, রসবোধের দ্বারা নাট্যচরিত্রের মধ্যে নূতন মাত্রা সংযোজন করতে পারেন। অভিনেতাকে মানব চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ হওয়া দরকার। মানুষের সমগ্র রূপকে তাঁর অভিনয়ের মাধ্যমে যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলতে হবে। মানুষের নানাদিক—দৈহিক, মানসিক ও আবেগমূলক দিকগুলি অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে।......তিনি দর্শকের কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে তাঁর অভিনয় হয়ে ওঠে সৃষ্টিধর্মী এবং অভিনেতা হয়ে দাঁড়ান সৃষ্টিকর্তা।

বাসন্তী চাকী ঃ বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাট্যকার বিধায়ক

কাল নিরবধি এবং পৃথ্বী বিপুলা—এ কথা বলতে পারেন লেখক, বলতে পারেন চিত্রকর। কিন্তু আমরা—অভিনেতারা তা পারি না। আমাদের জন্য নয় ভাবীকালের স্বীকৃতি।.......নিজের নিজের যুগের খণ্ডকালের মধ্যেই আমাদের অস্তিত্ব। সেই কালকে আমরা প্রকাশ করবার চেষ্টা করি আমাদের দেহ দিয়ে, মন দিয়ে, আবেগ দিয়ে। আমাদের সমগ্র সত্তা দিয়ে। সমকালীন জীবনের আগুন আহরণ করে সেই আগুনে আমরা নিজেদের দগ্ধ করি। কেউ কেউ হাউইয়ের মতো পারি আকাশের বিশালতায় উঠে যেতে। আর অনেকেই পারি না। সমস্ত আকাঙক্ষা নিয়েও মাটির ওপরেই জ্বলি। জ্বলি, আর একদিন ফুরিয়ে যাই।

শম্ভু মিত্র ঃ সন্মার্গ সপথা

অভিমান

ভালবাসা যেখানে যত গভীর, অভিমানটাও সেখানে তত বেশী উগ্র।

জরাসন্ধ ঃ মসীরেখা

অভিমানের সূক্ষ্মতা ও মাধুর্য ভালোবাসার অভ্রান্ত ব্যঞ্জনা ঃ 'নেহ নতুন ভেল মানে.....'।....অভিমান করার শক্তিই বাঙালী জাতির যুগপৎ প্রধান বৈশিষ্ট্য ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ।....আর জন্মে [কিন্তু আমি যে জন্মান্তরে বিশ্বাসী নই!] বাঙালী হয়ে অবতীর্ণ হওয়ার বড় ইচ্ছা করছে, অভিমানাস্বাদনার্থম্.....।

ফাদার দ্যতিয়েন ঃ ডায়েরির ছেঁড়াপাতা

আমার অভিমানের বদলে আজ নেব তোমার মালা।
আজ নিশিশেষে শেষ করে দিই চোখের জলের পালা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরূপরতন

রাগ না হোক অভিমান হতে পারে। রাগের চেয়ে অভিমান আরও বেশি জোরালো হয়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ নিরুদ্দেশের দেশে

অভিরুচি

স্মৃতির চেয়ে আসলটিতেই আমার অভিরুচি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তথাপি (ক্ষণিকা)

অভিলাষ

ইষ্ট কুটুম্ব আদি সঞ্জয় কেতুর জ্ঞাতি
অভিলাষে দিলেন যৌতুক।

মুকুন্দরাম ঃ চণ্ডীমঙ্গল

কালো অশ্ব অন্তরে যে সারারাত্রি ফেলেছে নিশ্বাস
সে আমার অন্ধ অভিলাষ।.....
খুরে খুরে খুঁড়েছে ধরণী
করেছে অধীর হ্রেষাধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালো ঘোড়া (বিচিত্রিতা)

অভিশাপ

ভোগসুখের এই ভয়ংকর অভিশাপ যে, সুখ অধিক দিন থাকে না, কিন্তু বন্ধন দুশ্ছেদ্য হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চোখের বালি—১০

অভিসার

মাধব তুয়া অভিসারক লাগি।
দুতর পন্থা গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি।

গোবিন্দদাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট॥
তহি অতি দূরতর বাদর দোল।
বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী পার॥

গোবিন্দদাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

অভিসারের পথের দুইটি প্রান্ত। এক প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণমাধব জ্বালিয়ে রেখেছেন প্রতীক্ষার প্রদীপ। অন্য প্রান্তে উদ্বেল মিলন-আকাঙ্ক্ষায় কম্পিত শ্রীমতী রাধার হৃদয়। মাঝে অসহ দুঃখের বিপত্তিসঙ্কুল পথ। এই বিপত্তি একদিকে যেমন প্রকৃতির, অন্যদিকে তেমনি পরিবার পরিজনের। এই বিপর্যয়কে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে হবে প্রেমাস্পদের কাছে, তবেই অভিসার দুঃখের বরষায় প্রাপ্তির ফুল ফোটাবে।

চিত্তরঞ্জন মাইতি ঃ বাংলা কাব্যপ্রবাহ

আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার।
পরাণসখা বন্ধু হে আমার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

নায়কের সঙ্গে মিলনের জন্য নায়িকা কিংবা নায়িকার সঙ্গে মিলনের জন্য নায়কের সংকেতস্থলে গমনকে অভিসার বলে।.....বৈষ্ণব পদাবলীর অভিসারের ব্যঞ্জনা আরো গভীর। এই অভিসার লৌকিক গণ্ডী অতিক্রম করে অলৌকিক ভগবৎ প্রেমের অপরূপ মাধুর্যকে প্রকাশ করে। প্রেমিক-প্রেমিকার গাঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায় এর দ্বারা। যে বস্তু দুঃখে লব্ধ, তা প্রাপ্তির আনন্দও অপরিসীম। অভিসারের পথও তাই দূর-দুর্গম।

সনাতন গোস্বামী ঃ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়

অভিসারিকা

স্বামীর সঙ্কেত স্থলে যে করে গমন।
তারে অভিসারিকা বলয়ে কবিগণ॥

ভারতচন্দ্র রায় ঃ রসমঞ্জরী

এসো গো অভিসারিকা, কাজের সংসারে কপাট পড়িয়াছে, হাটের পথে লোক নাই, চকিত বিদ্যুতের আলোকে আজ যাত্রায় বাহির হইবে—জাতীপুষ্পসুগন্ধিবনান্ত হইতে সজল বাতাসে আহ্বান আসিল—কোন্ ছায়াবিতানে বসিয়া আছে বহুযুগের চিরজাগ্রত প্রতীক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আষাঢ় (বিচিত্র প্রবন্ধ)

মেয়েরাই যথার্থ অভিসারিকা। যেমন করেই হোক, যত দুর্গমই হোক, বিচ্ছেদ পার হবার জন্য তাদের সমস্ত প্রাণ ছটফট করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার চলা
পদে পদে মিলছে একই তালে।
তাই নদী চলেছে যাত্রার ছন্দে,
সমুদ্র দুলেছে আহ্বানের সুরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিচ্ছেদ (পুনশ্চ)

অমর

যাহারা অমরত্বের অধিকারী তাহারা ক্ষুদ্র হইয়া থাকিবার জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই।

জগদীশচন্দ্র বসু ঃ গাছের লেখা (অব্যক্ত)

মরার পরে চাই নে ওরে
অমর হতে।
অমর হব আঁখির তব
সুধার স্রোতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ক্ষতিপূরণ (অমর)

সাধিলাম কি সুকৃতি, হব যার প্রসাদে অমর?

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ অকৃতজ্ঞ

অমা/অমাবস্যা

কণ্ঠ আমার রুদ্ধ আজিকে, বাঁশি সংগীতহারা।
অমাবস্যার কারা
লুপ্ত করেছে আমার ভুবন দুঃস্বপনের তলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রশ্ন (পরিশেষ)

গায়ের রং দেখে বোঝা যায় অমাবস্যার রাতে তার জন্ম।

সমীর কুমার গুপ্ত ঃ সেই জল সেই মাটি (চতুষ্কোণ বইমেলা সংখ্যা-১৪০৯)

ব্যাপ্ত মোর চতুর্দিকে অনন্ত অমার পটভূমি ;
সবই সেথা বিভীষিকা, এমন কি বিভীষিকা তুমি॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ নরক

কখন ওঠে, পাতাল ভেদ করে,
অসম্ভূত অমা ঃ
বায়ুর বেগ সহসা যায় মরে;
দ্রাঘিমা দেয় ক্ষমা।

তাহলে কেন বিরহী শুক নিরুদ্দেশে ঘোরে,
মজায় কাকে অনাত্মীয় অমা?

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ নষ্টনীড়

অমৃত

স্ট্রেচারের পরে শুয়ে কুয়াশা ফিরিছে বুঝি তোমার দুচোখ ;
ভয় নেই, মৃত্যু নয়, কোনো এক অপদার্থ অন্যায় আলোক ;
তাহলে কি এত লোক মরে যেত মশালের লালসায়—মাছির মতন?
অমৃতের সিঁড়ি বলে মানুষেরা গড়িত কি এত শাদা শ্লোক।

জীবনানন্দ দাশ ঃ জীবন সঙ্গীত (আলো পৃথিবী)

যে অমৃত মৃৎপাত্রকে অক্ষয় এবং শুচি করতে না পারে, সে আবার অমৃত কিসের?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বিচিত্র

অমৃত? সে ব্যাধিতের বিকার-জল্পনা!

মোহিতলাল মজুমদার ঃ মৃত্যু ও নচিকেতা

লক্ষ্মীর অমৃতভাণ্ডার ফুরোবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে বাইরে—নিখিলেশের আত্মকথা

অমৃত জিনিষটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে। এইজন্য যাহারা সেটাকে খোঁজে তাহারা সেটাকে পায়ই না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি—বাহির যাত্রা

যখন আসক্তির বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেছে তখন জল স্থল আকাশ, জড় জন্তু মনুষ্য, সমস্তই অমৃতে পরিপূর্ণ—তখন আনন্দের অবধি নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৈরাগ্য (শান্তিনিকেতন)

ভগবান....মাটির হাঁড়িতে অমৃত রাখিয়াছেন, অমৃত বলিয়া কাহারো বিশ্বাস হয় না। আঘাত লাগিয়া হাঁড়ি ভাঙিলে তবে অনেক সময় সুধার আস্বাদ পাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজর্ষি—৪৪

আমরা জানি অমৃত কী। পৃথিবীতে একেবারে যে তার স্বাদ পাইনি তা নয়। যদি না পেতুম তাহলে তার জন্য আমাদের কান্না উঠত না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—প্রার্থনা

মরণ-দুঃখে অমর জাগে, অমৃতেরি তত্ত্ব তাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বপ্ন (পূরবী)

অরণ্য/অরণ্যানী

মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূর-দেশে যেখানে পতিত পক্ব জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী-তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আরণ্যক (সূচনা)

পেয়ালার মত উপুড়-করা নীল আকাশের তলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য,.....ঘন ঘুমের ফাঁকে যেখানে কেবল দূর অন্ধকার বনে শেয়ালের দলের প্রহর-ঘোষণা শোনা যায়, নয় তো ধাবমান নীল-গাইয়ের দলের সম্মিলিত পদধ্বনি, নয়তো বন্য মহিষের গম্ভীর আওয়াজ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আরণ্যক

........বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধনহীন উদ্দাম সৌন্দর্যময়ী অরণ্যভূমি দেশের একটা বড় সম্পদ।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আরণ্যক

চারদিকে লোকারণ্য, তবু কেন নিঃসঙ্গ লাগে
এত কথা এত শব্দ সব ঢেকে নৈঃশব্দ্য জাগে।......
মন বলে ফিরে দাও সে অরণ্য, সে মহাশ্মশান
তারা ঢের ভালো ছিল। অসহ্য এ জনতা উদ্দাম।

মনীশ ঘটক ঃ দাও ফিরে সে অরণ্য

নির্জন অরণ্যের সুগভীর কেন্দ্রস্থলে একটা সুনিবিড় সম্মোহন আছে যেখানে চলছে তার বুড়ো বুড়ো গাছপালার কানে কানে চক্রান্ত, যেখানে ভিতরে ভিতরে উচ্ছ্বসিত

হচ্ছে সৃষ্টির আদিম প্রাণের মন্ত্রগুঞ্জরণ। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তার সুর উদাত্ত পর্দায়, রাতে দুপুরে তার মন্দ্রগম্ভীর ধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবনচেতনায়, বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছোটোগল্প শেষকথা (পাঠান্তর)

ঝিল্লীঝংকৃত রাত। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ দিগন্তে। অস্পষ্ট আলোয় অরণ্য কথা কয় যেন স্বপ্নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শাপমোচন

দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর,
লও যত লৌহ লৌষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সভ্যতার প্রতি (চৈতালি)

উদ্যানের চেয়ে অরণ্য আমাকে বেশি টানে। শোভার চেয়ে রহস্যময়তা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ রাশিয়া ভ্রমণ।

অরূপ ঃ

আমার অরূপের ঘর
রূপের ঘরে তাই মন নেই।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী ঃ পদ্য কথামৃত—৩৩

অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
যে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়মাঝে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

অরূপ, তোমার বাণী
অঙ্গে আমার চিত্তে আমার মুক্তি দিক সে আনি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি,
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলিপি

অর্থ

অর্থ কি সামান্য বস্তু? অর্থে পুত্রশোক নিবারিত হয়, পতিপ্রেম ভুলিয়া যায়, ভায়ের বুকে ভাই, পিতার বুকে পুত্র, বন্ধুর বুকে বন্ধু তীক্ষ্ণ ছুরিকা বসাইয়া জন্মের মতো বিদায় দেয়। পরমার্থের পরই এই অর্থ। এই অর্থই মানুষকে পরমার্থ ভুলাইয়া দেয়। অর্থের শক্তি কি কম?

অন্নদা ঠাকুর ঃ স্বপ্ন জীবন

জীবন-পথিক। অর্থ নেই, তবু নিঃস্বও নই।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ হিমালয়ের পথে পথে

এ কথা কে না জানে যে পরের টাকা ঘরে আনার নাম অর্থোপার্জন এবং এ কাজটা বড় স্কেলে করিতে পারার নাম বড়লোক হওয়া।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কুষ্ঠরোগীর বৌ

যে শুভ প্রভাতে সকলের সাথে
মিলিবি, পুরাবি কামনা,
আপন অর্থে সেদিন বুঝিবি—
জনম ব্যর্থ যাবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৯

নেমে এসে দূরে দাঁড়াবি যখন—
দেখিবি কেবল, নাহি খুঁজিবি,
এই হাসি-রোদনের মহানাটকের
অর্থ তখন কিছু বুঝিবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৩৭

দূরে যখন বাঁশি বাজিতেছে, পুষ্পকানন যখন চোখের সম্মুখে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন প্রেমের কথার অর্থ কত সহজে বোঝা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গদ্য ও পদ্য (পঞ্চভূত)

অর্থ? হায়রে অর্থ! হায়রে পাতকী অর্থ! তুই জগতের অনর্থের মূল।

মীর মশাররফ হোসেন ঃ বিষাদসিন্ধু

অর্থ জিনিষটাকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করা চলে তখনই যখন তাতে দিনপাত হয় মাত্র। যখন তার চূড়াকে সমুচ্চ করে তোলা যায় তখনই জনসাধারণ তাকে শ্রদ্ধা করে। উপকার পায় বলে নয়। তার বড়োত্ব দেখাটাতেই চিত্তস্ফূর্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুই বোন

সবাই কখনো রাজা হয় না। যাদের হাতে শক্তি তারাই রাজা। আর কলিকালে অর্থ ছাড়া শক্তি নেই। ....আগে দুটো শক্তি ছিল মানুষের মধ্যে এখন একটা হয়ে গেল। কেন? না একটাতে ছিল সাধারণ মানুষের শক্তি, সেটা টাকার শক্তির কাছে হেরে গেল। বিশ্বে এখন একমাত্র সত্য অর্থশক্তি।

সমীর রক্ষিত ঃ প্রাণময়ী (বন্যার পরে বাড়ি ফেরা অন্যান্য গল্প)

অর্থ আমার পাথেয়
অর্থ আমার পথ নয়
লক্ষ্য সাধন করার উপায়
অর্থ আমার লক্ষ্য নয়।

সলিল চৌধুরী ঃ লক্ষ্য

বাঙালী বিত্তবানের মধ্যে যেমন একটা নীচ অহমিকা দেখা দিয়েছে, তেমনই বাঙালি মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ভদ্রলোকের মধ্যেও অর্থবানের প্রতি একটা নিষ্ক্রিয় অথচ তীব্র মনুষ্যত্বখর্বকারী কাপুরুষোচিত বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে।......দুইটাই সমান হেয়।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ ধর্মত্যাগী বাঙালি

অর্থমন্ত্রী

আমার অর্থমন্ত্রী হওয়ার ইচ্ছে ছিল। কারণ অর্থমন্ত্রী হতে হলে যত কম লেখাপড়া জানা যায় তত ভাল। সেদিক থেকে আমি যোগ্য ছিলাম। কিন্তু আমার থেকেও কম লেখাপড়া জানা একজনকে পাওয়া গেল। তাকেই অর্থমন্ত্রী করা হল।

রমানাথ রায় ঃ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী

অর্থ শব্দটি সাধারণত টাকা, সম্পদ ইত্যাদি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। 'শাস্ত্র' শব্দের অর্থ বিদ্যা বা বিজ্ঞান। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে 'অর্থশাস্ত্র' বলতে বোঝায় সম্পদের শাস্ত্র বা বিদ্যা অর্থাৎ অর্থনীতি। কিন্তু কৌটিল্য, 'অর্থশাস্ত্র'কে রাষ্ট্রনীতির সমার্থক বলে বর্ণনা করেছেন। 'অর্থশাস্ত্রে'র সর্বশেষ অধ্যায়ে কৌটিল্য স্বয়ং অর্থশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন,

মনুষ্যাণাং বৃত্তিরর্থঃ, মনুষ্যবতী ভূমিরিত্যর্থঃ।
তস্যাঃ পৃথিব্যা লাভপালনোপায়ঃ
শাস্ত্রমর্থশাস্ত্রমিতি ॥[২৮]

অর্থাৎ,
অর্থ মনুষ্যদিগের জীবিকানির্বাহের প্রধান উপায়। অর্থাৎ ইহা মনুষ্যধারণকারী ভূমি বা পৃথিবী। এই পৃথিবী বা ভূমিকে লাভ করা এবং পালন করা শেখায় যে শাস্ত্র, তাই অর্থশাস্ত্র।

ভারতী মুখোপাধ্যায় : প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা

কৌটিল্যের বিবেচনায় যে শাস্ত্র দ্বারা রাজ্যজয়, রাজ্যরক্ষা এবং রাজ্যশাসন সম্পর্কে শিক্ষালাভ করা যায়, তাই অর্থশাস্ত্র। এখানে মনে রাখতে হবে যে, বিনিময়ের মাধ্যমকেই সাধারণভাবে অর্থ বলে। সে যুগে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ভূমি ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। কারণ কৃষিই ছিল সে-যুগের প্রধান অর্থনীতি। যে রাজা যত বেশি পরিমাণ ভূমির অধিকারী, সেই রাজা তত শক্তিশালী। সুতরাং এই ভূমি বা রাজ্যজয়, রাজ্যশাসন ও রাজ্যরক্ষা সম্পর্কিত শাস্ত্রকে 'অর্থশাস্ত্র' হিসাবে অভিহিত করা সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। কামন্দকীয় নীতিসারের প্রারম্ভিক অধ্যায়েই বলা হয়েছে, রাজাকে রাজ্যঅধিকার ও রাজরক্ষার উপায় সম্পর্কিত পদ্ধতি বিষয়ে নির্দেশদানই অর্থশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুক্রাচার্য তাঁর নীতিসারে বলেছেন, অর্থশাস্ত্র রাজ্যশাসন ও সম্পদ আহরণ উভয় সম্পর্কেই রাজাকে নির্দেশদান করে। কৌটিল্য স্বয়ং তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে এটিকে 'দণ্ডনীতি' নামে অভিহিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন এবং নাম দেন 'অর্থশাস্ত্র'। কৌটিল্যের এই অমরকীর্তি দণ্ডীর (Dandin) নিকট 'দণ্ডনীতি' নামেই পরিচিত ছিল। 'অমরকোষ' এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার ভাষ্য 'মিতাক্ষরা'তে 'দণ্ডনীতি' এবং 'অর্থশাস্ত্র' অভিন্ন বলে বর্ণিত হয়েছে।

ভারতী মুখোপাধ্যায় : প্রাচীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা

অলংকার

কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, ওর শরীর হচ্ছে বাক্য—অর্থযুক্ত পদসমুচ্চয়।.....বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজসজ্জার নাম অলংকার.....কাব্য যে মানুষের উপাদেয় তা এই অলংকারের জন্য।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত : কাব্যজিজ্ঞাসা

সকল অলংকারের শ্রেষ্ঠ অলংকার সরলতা। যিনি সোজা কথায় আপনার মনের ভাব সহজে পাঠককে বুঝাইতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক।

বঙ্কিমচন্দ্র : বাংলার লেখকদিগের প্রতি নিবেদন (বিবিধ প্রবন্ধ)

যেমন রমণীর তেমনি পদ্যেরও অলংকারের প্রতি টান বেশি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কাদম্বরী চিত্র (প্রাচীন সাহিত্য)

চন্দ্র সূর্য পায়ের কাছে
মালা হয়ে জড়িয়ে আছে,
তোমার বুকে শোভা পাবে আমার
দুখের অলংকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১০

অলংকার যে মাঝে পড়ে
মিলনেতে আড়াল করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১২৫

অলংকারমাত্রই যে অত্যুক্তি, সে তো বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো।.....পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠতা। আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে—মেয়েদেরই বিস্তর অলংকার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে বাইরে—বিমলার আত্মকথা

অলঙ্কার বাইরের থেকে এসে সাহিত্যের রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে না ; মানুষের স্বভাবেই তার জন্ম।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী : অলঙ্কারচন্দ্রিকা

অলক

অলকে কুসুম না দিয়ো, শুধু শিথিল কবরী বাঁধিয়ো।
কাজলবিহীন সজল নয়নে হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরকুমার সভা

দু-চারটে দুরন্ত অলক কপালের উপর ঝুঁকে পড়ে তার চোখের কালো তারা দেখবে বলে উঁকি মারছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভুল স্বর্গ (লিপিকা)

অলক্ষ্মী

অলক্ষ্মীর নিদ্রা বেশি, কাঙালের ক্ষুধা বেশি।

বাংলা প্রবাদ

যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাই যদি অলক্ষ্মীরে পাবই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তাসের দেশ

হে অলক্ষ্মী, রুক্ষকেশী।
তুমি দেবী অচঞ্চলা।
তোমার রীতি সরল অতি।
নাহি জান ছলাকলা।
জ্বালাও পেটে অগ্নিকণা
নাইকো তাহে প্রতারণা,
টানো যখন মরণ-ফাঁসি
বল নাকো মিষ্টভাষ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে
করব মোরা পরিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হতভাগ্যের গান

অলি

অলি বার বার ফিরে যায়, অলি বার বার ফিরে আসে—
তবে তো ফুল বিকাশে॥
কলি ফুটিতে চাহে, ফোটে না, মরে লাজে, মরে ত্রাসে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা

অল্প

না শুনিল মম বাক্য অল্প জ্ঞান করি।

কাশীরাম দাস : মহাভারত

অল্প লইয়া থাকি, তাই মোর যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে প্রাণ করে 'হায় হায়'॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য ১৭

শক্তি মোর অতি অল্প, হে দীনবৎসল,
আশা মোর অল্প নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য ৯৭

অলৌকিক

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার
তার নিত্য জাগরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভাষা ও ছন্দ

নিজের ভিতরেই আছে এক অলৌকিক, কখনো কখনো তাকে টের পাওয়া যায়। স্পষ্ট নয়—কেননা একমাত্র ধর্মের পথেই সেই অলৌকিক স্পষ্ট ও ঈশ্বরের সমতুল হয়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ ক্রীড়াভূমি

অশ্বত্থ

অশ্বত্থ বটের পথে অনেক হয়েছি আমি তোমাদের সাথী।

জীবনানন্দ দাশ ঃ অশ্বত্থ বটের পথে (রূপসী বাংলা)

অশ্বত্থবৃক্ষ বড় রসিক, এই নীরস পাষাণ হইতেও রসগ্রহণ করিতেছে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পালামৌ

অশ্রু

অশ্রুজল প্রেমের নীরব গীত।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ঃ অশ্রু-জল

অশ্রু-আঁখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ মেঘনাদবধ কাব্য

কারো অশ্রু উছলে পড়ে যায়
কারো অশ্রু শুকায় মনে মনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কবির বয়স (ক্ষণিকা)

অশ্রুনদীর সুদূর পারে ঘাট দেখা যায় তোমার দ্বারে ॥
নিজের হাতে নিজে বাঁধা ঘরে আধা বাইরে আধা—
এবার ভাসাই সন্ধ্যাহাওয়ায় আপনারে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতপঞ্চাশিকা

অশ্রুভরা বেদনা দিকে দিকে জাগে।
আজি শ্যামল মেঘের মাঝে বাজে কার কামনা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অশ্রু (মহুয়া)

অসৎ

একা রামচন্দ্র আর তাঁহার ভকত।
আর যত দেখ হয় সকলি অসৎ ॥

ভক্তমালগ্রন্থ

অসৎ লোককে খাওয়াতে নেই। এমন লোক, যারা ব্যভিচারাদি মহাপাতক করেছে—যারা বিষয়াসক্ত লোক এরা যেখানে বসে খায় সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

অসৎলোকের, বাঘ ভাল্লুকের স্বভাব ; তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

অসম্ভব

ঘরের দেওয়ালে সাদা পাথরের অসম্ভব পক্ষী সকল, অসম্ভব রকমে অসম্ভব লতার উপর বসিয়া, অসম্ভব জাতির ফুলের উপর পুচ্ছ রাখিয়া, অসম্ভব জাতীয় ফল ভক্ষণ করিতেছে। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ** রাজসিংহ ১/১

পূর্ণ হয়েছে বিচ্ছেদ, যবে ভাবিনু মনে,
একা একা কোথা চলিতেছিলাম নিষ্কারণে।
শ্রাবণের মেঘ কালো হয়ে নামে বনের শিরে।
খর বিদ্যুৎ রাতের বক্ষ দিতেছে চিরে,
দূর হতে শুনি বারুণী নদীর তরল রব
মন শুধু বলে, অসম্ভব এ অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অসম্ভব (সানাই)

যা না চাইবার তাই আজি চাই গো,
যা না পাইবার তাই কোথা পাই গো।
পাব না, পাব না,
মরি অসম্ভবের পায়ে মাথা কুটে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** গান (গীতবিতান)

—অসম্ভবের একটা নমুনা দাও

—আচ্ছা বলি শোনো—স্মৃতিরত্ন মশাই মোহনবাগানের গোল-কীপারি করে ক্যালকাটার কাছ থেকে একে একে পাঁচ গোল খেলেন। খেয়ে ক্ষিদে গেল না, উল্টো হল, পেট চোঁ চোঁ করতে লাগল। সামনে পেলেন অকটর্লনি মনুমেন্ট। নিচে থেকে চাটতে চাটতে চূড়ো পর্যন্ত দিলেন চেটে। বদরুদ্দিন মিঞা সেনেট-হলে বসে জুতো সেলাই করছিল, সে হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল। বললে, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হয়ে এত বড়ো জিনিষটা এঁটো করে দিলেন! **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** সে—৫

অসম্মান

অসম্মানশেল
চিরজীবী মৃত্যু-সম মানীর হৃদয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ও রানী ৪/৩

অসহ্য

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হল।

জীবনানন্দ দাশ ঃ আট বছর আগের একদিন

বেঁচে যখন ছিলুম তখন বেঁচে থাকবার শখ ছিল ষোলো আনা ; যেমন মরেছি অমনি আর যে কোনো মতেই কোনো কালেই মরতে পারব না, এই দুঃখ অসহ্য হয়ে উঠল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—৮

অসহায়

অসহায় জাতি ডুবিছে মরিয়া জানে না সন্তরণ।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

বিচ্ছিন্নতা নিঃসঙ্গতা জীবনের ভঙ্গুরতার মধ্যে অসহায়ত্বের বোধ একালের মানুষের জীবনে এসেছে অভিশাপের রূপ নিয়ে। এই যন্ত্রণার স্রষ্টা একালের মানুষ স্বয়ং।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ঈশ্বরহীন পৃথিবী 'তবুও মানুষ বাঁচে' (সাহিত্যের মানচিত্র)

অসামান্য

যা অসামান্য তাই মানুষের চোখকে টানে, তা সে সুরূপই হোক আর কুরূপই হোক।

প্রমথ চৌধুরী : ছোটো গল্প

অসীম

ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।
অসীম যে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ।
সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ—১৭

অসীম ধন তো আছে তোমার, তাহে সাধ না মেটে।
নিতে চাও তা আমার হাতে কণায় কণায় বেঁটে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতলেখা ২)

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যত দূরে আমি ধাই—
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (ব্রহ্মসঙ্গীত ১)

সীমার মাঝে, অসীম তুমি
বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ
তাই এত মধুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১২০

অসীমের দান
ক্ষণিকের করপুটে, তার পরিমাণ
সময়ের মাপে নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধাবমান (পরিশেষ)

সীমা আছে এ-কথা যেমন নিশ্চিত, অসীম আছেন এ কথা তেমনি সত্য।.....উভয়কে যখন বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তখনি আমরা মায়ার ফাঁদে পড়ি। তখনি আমরা এমন একটা ভুল করিয়া বসি যে,......আপনার সীমাকে লঙ্ঘন করিলেই বুঝি আমরা অসীমকে পাইব—যেন আত্মহত্যা করিলেই অমর জীবন পাওয়া যায়।.....ঘটের মধ্যে ছিদ্র থাকাতে যদি জল বাহির হইয়া যায়,.......দুধ ঢালিলেও সেই দশা হইবে এবং মধু ঢালিলেও তথৈবচ।...

.....অসীম যিনি তিনি সীমার মধ্যেই সত্য, সীমার মধ্যেই সুন্দর।.......জগৎসৃষ্টির ইতিহাসে রূপের বিকাশ কেবলই সুব্যক্ত হইয়া উঠিতেছে.....কুঁড়ি হইতে ফুল, ফুল হইতে ফল, কেবলই রূপ হইতে ব্যক্ততর রূপ।.....সীমার দ্বারা অসীমকে পাওয়াই সৌন্দর্য, অর্থাৎ আনন্দ। সীমা হইতে ভ্রষ্ট হওয়াই কদর্যতা,......তাহাই বিনাশ।......ব্যক্তি ব্যক্তি-হওয়ার দ্বারাই মানুষের মধ্যে গণ্য হয়, জাতি জাতীয়ত্ব-লাভের দ্বারাই সর্বজাতির মধ্যে স্থান পাইতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সীমার সার্থকতা (পথের সঞ্চয়)

ধর্মের সাহায্যে মানুষ আপনার সীমা খুঁজিতেছে......সেই ধর্মের সাহায্যেই......অসীমকে খুঁজিতেছে।.....এই দ্বন্দ্ব যেখানেই সম্পূর্ণরূপে একত্র হইয়া মিলিয়াছে সেইখানেই পূর্ণতা। যেখানে.......বিচ্ছেদ ঘটিয়া একটা দিকই প্রবল হইয়া ওঠে, সেখানেই যত অমঙ্গল। অসীম যেখানে সীমাকে ব্যক্ত করে না সেখানে তাহা শূন্য, সীমা যেখানে অসীমকে নির্দেশ করে না সেখানে তাহা নিরর্থক। মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার

করে সেখানে তাহা উন্মত্ততা, বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন।.....সীমা ও অসীমতাকে যদি.....বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখি তবে......ধর্মসাধনা একেবারেই নিরর্থক হইয়া পড়ে। অসীম যদি সীমার বাহিরে থাকেন তবে জগতে এমন কোনো সেতু নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যাইতে পারে। তবে তিনি আমাদের পক্ষে চিরকালের মতোই মিথ্যা.....

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সীমার সার্থকতা (পথের সঞ্চয়)

অসুখ

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।

জীবনানন্দ দাশ ঃ সুচেতনা (বনলতা সেন)

‘পৃথিবীর গভীর, গভীরতর অসুখ এখন’। এ যেন পচন রোগ, হঠাৎ হঠাৎ মেদিনী ভেদ করে বেরিয়ে আসছে গভীর ক্ষত। কখনও তা সন্ত্রাসবাদীদের নিদারুণ নিষ্ঠুরতা, কখনও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কখনও সাম্রাজ্যবাদী হামলা। চতুর্দিকে হিংসা। যেন একটা আগুনের বলয়ের মধ্যে জড়সড় হয়ে বসে আছে মানবসভ্যতা। যে-কোনও মুহূর্তেই সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। অন্য গ্রহ থেকে নেমে আসেনি হিংস্র আক্রমণকারীরা। সমুদ্র থেকে উঠে আসেনি অসুরবাহিনী। মনুষ্যজাতির এখন কোনও প্রতিপক্ষ নেই, তাই মানুষ নিজেই নিজেকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে।

সম্পাদকীয়—উৎসবের মরসুম ঃ শারদীয়া দেশ ১৪০৯

অসুর

অসুর বাড়ীর ফেরত এ মা শ্বশুর বাড়ীর ফেরত এ নয়।
দশভুজার করিস পূজা ভুল রূপে সব জগতময়॥ .....
অসুর দানব করল শাসন এইরূপে মা বারে বারে
রাবণ বধের বর দিলি মা এইরূপে মা রাম-অবতারে॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভক্তি-গীতি

অসুরের খল-কোলাহলে এস সুরের বৈতালিক!
বেতালের যতি-ভঙ্গে তোমার নৃত্য ছন্দ দিক॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান—রাগ-প্রধান

অসুরের কাছে মাথা নীচু করলে অসুরের জয় হয় না......হয় দেবতার পরাজয়।

বিধায়ক ভট্টাচার্য ঃ তোমার পতাকা ১/১

কৃষ্ণে প্রীতি যে না করে সে জন অসুর।

ভক্তমালগ্রন্থ

অসুর সেই পরিমাণেই জোরের ভান করে যে পরিমাণে পুরুষ হয় কাপুরুষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে ১২

ঋগ্বেদে অসুর শব্দের অর্থ নেতা, প্রধান দেবতা ইত্যাদি।.....ঋগ্বেদের সময় অসুর মহান অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আজ ‘দেবতা’ বলতে যা বুঝি সে সময় অসুর শব্দ তাই প্রকাশ করত।......বাঙালিদের সঙ্গে অসুরদের শুধু গভীর পরিচয় নয় রক্তের সম্পর্কও ছিল।

সুহৃদকুমার ভৌমিক ঃ রণড় মালা

অস্ত

অস্ত গেল রবি হায়।
অস্ত গেল যবনের গৌরব-ভাস্কর।

নবীনচন্দ্র সেন ঃ পলাশীর যুদ্ধ

যে-অস্তগমন নব অভ্যুদয়ের আশ্বাস না রেখেই যায় সে তো প্রলয় সন্ধ্যা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্রাবণ গাথা

অস্তিত্ব

? ....অস্তিত্ব
ঃ মূর্ছনার নামান্তর
কেননা আমরা
!! সংজ্ঞাহীন

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ খৃস্টাব্দ ২০০১ অথবা বঙ্গাব্দ ১৪০৮

নিজের অস্তিত্বের পরিচয় তো নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না,—বাইরে আর-কোথাও যে তার খোঁজ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে বাইরে। নিখিলেশের আত্মকথা

অস্ত্র

ইস্পাতের মৃত্যু নেই, অস্ত্রের মৃত্যু নেই। এ অস্ত্রকে শক্ত মুঠোয় ধরতে পারলেই হয়।

উৎপল দত্ত ঃ সন্ন্যাসীর তরবারি

অস্ত্রহীনভাবে ক্ষমতা দখলের কথা চিন্তা করা স্বপ্নবিলাসিতা ছাড়া আর কিছু নয়।

চারু মজুমদার ঃ দ্বিতীয় দলিল [রচনা সংগ্রহ]

অস্ত্রে দীক্ষা দেহো
রণগুরু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—আঘাত সংঘাত মাঝে

তরুণ হাসির আড়ালে কোন আগুন ঢাকা রয়—
একি গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখো কোন্ তূণে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী—এত দিন যে

পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লোকহিত (কালান্তর)

অহং

মানুষের প্রবল অহংবোধই মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে অপরের কাছ থেকে, সমাজের বন্ধন থেকে।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ সাহিত্যের মানচিত্র ঃ দ্বীপ থেকে মহাদেশ

বিশ্বব্যাপী আকাশে ও খণ্ডাকাশে যে-ভেদ, অহং এবং আত্মার মধ্যেও সেই ভেদ মানবত্ব বলতে যে-বিরাট পুরুষ, তিনি আমার খণ্ডাকাশের মধ্যেও আছেন। আমারই মধ্যে দুটো দিক আছে—এক আমাতেই বদ্ধ, আর এক সর্বত্র ব্যাপ্ত। এই দুই-ই যুক্ত এবং এই উভয়কে মিলিয়েই আমার সম্পূর্ণ সত্তা।......যখন.....অহংকে একান্তভাবে আঁকড়ে ধরি তখন.......মানবধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ি। সেই মহামানব, সেই বিরাট পুরুষ যিনি আমার মধ্যে রয়েছেন তাঁর সঙ্গে তখন ঘটে বিচ্ছেদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানবধর্ম, পরিশিষ্ট—মানবসত্য—২

ঈশ্বর আমাদের মতো.......শক্তিহীনের কাছে এক জায়গায় হার মানেন,.....হাসিমুখে বলতে দেন যে আমাদেরই জিত, বলতে দেন যে আমার শক্তিতেই হল, বলতে দেন যে আমারই টাকাকড়ি ধনজন আমারই সসাগরা বসুন্ধরা। তা যদি না দেন তবে তিনি যে-খেলা খেলেন সেই আনন্দের খেলায়, সেই সৃষ্টির খেলায়, আমার আত্মা একেবারেই যোগ দিতে পারে না।

......যদি বলি নদীতে গিয়ে জল খাওগে তা হলে জল দান করা হল না......আমার পাত্র থেকে সেই নদীরই জল এক গণ্ডূষ দিলেও সেটা জল দান......। বনের ফুল তো দেবতার সম্মুখেই ফুটেছে। কিন্তু তাকে আমার ডালিতে সাজিয়ে একবার আমার করে নিলে তবে তার দ্বারা দেবতার পূজা হয়।.......অহং আমাদের সেই ঘট, সেই ডালি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—অহং

প্রত্যেক মানুষ জীবনের কর্মের দ্বারা সংসারকে কিছু-না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে,.....কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না—কিন্তু মানুষ যখন সেই সঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটা ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—তরী বোঝাই

আত্মার প্রকাশরূপ যে অহং তার সঙ্গে আত্মার একটা বৈপরীত্য আছে। আত্মা....না জন্মায়, না মরে; অহং জন্মমরণের মধ্য দিয়ে চলেছে। আত্মা দান করে, অহং সংগ্রহ করে, আত্মা অন্তরের মধ্যে সঞ্চরণ করতে চায়, অহং বিষয়ের মধ্যে আসক্ত হতে থাকে। এই বৈপরীত্যের বিরোধের মধ্যে যদি একটি সামঞ্জস্য স্থাপিত না হয় তবে অহং আত্মাকে প্রকাশ না করে তাকে আচ্ছন্নই করবে।......জীবনের সাধনা এই যে, অহং-এর দ্বারা আমরা আত্মাকে প্রকাশ করব। যখন তা না করে ধনকে মানকে বিদ্যাকেই প্রকাশ করতে চাই তখন অহং নিজেকেই প্রকাশ করে, আত্মাকে প্রকাশ করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—আত্মার প্রকাশ

অহংকার

অহংকার ব্যক্তিত্বেরই লক্ষণ।...... দায়িত্ব-বোধের উপলব্ধিটাই অহংকার। এটা আত্ম-বিশ্বাস, আত্ম-মর্যাদাবোধ, আত্মসম্মান-জ্ঞানেরই নামান্তর বা রূপান্তর মাত্র।

আবুল মনসুর আহমদ ঃ আত্মকথা

আমার অহংকারের মূল কেটে দে
কাঠুরিয়ার মেয়ে।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (ভক্তি-গীতি)

নির্বোধ মানুষের অহংকারের আর অন্ত নাই, সে যাহার সৃষ্টি, তাহাকেই সে বন্দী করতে চায়, শাস্তি দিতে চায়! কিন্তু অহংকার একদিন চোখের জলে ডুববেই ডুববে।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ রাজবন্দীর জবানবন্দী

ধনে অহংকার নয় অহংকার মনে।

বাংলা প্রবাদ

অহংকার মানে আত্মপ্রচার।

বিমল মিত্র ঃ আমি

স্পর্ধা থাকা ভালো
কিন্তু মিথ্যার স্পর্ধা নয়
অহঙ্কার থাকা ভালো
কিন্তু পশুর অহঙ্কার নয়।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পশুর অহঙ্কার নয়।

অহংকার মর্যাদা-বোধকে আগলে রাখে। অভিমানী লোক তাই ভাঙ্গে, নুয়ে পড়ে না।

ভানু চট্টোপাধ্যায় ঃ আজকাল

অহংকারে লোকের পতন হয় কেন। প্রথম কারণ, নিজের বড়োত্ব সম্বন্ধে অতিবিশ্বাস

থাকাতে সে পরকে ঠিকমতো জানিতে পারে না। ....অহংকারের আর এক বিপদ, তাহা সংসারকে আমাদের প্রতিকূলে দাঁড় করায়।...কিন্তু সর্বাপেক্ষা বিপদ আর একটি আছে। বড়োকে বড়ো বলিয়া জানায় একটি আধ্যাত্মিক আনন্দ আছে। আত্মার বিস্তার হয় বলিয়া সে আনন্দ। অহংকার আমাদিগকে নিজের সংকীর্ণতার মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখে। যাহার ভক্তি নাই সে জানে না অহংকারের অধিকার কত সংকীর্ণ ; যাহার ভক্তি আছে সেই জানে আপনার বাহিরে যে বৃহত্ব যে মহত্ত্ব তাহাই অনুভব করাতেই আত্মার মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অযোগ্য ভক্তি [সমাজ]

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার
চরণধুলার তলে।
সকল অহংকার হে আমার
ঘুচাও চোখের জলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়ণিকের পত্র-১ গীতাঞ্জলি

আমি যে আছি সেই থাকার মূল্যই হচ্ছে অহংকার। এই মূল্য যতক্ষণ নিজের মধ্যে পাচ্ছি ততক্ষণ নিজেকে টিকিয়ে রাখবার সমস্ত দায় সমস্ত দুঃখ, অনবরত বহন করে চলেছি।.....অহংকারকে বিসর্জন করলেই টিকে থাকার মজুরি পোষায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাসমণির ছেলে (গল্পগুচ্ছ)(কালান্তর)

আমি যেখানে জগতের সামিল সেখানে তোমাকে জগদীশ্বর বলে মানি, তোমার সব নিয়ম.....না পালন করলে তোমার শাস্তি গ্রহণ করি—কিন্তু আমিরূপে তোমাকে.....স্বাধীন করে দিয়েছ—কেন না স্বাধীন না হলে প্রেম সার্থক হবে না, ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছা মিলবে না, লীলার সঙ্গে লীলার যোগ হতে পারবে না।.....স্বাধীনতার আমি-ক্ষেত্রেই আমার সব দুঃখের চেয়ে পরম দুঃখ তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ অর্থাৎ অহংকারের দুঃখ, আর, সব সুখের চেয়ে পরম সুখ তোমার সঙ্গে মিলন, অর্থাৎ প্রেমের সুখ। এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘুচবে সেই ভাবেই বুদ্ধ তপস্যা করেছিলেন এবং এই অহংকারের দুঃখ কেমন করে ঘোচে সেই জানিয়েই খ্রীষ্ট প্রাণ দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—বিশেষ

ঈশ্বর যে অহংকার দিয়ে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন সেটা তাঁর প্রেমেরই লীলা। অহংকার না হলে বিচ্ছেদ হয় না, বিচ্ছেদ না হলে মিলন হয় না, মিলন না হলে প্রেম হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—মানুষ

সকল অহংকারই বন্ধন,
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষসপ্তক—আঠারো

চার-পাঁচজনের জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহঙ্কার, যার পাণ্ডিত্যের অহংকার, যার মনের অহংকার, তার জ্ঞান হয় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

তমোগুণের স্বভাব অহংকার।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

পাণ্ডিত্যের অহংকারও অজ্ঞান।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

যারা একটু বই-টই পড়েছে, অমনি তাদের অহংকার এসে জোটে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

যতক্ষণ অহংকার ততক্ষণ অজ্ঞান, অহংকার থাকতে মুক্তি নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ঠিক জ্ঞান হলে অহংকার হয় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

অহংকার যে মরেও মরে না। ও যেন তুষের আগুন, নিবেও নেবে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শ্রীকান্ত

অ্যাডজাস্ট

মানুষ যে শক্তিমান।.....নিজেকে আশ্চর্য রকম 'অ্যাডজাস্ট' করে নিতে পারে মানুষ। 'অ্যাডজাস্ট' করতে করতেই তার জীবন পরিক্রমা।

তবু যে কেন নিজেকে নিয়ে ভাবনার শেষ নেই তার, এইটাই প্রশ্নের, এইটাই বিস্ময়ের।

আশাপূর্ণা দেবী ঃ ক্যাকটাস

অ্যাসেমব্লি

অ্যাসেমব্লিতে পুতুলেরা হাত নাড়ে
অবিকল মানুষের মতো,......
কিন্তু মানুষ তো নয়
মোটেই মানুষ নয় ....
এই সব আধুনিক প্রেত।

অসীম রায় ঃ অ্যাসেমব্লিতে

আইডিয়া

এ আমার আইডিয়া,.......এ পুরোপুরি আমি নয়.. ......তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্বেই তৈরি হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে বাইরে—সন্দীপের আত্মকথা

—আইডিয়াটা ভালো বটে।
—অর্থাৎ, শুনতে সুন্দর, কিন্তু করতে অসাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার সভা, ২/২

কতকগুলো জিনিষ আছে যার আইডিয়াটা এত সুন্দর যে, সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে, সে রাস্তা কি তোমার পটোলডাঙ্গা স্ট্রীট?.....বিরহিণীর হৃদয় নীলাম্বরী 'পরে মনোরাজ্যের পথে ওই রকম করে বেরিয়ে থাকে—বক্ষের উপর থেকে মুক্তো ছিঁড়ে পড়ে, চেয়েও দেখে না—সত্যিকারের মুক্তো হলে কুড়িয়ে নিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রজাপতির নির্বন্ধ—১০ম পরিচ্ছেদ

ও যে আইডিয়ালিস্ট। বাস রে! এত বড়ো ভয়ংকর জীব জগতে নেই। আফ্রিকার অসভ্য মারে মানুষকে নিজে খাবে বলে। এরা মারে তার চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যায়। খায় না-খিদে পেলেও। বলি দেয় সারে সারে, চেঙ্গিস খাঁর চেয়ে সর্বনেশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাঁশরি ১/৩

আইন

শিষ্টের পালন আইনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অপর্ণা সেন ঃ সম্পাদকীয় (সানন্দা ২৫.১২.২০০৩)

আমি মানি না ক' কোনো আইন
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো আমি ভীম
ভাসমান মাইন!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বিদ্রোহী

হাইকোর্টের অ্যাটর্নীর বাড়ীর প্যায়দা ও মালী পর্যন্ত সকলেই আইনবাজ হয়ে থাকে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম) ঃ হুতোম প্যাঁচার নক্সা

মানুষ মানুষের ওপর সজ্ঞানেই অন্যায় করে। তাহার প্রতিবিধানের জন্য দেশে আইন আছে কানুন আছে শাসন আছে শৃঙ্খলা আছে তবু অন্যায় হয়। এবং বহু ক্ষেত্রে সে অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। আইন অসহায়ভাবে দুর্বল হয়ে মাথা নত করে। মানুষের ন্যায়বোধ সমস্ত কিছুকেই মানুষেরই প্রবৃত্তি সরীসৃপের মত বিষাক্ত দংশনে বিনষ্ট করে। আইনী শৃঙ্খলার লোহার বাসরঘর নির্মাণ করে মানুষ ন্যায়নীতির লখীন্দরকে বাঁচাতে চেষ্টা করে। কিন্তু সূচীপ্রমাণ ছিদ্রপথে কালনাগিনী প্রবেশ করে লখীন্দরের প্রাণ হরণ করেছে যুগ যুগ ধরে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ফরিয়াদ

আইন—সে একটা তামাসা মাত্র—বড় মানুষেই খরচ করিয়া সে তামাসা দেখিয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বঙ্গদেশের কৃষক

যে আইনে কেবল দুর্বলই দণ্ডিত হইল, যাহা বলবানের পক্ষে খাটিল না—সে আইন আইন কিসে? যে আদালতের বল কেবল দুর্বলের উপর, বলবানের উপর নহে, সে আদালত আদালত কিসে?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বঙ্গদেশের কৃষক

নব্য-ভারতবর্ষে এখন ওকালতি করতে আর পড়াশোনা না করলেও চলে। আইন, জনগণের সমতাতেই প্রায় নেমে এসেছে। একেবারে আক্ষরিক অর্থেই।......এখন মামলা জিততে উকিলের ওকালতি, এমনকি তথ্যও না জানলে চলে। প্রকৃতই স্বাধীন হয়ে গেছে ভারতবর্ষ। মক্কেলের যদি পয়সা থাকে, তবে সে খুন বলাৎকার বা ডাকাতি করলেও আইনের হাত তার ইজ্জৎ, দামী জামার ভেঙে-যাওয়া ইস্ত্রির মতোই ঠিকঠাক করে দেয়। আইন তার কেশাগ্রও স্পর্শ করে না। আর যার পয়সা নেই, বা যে নব্য-ভারতের রীতিনীতিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি এখনও, আইনের সাঁড়াশি যে কী, তা তিনি হাড়ে হাড়েই টের পান। আইনের মতো 'তামাশা' আজ আর দুটি নেই।

বুদ্ধদেব গুহ ঃ বাসনাকুসুম

আইন ও আইন-ই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সুচিন্তিতভাবে সমাজের স্বার্থে গড়ে তুলতে হয়। আবার সমাজমুখী আন্দোলনের স্বার্থে আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। বিভিন্ন বিষয়ে সরকার-বিরোধিতা করার জন্যও প্রচলিত সিভিল, ক্রিমিনাল সব আইন ভঙ্গ করা হয়। ক্রমাগত এই আইন অমান্য চলতে চলতে আজ বিষয়টি লঘু বিষয়ে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে আজ আইন অমান্য করলে, ট্রেন বাস পোড়ালে, ঘর বাড়ী জ্বালালে, মানুষকে গ্রামছাড়া পাড়াছাড়া করলে, অপহরণ করলে, ঘেরাও করে অমানবিক ব্যবহার করলেও কিছু এসে যায় না। কারোও শাস্তি হয় না। যেন তেন প্রকারেণ কার্যসিদ্ধি হলেই হলো। আইন ভাঙার ক্রমাগত এই প্রবণতা দেখতে দেখতে মনে আইনের অনুশাসন (Rule of Law) আমাদের সমাজে একদিন তার সারবত্তা হারিয়ে ফেলবে।

সোমনাথ মিত্র ঃ বার্তা ন্যায় (জুন ২০০৩)

আকাশ

মানুষ কখনো আকাশ ছুঁতে পারে না
সে নিজেকে আয়নায় মাপে জমির দলিল দেখে ঘরের পাঁচিল তোলে।

অদীপ ঘোষ : ঈশ্বরের মৃত্যু (কুয়াশা ঘেরা রাস্তার শব্দ)

আকাশের থেকে ছোটো কোনো জিনিষ আমার পছন্দ নয়।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী : পদ্য কথামৃত-৩৩

আকাশে আজ ছড়িয়ে দিলাম প্রিয় আমার কথার ফুল গো
আমার গানের মালা গো কুড়িয়ে তুমি নিও॥

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য-গীতি

আকাশও একজন রাঙা কারিগর।

জহর সেনমজুমদার : ডাকিনী ও কর্পূর (প্রণয়-পালকি)

আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে।

জীবনানন্দ দাশ : নির্জন স্বাক্ষর

এ আকাশে রামধনু নেই
সে-আকাশ কোথায় লুকাল
যার নাম ভালবাসা—যার নাম আলো!

দিনেশ দাস : স্টেশন

আকাশটা হাঁস হয়ে চরে বেড়ায়
        মেঘলা দিঘিতে
                বারোমাস
আকাশ না হাঁস
        কাকে ফেলে কাকে দেখি।

পরেশ মণ্ডল : দিঘি

কত বৃষ্টি হয়ে গেছে,
        কত ঝড়, অন্ধকার, মেঘ,
                আকাশ কি সব মনে রাখে!

প্রেমেন্দ্র মিত্র : নীল দিন

আলোতে ভরা নীল আকাশটা আমার রক্তের ভিতর গিয়ে কথা কচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন

আলোর সঙ্গে আকাশ যেথায় এক হয়ে যায় মিলে
        শুভ্রে এবং নীলে
তীর্থ আমার জেনেছি সেইখানে।
অতল নীরবতার মাঝে অবগাহন স্থানে।
আবার যখন ঝঞ্ঝা, যেন প্রকাণ্ড এক চিল
এক নিমেষে ছোঁ মেরে নেয় সব আকাশের নীল....
আকাশে আর ঘুড়ে
আমার মনে সব-হারানো ছুটির মূর্তি গড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আকাশ [ছড়ার ছবি]

আকাশ জুড়ে শুনিনু ওই বাজে
তোমারি নাম সকল তারার মাঝে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবীথিকা

আকাশতলে দলে দলে মেঘ যে ডেকে যায়
'আয় আয় আয়'॥
জামের বনে আমের বনে রব উঠেছে তাই—
'যাই যাই যাই'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা-১

আকাশভরা সূর্য-তারা বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা-১

আকাশ খানিকদূর পর্যন্ত আকাশ, অর্থাৎ প্রকাশ, ততটা সে সাদা। তারপরে সে অব্যক্ত, সেইখান থেকে সে নীল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপান যাত্রী ৭

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা-১

মনে হয় যেন বেদনার একটা আকাশ আছে। সে আকাশ মাপের আকাশ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাণমন ২ (লিপিকা)

বাধামুক্ত আকাশ যেমন
নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ তারাদীপ্ত আত্মপরিচয়ে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক ৮

এ নীল আকাশ এত লাগিত কি ভালো,
যদি না পড়িত মনে তব মুখ-আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রিয়া (চৈতালি)

ইমারত-ঘেরা ক্লিষ্ট সে আকাশটুকু
তাকিয়ে থাকত একদৃষ্টে আমার মুখে,
বাদলের দিনে গুরুগুরু করে তার বুক উঠত দুলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বালক (পুনশ্চ)

আমার যৌবন-স্বপ্নে যেন ছেয়ে আছে বিশ্বের আকাশ।
ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।......
কে আমারে করেছে পাগল—শূন্যে কেন চাই আঁখি তুলে
যেন কোন উর্বশীর আঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যৌবন-স্বপ্ন (কড়ি ও কোমল)

জীবন হতে....আকাশখানা হারিয়ে ফেলেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

আকাশ ধরারে বাহুতে বেড়িয়া রাখে,
তবুও আপনি অসীম সুদূরে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

চিদাকাশে কাছে দূরে ভেদ নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা

ঐ আকাশটা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ যুগের কোটি কোটি ইচ্ছে দিয়ে পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে-১৪

জীবনলীলার পক্ষে ঐ আকাশটা যে নিতান্তই বাহুল্য মাটির নিচেকার কীট তার প্রমাণ দেয়। সংসারে মানব-কীটও আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্য ধর্ম (সাহিত্যের পথে)

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হৃদয়-আকাশ (কড়ি ও কোমল)

এখন আমার আকাশ দেখার দিন হয়েছে শেষ
এখন আমি আকাশ হয়ে জানলা খুঁজে মরি।

সন্তোষ দত্ত : এখন আমি

গভীর সবুজ নীলে ভরে আছে হৃদয়ের প্রান্তর আকাশ।

সুজিত সরকার : কথাগুলি মন্ত্র হয়ে যায়

আকাশের দেবতা ছিটিয়ে দিয়েছেন তারার ফুল। তারাগুলোকে ঠিক পাঁচ-পাপড়ির টগর ফুলের মতো লাগছে। সারা আকাশ যেন সেই ঝাঁকড়া গাছটা।

হর্ষ দত্ত : একটি সামান্য গাছ

আকাশগঙ্গা

জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে ভস্ম হবে
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে।

সমর সেন : ঘরে বাইরে

আকুল

নূপুর গুঞ্জরি যাও আকুল-অঞ্চলা
বিদ্যুৎ-চঞ্চলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উর্বশী (চিত্রা)

পরিপূর্ণ সুরধুনী কুলুকুলু ধ্বনি শুনি,
পরপারে বনশ্রেণী কুয়াশা-আকুল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নারীর উক্তি (মানসী)

....অকূল সিন্ধু উঠিছে আকুলি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিরুদ্দেশ যাত্রা (সোনার তরী)

সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘমাঝে
পশ্চিমের সমুদ্রসীমায়
প্রভাতের জন্মভূমি শৈশব পুরব-পানে
যেমন আকুলনেত্রে চায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রতিধ্বনি (প্রভাত সংগীত)

আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
আকুল নয়ন রে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিরহ (কড়ি ও কোমল)

অগুরুগন্ধে আকুল সকল দেহ,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভ্রষ্ট লগ্ন (কল্পনা)

আমি এ আকুল কবরী আবরি
কেমনে যাইব কাজে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লজ্জিতা (কল্পনা)

আখর

আখর দেওয়া কীর্তনগানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার—অনেকটা মার্গ সঙ্গীতের তানবিস্তারের মতো।.....পদাবলী গাহিতে গাহিতে ভাবাবেগের বশে গায়ক গদ্যে অথবা পদ্যে মূল তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন।....বস্তুত আখরের দ্বারা রসকীর্তন মূর্তি পরিগ্রহ করে, আখরেই কীর্তনিয়ারা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিপ্রবণতা ফুটাইয়া তুলেন।.....রবীন্দ্রনাথও তাঁহার কীর্তন ধরনের গানে আখর ব্যবহার করিয়াছেন।

ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়)

আখর—কীর্তনাদি গানের মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য সংযোজিত অতিরিক্ত শব্দ।....আখর দেওয়া—গান করিবার সময় সঙ্গীতের মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য মূল গীতের সহিত 'মরি হায়' 'উহু মরি' ইত্যাদি সময়োচিত সুললিত শব্দ প্রয়োগ। যথা—মূল গীত ঃ "এই সংসার পথ সঙ্কট অতি কণ্টকময় হে, আমি নীরবে যাব হৃদয় লয়ে প্রেম-মূরতি তব"। আখর—"পথের কাঁটা মানব না, নীরবে যাব, হৃদয়-ব্যথায় কাঁদব না, নীরবে যাব।"

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ঃ বাঙালা ভাষার অভিধান (রবীন্দ্রনাথ)।

কীর্তন গানে পদের অন্তর্গত জটিল ভাবকে সরল ও সহজ কথায়, সুরে, তালে বুঝিয়ে দেওয়া হয়, যে কথায় বোঝানো হয়, সেই কথার যোজনাকে বলা হয় অলংকার বা আখর।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ঃ বাংলা সাহিত্যের নানারূপ

আঁখি

তোমারি আঁখির মত আকাশের দুটি তারা
চেয়ে থাকে মোর পানে নিশীথে তন্দ্রাহারা।
সে কি তুমি? সে কি তুমি?

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (কাব্য-গীতি)

ভাবেতে বিভোর তনু গদ গদ বাণী।
ধরণে না যায় মোর দুটি আঁখির পানি।

বলরাম দাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

আঁখির আলোকছায়া আঁখিরে রয়েছে ঘিরে
তারি মাঝে দৃষ্টি পথহারা—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আচ্ছন্ন (ছবি ও গান)

আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি।
হৃদয় তোমার আঁখির পাতায়
থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৫

বাহির-আকাশে মেঘ ঘিরে আসে, এল সব তারা ঢাকিতে।
হারানো সে আলো আসন বিছালো শুধু দুজনের আঁখিতে—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা—৪

দুখানি করুণ আঁখি মানে না যুকতি,
কেবল মিনতি করে—অনুরোধ তার
এড়ানো কঠিন বড়ো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দেবতার গ্রাস (কাহিনী)

বুদ্ধের করুণ আঁখিদুটি,
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নগরলক্ষ্মী (কথা)

হেরিয়া শ্যামল-ঘন নীল গগনে
শ্যামল কাজল আঁখি পড়িল মনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নববিরহ (কল্পনা)

আঁখিদুটি
যেন কালো আলোকের সচকিত শিখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নাম্নী—নন্দিনী (মহুয়া)

........মেলিয়া উদার আঁখি রহিলা নীরবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রাহ্মণ (কথা)

দাঁড়াও আমার আঁখির আগে।
তোমার দৃষ্টি হৃদয়ে লাগে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত ২

হে অচেনা, তব আঁখিতে আমার
আঁখি কারে পায় খুঁজি
যুগান্তরের চেনা চাহনিটি
আঁধারে লুকানো বুঝি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

আঁখিজল

যাহার ঢলঢল নয়ন শতদল
তারেই আঁখিজল সাজে গো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গুপ্ত প্রেম (মানসী)

আঁখিজল মুছাইলে জননী—
অসীম স্নেহ তব, ধন্য তুমি গো,
ধন্য ধন্য তব করুণা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত

আগুন

দুঃখের আগুনে.....গ্লানি আবর্জনাই পোড়ে, ছাই হয় ; যা খাঁটি তা ছাই হয় না, পুড়ে শুদ্ধ হয়। **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সপ্তপদী**

আগুন শুধু পোড়ায় না আলোও দেয়।

হর্ষ দত্ত ঃ কুশপাতার দেউল

আগুনে আগুন নেভে না।

বাংলা প্রবাদ

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন-দানে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলেখা ৩

কিন্তু আগুন যে আর-এক জাতের ; সে এক নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে বাইরে—বিমলার আত্মকথা

আগুনকে যে ভয় করে সে আগুনকে ব্যবহার করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায়-১

চুলায় আগুন ধরাইবার বেলা নাকের জলে চোখের জলে হইতে হয়, কিন্তু গৃহদাহের আগুন নেবানোই দায়। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দর্পহরণ (গল্পগুচ্ছ)**

ওরে, আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারই জয় গাই।
.....আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে—
সকল দাহ মিটবে দাহে, ঘুচবে সব বালাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রায়শ্চিত্ত

যে আগুন নেবাবার কোনো উপায় নেই, সেটাকে আপনি জ্বলে ছাই হওয়া পর্যন্ত তাকিয়ে দেখতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ—৪৫ পরিঃ

শিমুলকাঠই হোক আর বকুলকাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১১

আগুন শুধু পোড়ায় না, আলোও দেয়।

হর্ষ দত্ত ঃ কুশপাতার দেউল

আঘাত

জীবনের এই উদার বিস্তারের মধ্যে আমরা যতই বিস্তীর্ণ হবো, ততই তো আমাদের আনন্দ, আবার ততই তো আমাদের আঘাত সহ্য করতে হবে। আনন্দকে যদি স্বীকার করে নিয়ে থাকি, তাহলে আঘাতকে এড়ালে চলবে না তো।

বিমল মিত্র ঃ কড়ি দিয়ে কিনলাম (২য় খণ্ড)

সামান্য আঘাতেও তোমার বুকের ভেতর থেকে নির্মল আলোর দীপ্তি বেরিয়ে আসে।

হর্ষ দত্ত ঃ কুশপাতার দেউল

আঁচল [দ্র. অঞ্চল]

ক্রোধে রাণী ধায় রড়ে [ছুটে]
আঁচল ধরায় পড়ে।

ভারতচন্দ্র রায় ঃ অন্নদামঙ্গল

হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে—
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে, মরি হায় হায় হায়।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা—১

আঞ্চলিক উপন্যাস

আঞ্চলিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় সংযোজন।.....আঞ্চলিক জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা চাই, স্থানিক রঙ ফোটানোর কারুকুশলতা চাই, আঞ্চলিক উপভাষার উপর দখল চাই। কিন্তু এগুলি উপাদন মাত্র, লক্ষ্য নয়। আসলে চাই গভীর জীবনবোধ। নতুন মানুষ, নতুন ভূখণ্ড, অপরিচিত ধ্যানধারণা, নতুন মানসিকতা—সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড জগৎ গড়ে তোলার উপযুক্ত জীবনবোধ। এ ছাড়া কোনো লেখাই সার্থক নয়।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ আঞ্চলিক উপন্যাস

একটি বিশেষ অঞ্চলকে পটভূমি করে উপন্যাস লেখা হলেই যে তা 'আঞ্চলিক' অভিধায় ভূষিত হতে পারে, এমন কিন্তু নয়। অ্যাব্রামস [M. H. Abrams] এই শ্রেণীর উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে মাত্র একটি দীর্ঘ বাক্যে তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন, তিনি বলেছেন—'The regional novel emphasizes the setting, speech, and customs of a particular locality, not merely as local color, but as important conditions affecting the temperament of the characters, and their ways of thinking, feeling and acting [A Glossary of Literary Terms.]

হীরেন চট্টোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য প্রকরণ

আড্ডা

আড্ডাই আমাদিগের দেশের জাতীয়ত্বের এবং নিজের নিজের মনুষ্যত্বের হ্রাস বৃদ্ধির, মঙ্গল অমঙ্গলের উন্নতি ও অবনতির মূল কারণ। হেলায় বৃথা সময় কাটাইয়া মনুষ্যত্বের হানি করিতে আড্ডা যেমন মজবুত এমন আর কিছুই নহে।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ঃ আড্ডা (উদ্বোধন ২/১৯)

আড্ডার নাম শুনিলেই যেন সাধারণত লোকের মনে একটা ঘৃণাসূচক ভাব আসে। সে-ভাব যেন সকলকার মন হইতে দূরীকৃত হয়। আড্ডাসকল যেন আমাদিগের দেশের নেতৃমণ্ডলি-স্বরূপে পরিণত হয়, যেন পাড়ার আদর্শ-স্থান বলিয়া গণ্য হয়—এই একান্ত প্রার্থনা। যাবতীয় আড্ডাগুলি যদি সদ্ভাবে পূর্ণ হয়, তাহা হইলে আর দেশের কোন স্থানে আপদ-বিপদের ভয় থাকে না। যদি কোন্ পাড়ায় কাহারও কোন আপদ-বিপদের সম্ভব হয়, তো তৎক্ষণাৎ স্থানীয় আড্ডায় খবর দিলেই যেন তিনি নির্ভরপ্রাপ্ত হন। আড্ডা যেন, দীন-দরিদ্র, অনাথ-অনাথাগণের আশ্রয় হয় ; আড্ডা যেন বিপন্নগণের একমাত্র শরণ-স্থল হয় ; যেন দুষ্টের পরিবর্তন ও শিষ্টের আদর-স্থান হয় ; ধনী-নির্ধন, গুণী ও নির্গুণ, মহৎ ও ক্ষুদ্র, বালক বা বৃদ্ধ, সকলকারই যেন প্রিয় কুটির হয়। আড্ডা যেন পল্লীর শান্তিনিকেতন হয়। আড্ডা যেন যাবতীয় লোককে একতাবন্ধনে বদ্ধ করিতে পারেন। দেশের জাতীয়ত্ব বজায় রাখিতে পারেন এবং ভারতের নষ্টদ্রব্য উদ্ধার করিয়া স্বজাতির জীবনরক্ষা করিতে পারেন, নিজ মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে পারেন।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ঃ আড্ডা

বাঙালীর প্রধান বিপদ হচ্ছে আড্ডা।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

আড্ডায় সকলেরই মর্যাদা সমান হওয়া চাই।.....তার্কিক এবং পেশাদার হাস্যরসিক, আড্ডায় এই দুই শ্রেণীর মানুষের প্রবেশ নিষেধ। যাঁরা প্রাজ্ঞজন কিংবা যাঁরা লোকহিতে বদ্ধপরিকর, তাঁদেরও সসম্মানে বাইরে রাখতে হবে। কেননা আড্ডার ইডেন থেকে যে সূক্ষ্ম সর্প বারবার আমাদের ভ্রষ্ট করে, তারই নাম উদ্দেশ্য। যত মহৎই হোক, কিংবা যত তুচ্ছই হোক, কোনো উদ্দেশ্যকে ভ্রমক্রমেও কখনো আড্ডায় ঢুকতে দিতে নেই।

বুদ্ধদেব বসু ঃ আড্ডা

আড্ডা কি বাঙালির জীবন থেকে একেবারে হারিয়ে গেল? আরও কত কি তো হারিয়ে গেল। আড্ডা বাঙালির জীবনের শ্রী ও সৌন্দর্য, প্রতিভা ও প্রকাশের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে ছিল। সেকালের রবিবারের আড্ডা এক রোমহর্ষ সৃষ্টিশালা ছিল। আড্ডা যে কেবলই জীবনটাকে ফুঁকে দেয়ার ব্যাপার ছিল যাঁরা মনে করেন তাঁরা আড্ডা দেনইনি কোনওদিন। এই আড্ডাই জন্ম দিয়েছে একদিন কত মাসিক পত্রিকার, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা যা বাঙালিকে দিয়েছে যেমন আনন্দ তেমনই নতুন নতুন সৃষ্টির উন্মাদনা। এমন আড্ডা খরুচে আড্ডা ছিল না। চা-মুড়ি, চা-বিস্কিট, সঙ্গে গরম-গরম জিলিপি, কিংবা খুব জোর অমৃতি। আড্ডা চলত সকাল থেকে দুপুর দুটো-তিনটে। তারপর যে যার বাড়ি। আড্ডাধারীরা কেউ লেখক, কেউ সরকারি আপিসের বড় অফিসার। কেউবা গুরুগম্ভীর ফরেস্ট রেঞ্জার। আবার কেউবা সাংবাদিক। কোথাওবা কেউ গোপনে নিজের পদমর্যাদা নিয়ে কিংবা এখন ভূতপূর্ব একটু সামান্য অভিমানবোধ করতেই পারেন। কিন্তু জানতেন এসব প্রকাশের জায়গা এমন আড্ডার জায়গা নয়। এটাই তো সভ্যতার একটা বড় পরিচয়। জীবনে অন্তত সপ্তাহে একদিন বাইরের সব আবরণ ছিন্ন করে ভেতরের মানুষটাকে বাইরে মেলে ধরা একান্তই দরকার—অর্থাৎ মনের স্বাস্থ্যের জন্যে।

হোসেনুর রহমান ঃ প্রতিদিন ৪.৮.২০০২

আণব

মানব-নিধন আণববোমার নেই কোন দরকারই!
সবাই যেন পায় খেতে রোজ ডাল-ভাত-তরকারি!!

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার : সবাই যেন পায় খেতে রোজ

আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম

আত্মসংযম ও আত্মজ্ঞানই ধর্মের প্রধান দিক ও সার অংশ। নিজের দিব্যস্বরূপকে ও সত্যকার স্বভাবকে উপলব্ধি করার ফলে যে জ্ঞান লাভ হয় তার নাম আত্মজ্ঞান। হীন প্রবৃত্তি, কুভাবকে সম্পূর্ণভাবে জয় করাই আত্মসংযম। পশুপ্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে পারলেই আত্মসংযম লাভ হয়।

যদি আত্মসংযম করতে পারো তবেই আত্মজ্ঞান লাভ হবে।

স্বামী অভেদানন্দ : উপদেশমালা [কালী-তপস্বী]

আত্মহত্যা/আত্মহনন

নারায়ণী বলে শুন আমার বচন।
আত্মহত্যা মহাপাপ নরকে গমন॥

লক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা ও পাঁচালী

সমাজের প্রতিনিয়ত 'ইঁদুর দৌড়ে' ব্যর্থ ছেলেমেয়েরাই আশ্রয় খোঁজে আত্মহননের 'নিবিড় শান্তিতে'।

বেলা দত্তগুপ্ত : আত্মঘাতী কিশোর-কিশোরী (উদ্বোধন ৯৭/১০)

ব্যক্তির মনস্তাত্ত্বিক কারণের চেয়ে সমাজতাত্ত্বিক কারণগুলিই বর্তমান কিশোর-কিশোরীর আত্মহননের নিয়ামক। পশ্চিমী ধাঁচের আধুনিক, অঢেল সমাজ যদি চিন্তাভাবনা না করে কোন দেশের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে এসব বিচ্যুতির মধ্য দিয়েই যেতে হবে সে-সমাজকে। এক্ষেত্রে....আত্মহননের পরিবেশের জন্য দায়ী মুনাফাসর্বস্ব, প্রতিযোগিতাকীর্ণ সমাজ, যেখানে মানবিক মূল্য ও বোধ দুই-ই ক্ষয়িষ্ণু।

বেলা দত্তগুপ্ত : আত্মঘাতী কিশোর-কিশোরী (উদ্বোধন ৯৭/১০)

আত্মা

খুব কষ্টে পুড়ে যাচ্ছি
তুলে ধরো, বাতাস শুশ্রূষা দাও।
আত্মার পোড়া গন্ধ তাও কি পাও না?

উত্তম দাশ : আত্মার পোড়া গন্ধ

মানুষের আত্মা অনাদি অমর পূর্ণ ও অনন্ত এবং কেন্দ্র পরিবর্তন বা দেহ হইতে দেহান্তরে গমনের নামই মৃত্যু।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—১

আত্মার ক্ষয় বা অধঃপতন নাই।....যাহা স্বপ্রকাশ তাহার কখনও ক্ষয় হয় না। যাহা অপরের আলোকে আলোকিত, তাহার আলোক কখন থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ, তাহার আলোকের আবির্ভাব, তিরোভাব, হ্রাসবৃদ্ধি আবার কি?....আত্মা স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—২

উচ্চতম হইতে নিম্নতম—নিকৃষ্ট ব্যক্তি পর্যন্ত, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে ক্ষুদ্রতম বিচরণশীল কীটাণু পর্যন্ত—সকলেই সেই পবিত্র পূর্ণস্বরূপ, অসীম আনন্দময় সত্তা। কীটের মধ্যে

আত্মার অনন্ত শক্তির স্বল্প বিকাশ ; শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে আত্মার শক্তি সর্বাধিক বিকশিত হইতেছে। প্রভেদ শুধু বিকাশের তারতম্যে, মূলতঃ আত্মা একই। সকল জীবের মধ্যে সেই পূর্ণ পবিত্র আত্মা অবস্থান করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—২

সিংহ-গর্জনে আত্মার মহিমা ঘোষণা কর্। জীবকে অভয় দিয়ে বল্—'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত' –Arise ! Awake ! and stop not till the goal is reached. (ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থেমো না।)

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী —৯

আত্মাতে কি লিঙ্গভেদ আছে নাকি? দূর কর মেয়ে আর মদ্দ, সব আত্মা।

স্বামী বিবেকানন্দ : ৭

আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা।.....আমরা আপনার সুখ চাই না, আমরা আনন্দের সহিত আত্মবিসর্জন করিতে পারি, আমরা পরের সুখের জন্য নিজেকে দুঃখ দিতে কাতর হই না।....যাহার আত্মায় এ আদর্শ নাই, দেহের সহিত তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়। জড়ত্বই তাহার পরিণাম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মার অমরতা/স্থায়িত্ব (আত্মা)

অহং আপনার মৃত্যুর দ্বারাই আত্মার অমরত্ব প্রকাশ করে।.....অহং-এর মৃত্যুর দ্বারা আত্মা রূপকে বর্জন করতে করতেই নিজের রূপাতীত স্বরূপকেই প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মার প্রকাশ (শান্তিনিকেতন)

আদর

আদর করে রাখ হৃদে আদরিণী শ্যামা মাকে।

কমলাকান্ত : শ্যামাসঙ্গীত

আদর যাহার ফুরাল, তাহারে
সের দরে বেচ ভাই।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : কাগজ বিক্রী

আদর বিবির চাদর গায়
ভাত পায় না ভাতার চায়। **বাংলা প্রবাদ**

দিগ্‌বালিকারা শিউলি বনে যখন শিল বৃষ্টি করে তখন রাগ করে না। তাদের আদর করবার প্রথাই ওই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটীর পূজা—১

আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রজাপতির নির্বন্ধ—৪

বেশের আদর করতে গিয়ে ওরা
রূপের আদর ভোলে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** : মুক্তপথে (সানাই)

মার সোহাগে বাপের আদর এ দৃষ্টান্ত যথা তথা।

রামপ্রসাদ : শ্যামাসঙ্গীত

আদর্শ

সর্বজনপূজিত ব্যক্তি যাহা করেন, লোকে তাহাই আদর্শ করিয়া আচরণ করে।

অরবিন্দ ঘোষ : সন্ন্যাস ও ত্যাগ

তোমরা যদি তোমাদের জীবনকে আদর্শরূপে গড়িয়া তুলিতে পার, তাহা হইলে তোমাদের আদর্শে আবার শত শত ছাত্র গড়িয়া উঠিবে। এমনিভাবে সমগ্র ছাত্রসমাজ

গড়িয়া উঠিলেই একটা মহান জাতি-গঠনের ভিত্তি তৈরি হইবে। আদর্শের একটা নৈতিক প্রভাব আছে। বর্তমানে যদি তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের নিজ নিজ জীবনকে গড়িয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর হও, তাহা হইলে তাহাই হইবে তোমাদের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় কাজ। একটা মহান আদর্শকে কঠোর সাধনা দ্বারা জীবনে বিকশিত করিয়া তোলার চেয়ে আর বড় কাজ কি হইতে পারে? একটা স্কুলে যদি ২০ জন ছাত্রও একটা আদর্শ নিয়ে চলে, তবে সমস্ত স্কুলের ভাবধারার পরিবর্তন হইতে পারে।

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ ঃ শ্রীপ্রণবানন্দ উপদেশ

আদর্শ পুরুষ তিনিই যিনি গভীরতম নির্জনতা, নিস্তব্ধতার মধ্যে তীব্র কর্মী এবং প্রবল কর্মশীলতার মধ্যে মরুভূমির নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী—১

হওয়াটাই জগতের চরম আদর্শ, করাটা নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নববর্ষ (ভারতবর্ষ)

মানুষের আদর্শ যেমন সত্য, সেই আদর্শের ব্যাঘাতও তেমনি সত্য। যাহারা.....ব্যাঘাতের ভিতর দিয়াই চোখ মেলিয়া আদর্শকে দেখিতে না পারে, চোখ বুজিয়া স্বপ্ন দেখা ছাড়া তাহাদের গতি নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধর্মশিক্ষা (সঞ্চয়)

যে আদর্শ অন্যের আদর্শের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ তাহা আদর্শই নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সমাজভেদ (স্বদেশ)

দুর্বলতাবশতঃ কোনমতেই সমাজের চরম আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করা উচিত নয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিজয়া ১/১

আদর্শ, আইডিয়াল শুধু দু-চার জনের জন্যই, তাই তার দাম। তাকে সাধারণ্যে টেনে আনলে সে হয় পাগলামি, তার শুভ যায় ঘুচে, তার ভাল হয় দুঃসহ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শেষ প্রশ্ন—২৮

যে দুঃখকে ভয়,.......তারই ভেতর দিয়ে আবার তারও চেয়ে বড় আদর্শ জন্মলাভ করবে ; আবার তারও যেদিন কাজ শেষ হবে, মৃতদেহের সার থেকে তার চেয়েও মহত্তর আদর্শের সৃষ্টি হবে, এমনি করেই সংসারে শুভ শুভতরের পায়ে আত্মবিসর্জন দিয়ে আপন ঋণ পরিশোধ করে। এই তো মানুষের মুক্তির পথ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শেষ প্রশ্ন—২৮

আদর্শকে ষোল আনা পাইতে হইলে নিজের ষোল আনা দেওয়া চাই।

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ তরুণের স্বপ্ন

আদালত

জোর কি আমার রে, জোর আদালতের।......আর আদালত টাকার।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ চৈতালী ঘূর্ণি

আদালত এবং বারাঙ্গনার মন্দির [ঘর] তুল্য ; অর্থ নহিলে প্রবেশের উপায় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সাম্য

একবার আদালতে মকদ্দমা উপস্থিত হইলে আর শান্তি নাই—বিরাম নাই। ইহার চূড়ান্ত হইতে যে কালবিলম্ব হয় তাহাতে কত ধূর্ততা কত প্রবঞ্চনা মিথ্যা সাজাইবার সময় পাওয়া যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বোম্বাই রায়ত

আদালতের নাম শুনিলে লোকে সত্য গোপন করে কেন?.....একেবারে সত্য পথে চলিলে, আদালতের নিয়ম রক্ষা পায় না।

হরিনাথ মজুমদার ঃ গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

আদিবাসী

ভারতবর্ষের আদি বসতকারী মানবই আদিবাসী।.....আর্যপূর্ব ভারতের আদিম বাসিন্দা তারাই। আর্যদের ভারতে আগমন ও বসতি বিস্তারের ফলে তারা বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। কার্যত, আর্যরা তাদের নিজের বসতস্থল থেকে বিতাড়িত করে। তার ফলে অবশ্য ফল একদিক দিয়ে ভাল হয়েছে। তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় থাকতে পেরেছে। আর্যদের সভ্যতা তাদের গ্রাস করতে পারেনি। আজও তাদের মধ্যে বিশিষ্ট রীতি-নীতি, ধরন-ধারণ, আচার-বিচার প্রভৃতির মাধ্যমে বহমান এক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য বজায় আছে।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ

আদিবাসী মাত্রই প্রকৃতির সন্তান।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে : পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ

আদিম অধিবাসী অর্থে আদিবাসী শব্দের ব্যবহার নৃতাত্ত্বিকরা স্বীকার করেন। অর্থাৎ, আদিবাসীরা হলেন কোনও একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে প্রথম বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী। ভারতের আদিবাসী বলতে ভারতবর্ষের মাটিতে প্রাক আর্য মানবগোষ্ঠীকেই বোঝায়—একথাও সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন।

ইংরেজ আমলের আগে 'আদিবাসী' শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় না। ইংরেজি 'ট্রাইব' শব্দের ভারতীয়করণ করা হয়েছে আদিম জাতি, বন্যজাতি, বনবাসী, বনচারী, আদিবাসী, জনজাতি, উপজাতি ইত্যাদি। বাংলায় আদিবাসী, তপশিলী উপজাতি ও হিন্দিতে জনজাতি শব্দের বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর পৃথক ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের আন্দোলন দানা বাঁধলে ওই অঞ্চলবিশেষের আদিবাসীদের 'ঝাড়খণ্ডী' বলা শুরু হয়। একুশ শতকের শুরুতে ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠন হওয়ায় 'ঝাড়খণ্ডী' শব্দটা পাকাপাকি এসে যায়। এঁদের সহজ-সরল জীবন যন্ত্রসভ্যতার যুগে এখনও নষ্ট হয়ে যায়নি। বরং প্রকৃতির কাছাকাছি ওই জীবনই মানুষকে সুখ-শান্তি দিতে পারে, এরকম একটা কথা মাঝে-মধ্যেই শুনতে পাই। কথাটা সত্য। পুরো সত্য বলেই মনে হয়। ভারতবর্ষের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এঁরা সমৃদ্ধ করেছেন। এঁদের গান-বাজনা, পোশাক-আশাক, অলঙ্কার, আচার-অনুষ্ঠান এ সবই সেই কবে থেকে চলে আসছে। নিজের সংস্কৃতিকে এঁরা ধরে রেখেছেন।

পরিমল হেমব্রম : দৈনিক প্রতিদিন (১৩.৯.২০০২)

আদিবাসী.....যে সুপ্রাচীন ভারত-জনের উত্তরসূরী, জীবন যাত্রার নানা ক্ষেত্রে, দিন-চর্যায়, রীতি-নীতি আচরণ অনুষ্ঠানের আঙিনাতে, ধর্মবিশ্বাস অশরীরী বা অতি-প্রাকৃত শক্তির কল্পনায়, বিশ্বচিন্তা (World View)-র দিগবলয়ে তাদের জীবন-সংস্কৃতি এক বৈশিষ্ট্য সূচিত করে।

প্রবোধ কুমার ভৌমিক : ভূমিকা (পশ্চিমবঙ্গের আদিবাসী সমাজ,—ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে)

আধুনিক

কেবল ব্যক্তিত্ব অর্জন নয়, স্বীয় ব্যক্তিত্বের মুখোমুখি দাঁড়াবার সামর্থ্যই আধুনিকতা।

আলোক সরকার : আধুনিক মন (শতভিষা —৩৪)

ইতিহাসের স্রষ্টা যে-মানুষ সে-ই আধুনিক,
ইতিহাসের সৃষ্টি যে সে নয়।

আলোক সরকার : আধুনিক মন (শতভিষা-৩৪)

আধুনিকতার মৌল লক্ষণ অমিশ্র-বিশুদ্ধ মানবিক কৌতূহল।

ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য়)

মন উড়ুউড়ু, চোখ ঢুলুঢুলু,
ম্লান মুখখানি কাঁদুনিক—
আলুথালু ভাষা, ভাব এলোমেলো,
ছন্দটা নির্‌বাঁধুনিক।
পাঠকেরা বলে, 'এ তো নয় সোজা,
বুঝি কি বুঝি নে যায় না সে বোঝা।'
কবি বলে, 'তার কারণ, আমার
কবিতার ছাঁদ আধুনিক'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : খাপছাড়া (১৯)

নদী সামনের দিকে সোজা চলতে চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি বরাবর সিধে চলে না। যখন সে বাঁক নেয় তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডার্‌ন্‌ বাংলায় বলা যাক আধুনিক। এই আধুনিকটা সময় নিয়ে নয়, মর্জি নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আধুনিক কাব্য

আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর বিশুদ্ধ আধুনিকতাটা কী, তা হলে আমি বলব, বিশ্বকে ব্যক্তিগত আসক্ত ভাবে না দেখে বিশ্বকে নির্বিকার তদ্‌গত ভাবে দেখা। এই দেখাটাই উজ্জ্বল, বিশুদ্ধ ; এই মোহমুক্ত দেখাতেই খাঁটি আনন্দ। আধুনিক বিজ্ঞান যে নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে আধুনিক কাব্য সেই নিরাসক্ত চিত্তে বিশ্বকে সমগ্রদৃষ্টিতে দেখবে, এইটেই শাশ্বতভাবে আধুনিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আধুনিক কাব্য

বিশ শতকের আধুনিক মানুষ বিচ্ছিন্নতা পীড়িত, নির্বেদ-আক্রান্ত, আত্মপ্রত্যয়হীন, শুভ-অশুভ নির্ণয়ে অসমর্থ, ধর্ষকাম এবং মর্ষকাম বৃত্তির প্রাবল্যে বিকলচিত্ত, রাজনৈতিক বুলি এবং ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপনের অসহায় বলি। পরিবার এবং সমাজ ভেঙে পড়ছে, স্নেহ, বন্ধুতা, ভালবাসা, শ্রদ্ধা, মানুষে মানুষে নির্ভরযোগ্য সম্পর্ক দ্রুত দুর্লভ হয়ে উঠছে। মানুষের বানানো পারমাণবিক এবং জৈবরাসায়নিক অস্ত্রশস্ত্রের সম্ভাব্য প্রয়োগ আজ প্রাজাতিক ভবিষ্যতের মাথায় ভয়ংকর প্রশ্নচিহ্ন হয়ে ঝুলছে। এবং মানুষ যে-হারে পরিবেশদূষণ করে চলেছে তা যদি বন্ধ না হয় একুশ শতকের পৃথিবীতে প্রাণধারণই অসম্ভব হয়ে উঠবে।

শিবনারায়ণ রায় : আত্মঘাতী আধুনিকতা ও একুশ শতকের সম্ভাব্য উত্তর আধুনিকতা [শরক্ষেপ]

সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ হিসেবে যে-দুটি প্রসঙ্গের কথা সবচেয়ে বেশি ওঠে তা হলো প্রচলিত মূল্যবোধে সংশয় ও নৈরাশ্যবোধের তীব্রতা।

সুমিতা চক্রবর্তী : আধুনিক কবিতা—আধুনিকতার দর্পণ

আধুনিক কবিতা/কাব্য

কালের দিক থেকে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী এবং ভাবের দিক থেকে রবীন্দ্রপ্রভাবমুক্ত, অন্তত মুক্তিপ্রয়াসী, কাব্যকেই আমরা আধুনিক কাব্য বলে গণ্য করেছি।

আবু সয়ীদ আইয়ুব : ভূমিকা—আধুনিক বাংলা কবিতা

আধুনিক শব্দটি....সাময়িক বৈশিষ্ট্যের আভাস জোগায়। আমরা সচেতনভাবে আধুনিক পর্বের বাংলা কবিতা বলতে রবীন্দ্রনাথকে বোঝাই না, ত্রিশের দশক থেকে বাংলা কাব্যের পালাবদল বুঝি। তবে সাহিত্য-আলোচকরা বিশ্বসাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই

সময়কে আরেকটু পিছিয়ে নেন ভার্জিনিয়া উলফের সেই বিখ্যাত উক্তি, '১৯১০ সালে মানুষের প্রকৃতি বদলাল' মনে রেখে। এক্সপ্রেশনিষ্ট ইমপ্রেশনিষ্ট, ইমেজিষ্ট আন্দোলন সাহিত্য-শিল্পে আধুনিক মানুষের মন বদলের চিত্র আঁকল। অন্যদিকে ১৯১৪-তে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ মানুষের মূল্যবোধকে দারুণভাবে পালটাল।

আশিসকুমার দে ও শিপ্রা দে : আধুনিক বাংলা কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণ

আধুনিক কবিতা বলতে আমি সেই শিল্পঘটনা বুঝি যা ইতিমধ্যেই চিরায়ত কবিতার অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : আধুনিকতা বিষয়ে আরেকটি প্রস্তাব (শতভিষা ৩৪)

আধুনিক কাব্যে কল্পপ্রতিমা রূপকীকৃত না হয়ে প্রতীকোৎসারী হয়ে ওঠে, অতিভাষী সুবোধ্যতার মসৃণ ময়দান ছেড়ে কবিতা বিহার করতে ওঠে মিতবাক, উচ্চাবচ, এমন কি হয়তো আপাত দুর্বোধ্যতার পাথুরে জমিতে। একই কারণে কাব্যের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসের প্রাবল্যের চেয়ে ব্যক্তি সমাজের নিহিত ভাষা বিনিময়ের আততি হচ্ছে আধুনিক কাব্যের মৌলিক লক্ষণ।

বিষ্ণু দে : একালের কবিতা—মুখবন্ধ

আধুনিক কবিতা এমন কোনো পদার্থ নয় যাকে কোনো একটা চিহ্নদ্বারা অবিকলভাবে শনাক্ত করা যায়। একে বলা যেতে পারে বিদ্রোহের, প্রতিবাদের কবিতা, সংশয়ের, ক্লান্তির, সন্ধানের, আবার এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিস্ময়ের জাগরণ, জীবনের আনন্দ, বিশ্ববিধানে আস্থাবান চিত্তবৃত্তি। আশা আর নৈরাশ্য, অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতা, সামাজিক জীবনের সংগ্রাম ও আধ্যাত্মিক জীবনের তৃষ্ণা, এই সবগুলো ধারাই খুঁজে পাওয়া যাবে, শুধু ভিন্ন ভিন্ন কবিতে নয়, কখনো হয়তো বিভিন্ন সময়ে একই কবির রচনায়।

বুদ্ধদেব বসু : আধুনিক বাংলা কবিতা (ভূমিকা)

আধুনিক সাহিত্য মানুষের সাহিত্য—এই হল আধুনিক সাহিত্যের সম্বন্ধে প্রধান কথা। মানব-সত্য নিয়েই আধুনিক সাহিত্য।

গোপাল হালদার : আধুনিক সাহিত্য

আধ্যাত্মিকতা

আধ্যাত্মিকতা আমাদের আর কিছু দেয় না, আমাদের ঔদাসীন্য আমাদের অসাড়তা ঘুচিয়ে দেয়। অর্থাৎ তখনই আমরা চেতনার দ্বারা চেতনাকে, আত্মার দ্বারা আত্মাকে পাই। সেই রকম করে যখন পাই তখন আর আমাদের বুঝতে বাকি থাকে না যে সমস্তই তাঁর আনন্দরূপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মার দৃষ্টি (শান্তিনিকেতন)

আনন্দ

পৃথিবীতে যে বস্তু আনন্দঘন—তা স্বপ্রকাশ। ভাষায় এর ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রমথ চৌধুরী : বীণাবাই

আনন্দের উৎসে গিয়ে দেখি
বিষাদ যমজ ভাই ;
গলা জড়াজড়ি করে বসেছি দুজনে।

ব্রত চক্রবর্তী : কয়েক টুকরো—এক (ঘুরেছি, খুঁজেছি)

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অভয় (চৈতালি)

আমি যখন ছিলেম অন্ধ,
সুখের খেলায় বেলা গেছে, পাইনি তো আনন্দ॥
.......যে দিন তুমি অগ্নিবেশে সব কিছু মোর নিলে এসে,
সেদিন আমি পূর্ণ হলেম, ঘুচল আমার দ্বন্দ্ব।
দুঃখ সুখের পারে তোমায় পেয়েছি আনন্দ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন

যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেইক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং সেই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসব (ধর্ম)

নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী, সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক, সেখানেই তার আনন্দ। মা যেখানে মা, সেখানে তার ঝঞ্ঝাট যত বেশি হোক না কেন, সেখানেই তার আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবির কৈফিয়ৎ (সাহিত্যের পথে)

পারবি না কি যোগ দিতে এই ছন্দে রে,
খসে যাবার ভেসে যাবার
ভাঙবারই আনন্দে রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—৩৬

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—৪৪

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নীচে—
আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হত যে মিছে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১২১

যে আনন্দে মাটির ধরা হাসে
অধীর হয়ে তরুলতায় ঘাসে,
যে আনন্দে দুই পাগলের মতো
জীবন-মরণ বেড়ায় ভুবন ঘুরে—
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।
যে আনন্দ আসে ঝড়ের বেশে,
ঘুমন্ত প্রাণ জাগায় অট্ট হেসে.
যে আনন্দ দাঁড়ায় আঁখিজলে,
দুঃখ-ব্যথার রক্ত শতদলে,
যা আছে সব ধুলায় ফেলে দিয়ে,
যে আনন্দে বচন নাহি ফুরে—
সেই আনন্দ মেলে তাহার সুরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১৩৪

আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি—ঘর ও বাহির

যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে, তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহা নিয়মে বাঁধা, আকারে নির্দিষ্ট ; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য, তাহাই আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি

সুখের সঙ্গে আনন্দের প্রভেদ এই যে, সুখের বিপরীত দুঃখ, কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নহে। শিব যেমন করিয়া হলাহল পান করিয়াছিলেন, আনন্দ তেমনি করিয়া দুঃখকে অনায়াসেই গ্রহণ করে।.....আপনার পূর্ণতাকে উপলব্ধি করে। তাই দুঃখের তপস্যাই আনন্দের তপস্যা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথের সঞ্চয়—দুই ইচ্ছা

সত্যের রসই হচ্ছে আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি—১৫/২/২৫

সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত।.......সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া বসিয়া থাকে ; আনন্দ দুঃখের বিষকে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে,—কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত,..........আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুইই সমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী—৪র্থ দৃঃ

ফোটা ফুলের আনন্দ রে,
ঝরা ফুলেই ফলে ধরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী—৪র্থ দৃঃ

অলৌকিক আনন্দের ভার
বিধাতা যাহারে দেয়, তার বক্ষে বেদনা অপার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভাষা ও ছন্দ (কাহিনী)

হায় রে, আর সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রক্তকরবী

আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো না স্যাৎ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রোগশয্যায়—৩৬

আনন্দকে ভাগ করলে দুটি জিনিষ পাওয়া যায়,—একটি হচ্ছে জ্ঞান, এবং আর একটি প্রেম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন। সমগ্র এক

প্রহর গণনা করে আনন্দের সীমানির্ণয় ! এ কেমন কথা !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্রাবণগাথা

আনন্দময়ী

মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে।
ইহকালে পরকালে মা তারে আনন্দে রাখে॥
সদানন্দময়ী তারা সদানন্দের মনোহরা,
এই মিনতি করি তারা ঐ পদে যেন মতি থাকে॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য : শাক্ত পদাবলী

মাগো আনন্দময়ী নিরানন্দ করো না।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য : শাক্ত পদাবলী

আপনি, আপনার

যদি কেহ আপনি আপনার প্রশংসা করে কিংবা আপনার কথা অধিক করিয়া বলে, অথবা কোন রূপে ইহা ব্যক্ত করে যে, সে আপনি আপনাকে বড় জ্ঞান করে, তাহা হইলে সে নিঃসন্দেহে উপহাসাস্পদ হয়।........বিনয় সদগুণের শোভা সম্পাদন করে, কিন্তু যথার্থ সদগুণও আত্মশ্লাঘাকৃত হইলে সকলের ঘৃণিত হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ বিনয় (নীতিবোধ)

আবৃত্তি

শুদ্ধ উচ্চারণ আবৃত্তির অলংকার।
....একটি কবিতাকে বারবার পড়তে হবে অর্থাৎ কবিতা-প্রতিমাকে চিনে নিতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে কবিতাটির অন্তর ও বাহির ব্যঞ্জনাটিকে।.....শিল্পীকে শব্দের নির্ভুল উচ্চারণের প্রতিও সচেতন হতে হবে।.......নির্ভুল উচ্চারণটা অনুশীলনসাপেক্ষ।

অমিয় চট্টোপাধ্যায় ঃ ছোটদের আবৃত্তির ক্লাস গ্রন্থের প্রবন্ধ

আবৃত্তি আদতে এক শিল্পনির্ভর শিল্প। অর্থাৎ ভাষাশিল্পের উপর ভর করে গড়ে ওঠা এক বাক্‌শিল্প, কবিতা বা ছন্দিত গদ্যভিত্তিক এক অনন্য প্রয়োগকলা ; যাকে ইংরেজিতে বলা হয় পারফর্মিং আর্ট।......কবি অরুণ মিত্রের কথায়, "বৃহৎ জনসমষ্টির সামনে performance হিসেবে কবিতা পড়তে হলে তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করা দরকার।......মূলত এই প্রস্তুতি, এই প্রশিক্ষণ, আনুষঙ্গিকের এই গুরুত্ব কবিতাপাঠের প্রকৃতি বদলে দেয়, কবিতা অবলম্বনে সৃষ্টি হয় এক বিশেষ শিল্পরূপ .....performing art এর বৈশিষ্ট্যই তাই।"

অশোক পালিত ঃ ছোটোদের আবৃত্তির ক্লাস গ্রন্থের প্রবন্ধ

ভালোবেসে কবিতাটিকে আত্মস্থ করা থেকেই শুরু হয়ে যায় আবৃত্তি করার প্রস্তুতি। এই প্রস্তুতি থেকে পরিণাম পর্যন্ত কোনও কবিতা আর কবির থাকে না তা আবৃত্তিকারের চেতনায় অনুভবে তার নিজস্ব হয়ে ওঠে। যাকে কবি শঙ্খ ঘোষ বলেছেন 'আত্মপ্রাণিত অনুভব"।

অশোক পালিত ঃ ছোটোদের আবৃত্তির ক্লাস গ্রন্থের প্রবন্ধ

আবৃত্তি করতে গেলে অনেক কিছুরই প্রয়োজন। একটা সক্ষম কণ্ঠ। আঞ্চলিকতামুক্ত মনে উচ্চরণ। একটা সংবেদনশীল মন। অফুরান পাঠস্পৃহা। ধাপে ধাপে অনুশীলন দ্বারা নিজেকে গড়ে তোলার আন্তঃশৃঙ্খলা ও সে পরিশ্রম সহ্য করার মতো একটা শরীর। আর সর্বোপরি শিল্পবোধ, কেবল কাব্যবোধ নয়।

উৎপল কুণ্ডু ঃ ছোটোদের আবৃত্তির ক্লাস গ্রন্থের প্রবন্ধ

আবৃত্তির ক্ষেত্রে.......স্মৃতি ততটা জরুরী নয়।.......শ্রুতিসুখকর কণ্ঠস্বর, পরিশীলিত বাচনভঙ্গী, মান্য উচ্চারণ প্রক্রিয়ার দক্ষতা, ছন্দের অনুশীলন এবং বাংলা কবিতার আনুপূর্বিক ধারাবাহিকতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা দরকার।

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ছোটোদের আবৃত্তির ক্লাস গ্রন্থের প্রবন্ধ

আবৃত্তির জন্য চাই মনন। সেইসঙ্গে কণ্ঠ নিয়ন্ত্রণের জন্য বিজ্ঞানসম্মত কৌশল রপ্ত করা প্রয়োজন। কবিদের পছন্দ শান্ত এবং গভীর কবিতা। আবার আবৃত্তিকারদের পছন্দ উদাত্ত কবিতা যা সহজেই শ্রোতার মনে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।........আবৃত্তিশিল্পে ইদানীং.....মিউজিক, আলোর খেলা, মঞ্চে তিন-চারটি মাইক্রোফোন ব্যবহার এবং আবৃত্তির পিছনে মূকাভিনয়ের যে চেষ্টা চলছে তাতে আমার যেন মনে হচ্ছে যে আবৃত্তিশিল্পে কোথায় যেন একটা অবক্ষয় শুরু হয়ে গেছে।

পার্থ ঘোষ ঃ ছোটোদের আবৃত্তির ক্লাস গ্রন্থের প্রবন্ধ

আবৃত্তিকার শব্দকে সঞ্জীবিত করেন, ভাব ও অর্থকে সঞ্চারিত করেন। শ্রোতার মনেও সেই ভাব ও অর্থের ক্রিয়া চলতে থাকে বলে এ দুয়ের মিলনটা খুব জরুরী। এবং এই মিলন মুহূর্তেই আবৃত্তি সার্থক, ফলপ্রসু। নিছক পাঠ বা উচ্চারণ নয়, আবৃত্তি তাই এক সৃজনধর্মী শিল্প। আবৃত্তিকার বিষয়ের মর্ম উপলব্ধি করেন বোধ, বুদ্ধি, অনুভূতি দিয়ে, মননে অনুশীলনে তাকে আবার অবয়ব দেন শ্রোতার সামনে তুলে ধরতে। প্রতিনিয়ত এই গড়া আর ভাঙা চলে শব্দকে নিয়ে—কবিতা নিয়ে, এমনকি বারবার বহুবার একই কবিতা বা শব্দ নিয়েও। তাই কবি যেখানে সুনিশ্চিত অর্থ নিয়ে পাঠক-শ্রোতাকে পরিচালিত করেন, মননশীল আবৃত্তিকার বহুতর ব্যঞ্জনার অবকাশে শ্রোতাকে শুধু আকৃষ্ট করেন না—অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধও করেন।

প্রদীপ ঘোষ ঃ পাঠ, আবৃত্তি ঃ কিছু ভাবনা, কিছু কথা
[বিষয় ঃ আবৃত্তি—সম্পাদনায়
দেবদুলাল বন্দ্যোঃ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়

আমাদের জীবনে বৃত্তটাই হল আসল। বৃত্ত নইলে অস্তিত্বই নেই। আবার সেই বৃত্তকে যদি মূল-এর সঙ্গে বিন্দুর সঙ্গে যুক্ত করতে পারি, তাহলেই আমাদের অস্তিত্বের পূর্ণতা। বিন্দুবাসিনী আমাদের বৃত্তে এসেই নিত্য ; নিত্যকালীন নৃত্যকালী ; তাঁর সঙ্গে সংযোগেই আমাদের অস্তিত্ব। আমরা অ-মৃত। একেই বলে আবৃত্তি।.................তাঁকে নিয়ে আমরা পুনরাবৃত্ত, এবং আমাদের নিয়ে তাঁর পুনরাবৃত্তি। পুনঃ পুনঃ পুনরাবৃত্তি—অনন্তকাল ধরে চলে এই খেলা।

শিবরাম চক্রবর্তী ঃ ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা।

তিনি বৃত্তপথে এসে ব্যক্ত হচ্ছেন—আমাদের মনোবৃত্তে প্রাণবৃত্তে, আমাদের ব্যক্তিত্বে। দেহবৃত্তে স্নেহবৃত্তে আদান-প্রদানের রূপ ধরে জীবনের নানান বৃত্তিতে।.....তাঁকে কেন্দ্র করেই বৃত্তাকারে ঘুরছি আমরা, ঘুরব আমরা—এই আবৃত্তিই হচ্ছে শাস্ত্রটাস্ত্র পড়ার চেয়ে বেশি। এই আবৃত্তিই সর্বশাস্ত্রানাং বোধাদপি গরীয়সী।

শিবরাম চক্রবর্তী ঃ ঈশ্বর পৃথিবী ভালবাসা

আভিজাত্য, অভিজাত, অ্যারিষ্টক্র্যাট

অ্যারিষ্টক্র্যাট শব্দের বাংলাই পাওয়া যায় না। প্রাচীন অভিজাত শব্দ বাংলাদেশে অপরিচিত। 'কুলীন' শব্দ সর্বজনবিদিত, কিন্তু কৌলীন্য বিলাতি ভাবের অ্যারিষ্টক্র্যাসি নহে। আমাদের দেশে ধনের সম্মান য়ুরোপের ন্যায় তেমন অধিক নহে। এমন কি যে সকল জাতির মধ্যে ধনী মহাজন বিস্তর আছে তাহারা সমাজে উচ্চ স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুখুজ্যে বনাম বাঁড়ুয্যে—সমূহ পরিশিষ্ট

আভিজাত্য। ঐ একটা জিনিস আমি টাকা দিয়ে কিনতে পারিনি।

তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী) ঃ আর হবে না দেরী

দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা, এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল-পোষ্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো—এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দরজিশালার রেজেস্ট্রি-বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা ; ......ওর স্ল্যাঙ্-বিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত চক্ষুর অলস কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত ; ...... এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১৪

আমরা/আমাদের

আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অবস্থা ও ব্যবস্থা (আত্মশক্তি)

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরূপরতন

আমরা শয়তানের কর্তৃত্বকে হঠাৎ প্রবল করতে গিয়ে মরি নি, আমরা মরেছি ঔদাসীন্যে, আমরা মরেছি জরায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কর্মযজ্ঞ (কালান্তর-সংযোজন)

অভিমন্যু মায়ের গর্ভেই ব্যূহে প্রবেশ করিবার বিদ্যা শিখিল, বাহির হইবার বিদ্যা শিখিল না, তাই সে সর্বাঙ্গে সপ্তরথীর মার খাইয়াছে। আমরাও জন্মিবার পূর্ব হইতেই বাঁধা পড়িবার বিদ্যাটাই শিখিলাম। গাঁট-খুলিবার বিদ্যাটা নয়,.....যেখানে যত রথী আছে, এমনকি পদাতিক পর্যন্ত সকলের কাছে মার খাইয়া মরিতেছি। মানুষকে, পুঁথিকে, ইশারাকে, গণ্ডিকে, বিনা বাক্যব্যয়ে পুরুষে-পুরুষে মানিয়া চলাই এমনি আমাদের অভ্যস্ত যে.....কোথাও যে আমাদের কর্তৃত্ব আছে তাহা চোখের সামনে সশরীরে উপস্থিত হইলেও.....ঠাহর হয় না, এমন কি বিলাতি চশমা পরিলেও না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

আমরা না পড়িয়া পণ্ডিত, আমরা না লড়িয়া বীর, আমরা ধাঁ করিয়া সভ্য, আমরা ফাঁকি দিয়া পেট্রিয়ট....। আমরা ভারি ভদ্র, ভারি বুদ্ধিমান, কোনো বিষয়ে পাগলামি নাই। আমরা পাশ করিব, রোজগার করিব ও তামাক খাইব। আমরা এগোইব না, অনুসরণ করিব ; কাজ করিব না, পরামর্শ দিব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিঠিপত্র—৪ এবং ৫

আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না ; আড়ম্বর করি, কাজ করি না ; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না ; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না ;......পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস্‌,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিদ্যাসাগর চরিত (চারিত্রপূজা)

রোগ সব শরীরেই দুঃখের কিন্তু ক্ষীণ শরীরে মারাত্মক। মনুষ্যত্বের অপমান করেও কিছুদিনের মতো জয়ডঙ্কা বাজিয়ে চলতে পারে তারা যাদের আছে বাহুবল, কিন্তু আমরা পারব না। আগাগোড়া কলঙ্কে কালো হয়ে পরাভবের শেষ সীমায় অখ্যাতির অন্ধকারে মিশিয়ে যাব আমরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায়—৩

আমরা অনেক আচার, অনেক আসবাব য়ুরোপের কাছ থেকে নিয়েছি—সব সময় প্রয়োজনের খাতিরে নয়, কেবলমাত্র সেগুলো য়ুরোপীয় বলেই। য়ুরোপের কাছে আমাদের মনের এই সব পরাভব ঘটেছে অভ্যাসবশত সেজন্য আমরা লজ্জা করতেও ভুলে গেছি। য়ুরোপের যত বিদ্যা আছে সবই যে আমাদের শেখবার, এ কথা মানি ; কিন্তু যত ব্যবহার আছে সবই যে আমাদের নেবার, এ কথা আমি মানি নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপান যাত্রী—১৪

চলচ্চিত্তং চল দ্বিত্তং—আমাদের চিত্তেও কাজ নেই, বিত্তেও কাজ নেই ; আমরা চলব না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী—৩য় দৃঃ

আমরা হয় প্রচুররূপে নগ্ন, নয় প্রচুররূপে আবৃত।.......হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি, নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত।......হয় অতিশয় সংযত, নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অত্যুক্তি (ভারতবর্ষ)

য়ুরোপীয়েরা আমাদের আধুনিক গুরু,.......তাঁহাদের কাছ হইতে নিজেদের সম্বন্ধে অন্ধতাটুকুও আমরা শিখিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজকুটুম্ব (সমূহ, পরিঃ)

আমরা......বড়ো প্রাচীন, বড়ো শ্রান্ত।......কেবল চিন্তা এবং বিশ্রাম এবং বৈরাগ্য। যেন অন্তর বাহিরে একটা সুদীর্ঘ ছুটি। যেন জগতের প্রাতঃকালে আমরা কাছারির কাজ সেরে এসেছি, তাই এই উত্তপ্ত মধ্যাহ্নে যখন আর সকলে কাজে নিযুক্ত তখন আমরা দ্বার রুদ্ধ করে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম করছি,.....পুরা বেতন চুকিয়ে নিয়ে কর্মে ইস্তফা দিয়ে পেন্সনের উপর সংসার চালাচ্ছি। বেশ আছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নূতন ও পুরাতন (স্বদেশ)

আমরা কি দেখিতেছি না, আমরা মরিতে শুরু করিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দেশনায়ক (সমূহ)

সাহেবি অনুকরণ আমাদের পক্ষে নিষ্ফল, ...হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি আমাদের পক্ষে মৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রসঙ্গ কথা—(সমূহ, পরিশিষ্ট)

আমরা-তোমরা

আমরা তৃষ্ণা, তোমরা সুধা,
তোমরা তৃপ্তি, আমরা ক্ষুধা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষরক্ষা—৪৩

আমাদের-তোমাদের

আমাদের কৌচকার্পেট কেদারা নেই বললেই হয়,.....তক্তপোশের উপর অর্ধশয়ান অবস্থায়.....তোমাদের সাহিত্য পড়ি, তবুওতো অনেকটা বুঝতে পারি এবং সুখ পাই ; ভাঙা খোলা গায়ে তোমাদের ফিলজফি অধ্যয়ন করে থাকি, তবু তার থেকে এত বেশি আলো পাই যে আমাদের ছেলেরাও অনেকটা তোমাদের মতো বিশ্বাসহীন হয়ে আসছে।.....আরামটি তোমাদের আগে, তারপরে ভালোবাসা ; আমাদের ভালোবাসা নিতান্তই আবশ্যক, তারপরে প্রাণপণ চেষ্টায় ইহজীবনে কিছুতেই আর আরামের জোগাড় হয়ে ওঠে না।.....

.......আমাদের যেমন প্রতি বৎসর পরিবার বাড়ছে, ওদের তেমনি প্রতি বৎসর আরাম বাড়ছে।....আমরা বলি সন্তানে গৃহ পরিবৃত না হলে গৃহ শ্মশানসমান, ইংরেজ বলে আসবাব অভাবে গৃহ শ্মশানতুল্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সমাজ)

আমাশা

চলতি ভাষায় যারে বলে থাকে আমাশা
যতদূর জানা আছে, সেটা নয় তামাশা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অপাক-বিপাক (প্রহাসিনী)

আমি/আমার/আমি-তুমি/আমার-তোমার

কালকূট অন্তরে, তবু ধীর, প্রশান্ত, উদ্বেগহীন আমি
মহাকাশের সৌম্য পরিণতি প্রতীক্ষায় থাকবো।

নীলাচার্য ঃ আমি কাপুরুষ নই (আলোয় ফেরা)

আমাকে আমিই চালাচ্ছি, আর আমাকে তুমিই চালাচ্ছ—এই দুটোই আমি মিলিয়ে জানতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অচলায়তন

‘আমি’ বলিতে যাহাকে বুঝি তাহা বাহিরের দিকে কত শব্দ গন্ধ স্পর্শ, কত মুহূর্তের চিন্তা ও অনুভূতি, অথচ এই-সমস্তেরই ভিতর দিয়া যে একটি জিনিষ আপন সমগ্রতায় প্রকাশ পাইতেছে তাহাই আমি, এবং তাহা তাহার বাহিরের রূপের প্রতিরূপ মাত্র নহে, বরঞ্চ বাহিরের বৈপরীত্যের দ্বারাই সে ব্যক্ত হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অন্তর বাহির (পথের সঞ্চয়)

এই আমিটা কোথা থেকে আসে।.......অসীম যেখানে আপনাকে সীমায় সংহত করেছেন সেখানেই অহংকার।.......সেখানেই তিনি হচ্ছেন আমি আছি। অসীমের বাণী অর্থাৎ সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশই হচ্ছে, অহমস্মি। আমি আছি। যেখানেই হওয়ার পালা আরম্ভ হল সেখানেই আমির পালা।....আমি আছি, এইটেই হচ্ছে সৃষ্টির ভাষা। এই এক আমি-আছিই লক্ষ লক্ষ আমি-আছিতে ছড়িয়ে পড়েছেন—তবু তার সীমা নেই। যদিচ আমার আমি-আছি সেই মহা আমি-আছির প্রকাশ, কিন্তু তাই বলে এ কথা বলাও চলে না যে এই প্রকাশেই তাঁর প্রকাশ সমাপ্ত। তিনি আমার আমি-আছির মধ্যেও যেমন আছেন তেমনি আমার আমি-আছিকে অতিক্রম করেও আছেন। সেই জন্যেই অগণ্য আমি-আছির মধ্যে যোগের পথ রয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আমার জগৎ (সঞ্চয়)

তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে,
না, না, না,—
না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ,
না-আমি, না-তুমি।
ও দিকে, অসীম যিনি তিনি স্বয়ং করেছেন সাধনা
মানুষের সীমানায়,
তাকেই বলে “আমি”।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আমি (শ্যামলী)

আমি এসেছি নিমেষে, যাইব নিমেষ বই।
আমি আমারে চিনি নে, তোমারে জানি নে
আমার আলয় কই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উচ্ছৃঙ্খল (মানসী)

যে আমি ওই ভেসে চলে   কালের ঢেউয়ে আকাশতলে
ওরই পানে দেখছি আমি চেয়ে।
ধুলার সাথে, জলের সাথে,   ফুলের সাথে, ফলের সাথে,
সবার সাথে চলছে ও যে ধেয়ে।
....একটু ক্ষয়ে ক্ষতি লাগে,   একটু ঘায়ে ক্ষত জাগে—
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে॥
....এই-যে আমি ওই আমি নই, আপন-মাঝে আপনি যে রই,
যাই নে ভেসে মরণধারা বেয়ে—
মুক্ত আমি, তৃপ্ত আমি,   শান্ত আমি, দৃপ্ত আমি,
ওরি পানে দেখছি আমি চেয়ে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবীথিকা

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে,
আমি বাইব না মোর খেয়াতরী এই ঘাটে,
চুকিয়ে দেব বেচা কেনা,
মিটিয়ে দেব লেনা দেনা,
বন্ধ হবে আনাগোনা এই হাটে—
....তখন কে বলে গো, সেই প্রভাতে নেই আমি।
সকল খেলায় করবে খেলা এই-আমি
নতুন নামে ডাকবে মোরে,
বাঁধবে নতুন বাহুডোরে,
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতপঞ্চাশিকা

আমি যে রূপের পদ্মে করেছি অরূপ-মধু পান,
দুঃখের বক্ষের মাঝে আনন্দের পেয়েছি সন্ধান,
অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছি অন্তরে,
দেখেছি জ্যোতির পথ শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে।
নহি আমি বিধির বৃহৎ পরিহাস,
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কঙ্কাল (পূরবী)

তোমার/আমার

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।
নয়কো বনে, নয় বিজনে,
নয়কো আমার আপন মনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়,
সেথায় আপন আমারো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—৯৪

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে,
তাইতো আমি এসেছি এই ভবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১৩০

মোর ত্যাগে যে তোমার হবে জয়,
মোর প্রেমে যে তোমার পরিচয়।
মোর ধৈর্য তোমার রাজপথ.....
মোর বীর্য তোমার জয়রথ......।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—২৮

যখন আমার আমি
ফুরায়ে যায় থামি
তখন আমার তোমাতে প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—১০০

তোমারি আনন্দ আমার দুঃখে সুখে ভরে
আমার করে নিয়ে তবে নাও যে তোমার করে।
আমার বলে যা পেয়েছি শুভক্ষণে যবে
তোমার ক'রে দেব তখন তারা আমার হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিমাল্য—১০১

আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেইজন্যই নিজের উপর এমন প্রবল টান ; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেললেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে (সন্দীপের আত্মকথা)

আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করছি, আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই, তা তো নয়। আমি যা ভালোবাসি নে, যা ইচ্ছে করি নে, আমি যে তাও। আমার জন্মাবার আগেই আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমি তো নিজেকে বেছে নিতে পারি নি, হাতে যা পেয়েছি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে (সন্দীপের আত্মকথা)

চেনাশোনা হল ; বাহিরকেও বুঝলুম, অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভলোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল, তাই আমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে (নিখিলেশের আত্মকথা)

আমি তো ভেদজ্ঞানবিলুপ্ত একাকারতা-বন্যার একটা ঢেউমাত্র হতে চাই না, আমি যে আমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চতুরঙ্গ। শচীশ—৪

অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চালক (কণিকা)

আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন-মরণ-তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাইতো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা—২৯

তাই তো আমি জানি
আমি বাণীর সাথে বাণী,
আমি গানের সাথে গান,
আমি প্রাণের সাথে প্রাণ,
আমি অন্ধকারের হৃদয়-ফাটা
আলোক জ্বলজ্বল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা—৩৫

"আমাকে নইলে চলে না এই কথা মনে করে এত দিন ভারি ব্যস্ত হয়ে কাজ করা গেছে, চোখের পলক ফেলতে সাহস হয় নি। ডাক্তার বলছে, 'এইখানে বাস করো, একটু থামো।' আমি বলেছি, 'আমি থামলে চলে কই?' ঠিক এমন সময় চাকা ভেঙে আমার রথ এই জানলাটার সামনে এসে থামল। এখানে দাঁড়িয়ে অনেক দিন পরে ঐ মহাকাশের দিকে তাকালুম। সেখানে দেখি মহাকালের রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ

অগ্নিচক্র ঘুরতে ঘুরতে চলেছে ঃ না উড়ছে ধুলো, না উঠছে শব্দ, না পথের গায়ে একটুও চিহ্ন পড়ছে। ঐ রথের চলার সঙ্গে বাঁধা হয়ে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে। এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল। মনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাকে না হলেও চলে। কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র কারো অভাবে, কারো শৈথিল্যে, কোথাও এক তিন বা এক পল বেধে যাবে এমন লক্ষণ তো দেখি নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র (কালান্তর)

যত বড়ো হও
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও।
আমি মৃত্যু চেয়ে বড়ো এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মৃত্যুঞ্জয়

যে আমি রয়েছে তোমার আমায় সে আমি আমারি আমি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাবার মুখে (সেঁজুতি)

.....আমিই......আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচরকে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।.....এই-যে ঘর ভাঙবার মূল আমি, মিশিয়ে দেবার মূলও......উনি।.....আমি আমাকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে সকলকে জানছি এবং সকলকে জানছি বলেই তার প্রতিঘাতে আমাকে জানছি। বিশ্ব-আমির সঙ্গে আমার আমির এই নিত্যকালের ঢেউ-খেলাখেলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—জাগরণ

....আমিটুকুর মধ্যে অনন্ত দ্বন্দ্ব। যেদিকে সে পৃথক সেই দিকে তার চিরকালের দুঃখ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার চিরকালের আনন্দ ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকে তার স্বার্থ, সেইদিকে তার পাপ, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকে তার ত্যাগ, সেদিকে তার পুণ্য ; যেদিকে সে পৃথক সেইদিকেই তার কঠোর অহংকার, যেদিকে সে মিলিত সেইদিকেই তার সকল মাধুর্যের সার প্রেম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—জাগরণ

আমি/আমার

পুরাণে বলে কাশী সমস্ত পৃথিবীর বাইরে। বস্তুত আমিই সেই কাশী। আমি জগতের মাঝখানে থেকে সমস্ত জগতের বাইরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—প্রেমের অধিকার

আমি......তোমার সকল হতে স্বতন্ত্র.....একটি বিশেষ লীলা—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—বিশেষ

এ যেন অগম্য গ্রহ এই আমার সত্তা,
বাষ্প-আবরণে ফাঁক পড়েছে কোণে কোণে,
দূরবীনের সন্ধান সেইটুকুতেই।
যাকে বলতে পারি আমার সবটা,
তার নাম দেওয়া হয় নি,
তার নকশা শেষ হবে কবে?
তার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহারের সম্পর্ক হবে কার?
নামটা রয়েছে যে পরিচয়টুকু নিয়ে,
টুকরো-জোড়া দেওয়া তার রূপ,
অনাবিষ্কৃতের প্রান্ত থেকে সংগ্রহ-করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক—নয়

আমি যাই
দিনান্তের বিরাট চুল্লী থেকে
আমার বুকের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিতে
আমি রাখি, আমি তাকে রাখি
নৈঃশব্দ্যের পায়ের নীচে। **রাম বসু ঃ** স্মৃতিতে নায়ক

পাহাড়ের ধূসর স্তব্ধতায় শান্ত আমি,
আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।

সমর সেন ঃ মুক্তি

আমি/তুমি

আমি রাত্রির কানে কথা বলে আজ ধন্য হবো
আমি মুহূর্তমাঝে রক্তগোলাপ অগ্নি খাবো
আজ বিধাতাপুরুষ চাবুকে চাবুকে ধন্য হবে
আজ নতজানু আমি দাঁড়িয়েছি উঠি প্রসাদ পাবো।

সৌমিত বসু ঃ নতজানু আমি ঘাসে ও বাতাসে (বোধবিন্দু)

আমেরিকা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে রাজনীতি ঘুরিত ঠাণ্ডা যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া। আর ঠাণ্ডা যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে বিশ্ব রাজনীতি ঘুরিতেছে একমেবাদ্বিতীয়ম মহাশক্তি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া—যাহার মেজাজমর্জির উপর গোটা বিশ্বেরই চিত্রপট কোনও না কোনও ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ সম্পাদকীয় (৩.৪.২০০৩)

আমোদ

নিয়মভঙ্গে যে একটু পীড়া আছে সেই পীড়াটুকু না থাকিলে আমোদ হইতে পারে না। আমোদ জিনিসটা নিত্য-নৈমিত্তিক সহজ নিয়মসঙ্গত নহে ; তাহা মাঝে মাঝে এক-এক দিনের ; তাহাতে প্রয়াসের আবশ্যক। সেই পীড়ন এবং প্রয়াসের সংঘর্ষে মনের যে-একটা উত্তেজনা হয় সেই উত্তেজনাই আমোদের প্রধান উপকরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৌতুক হাস্যের মাত্রা (পঞ্চভূত)

কলি যখন সর্বনাশ করে তখন আমোদ করতে করতেই করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিত্রাণ—১/৩

আয়না

রাজার চারিদিকে যে-সকল মনুষ্য আয়না.....তাহাতে তিনি মুখ ঠিক দেখিতে পান না, শরীরের পরিমাণ অত্যন্ত বড়ো দেখায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বউঠাকুরানীর হাট—৭পরিঃ

আয়ু

পৃথিবীতে ঢের দিন বেঁচে থেকে আমাদের আয়ু
এখন মৃত্যুর শব্দ শোনে দিনমান।

জীবনানন্দ দাশ ঃ বিভিন্ন কোরাস ১ (সাতটি তারার তিমির)

মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর?

জীবনানন্দ দাশ : সময়ের কাছে (সাতটি তারার তিমির)

......দীর্ঘ আয়ু দীর্ঘ অভিশাপ,
বিচ্ছেদের তাপ নাশে সেই বড়ো তাপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিশেষ, সং। অতুলপ্রসাদ সেন

আয়োজন

আয়োজনটি অতি সুন্দর.......। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখির গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সমাপ্তি (গল্পগুচ্ছ)

আর

অথর্ববেদ বলেছেন, এই আরও'র দিকে, এই ছাড়িয়ে যাবার দিকে মানুষের শ্রী, তার ঐশ্বর্য, তার মহত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানুষের ধর্ম—দুই

আরকিটাইপ

আরকিটাইপ : বাংলা প্রতিশব্দ 'আদিরূপ'। মূল গ্রিক arche অর্থাৎ আদি/মূল এবং typos অর্থাৎ রূপ। বাংলায় 'প্রত্ন-প্রতিমা'ও বলা হয়ে থাকে। কোনও প্রতীক, বিষয়, পটভূমি অথবা আদর্শ চরিত্র, বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন স্থানে, মিথ-এ, সাহিত্যে, লোকচর্যায়, স্বপ্নে এবং লোকাচারে এমন উজ্জ্বলভাবে বা ঘনঘন ব্যবহৃত হয় যাতে মনে হয় যে এটিই সার্বজনীন মানবিক অভিজ্ঞতার মূল স্বরূপ বা আদিরূপ। (মিথ সমালোচনায় গোলাপ, সর্প বা সূর্যের ব্যবহার)।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যের শব্দার্থকোশ

আরতি

কানুর পিরীতি যতেক আরতি
যাইলে জানিবা তুমি।

চণ্ডীদাস : বৈষ্ণব পদাবলী

দেবতার প্রতিকৃতির সম্মুখে প্রদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, বস্ত্র, পুষ্প এবং চামরাদি আবর্তনে দেবতাকে প্রীত ও সংবর্ধিত করবার যে অনুষ্ঠান তাকেই আরাত্রিক বলে। আরাত্রিকের অপর নাম 'নীরাজন', প্রচলিত ভাষায় আরতি। আরাত্রিক মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে শাস্ত্রে আছে ;

মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং যৎকৃতং পূজনং হরেঃ।
সর্বং সম্পূর্ণতামেতি কৃতে নীরাজনে শিবে॥

—দেবদেবের নীরাজন করলে, যে-কোন পূজা তা মন্ত্রবর্জিত হোক আর ক্রিয়াবর্জিতই হোক, ফলবতী হবে। যে ব্যক্তি নীরাজন দ্বারা শ্রীভগবানের পূজা করেন তিনি ইহলোক এবং পরলোক—উভয় লোকেই মুক্তিপ্রাপ্ত হন।

স্বামী প্রমেয়ানন্দ : পূজা-বিজ্ঞান

তাঁহারে আরতি করে চন্দ্র তপন, দেব মানব বন্দে চরণ—
আসীন সেই বিশ্বশরণ তাঁর জগতমন্দিরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রহ্মসঙ্গীত.

আরশি নগর

আমি একদিন না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ীর কাছে আরশি নগর
এক পড়শী বসত করে॥

লালন সাঁই ঃ গান

আরশি নগরে পড়শি বসত করে।
ধান ভেসে গেছে, মানুষ মড়কে মরে॥......
জলে ভাসে ঘর—সান্ত্বনা দরকার।
কাপড় অন্ন নিয়ে উড়ে যায় প্লেন,
তারায়-তারায় অনন্ত শাদা রোদ,
গুণতে পারিনে আর।
গণক প্রেমিক ভিক্ষুক গুলজার
রূপসী শহর—কোথায় আরশি তার?

আরশি নগর ঃ রমেন্দ্রকুমার আচার্যচৌধুরী

আরাম

আরাম হতে ছিন্ন করে
সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায়
শান্তি সুমহান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি ৭৪

তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা
এবার সকল অঙ্গ জুড়ে পরাও রণসজ্জা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা-৪

জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রায়শ্চিত্ত (নবজাতক)

আরোগ্য

বিশ্বসংসারে আরোগ্যলাভই হল শ্রেষ্ঠ লাভ। যক্ষরূপী ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে যে-সব প্রশ্ন করেছিলেন তার মধ্যে একটি প্রশ্ন ছিল—লাভানামুত্তমং কিম—? সংসারের লাভের মধ্যে সর্বোত্তম লাভ কী? যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—লাভানাং শ্রেয় আরোগ্যম্ অর্থাৎ আরোগ্যলাভই সংসারের শ্রেষ্ঠ লাভ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আরোগ্য-নিকেতন

আর্ট

মানুষের আর্টও কোথাও কখনো পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠে না। মানুষ জানে সে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি। গ্রীস, ভারত, চীন, ঈজিপ্ট সবাই দেখি পরম সুন্দরের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা কেউ পায়নি। কেবল পেতে চাওয়ার দিকেই চলেছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৌন্দর্যের সন্ধানে

সামনে আশেপাশে নানা দিক থেকে পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্য দিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চিরযৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন-নতুন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৌন্দর্যের সন্ধানে

এ যুগের ডেমোক্রাটিক আত্মা আর্টকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে; সম্ভবত মনে মনে হিংসাও করে ; বোধ হয় এই কারণে যে, আর্টের গায়ে আভিজাত্যের ছাপ চিরস্থায়ী রূপে বিরাজ করে।

প্রমথ চৌধুরী : বই পড়া

প্রবল আঘাতের দ্বারা হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংযমের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতায় লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য।.....বাস্তবকে চোখ দিয়া দেখি, আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই। মন দিয়া দেখিতে গেলেই চোখের সামগ্রীর দৌরাত্ম্যকে খর্ব করিতেই হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অন্তর বাহির (পথের সঞ্চয়)

তারে বলে আর্ট
　　　না-বলা যাহার কথা ;
ঢাকা খুলে বলা
　　　সে কেবল বাচালতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গরঠিকানি (প্রহাসিনী)

এক পাখি ভোগ করে, আর এক পাখি দেখে। যে-পাখি ভোগ করে সে নির্মাণ করে, যে-পাখি দেখে সে সৃষ্টি করে।......ভোগী পাখি যে-সমস্ত উপকরণ নিয়ে কাজ করছে তা প্রধানত বাইরের উপকরণ, আর দ্রষ্টা পাখির উপকরণ হচ্ছে আমি-পদার্থ। এই আমির প্রকাশই সাহিত্য, আর্ট। তার মধ্যে কোন দায়ই নেই, কর্তব্যের দায়ও না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপান যাত্রী ২

ইংরেজি ভাষায় ক্যারেকটার শব্দের একটা অর্থ স্বভাব, নৈতিক চরিত্র ; আর একটা অর্থ চরিত্ররূপ। অর্থাৎ, এমন কতকগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়।....এইরকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম। নাট্যে কাব্যে চিত্রে নৈতিক সদগুণের চেয়ে এই ক্যারেকটারের মূল্য বেশি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়রি

আর্টে আমরা গুণবানকে চাই নে, রূপবানকে চাই। এখানে রূপবান বলতে সুন্দরকে বলছি নে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান ভাঁড়ুদত্ত।....বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে, সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ বলে। সুপ্রত্যক্ষ বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়রি

আর্টের প্রধান তত্ত্ব তার পরিমিতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পারস্যে

এখনকার লোকে... রস চায় না মদ চায়, আনন্দ চায় না আমোদ চায়। চিত্তের জাগরণটা তাদের কাছে শূন্য, তারা চায় চমক-লাগা।....আর্ট তো চীৎকার নয়, তার গভীরতম পরিচয়......আত্মসংবরণে।.....আর্ট আজ আপনার শ্রী ও হ্রী বিসর্জন দিয়ে নৃত্য ভুলে পাঁয়তারা মেরে বেড়াচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম যাত্রীর ডায়রি

আর্টের প্রমাণ রুচির পথে, সে রসিক লোকের প্রাইভেট পথ। সে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবিবার (তিনসঙ্গী)

মানুষ বিশ্বসংসারে যাহা ভালোবাসে, আর্টের দ্বারা তাহার স্তব করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শুভবিবাহ (আধুনিক সাহিত্য)

আর্ট ত চিরকাল এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না ; সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রীতিনীতির পরিবর্তন হয়।

সত্যজিৎ রায় ঃ গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্টেট

আলকাপ

'আল' প্রাচীন বাংলা শব্দ। অর্থ রঙ্গরস, 'কাপও' তাই, অর্থ কৌতুক নাটিকা। আলকাপের অর্থ রঙ্গরসাত্মক নাটিকা ; বাংলা ভাষায় এ ধরনের সমার্থক শব্দজোড় সুপরিচিত যেমন ঘরবাড়ী, খাটপালঙ্ক, সাজপোষাক, তবে আক্ষরিক অর্থে আলকাপ রঙ্গরসাত্মক নাটিকা হলেও শব্দটির সামাজিক অর্থ হলো রঙ্গব্যঙ্গাত্মক নাটিকা।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ আলকাপ নাট্যরীতি ও থার্ড থিয়েটার

আলস্য

আলস্য এক সংক্রামক ব্যাধি।

অভিজিৎ তরফদার ঃ সহযাত্রী

আলস্যে রাখিলে কর্ম পুনঃ হওয়া ভার।

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড)

আকাশের কোণে কোণে
সাদা মেঘের আলস্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছুটির আয়োজন (পুনশ্চ)

আলস্য সংক্রামক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নকলের নাকাল (সমাজ)

আলো

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা।

জীবনানন্দ দাশ ঃ ঘাস

আলো, আমার আলো, ওগো আলো ভুবনভরা।
আলো, নয়ন ধোয়া, আমার আলো হৃদয়হরা।.....
নাচে আলো নাচে, ও ভাই আমার প্রাণের কাছে—
বাজে আলো বাজে, ও ভাই, হৃদয়বীণার মাঝে—
জাগে আকাশ, ছোটে বাতাস, হাসে সকল ধরা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অচলায়তন

তখন তোমার ঘোমটা-খোলা
কালো চোখের কোণে
কাঁপে কিসের আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অনাহত (খেয়া)

রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অভিসার (কথা)

সব সুখজালে বজ্র জ্বালালে
সেই আলো মোর সেই আলো।....
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
সেই আলো মোর সেই আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৪১

সেতারের দ্রুত তালের বাজন যেন
পাতায় পাতায় আলোর চমক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালরাত্রে (শ্যামলী)

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে॥
সব আলোটি কেমন ক'রে ফেল আমার মুখের 'পরে,
তুমি আপনি থাকো আলোর পিছনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলেখা

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো।
বিরহানলে জ্বালো রে তারে জ্বালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—১৭

এই তো তোমার প্রেম, ওগো
হৃদয়হরণ।
এই-যে পাতায় আলো নাচে
সোনার বরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৩০

আকাশ হতে প্রভাত-আলো
আমার পানে হাত বাড়ালো,
ভাঙা কারার দ্বারে আমার
জয়ধ্বনি উঠল রে, এই উঠল রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৩৭

আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ানো দিক-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের নিবিড় কালো জল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৪৮

পূর্বদিকের তোরণ খুলে
নাম ডেকে যায় প্রভাত-আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতালি—৯৪

পূর্বদিকে তখন নিদ্রিত মুখের হাসির মতো একটুখানি আলোকের আভাস দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা

সন্ধ্যা হয়ে আসে ;
সোনা-মিশোল ধূসর আলো ঘিরল চারিপাশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরের খেয়া (ছড়ার ছবি)

বাহির আকাশে মেঘ ঘিরে আসে
এল সব তারা ঢাকিতে

হারানো সে আলো আসন বিছালো
শুধু দুজনের আঁখিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা

ছুটিল গোধূলিবেলা তন্দ্রালু আলোকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্মদিন (সেঁজুতি)

আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ-ঢাকা বধূ সেজে,
গলায় পরিয়া হার
বুদবুদ মণিকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্মদিনে-১১

অস্তগত তপনের সর্বশেষ আলোর মতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জরতী (পরিশেষ)

দিনের শেষে শেষ আলোটি পড়েছে ঐ পারে
জলের কিনারায়,
পথে চলতে বধূ যেমন নয়ন রাঙা করে
বাপের ঘরে চায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দিঘি (খেয়া)

নীল আলো প্রেয়সীর আঁখিপ্রান্ত হতে
নিয়ে যায় চিত্ত মোর অকূলের অবারিত স্রোতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দূরের গান (সানাই)

শেষরাত্রের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া
আলোর আড়-চাহনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দ্বৈত (শ্যামলী)

চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিরুদ্দেশ যাত্রা (সোনার তরী)

মুক্ত নীলাম্বরে
অচ্ছায় আলোক গাহে বৈরাগ্যের স্বরে
যে ভৈরবী গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—৭৩

আকাশ তখন বিদায়োন্মুখ আলোকের আলিঙ্গনে পাণ্ডুবর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৌকাডুবি—১৬

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথের বাঁধন (মহুয়া)

বিকেলের প্রৌঢ় আলোয় বৈরাগ্যের ম্লানতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পুকুর ধারে (পুনশ্চ)

দূর আকাশের ছায়াপথে
যে আলোক আসে নামি ধরণীর শ্যামল ললাটে
সে তোমার চক্ষু চুম্বি তোমারে বেঁধেছে অনুক্ষণ
সখ্যডোরে দ্যুলোকের সাথে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—১৩

সকাল বেলাকার আলো কানে কানে বললে,—সাবাস, এগিয়ে চলো ; বিকেল বেলাকার আলো তাই নিয়ে ভারি ঠাট্টা করছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী—৩য় দৃশ্য

ওগো, এমন সোনার মায়াখানি
কে যে গড়েছে!
মেঘ টুটে আজ প্রভাত-আলো
ফুটে পড়েছে।
বাতাস কাহার সোহাগ মাখে
গাছে-পালায় চমক লাগে,
হৃদয় আমার বিভাস রাগে
কী গান ধরেছে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষাপ্রভাত (খেয়া)

ঝোড়ো মেঘের বুকভাঙা সূর্যাস্তের রাগী আলোর মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাঁশরি ২/১

শঙ্কিত আলোক নিয়ে দিগন্তে উদিল শীর্ণ শশী—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিরহ (মহুয়া)

মরমের আলো কপোলে ফুটিবে
শরম-অরুণ-রাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মায়ার খেলা—৩

বৃদ্ধ তেঁতুলগাছ তার চিরচঞ্চল পাতাগুলো দিয়ে সূর্যের আলো চূর্ণচূর্ণ করে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ—৩৩

সূর্যের আলো হয়ে আকাশপূর্ণ একটি পরম স্পর্শ....অভিনন্দিত করলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ—৩৩

সকালে ফুলের বনে যে আলো আসে তাতে বিস্ময় নেই, কিন্তু পাকা দেওয়ালের ফাটল দিয়ে যে আলো আসে সে আর-এক কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

এই পূর্ণিমার আলো মদের ফেনার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা—৪

যেন চলে যেতে পারি নিরাসক্ত মনে
বৈরাগী সে সূর্যাস্তের গেরুয়া আলোয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রোগশয্যায়—১

অল্প কিছু আলো থাক্,
অল্প কিছু ছায়া
আর কিছু মায়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রোগশয্যায়—৪

মাটির প্রদীপখানি আছে
মাটির ঘরের কোলে,
সন্ধ্যাতারায় তাকায় তারই
আলো দেখবে বলে।
সেই আলোটি নিমেষহত,
প্রিয়ার ব্যাকুল চাওয়ার মতো,

সেই আলোটি মায়ের প্রাণের
ভয়ের মতো দোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লিপিকা— স্বর্গ-মর্ত্য

ভোরের ভাঙা ঘুমে শুকতারার আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লিপিকা—সতেরো বছর

শুকতারা মনে করে শুধু একা মোর তরে
অরুণের আলো।
ঊষা বলে, "ভালো, সেই ভালো"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

আলো কেবল একটিমাত্র কথা প্রতিদিন আমাদের বলছে—"দেখো" বাস্। "একবার চেয়ে দেখো।" আর কিছুই না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—দেখা

শুধু তাঁর আলোতেই তাকে দেখব এ যদি হত তাহলে সহজেই চুকে যেত—কিন্তু এইটুকু কড়ার তিনি আমাদের দিয়ে করিয়ে নিয়েছেন যে, আমাদের আলোটুকুও জ্বালতে হবে.....। অহংকারের আগুন জ্বেলে আমরা মহোৎসবের মশাল তৈরী করব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—৭ই পৌষের উৎসব

পাঁজিতে দেখা গেল তিথিটা পূর্ণিমা, এদিকে চাঁদ মেরেছেন দৌড়, পাছে কেউ বলে বসে তাঁর আলো ঝাপসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ বর্ষণ

ফুরিয়ে গেল পৌষের দিন ;
কৌতূহলী ভোরের আলো
কুয়াশার আবরণ দিলে সরিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষসপ্তক—তিন

অন্ধকারের উপরকার ঢাকা খুলে আসছে,
বেরিয়ে আসছে কোমল আলো
নতুন-ফোটা কাঁটালিচাঁপার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষসপ্তক—৪৬

ম্লান মূর্চ্ছাতুর আলো—রোদন-অরুণ
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শৈশবসন্ধ্যা (সোনার তরী)

আশ্বিনের আলো
বাজাল সোনার ধানে ছুটির সানাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্যামা (আকাশপ্রদীপ)

"আলো" "আলো" খুঁজে মরি পরের নয়নে,
"আলো" "আলো" খুঁজে খুঁজে কাঁদি পথে পথে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সত্য (কড়ি ও কোমল)

আলো তার পদচিহ্ন
আকাশে না রাখে—
চলে যেতে জানে, তাই
চিরদিন থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—৩৩

ঘরে যদি আলো না জ্বলে, সেটি দারিদ্র্যের চিহ্ন। তাই হৃদয় মধ্যে জ্ঞানের আলো জ্বালতে হয়। ‘জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না’।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সমুদ্রের তলদেশের অন্ধকারে ডুব দিয়েই ঝকঝকে মুক্তো তুলে আনেন তো ডুবুরী। তেমনই অন্ধকারের উৎস থেকেই মানুষকে খুঁজে নিতে হয় যথার্থ আলো—যে-আলো পথের সন্ধান দেয়, চক্ষে ধাঁধা লাগিয়ে দেয় না। বাস্তবকে অতিক্রম করে জীবনের সত্যকে যিনি সন্ধান করেন তাঁকে ঐ অন্ধকারনিমগ্ন স্তব্ধতায় নিজেকে সমর্পণ করতে হয়।

শাঁওলী মিত্র ঃ ত্রস্ত সময় ধ্বস্ত সংস্কৃতি

আলো মঞ্চের উপর ব্যবহৃত হয় (ক) মঞ্চের উপরস্থ বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখাবার জন্য, (খ) প্রাকৃতিক অবস্থার অনুকরণের ভিতর দিয়ে সময়, ঋতু, ও আবহাওয়া বোঝানোর কাজে, (গ) ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ও বর্ণবিন্যাসের মাধ্যমে মঞ্চের উপরে চিত্রসৃষ্টির উপাদান হিসাবে এবং বস্তু ও ব্যক্তির ঘনত্ব বোঝানোর কাজে, (ঘ) সহজে কালান্তর, স্থানান্তর ও অবস্থান্তর প্রভৃতি বোঝানোর জন্য, এবং (ঙ) ঘটনার অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক রসের সন্ধান দিতে।

অমর ঘোষ ঃ পট দীপ ধ্বনি

আলো যেন দীপ-চিত্রণ শিল্পীর হাতে একটি যাদুদণ্ড-বিশেষ। বিভিন্ন বর্ণ মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার ক্ষমতা, প্রাখর্য এবং পরিবেশনে পরিবর্তন সাপেক্ষতা এবং সবার উপরে এর প্রক্ষেপণ-ধর্মিতা আলোকে করে তুলেছে একটি অতি শক্তিশালী হাতিয়ার।

অমর ঘোষ ঃ পট দীপ ধ্বনি

আলো ও শব্দ—দৃশ্যনাটক ও শ্রব্যনাটক ঃ

দেখা দুইটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—আলো ও শব্দ। আলো না পড়লে কোনো বস্তুই দৃশ্যমান নয়। অন্ধকার দৃশ্যেও খুব মৃদু আলো দেওয়া দরকার যাতে দৃশ্যের ঘটনাবলী দর্শকের চোখে পড়ে। দৃশ্যনাটকে দর্শক দেখতে চায়। সেই দেখার জন্য কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা। সেই আলোর নানারূপ নিয়ন্ত্রণ করে আলো ও ছায়ার মায়াজাল সৃষ্টি করে দৃশ্য বস্তুকে যথাযথ না দেখিয়ে তার শিল্পিত রূপই দর্শকদের দেখানো হয়। একটি চরিত্রকে পুরোপুরি না দেখিয়ে তার দেহের কোনো অংশ আলোকিত করে এবং অন্য অংশ অন্ধকারে রেখে তাকে আলোর পরিচালক একটি শিল্পমূর্তিকেই দেখিয়ে থাকেন। দৃশ্য নাটকের আর একটি নির্ভরতা শব্দের উপর। নামে দৃশ্যনাটক কিন্তু শ্রব্যতা বাদ দিলে তার চলে না। শব্দহীন দৃশ্যবস্তু নিস্তেজ, নিষ্প্রাণ, বর্ণহীন, তা মনে সাড়া জাগায় না, আবেগ উত্তেজনায় চঞ্চল করে তোলে না। বাক্যহীন অভিনয় হল মূকাভিনয়, কিন্তু মূকাভিনয়ও শুধু মাত্র দৃশ্যরূপে দর্শকদের আকর্ষণ করতে পারে না, তার জন্য চাই অর্থবহ সঙ্গীত ও উত্তেজনা জাগানো শব্দ। দৃশ্যনাটকে বাচিক অভিনয় তো আছেই, সেই সঙ্গে আছে সঙ্গীত—কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত এবং আরো আছে নেপথ্যসঙ্গীত। এই বাক্য ও সঙ্গীতের সহযোগিতায় দৃশ্যনাটক দর্শকের সামনে উপস্থাপিত হয়। শব্দে, সঙ্গীতে, উচ্চারিত বাক্যে এবং অভিব্যক্তিতে চিত্তে রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাঁপন জাগে, অণুপরমাণুতে লাগে আবেগের স্পন্দন, গতিবেগের উত্তেজনায় মেতে ওঠে নাট্যমগ্ন সত্তা।

শ্রব্যতা কিন্তু স্বাধীন, অন্যকিছুর পরে তার নির্ভরতা নেই। তা নিরবচ্ছিন্ন নিরবয়ব, নিরাভরণ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শব্দতরঙ্গ ভেসে চলেছে, অনির্বচনীয় বাণী সেই তরঙ্গপ্রবাহে ভেসে বেড়ায়, অনাহত সঙ্গীত তরঙ্গে তরঙ্গে বেজে চলে। সেই বাণী

ও সঙ্গীত কিছু কিছু ধরে রাখার চেষ্টা সসীম মানুষের। সঙ্গীত আমাদের অজানা উর্ধ্বলোকে নিয়ে যায়, বাক্য অরূপ অমূর্ত, কিন্তু বাক্য শূন্যতার মধ্যে ছবি এঁকে চলে। শব্দ ও সঙ্গীত নিয়ে যে নাটক তা শ্রুতিনাটক। নাটকের কথা আসছে, সুর আসছে কানে, সেগুলির মনের পটে ছবি হয়ে যাচ্ছে। ছবির পর ছবি। কানে যা শুনছি তাই মনের চোখে মূর্ত হয়ে যাচ্ছে। শ্রব্য অবিরাম দৃশ্য হয়ে চলেছে। রেডিওতে যখন নাটক শুনি তখন আমাদের মনের চোখ সেই নাটককে দৃশ্য করে চলে। রেডিও আমাদের কল্পনায় মুক্তি দেয়। ভাবনাকে সক্রিয় করে তোলে।

অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ

আল্লা/আল্লাহ

আল্লা নামের নায়ে চড়ে যাব মদিনায়।
মোহাম্মদের নাম হবে মোর
(ও ভাই) নদী-পথে পুবাল বায়॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (ইসলামী)

আল্লাহ্ আমাদের প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়॥
আমার কিসের শঙ্কা,
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়॥

নজরুল ইসলাম ঃ গান (ইসলামী)

আশা

ধন্য আশা কুহকিনি ! তোমার মায়ায়
মুগ্ধ মানবের মন, মুগ্ধ ত্রিভুবন!
দুর্ব্বল মানব-মনোমন্দিরে তোমায়
যদি না সৃজিত বিধি ; হায়! অনুক্ষণ
নাহি বিরাজিতে তুমি যদি সে মন্দিরে—
শোক, দুঃখ, ভয়, ত্রাস, নিরাশ প্রণয়,
চিন্তার অচিন্ত্য অস্ত্র নাশিত অচিরে
সে মনোমন্দির শোভা। পলাত নিশ্চয়
অধিষ্ঠাত্রী জ্ঞানদেবী ছাড়িয়া আবাস ;
উন্মত্ততা ব্যাঘ্ররূপে করিত নিবাস!

নবীনচন্দ্র সেন ঃ পলাশীর যুদ্ধ (২/১১)

ধন্য, আশা কুহকিনি! তোমার মায়ায়
অসার সংসারচক্র ঘোরে নিরবধি!
দাঁড়াইত স্থিরভাবে, চলিত না হায়!
মন্ত্রবলে তুমি চক্র না ঘুরাতে যদি!
ভবিষ্যৎ-অন্ধ মূঢ় মানব সকল
ঘুরিতেছে কর্ম্মক্ষেত্রে বর্ত্তুল আকার
তব ইন্দ্রজালে মুগ্ধ ; পেয়ে তব বল
যুঝিছে জীবন-যুদ্ধ হায়! অনিবার।
নাচায় পুতুল যথা দক্ষ বাজিকরে,
নাচাও তেমতি তুমি অর্ব্বাচীন নরে।

নবীনচন্দ্র সেন ঃ পলাশীর যুদ্ধ (২/১২)

আশাই দুঃখের মূল। যত পাপ কৃত হয়, সকলই লাভের আশায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চন্দ্রশেখর

যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায় না ; আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিষবৃক্ষ

আশা আর বাসা ছোট করতে নেই। **বাংলা প্রবাদ**

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে ধায়,
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত : আত্ম-বিলাপ

বহুদিন মনে ছিল আশা
ধরণীর এক কোণে
রহিব আপন মনে ;—
ধন নয়, মান নয়, এতটুকু বাসা
করেছিনু আশা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আশা (পূরবী)

নিজের মন তো দেবার আশা
চুকেই গেছে
পরের মনটি পাবার আশায়
রইনু বেঁচে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসৃষ্ট (ক্ষণিকা)

আশা হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে
হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা—১

ওরে ভয় নাই, নাই স্নেহমোহবন্ধন—
ওরে আশা নাই, আশা শুধু মিছে ছলনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুঃসময় (কল্পনা)

আশা করিয়া থাকাই একটা নেশা—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দেশনায়ক (সমূহ)

আশাকে ত্যাগ করলেও সে প্রগলভা নারীর মতো ফিরে ফিরে আসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা—১৫

আশা করিবার ক্ষেত্র বড়ো হইলেই মানুষের শক্তিও বড়ো হইয়া বাড়িয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথের সঞ্চয় (লক্ষ্য ও শিক্ষা)

আশা যতোই বড়ো, ততই বড়ো তার বাধা ভিতরে বাইরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ল্যাবরেটরি (তিন সঙ্গী)

আশার আর এক নাম বোধ হয় মরীচিকা।

সমরেশ বসু : শুভ্রা সন্ধ্যা সংবাদ

আশ্বাস

উন্মুখ ভিক্ষুক বোধ হয় মরে গেলেও আশ্বাসের মন্ত্রে বেঁচে ওঠে। নয়তো পৃথিবীতে এত মানুষ আজও বেঁচে আছে কেন?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : যে বাঁচায়

আশীর্বাদ

এই আশীর্বাদ করো, জয়পরাজয়
ধরি যেন নম্রচিত্তে করি শির নত
দেবতার আশীর্বাদী কুসুমের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আশিস-গ্রহণ (চৈতালি)

ইহাদের করো আশীর্বাদ।
ধরায় উঠেছে ফুটি শুভ্র প্রাণগুলি
নন্দনের এনেছে সম্বাদ
ইহাদের করো আশীর্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আশীর্বাদ (শিশু)

আমি আশীর্বাদে সিকি-পয়সা বিশ্বাস করি না, কিন্তু তোমার ওই মুখখানি দেখিলে আমার আশীর্বাদ করিতে ইচ্ছা করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চতুরঙ্গ—জ্যাঠামশায়—৬

করো আশীর্বাদ
যখনি তোমার দূত আনিবে সংবাদ
তখনি তোমার কার্যে আনন্দিত মনে
সব ছাড়ি যেতে পারি দুঃখে ও মরণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—৭৩

জীবন দেবতা তব
দেহে মনে অন্তরে বাহিরে
আপন পূজার ফুল
আপনি ফুটান ধীরে ধীরে।
মাধুর্যে সৌরভে তারি
অহোরাত্র রহে যেন ভরি
তোমার সংসারখানি,
এই আমি আশীর্বাদ করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ফুলিঙ্গ—৯১

ভগবানের আশীর্বাদে বইতে পারে সকল ভারে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : কুহু ও কেকা

আশ্চর্য

আশ্চর্য জিনিষ? পৃথিবীতে আশ্চর্য খুঁজতে হয়?

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : রাণা প্রতাপ সিংহ

তোমার পাণ্ডিত্যে সকলে আশ্চর্য হয়ে যায়। কিন্তু তার চেয়ে ঢের বেশি আশ্চর্য হয় তুমি আমারই দাদা বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন—১

মানুষ যে বাঁচে এই আশ্চর্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপানযাত্রী

দীন প্রজা যত
চিরদিন কেটে গেছে অর্ধাশনে যার
আজও তার অনশন হল না অভ্যাস
এমনি আশ্চর্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—৪

ইহাই আশ্চর্য যে এত ঐশ্বর্য, এত প্রতাপের মাঝখানটিতে সমস্ত এমন সহজ, এমন আপন! ইহাই আশ্চর্য, পা তুলিতে ভয় হয় না, হাত তুলিতে হাত কাঁপে না। ইহাই আশ্চর্য যে এমন অভেদ্য রহস্যময় জ্যোতির্ময় লোক-লোকান্তরের মাঝখানে এই অতি ক্ষুদ্র মানুষের জন্মমৃত্যু সুখদুঃখ, খেলাধুলা কিছুমাত্র ছোটো নয়, সামান্য নয়, অসংগত নয়—সেজন্য কেহ তাহাকে একটুও লজ্জা দিতেছে না। সবাই বলিতেছে—তোমার ওইটুকু খেলা, ওই হাসিকান্নার জন্যই এত আয়োজন—ইহার যতটুকুই তুমি গ্রহণ করিতে পারো, ততটুকুই সে তোমারই ; যতদূর পর্যন্ত তুমি দেখিতেছ সে তোমারই দুই চক্ষুর ধন, যতদূর পর্যন্ত তোমার মন দিয়া বেড়িয়া লইতে পার সে তোমারই মনের সম্পত্তি। তাই এত বড়ো জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে আমার গৌরব ঘুচিল না—ইহার অন্তবিহীন ভারে আমার মাথা একটুও নত হইল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রোগীর নববর্ষ (সঞ্চয়)

পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৭

মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে,
না মরিব এই মনে, কি আশ্চর্য হায়!

রামমোহন রায় ঃ সঙ্গীত

সংসারে আশ্চর্য আছে বলেই ত মানুষের বাঁচা অসম্ভব হয়ে ওঠে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পথের দাবী

আশ্বিন

আশ্বিনের সন্ধ্যা জ্বলে
পাকা ধানে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বনময় নীলে
সোনালি হৃদয়ে হালকা হাওয়ায় সহজ মেঘের গায়ে
উন্মুক্ত উদার স্বচ্ছ শরৎ নিখিলে।

বিষ্ণু দে ঃ অন্বিষ্ট (অন্বিষ্ট)

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জগজনে।
ছাগ মেষ মহিষ দিয়া বলিদানে॥
উত্তম বসনে বেশ করয়ে বনিতা।
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিন্তা॥
কেহ না আদরে মাংস কেহ না আদরে।
দেবীর প্রসাদ-মাংস সবাকার ঘরে॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ চণ্ডীমঙ্গল

আকাশ আজিকে নির্মলতম নীল,
        উজ্জ্বল আজি চাঁপার বরন আলো,
সবুজে সোনায় ভূলোকে দ্যুলোকে মিল
        দূরে-চাওয়া মোর নয়নে লেগেছে ভালো।
ঘাসে ঝরে-পড়া শিউলির সৌরভে
        মন-কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে।
মালতীবিতানে শালিকের কলরবে
        কাজ-ছাড়া-পাওয়া ছুটির আভাস জাগে।
.......আজি আশ্বিনে প্রিয়-ইঙ্গিতসম
        নেমে আসে বাণী করুণ, কিরণ-ঢালা ;

চিরজীবনের হারানো বন্ধু মম,
এবার এসেছে তোমারে খোঁজার পালা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আশ্বিন (বীথিকা)

শিউলিফুলের নিশ্বাস বয়
ভিজে ঘাসের 'পরে,
তপস্বিনী উষার পরা পুজোর চেলির
গন্ধ যেন
আশ্বিনের এই প্রথম দিনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পয়লা আশ্বিন (পুনশ্চ)

আশ্বিনের আলো
বাজালো সোনার ধানে ছুটির সানাই।
চলেছে মন্থর তরী নিরুদ্দেশ স্বপ্নেতে বোঝাই॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্যামা (আকাশপ্রদীপ)

আষাঢ়

আষাঢ়ে পূরিল মহী নব-মেঘে জল।
বড় বড় গৃহস্থের টুটিল সম্বল॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ চণ্ডীমঙ্গল

কার অভিমানে এমন ফাগুনে ঘনাল বরষা আজি—
কে মানিনী আজ, ফেলি' ফুলসাজ এলাল চিকুররাজি!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ অভিমান

আষাঢ়, কোথা হতে আজ পেলি ছাড়া।
মাঠের শেষে শ্যামল বেশে ক্ষণেক দাঁড়া॥
জয়ধ্বজা ওই-যে তোমার গগন জুড়ে।
পুব হতে কোন পশ্চিমেতে যায় যে উড়ে,
গুরু গুরু ভেরী কারে দেয় যে সাড়া॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা—১

বজ্রমানিক দিয়ে গাঁথা, আষাঢ়, তোমার মালা।
তোমার শ্যামল শোভার বুকে বিদ্যুতেরই জ্বালা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমালিকা—২

এসেছে এসেছে এই কথা বলে প্রাণ,
এসেছে এসেছে উঠিতেছে এই গান,
নয়নে এসেছে, হৃদয়ে এসেছে ধেয়ে।
আবার আষাঢ় এসেছে আকাশ ছেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৯৯

বহুযুগের ওপার হতে আষাঢ় এল আমার মনে,
কোন সে কবির ছন্দ বাজে ঝরো ঝরো বরিষনে।
যে মিলনের মালাগুলি ধুলায় মিশে হল ধুলি
গন্ধ তারি ভেসে আসে আজি সজল সমীরণে।
সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,
এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে।
মালবিকা অনিমিখে চেয়েছিল পথের দিকে,
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা-২। বহুযুগের ওপার হতে

প্রথম মিলনদিন, সে কি হবে নিবিড় আষাঢ়ে,
যেদিন গৈরিক বস্ত্র ছাড়ে
আসন্নের আশ্বাসে সুন্দরা
বসুন্ধরা?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (লগ্ন) মহুয়া

তেমনি এই-যে সোনায় পান্নায় ছায়ায় আলোয় গাঁথা।
অবকাশের নেশায় মন্থর আষাঢ়ের দিন
বিহ্বল হয়ে আছে মাঠের উপর ওড়না ছড়িয়ে দিয়ে,.......
এ আকাশবীণায় গৌড়সারঙের আলাপ,
সে আলাপ আসছে সর্বকালের নেপথ্য থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (সুন্দর) পুনশ্চ

আসল

আসল ব্যাপারগুলি ঠিক ঠিক জানা চাই—তলে তলে কারা সব
সুড়ঙ্গ কাটছে, কারা যুদ্ধ বাধানো এবং থামানোর ফাঁকে ফাঁকে
সোনায়-বাঁধানো দাঁত বার করে হাসছে, কাদের হাতে থানা পুলিশ
স্টক এক্সচেঞ্জ উৎপাদন এবং বাজার, কাদের হাতে মন্ত্রী মন্দির
মিলিটারী অস্ত্রকারখানা মসজিদ গীর্জা জুয়া এবং ভাটিখানা,—এসব জানা চাই,
জানা চাই
হঠাৎ মাঝরাতে কেন দোরগোড়ায় ভ্যান থেমে যায়,
আর সার্ভিস রিভলভার গর্জে ওঠে।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য : এই বইয়ের কম্পোজিটারকে

আসল কথা কি, ভালো নয় থাকা
মেয়েমানুষের এতগুলো টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লক্ষ্মীর পরীক্ষা

আস্ত

আস্ত পাওয়াটাই সবচেয়ে ভালো ; নিতান্তই যদি তা না সম্ভব হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে বাইরে—বিমলার আত্মকথা

আজকালকার দিনে আস্তে বললে শোনে কে? এখন চেঁচিয়ে কথা কইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—১/২

আহাম্মক

আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান।

স্বামী বিবেকানন্দ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

আহ্বান

যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বানগীত ছুটেছে যে নির্ভীক পরাণে
সংকট আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : এবার ফিরাও মোরে (চিত্রা)

ধ্বনিল আহ্বান মধুর গম্ভীর প্রভাত-অম্বর মাঝে,
দিকে দিগন্তরে ভুবনমন্দিরে শান্তিসঙ্গীত বাজে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

'এসো মোর কাছে'
শুকতারা গাহে গান।
প্রদীপের শিখা নিবে চলে গেল,
মানিল সে আহ্বান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—৪৪

আহার

আহারের উপর আসক্তি, তার জন্য লোভ ও ব্যগ্রতা, জীবনের মধ্যে তাকে একটা অত্যধিক বড় জিনিষ করে তোলা—এ হল যোগবৃত্তির বিরোধী।......যোগী আহার করে বাসনার বশে নয়, শরীর ধারণের জন্য।

শ্রীঅরবিন্দ ঃ যোগসাধনার ভিত্তি

বাহ্য জগৎ হতে যা আহৃত হয়, ইন্দ্রিয়দ্বারা যা গৃহীত হয় ও শরীরের পুষ্টির জন্য যা গৃহীত হয় তা শারীর আহার। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে 'আহারের শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি, বুদ্ধির নির্মলতা' (আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ)।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ঃ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার।
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার॥

ভারতচন্দ্র রায় ঃ অন্নদামঙ্গল

ইংরেজ

ইংরেজ এত অধিক সভ্য হইয়াছে যে, আমাদের সহিত সভ্যতা রক্ষা করা সে বাহুল্য জ্ঞান করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অপমানের প্রতিকার (রাজাপ্রজা)

ঢেঁকি যেমন স্বর্গেও ঢেঁকি, তেমনি ইংরেজ সর্বত্রই খাড়া ইংরেজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ইংরেজ ও ভারতবাসী (রাজাপ্রজা)

.....আমি ইংরেজকেও জানি। যত পশ্চিমী জাত আছে তার মধ্যে ওরা সব-চেয়ে বড়ো জাত। রিপুর তাড়ায় ওরা যে মারতে পারে না তা নয় কিন্তু পুরোপুরি পারে না—লজ্জা পায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায়—১

যে বড়ো-ইংরেজ ষোলা-আনা মানুষ......সে থাকে সমুদ্রের ওপারে,......এপারে পাড়ি দিতেই প্রয়োজনের কাঁচিকলের মধ্যে আপনার বারো-আনা ছাঁটিয়া সে একটুকু ছোট হইয়া বাহির হইয়া আসে।

.....এই বড়ো-ইংরেজ স্থির নাই, সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।......সে সৃজনধর্মী ; যুরোপীয় সভ্যতার বিরাট যজ্ঞে সে একজন প্রধান হোতা।

.....কিন্তু ছোট-ইংরেজ অগ্রসর হইয়া চলে না।.......তার জীবনের একপিঠে আপিস, আর একপিঠে আমোদ।........তারা মনে করে তাদের আপিসটা সুনিয়মে চলিতেছে, এইটেই বিশ্বের সব-চেয়ে বড়ো ঘটনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছোটো ও বড়ো (কালান্তর)

আমাদের.......বিচারবুদ্ধি ইংরেজ-বাড়ির বুল্‌ডগের মতো—ধুতির কোঁচাটা দুলছে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোন্‌টা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তক্‌মা দেখলে লেজ নাড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১২

ইংরেজ কবি হুড্‌ জিরাফ জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "So very lofty in thy front, but then/So dwindling at the tail." ইংরেজ-জিরাফের লাঙ্গুলের দিকটা পরজাতির দিকে......।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সমূহ, পরিশিষ্ট। (প্রসঙ্গ কথা-২)

ভারতবর্ষের বড়ো পরিচয়টা ভারতবর্ষের ইংরেজ লাভ করে না।........ আমরা তাহাদের বাজারের খরিদ্দার, আপিসের কেরানি, ব্যারিষ্টারের বাবু, আদালতের আসামি-ফরিয়াদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্টপফোর্ড ব্রুক (পথের সঞ্চয়)

ইংরেজি

সাহেব যদি হাসিয়া বলিয়া বসে, বাঃ বাবু, তুমি তো ইংরেজি মন্দ বল না, তাহার পর হইতে বাংলার চর্চা করা আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ইংরেজ ও ভারতবাসী (রাজাপ্রজা)

গাল দেবার আবেগ যখন তীব্র হয়ে ওঠে তখন তার ভাষাটা হয় ইংরেজি,......যখন উপদেশের ভাষাটা হয় অত্যন্ত উচ্চ শ্রেণীর, ইংরেজিই তখন তার বাহন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুই বোন

কেবল ইংরেজি শিখিয়াই আমরা যেন ইংরেজের মহত্ত্বকে কতকটা আপনার বলে মনে করি......ইংরেজের মহত্ত্ব যে ঐতিহাসিক, তাহা যে বংশপরম্পরাগত, কর্ম্মগত, চরিত্রগত ; — ইংরেজের ভাষা সাহিত্য বিজ্ঞান যে সেই ইতিহাস, সেই চরিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ; তাহা যে সুদ্ধমাত্র স্কুলে অধ্যয়ন এবং পরীক্ষা পাশ হইতে নহে— ইহা আমরা চোখ বুজিয়া ভুলিতে ইচ্ছা করি।......ইংরেজের স্কুলে পড়িয়াছি বলিয়াই আমরা নিজেকে ইংরেজশ্রেণীয় জ্ঞান করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সমূহ, পরিশিষ্ট—অপর পক্ষের কথা

এক তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বইয়ে পড়েছিলুম, 'বাঙলা শব্দের অন্ত্যদেশে অনুস্বার যোগ করিলে সংস্কৃত হয় ; ইংরিজী শব্দের প্রাগ্দেশে জোর দিয়া কথা বলিলে সায়েবী ইংরিজী হয়'। অর্থাৎ পয়লা সিলেব্‌লে অ্যাকসেণ্ট দেওয়া খারাপ রান্নায় লঙ্কা ঠেসে দেওয়ার মত—সব পাপ ঢাকা পড়ে যায়। সোজা বাংলায় এরি নাম গাঁক গাঁক করে ইংরিজী বলা।

সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ দেশে বিদেশে

মধুসূদনকে মধুসূদন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বঙ্কিমকে বঙ্কিম বলিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না,......কেহ বা বাংলার মিল্টন, কেহ বা বাংলার বায়রন, কেহ বা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন......একদিন গেছে যখন.......ইংরেজিগ্রস্ততা এতদূর পর্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল......।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (আত্মশক্তি)

ইংরেজি সাহিত্য পেতে পারি, কিন্তু ইংলণ্ড পাবো কোথা থেকে। বীজ পাওয়া যায়, কিন্তু মাটি পাওয়াই কঠিন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সমাজ)

ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কান-মলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১২

ইঙ্গিত

ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তোমরা ও আমরা (সোনার তরী)

উর্ধ্ব আকাশে তারাগুলি মেলি অঙ্গুলি,
ইঙ্গিত করি তোমা-পানে আছে চাহিয়া।
নিম্নে গভীর অধীর মরণ উচ্ছলি
শত তরঙ্গে তোমা-পানে উঠে ধাইয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুঃসময় (কল্পনা)

ইচ্ছা/ইচ্ছে

ইচ্ছা সম্যক্ জগদরশনে কিন্তু পাথেয় নাস্তি
পায়ে শিক্লি মন উড়ু উড়ু এ কি দৈবের শাস্তি!
টঙ্কা দেবী করে যদি কৃপা না রহে কোন জ্বালা।
বিদ্যাবুদ্ধি কিছু না কিছু না শুধু ভস্মে ঘি ঢালা॥

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর : মন্দাক্রান্তা ছন্দের প্যারডি

উস্‌খুস্ করা মনের যত সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চার অধ্যায়

ইচ্ছে!—ইচ্ছে!
সেই তো ভাঙছে, সেই তো গড়ছে,
সেই তো দিচ্ছে নিচ্ছে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তাসের দেশ

একটা প্রয়োজনের ইচ্ছা, আর-একটা অপ্রয়োজনের ইচ্ছা। একটা যাহা না হইলে কিছুতেই চলে না তাহার ইচ্ছা, এবং অন্যটা, যাহা না হইলে অনায়াসেই চলে, তাহার ইচ্ছা।.........এই দ্বিতীয় ইচ্ছাটার শক্তি এমন প্রবল যে, সে যখন জাগিয়া ওঠে তখন সে এই প্রথম ইচ্ছাটাকে একেবারে ছারখার করিয়া দেয়।........সুখ সুবিধা প্রয়োজনের কোনো দাবিতেই একেবারে কর্ণপাত করে না। তখন সে বলে,...........সুখ আমার সুখ নহে, আরো'ই আমার সুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুই ইচ্ছা (পথের সঞ্চয়)

অতি-ইচ্ছা চলে অতি-বেগে। দেখিতে না পায় পথ, আপনারে করে সে নিষ্ফল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—৫/১

আমার ইচ্ছা কেবল আমারই মনের উৎপন্ন পদার্থ নয়। অনেকের ইচ্ছা আমার মধ্যে ইচ্ছিত হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন—দশের ইচ্ছা

যিনি ইচ্ছাময় তিনি আমাদের প্রত্যেককে একটি করে ইচ্ছার তালুক দান করেছেন.....। বিশ্বসাম্রাজ্যে আর সমস্তই তাঁর ঐশ্বর্য, কেবল ওই একটি জিনিস তিনি নিজে রাখেন নি, ওইটি তিনি কেড়ে নেন না, চেয়ে নেন, মন ভুলিয়ে নেন।.......ফুল যদি দিই সে তাঁরই ফুল, জল যদি দিই সে তাঁরই জল—কেবল ইচ্ছা যদি সমর্পণ করি তো সে আমারই ইচ্ছা বটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন—ইচ্ছা

সমস্ত সৃষ্টির গোড়াকার কথাটা ইচ্ছা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাতীয় বিদ্যালয় (শিক্ষা)

খোকা মাকে শুধায় ডেকে,
'এলেম আমি কোথা থেকে,
কোন্‌খানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'
মা শুনে কয় হেসে কেঁদে
খোকারে তার বুকে বেঁধে,
ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিশু—জন্মকথা

স্ত্রীলোকের ইচ্ছার একেবারে খাড়া উল্টোমুখে চলতে গেলে বিপদে পড়বে। তার চেয়ে পাশ কাটিয়ে ঘুরে গেলে ফল পাওয়া যায়। বাতাস যখন উল্টো বয়, জাহাজের পাল তখন আড় করে রাখতে হয়, নইলে চলা অসম্ভব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শোধবোধ

ইচ্ছাময়ী

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি॥
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি।
কারে দাও মা ব্রহ্ম-পদ কারে কর অধোগামী॥

রামদুলাল নন্দী ঃ শাক্ত পদাবলী

ইতর

ইতর প্রাণীদেরও আত্মা আছে, তাদের মনে দুঃখ দিলে সাধনার ফল ক্ষয় হয়ে যায়।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারানাথ তান্ত্রিক

ইতিহাস

ইতিহাসের মূল লক্ষ্য হচ্ছে, অতীতের আলোতে বর্তমানের পথ দেখানো, সমাজ ও গোষ্ঠীর চলাচলের পথ ও বিপথ দেখিয়ে মানুষকে সাবধান করা। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানীরা যে সব উপদেশ করেছেন তাঁদের উপদেশের বাস্তব রূপ দেখা যায় ইতিহাসে। সমাজ ও সভ্যতার অভ্যুদয় ও পতনের বন্ধুর পথে মানুষের যাত্রা ও যাত্রাশেষের দিগদর্শন হচ্ছে ইতিহাস। ইতিহাস কাহিনীকার নয়, ইতিহাস উপদেষ্টা। মানুষের চরিত্রের নিগূঢ় তত্ত্বদর্শীদের নীতিসূত্রের ভাষ্য হচ্ছে ইতিহাস।

অতুল গুপ্ত ঃ ইতিহাসের মুক্তি

চিরপরিচিত মানুষ মানুষের চিরকালের বিস্ময়। সেই চিরবিস্ময়ের বার্তা বহন করে ইতিহাস।

অতুল গুপ্ত ঃ ইতিহাসের মুক্তি

ইতিহাস তো শুধু একটি গ্রন্থ কিংবা বিবরণী নয়, নয় শুধু কীর্তিপঞ্জী। ইতিহাস এক অনন্ত যোগসূত্র, যা অতীতকে অনায়াসে বেঁধে ফেলে বর্তমানের সঙ্গে এবং তারপরও থামে না। বয়ে চলে ভবিষ্যতের দিকে।

অপর্ণা সেন ঃ সম্পাদকীয় (সানন্দা ৫.৫.২০০০)

যে ইতিহাসের লেখক সর্বদেশদর্শী, সত্যসন্ধ ও অপক্ষপাত, যে ইতিহাসের আঙ্গিক সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ সত্যের জ্যোতিতে প্রদীপ্ত—এবং যার মধ্যে বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের পূর্ণ সঙ্গতি বিদ্যমান—সেই ইতিহাস শ্রেষ্ঠ, চিরজীবী। অন্যান্য ইতিহাস মরশুমী ফুলের মত।

অমলেশ ত্রিপাঠী ঃ ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

মানুষ অজেয়; অজেয় তার সহমর্মিতা, তার ভালোবাসা। তারই ইতিবৃত্তের নাম ইতিহাস।

আজিজুল হক ঃ কারাগারে ১৮ বছর

আজকাল আমরা যে অর্থে 'ইতিহাস' শব্দটি ব্যবহার করি, প্রাচীন ভারতীয়গণের মধ্যে ঠিক সেই অর্থে ইতিহাস শব্দ ব্যবহৃত হত বলে মনে হয় না। যে কোনও কাহিনীই ছিল তাঁদের ইতিহাস। এমন কি মহাভারতে বহুবার ইতিহাস শব্দটি কেবল উপকথা মাত্র বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

দীনেশচন্দ্র সরকার ঃ সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ

ইতিহাস শুধু রাজ-রাজড়ার কাহিনী নয়, নয় কেবল সাল-তারিখের কচকচি। ইতিহাস গড়ে ওঠে মানুষের সমগ্র জীবনের অতীতকে নিয়ে, এমন কি পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আগের কাহিনীও ইতিহাসের অঙ্গ হতে পারে। এই রকমটি ছিল, ইতি হ আস, এটা জানানোই ইতিহাসের উদ্দেশ্য। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ইতিহাসের অনেক উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।৫।৭।৪-৮) স্বাধ্যায়ের একটি বিষয় হল ইতিহাস-পুরাণ। গো পথ ব্রাহ্মণ (২।১০) বলেছে বেদের সঙ্গে সঙ্গে উপনিষৎ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষৎ (৭।১।২) ত ইতিহাসকে পঞ্চম বেদ বলে ঘোষণা করল যা নারদমুনির একটি পাঠ্য বিষয় ছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও ইতিহাসের পবিত্রতা আর ব্যাপকতার পরিচয় মেলে। কৌটিল্য বেদসমূহের মধ্যে ইতিহাস-বেদের উল্লেখ করেছেন (১।৩।১-২) আবার ইতিহাসের একটি বিস্তৃত সংজ্ঞাও তিনি দিয়েছেন। তাঁর মতে ইতিহাস হল পুরাণ, ইতিবৃত্ত, আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্র।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ঃ ইতিহাস নানা পথে (ভূমিকা)

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডই নয়া ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু নয়। তেমনই নয় বিশিষ্ট অভিনেতা-নায়কদের প্রভাব প্রতিপত্তি আর নর-নারীর জীবনের নাটকীয় ঘটনাবলী। এর কাজ হল মানুষের ভাগ্যের পিছনে যে নৈর্ব্যক্তিক সামাজিক শক্তি কাজ করছে তার স্বরূপ উদঘাটন করা আর তাকে সামাজিক কালক্রমে ছকে দেওয়া। এই জন্যে নয়া ঐতিহাসিকেরা সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি অন্যান্য বিদ্যার সাহায্য নিতে পারেন। ইতিহাসের এই নতুন প্রেক্ষাপট অবশ্যই কৌটিল্যের ব্যাপক সংজ্ঞার সঙ্গে তুলনীয়। ধর্মশাস্ত্রে আছে প্রাচীন সমাজতত্ত্ব আর অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন অর্থনীতি। তাই এদের ইতিহাসের অঙ্গ করে কৌটিল্য বোধ হয় ভুল করেননি। এখন দেখা যাচ্ছে মানুষ সম্পর্কে যে কোন তথ্য খুঁজতে হবে নানা পথে। বিভিন্ন পথে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের মণিমুক্তা। সেগুলির কিছু কিছু কুড়িয়ে নিতে পারলে ভালো লাগে, আবার জ্ঞানও বাড়ে।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ঃ ইতিহাস নানা পথে (ভূমিকা)

এদেশে ইতিহাসকে বলা হয়েছে বেদ। কৌটিল্য রাজার দিনপঞ্জীর মধ্যে রেখেছেন ইতিহাস-শ্রবণ। মহাভারত বার বার 'ইতিহাসং পুরাতনম্' বলে উপদেশ দিয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য (১। ৪৪-৪৫) প্রত্যেক ছাত্রকে প্রতিদিন সাধ্যমত অন্যান্য বিদ্যার সঙ্গে পুরাণ-ইতিহাস চর্চা করতে বলেছেন। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিদ্যার তালিকার মধ্যে পুরাণ, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির উল্লেখ আছে। ইতিহাস হল, যেন অতীতের বিশ্বকোষ। রাষ্ট্রনীতি, ধর্ম, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি অনেক কিছু এর উপজীব্য। এই জন্যে ইতিহাস রচয়িতার দায়িত্ব অনেক। কল্‌হন তাঁর 'রাজতরঙ্গিণী'তে

ইতিহাসপ্রণেতাকে রাগদ্বেষ বর্জন করে নিরপেক্ষ হতে বলেছেন। তিনি লিখেছেন,

শ্লাঘ্যঃ স এব গুণবান্ রাগদ্বেষবহিষ্কৃতা।
ভূতার্থকথবনে যস্য স্থেয়স্যেব সরস্বতী॥ (১। ৭)

এই সব কারণে ইতিহাসকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হবে।

প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র ঃ ইতিহাস নানা পথে (ভূমিকা)

ইতিহাস যেন একটি কল্লোলিত নদী।

বুদ্ধদেব গুহ ঃ কোয়েলের কাছে

ইতিহাস বুড়ো, বেড়াজাল তার পাতা,
সঙ্গে রয়েছে হিসাবের মোটা খাতা—
ধরা যাহা পড়ে ফর্দে সকলি আছে।
হয় আর নয়, খোঁজ রাখে শুধু এই,
ভালোমন্দর দরদ কিছুই নেই,
মূল্যের ভেদ তুল্য তাহার কাছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অবর্জিত (নবজাতক)

সব ইতিহাসই বাইরের দিকে অন্ন নিয়ে যুদ্ধ, আর ভিতরের দিকে তত্ত্ব নিয়ে যুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাভা-যাত্রীর পত্র—১। ৮। ২৭

সংসারে যেখান হইতে ইতিহাস সুরু হয়, তাহার অনেক পরের অধ্যায় হইতে লিখিত হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রজাপতির নির্বন্ধ

সযত্নসেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন-ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্ত (কল্পনা)

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি, এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন-কাহিনী মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস

মানুষের ইতিহাসটা.....দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায়, দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা

তরল জলের কোমল একাধিপত্য ঢুঁ মেরে, গুঁতো মেরে, লাথি মেরে, কিল মেরে, ঘুষো মেরে, ধাক্কা মেরে, উঠে পড়তে লাগল ডাঙা তার পাথুরে নেড়া মুণ্ডুগুলো তুলে। ভূলোকের ইতিহাসে এইটেকেই সবচেয়ে বড়ো পর্ব বলে। মানো কিনা?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—২২

রাজার রাজত্বকাল, সন তারিখ—এ-সবকে আশ্রয় করিয়া তবে ইতিহাসের গতি বা ধারা বুঝা যায়। কিন্তু সমগ্রভাবে জাতির লোকদের প্রগতির আলোচনা, ইহাই হইতেছে সত্যকার ইতিহাস।....কোনোও জাতির বা মানবসমাজের ইতিহাস হইতেছে, তাহার সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতি

সমস্ত সমাজ বা জাতির ক্রমবিকাশের কথাই হইল ইতিহাসের সারমর্ম।......যুগযুগ ধরিয়া মানুষ নানারকমের সমাজ গড়িয়াছে। তাহাদের আরম্ভ বিকাশ পরিণতি আর শেষ লইয়াই ইতিহাসের আসল কারবার।

সুশোভন সরকার ঃ ইতিহাসের ধারা

ইলিশ

ইলিস মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তিরসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ আমার মন (কমলাকান্ত)

রাত্রিশেষে গোয়ালন্দে অন্ধকালো মালগাড়ি ভরে
জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি রাশি ইলিশের শব
নদীর নিবিড়তম উল্লাসের মৃত্যুর পাহাড়।
তারপর কলকাতার বিবর্ণ সকালে ঘরে ঘরে
ইলিশ ভাজার গন্ধ ; কেরানির গিন্নির ভাঁড়ার
সরস সর্ষের ঝাঁজে। এলো বর্ষা ইলিশ-উৎসব।

বুদ্ধদেব বসু ঃ ইলিশ

পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার মরসুম চলিয়াছে।.....নৌকার খোল ভরিয়া জমিতে থাকে মৃত সাদা ইলিশ মাছ। লণ্ঠনের আলোয় মাছের আঁশ চকচক করে, মাছের নিস্পলক চোখগুলিকে স্বচ্ছ নীলাভ মণির মত দেখায়।.....
ইলিশের মরসুম ফুরাইলে বিপুলা পদ্মা কৃপণ হইয়া যায়। নিজের বিরাট বিস্তৃতির মাঝে কোনখানে সে যে তার মীনসন্তানগুলিকে লুকাইয়া ফেলে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পদ্মানদীর মাঝি

ইলেকট্রনিক্স

'ইলেকট্রনিকস' কথাটির উৎপত্তি 'ইলেকট্রন' শব্দটি হইতে।.....প্রতিটি মৌলিক পদার্থের ভিতর উহার পরমাণুঅঙ্ক অনুযায়ী বিভিন্ন সংখ্যক ইলেকট্রন বিশেষভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। তবে কতকগুলি উপায়ে, যেমন উত্তাপের সাহায্যে, আলোকতরঙ্গের সাহায্যে অথবা অন্যান্য পন্থায় ইলেকট্রনকে পদার্থ হইতে বা পদার্থের পরমাণু হইতে মুক্ত করা যায়। এই মুক্ত ইলেকট্রনগুলিকে তড়িৎ বা চৌম্বক ক্ষেত্রের সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার কার্যে প্রয়োগ করা হয়। এই সমুদয় সংক্রান্ত বিজ্ঞানকে ইলেকট্রনিকস বলা হইয়া থাকে।

অনাদিনাথ দাঁ ঃ ইলেকট্রনিক্স

ইসলাম

ইসলাম ধর্ম যেভাবে ভারতে অনুসৃত হয়েছে বহু প্রজন্মের বিস্তারে, সেই প্রেক্ষিতে তাকে একটি ভারতীয় ধর্ম হিসেবেই দেখা যুক্তিসঙ্গত হবে।

অমর্ত্য সেন ঃ সংকটের মুখে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা

ইসলাম বলে সকলের তরে মোরা সবাই,
সুখ দুখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই,
        নাই অধিকার সঞ্চয়ের।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ঈদ মোবারক

ইসলামের ঐ বাগিচাতে ফুটলো দুটী ফুল।
শোভায় অতুল সে ফুল আমার আল্লা ও রসুল॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (ইসলামী)

বেদান্ত মত যত সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হোক না কেন, কর্মপরিণত ইসলাম-ধর্মের সাহায্য ছাড়া তা বিশাল জনসমষ্টির কাছে সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—৬

ঈদ

ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।
তুই আপ্‌নাকে আজ বিলিয়ে দে শোন্ আসমানী তাকিদ্॥.....
তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদ্‌গাহে
যে ময়দানে সব গাজী মুস্‌লিম হয়েছে শহীদ্।

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (ইসলামী)

ঈদ মোবারক্, ঈদ মোবারক্।
দোস্ত দুষমন পর ও আপন
সবার মহলে আজি হউক রওনক॥
যে আছ দূরে যে আছ কাছে
সবারে আজ মোর সালাম পৌঁছে,
সবারে আজ মোর পরাণ যাচে
সবারে জানাই এ দিল্ আশক॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (ইসলামী)

ঈদজ্জোহার চাঁদ হাসে ঐ এল আবার দুস-রা ঈদ।
কোর্‌বানী দে কোরবানী দে শোন্ খোদার ফর্‌মান তাকিদ।

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (ইসলামী)

ঈশান

ঈশান মেঘে আর ওঠে না দুলে-দুলে
ত্বরিতে কাঁদে আর চকিতে মৃদু হাসা,
জোগায় কথা তাই সোনালি নদীকূলে।

বিষ্ণু দে : ভিলানেল

ঈশানকোণে ঈশানী
কহে দিলাম নিশানী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গুপ্তধন

ঈশানের পুঞ্জমেঘ অন্ধবেগে ধেয়ে চলে আসে
বাধাবন্ধহারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বর্ষশেষ

ভাবিতেছিলাম উঠি কিনা উঠি,
অন্ধতামস গেছে কিনা ছুটি,
রুদ্ধ নয়ন মেলি কি না মেলি
তন্দ্রাজড়িমা মাজিয়া
এমন সময় ঈশান তোমার
বিষাণ উঠেছে বাজিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুপ্রভাত

ঈশ্বর

মানুষ ঈশ্বরকে হত্যা করল, মানুষকে বাঁচিয়ে দিলেন ঈশ্বর।
মানুষ ঈশ্বরকে দিল নশ্বরতা, ঈশ্বর মানুষকে দিলেন অমরত্ব
ঈশ্বর মানুষ হলেন, মানুষ এবার ঈশ্বর হবে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ মানুষ ঈশ্বর হবে

রক্তাক্ত তারার ভিড়ে ঈশ্বরের আর্তনাদ স্পষ্ট শোনা যায়
এক সময় ঈশ্বর বাধ্য হয়ে মারা যান
ফাঁক পেয়ে মানুষেরা ভগবান বনে যেতে থাকে।

অদীপ ঘোষ ঃ ঈশ্বরের মৃত্যু (কুয়াশা ঘেরা রাস্তার শব্দ)

ঈশ্বর অনাদি অনন্ত অখণ্ড প্রাণস্বরূপ। তিনি সমস্ত জীবের চৈতন্যস্বরূপ, সকলের প্রাণের প্রাণ, আত্মার আত্মা। ঈশ্বর সকলের অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ব্যাপ্ত আছেন। তিনি অন্তর্যামী—আমাদের জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিষ্ঠানস্বরূপ।

....ঈশ্বরে মন স্থির হলে বাইরের কোন-কিছুর সম্বন্ধে (সাধকের) আর সাড়া থাকে না। নিজের দেহ পর্যন্তও তখন ভুল হয়ে যায়। মন যখন ইন্দ্রিয়ের রাজ্য ছাড়িয়ে একেবারে অতীন্দ্রিয় লোকে স্থির হয় তখনই দিব্যানুভূতির আরম্ভ।

স্বামী অভেদানন্দ ঃ উপদেশমালা

ঈশ্বর মুখে দিয়ে দামী সিগারেট
বসে বসে দেখছেন স্বর্গে।
নতুন জুতো পরা পা দুটো রেলিঙে
উঠিয়ে, আরাম করে, ভালো খেয়ে দেয়ে।
মাটির পৃথিবীটাকে কৌতুকে করুণায়
ঈশ্বর দেখছেন স্বর্গ থেকে।

অমিয় চক্রবর্তী ঃ মানুষের ঈশ্বর (দূরযানী)

কলিকালে ঈশ্বরের মানমর্যাদা বলিয়া কিছু অবশিষ্ট নাই, বাজনীতিকদের কথায় জগৎসংসার চলে।

আনন্দবাজার পত্রিকা। (৬.৮.২০০০)—**সম্পাদকীয়**

সারা পৃথিবী টুঁড়ে দুঃখ বা শোক করার মত
সে কিছুই দেখল না
...ঈশ্বর তুমি তাকেই গুরুবরণ কর।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী ঃ ঋক অথবা শায়েরী

ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ বোধোদয়

তিনি ঈশ্বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি মৃত্যুকে ভয় করবেন কেন?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সপ্তপদী

জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গম্ভীর নিরুৎসব বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়। আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়, ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন ঐ গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ **পদ্মানদীর মাঝি**

যুগ-যুগান্তরের সাধনায় মানুষ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়া ন্যায়-অন্যায়ের সীমারেখার নির্দেশ করিয়াছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আখড়াইয়ের দীঘি

সে [আনন্দ] বলে চীন রাশিয়াকে তারিফ করি—তার কারণ তারা ঈশ্বর নামক কল্পনাটিকে ধুয়ে মুছে দিয়েছে। জীবনের সমস্ত পথে বাধা ঐ প্রস্তরখণ্ড।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে

ঈশ্বরের কোন্ কার্য না আশ্চর্য।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী

ঈশ্বরের সঙ্গে আমি বিবাদ করিনি।
তবুও ঈশ্বর
হঠাৎ আমাকে ছেড়ে কোথায় গেলেন?
অন্ধকার ঘর।
আমি সেই ঘরের জানলায়
মুখ রেখে
দেখতে পাই, সমস্ত আকাশে লাল আভা,
নিঃসঙ্গ পথিক দূর দিগন্তের দিকে চলেছেন।
অস্ফুট গলায় বলে উঠি :
ঈশ্বর! ঈশ্বর!

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : ঈশ্বর! ঈশ্বর! (কলকাতার যীশু)

আমাকে তোমার মতন বোবা কালা কোরে দাও ঈশ্বর! যেনো ডুবতে ডুবতে
ভেসে থাকতে পারি, ভাসতে ভাসতে ডুবে না যাই
বেঁচে থাকার আরাম এখনো তেতো হয়ে যায়নি প্রভু
চোখ কান বুজে থাকতে শিখেছি.....
অতি বড়ো ধূর্তও বুঝতে পারে না, আমার থলিতে কোন সাপ রেখেছি লুকিয়ে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় : বিস্মিত হই না কিছুতেই

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণাভাব ঈশ্বরের অনস্তিত্বের প্রমাণ নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে (বিবিধ প্রবন্ধ)

মানবদেহান্তর্গত মানবাত্মাই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী

ঈশ্বর আছেন আমাদের ভালোবাসার আর পূজার জন্য।.....চরম ভালোবাসার পাত্র আমরা তৈরি করেছি ঈশ্বরকে—যাকে মানুষের দাবি মেটাবার জন্য হতে হয়েছে সর্বজ্ঞ, সর্বক্ষম ও সর্বপ্রেমময়।

বুদ্ধদেব বসু : ভূতের ভয় [হঠাৎ আলোর ঝলকানি]

আদিম মানুষ একদা যে অতিপ্রাকৃতিক অপার্থিব শক্তির কল্পনা করেছিল (প্রায় ৩০-৪০ হাজার বছর আগে), ঐ আদিম কল্পনার বিবর্তিত রূপই নানা দেবদেবী ও নানা ভাষায় পরিচিত ঈশ্বর বা ভগবান। আমাদের নিজেদের অজ্ঞতা ও অসহায়তা এবং জীবনের অনিশ্চয়তা—এসবের কারণে মানুষ নিজের কল্পনার ঈশ্বরের উপর ভরসা রেখে সাহস ও শক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে।

ভবানীপ্রসাদ সাহু : প্রণাম করা (কোন্‌টা মানবো কোন্‌টা মানবো না)

যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরের মধ্যে নিজেদের বা নিজেদের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখতে না পাই ততক্ষণ আমাদের পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করি। যদিও সে-অস্তিত্ব বাস্তবরূপে সত্য নয়। কিন্তু বুদ্ধি যত স্বচ্ছ হয়, আধ্যাত্মিক জীবনে যত অগ্রসর হই ততই আমাদের এই সীমাবদ্ধতা ক্ষয় হতে থাকে, উপাধিগুলি বর্জিত হয়। আমরা ঈশ্বররূপী মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে তিনিই হয়ে যাই, নুনের পুতুল যেমন সমুদ্রে পড়লে সমুদ্রেই মিলিয়ে যায়। এই-ই আমাদের জীবনের লক্ষ্য।

স্বামী ভূতেশানন্দ ঃ মন্ত্রদীক্ষা

তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিতেন বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।......ঈশ্বর-বিশ্বাসীর সঙ্গে তিনি এই পদ্ধতিতে তর্ক করিতেন—

ঈশ্বর যদি থাকেন তবে আমার বুদ্ধি তাঁরই দেওয়া।
সেই বুদ্ধি বলিতেছে যে ঈশ্বর নাই।
অতএব ঈশ্বর বলিতেছেন যে ঈশ্বর নাই।
অথচ তোমরা তাঁর মুখের ওপর জবাব দিয়া বলিতেছ যে
ঈশ্বর আছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ

ঈশ্বর এইখানেই আমাদের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। তিনি সব দিয়াছেন, অথচ এটুকু আমাদের বলিবার মুখ রাখিয়াছেন যে, আমরাই লইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধর্ম. প্রার্থনা

ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে ব্যস্ততা নাই কিন্তু অমোঘতা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সঞ্চয় ধর্মশিক্ষা

ঈশ্বরের নাম গুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসঙ্গ—ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়-কাজের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ঈশ্বরই একমাত্র বন্ধু।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ঈশ্বরকে ভালোবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালোবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালোবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালোবাসে। এই তিনজনের ভালোবাসা এই তিন টান একত্র করলে যতখানি হয়, ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তার দর্শন লাভ হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সংসারে সব কর্ম কর। কিন্তু ঈশ্বরের দিকে মন রেখো।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ঈশ্বর কল্পতরু। তাঁর কাছ থেকে চাইতে হয়। তখন যে যা চায় তাই পায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ঈশ্বর এক—এক বৈ দুই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে লোকে ডাকে। কেউ বলে গড, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে কৃষ্ণ, কেউ বলে শিব, কেউ বলে ব্রহ্ম। যেমন পুকুরে জল আছে—এক ঘাটের লোক বলছে জল, আর এক ঘাটের লোক বলছে ওয়াটার, আর এক ঘাটের লোক বলছে পানি—কিন্তু বস্তু এক।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

একটু কামনা থাকলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ধর্মের সূক্ষ্ম গতি। ছুঁচে সূতা পরাচ্ছ—কিন্তু সূতার ভিতর একটু আঁশ থাকলে ছুঁচের ভিতর প্রবেশ করবে না।.....তবে একটি কথা আছে—ঈশ্বরের কৃপা হলে, ঈশ্বরের দয়া হলে একক্ষণে সিদ্ধিলাভ করতে পারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘর, হঠাৎ কেউ যদি প্রদীপ আনে, তাহলে একক্ষণে আলো হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

অদ্ভুত ঈশ্বর এসে দাঁড়িয়েছেন মৃন্ময় উঠোনে
একদিকে শিউলির স্তূপ,
অন্যদিকে দ্বাররুদ্ধ প্রাণ
কার জন্য এসেছেন—
কেউ কি তা স্পষ্ট করে জানে?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ কার জন্য এসেছেন? (ঈশ্বর থাকেন জলে)

ঈশ্বর মানি, আর ভূতের ভয় করিনে—সে হবার জো নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ চরিত্রহীন (১)

যেখানে সত্য সেখানেই ঈশ্বর।

শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

আমি একা কোন ঈশ্বরের মতো
শুধু স্বাতন্ত্র্য চেয়েছিলাম
কারো করুণা
চাইনি।

সন্তোষ দত্ত ঃ অবলোকন

দিগন্তে প্রকাশিত হচ্ছিল একটা নিঃশব্দ নক্ষত্র—যেন আকাশের দরজা খুলে ঈশ্বর এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু তাঁকে দেখা গেল না—বোঝা গেল ওই তাঁর স্মিত সুন্দর হাসিটি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ নিষিদ্ধ প্রান্তর

উই/উইপোকা

শিল্পীর শিরে পিলপিল করে
আইডিয়া
লেখেন যখন পুস্তক তিনি
তাই দিয়া
উইপোকা কয় চল এইবার
খাই গিয়া।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ চন্দ্রহাস

উকিল

উকিল-মোক্তারের সহিত কারবার হাসির কথা নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরনিন্দা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

উকিল মানুষ, সোজা প্যাঁচ না মেরে বলতে পারে না।

সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ রসগোল্লা

উচ্চ

তুমি যে উচ্চকুলে জন্মিয়াছ, সে তোমার গুণে নহে; অন্য যে নীচকুলে জন্মিয়াছে, সে তাহার দোষে নহে। অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সাম্য

নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।

ভারতচন্দ্র রায় ঃ অন্নদামঙ্গল

নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে

ভারতচন্দ্র রায় ঃ অন্নদামঙ্গল

মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে—মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আত্মশক্তি—স্বদেশী সমাজ

উচিত

উচিত কথায় দেবতা তুষ্ট
উচিত কথায় মানব রুষ্ট।

বাংলা প্রবাদ

উচ্ছৃঙ্খলতা

উচ্ছৃঙ্খলতা দরিদ্রতার বাহন—বাহন অর্থ আশ্রয় বা আবাসস্থান। যেমন দুর্গার বাহন সিংহ, কার্তিকের বাহন ময়ূর, গণপতির বাহন ইঁদুর—তেমনি দরিদ্রতার বাহন উচ্ছৃঙ্খলতা। তোমাদের দৈনন্দিন কার্যের ভিতর দিয়া অনুভব করিবে যখন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে তখন নিশ্চিত জানিবে দরিদ্রতা তোমাকে তিলে তিলে গ্রাস করিতেছে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী ঃ বাণী

উত্তম

যে অধম, সেই শত্রুর প্রতিহিংসা করে ; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ চন্দ্রশেখর

পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কপালকুণ্ডলা

উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে॥

ভারতচন্দ্র রায় ঃ অন্নদামঙ্গল

নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহু ধন।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ চণ্ডীমঙ্গল

উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কণিকা

উত্তর-আধুনিকতা

'উত্তর-আধুনিকতা' বা 'পোস্ট মডার্নিজম্'—সাহিত্যের একটি বিতর্কিত পারিভাষিক শব্দ। সাধারণ অর্থে ১৯৪০ বা ১৯৫০-এর পর থেকে শিল্পে, সাহিত্যে, সংগীতে, স্থাপত্যে, দর্শনে যে-কোনও পরিবর্তন বা বিকাশের প্রবণতাকেই উত্তর-আধুনিকতা বলে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। উত্তর-আধুনিকতা আধুনিকতা থেকে স্বতন্ত্র, আধুনিকতার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিক্রিয়া নয়। উত্তর-আধুনিকতায় আধুনিকতার শৈল্পিক সমগ্রতার সন্ধান নেই, কিন্তু বিচ্ছিন্নতা ও বিবিক্তির ধারাবাহিকতা আছে। জঁ ফ্রাঁসোয়া লিয়র্তা (Jean Francois Lyotard) তাঁর 'দ্য পোস্টমডার্ন কণ্ডিশন ঃ আ রিপোর্ট অন নলেজ'

(১৯৭৯, ১৯৮৪) গ্রন্থে বলেছেন, এক অর্থে পোস্ট মডার্নিজমের উদ্ভব মর্ডার্নিজমের আগে, পরে নয়। অর্থাৎ তাঁর মতে 'A work can become modern only if it is first modern......Post-modernism thus understood is not modernism at its end but in the nascent state' (লিয়র্তা, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা ৭৯)। ইহাব্ হাসান (Ihab Hassan) তাঁর 'দ্য পোস্ট মডার্ন টার্ন ঃ এসেইজ্ ইন পোস্ট-মডার্ন থিয়োরি অ্যান্ড কালচার' ১৯৮৭ গ্রন্থে এই একই অভিমত পোষণ করে বলেছেন পোস্ট মডার্নিজম্ এর অর্থ মডার্নিজম থেকে সরে আসা নয়, বরং মডার্নিজমেরই অভিনব নবীকরণ।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্যের শব্দার্থকোশ

উত্তেজনা

উত্তেজনা যে দুর্বলেরই ব্যাধি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ প্রেম ও প্রয়োজন

উদ্দেশ্য

উদ্দেশ্য কিছুই নয়। কেবল গোলাপ
সম্পূর্ণ গোলাপ হতে চায়। কেবল পাখিটা
সম্পূর্ণ পাখির অভিমুখী।

আলোক সরকার ঃ মন্ত্র (স্তব্ধলোক)

উদ্ধত

বটে আমি উদ্ধত,
নই তবু ক্রুদ্ধ তো,
শুধু ঘরে মেয়েদের সাথে মোর যুদ্ধ তো।
যেই দেখি গুণ্ডায়
ক্ষমি হেঁটমুণ্ডায়,
দুর্জন মানুষেরে ক্ষমেছেন বুদ্ধ তো।
পাড়ায় দারোগা এলে দ্বার করি রুদ্ধ তো—
সাত্ত্বিক সাধকের এ আচার শুদ্ধ তো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খাপছাড়া

উদ্ধত যত শাখার শিখরে রডোডেনড্রনগুচ্ছ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথের বাঁধন

উদ্বোধন

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন।
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে হবে না তোর বিসর্জন॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভক্তি-গীতি

উদ্ভট নাট্যরীতি (দ্র. অ্যাবসার্ড নাটক)

বাস্তব নাট্যরীতি আজকের জগতে এত অবাস্তব। আজকের উদ্ভট জগতে উদ্ভট নাট্যরীতিই সবচেয়ে সত্য ও বাস্তব। উদ্ভট নাট্যলেখকদের কি কোনো জীবনতত্ত্ব নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা ভাষা ও যুক্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ইয়োনেস্কো ও বেকেট এমন কিছু বলতে চাইছেন যা ভাষায় বচনীয় নয়, বাক্যে প্রকাশ

করলেই তা মিথ্যা হয়ে যাবে। বৌদ্ধ নির্বাণতত্ত্ব যেমন নেতিবাচক ভাষারীতির মধ্য দিয়েই শুধু ব্যাখ্যা করা যায়, ইয়োনেস্কো ও বেকেট প্রভৃতির জীবনদর্শনও ঠিক সেভাবে বর্ণনা করা চলে। পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী মন আজ এমন যুক্তিবন্ধনাতীত জগতের মুখোমুখি এসেছে যেখানে অ্যাবসার্ড অথবা অসম্ভাব্য রূপই একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছে। ইয়োনেস্কোর প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গেই যেন এক অপার বিস্ময় জড়িয়ে আছে। কারণ কোনো কিছুর সঙ্গেই সঙ্গত কারণ জড়িয়ে নেই। কারণ ও কার্য যুক্ত হয়ে যে সম্ভাব্যতা সৃষ্টি করে তা তাঁর নাটকে দেখা যায় না। যখন সব কিছুই যুক্তিহীন, অকারণ ও অসম্ভাব্য তখন বিশেষ কোনো ঘটনা আর অদ্ভুত লাগে না। অ্যামেডি ও তার স্ত্রী দেখতে পাচ্ছে যে তাদের ঘরে রক্ষিত মৃতদেহটি ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে তার দেহ ছড়িয়ে পড়ছে, পা দুটো বাড়তে বাড়তে জানালা দিয়ে বাইরে ঝুলে পড়ছে, কিন্তু কেউ একটু অবাক হচ্ছে না, কি ভয় পাচ্ছে না। 'রাইনোসেরাস' নাটকে দলে দলে লোক গণ্ডারে পরিণত হয়েছে, তাদের দাপাদাপি ও গর্জনই মনোহর ও শ্রুতিসুখকর হয়ে উঠেছে। অ্যাবসার্ড জগতে মানুষ গণ্ডারের চেহারা ও স্বভাবে আকৃষ্ট হয়ে গণ্ডার হতে চাইছে। যেখানে গণ্ডারের দলই সুন্দর ও স্বাভাবিক, সেখানে মানুষ হয়ে থাকাই হল স্বভাবের ব্যতিক্রম। উদ্ভট নাটকের জগতে সময় ও স্থানের কোনো বাঁধাধরা সীমানা নেই। 'দি কিলার' নাটকে বেরেঞ্জার ভেবে পাচ্ছে না তার বয়স কত—'Sixty years old, seventy, eighty, a hundred and twenty, how do I know?'

অজিতকুমার ঘোষ : উদ্ভট নাটক : আঙ্গিক ও জীবন দৃষ্টি

উন্মত্ত

উন্মত্ত না হলে কেউ কোন কালে কোন মহৎ কাজ করতে পেরেছে?

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : মেবার পতন

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা এ উন্মত্ততা
জাগায় দেহে মনে একি বিপুল ব্যথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা

উন্মাদ

ঠিকমত স্থানকাল পাত্রযোগে উন্মাদের কপালেও রাষ্ট্রীয় মর্যাদা জুটে যায়।

অদীপ ঘোষ : গণতন্ত্র এবং উন্মাদ (অলৌকিক চুম্বকের টানে)

আমি উন্মাদ, আমি উন্মাদ!!
আমি চিনেছি আমারে, আজিকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ।।

কাজী নজরুল ইসলাম : বিদ্রোহী

আমি তাই করি ভাই যখন চাহে এ মন যা
করি শত্রুর সাথে গলাগলি ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা,
আমি উন্মাদ, আমি ঝঞ্ঝা!

কাজী নজরুল ইসলাম : বিদ্রোহী

আজি উন্মাদ মধুনিশি, ওগো
চৈত্রনিশীথশশী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চৈত্র রজনী (কল্পনা)

আমি-যে দেখিনু তরুণ বালক উন্মাদ হয়ে ছুটে
কী যন্ত্রণায় মরেছে পাথরে নিষ্ফল মাথা কুটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রশ্ন (পরিশেষ)

দগ্ধ হুতাশ্বাসে
জুটিলা উন্মাদপ্রায় হুঙ্কারি ভীষণ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বৃত্রসংহার কাব্য

উন্মাদাশ্রম

উন্মাদাশ্রম ঃ মুক্ত চিন্তার মানুষদের থাকিবার জন্য সুরক্ষিত আশ্রয়।

প্রমথনাথ বিশী ঃ অভিনব অভিধান

উপদেশ

বিজ্ঞ লোকের মত এই যে, যখন বিচারে পরাস্ত হইবে তখন গম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিড়াল (কমলাকান্ত)

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বড় সত্য এই যে, মানুষকে সদুপদেশ দিয়া কখনো ফললাভ হয় না। সৎ পরামর্শ কিছুতেই কেহ শুনে না।

শরৎচন্দ্র ঃ শ্রীকান্ত ৪র্থ

উপন্যাস

উপন্যাসে আমরা মানুষকে, তার জীবনের বহু বিচিত্র রূপকে, সংগ্রাম ও তৃষ্ণাকে, ব্যর্থতা ও সাফল্যকে দেখি। উপন্যাস মানবজীবনের দর্পণ। উপন্যাসের প্রথম ও শেষ অন্বিষ্ট মানুষ, তার জীবন। সুতরাং উপন্যাস জীবন-সংলগ্ন আলেখ্য।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ আঞ্চলিক উপন্যাস (বিষয় ঃ প্রবন্ধ)

উপন্যাস হচ্ছে সেই আধুনিক শিল্প-প্রতিমা যা শুধু সমগ্রতাস্পর্শীই নয়, যেখানে শিল্পিত স্বরগ্রামে প্রকাশিত হয় ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ আর তাঁর স্বদেশ, সমাজ ও সমকাল।

বুর্জোয়া সমাজের সমূহ শক্তি ও সবিশেষ স্বাতন্ত্র্যে আত্মস্থ হয়ে মধ্যযুগীয় জীর্ণ ও ভঙ্গুর সামন্ত সমাজ কাঠামো ভেঙ্গে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেছে উপন্যাস। এই উপন্যাসের জন্মদাতা নিঃসন্দেহে নবোত্থিত শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বুর্জোয়া সমাজ। সমাজ ও প্রকৃতির বিরুদ্ধে আধুনিক মানুষের যে সংগ্রাম—তারই মহাকাব্যিক রূপও উপন্যাস। রালফ ফক্স-এর ভাষায় The novel is the epic poem of our modern bourgeois society.

অরুণ সান্যাল ঃ ভূমিকা (প্রসঙ্গ ঃ বাংলা উপন্যাস)

মানুষের বাস্তব ও কল্পনার জগৎকে কেন্দ্র করেই উপন্যাস রচিত হয়। মানুষের জীবনধারা, সমাজ পরিপ্রেক্ষিত, আদর্শ, উদ্দেশ্য, প্রত্যয়—সমস্ত ব্যাপারই উপন্যাসের পটভূমিকায় কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও-বা পরোক্ষে নানা ধরনের রং-রস-ভাব সৃষ্ট করে।.......যার মূল উপাদান হল মানুষের বাস্তব জীবন, তাঁর না না, সমস্যা, সংশয়, নানা ভাব, কল্পনা, আদর্শের বিচিত্র সমারোহ।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য কোষ—কথাসাহিত্য (অলোক রায় সম্পাদিত)

একটি জীবনকে অনন্ত জটিলতার মধ্যে পরিকীর্ণ করে শাশ্বত জীবনের মূর্তি রচনা করে উপন্যাস। আর অনন্তে-প্রসৃত জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের গভীর অতলে একান্ত করে বিম্বিত—সীমা-ব্যঞ্জিত করে ছোটগল্প। সকল সার্থক গল্পের মতোই উপন্যাস এবং ছোটগল্পও বস্তুময় জীবন-রূপকে প্রতিফলিত করে থাকে নিজ নিজ শিল্প-রূপের মুকুরে। উপন্যাসের জীবন যেন পূর্ণিমা রাতে জোয়ারের সমুদ্রে বিম্বিত

জীবন-রূপ। একখানা ঢেউ হাজারখানা হয়ে ফুলে ফেঁপে আছড়ে পড়ছে,—বিচিত্র উল্লাস-আতঙ্কের সৃষ্টি ক'রে। ঢেউ-এর বুকে ঢেউ-এর মূর্চ্ছা উচ্ছ্বসিত ফেনায় তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে প্রতি মুহূর্তে, নীল ঢেউ-এর চুড়ায় চুড়ায় সাদা ফেনার পুঞ্জ,—কালোনাগের মাথায় যেন শুভ্র পদ্মরাগ মণি! মুহূর্তে জাগ্রত স-ফেন ঢেউ-এর শীর্ষে পূর্ণ চাঁদের আলো চক চক করে ওঠে ; শাদা ফেনার মুকুরে সেই পূর্ণ আলোয় একটি মানুষের একটি রূপ হাজারখানা হয়ে হাজার ঢেউ-এর মাথায় চকিতে হেসে ওঠে। কিন্তু সে কেবল ঐ মুহূর্তের জন্যে।—তারপর ঘোর গর্জনে ঢেউগুলি একে অন্যের ওপরে আছড়ে ভেঙে কুটি কুটি হয়ে যায়, শুভ্র-সফেনতা কালো জলের ভ্রূকুটিতলে আত্মহত্যা করে বাঁচে। আরো পরে অকূল সমুদ্রের আলোড়নকে আমূল পীড়িত করে আবার চলে শুভ্র-ফেনায় জীবন-মুকুর রচনার একান্ত প্রয়াস। উর্মিমুখর সমুদ্রে সহস্রবিভঙ্গ জীবনের উত্তাল-ক্ষুব্ধ রূপটিকে পূর্ণ-বিম্বিত করবার শিল্প-মুকুর উপন্যাস।

ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার

উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাসের আইনেই মরতে পারে, নীতির চোখ রাঙানিতে তার মরা চলে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্য ও নীতি (১)

উপন্যাস সর্বগ্রাহী। সার্থক শিল্পী জানেন যে মানুষের অন্তর্মুখীনতা বা হৃণ্ময়তা কবিতার বিষয়, তার দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্ব নাটকের বিষয়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি এও জানেন যে, সেই হৃণ্ময়তা ও দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি যখন সামাজিক মানুষের সম্পর্ক সূত্রে গ্রথিত করে দেখাতে চান তখনই উপন্যাসের অগ্রাধিকার। শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার সর্বত্রচারী। মানব-মনীষার অন্যতম প্রধান দান দর্শন, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব, এবং সাহিত্য শিল্পের যতগুলি শাখা অর্থাৎ কবিত্ব নাট্যরস এবং কাহিনীরস কোনো কিছু থেকেই ঋণগ্রহণে উপন্যাসের আপত্তি নেই।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

উপন্যাস গদ্যে বর্ণিত কল্পিত আখ্যানের মাধ্যমে জীবন ব্যাখ্যা।.....উপন্যাসের কাছ থেকে আমরা জীবনের সামগ্রিক রূপের সন্ধান চাই। সমাজ এবং সমাজ-বিধৃত মানুষ, পট এবং পট-নির্ভর জীবন উপন্যাসের উপাদান।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

মহাকাব্যের মতো সার্থক মহৎ উপন্যাসও শান্তরস পরিণামী। উপন্যাসের ফলশ্রুতিতে পাঠকচিত্তে জীবন সম্বন্ধে আগ্রহের গভীরতা বাড়ে, ব্যক্তিজীবনের বাসনা কামনাকে সুবৃহৎ পটে স্থাপিত দেখে তাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের আতিশয্যের হ্রাস হয়। আমরা তখন সহিষ্ণু উদার চিত্তে জীবনের অগাধ অসীমতা সম্বন্ধে সচেতন হই। চিত্তে শমভাবের সঞ্চার সার্থক উপন্যাসের শিল্পকর্মের লক্ষ্য।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা উপন্যাসের কালান্তর

উৎসব

তুমি আজ্ঞা দিলে আমি যাই পিতৃবাস।
বাপের উৎসব দেখি বড় অভিলাষ॥

মুকুন্দরাম : চণ্ডীমঙ্গল

উৎসবের মধ্যে মিলন চাই। একলার উৎসব হইলে চলে না।.....উৎসব একলার নহে। মিলনের মধ্যেই সত্যের প্রকাশ—সেই মিলনের মধ্যেই সত্যকে অনুভব করা উৎসবের

সম্পূর্ণতা। একলার মধ্যে যাহা ধ্যানযোগে বুঝিবার চেষ্টা করি, নিখিলের মধ্যে তাহাই প্রত্যক্ষ করিলে তবেই আমাদের উপলব্ধি সম্পূর্ণ হয়।.....উৎসবের একটা প্রধান লক্ষণ প্রাচুর্য। এইজন্য উৎসবদিনে আমরা প্রতিদিনের কার্পণ্য পরিহার করি—প্রতিদিন যেরূপ প্রয়োজন হিসাব করিয়া চলি, আজ তাহা অকাতরে জলাঞ্জলি দিতে হয়। দৈন্যের দিন অনেক আছে, আজ ঐশ্বর্যের দিন।

উৎসবের দিন সৌন্দর্যের দিন। এই দিনকে আমরা ফুলপাতার দ্বারা সাজাই, দীপমালার দ্বারা উজ্জ্বল করি, সংগীতের দ্বারা মধুর করিয়া তুলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসব (ধর্ম)

মানুষের উৎসব কবে? মানুষ যেদিন আপনার মনুষ্যত্বের শক্তি বিশেষভাবে স্মরণ করে, বিশেষভাবে উপলব্ধি করে, সেইদিন।.....প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র, দীন, একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসবের দিন (ধর্ম)

অনেক রসিক লোক হঠাৎ শরীরে একটা আঘাত করাকে পরিহাস জ্ঞান করেন.....হঠাৎ উৎকট বোমার আওয়াজ করা আমাদের দেশে উৎসবের অঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৌতুক হাস্য (পঞ্চভূত)

এত আলো জ্বালিয়েছ এই গগনে
কী উৎসবের লগনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতলেখা)

উৎসব জিনিষটাই হচ্ছে নবীনতার উপলব্ধি—তা আমাদের প্রতিদিনের অতীত। উৎসব হচ্ছে জীবনের কবিত্ব, যেখানে রস সেইখানেই তার প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্মোৎসব (শান্তিনিকেতন)

সত্য যেখানেই সুন্দর হয়ে প্রকাশ পায় সেইখানেই উৎসব।.....যে উৎসব নিখিলের উৎসব সেই উৎসবকে আজ আমরা উৎসব করে তুলব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতনে ৭ই পৌষের উৎসব (শান্তিনিকেতন)

উপরওয়ালা

উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাঁহাকে সম্মান করিবে, পার ভক্তি করিবে, কিন্তু কদাচ ভয় করিবে না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ধর্মতত্ত্ব (দশম অধ্যায়)

উপাচার্য

উপাচার্যদের দুটো যুগ, ডাইনোসেয়ার যুগে ভাইস চ্যান্সেলার হতেন আশুতোষ মুখার্জী, যদুনাথ সরকার, সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ। সেকালে যাঁরা হেডমাস্টার হবার সাহস পেতেন না তাঁরা পিগমি যুগে ভি সি হচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তো অভাব নেই—সাঁতরাগাছি, ডোমজুড়, কোন্নগর, এঁড়েদহ সব জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় ছড়িয়ে পড়েছে, এতো গুণনিধি পাবে কোথায়? **শংকর** ঃ যাবার বেলায়

উপাসনা

উপাসনা—আরাধ্যের সান্নিধ্য অনুভূতিসহ পূজা ; 'যদ্দ্বারা আনন্দস্বরূপ ঈশ্বরে নিজ আত্মাকে মগ্ন করা যায়'—দয়ানন্দ সরস্বতী

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ঃ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

সমস্ত উপাসনার সার—শুদ্ধচিত্ত হওয়া এবং অপরের কল্যাণ করা। দরিদ্র, দুর্বল, রুগী—সবার মধ্যেই যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই ঠিক ঠিক শিবের উপাসনা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী

প্রেম ও সহানুভূতিই একমাত্র পন্থা। ভালোবাসাই একমাত্র উপাসনা।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী

আনন্দই উপাসনা আনন্দময়ের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অভয় (চৈতালি)

তাঁর উপাসনা তাঁকে লাভ করবার উপাসনা নয়—আপনাকে দান করবার উপাসনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—উপাসনা

যখন বিদ্যার ধনের বা মানুষের উপাসনা করি........তখন উপাসনা যে কাকে বলে তা বুঝতে বাকি থাকে না।.....ঈশ্বরের উপাসনাটাই হচ্ছে উপাসনার মধ্যে সবচেয়ে ফাঁকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—মরণ

আমরা এতদিন প্রত্যহ আমাদের উপাসনা থেকে কী ফল চেয়েছিলুম? আমরা চেয়েছিলুম শান্তি। ভেবেছিলুম এই উপাসনা বনস্পতির মতো আমাদের ছায়া দেবে, প্রতিদিনের সংসারের তাপ থেকে আমাদের বাঁচাবে।

কিন্তু শান্তিকে চাইলেই শান্তি পাওয়া যায় না। তার চেয়ে আরও অনেক বেশি না চাইলে শান্তির প্রার্থনাও বিফল হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—কী চাই?

উর্বশী

নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী,
হে নন্দনবাসিনী উর্বশী!
গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসর শয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।
উষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা
তুমি অকুণ্ঠিতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উর্বশী

স্বর্গের উদয়াচলে মূর্তিমতী তুমি হে উষসী,
হে ভুবনমোহিনী উর্বশী!
জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা,
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণশোণিমা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উর্বশী

তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো!
কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে

হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণমুখে
উর্বর মেয়েরা আসে।

সমর সেন ঃ উর্বশী

উলঙ্গ

বাইরে পোষাক থাক উলঙ্গ ভেতরটা।

ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় ঃ পর্যটন (১১)

সবাই দেখছে যে রাজা উলঙ্গ, তবুও
সবাই হাততালি দিচ্ছে।
সবাই চেঁচিয়ে বলছে ঃ শাবাশ, শাবাশ।.....
কিন্তু সেই গল্পের ভিতরে.....
একটি শিশুও ছিল।
সত্যবাদী, সরল, সাহসী একটি শিশু।......
সে এসে একবার এই উলঙ্গ রাজার সামনে
নির্ভয়ে দাঁড়াক।
সে এসে একবার এই হাততালির ঊর্ধ্বে গলা তুলে
জিজ্ঞাসা করুক ঃ
রাজা, তোর কাপড় কোথায়?

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ উলঙ্গ রাজা

ঊষা

অয়ি সুখময়ি উষে
কে তোমারে নিরমিল?
বালার্ক-সিন্দূর ফোঁটা
কে তোমার ভালে দিল?

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ঃ উষা

ডাকে পাখি না ছাড়ে বাসা।
উড়ে বসে খাবে করি আশা॥
ফিরে যায় ঘরে না পেয়ে দিশা।
খনা ডেকে বলে তার নাম ঊষা॥

খনার বচন

ঋণ

জীবনে অনেক ঋণ থেকে যায়।.....
কে শোধে জীবনে ঋণ?
পৃথিবীর রোদ ও ছায়ার ঋণ কে শুধিতে পারে?

ঈশ্বর ত্রিপাঠী ঃ ঋণশোধ

জীবনের অনেক ঋণই শোধ করা যায় না ; শুধু স্বীকার করা যায় মাত্র।

বুদ্ধদেব গুহ ঃ কোয়েলের কাছে

ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে—ঋণ যাদের হাতে ঋণই হয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপানযাত্রী-১৫

আমি আছি গো তারিণি ঋণী তব পায়।

দাশরথি রায় ঃ পাঁচালী

অহঙ্কারী লোক কাহারো কাছে ঋণী থাকিতে চায় না।

প্রমথনাথ বিশী ঃ মাইকেল মধুসূদন

ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অকৃতজ্ঞ (কণিকা)

যে ঋণী সে কৃতজ্ঞ নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষা (পরিচয়)

ঋতুপতি/ঋতুরাজ

আওত রে ঋতুরাজ বসন্ত।
খেলত রাই কানু গুণবন্ত।।
তরুকুল মুকুলিত অলিকুল ধাব।
মদনমহোৎসব পিককুলরব।।

জ্ঞানদাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

আওল ঋতুপতি রাজ বসন্ত।
ধাওল অলিকুল মাধবী পন্ত।।

বিদ্যাপতি ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

ঋতুরাজের যে গায়ের কাপড়খানা আছে, তার একপিঠে নূতন, একপিঠে পুরাতন। যখন উল্‌টে পরেন, তখন দেখি শুকনো পাতা, ঝরা ফুল, আবার যখন পালটে নেন তখন সকাল বেলার মল্লিকা, সন্ধ্যাবেলার মালতী,—তখন ফাল্গুনের আম্রমঞ্জরি, চৈত্রের কনকচাঁপা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্ত

ঋদ্ধি

ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালোবাসেন না।

দীনেশচন্দ্র সেন ঃ রামায়ণী কথা (বাল্মীকি রামায়ণে ভরত সম্বন্ধে রামের উক্তি)।

এক

মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে—নহিলে তাহার মন মানে না, তাহার সুখ থাকে না, তাহার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তাহার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায়, তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌন্দর্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সংগীত,—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

গাছ থেকে যে-ডাল কাটা হয়েছে সে ডালের ভার মানুষকে বইতে হয় ; গাছে যে-

ডাল আছে সে ডাল মানুষের ভার বইতে পারে। এক থেকে বিচ্ছিন্ন যে অনেক তারই ভার মানুষের পক্ষে বোঝা ; একের মধ্যে বিধৃত যে অনেক সেই তো মানুষকে সম্পূর্ণ আশ্রয় দিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপানযাত্রী—১০

শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—৩৭

একা এক শূন্যমাত্র নাই অবলম্ব,
দুই দেখা দিলে হয় একের আরম্ভ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

বাইরের যে-এক, তা হচ্ছে প্রলয়, তাই একাকারত্ব,......অন্তরের যে-এক, তা হল সৃষ্টি, তাই ঐক্য। একটা হল পঞ্চত্ব, আর একটা হল পঞ্চায়েৎ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্যের পথে, পরিশিষ্ট। সভাপতির অভিভাষণ

যে ভাবে পরম-এক আনন্দে উৎসুক
আপনারে দুই করি লভিছেন সুখ,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্মরণ—২২

একটি

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে॥
ভরে রইল বুকের তলা, কারো কাছে হয় নি বলা,
কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতপঞ্চাশিকা

শুধু একটি গণ্ডূষ জল,
আহা, নিলেন তাঁহার করপুটের কমলকলিকায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চণ্ডালিকা

একটি চুম্বন গড়ি
দোঁহে লব ভাগ করি—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সান্ত্বনা (চিত্রা)

একটি ছোটো মালা তোমার
হাতের হবে বালা।
একটি ছোটো ফুল তোমার
কানের হবে দুল।
একটি তরুতলায় বসে
একটি ছোটো খেলায়
হারিয়ে দিয়ে যাবে মোরে
একটি সন্ধেবেলায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বপ্নশেষ (ক্ষণিকা)

একটু

একটু দেওয়া একটু রাখা,
একটু প্রকাশ একটু ঢাকা,
একটু হাসি একটু শরম—

দুজনের এই বোঝাবুঝি।
তোমার আমার এই-যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সোজাসুজি (ক্ষণিকা)

একলা

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

একলা বসে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বাসন্তী রঙ দিয়া।
খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (স্বরবিতান—১৩)

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা আকাশকুসুমচয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে তোমার দুখানি নয়নে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা

আমি একলা চলেছি এ ভবে,
আমায় পথের সন্ধান কে ক'বে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিসর্জন

পৃথিবীতে কোনো একলা মানুষই এক নয়, সে অর্ধেক। আর একজনের সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তধারা

একা

শিল্পে যখন একা—আমি গিয়ে বসি
স্টুডিয়োয়, সঙ্গে থাকেন ঈশ্বর ও যম
আমরা বসে পাশা খেলি, কখনও
মোমবাতি জ্বেলে পড়ি অরচিত আত্মজীবনী।

অমিতেশ মাইতি : মৃত্যুর উচ্ছ্বাস

যিনি দিয়েছেন তিনিই নিয়েছেন, সব হারিয়েই তো তাঁকে পাওয়া। হারাবার আর কোন ধনও নেই, ভাবনাও নেই। একাই এসেছি, একাই যাবো। যিনি সঙ্গে থাকার, সঙ্গে তো আছেনই।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : গঙ্গাবতরণ

একা একা তো প্রতিশোধ নেয়া যায় না। সবাই মিলে লড়াই করে আবর্জনা সরাতে হবে। এমন একটা সমাজ গড়তে হবে, যেখানে মায়েদের মার খেতে হয় না, বোনেদের ইজ্জৎ যায় না।

উৎপল দত্ত : সাদা পোষাক

আইতেও একা যাইতেও একা
কার সাহে কার দেখা।

বাংলা প্রবাদ

আমাদের বিবাহে স্বামী স্ত্রীতে অগ্নি সাক্ষী করে, সাত পা একসঙ্গে পা ফেলে হাঁটে। কিন্তু যখন ভগবানকে খোঁজে মানুষ, তখন সে একা, কারুর সঙ্গেই সাত পা হাঁটা যায় না।.....একা। সে পথে বিচিত্রভাবে আসে আশীর্বাদ, অভিশাপ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সপ্তপদী

কেহ একা থাকিও না। যদি অন্য কেহ তোমার প্রণয়ভাগী না হইল, তবে তোমার মনুষ্যজন্ম বৃথা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ একা (কমলাকান্ত)

দুইজনে পাশাপাশি যবে
রহে একা, তার চেয়ে একা কিছু নাই এ ভুবনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তি (বীথিকা)

চরের বালুতে ঠেকা
পরিত্যক্ত তরীসম রহিল সে একা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তি (বীথিকা)

পথে যতদিন ছিনু ততদিন
অনেকের সনে দেখা ;
সব শেষ হল যেখানে সেথায়
তুমি আর আমি একা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সমাপ্তি (ক্ষণিকা)

একাকিত্ব

বন্ধদুয়ার বিশ্ব বিরাজে,
নিবেছে ঘরের দীপ্তি,
চির-উপবাসী আপনার মাঝে
আপনি না পাই তৃপ্তি,
পদে পদে রয় সংশয় ভয়,
পদে পদে প্রেম ক্ষুণ্ণ,
বৃথা আহ্বান, বৃথা অনুনয়,
সখার আসন শূন্য,
মন বলি উঠে, 'ডুবে যা গভীরে,
মিথ্যে, এসব মিথ্যে,
নিবিড় ধেয়ানে নিখিল লভি রে,
আপনারি একাকিত্বে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুর্দিনে (পরিশেষ)

এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নববর্ষ (ভারতবর্ষ)

একাকী

বঁধুয়া, নিদ নাহি আঁখিপাতে।
আমিও একাকী তুমিও একাকী
আজি এ বাদল রাতে।

অতুলপ্রসাদ সেন ঃ গীতিগুঞ্জ

একাকীর নাই ভয়,
ভয় জনতার মাঝে ; একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রান্তিক—৩

যুরোপ ভোগ করে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ।......ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতবর্ষ (নববর্ষ)

এভোল্যুশন্

আমরা তৈরী করি তৈরী-জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ওইটেকেই বলে এভোল্যুশন্।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১৩

এম. এ

....রোমহর্ষক এম্.এ. ; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১

একুশে ফেব্রুয়ারী

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী,
আমি কি ভুলিতে পারি।

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী : একুশের গান

বাঙালির রাজনৈতিক পরিচয়, অবস্থানগত ঠিকানা যাই হোক না কেন, একুশে ফেব্রুয়ারী সব বাঙালির আত্ম-আবিষ্কারের দিন।

বাসব সরকার : একটি দিন, একটি আদর্শ
(আনন্দবাজার পত্রিকা ৬ই ফাল্গুন ১৪০১)

এপিক রীতি

ব্রেখট-ও বহু চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন—একত্রে বহু ভাব দেখালে নাটকে জটিলতা সৃষ্টি হয়, সাধারণ দর্শকের পক্ষে বিপ্লবতত্ত্ব বুঝতে অসুবিধা হয়। অন্যপক্ষে মার্কসবাদী হিসেবে, ডায়ালেক্‌টিশিয়ান হিসেবে তাঁর পক্ষে মানুষকে স্রেফ শাদা বা স্রেফ কালো মনে করা ছিল অসম্ভব। সমাধান হিসেবে তাঁর এপিক রীতি আবিষ্কার—বা বলা চলে পুনরাবিষ্কার। প্রাচীন মহাকাব্য থেকে যেমন তিনি দূরত্ব সৃষ্টি ও বিশ্লেষণী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন, মানুষকে কীভাবে দেখাব এ প্রশ্নের উত্তরও সেই মহাকাব্য থেকেই সংগ্রহ করলেন। শেকসপিয়ারে চরিত্ররা যেমন দৃশ্য থেকে দৃশ্যে জটিলতর হয়ে উঠতে থাকে, অন্তর্দ্বন্দ্বে বিপর্যস্ত হতে থাকে, প্রাচীন মহাকাব্যে তা কখনো হয় না। অর্জুন বা কর্ণের বিপর্যয় নেই, তারা পাষাণপ্রতিমার ন্যায় বৃহৎ ও শান্ত। তাদের এককে পর্বে এককে ভাব। অর্জুন কখনো প্রেমিক, কখনো মহাবীর, কখনো বা যুদ্ধবিমুখ। কর্ণ কখনো নারী উৎপীড়ক, কখনো বীরশ্রেষ্ঠ, কখনো বা মাতৃস্নেহলোলুপ জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব। শাদা ও কালো দুই চিত্রই উপস্থিত হচ্ছে, তবে একত্রে ধূসর রং ধারণ করে নয়, আলাদা, পর পর। এতে তথাকথিত লজিকের প্রয়োজন হয় না। মহাকাব্য

নিজের দূরত্ব বজায় রাখে বলে দৈনন্দিনতায় আবদ্ধ নয়। উপকথার যেমন জাগতিক লজিক লাগে না, মহাকাব্যেরও নয়। এই ফর্মকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক আলোয় সংশোধিত ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছেন ব্রেখট, থিয়েটারকে দিয়েছেন উপকথার বৃহত্ব, মহাকাব্যের গরিমা। মানুষকে ব্রেখট দেখিয়েছেন একেক দৃশ্যে একেক রূপে, প্রতি রূপকে আরো স্পষ্ট করে দিয়েছেন বৃহৎ লিখিত বিজ্ঞপ্তি মারফত ঃ 'তখন কুরাজ ব্যবসায়ে নামলেন' বা 'য়োহানার ধর্মভাব' অথবা 'গালিলেও স্বর্গ উঠিয়ে দিলেন'। কুরাজ যে কখনো মাতা, কখনো কূট ব্যবসায়ী, কখনো ফিউদাল যুদ্ধবাজদের সমালোচক, কখনো বা হতভম্ব নির্বোধ—এইসব একের পর এক চিত্র চলে যায় দর্শকচক্ষুর সামনে দিয়ে। সবগুলির সমন্বয়ে আস্ত মানুষ কুরাজ সৃষ্টি হয় দর্শকমনে। এইভাবে এপিকের দূরত্ব, আপাত নির্লিপ্ততা এবং একেক পর্বে একেক ভাব মারফত ব্রেখট সৃষ্টি করেছেন আজকের কুরুক্ষেত্র, আজকের কুরু-পাণ্ডব।

উৎপল দত্ত ঃ এপিকের সার কথা

ব্রেখটের এপিক রীতি নাট্যশালায় মার্কসবাদী ডায়ালেকটিকস প্রয়োগের এক চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। তাঁর সারা জীবনের বিপ্লবচিন্তা, নাট্যচিন্তা এবং আঙ্গিকচিন্তা অঙ্গাঙ্গি জড়িত।

উৎপল দত্ত ঃ এপিকের সার কথা

এলিয়েনেশন

ব্রেখট তাঁর নতুন পদ্ধতিতে অভিনেতাকে একেবারে আবেগশূন্য করতে চেয়েছিলেন ; তাঁর এই পদ্ধতির নাম 'ভেরফ্রেম্‌ডুং'। তাঁর এপিক থিয়েটারের পরীক্ষা সাফল্যের পথে, এ কথাও আজ সর্বজনবিদিত। তিনি চাইছেন 'এলিয়েনেশন' ঃ ঘটনা এবং পরিবেশ থেকে অভিনেতার দূরত্ব বজায় রেখে অভিনয় করা। অভিনেতার কাছ থেকে তিনি চাইছেন বৈজ্ঞানিক বা ঐতিহাসিকের নিরুত্তাপ দৃষ্টিভঙ্গি। তার জন্যে প্রথমেই আবেগ-আদিকে ছাঁটাই করতে হবে ঃ

> If the A-effect (এলিয়েনেশেন বা ভেরফ্রেমডুং) is to achieve its aim, the stage and the auditorium must be cleared of magic .... The actor is not to warm the audience up by unloosing a flood of temperament.

এরভিন পিসকাটর সোজাসুজি এই এপিক অভিনয়ের নাম দিয়েছেন 'অবজেকটিভ অ্যাকটিং,' অভিনেতা যেখানে সূত্রধার মাত্র, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মতন। অভিনেতার 'আবেগ' বা 'পার্টে ডুবে যাওয়া' ইত্যাদি শিকেয় তুলে রাখার প্রস্তাব করেছেন পিসকাটর।

উৎপল দত্ত ঃ সঙ্গীত ও অভিনয়

এসো

এসো এসো ফিরে এসো, বঁধু হে ফিরে এসো।
আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, নাথ হে ফিরে এসো।
ওহে নিষ্ঠুর, ফিরে এসো,
আমার করুণকোমল এসো,
আমার সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এসো,
আমার চিরদুখ ফিরে এসো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (স্বরবিতান—১৩)

এসো গো নূতন জীবন।
এসো গো কঠোর নিঠুর নীরব, এস গো ভীষণ শোভন॥
এসো অপ্রিয় বিরস তিক্ত, এসো গো অশ্রুসলিলসিক্ত,
এসো গো ভূষণবিহীন রিক্ত, এসো গো চিত্তপাবন॥
.....এসো গো প্রখর হোমানলশিখা হৃদয়শোণিতপ্রাশন।
এসো গো পরমদুঃখনিলয়, আশা-অঙ্কুর করহ বিলয়—
এসো সংগ্রাম, এসো মহাজয়, এসো গো মরণসাধন॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান।

এসো আমার ঘরে।
বাহির হয়ে এসো তুমি যে আছ অন্তরে॥
স্বপনদুয়ার খুলে এসো অরুণ-আলোকে
মুগ্ধ এ চোখে।
ক্ষণকালের আভাস হতে চিরকালের তরে
এসো আমার ঘরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৫৮

তুমি নব নব-রূপে এসো প্রাণে।
এসো গন্ধে বরনে, এসো গানে।
......এসো দুঃখে সুখে, এসো মর্মে,
এসো নিত্য নিত্য সব কর্মে,
এসো সকলকর্ম-অবসানে,
তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৭

ঘুমের ঘন গহন হতে যেমন আসে স্বপ্ন
তেমনি উঠে এসো এসো।
শমী শাখার বৃক্ষ হতে যেমন জ্বলে অগ্নি,
তেমনি তুমি এসো এসো।
ঈশান কোণে কালো মেঘের নিষেধ বিদারি
যেমন আসে সহসা বিদ্যুৎ,
তেমনি তুমি চমক হানি এসো হৃদয়তলে
এসো তুমি, এসো তুমি, এসো, এসো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চণ্ডালিকা

বহুদূর তীরে কারা ডাকে বাঁধি অঞ্জলি
এসো এসো সুরে করুণ-মিনতি-মাখা।
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর,
এখনি অন্ধ, বন্ধ কোরো না পাখা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুঃসময় (কল্পনা)

এ্যাবসার্ড নাটক/দ্র. উদ্ভট নাট্যরীতি

অ্যাবসার্ড নাট্যরীতিতে স্থানকালের অসংগতি, পারম্পর্যহীনতা, সংলাপের অর্থহীনতা এবং ঘটনার উদ্ভটত্বই লক্ষ্য করা যায়।

অজিতকুমার ঘোষ : আধুনিক নাটক ও নাট্যমঞ্চ

উদ্ভট নাটকে ঘটনা বলতে কিছুই নেই। এর ঘটনার কোনো সমাপ্তিও নেই। চরিত্রগুলির কাজের পিছনে কোনো সুস্পষ্ট ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য নেই। এর সংলাপ অর্থহীন শব্দের সমষ্টি ; যুক্তি শৃঙ্খলা ও পারম্পর্য বলতে এতে কিছুই নেই। এতে জীবনের কোনো মূল্যের প্রতিই আস্থা দেখানো হয় না। সবকিছুই মূল্যহীন, সব কিছুই প্রয়োজনহীন। অসঙ্গতি উদ্দেশ্যহীনতা ও অনস্তিত্বই হচ্ছে একমাত্র সার কথা।

অজিতকুমার ঘোষ : উদ্ভট নাটক, আঙ্গিক ও জীবনদৃষ্টি

অ্যাবসার্ড অভিধাটির প্রথম তাত্ত্বিক সাহিত্যিক ও অস্তিত্ববাদী দার্শনিক আল্‌ব্যের কামু। তিনি তাঁর ১৯৪২-এ রচিত 'মীথ অব সিসিফাস' প্রবন্ধে অভিধাটি ব্যবহার করেন। কামুর মতে, মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা এবং অর্থহীন পৃথিবী—যে অর্থহীনতার মধ্যে তাকে ঠেলে দেয়া হয়—এই দু'য়ের ভেতরে ব্যবধান থেকেই অ্যাবসার্ডিটি জন্ম নেয়। অ্যাবসার্ড নাটকের ঘটনা (action) কোনও কাহিনী বলে না, পরিবর্তে এমন কিছু রূপকল্পের জোগান দেয় যা মানুষের অস্তিত্বের জটিলতা, অনিশ্চয়তা ও দুর্বোধ্যতাকে প্রকাশ করে।

জিয়া হায়দার : অ্যাবসার্ড নাটক

এ্যামিবা

এ্যামিবার কি-বা গতি, ঠিক মতো ঠ্যাঙ্ নেই
ধরাশায়ী ধর ছাড়া মুণ্ডু কি মাথা নেই
তবু এই পুঁচকেই নাম ডাক করেছে
বায়োলজি বুই-টইয়ে জীবনীও ছেপেছে।

দীপঙ্কর রায় : গাছে ওঠা গরু

কালে-কালে কতই হল
সেই অ্যামিবা মানুষ হল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : আদ্যিকালের বুড়ি

ঐকতান

পেঁকো নর্দমায়
বীভৎস মাছির দল ঐকতান-বাদন জমায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অনসূয়া (সানাই)

প্রকৃতির ঐকতান স্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে ;
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ—
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐকতান (জন্মদিনে)

সাহিত্যের ঐকতান সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,

নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐকতান (জন্মদিনে)

বিধাতা চান.....বহুকে গেঁথে গেঁথে সৃষ্টি হবে ঐক্যের ; বিশেষফললুব্ধ শাসনকর্তারা চান.....বহুকে দ'লে ফেলে পিণ্ড পাকানো হবে সাম্যের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চরকা (কালান্তর)

ইংরেজের রাজত্বে আমরা এক-শাসন পাইয়াছি, কিন্তু এক-দায়িত্ব পাই নাই। তাই আমাদের ঐক্য বাহিরের। এ ঐক্যে আমরা মিলি না, পাশে পাশে সাজানো থাকি, বাহিরে বা ভিতরে একটু ধাক্কা পাইলেই ঠোকাঠুকি বাধিয়া যায়।....ইহা ঘুমন্ত মানুষের এক মাটিতে শুইয়া থাকিবার ঐক্য, ইহা সজাগ মানুষের এক পথে চলিবার ঐক্য নহে।.......ইহাতে কেবল স্তুতি করিতে পারি, নতি করিতে পারি, উন্নতি করিতে পারি না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছোটো ও বড়ো (কালান্তর)

যে পরিবারে দশজন মানুষ আছে সেখানে তো দশটা বৈচিত্র্য।......সুইজরল্যাণ্ড যদি নানা জাতিকে লইয়াই এক হইয়া থাকে তবে ইহাই বুঝিতে হইবে সেখানে নানাত্বকে অতিক্রম করিয়াও একত্ব কর্তা হইয়া উঠিতে পারিয়াছে ; সেখানকার সমাজে এমন একটি ঐক্যধর্ম আছে। আমাদের দেশে বৈচিত্র্যই আছে কিন্তু ঐক্য-ধর্মের অভাবে বিশ্লিষ্টতাই ভাষা, জাতি, ধর্ম, সমাজ ও লোকাচারে নানাবিধ আকার ধারণ করিয়া এই বৃহৎ দেশকে ছোটোবড়ো বহুতর ভাগে-বিভাগে শতবিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।....চক্ষু বুঁজিয়া এ-কথা বলিলে ধর্ম শুনিবে না যে,.......কেবল ইংরেজকে কোনোমতে বাদ দিতে পারিলেই বাঙালিতে পাঞ্জাবিতে মারাঠিতে মাদ্রাজিতে হিন্দুতে মুসলমানে মিলিয়া একমনে এক প্রাণে এক স্বার্থে স্বাধীন হইয়া উঠিব।.....ভারতবর্ষে যেটুকু ঐক্য দেখিয়া আমরা সিদ্ধিলাভকে আসন্ন জ্ঞান করিতেছি তাহা যান্ত্রিক, তাহা জৈবিক নহে। ভারতবর্ষের ভিন্ন জাতির মধ্যে সেই ঐক্য জীবনধর্মবশত ঘটে নাই—পরজাতির এক শৃঙ্খলই বাহিরের বন্ধনে একত্র জোড় দিয়া রাখিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথ ও পাথেয় (রাজা প্রজা)

প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

ঐতিহাসিক

ইতিহাসের আনুপূর্বিক ধারা আবিষ্কার করা এবং সেই ধারার তরঙ্গায়িত গতির ছন্দটি খুঁজে বার করাই ঐতিহাসিকের প্রধান লক্ষ্য।

বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (১ম)

ঐশ্বর্য

ঐশ্বর্যজ্ঞানেতে সব জগৎ মিশ্রিত।
ঐশ্বর্যশিথিল প্রেমে নাহি মোর প্রীত।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত

সেই ঐশ্বর্য-যুগ, যে ঐশ্বর্য আবশ্যককে অবজ্ঞা করতে পারত, এখন চলে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পারস্যে

গুণের বাহ্য নিদর্শনস্বরূপ হয়ে ঐশ্বর্য দেখা দেয়, অবশেষে বাহ্যাড়ম্বরের অনুবর্তী হয়ে না এলে গুণের আর সম্মান থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সমাজ)

ঐশ্বর্যের আড়ম্বরই বিলাতি ধনীর প্রধান শোভা, মঙ্গলের আয়োজন ভারতের ধনীর প্রধান শোভা। সমাজস্থ বন্ধুদিগকে বহুমূল্য পাত্রে বহুমূল্য ভোজ দিয়া বিলাতের ধনী তৃপ্ত, আহূত রবাহূত অনাহূতদিগকে কলার পাতায় অন্নদান করিয়া আমাদের ধনীরা তৃপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বারোয়ারি মঙ্গল (ভারতবর্ষ)

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য একটি প্রধান অন্তরায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (চারিত্রপূজা)

কিন্তু কাকে বলে ঐশ্বর্য তাই নিয়ে তর্ক। ক্রাইসলারের গাড়িকে যারা ঐশ্বর্য বলে, আমি তো বলি, তারা মানুষকে ছোটো করবার দিকে টানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবিবার (তিনসঙ্গী)

সাবেক কালে......ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ছিল প্রধানত সামাজিক দানে ও কর্মে, এখন হয়েছে ব্যক্তিগত ভোগে। তাতে বিস্মিত করে, আনন্দিত করে না ; ঈর্ষা জাগায়, প্রশংসা জাগায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাশিয়ার চিঠি—উপসংহার

ওকালতি

সুনীত ধরেছে ওকালতি,
ওকালতি ধরল না তাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভীরু (পুনশ্চ)

ওজন

যেখানে অনেককে টিকিতে হইবে সেখানে......আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই একককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সংগীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

ওঠা/উঠুন

উঠুন, দলিত ভুজঙ্গের মত ফণা বিস্তার করে উঠুন ; হৃতশাবক ব্যাঘ্রীর মত প্রমত্ত বিক্রমে গর্জে উঠুন ; অত্যাচারে ক্ষিপ্ত জাতির মত জেগে উঠুন। নিয়তির মত কঠিন হৌন ; হিংসার মত অন্ধ হৌন ; শয়তানের মত ক্রূর হৌন। তবে তার সঙ্গে পার্বেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সাজাহান

ওড়না

ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথের বাঁধন (মহুয়া)

স্বপ্নসম ওড়না গেল উড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হোরিখেলা (কথা)

ওঁ

সীমা শব্দটার সঙ্গে একটা 'না' লাগিয়ে দিয়ে আমরা "অসীম শব্দটাকে রচনা করে সেই শব্দটাকে শূন্যাকার করে বৃথা ভাবতে চেষ্টা করি, কিন্তু অসীম" তো না নন, তিনি যে নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন 'হাঁ'। তাইতো তাঁকে ওঁ বলে ধ্যান করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছোটো ও বড়ো (শান্তিনিকেতন)

ওঁ শব্দের অর্থ, হাঁ।.....ছান্দোগ্য বলেছেন মিথুনের মাঝখানে অর্থাৎ দুই যেখানে মিলেছে সেইখানেই এই ওঁ।......পরিপূর্ণতার সঙ্গীত ওঁ। যাঁর মধ্যে কিছুই বাদ পড়েনি, যাঁর মধ্যে সমস্ত খণ্ডই অনন্ত হয়েছে, সমস্ত বিরোধ মিলিত হয়েছে,.....। ......যা সমস্তকে নিয়ে অথচ যা কোন খণ্ডকে আশ্রয় করে নয়, যা চন্দ্রে নয় সূর্যে নয় মানুষে নয় অথচ সমস্ত চন্দ্র-সূর্য-মানুষে, যা কানে নয় চোখে নয় বাক্যে নয় মনে নয় অথচ কানে-চোখে-বাক্যে-মনে, সেই এককেই, সেই হাঁ-কেই সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে....স্বীকার হচ্ছে ওংকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ওঁ (শান্তিনিকেতন)

ওড়া

ওগো হংসের পাঁতি,.......
শীতপবনের সাথি,
ওড়ার মদিরা পাখায় করিছ পান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

শঙ্খচিল উড়ছে একলা
ঘন নীলের মধ্যে,
.....নিঃশব্দ জপমন্ত্রের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষসপ্তক—সাতাশ

ওস্তাদি

গান বল, চিত্র বল, কাব্য বল, ওস্তাদি প্রথমে নম্রশিরে, মোগল দরবারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির মতো, তাদের পিছনে থাকে। কিন্তু যে-হেতু প্রভুর চেয়ে সেবকের পাগড়ির রং কড়া, তার তক্‌মার চোখ-ধাঁধানি বেশি, এই কারণে তারা ভিড়ের উৎসাহ যতই পায় ততই পিছন ছেড়ে সামনে এসে জমা হয়। যথার্থ আর্ট তখন হার মানে,.....আভরণ হয়ে ওঠে শৃ , ...।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রী

সারা প্রহর একটানা এক পঞ্চম সুর সাধি
লুকিয়ে কোকিল করে কী ওস্তাদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রোগশয্যায়—৬

ঔৎসুক্য

ঔৎসুক্য খুবই ভাল গুণ। কিন্তু ক্ষমতায় আসীন লোকদের সোর্স-অব-ইনকাম সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিও না।

আবুল মনসুর আহমদ ঃ রাজনৈতিক বাল্য শিক্ষা

ঔদার্য

ঔদার্য ভরা-উদরের উপরে অনেকটা নির্ভর করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাশিয়ার চিঠি

ঔদাস্য

অভ্যাসের সীমা-টানা চৈতন্যের সংকীর্ণ সংকোচে
ঔদাস্যের ধুলা ওড়ে, আঁখির বিস্ময়রস ঘোচে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নীলমণিলতা (বনবাণী)

অলস ঔদাস্যভরে
মধ্যাহ্নের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুষ্ক পত্র লয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যেতে নাহি দিব (সোনার তরী)

ঔষধ/ওষুধ

পারত পক্ষে, ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা।

স্বামী বিবেকানন্দ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য

সর্বনাশ করেছে ওই পোড়া ডাক্তার বদ্দিগুলো। ওরা সবজান্তা, ওষুধের জোরে ওরা সব করতে পারে। একটু পেট গরম হয়েছে তো অমনি একটু ওষুধ দাও। পোড়া বদ্দিও বলে না যে, দূর কর ওষুধ, যা দু-ক্রোশ হেঁটে আসগে যা।

স্বামী বিবেকানন্দ : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

একজামিন পাশের পেটেণ্ট ঔষধ......পাঠ্যপুস্তকের মোটা মোটা নোট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চতুরঙ্গ। শ্রীবিলাস—৫

ওষুধে ডাক্তারে
ব্যাধির চেয়ে আধি হল বড়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাঁকি (পলাতক)

যে ব্যামোর দেখবেন সাতান্ন রকমের ওষুধ, বুঝে নেবেন সে ব্যামো ওষুধে সারে না। **সৈয়দ মুজতবা আলী : বেঁচে থাকো সর্দি কাশি**

কটাক্ষ

কটাক্ষেতে ছিটিয়ে দিলে হাসি,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মাল্যতত্ত্ব (প্রহাসিনী)

পরেন বটে জুতা মোজা
চলেন বটে সোজা সোজা
বলেন বটে কথাবার্তা
অন্য দেশীর চালে,
তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা দিত
কালিদাসের কালে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সেকাল (ক্ষণিকা)

কঠিন

শীতের বনে কোন সে কঠিন আসবে বলে
শিউলিগুলি ভয়ে মলিন বনের কোলে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (স্বরবিতান—২)

বড়ো কঠিন সাধনা, যার
বড়ো সহজ সুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিমাল্য—১৪

যাহা কঠিন, তাহা কঠিনই ; যাহা দুঃসাধ্য তাহা দুঃসাধ্যই ; ইহাতে কিছু অসুবিধা আছে বটে কিন্তু সহজ করিবার চেষ্টা করিলে অসুবিধা আরও সাতগুণ বাড়িয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নর্মাল স্কুল (জীবনস্মৃতি)

লোহা কঠিন, বজ্র কঠিন, নাগরা জুতোর তলা—
তাহার অধিক কঠিন তোমার বাপের বাড়ি চলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রঙ্গ (প্রহাসিনী)

সত্য যে কঠিন,
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম—
সে কখনো করে না বঞ্চনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রূপ নারানের কূলে (শেষ লেখা)

কণ্টক

কণ্টক যতই ক্ষুদ্র হউক তাহার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বঙ্কিমচন্দ্র (আধুনিক সাহিত্য)

কণ্ঠ

.....কবি.....কোকিলের সঙ্গে এই কণ্ঠের তুলনা করেন। অন্যায় করেন না। কোনো কথা গোপনে বলবার অভ্যাস ঐ পাখিটার নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তপতী—১

আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল ভুলায়ে,
সে যে বাসা বাঁধে নীরব মনের কুলায়ে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবগীতিকা—২

মোগল-শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুইজনা দুই জনে—
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বন্দীবীর (কথা)

দেহটা যে-ওজনের কণ্ঠস্বরটাও তেমনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঁশরি—১।২

কত

কত কথা তারে ছিল বলিতে।
চোখে চোখে দেখা হল পথ চলিতে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিমালা

....কত টুকিটাকি, কত ইটি-উটি, কত মিষ্টতা, কত শিষ্টতা, কত কথা, কত কাহিনী, কত ভাব, কত ভঙ্গি, কত অবসর সঞ্চয় করিয়া তবে এই পৃথিবীর গৃহকার্য চালাইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিচয় (পঞ্চভূত)

কথা

অনেক আশ্চর্য কথা হয়তো বলেছি তার কানে।
হৃদয়ের কতটুকু মানে
তবু সে-কথায় ধরে!

প্রেমেন্দ্র মিত্র : কথা

আর কোন কথা নেই আমাদের
এখন কেবল উত্তাপবিহীন ক্ষয়
আর প্রত্যাশাবিহীন অপেক্ষা।

বাসুদেব দেব : আমাদের অপেক্ষা (হেমন্ত সন্ধ্যার গান)

যখন ব্যথা হইতে কথা আসে না, কথা হইতেই কথা আসে, তখন কথার কারুকার্য ক্রমশ জটিল ও নিপুণতর হইয়া উঠিতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবি ইয়েট্‌স্ (পথের সঞ্চয়)

চাণক্য যাহাদিগকে কথা কহিতে বারণ করেন তাহারাই আগে-ভাগে কথা কহিয়া বসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র (ছন্দ)

আঁখি তার কথা কয়, বাহুভঙ্গী কত কথা বলে,
চরণ যখন চলে
কথা কয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নারী-কাকলী (মহুয়া)

ছাপা অক্ষরে যেসব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে, সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিশীথে (গল্পগুচ্ছ)

ভুলে গেছ নির্বাক দেবতা
বেদিতে বসিবে আসি যবে, কথার দেউলখানি
কথার অতীত মৌনে লভিবে চরমতম বাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট—১৮

ধ্বনি দিয়ে আঁট-বাঁধা শব্দই ভাষার ইট, বাংলায় তাকে বলি "কথা"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলাভাষা-পরিচয়—২

কী কথা উঠে মর্মরিয়া বকুলতরুপল্লবে,
ভ্রমর উঠে গুঞ্জরিয়া কী ভাষা!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মদনভস্মের পর (কল্পনা)

এমন কথা আছে ভাষায় বললে যার আলো যায় নিভে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালঞ্চ—৮

সব কথারই ভাষা আছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালঞ্চ—৩

কথার দরকার কিসের। পুরুষ পাখিই গান করে,......মেয়ে পাখি চুপ করে শুনলেই উত্তর দেওয়া হল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালঞ্চ—৫

কোন্ কথার টিকে কোন্ চালে আগুন লাগায় কেউ জানে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রক্তকরবী

অধরে অধর বসি প্রহরীর মতো
চপল কথার দ্বার রাখুক রুধিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ও রানী—১।৩

চাষা-ভুষোর মুখে যে কথাটা ছোট্ট, বড়োলোকের মুখে সেইটেই কত বড়ো শোনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ও রানী—১।৫

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায় নীরব নীড়ের 'পরে
কথাহীন ব্যথা একা একা বাস করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

কথা ধনীঘরের মেয়ে,
অর্থ আনে সঙ্গে করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক—১৬

একের কথার উপর আরের মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১৭

বড়ো কথা একলাই একটানা বলিয়া যাওয়া চলে, অন্যপক্ষ মন দিল কিনা খেয়াল না করিলেই হয়, কিন্তু তুচ্ছ কথায় নিয়ত দুইপক্ষের যোগ থাকা চাই। বাঁশি একাই বাজিতে পারে, কিন্তু দুইয়ের মিল না থাকিলে করতালের খচমচ জমে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের রাত্রি (গল্পগুচ্ছ)

সহজে বলবার কথা পৃথিবীতে এত আছে যে তাক্-লাগানো কথা না ব'ললেও সময় কেটে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শোধবোধ

কেউ বা মরে কথা ব'লে কেউ বা মরে না ব'লে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—২

—কথা না ব'লে কি বাঁচা যায়।
—কথা বলেই মানুষ মরে।......যারা কথা বলত সবাই মরেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—২

কথা চাই, কথা চাই, হাঁকে
কথার বাজারে ;
কথাওয়ালা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে
হাজারে হাজারে।
প্রাণে তোর বাণী যদি থাকে,
মৌনে তোর বাণী যদি থাকে,
মৌনে ঢাকিয়া রাখ তাকে,
মুখর এ হাটের মাঝারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—৪৮

কথা জিনিষটা মানুষেরই,.......গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ।.....গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—১১

কন্যা

অনুবন্ধি করে কন্যা মুনির সেবন।

কাশীরাম দাস ঃ মহাভারত

বর কন্যা যাইতে বাজে মধুর বাজনা।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ঃ মনসার ভাসান

কাহার যুবতী কন্যা আনিয়াছ ঘরে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ চণ্ডীমঙ্গল

যেদিন দেখ্যাছি কন্যা তোমার চান্দবদন।
সেইদিন হইয়াছি আমি পাগল যেমন।।

চন্দ্রাবতী ঃ (মৈমনসিংহ গীতিকা)

সোনার কাঠির শিহর-লাগা বিশ বছরের বেগে
আছেন কন্যা দেহে মনে পরিপূর্ণ জেগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মালাতত্ত্ব (প্রহাসিনী)

কন্যা নহেক পিতার
শাখাচ্যুত পুষ্প শাখে ফিরে না কো আর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সতী (কাহিনী)

কন্যা সম্প্রদান

আমাদের সমাজে কন্যার পিতার এই পরিণাম! ঘরে ঘরে এই শোচনীয় অবস্থা! কোথাও পুত্রবধূর আত্মহত্যা কোথাও কন্যা পরিত্যক্তা! প্রতি গৃহে দরিদ্রতা। সকলের চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য গৃহে গৃহে নিত্য বিরাজমান!—তথাপি আমরা পুত্রের শুভবিবাহে কন্যার পিতাকে পীড়ন করতে পরাঙ্মুখ হই না। পবিত্র উদ্বাহ, আমাদের সমাজের এক অদ্ভুত কীর্তি—জগতে এক নূতন রহস্য! বাঙ্গালায় কন্যা সম্প্রদান নয়—বলিদান!!

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ঃ বলিদান ৫।৯

কপাল

কপাল ঠুকিয়া লাগিলেই কপালের জোরও বাড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভাই ফোঁটা (গল্পগুচ্ছ)

'একেই বলে কপাল' অর্থাৎ পূর্বজন্মের ইস্টিমতেই এ জন্মের গাড়ি চলছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ—২

কপালটা মস্ত ;
তার উত্তর দিগন্তে নেই চুল,
দক্ষিণ দিগন্তে নেই ভুরু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সহযাত্রী (পুনশ্চ)

ফুঃ, এখনও সেই চারমিনারেই রয়ে গেলে।
তোমার কপালে আর করে খাওয়া হল না দেখছি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ

কবি

কবি ছাড়া যুদ্ধে জেতা যায় না।

অনিল সরকার ঃ আফ্রিকার যীশু (ব্রাত্যজনের কবিতা)

কবি তার স্বকালের বই-কি। কিন্তু কবির উক্তি একবার উচ্চারিত হলে চিরকালের। হাওয়ার পিঠে সওয়ার হয়ে বীজ যেমন দূর দেশে যায় তেমনি সময়ের পাখায় ভর করে কবির উক্তি যেতে পারে নিরবধি কালের শেষ সীমানা অবধি।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ কবি ও তার স্বকাল

যতদিন একটিও মানুষ ক্ষুধায়
ঘুমিও না কবি
যতদিন একটিও শিশু অচিকিৎসায়
ঘুমিও না কবি
যতদিন একটিও নারীর শরীর অনিচ্ছায়
ঘুমিও না কবি.....
কবি, তুমি কোটিবর্ষ ঘুমানোর অবসর পাবে
মৃত্যুর বিছানা পাতা রয়েছে অম্লান সুখময়
যতদিন বেঁচে আছো, ঘুমিও না......
পৃথিবী উন্মুখ হয়ে শুনতে চায়
তোমারই কবিতা।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী : কবি

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী',
কবি ও অকবি যাহা বলো মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি।
কেহ বলে 'তুমি ভবিষ্যতে যে
ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে-বাণী কই, কবি?'
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী।
পরোয়া করি না, বাঁচি বা না-বাঁচি যুগের হুজুগ কেটে গেলে,
মাথার ওপর জ্বলিছেন রবি, রয়েছে সোনার শত ছেলে।
প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

কাজী নজরুল ইসলাম : আমার কৈফিয়ৎ

আমি কবি। অপ্রকাশক সত্যকে প্রকাশ করবার জন্য, অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তি দানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত কবির কণ্ঠে ভগবান সাড়া দেন। আমার বাণী সত্যের প্রকাশিকা, ভগবানের বাণী। সে-বাণী রাজ-বিচারে রাজদ্রোহী হতে পারে, কিন্তু ন্যায়-বিচারে সে বাণী ন্যায়-দ্রোহী নয়। সত্য-দ্রোহী নয়। সে বাণী রাজদ্বারে দণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু ধর্মের আলোকে, ন্যায়ের দুয়ারে তাহা নিরপরাধ, নিষ্কলুষ, অম্লান, অনির্বাণ, সত্যস্বরূপ।

কাজী নজরুল ইসলাম : রাজবন্দীর জবানবন্দী

সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি।

জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কথা

আমি কবি শব্দের ইন্দ্রজাল বুনে চলি ঠিক
আকাশ ময়ূর-নীলে লিখে চলি হীরের অক্ষর,
আমি কবি পৃথিবীর শেষ যাদুকর—
আমরাই শতাব্দীর শেষ তান্ত্রিক।

দিনেশ দাস : শেষ তান্ত্রিক

কবি, তুমি গদ্যের সভায় যেতে চাও?
যাও।

পা যেন টলে না, চোখে সবকিছুকে-তুচ্ছ-করে-দেওয়া
কিছুটা ঔদাস্য যেন থাকে।
যেন লোকে বলে
সভাস্থলে
আসবার ছিল না কথা, তবু সম্রাট এসেছেন।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : কবি

আমি কবি যত কামারের আর কাঁসারির আর
ছুতোরের মুটে মজুরের,
—আমি কবি যত ইতরের!
আমি কবি ভাই কর্মের আর ঘর্মের ;
বিলাস-বিবশ মর্মের যত স্বপ্নের তরে ভাই
সময় যে হায় নাই!

প্রেমেন্দ্র মিত্র : আমি কবি (প্রথমা)

কে কবি—কবে কে মোরে? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন, ...?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃকমলেতে পাতেন আসন....
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ;
অরণ্যে কুসুম ফোটে যার ইচ্ছা-বলে।

মধুসূদন দত্ত : কবি

তিনিই কবি যাঁর পিঠে চাবুকের দাগ থাকে না
এক অর্থে তিনি সৈনিক.....
যে বেঁচে থাকায় বঞ্চনার বিষ
যে জীবন জীবন্ত নয়
যে পৃথিবী সুন্দর করার জন্য এতদিন আমরা
পূজা করে আসছি   নামাবলী কমণ্ডলু ধূপধূনা ব্যতিরেকে
তিনি সেই পূজার পুরোহিত
তার গলায় শেকলের দাগ নেই!

রবীন সুর : কবি

যে আমি স্বপন-মুরতি গোপনচারী,
যে আমি আমারে বুঝিতে বুঝাতে নারি,
আপন গানের কাছেতে আপনি হারি,
সেই আমি কবি। কে পারে আমারে ধরিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ—২১

কবিরে পাবে না তাহার জীবনচরিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ—২১

কাব্য দেখে যেমন ভাব
কবি তেমন নয় গো
চাঁদের পানে চক্ষু তুলে

রয় না পড়ে নদীর কূলে
গভীর দুঃখ ইত্যাদি সব
মনের সুখেই বয় গো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবি (ক্ষণিকা)

কাব্য যেমন কবি যেন
তেমন নাহি হয় গো।
বুদ্ধি যেন একটু থাকে,
স্নানাহারের নিয়ম রাখে,
সহজ লোকের মতোই যেন
সরল গদ্য কয় গো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবি (ক্ষণিকা)

ক্ষণকালের তুচ্ছতা থেকে, জীর্ণতা থেকে, নিত্যকালের আনন্দরূপকে আবরণমুক্ত করে দেখবার ভার কবির।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবির অভিভাষণ

কবি গীতার উপদেশকে ছাড়াইয়া গেছে। তাহার কর্মেও অধিকার নাই, ফলেও অধিকার নাই। তাহার একমাত্র অধিকার ছুটিতে ; কর্ম হইতে ছুটি, ফল হইতে ছুটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আষাঢ় (বিচিত্র প্রবন্ধ)

সেই কবিকেই মানুষ বড় বলে, যে এমন-সকল বিষয়ে মানুষের চিত্তকে আশ্লিষ্ট করেছে যার মধ্যে নিত্যতা আছে, মহিমা আছে, মুক্তি আছে, যা ব্যাপক এবং গভীর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রচনাবলী ১ (বিশ্বভারতী) অবতরণিকা

কাটা ধানের সঙ্গে সঙ্গে খেতটাকে তো কেউ ঘরে আনে না। কাব্য লিখেই কবি খালাস, তার পর জগতে তার মতো অদরকারি আর কিছু নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষবর্ষণ

কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফারের বয়সের গাছ-পাথর নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১

কবিরা তো নিজের রুচিতে আমাদের রুচির প্রসার বাড়িয়ে দিচ্ছে। সৃষ্টিকে আন্ডার লাইন করাই তাদের কাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—১৩

কবি যে শুধু সৃষ্টি করে তা নয়, কবি সৃষ্টি রক্ষাও করে। যা স্বভাবতই সুন্দর, তাকে যেমন আরও সুন্দর করে প্রকাশ করা তার একটা কাজ, যা সুন্দর নয়, তাকেও অসুন্দরের হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলা তারই একটা কাজ!

শরৎচন্দ্র : চরিত্রহীন—৩১

কবির জাতের খোঁজ করতে নেই।

শরৎচন্দ্র : শ্রীকান্ত (৪র্থ)-৬

আমি এক দুর্ভিক্ষের কবি,
প্রত্যহ দুঃস্বপ্ন দেখি, মৃত্যুর সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।
আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়,
আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়,
আমার রোমাঞ্চ লাগে অযথা নিষ্ঠুর রক্তপাতে,
আমার বিস্ময় জাগে নিষ্ঠুর শৃঙ্খল দুই হাতে।

তাই আজ আমারো বিশ্বাস,
"শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।"
তাই আমি চেয়ে দেখি প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,
দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ রবীন্দ্রনাথের প্রতি

আমাকে কেউ কবি বলুক
আমি চাই না।
কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে
জীবনের শেষদিন পর্যন্ত
যেন আমি হেঁটে যাই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ আমার কাজ

এক কবি।
তিনি পরতেন চুপি চুপি
লম্বা মেঘের পাজামা।
ঝড় ঝঞ্ঝায় ফুঁ দিয়ে
যখন ইচ্ছে বজ্রে
বাজাতেন তিনি
প্রকাণ্ড এক দামামা—
পৃথিবীকে তিনি ভালোবাসতেন খুবই
মাটিতেই তাঁর
ছিল পা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ ছিটমহল

কাব্য সিন্ধু শব্দ মুক্তা কবি সে ডুবারু।
বহু যত্নে ডুবি তোলে রতন সুচারু॥

সৈয়দ আলাওল ঃ পদ্মাবতী

কবিতা

জীবন সম্বন্ধে তত্ত্বকথা বলা কবিতার ধর্ম নয়। জীবনের নানান অভিঘাত হৃদয়মনের নানান প্রতিক্রিয়ায় রূপায়িত করাই তার ধর্ম। দার্শনিক জ্ঞান এবং কাব্যিক উপলব্ধি এ-দুয়ের পথ সম্পূর্ণ পৃথক। আমি তো মনে করি, বিজ্ঞতার মনোভাব কবিতার পক্ষে বেশ ক্ষতিকর। সব জানা হয়ে গেছে, সব বোঝা হয়ে গেছে, এমন ধারণা যদি মনে জেঁকে বসে, তা হলে কবিতার সব আশ্চর্য নিখোঁজ হয়ে যায়।

অরুণ মিত্র ঃ কবির কথা, কবিদের কথা

কবিতা সভ্যতার সব সংকীর্ণতা চূর্ণ করে। পৃথিবীর সমস্ত সীমানা ভেঙে দেয়। কবিতায় বাস্তব অবাস্তব হয়ে ওঠে। মায়া রূপ নেয় সত্যের। কবিতা একা মানুষের ভাষা। তবু সে বাঙ্ময় করে তোলে মানবতার প্রবাহকে।

ঈশ্বর ত্রিপাঠী ঃ ভূমিকা—নির্বাচিত কবিতা

সেকাল গিয়েছে, কবিতা যখন ছিল বনিতার মতো
রাখা যেত যাকে যত্নে ঘরের নিরালায় সাজিয়ে

ফুলের ঘায়ে সে মূর্ছিত হতো—মৃদু লবঙ্গলতা,
আভাসে লাগতো ইন্দ্রধনুর দেহের অলংকারে।.....
আজ সে চলেছে পথে, প্রান্তরে, সমুদ্রে, সংসারে
শোকে, অপমানে—আজ আর তাই কিছু হারাবার নেই।

অমিতাভ গুপ্ত ঃ জন্মান্তর

কবিতার কোনো সুনির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থ থাক বা না থাক, অন্য এক গূঢ়তর অর্থ বহন করবার শক্তি তার আছে যার জোরে সে বিশ্লেষণী মনের পাহারা এড়িয়ে হৃদয়ান্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পায়। আমাদের দেশের আলঙ্কারিকরা কাব্যের দুই প্রকার অর্থের কথা বলেছেন—এক তার বাচ্যার্থ, এলিয়টের mince-meat ; অন্যটা তার ব্যঙ্গার্থ, তাদের পরিভাষায় যার নাম ধ্বনি। রসবাদীর মতে এই অর্থদ্বৈধের মধ্যে প্রভেদ মৌলিক—এত মৌলিক যে প্রথমটিকে লৌকিক ও দ্বিতীয়টিকে অলৌকিক আখ্যা দিতে তারা দ্বিধা বোধ করেননি।

আবু সয়ীদ আইয়ুব ঃ কবিতা ও প্রেম (পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা)

খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময়ে যেন থেমে যায়,—একটি-পৃথিবীর-অন্ধকার-ও-স্তব্ধতায় একটি মোমের মতন যেন জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের প্রতিভা ও আস্বাদ পাওয়া যায়।

জীবনানন্দ দাশ ঃ কবিতার কথা

মহাবিশ্বলোকের ইসারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো ; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি।

জীবনানন্দ দাশ ঃ কবিতা প্রসঙ্গে (কবিতার কথা)

কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।

জীবনানন্দ দাশ ঃ উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য (কবিতার কথা)

ভিক্তর হিউগো বলিতেন, সেই কবিতাই প্রকৃত কবিতা, তাহাই কবিতার শিরোমণি যাহার মধ্যে পাই একটা বৃহতের ভাব Immensity— বিশালতা।.....বস্তুত কবিতা হইতে, শুধু কবিতা কেন—সকল চারুকলা হইতেই আমরা যে জিনিষটি উপভোগ করিতে চাই তাহা হইতেছে এই একটা অনন্তের অসীমের অভিব্যঞ্জনা, প্রাণ যেখানে খুলিয়া গিয়াছে, দুই পক্ষ বিস্তার করিয়া সমগ্রকে বিশ্বকে সে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতেছে।......কবিতার মর্মের কথাটি......একটা অনন্তের বিস্তার, বিশ্বতোমুখী তরঙ্গোল্লাস।

নলিনীকান্ত গুপ্ত ঃ বিশ্বসাহিত্য

এক-একটা কবিতা যেন ঝড়ের ভিতর হয়ে ওঠে নিয়তির কণ্ঠস্বর।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ কবিতা ৭০

প্রত্যেক কবিতা তার নির্জন নিঃসঙ্গতার মধ্যেই সার্থকা। তার চারদিকে একটা অবকাশের বিস্তৃতি আছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ ভূমিকা—শ্রেষ্ঠ কবিতা

শুধু কি বয়েস গেছে? আমার কবিতা
আমাকে বিষণ্ণ করে বিদায় নিয়েছে।
সে বড় একাকী ছিল, আজ আমি একা।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শুধু কি বয়েস গেছে

ইতিহাসের গতি ও পথ, সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাত কবিতার জন্মভূমি। ফুলের বহু রঙ, গন্ধ, আকৃতি ও আয়ুর মতন কবিতাও মানুষের চৈতন্যপ্রবাহের বিচিত্র বর্ণাঢ্য প্রতিচ্ছবি। কবিতা বাস্তব, রোমান্টিক, পরাবাস্তব, কতরকম। কবিতায় প্রকৃতি, কবিতায় মানুষ। কবিতায় উপদেশ, কবিতায় দর্শন। কবিতা গান সুর ছবি। কবিতা কল্পনালতা, কবিতা কথা-কাহিনী। ছন্দেই কবিতার বন্ধন, কবিতার মুক্তি। কবিতা শুধু বচন নয়, বচনভঙ্গি। স্ফুলিঙ্গ থেকে আগ্নেয়গিরি, হিমালয় থেকে মহাসাগর, বিদ্রোহ থেকে নিঃসঙ্গতা, উদ্যোগ থেকে অভিনব ক্লান্তি, অন্ধকার থেকে আলো, জীবন থেকে মৃত্যু—কবিতা সর্বত্রগামী।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

মানুষ মরণশীল। ক্ষণস্থায়ী জীবনে কবিরও মৃত্যু হয়। শুধু থাকে তাঁর কবিতা। আত্মজ পাণ্ডুলিপি উড়ে চলে অনন্তকালের কাছে, ব্যাকুল প্রতীক্ষায়, বিচার প্রার্থনায়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

নিজেই গড়বে সে, নিজেই ভাঙবে,
ঈষৎ অভিমানী, গোঁয়ারও কিছুটা,
আমার ঈশ্বর, আমার কবিতা।

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ আমার ঈশ্বর

প্রকৃতির গোপন রহস্য কবির নিকট ধরা দেয়—এজন্য তিনি সত্যদ্রষ্টা। কোন কোন দেশে কবি ভবিষ্যৎদর্শী মহামানব, কারণ ভবিষ্যতের সুসমাচার তাঁহাদের মুখেই প্রচারিত হয়। কবিই শব্দব্রহ্ম—তাঁহার মধ্য দিয়া বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের ইচ্ছা মানুষের নিকট প্রকট হয়।

মেঘনাদ সাহা ঃ কাব্য ও বিজ্ঞান

আমার কবিতা জানি আমি
গেলেও বিচিত্রপথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঐকতান

হায় রে, কানে শোনার কবিতাকে
        পরানো হল চোখে দেখার শিকল,
কবিতার নির্বাসন হল লাইব্রেরি-লোকে ;
        নিত্যকালের আদরের ধন
পাব্লিশারের হাটে হল নাকাল।
                উপায় নেই,
        জটলা-পাকানোর যুগ এটা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্র (পুনশ্চ)

কিছু একটা বুঝাইবার জন্য কেহ তো কবিতা লেখে না।.....এইজন্য কবিতা শুনিয়া কেহ যখন বলে, 'বুঝিলাম না' তখন বিষম মুশকিলে পড়িতে হয়। কেহ যদি ফুলের গন্ধ শুঁকিয়া বলে 'কিছু বুঝিলাম না', তাহাকে এই কথা বলিতে হয়, ইহাতে বুঝিবার কিছু নাই, এ যে কেবল গন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রভাতসঙ্গীত (জীবনস্মৃতি)

ভালো কবিতার ভালোত্ব যদি.....অবহেলে না বুঝিতে পারি তবে আমি তাহার সমালোচনা পড়া আবশ্যক বোধ করি না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাঞ্জলতা (পঞ্চভূত)

অর্থের প্রবণতা বেড়ে উঠলে কবিতার সম্মোহন যায় কমে। ধ্বনির ইশারা দিয়ে যা নিজেকে অভাবনীয় রূপে সার্থক ক'রে তোলে.....ব্যাখ্যার দ্বারা তা যখন সমর্থনের অপেক্ষা করে তখন কবিতার মন্ত্রশক্তি হারায় তার গুণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়

কবিতার বিশেষত্ব হ'চ্ছে তার গতিশীলতা। সে যে শেষ হয়েও শেষ হয় না। গদ্যে যখন বলি “একদিন শ্রাবণের রাত্রে বৃষ্টি পড়েছিল”, তখন এই কথার মধ্যে এই খবরটা ফুরিয়ে যায়। কিন্তু কবি যখন বললেন—

রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়াগরজন
রিমঝিম শবদে বরিষে—

তখন কথা থেমে গেলেও বলা থামে না।

এ বৃষ্টি যেন নিত্যকালের বৃষ্টি, পঞ্জিকা-আশ্রিত কোনো দিনক্ষণের মধ্যে বদ্ধ হয়ে এ বৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায়নি। এই খবরটির উপর ছন্দ যে দোলা সৃষ্টি করে সে দোলা ঐ খবরটিকে প্রবহমান করে রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়

আইনের লৌহ-ছাঁচে কবিতা কভু না বাঁচে,
প্রাণ শুধু পায় তাহা প্রাণে॥
কে বোঝে কে নাই বোঝে ভাবুক তা নাহি খোঁজে,
ভালো যার লাগে তার লাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিসর্জন—উৎসর্গ

কবিতা যখন শেষ হ'য়ে যায়, তখন সেই শেষ হয়ে যাওয়াটাও কবিতার একটা বৃহৎ অঙ্গ। কেননা কোনো ভাল কবিতাই একেবারে শূন্যের মধ্যে শেষ হয় না—যেখানে শেষ হয় সেখানেও সে কথা বলে—এই নিঃশব্দে কথাগুলি বলবার অবকাশ তাকে দেওয়া চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—১২

কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নি পরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সে আগুন সে যাচাই করবে কী দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৭

কবিতাই কবিতার ভূমিকা। প্রত্যেক কবিতার পিছনে থাকে নিজেকে অতিক্রম করে নিজেকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। সময় জগৎ ও জীবনের আবর্তে নতুন আত্মপরিচয়। আদি মানুষের মতো মশাল উঁচিয়ে ইতিহাসের পূত বেদী পরিক্রমা। সত্তার তামস নির্মোক জ্বালিয়ে মানবিকতার দীপায়ন। আমাদের অজান্তে উর্বশী পৃথিবী মহত্তর বিবর্তনের মুখোমুখি। ব্যক্তি এখন পরম সত্তার একত্বে বিশ্বে বিলাসিত, আবার বিশ্বোত্তীর্ণ। শ্রেণীর কলুষ নিয়েও ফলভারে অবনত মস্তক। কবিতা আজ জীবনের স্তব।

রাম বসু ঃ ভূমিকা (রাম বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা)

শব্দে রচিত কবিতা শব্দ অতিক্রম করে যায়।

সুজিত সরকার ঃ ছড়ানো পালক

দুঃখই কবিতার জননী।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ কবিতার জন্ম

কবিতার পবিত্রতা কবিতার ব্যাখ্যায় ঝলসে যায়।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ কবিতার সুখ দুঃখ

শুধু কবিতার জন্য আমি অমরত্ব তাচ্ছিল্য করেছি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ শুধু কবিতার জন্য

একটি কবিতা লেখা হবে। তার জন্যে
দেয়ালে দেয়ালে এঁটে দেয় কারা
অনাগত এক দিনের ফতোয়া,
মৃত্যুভয়কে ফাঁসিতে লটকে দিয়ে
মিছিল এগোয়
আকাশবাতাস মুখরিত গানে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ একটি কবিতার জন্যে

কবিত্ব

লেজই বলো কবিত্বই বলো, ভিতরে না থাকলে জোর করে টেনে বের করবার জো নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার সভা

স্মরণের তুলিতেই কবিত্বের রঙ্ ফোটে ভালো। প্রত্যক্ষের একটা জবরদস্তি আছে—কিছু পরিমাণে তাহার শাসন কাটাইতে না পারিলে কল্পনা আপনার জায়গাটি পায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি—কারোয়ার

পৃথিবীতে যত কবি যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়ে মুছে ফেলতে পার তাহলেই প্রমাণ হবে—কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসল খেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেছে কারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী

লোকে যাকে চোখ টিপে বলে কবিত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাসা (পুনশ্চ)

শব্দ তৈরী হয়েছে ঠিকটা-কী জানবার জন্যে ; সেই জন্যে ঠিক-যেন-কী বলতে গেলে তার অর্থকে বাড়াতে হয়, বাঁকাতে হয়। ঠিক-যেন-কীর ভাষা অভিধানে বেঁধে দেওয়া নেই, তাই সাধারণ ভাষা দিয়েই কবিকে কৌশলে কাজ চালাতে হয়। তাকেই বলা যায় কবিত্ব।.....হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙ্গে দিতে হয়। কবিত্বে আছে সেই বেড়া ভাঙার কাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়—৪

কবি যদি ক্লান্ত মনে এমন কথা মনে করে যে কবিত্বের চিরকালের বিষয়গুলি আধুনিক কালে পুরোনো হয়ে গেছে তাহলে বুঝব আধুনিক কালটাই হয়েছে বৃদ্ধ ও রসহীন।.....যে কল্পনা নিজের চারিদিকে আর রস পায় না, সে যে কোনো চেষ্টাকৃত রচনাকেই দীর্ঘকাল সরস রাখতে পারবে এমন আশা করা বিড়ম্বনা। রসনায় যার রুচি মরেছে, চিরদিনের অন্নে সে তৃপ্তি পায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী-১ (বিশ্বভারতী) অবতরণিকা

বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিত্ব রোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আধ-পেটা করে খাও, অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি

কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান করতে থাকে ; জানালার কাছে বসে মনে হয় কী যেন চাও,— যা চাও সেটি যে বাইকার্বোনেট অফ্ সোডা, তা কিছুতেই বুঝতে পার না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ রক্ষা—১।২

কবিত্বের কালিমা পৃথিবীর রাত্রিটুকুরই মতো। এর শিয়রের কাছে বিজ্ঞানের জগজ্জয়ী আলো দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু সে এর গায়ে হাত তোলে না। স্নেহ ক'রে বলে, আহা স্বপ্ন দেখুক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়—আমার জগৎ

কবিমানস

বাঙলার আকাশে নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি, আষাঢ়ের ঘন বর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য ও মহিমা, এবং শ্রাবণের দিবারাত্র অবিরাম বর্ষণধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি। ষড়ঋতুর বিচিত্র নৃত্যলীলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে বাঙালীর কবিমানসের উৎস কোথায়।

হুমায়ুন কবির : বাংলা কাব্যের গোড়ার কথা

কবিতা-গান-ছবি

ছবি জিনিসটা অবনীর, গান জিনিসটা গগনের। অসীম যেখানে সীমার মধ্যে, সেখানে ছবি ; অসীম যেখানে সীমাহীনতায়, সেখানে গান। রূপরাজ্যের কলা ছবি, অপরূপ রাজ্যের কলা গান। কবিতা উভচর, ছবির মধ্যেও চলে, গানের মধ্যেও ওড়ে।......কবিতার উপকরণ......ভাষা। ভাষার একটা দিকে অর্থ ; আর একটা দিকে সুর ;......অর্থের যোগে ছবি গড়ে ওঠে, সুরের যোগে গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপানযাত্রী—১৪

কবির গৃহিণী

প্রতিদিন অভাবে অনটনে, রাগে, দুঃখে সুখে
কামে-প্রেমে-কবিতায় কবির গৃহিণী এক বহুপর্ণা
বহুবর্ণা নারী হয়ে ওঠে।

অশোক রায়চৌধুরী : কবির গৃহিণী

কমপিউটর

আমি কমপিউটরে শুনি
আমি কমপিউটরে বলি
আমি কমপিউটর দেখে
রাস্তায় পথ চলি।
বোতামে বোতামে ছয়লাপ
বোতামে রেখেছি হাত
কমপিউটর দিতে পারে নাকি
দুবেলা দুমুঠো ভাত?

সুবোধ সরকার : দুবেলা দুমুঠো

কমল

কমল মুখ তায় কমল হাসি,
কমল কর তায় কমল বাঁশী।

দাশরথি রায় : পাঁচালী

মুদিত আলোর কমলকলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার পর্ণপুটে।

উত্তরিবে যবে নবপ্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কণিকা (গীতালি)

আজি কমলমুকুলদল খুলিল, দুলিল রে দুলিল—
মানসসরসে রসপুলকে পলকে পলকে ঢেউ তুলিল।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতলিপি

মরণের মন্দিরে এসে মাধুরী সংগীত।
বাজায় ক্লান্তি ভুলি
শুভ্র কমলগুলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতলিপি-৮৪

কমলা যারে চায়, বলো সে কী না পায়,—
দুখের এ ধারায় থাকে সে সুখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাল্মীকি প্রতিভা—৬ষ্ঠ দৃশ্য

সত্য স্বরূপিণী তুমি ওগো মা কমলে।।

লক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা ও পাঁচালী

সমুদ্রমন্থনে অপ্সরাদের উদ্ভব হবার পর চতুর্দিক আলোকিত করে বিদ্যুৎমালার মত দেবী কমলা সমুদ্রগর্ভ হতে উত্থিত হন। ইন্দ্র তাঁকে অভ্যর্থনা করে উৎকৃষ্ট আসনে বসান। পৃথিবী তাঁকে অভিষেকোপযোগী সর্বপ্রকার ওষধি দান করেন। অতঃপর ঋষিরা এঁকে অভিষেক করেন।

সুধীরচন্দ্র সরকার : পৌরাণিক অভিধান

কমিউনিজম

কমিউনিজম হল পৃথিবীর যৌবন, কারও সাধ্যি নেই, তার পথ রোধ করে—।

অমল রায় : গেব্রিয়েল পেরী

এ যুগের মনুষ্যবাদই কমিউনিজম—সৃষ্টির কর্মযোগশাস্ত্র।

গোপাল হালদার : আর একদিন (ত্রিদিবা)

কমিউনিজম এ যুগের মানবতার নাম।

গোপাল হালদার : সংস্কৃতির বিশ্বরূপ

কমিউনিজম আজ ভারতবর্ষকে ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পারে। কমুনিস্টরা মনুষ্যত্বটাকে বড় বলে মানে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির প্রশ্রয় তারা একেবারেই দেয় না। তারা ধনিকগণের লোভ-লোলুপতার অবসান করে দিতে চায়। সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আয়ত্ত করে, সর্ব সম্পদ ও উৎপাদিত যাবতীয় সামগ্রী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং উৎপাদন ও বণ্টনের সুব্যবস্থা করে কমুনিস্টরা জগতে স্থায়ী শান্তি আনয়ন করে।

মুজফফর আহমদ : কোথায় প্রতিকার

সস্তায় কমিউনিস্ট বিপ্লবী হওয়া যায় না। কৃষকের সঙ্গে একাত্ম হওয়াটা মন্ত্রিত্ব করা নয়, কোনও ভোজসভা বা ফিতে কাটা নয়। সে এক নাড়ি ছেঁড়ার যন্ত্রণা। ত্যাগ করতে হয় সব পুরনো। ত্যাগ করতে হয় মোহ, মাৎসর্য, আত্মস্বার্থ আর আত্মপরিচয়।

আজিজুল হক : আজকাল ৩.১০.২০০২

কে প্রকৃত কমিউনিস্ট? যিনি জনগণের জন্য আত্মত্যাগ করতে পারেন এবং এই আত্মত্যাগ কোনো বিনিময়ের প্রত্যাশা করে নয়। দুটো পথ—হয় আত্মত্যাগ নয় আত্মস্বার্থ। মাঝামাঝি কোন রাস্তা নেই।

চারু মজুমদার ঃ প্রকৃত কমিউনিস্ট হবার তাৎপর্য কী?

করবী

করবীর রাঙা রক্ত কঙ্কণঝংকারসুরে মাখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নীলমণিলতা (বনবাণী)

এবার বিদায়বেলার সুর ধরো ধরো ও চাঁপা, ও করবী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্ত

করুণ

বুদ্ধের করুণ আঁখিদুটি
সন্ধ্যাতারা সম রহে ফুটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নগরলক্ষ্মী (কথা)

উষার করুণ চাঁদ শীর্ণ মুখচ্ছবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ চুম্বন (চৈতালি)

করুণা

কাননের ছায়া সে করুণা,
করুণা সে উষার কিরণ,
করুণা সে জননীর আঁখি
করুণা সে প্রেমিকের মন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পাষাণী (সন্ধ্যাসংগীত)

অনুগ্রহ দুঃখ করে—দিই নাহি পাই
করুণা কহেন আমি দিই নাহি চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রভেদ (কণিকা)

কর্ণ

জানোনাকি কদাচন মূঢ়
কর্ণ বিমর্দন মর্ম কি গূঢ়?
কর্ণ দিবার কি কারণ অন্য,
যদি না তা আকর্ষণ জন্য?

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ কর্ণবিমর্দন কাহিনী (আষাঢ়ে)

কর্ণধার

ওগো আমার প্রাণের কর্ণধার.....
ডাইনে বাঁয়ে দ্বন্দ্ব লাগে
সত্যের মিথ্যার।....
ওগো আমার লীলার কর্ণধার,
জীবন-তরী মৃত্যু ভাঁটায়
কোথায় কর পার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কর্ণধার (সানাই)

সমুখে শান্তিপারাবার—
ভাসাও তরণী, হে কর্ণধার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরবো না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার—
তোমারে করি নমস্কার॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিচর্চা

সুন্দরকে কর্ণধার করলেই শক্তির তরী সত্যি বশ মানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রথযাত্রা (কালের যাত্রা)

কর্তব্য

যেমন চিবিয়ে না খেলে খাদ্যটাকে খাদ্য বলেই মনে হয় না তেমনি হুড়মুড় করে কাজ করাকে কর্তব্য বলে উপলব্ধি করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাভা-যাত্রীর পত্র—২১

কর্তব্য চিরদিনই......কর্তব্য! তার কাছে হৃদয়-বৃত্তির কোন দাবি-দাওয়া নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দত্তা ৫

কর্ম

করিতে উত্তম কর্ম বাঞ্ছা যবে হবে।
আলস্য ত্যজিয়া তাহা তখনি করিবে॥

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ (রাবণের উপদেশ—**লঙ্কাকাণ্ড**)

যাহার লাগিয়া ফিরিছে মাগিয়া
মুছি ললাটের ঘর্ম,
স্বদেশের কাছে কী সে করিয়াছে?
কী অপরাধের কর্ম?.......
আর কিছু নহে, পিতাপিতামহে
বসায়ে গেছে সে উচ্চে,
জন্মভূমিরে সাজায়েছে ঘিরে
অমর পুষ্পগুচ্ছে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উন্নতিলক্ষণ (কল্পনা)

কর্ম করি যে হাত লয়ে কর্মবাঁধন তারে বাঁধে।
ফলের আশা শিকল হয়ে জড়িয়ে ধরে জটিল ফাঁদে।
তোমার রাখী বাঁধো আঁটি—সকল বাঁধন যাবে কাটি,
কর্ম তখন বীণার মতো বাজবে মধুর মূর্ছনাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান—"তোমার হাতের রাখীখানি"

কর্ম যখন প্রবল-আকার গরজি উঠিয়া ঢাকে চারি ধার
হৃদয়প্রান্তে, হে জীবননাথ, শান্ত চরণে এসো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

কর্ম যখন দেবতা হয়ে জুড়ে বসে পূজার বেদী.....
জীবন যখন শুকিয়ে আসে ধীরে ধীরে
পায় না আলো, পায় না বাতাস, পায় না ফাঁকা, পায় না কোন রস,
কেবল টাকা, কেবল সে পায় যশ,
তখন সে কোন্ মোহের পাকে
মরণ-দশা ঘ'টেছে তার, সেই কথাটাই ভুলে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছিন্নপত্র (পলাতকা)

কর্ম থেকে কর্তৃত্বকে যতই দূরে পাঠানো যাবে কর্ম ততই মজুরির বোঝা হয়ে মানুষকে চেপে মারবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাভা-যাত্রীর পত্র—৫

সোপান যেমন সোপানকে অতিক্রম করিবার উপায়, ভারতবর্ষে কর্ম তেমনি কর্মকে অতিক্রম করিবার উপায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধম্মপদং (ভারতবর্ষ)

কর্ম নাগরদোলার ঘূর্ণি নেশা যখন এক একটা জাতিকে পাইয়া বসে, তখন পৃথিবীতে আর শান্তি থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নববর্ষ (ভারতবর্ষ)

প্রয়োজন থেকে অভাব থেকে আমরা যে কর্ম করি সেই কর্মই আমাদের বন্ধন, আনন্দ থেকে যা করি সে তো বন্ধন নয়—বস্তুত সেই কর্মই মুক্তি।....কর্মের মুক্তি আনন্দের মধ্যে এবং আনন্দের মুক্তি কর্মে।.......

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন—৪ (কর্ম)

একবার দিনান্তে স্নান করে কাপড় ছেড়ে কারখানার মনিবকে যদি দেখে আসতে পারি তবে তাঁর সঙ্গে আমাদের কাজের যোগ নির্ণয় ক'রে কলের একাধিপত্যের হাত এড়াতে পারি, তবেই কাজে আমাদের আনন্দ জন্মে। নতুবা কেবলই কলের চাকা চালাতে চালাতে কলেরই শামিল হ'য়ে উঠি।....তাঁর দিকে চাইলে কর্মের বল বাড়ে অথচ উগ্রতা চলে যায়।.....কাজ চলতে থাকে অথচ স্তব্ধতা আসে,.....চিন্তায় বাক্যে কর্মে বাড়াবাড়ি কিছুমাত্র থাকে না। শক্তি তখন আপনি আপনাকে আড়াল করে দিয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে—যেমন সুন্দর আজকের সন্ধ্যাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলী!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন—ছুটির পর

কর্মিষ্ঠ

কর্মিষ্ঠ লোকের দোষ এই, অন্য লোকের কর্মপটুতার উপরে তাহাদের বড়ো একটা বিশ্বাস থাকে না। তাহাদের ভয় হয়, যে কাজ তাহারা নিজে না করিবে, সেই কাজ অন্যে করিলেই পাছে সমস্ত নষ্ট করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৌকাডুবি

কল

চটকল থেকে যে পাটের বস্তা তৈরী হয়ে বেরোয়.....বোঝা গ্রহণ করবার জন্যই তার ব্যবহার। মানুষ-পেষা কল থেকে ছাঁটা-কাটা যে-সব.....পদার্থের উৎপত্তি হয় তারাও কেবল বাইরের বোঝা বইতেই আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সমস্যা (কালান্তর)

কলেতে কেতাব ছাপে, কলে রাঁধে ভাত,
কলেতে সেলাই করে, কেন দুটো হাত?
কলেতে হাঁটাবে শেষে, পরাবে কাপড়,
খাওয়াবে, শোওয়াবে, দেবে ঘুসি ও চাপড়।

সতীশচন্দ্র ঘটক : কল

কলকারখানায় মানুষকে নিঙড়ে ছোবড়া করে দেওয়া হয়। একেবারে—যাকে বলে ডিহিউম্যানাইজেশন।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : দু'নম্বর চাবি

কলকাতা/কলিকাতা

কলিকাতাই আসলে পশ্চিমবঙ্গ, বাকীটুকু নগণ্য।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী : পূর্ববঙ্গের সমস্যা

কলকাতা বড় কিউবিক
যেন পিকাশোর ইজেলে তুলিতে
গরগরে রাগে রাঙা।
কলকাতা সুররিয়ালিস্ট।
যেন স্যাগালের নীলের লালের
গূঢ় রহস্যে রাঙা।
কলকাতা বড় অস্থির।
যেন বেঠোফেন ঝড়ে খুঁজেছেন
সিমফনী কোনো শান্তির।
কলকাতা এক স্কাল্পচার।
রঁদার বাটালি পাথরে কাটছে
পেশল-প্রাণের কান্তি।

পূর্ণেন্দু পত্রী : কলকাতা

কলকাতা একটা সমুদ্রবিশেষ। তার মধ্যে সাপ-হাঙরও আছে, আবার মণি-মাণিক্যও আছে।

বনফুল : হাটে বাজারে

এই তোমার কলকাতা শহর, এই অফিস, এই আদালত এই গোটাকতক ইট কাঠের বুদ্বুদ। ছোঃ!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা—৪ পরিঃ

ইঁটের-টোপর-মাথায়-পরা শহর কলিকাতা
অটল হয়ে বসে আছে ইঁটের আসন পাতা।
ফাল্গুনে বয় বসন্তবায়, না দেয় তারে নাড়া।
বৈশাখেতে ঝড়ের দিনে ভিত রহে তার খাড়া।
শীতের হাওয়ায় থামগুলোতে একটু না দেয় কাঁপন।
শীত বসন্ত সমান ভাবে করে ঋতুযাপন॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চলন্ত কলিকাতা

কলকাতায় আমরা মানুষ সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কোথাও দেখিনি। আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকে বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছেলেবেলা—১৩

কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা, সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দৃষ্টিদান (গল্পগুচ্ছ)

প্রণয়ীদের জন্য কাব্যে যে-সকল আয়োজনের ব্যবস্থা আছে, কলিকাতা শহরে তাহা মেলে না। কোথায় প্রফুল্ল অশোকবকুলের বীথিকা, কোথায় বিকশিত মাধবীর প্রচ্ছন্ন লতাবিতান, চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলি? তবু এই শুষ্ককঠিন সৌন্দর্যহীন আধুনিক নগরে.......এই গাড়ি ঘোড়ার বিষম ভিড়ে, এই লৌহনিগড়বদ্ধ ট্রামের রাস্তায় একটি চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন করিয়া লালপাগড়ি প্রহরীদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া কত রাত্রে কত দিনে কতবার কত ঠিকানায় যে আনাগোনা করিতেছেন, তাহা কে বলিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৌকাডুবি—৯

কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন-তেমন করিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তৈরী হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথের সঞ্চয়। বোম্বাই শহর

সকালবেলায় কলিকাতার রাস্তা.......বিশেষ সুদৃশ্য নহে,.......এখানে সুরকিতে ইটেতে, ধুলিতে নাসারন্ধ্রে, গাড়িতে ঘোড়াতে হঠযোগ চলিতেছে। এখানে চারিদিকে দেয়ালের সহিত দেয়ালের, দরজার সহিত হুড়কার, কড়ির সহিত বরগার, চাপকানের সহিত বোতামের আঁটা-আঁটি মিলন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিচিত্র প্রবন্ধ। সরোজিনী-প্রয়াণ

এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা
হেঁটে দেখতে শিখুন
হেঁটে দেখতে শিখুন ঝরছে কী খুন দিনের রাতের মাথায়
আরেকটা কলকাতায় সাহেব আরেকটা কলকাতায়
সাহেব বাবুমশায়!

শঙ্খ ঘোষ : বাবুমশাই

এখনও এই কলকাতা শহরে অনেক মানুষ আছেন যাঁরা যন্ত্রসভ্যতার চাপে নীরক্ত হয়ে যাননি। এখনও কিছু মানুষ আশ্চর্য সরল চোখে জীবনটাকে দেখে থাকেন।

সমরেশ মজুমদার : সাতকাহন, (২য় পর্ব)

এপাশে হাওড়া, ওপাশে শিয়ালদা
দুটো ক্ষয়ে যাওয়া ফুসফুস নিয়ে, গোটা কলকাতা একটা
বিরাট ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের মধ্যে ধকধক করছে।

সুবোধ সরকার : ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট

আমরা কল্‌কেতা শহরকে 'রত্নগর্ভা' বলেও ডাকতে পারি—কল্‌কেতার কি বড় মানুষ, কি মধ্যাবস্থ এক একজন এক একটি রত্ন!!

হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ) : হুতোম প্যাঁচার নক্সা

কলিকাতা শহর রত্নাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানোয়রই নাই।

হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ) : হুতোম প্যাঁচার নক্সা

আজব শহর কলকেতা
রাঁড়ী বাড়ী জুড়ী গাড়ী মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা।
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী বদমাইসির ফাঁদ পাতা।

হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ) : হুতোম পাঁচার নক্সা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া প্রশ্নের ধরন পাল্টাইয়া ফেলিতেছে, এবং ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রতিটি বিষয়ের

'মডেল' প্রশ্ন তুলিয়া দিবার অঙ্গীকার করিয়াছে।......বিশ্ববিদ্যালয় নামক বস্তুটির যে আরও একটি মহত্তর কিন্তু উপেক্ষিত লক্ষ্য ছিল—বিদ্যাচর্চা—তাহা উভয়ের মতানুক্রমেই নির্বাসিত হইল।

আনন্দবাজার পত্রিকা : সম্পাদকীয় ৩.৪.২০০৩

সারস্বত-সাধনার পীঠস্থান কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। উচ্চশিক্ষা যে করণিক তৈরির কারখানা নয়, বিদ্যা সাধনার ক্ষেত্র, বিশ্ববিদ্যালয় যদি নিজেই তাহা ভুলিয়া যায়, অন্যে পরে কা কথা, ছাত্রদের আর দোষ কী!

আনন্দবাজার পত্রিকা : সম্পাদকীয় ৩.৪.২০০৩

কলঙ্ক, কলঙ্কী

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাইকো দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ।।

চণ্ডীদাস : বৈষ্ণব পদাবলী

কলঙ্কী শশাঙ্ক, তোমা বলে সর্ব জনে।
কর আসি কলঙ্কিনী কিঙ্করী তারারে,
তারানাথ! নাহি কাজ বৃথা কুলমানে।

মধুসূদন দত্ত : সোমের প্রতি তারা (বীরাঙ্গনা কাব্য)

কলঙ্কের একান্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে বাইরে—বিমলার আত্মকথা

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে।
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিজের ও সাধারণের (কণিকা)

চন্দ্রের যা কলঙ্ক সেটা কেবল মুখের উপরে, তার জ্যোৎস্নায় কোনো দাগ পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ রক্ষা ১।১

কলরব

এই কলরবের বিশেষত্বই হচ্ছে তার অকিঞ্চিৎকরতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রকৃতির প্রতিশোধ। সূচনা

সমাজ সংসার মিছে সব,
মিছে এ জীবনের কলরব।
কেবল আঁখি দিয়ে আঁখির সুধা পিয়ে
হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব।
আঁধারে মিশে গেছে আর সব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বর্ষার দিনে (মানসী)

বিজনে পথের মাঝে
কলস কাঁদিয়া বাজে কাঁকনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দিন শেষে (চিত্রা)

কাঁখের কলসী বলে ছলছলি
জলভরা কলকথা—
যবে বুকে ভরি উঠে ব্যথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘাটের পথ (খেয়া)

কলসী লয়ে কাঁখে, পথ সে বাঁকা—
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বধূ (মানসী)

কলহ্

"এ জীবন অতি অনিশ্চিত
তবু নিশ্চিত
কী আছে, বলহ্"।
"কলহ্"।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ ধাঁধা (ছড়া সমগ্র)

ভোগের আসক্তিতেই যত কলহ।

বিনয়কুমার সরকার ঃ হিন্দু ও মুসলমান

কলহ অক্ষমের উত্তেজনাপ্রকাশ,.....অকমর্ণ্যের একপ্রকার আত্মবিনোদন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দেশনায়ক (সমূহ)

কলাবিদ্যা

কলাবিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর।....বর্বরতার আড়ম্বর-আয়োজন অত্যন্ত বেশি। সভ্যতা অপেক্ষাকৃত নিরলংকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাঞ্জলতা (পঞ্চভূত)

কলিকাল/কলিযুগ

কলিকালের ছেইলাগুলার
লম্বা পারা চুল
ছাপাছুপা জামার বাহার
মেইয়া বইলেই ভুল।
কলিকালের বিটি ছেইলার
চুলে আচ্ছা ছাঁট
হটর মটর মুজা জুতায়
মেজিস্টারের ঠাঁট।

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ কলিকালের ছড়া

কলিতে একমাত্র ভগবানের নাম করা—এ ছাড়া অন্য গতি নেই। ভগবানের নাম করাই কলিযুগে একমাত্র তপস্যা। ঠাকুর আরও একটি কথা বলেছেন, কলিতে সত্য কথাই তপস্যা। সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরে থাকলে অন্য তপস্যা না করলেও চলবে। তাহলে কলিযুগ সম্বন্ধে দুটি কথা পাওয়া গেল, এক—ভগবানের নাম গুণগান, দুই সত্যের প্রতি নিষ্ঠা।..... শাস্ত্রমতে ধর্ম যখন প্রায় নিঃশেষিত তখন কলিকাল।

স্বামী ভূতেশানন্দ ঃ শরণাগতি

কলিযুগে যে ভগবানেরও ক্ষমতা থাকে না।

বিমল মিত্র ঃ ইন্ডিয়া

কলিযুগে, হায়
দেবতারা বৃদ্ধ আজি। নারীর মিনতি
এখন কেবল খাটে মানবের প্রতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অনাবৃষ্টি (চৈতালি)

কলিযুগে..........ভাগ্যচক্রের সব গ্রহনক্ষত্রই বৈশ্যবর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ—২১

কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র, চলে কেবল স্বর্ণচক্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রথের রশি (কালের যাত্রা)

দেবতারে নিয়ে বানাবে দত্যি।
কলিকাল তবে হবে তো সত্যি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লক্ষ্মীর পরীক্ষা (কাহিনী)

কলিযুগের...........সিংহাসনটা..............লোভের উপরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র—২ (কালান্তর)

কল্পনা

পৃথিবীতে কিছু কল্পনা থাকে যা কল্পনার মধ্যেই সুন্দর। মানুষের সেই ব্যক্তিগত বিশ্ব কেউ দেখতে পায় না। তা একার। তা একান্ত। তা একটি পৃথিবী বিচ্ছিন্ন দ্বীপ! তা একটি দুর্গ।

আবুল বাশার ঃ ফুলবউ

কবিতা কল্পনালতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসুন্দরী (সোনার তরী)

আজ পর্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিক্ষার বাহন (পরিচয়)

কল্পনা এবং কাল্পনিকতা দুইয়ের মধ্যে মস্ত প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়।.....যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র (আধুনিক সাহিত্য)

কল্পনায় বাস করার বিপদ হচ্ছে এই, কল্পনার বাইরের এই বাস্তবজীবনে সামান্যতম দুঃখ বেদনা অপমান সহ্য করার মতো, ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার মতো জোর অবশিষ্ট থাকে না। কল্পনাপ্রবণ মানুষ তাই দিশেহারা হয়ে যায় সামান্য বিপদে বা দুঃখে। কিছু ঘটলেই তার মনে ঝড় ওঠে এবং দীর্ঘকাল সেই ঝড়ের প্রতিক্রিয়া থেকে যায়।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ সূত্রসন্ধান (ক্রীড়াভূমি)

কল্পবিজ্ঞান

গদ্য উপন্যাসের এক জনপ্রিয় শাখা। কল্পবিজ্ঞানমূলক উপন্যাসে মানুষের সাধারণ অস্তিত্বের বাইরে অস্তিত্বের এক অসম্ভাব্য, কাল্পনিক জীবন বা অস্তিত্ব সম্বন্ধে লেখা হয়। সময়ের বাহনে অতিবাস্তববাদী রোমাঞ্চকর জগতে পাড়ি দেওয়া—কল্পবিজ্ঞানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। এক ধরনের সাহিত্যিক প্রকল্পনা। ১৯২৬ সালে আমেরিকান পত্রিকা "অ্যামেজিং স্টোরিজ"-এর সম্পাদক হিউগো গ্যারন্স ব্যাক প্রথম এই শব্দটির প্রচলন করেন। ১৮১৮ সালে মেরি শেলির লেখা 'ফ্রাংকেনস্টাইন'কে কল্পবিজ্ঞান আখ্যা দেওয়া হলেও প্রকৃত কল্পবিজ্ঞান কাহিনির শুরু হল জুল ভার্ন এবং এইচ. জি. ওয়েল্‌স-এর লেখা কল্পকাহিনি থেকে। পরবর্তীকালে আইজাক আসিমভ, রে ব্র্যাডবেরি এবং আরথার সি ক্লার্ক এই সংরূপটির বিকাশ করেন।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্যের শব্দার্থকোশ

কষ্ট

কষ্ট করা চাই। কষ্ট না দেখলে যে জগৎবাসী তুষ্ট হয় না। কষ্ট না দেখলে 'ইস্ট' বলে চিনতে চায় না। দুঃখীর বেশ না দেখলে দুঃখাতুর জীব বলে—'তুমি তো রাজ-রাজেশ্বরী, তুমি আমাদের কে'? এ কথা সকল যুগের, সব কালের। তাই না—রাজার ছেলে সিদ্ধার্থ রাজপুরী ত্যাগ করে পথে বেরলেন। মাথা মুড়োলেন, চীরবসন পরলেন, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে দ্বারে দ্বারে ফিরলেন।

আশাপূর্ণা দেবী : মহামায়ার মায়া

ছ্যাঁদা ঘটী, চোরা গাই,
চোর পড়শী, ধূর্ত ভাই,
মূর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট,
এই কয়টি বড় কষ্ট।

বাংলা প্রবাদ

কাঁকন

কেন বাজাও কাঁকন কনকন কত ছলভরে।
ওগো, ঘরে ফিরে চলো কনককলসে জল ভরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

.....কাঁকনে নিরেট রোদ
দু হাতে পড়েছে যেন বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্যামা (আকাশপ্রদীপ)

দুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন দুখানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সোনার বাঁধন (সোনার তরী)

কাঁটা

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিমাল্য—৪৯

গোলাপের যে কারণে কাঁটা....স্ত্রীলোকেরও সেই কারণে তীক্ষ্ণ কথায় মর্মচ্ছেদ করবার অভ্যাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি—১৩.১০.১৮৯০

একদিন ফুল দিয়েছিলে হায়,
কাঁটা বিঁধে গেছে তার।
তবু, সুন্দর হাসিয়া তোমায়
করিনু নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

কাঁটাতে আমার অপরাধ আছে
দোষ নাহি মোর ফুলে।
কাঁটা, ওগো প্রিয়, থাক মোর কাছে
ফুল তুমি নিও তুলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

ফুল দেখিবার যোগ্য চক্ষু যার রহে
সেই যেন কাঁটা দেখে, অন্যে নহে নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

কাক

কাকেদের মামা নেই
বাবা, দাদা, দাদু নেই—
আর সব রিলেশন
বিলকুল ফাঁকা,
তাই কাক সমাজে
সব্বাই কা-কা।

দীপঙ্কর রায় ঃ গাছে ওঠা গরু

খাঁ খাঁ রোদ, নিস্তব্ধ দুপুর
আকাশ উপুড় করে ঢেলে দেওয়া অসীম শূন্যতা,
পৃথিবীর মাঠে আর মনে—
তারই মাঝে শুনি ডাকে
শুষ্ক কণ্ঠ কাক!
গান নয়, সুর নয়,
প্রেম, হিংসা, সুধা—কিছু নয়,
—সীমাহীন শূন্যতার শব্দমূর্তি শুধু।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ কাক ডাকে

কাঁপিয়ে গ্রীবা ভাবছে বারংবার,
নিরাপদের সীমা কোথায় তার।.....
কাকের দলের সাম্প্রদায়িক রাজনীতিবিৎ মন
সন্দেহ আর সতর্কতায় দুলছে সারাক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পাখির ভোজ (আকাশ প্রদীপ)

আর ছিল কাক....
কালো অঙ্গে চটুলতা, গ্রীবাভঙ্গী, চাতুরী সতর্ক আঁখি কোণে
পরস্পর ডাকাডাকি ক্ষণে ক্ষণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্কুল-পালানে (আকাশ প্রদীপ)

সবুজ ঘাসে কালো কাক সকাল আনে।

সমর সেন ঃ একটি কবিতা

আমার বয়সে আজ
কাকই শুধু কাছে আসে, শব্দের উচ্ছিষ্ট খায়,
মনে হয় আর কোন পাখি মানুষের এত কাছে
আসেনা কখনো। তাই কি হিন্দুর পিণ্ডে
কাকের প্রথম অধিকার! কাকের মহাত্মা ডেকে
শাস্ত্র লেখে 'নমঃ কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে নমঃ' মনে হয় মর্তেই রয়েছে
তার স্বর্গের স্বচ্ছন্দ অধিকার।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ কাকবিষয়ক (গাছমানুষ)

ওগো কাঙাল, আমারে কাঙাল করেছ, আরো কী তোমার চাই।
ওগো ভিখারি আমার ভিখারি, চলেছ কী কাতর গান গাই॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

কাঙাল/কাঙ্গাল

ওই যে কাঙ্গাল বসি রাজপথ ধারে,—
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি!—কঙ্কাল শরীর,
জীর্ণ পরিধেয় বস্ত্র, দুর্গন্ধ আধার ;
দুনয়নে অভাগার বহিতেছে নীর।
ভিক্ষা করি দ্বারে দ্বারে এ তিন প্রহর
পাইয়াছে যাহা, তাহে জঠর-অনল
নাহি হবে নির্ব্বাপিত ; রুগ্ন কলেবর ;
চলে না চরণ, চক্ষে ঘোরে ধরাতল।
কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কানে,
চলিল অভাগা পুনঃ ভিক্ষার সন্ধানে।

নবীনচন্দ্র সেন : পলাশীর যুদ্ধ (২/১৩)

রয় যে কাঙাল, শূন্য হাতে, দিনের শেষে
দেয় সে দেখা নিশীথরাতে স্বপন বেশে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

গাছের শিকড়
কাঙালের মতো ছড়িয়েছে আঙ্গুলগুলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক—চব্বিশ

কাঁচা

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সবুজের অভিশাপ (বলাকা)

কাছ

কাছের মানুষ না হলে কি সুখদুঃখের কথা বলা যায়।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় : বস্ত্রহরণ (শ্রেষ্ঠ গল্প)

কাছে আসবার রাস্তাটা কাছের লোকের চোখেই পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন

কাছে থেকে দূর রচিল কেন গো আঁধারে।
মিলনের মাঝে বিরহকারায় বাঁধা রে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (স্বরবিতান ১)

কাছে যবে ছিল পাশে হল না যাওয়া,
চলে যবে গেল তারি লাগিল হাওয়া।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (স্বরবিতান ২)

যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক
তারা তো পাবে না জানিতে
তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ
আমার হৃদয়খানিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—১০

দূর হতে যারে পেয়েছি পাশে
কাছের চেয়ে সে কাছেতে আসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

দুজনে রহিলে একা
কাছে থেকে থেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিচ্ছেদ (বীথিকা)

আপনি যে কাছে এল দূরে সে আছে
কাছে যে টানিয়া আনে সে আসে কাছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষরক্ষা—৪।১

কাছের রাতি দেখিতে পাই
মানা।
দূরের চাঁদ চিরদিনের
জানা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ফুলিঙ্গ—৫৩

কাজ

শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে.....কাজের মধ্যেই দাবানল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন

মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে হয় নিজের মনিবকে, নয় কোনো প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তুরের কর্ম-প্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরো-আনা মানুষের কাজ অন্যের কাজ। জোর করিয়া মানুষ নিজেকে আর কেহ কিংবা আর-কিছুর মতো করিতে বাধ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবির কৈফিয়ত (সাহিত্যের পথে)

যারা কাজ করতে চায় না তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে। যথার্থ কাজ করতে গেলেই লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরকুমার সভা

কাজের সম্বন্ধের ভিতর দিয়েও মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্বন্ধ, এইটেই বোধ হয় আমাদের পূর্বদেশের জিনিস। পশ্চিমদেশ কাজকে খুব শক্ত করে খাড়া করে রাখে, সেখানে মানবসম্বন্ধের দাবি ঘেঁষতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপানযাত্রী—৮

আপন ক্ষেত্রে পুরুষের জোর.....। যুক্তিতর্ক-কাকুতিমিনতির বাইরে একটি মাত্র কথা—কাজ আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুই বোন। শর্মিলা

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই—কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে, তাহারা কাজও নষ্ট করে সময়ও নষ্ট করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পনেরো আনা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

টাকা নিয়ে যারা কাজ করে তারা সেই টাকার পরিমাণেই কাজ করে,.......কাজেই তাদের ছুটি মেলে.....। কিন্তু অহংকারের তাগিদে যারা কাজ করে তাদের আর ছুটি নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাতায়নিকের পত্র—১ (কালান্তর)

মানুষের কাজের দুটো ক্ষেত্র আছে—একটা প্রয়োজনের আর একটা লীলার। প্রয়োজনের তাগিদ সমস্তই বাইরের থেকে, অভাবের থেকে ; লীলার তাগিদ ভিতর থেকে, ভাবের থেকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—২৪।৯।২৪

—সব জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াটাই তার লক্ষ্য।
—তা হলে কাজটা?
—চলার বেগে যে ধুলো ওড়ে, কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী

মেয়েরাই কাজের, পুরুষেরা হাড়ে অকেজো। আমরা কাজ করি দায়ে পড়ে, তোমরা কাজ কর প্রাণের উৎসাহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালঞ্চ—৪

কাজ সে তো মানুষের, এই কথা ঠিক,
কাজের মানুষ কিন্তু ধিক তারে ধিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

হয় কাজ আছে তব নয় কাজ নাই
কিন্তু 'কাজ করা যাক' বলিয়ো না ভাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

যেখানে কাজের দাবি অতিমাত্র,.....অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত কেজো ভাবেই আপনাকে প্রচার করার দিকে.....একান্ত প্রয়াস।.........সেখানে কাজ একটা মদের মতো, ফুরোলেই অবসাদ,......জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শতসহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ (শান্তিনিকেতন)—১২

কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে একেবারে হারিয়ে যেয়ো না।—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরনবীনতা (শান্তিনিকেতন)

বিনা মাইনের কাজ কাজও নয়, ছুটিও নয়, বারো আনা ফাঁকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১১

আমাদের দেশে একজন মানুষকে আশ্রয় করিয়া এক-একটা কাজ জাগিয়া উঠে ; তাহার পরে সেই কাজকে যাহারা গ্রহণ করে তাহারা তাহাকে যতটা আশ্রয় করে ততটা আশ্রয় দেয় না। কারণ, তাহারা কাজের দিকে তেমন করিয়া তাকায় না, যেমন করিয়া নিজের দিকে তাকায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথের সঞ্চয়—সমুদ্রপাড়ি

কোন কাজই কোনদিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়া যায় না। তার শক্তি কোথাও না কোথাও গিয়ে কাজ করেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পল্লীসমাজ

কাজল

কে দেখতে পায় চোখের কাছে
কাজল আছে কি না আছে?
তরল তব সজল দিঠি, মেঘের চেয়ে কালো,
আঁখির পাতা যেমন আছে এমনি থাকা ভালো।
কাজল দিতে প্রদীপখানি মিথ্যা কেন জ্বালো?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরায়মানা (ক্ষণিকা)

হরিণগর্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না, সরলে।—
এমনি তো বাণ নাশ করে প্রাণ
কী কাজ লেপিয়া গরলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার সভা

কাজল-বিহীন সজল নয়নে
হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিয়ো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রজাপতির নির্বন্ধ

আশ্বিনে পূজার যোগে তুলেছে কাজল।
যুবতী লোচনে দিলে পুরুষ পাগল॥

রূপরাম চক্রবর্তী ঃ ধর্মমঙ্গল

কাজলা

বাঁশবাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই—
মাগো, আমার শোলক-বলা কাজ্‌লা দিদি কই?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে,—
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই,
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজ্‌লা দিদি কই?

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ঃ দিদি-হারা

কাজের লোক

যারা কাজের লোক তাদের স্থির করিয়া রাখিলে তারা চারিদিকের সমস্ত লোককে অস্থির করিয়া তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভাইফোঁটা (গল্পগুচ্ছ)

কাজের লোক হইবার সবচেয়ে বড় সরঞ্জাম নিজের পবে অগাধ বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভাইফোঁটা (গল্পগুচ্ছ)

স্বাতন্ত্র্য-বুদ্ধিকে খর্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ-সমস্ত কাজের লোকের গুণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সফলতার সদুপায় (আত্মশক্তি)

কাড়া

যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে, গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কমলাকান্তের জোবানবন্দী

আমাদের সমাজ লোকসাধারণকে যে শক্তিহীন করিয়া রাখিয়াছে এইখানে সে নিজের শক্তিকে অপহরণ করিতেছে। পরের অস্ত্র কাড়িয়া লইলে নিজের অস্ত্র নির্ভয়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে—এইখানেই মানুষের পতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ (লোকহিত)

এ সংসারে কেড়ে না-নিলে যে কেউ কিছু দেয় না।

বিমল মিত্র ঃ আত্মহত্যার আগের ঘটনা

কাড়াকাড়ি

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বন্দী বীর (কথা)

কাণ্ডারী

অসহায় জাতি ডুবিছে মরিয়া জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! আজি দেখিব তোমার মাতৃমুক্তি-পণ!
"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন্ জন?
কাণ্ডারী! বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র!
কাণ্ডারী! তব সম্মুখে ঐ পলাশীর প্রান্তর,
বাঙালীর খুনে লাল হল যেথা ক্লাইভের খঞ্জর!
ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর।
উদিবে সে রবি আমাদের খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কান্তার

দুর্গম গিরি কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুঁশিয়ার!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

কান্না

কান্নার মতন বন্ধু আর নেই
শয়তান কাঁদে না, শয়তানের চোখ তাই জ্বলতে থাকে....
পুড়তে থাকে নিরুপায় বিদ্রোহের মতো.....
শয়তান কাঁদে না তাই তার মতো দুঃখী কেউ নেই
তুমি কাঁদতে পারো, তাই তুমি এতো সুন্দর, এতো পবিত্র।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় ঃ প্রকীর্ণ কবিতাবলী-৬

কাঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারই ঘায়ে—
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (স্বরবিতান ২)

কান্নাহাসির-দোল-দোলানো পৌষ-ফাগুনের পালা,
তারি মধ্যে চিরজীবন বইব গানের ডালা—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতপঞ্চাশিকা

যে কাঁদনে হিয়া কাঁদিছে সে কাঁদনে সেও কাঁদিল।
যে বাঁধনে মোরে বাঁধিছে সে বাঁধনে তারে বাঁধিল॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতপঞ্চাশিকা

দক্ষিণ হাওয়ায় দূর সমুদ্রের ঢেউ এর শব্দ পৃথিবীর বুকের ভিতরকার একটা কান্নার মতো নক্ষত্রলোকের দিকে উঠিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ

মেয়েদের বিয়ের আগেকার কান্না প্রভাতে মেঘডম্বরং।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায়-১

মানুষ সর্বদা নির্জনে কাঁদতে চায়। কোন সাক্ষী না রেখে।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ হিম পড়ে গেল

কানকাটা

কান-কাটাদের রাজ্যে।
ঠোঁট-কাটারা যাই বলুক না
আনে না কেউ গ্রাহ্যে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ দেয়ালের লিখন

কাপড়

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই,
দীন-দুখিনী মা যে মোদের
তার বেশি সাধ্য নাই।

রজনীকান্ত সেন : মায়ের দেওয়া

কাপুরুষ

কাপুরুষ ও দুর্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—২

অভাব জয় করাই জীবনের সফলতা—তাকে স্বীকার করে তার গোলামী করাটাই কাপুরুষতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : তরুণের বিদ্রোহ

দেবের দোহাই দেয় কাপুরুষ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শ্রীকান্ত ৪র্থ

কাব্য

কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার বাচ্য নয় 'ব্যঞ্জনা', কথা নয় 'ধ্বনি'— এ ব্যঞ্জনা কিসের ব্যঞ্জনা, এ ধ্বনি কিসের ধ্বনি। ধ্বনিবাদীদের উত্তর—'রস'-এর। তাঁরা দেখিয়েছেন, বাক্য যদি মাত্র কেবল বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, তবে তা কাব্য হয় না। রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। কাব্যের 'ধ্বনি' হচ্ছে রসের ধ্বনি।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত : ধ্বনি (কাব্যজিজ্ঞাসা)

কাব্য পাঠককে উপদেশ করে, রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ, রামের মতো পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাওয়া উচিত, রাবণের মতো পরদারহরণ অনুচিত। তবে এ উপদেশ নীরস শাস্ত্রবাক্যের উপদেশ নয়, কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে—কান্তার উপদেশের মতো সরস, অর্থাৎ অম্লমধুর উপদেশ।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত : ফল (কাব্যজিজ্ঞাসা)

রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত : রস (কাব্যজিজ্ঞাসা)

কাব্যের উদ্দেশ্য নীতিজ্ঞান নহে—কিন্তু নীতিজ্ঞানের যে উদ্দেশ্য, কাব্যের সেই উদ্দেশ্য। কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : উত্তরচরিত (বিবিধ প্রবন্ধ)

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ, মা গৃধঃ।.....কাব্য সাধনায় এই মন্ত্র মহামূল্য।.....মহৎ সাহিত্য ভোগকে লোভ থেকে উদ্ধার করে, সৌন্দর্যকে আসক্তি থেকে, চিত্তকে উপস্থিত গরজের দণ্ডধারীদের হাত থেকে। রাবণের ঘরে সীতা লোভের দ্বারা বন্দী ; রামের ঘরে সীতা প্রেমের দ্বারা মুক্ত, সেখানেই তাঁর সত্য প্রকাশ। প্রেমের কাছে দেহের অপরূপ রূপ প্রকাশ পায়। লোভের কাছে তার স্থূল মাংস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অবতরণিকা

কবি ভাবের আলোককে কেবল প্রকাশ করেন তাহা নহে, তিনি যে দেশের মানুষ

সেই দেশের হৃদয়ের রং দিয়া তাহাকে একটু বিশেষ ভাবে সুন্দর করিয়া প্রকাশ করেন।......বৈষ্ণব পদাবলী বাঙালি-কাব্য রূপেই বিশ্বকাব্য। তাহা বিশ্বের জিনিস বিশ্বকে দিতেছে, কিন্তু তাহারই মধ্যে নিজের একটা রস যোগ করিয়া দিতেছে;নিজের একটি রূপের পাত্রে তাহাকে ভরিয়া দিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবি য়েট্‌স্‌ (পথের সঞ্চয়)

কাব্য বোঝবার আনন্দেরও সাধনা করতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবির অভিভাষণ (সাহিত্যের পথে)

কাব্যের একটা গুণ এই যে, কবির সৃজনশক্তি পাঠকের সৃজনশক্তি উদ্রেক করিয়া দেয়। কাব্য সেই অগ্নিশিখা, পাঠকদের মন ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আতশবাজি। আগুন ধরিবামাত্র কেহ বা হাউইয়ের মত একেবারে আকাশে উড়িয়া যায়, কেহ বা তুবড়ির মত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। কেহ বা বোমার মত আওয়াজ করিতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কাব্যের তাৎপর্য (পঞ্চভূত)

আঁঠিই ফলের প্রধান অংশ, এবং বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা তাহার প্রমাণ করাও যায়।....তথাপি অনেক রসজ্ঞ ব্যক্তি ফলের শস্যটি খাইয়া তাহার আঁঠি ফেলিয়া দেন।....কাব্য হইতে কেহ বা ইতিহাস আকর্ষণ করেন, কেহ বা দর্শন উৎপাটন করেন, কেহ বা নীতি, কেহ বা বিষয়জ্ঞান উদ্‌ঘাটন করিয়া থাকেন, আবার কেহ বা কাব্য হইতে কাব্য ছাড়া আর কিছুই বাহির করিতে পারেন না—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কাব্যের তাৎপর্য (পঞ্চভূত)

যেখানে বিদ্যুৎ-সুক্ষ্মছায়া
করিছে রূপের খেলা, পরিতেছে ক্ষণিকের কায়া,
আবার ত্যজিয়া দেহ ধরিতেছে মানসী আকৃতি—
সেই তো কবির কাব্য, সেই তো তোমার কণ্ঠে গীতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতচ্ছবি (বীথিকা)

বাক্ এবং অবাক্-এর একান্ত মিলনেই কাব্য।.....যাকে কাব্য বলি সেটা হচ্ছে বচন-অনির্বচনের সদ্য-মিলনের পরিভূষিত উৎসব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র (ছন্দ)

যে জিনিষটা পাতে পড়িলে উপাদেয়, সেইটাই মাথায় পড়িলে গুরুতর হইয়া উঠিতে পারে। ভাষা শিখাইবার জন্য ভালো কাব্য পড়াইলে তরবারি দিয়া ক্ষৌরি করাইবার মতো হয়—তরবারির তো অমর্যাদা হয়ই, গণ্ডদেশেরও বড়ো দুর্গতি ঘটে। কাব্য জিনিষটা রসের দিক হইতে পুরোপুরি কাব্য হিসাবেই পড়ানো উচিত ; তাহার দ্বারা ফাঁকি দিয়া অভিধান-ব্যাকরণের কাজ চালাইয়া লওয়া কখনই সরস্বতীর তুষ্টিকর নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি

সকল বড়ো কাব্যই আমাদিগকে বৃহতের মধ্যে আহ্বান করিয়া আনে ও নিভৃতের দিকে নির্দেশ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নববর্ষ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

সাধ্বী স্ত্রী যেমন স্বামীকে ছাড়া আর কাহাকেও চায় না, ভালো কাব্য তেমনি ভাবুক ছাড়া আর কাহারও অপেক্ষা করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রঙ্গমঞ্চ (বিবিধ প্রবন্ধ)

ভর্তৃহরির কাব্যে দেখি ভোগের মানুষ আপন সুর পেয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই কাব্যের

গভীরের মধ্যে বসে আছে ত্যাগের মানুষ আপন একতারা নিয়ে—এই দুই সুরের সমবায়েই রসের ওজন ঠিক থাকে, কাব্যেও মানবজীবনেও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী—১ (বিশ্বভারতী)—অবতরণিকা

ইতিহাস সবই মনে রাখতে চায় কিন্তু সাহিত্য অনেক ভোলে।......সাহিত্যের মধ্যে আছে বাছাই করার ধর্ম....। কবির রচনাক্ষেত্রকে তুলনা করা যেতে পারে নীহারিকার সঙ্গে। তার বিস্তীর্ণ ঝাপসা আলোর মাঝে মাঝে ফুটে উঠেছে সংহত ও সমাপ্ত সৃষ্টি। সেইগুলিই কাব্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবীন্দ্র-রচনাবলী—১। (বিশ্বভারতী)—ভূমিকা

শ্রেষ্ঠ কাব্যে প্রথমে আমাদের কানের এবং কলাবোধের তৃপ্তি, তারপরে আমাদের বুদ্ধির তৃপ্তি ও তারপরে হৃদয়ের তৃপ্তি—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—২। বিকার শংকা

মানুষের বোধের বেগ যখন বাঁধ মানে না,
বাহন করতে চায় কথাকে,—
তখন তার কথা হয়ে যায় বোবা,
সেই কথাটা খোঁজে ভঙ্গি, খোঁজে ইশারা,
খোঁজে নাচ, খোঁজে সুর,
দেয় আপনার অর্থকে উল্‌টিয়ে,
নিয়মকে দেয় বাঁকা করে।
মানুষ কাব্যে রচে বোবার বাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক—১৭

জীবন-সত্যের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাই ত সত্যিকার কাব্য-প্রেরণার বিশুদ্ধ উৎস।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আধুনিক কাব্য

কাব্যের মূল কথা হইল সৌন্দর্য-সৃষ্টি।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আধুনিক কাব্য

কাব্যনাট্য

কাব্যনাট্য মুখ্যতঃ এবং সর্বতোভাবেই অন্তর্নাটক ; আধুনিক মননে যে নাটক নিঃশব্দ-সঞ্চারী অথচ হৃদয় মন্থন করা আবেগের প্রকাশ, কাব্যনাট্য তাকেই দিয়েছে সার্থকতা। নাটক মাত্রেই অভিনেয়। কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রেও এই দাবী উপেক্ষণীয় নয়।....কাব্যনাট্য পঠিতব্যও বটে। এ নাটক পাঠে যে আনন্দ, অভিনয়ে তারই ব্যাপ্ত ব্যঞ্জনা দর্শকদের এর অংশভাগী করবে।.....গভীরতা ও গতি এই দুইয়ের সমান্তরাল অভিজ্ঞতা প্রায় অলভ্য হলেও আধুনিক জীবন যে অর্থে অসম্ভবের সমীকরণ, আধুনিক কাব্যনাট্যও সে অর্থেই তার বিশ্বস্ত সহযাত্রী।

চারচোখ কাব্যনাট্য সংকলন ঃ ভূমিকা

আধুনিক বাংলা নাটকে এত স্থূলত্ব এসে গেছে যে, একে সাহিত্যের স্তরে উন্নীত করতে হলে কাব্যনাট্যের সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নাটকের সাহিত্যমূল্য

কাম

কাম প্রেম দোঁহাকার বিবিধ লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ॥
আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥

অতয়েব কাম প্রেম বহুত অন্তর।
কাম অন্ধ তমঃ প্রেম নির্ম্মল ভাস্বর॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

কাম শরীরের নয়, মনোবাঞ্ছা, এবং সে মন দুজনের
দুটি মন যদি মেলে, তখনই শরীর জেগে ওঠে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত ঃ জয়দ্রথ ও দ্রৌপদী

সৃষ্টিমূলে আছে কাম সেই কাম দুর্জয় দুর্বার।

মোহিতলাল মজুমদার ঃ পান্থ

কামনা

তুমি মোরে দিয়েছো কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি-সম
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্নসুধা মম।

বুদ্ধদেব বসু ঃ বন্দীর বন্দনা

কারা/কারাগার

কারার ঐ লৌহকপাট, ভেঙে ফেল, কর্ রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ!
ধ্বংস নিশান উঠুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি'।.......
লাথি মার্ ভাঙ্‌রে তালা! যত সব বন্দীশালায়
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভাঁঙার গান

কারাগারের কোণে বসে অসহায় শিশুর মত ক্রন্দন করলে কিছু হবে না ; পদাহত পঙ্গুর মত বসে দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করে অভিশাপ দিলে কিছু হবে না ; পাপী মুমূর্ষুর মত অন্তিমে একবার ঈশ্বরকে 'দয়াময়' বলে ডাকলে কিছু হবে না!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সাজাহান

কারাগার যদি
সুবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে
কমনীয় কভু কি লো শোভে তার আভা?

রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধূ,
তবু বদ্ধ কারাগারে।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ মেঘনাদবধ কাব্য

ওরে, চারি দিকে মোর
এ কী কারাগার ঘোর।
ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা, আঘাতে আঘাত কর্!
ওরে, আজ কী গান্ গেয়েছে পাখি,
এসেছে রবির কর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ (প্রভাত সংগীত)

কাল

তুমি মৃত্যু তুমি কাল তুমি হও যম।

কাশীরাম দাস ঃ মহাভারত

গেছে কেটে তিনকাল
যে কালে এসেছি আজ সে কালটা সিনিকাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আধুনিকা (প্রহাসিনী)

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন,
চক্রে-পিষ্ট আধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদায় (মহুয়া)

যে কাল হরিয়া লয় ধন
সেই কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি।
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রী (পরিশেষ)

আজ যারা চোখে পড়ে না
কাল তারা দেখা দেবে সবচেয়ে বেশি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রথের রশি

—মডার্ণ কালটাই খেলো।
—খেলো বলব না, বলব বেহায়া। সে কালের বুড়ো শিব চোখ বুজে বসেছেন ধ্যানে, এ কালের নন্দীভৃঙ্গী আয়না হাতে নিয়ে নিজেদের চেহারাকে ব্যঙ্গ করছে—যাকে বলে debunking.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবিবার (তিনসঙ্গী)

থাকব না ভাই থাকব না কেউ—
থাকবে না ভাই, কিছু,
সেই আনন্দে যাও রে চলে
কালের পিছু পিছু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ (ক্ষণিকা)

হায়। কালের কি মহিমা—সেদিন যার পিতামহ যে পাথরকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করেচে—মুক্তির অনন্যগতি জেনে ভক্তি করেচে, আজ তার পৌত্তর সেই পাথরের ওপোর পা তুলতে শঙ্কিত হচ্চে না।

হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ) : হুতোম প্যাঁচার নক্সা

কালচার

'কালচার' শব্দের মৌলিক অর্থ ও গঠন ধরিয়া কর্ষণাত্মক 'কৃষ্টি' শব্দ তৈয়ারী করা অন্যায় নয়। অবশ্য 'কৃষ্টি'ও অনেক পুরাতন শব্দ ; উহার বৈদিক অর্থ এখন বিস্মৃত। সেই অর্থ ছিল 'সমুদয় কৃষককুল' (দ্রষ্টব্য ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি' ১ম ভাগ পৃঃ ৬১)। 'সংস্কৃতি' শব্দটিও বৈদিক। 'সংস্কৃতি' শব্দটির মধ্যে মানুষের 'কৃতি'র বা সৃষ্টিমূলক সক্রিয় প্রয়াসের একটি ইঙ্গিত রহিয়াছে বলিয়া তাহা সর্ব যুগের মানুষের উপযোগী।

গোপাল হালদার : সংস্কৃতির গোড়ার কথা

আজকাল 'কালচার্ড', মানেই স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিক।

বনফুল : হাটে বাজারে

কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা-১

কালবৈশাখী

নাচে ঐ কাল-বোশেখী, কাটাবি কাল বসে কি?
দেয় রে দেখি ভীম-কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি!
লাথি মার ভাঙরে তালা! যত সব বন্দীশালায়
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।

কাজী নজরুল ইসলাম : গান-দেশাত্মবোধক (কারার ঐ)

নববর্ষের পুণ্য-বাসরে কাল-বৈশাখী আসে।
হোক সে ভীষণ, ভয় ভুলে যাই অদ্ভুত উল্লাসে।
ঝড় বিদ্যুৎ বজ্রের ধ্বনি—
দুয়ার জানালা উঠে ঝনঝনি—
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে বুঝি, তবু প্রাণ ভরে আশ্বাসে।

মোহিতলাল মজুমদার : কালবৈশাখী

কালি

গায়ের কালি ধুলে যায়, মনের কালি মলে যায়।

বাংলা প্রবাদ

ওই......এক বোতল ব্লু-ব্ল্যাক কালি কিনিয়া আনিয়াছি উহারই প্রত্যেক ফোঁটার মধ্যে কত পাঠকের সুষুপ্তি মাদার টিংচার আকারে বিরাজ করিতেছে।....কত পুঁথি, কত চটি, কত যশ, কত কলঙ্ক, কত জ্ঞান, কত পাগলামি, কত ফাঁসির হুকুম, যুদ্ধের ঘোষণা, প্রেমের লিপি, কালো-কালো হইয়া স্রোত বাহিয়া বাহির হইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সরোজিনী প্রয়াণ-৩ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

কালী

সদানন্দময়ী কালী, মহাকালের মনোমোহিনী।
তুমি আপনি নাচ, আপনি গাও, আপনি দাও মা করতালি॥
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশি-ভালী.
ব্রহ্মাণ্ড ছিল না যখন, মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য : শাক্ত পদাবলী

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি
অন্তিম কালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী কালী।

দাশরথি রায় : পাঁচালী

কালীতন্ত্রে বলা হয়েছে—"কাল নিয়ন্ত্রণাৎ কালী তত্ত্বজ্ঞান" প্রদায়িনী ঃ ১১/১৮ কালকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলে ইনি কালী—তত্ত্বজ্ঞান প্রদায়িনী। যিনি সর্বভূতকে 'কলন' অর্থাৎ গ্রাস করেন তিনি হলেন কাল। মহানির্বাণতন্ত্রে বলা হয়েছে—

কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরাঃ।

—মহাকাল সকল প্রাণীকে গ্রাস করেন তাই তিনি মহাকাল। তুমি মহাকালকেও

কলন কর বলে তোমার নাম আদ্যা পরমা কালিকা।
এই বিশ্বসৃষ্টির আগে একমাত্র ইনিই বর্তমান ছিলেন এবং এঁর দ্বারাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রসূত হয়েছে, এজন্য একে আদ্যা বলা হয়ে থাকে।

দীপ্তিময় রায় ঃ পশ্চিমবঙ্গের কালী ও কালীক্ষেত্র

গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়।
কালী কালী বলে আমার অজপা যদি ফুরায়॥
ত্রিসন্ধ্যা যে বলে কালী, পূজা সন্ধ্যা সে কি চায়।
সন্ধ্যা তার সন্ধানে ফেরে, কভু সন্ধি নাহি পায়॥

মদন মাস্টার ঃ শাক্ত পদাবলী

ও মা কালী চিরকালই সং সাজালি এ সংসারে।
এ সং-সাজায় নাইকো মজা, সাজা পাই যে অন্তরে॥
ও মা কভু ভূতলে অনিলে, কভু ব্যোম রসাতলে,
কভু বারিধি সলিলে সাজাও নানা আকারে॥

মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক) ঃ শাক্ত পদাবলী

আদ্যাশক্তি লীলাময়ী ; সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী।....তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তিনিই মহাকালী, নিত্যকালী, শ্মশানকালী, রক্ষাকালী, শ্যামাকালী। মহাকালী, নিত্যকালীর কথা তন্ত্রে আছে। যখন সৃষ্টি হয় নাই ; চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, পৃথিবী ছিল না ; নিবিড় আঁধার ; তখন কেবল মা নিরাকারা মহাকালী—মহাকালের সঙ্গে বিরাজ করছিলেন।

শ্যামাকালীর অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনী। গৃহস্থ বাড়িতে তাঁরই পূজা হয়। যখন মহামারী, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি হয়—রক্ষাকালী পূজা করতে হয়। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। শব, শিবা, ডাকিনী, যোগিনী মধ্যে, শ্মশানের উপর থাকেন। রুধিরধারা, গলায় মুণ্ডমালা, কোটীতে নরহস্তের কোমরবন্ধ। যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন।.....সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্ণনাভি'র কথা ; মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

মন তোর এত ভাবনা কেনে।
একবার কালী বলে বস রে ধ্যানে॥
জাঁক-জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে করবে পূজা, জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু-পাষাণ মাটির মূর্তি, কাজ কিরে তোর সে গঠনে?
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি-পদ্মাসনে॥.....
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কি রে তোর বলিদানে,
তুমি 'জয় কালী' 'জয় কালী' বলে বলি দাও ষড় রিপুগণে॥

রামপ্রসাদ সেন ঃ শাক্ত পদাবলী

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন॥

কালী পদ্মবনে হংস-সনে হংসীরূপে করে রমণ॥
তাকে সহস্রারে মূলাধারে সদা যোগী করে মনন॥

রামপ্রসাদ সেন ঃ শাক্ত পদাবলী

কালো

আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়
দেখে যা আলোর নাচন॥
মায়ের রূপ দেখে দেয় বুক পেতে শিব
যার হাতে মরণ বাঁচন॥
আমার কালো মেয়ের আঁধার কোলে
শিশু রবি-শশী দোলে ;
(মায়ের) একটুখানি রূপের ঝলক
ঐ স্নিগ্ধ বিরাট নীল-গগন॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভক্তিগীতি

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে
কালো চুলে রাঙা কোসম হেরেছ কি নয়নে?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কবি

একে কালো মেয়ে, দরিদ্র তায়, বয়স—সে বিশ পার ;
জগতের চোখে কে-বা তারে চায়? নিরুপায় চারিধার!
তবু এ রজনী শেষ হয়ে যাবে—যতই ফাটুক বুক!
কাল প্রাতে কোথা নিস্তার পাবে? দেখাতে হবে না মুখ।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ঃ আইবুড়ো কালো মেয়ে

কাস্তে

বেয়নেট হোক যত ধারালো—
কাস্তেটা ধার দিয়ো, বন্ধু!
শেল আর বম হোক ভারালো
কাস্তেটা শান দিয়ো, বন্ধু।
নতুন চাঁদের বাঁকা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালোবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো
এ-যুগের চাঁদ হলো কাস্তে!

দিনেশ দাস ঃ কাস্তে

আজ শুধু কাস্তে দাও আমার এ হাতে।
আমার পুরনো কাস্তে পুড়ে গেছে ক্ষুধার আগুনে,
তাই দাও দীপ্ত কাস্তে চৈতন্য প্রখর—
যে কাস্তে ঝলসাবে নিত্য উগ্র দেশ প্রেমে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ ফসলের ডাক ১৩৫১ (ছাড়পত্র)

আকাশে উঠেছে কাস্তের মতো চাঁদ,
এ যুগের চাঁদ কাস্তে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কাস্তে

কিউবিজম

১৯০৭ সালে প্যারিসে এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। 'কিউবিজম'-এর ধারার চিত্রকলায় বস্তু, দৃশ্যরূপ এবং কখনও কখনও প্রকৃতিকেও তাদের মূল জ্যামিতিক ছকে বা আকৃতিতে প্রকাশ করা হয়। পাবলো পিকাসো ও জর্জ ব্রাক দৃশ্যমান শিল্পে কিউবিজমের প্রতিষ্ঠাতা।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্যের শব্দার্থকোশ

কিশোর

হে কিশোর, তুলে লও তোমার উদার জয়ভেরী
        করহ আহ্বান।
আমরা দাঁড়াব উঠি, আমরা ছুটিয়া বাহিরিব,
        অর্পিব পরান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষশেষ (কল্পনা)

মানুষের এই কিশোর বয়সটার মত এমন মহাবিস্ময়কর বস্তু বোধ করি সংসারে আর নাই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শ্রীকান্ত

নবীন কিশোর, তোমাকে দিলাম ভুবনডাঙার মেঘলা আকাশ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ উত্তরাধিকার

কিশোরী

একটি কিশোরী তার করমচা রঙের হাত মেলে দিল বিকেলের দিকে
সূর্য খুশী হয়ে উঠলেন তাঁর পুনরায় যুবা হবার সাধ হলো।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ নিসর্গ (বন্দী জেগে আছো)

কীর্তন

রূপ গোঁস্বামী 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে বলিয়াছেন, "নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"। উচ্চৈঃস্বরে ভগবানের নামলীলা ও গুণসমূহের অনুশীলনের নাম কীর্তন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য়)

কীর্তনের গানের কথা সুর সব ভগবানের সঙ্গে ; মানুষের সঙ্গে নয়। শ্রোতা ওখানে উপলক্ষ্য। উপযুক্ত স্থান নইলে ও গান গাইতে নেই। গাইলেও আসে না। পয়সা নিয়ে আসর করে যারা কীর্তন গায়, মানুষকেই শোনায়—তাদের গানে সেই জন্য প্রাণ থাকে না। কণ্ঠে সুর, শিক্ষার জ্ঞান যতই থাক মনে ভক্তি আর পবিত্রতা না থাকলে কীর্তন হয় না ; সে মিথ্যা গাওয়া হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নিশিপদ্ম

কীর্তনের গঠনপদ্ধতিতে যে 'বহুশাখায়িত নাট্যরস' আছে, যে মহৎ স্থাপত্যশিল্প আছে, যে ছবি ও সুর, প্রেম ও কাব্য, রূপ ও ভাবের একত্র-সমাবেশ, তাল ও আখরের বৈচিত্র্য আছে সে-সবই সঙ্গীতের একটি উচ্চ সাধনার পরিণাম।

দিলীপকুমার রায় ঃ কীর্তন

কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ—কলিতে বহু দোষ, কিন্তু একটা গুণ এই যে, কৃষ্ণনাম কীর্তন করলেই পরা মুক্তি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দেবযান

বাংলাদেশে কীর্তন গানের উৎপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভীর এবং দূরব্যাপী হৃদয়াবেগ। এই সত্যকার উদ্দাম বেদনা হিন্দুস্থানি গানের পিঞ্জরের মধ্যে বন্ধন স্বীকার করতে পারলে না, সে বন্ধন হোক না সোনার। বাদশাহী হাটে

তার দাম যত উঁচুই হোক। অথচ হিন্দুস্থানি রাগরাগিণীর উপাদান সে বর্জ্জন করেনি। সে সমস্ত নিয়েই সে আপন নূতন সঙ্গীতলোক সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করতে হলে চিত্তের বেগ এমনিই প্রবলরূপে সত্য হওয়া চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিঠি

কীর্তন আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ আমরা

"নামলীলাগুণাদীনাং উচ্চৈর্ভাষা তু কীর্তনম্"—শ্রীহরির নাম, লীলা ও গুণাদির উচ্চভাষণই কীর্তন। নবধা ভক্তির দ্বিতীয় অঙ্গ কীর্তন। এই কীর্তন 'জপ' নামেও পরিচিত।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ঃ বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনীয়া

কীর্তি

মহাপুরুষদিগের কীর্তি এক কালকে অন্য কালের সহিত বাঁধিবার জন্য যোগসূত্রের কাজ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্রসূচনা—বঙ্গদর্শন

নদী কি নিজের ফেনাকে গ্রাহ্য করে? কীর্তি তো আমাদের ফেনা—ছড়াতে ছড়াতে চলে যাবো, ফিরে তাকাবো না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী

কীর্তি যখন গড়া শেষ হয়নি তখন সে আমার ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তধারা

তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার বারম্বার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা ৭ (সাজাহান)

কুকুর

একটা কুকুর ছিল ওর পোষা,
কুলীন জাতের নয়,
একেবারে বঙ্গজ।
চেহারা প্রায় মনিবেরই মতো,
ব্যবহারটাও।
অন্ন জুটত না সব সময়ে
গতি ছিল না চুরি ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছেলেটা (পুনশ্চ)

কুকুর সোহাগ পাইলে ক্রমে কর্তার মুখ চাটে।

হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) ঃ সম্পাদকীয় (গ্রামবার্তা প্রকাশিকা)

কুটিলতা

সরলতা এবং মহত্ত্ব যেমন চোখে মুখে স্বতঃস্ফূর্ত হয়, কুটিলতা এবং নীচতাও তেমনি হয়।

বনফুল ঃ হাটে বাজারে

কুটুম্ব

কুটুম্বেরা কুটুম্বের গৌরব খুঁজেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় : কুটুম্বিতা

কহিল ভিক্ষার ঝুলি টাকার থলিরে
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কিরে?
থলি বলে, কুটুম্বিতা তুমিও ভুলিতে
আমার যা আছে গেলে তোমার ঝুলিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মীয়তা (কণিকা)

গতির সহিত গতির, এক কম্পনের সহিত অন্য কম্পনের ভারি একটা কুটুম্বিতা আছে। "সা" সুরের তার বাজিয়া উঠিলে "মা" সুরের তার কাঁপিয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গদ্য ও পদ্য (পঞ্চভূত)

কুমারী

কুমারী মেয়েদের মনটা খুব শুদ্ধ হয়, ফুলের মতন হয়।....সেই মনটাকে আরো শুদ্ধ করে তোলার জন্য কোন পুরুষকে সে ভালোবাসে, সেটা তো একধরনের পুজো। মনটা একটা কেন্দ্রে এসে জড়ো হয়।

আবুল বাশার : ফুলবউ

কুর্ণিশ

আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!

কাজী নজরুল ইসলাম : বিদ্রোহী

করপুটে পৃথ্বীনাথে কুর্ণিশ করিল।

ঘনরাম চক্রবর্তী : ধর্মমঙ্গল

কুণ্ডলিনী/কুলকুণ্ডলিনী

কুণ্ডলিনী মহাশক্তি হইতে অভিন্না। শক্তির সঙ্কুচিত রূপটিই কুণ্ডলীভূত রূপ। এইজন্য ইহা জটপাকানো অর্থাৎ কুণ্ডলীভূত। ইহা সার্দ্ধত্রিবৃত্তাকৃতি ও ভুজগাকার। সুষুম্না নাড়ীর অঙ্গভূত ছিদ্রে, দেহস্থ আধারকমলে স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে বেষ্টন করিয়া ব্রহ্মদ্বার আচ্ছাদনপূর্বক ইনি অবস্থান করেন। ইনি প্রসুপ্তা। এই অবস্থায় তাঁহার যে শ্বাসোচ্ছ্বাস, তাহাই জীবের জীবনপ্রবাহ—'শ্বাসোচ্ছ্বাসবিভঞ্জনেন জগত্যং জীবো যয়া ধার্যতে' (ষট্‌চক্রনিরূপণ)। প্রসুপ্ত অবস্থায় তাঁহার মুখ হইতে মত্ত অলির মত যে অস্ফুট সুমধুর গুঞ্জন উত্থিত হয়, তাহাই বর্ণাত্মক কাব্য। কুণ্ডলিনী 'পরংব্রহ্মরূপিণী', ইনি 'নিত্যানন্দ পীযূষধারাধরা' ; ইনি একদিকে 'অঘটনঘটনপটিয়সী', 'অতি কুশলা'—শিব ও জীবকে মোহমুগ্ধ করিয়া রাখেন, তেমনই আবার ইনি অন্যদিকে জ্ঞানরূপা—'নিত্যা প্রবোধোদয়া'। এই কুণ্ডলিনী দেহস্থ পদ্মের দলে দলে ছন্দে ছন্দে বিরাজমানা। ইনিই নাদের পরা, পশ্যন্তা, মধ্যমা ও বৈখরী রূপে প্রকাশিতা হন। অপরূপ ইঁহার রূপমাধুরী, অদ্ভুত শক্তি। সাধক যোগী স্বদেহে ইঁহাকে ধ্যান করেন, আধারকমলে প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগরিত করিয়া ষট্‌চক্র ভেদপূর্বক সহস্রার কমলে পরম শিবের সহিত মিলিত করেন। ইহাই তান্ত্রিক যোগ এবং এই যোগে সিদ্ধ হইলেই পুরুষার্থসিদ্ধি।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী : শাক্ত পদাবলী ও শক্তিসাধনা

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—সুষুম্নার ভিতর সব পদ্ম আছে—চিন্ময়।.......মূলাধার পদ্মে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি আছেন। চতুর্দল পদ্ম। যিনি আদ্যাশক্তি তিনিই সকলের দেহে

কুলকুণ্ডলিনী রূপে আছেন। যেন ঘুমন্ত সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে! "প্রসুপ্ত-ভুজগাকারা আধারপদ্মবাসিনী"!

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

কুলকুণ্ডলিনী—তন্ত্রপ্রসিদ্ধ মূলাধারস্থ সর্পীতুল্য শক্তি।....যাহা মূলাধার পদ্মগহ্বরে শোভা পায়, এবং মত্ত অলিসমূহের ন্যায় মধুর শব্দ করে, আর যাহার শ্বাস ও উচ্ছ্বাসের বিবর্তন দ্বারা জগতের জীব জীবিত থাকে, সেই শক্তিকে কুলকুণ্ডলী বা কুলকুণ্ডলিনী বলে।

সুবলচন্দ্র মিত্র : সরল বাঙ্গালা অভিধান

কুয়াশা

স্ট্রেচারের পরে শুয়ে কুয়াশা ফিরিছে বুঝি তোমার দুচোখে।

জীবনানন্দ দাশ : জীবন সঙ্গীত (আলোপৃথিবী)

পাড়ার বস্তিগুলির উপরে তখনো একখানা করিয়া সাদা কুয়াশা, ডিম্বগুলির উপরে নিস্তব্ধআসীন রাজহংসের মতো স্থির হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৌকাডুবি—৪৩

কুলায়

কুলায়-ফেরা পাখি
নীল আকাশের বিরামখানি রাখবে ডানায় ঢাকি ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আনমনা (পূরবী)

জান তো ভাই, দুটি প্রাণীর বেশি
এ কুলায়ে কুলায় নাকো মম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যুগল (ক্ষণিকা)

আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে।

সতেন্দ্রনাথ দত্ত : বর্ষা নিমন্ত্রণ (অভ্র-আবীর)

কুলীন

যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কোন্দল।

ভারতচন্দ্র রায় : অন্নদামঙ্গল

কৃতকার্য

বুঝলে মুখুজ্যে, জীবনে কিছুই কিছু নয়
যদি কৃতকার্য না হলে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ

কৃতঘ্ন/কৃতঘ্নতা

কৃতঘ্নতা মহাপাপ! বল না আমায়
যেই করে ক'রে মুখে আহার প্রদান,
কোন্ মূর্খ সেই কর কাটিবারে চায়?
কৃতঘ্নহৃদয় আহা! নরক সমান!
সামান্য যে উপকারী, তার অপকার
করিলে, পাপেতে আত্মা হয় কলুষিত।

নবীনচন্দ্র সেন : পলাশীর যুদ্ধ (১৭)

পরাধীন দেশের সবচেয়ে বড় অভিসম্পাতই তো হল কৃতঘ্নতা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পথের দাবী

কৃতজ্ঞতা

দয়া বলে,—'কে গো তুমি? মুখে নাই কথা'?
অশ্রুভরা আঁখি বলে, 'আমি কৃতজ্ঞতা'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিচয় (কণিকা)

য়ুরোপীয় যখন বলে "থ্যাঙ্ক গড", তখন তাহার অর্থ এই ঈশ্বর যখন মনোযোগপূর্বক আমার একটা উপকার করিয়া দিলেন, তখন সে উপকারটা স্বীকার না করিয়া বর্বরের মতো চলিয়া যাইতে পারি না। আমাদের দেবতাকে আমরা কৃতজ্ঞতা দিতে পারি না কারণ, কৃতজ্ঞতা দিলে তাঁহাকে অল্প দেওয়া হয় তাঁহাকে ফাঁকি দেওয়া হয়। তাঁহাকে বলা হয়, তোমার কাজ তুমি করিলে, আমার কর্তব্যও আমি সারিয়া দিয়া গেলাম। বরঞ্চ স্নেহের একপ্রকার অকৃতজ্ঞতা আছে, কারণ স্নেহের দাবির অন্ত নাই। সেই স্নেহের অকৃতজ্ঞতাও স্বাতন্ত্র্যের কৃতজ্ঞতা অপেক্ষা গভীরতর, মধুরতর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৌন্দর্যের সম্বন্ধ (পঞ্চভূত)

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাওয়া কঠিন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : অভিভাষণ

কৃত্রিম

কৃত্রিমতাই মনুষ্যের সর্বপ্রধান গৌরব।....গাছকে আপনার পল্লব প্রস্তুত করিতে হয় না, আকাশকে আপনার নীলিমা নির্মাণ করিতে হয় না ; ময়ূরের পুচ্ছ প্রকৃতি স্বহস্তে চিত্রিত করিয়া দেন। কেবল মানুষকেই বিধাতা আপন সৃজন-কার্যের অ্যাপ্রেন্টিস্ করিয়া দিয়াছেন, তাহার প্রতি ছোটোখাটো সৃষ্টির ভার দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গদ্য ও পদ্য (পঞ্চভূত)

ঝুমকোর ফুল ফোটে ডালে,
চোরেও চায় না কোনোকালে,
কানে ঝুমকোর ফুল দামি।
কৃত্রিম জিনিসেরই দাম,
কৃত্রিম উপাধিতে নাম,—
জমকালো করেছি তো আমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পলাতকা (প্রহাসিনী)

কৃত্তিবাস

আধুনিক যুগেও বহুপঠিত গ্রন্থের মধ্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণই সর্বপ্রধান, বাঙালীর ধ্যানধারণা ও জীবনাদর্শের প্রতিটি পর্ব এই মহাগ্রন্থের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুধু কাব্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, বাঙালীর প্রাণের সঙ্গে এ কাব্যের অচ্ছেদ্য বন্ধন স্থাপিত হয়েছে।

বস্তুত কৃত্তিবাসী রামায়ণ ভক্তিগ্রন্থেই পরিণত হয়েছে, এতে যে রামনামতত্ত্ব প্রচারিত হয়েছে, তাই চৈতন্যযুগে নতুন রূপে ও পরিবেশে অভিনব তাৎপর্য লাভ করেছে। রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বাঙালীর ঘরের মানুষ হয়ে গেছেন, বাঙালীর সমগ্র জীবনকেই কৃত্তিবাসী গ্রন্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ধরেছে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

কৃত্তিবাস, কীর্ত্তিবাস কবি
এ বঙ্গের অলঙ্কার।

মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য

কৃষি

এবার আমি করব কৃষি।'
ওগো এ ভবসংসারে আসি॥

রামপ্রসাদ সেন : শাক্ত পদাবলী

মন রে কৃষি কাজ জান না।।
এমন মানব জমিন রইল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা।।
কালী নামে দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না।।
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছেতে যম ঘেঁসে না।।

রামপ্রসাদ সেন ঃ শাক্ত পদাবলী

কৃষিবিপ্লব

ভারতবর্ষে বিপ্লবের প্রধান ভিত্তি হচ্ছে কৃষিবিপ্লব। সুতরাং আমাদের রাজনৈতিক প্রচার আন্দোলনের প্রধান বক্তব্য হবে—কৃষিবিপ্লব সফল কর।

চারু মজুমদার ঃ বর্তমান অবস্থায় আমাদের কর্তব্য

কৃষ্টি

গোলাম।। আমি তাসদ্বীপপ্রদীপের সম্পাদক। আমি তাসদ্বীপের কৃষ্টির রক্ষক।
রাজা।। কৃষ্টি! এটা কী জিনিস। মিষ্টি শোনাচ্ছে না তো।
গোলাম।। না মহারাজ, এ মিষ্টিও নয়, স্পষ্টও নয়, কিন্তু যাকে বলে নতুন, নবতম সকলে।। অবদান। এই কৃষ্টি আজ বিপন্ন।
সকলে।। কৃষ্টি, কৃষ্টি, কৃষ্টি।

……………………………

কৃষ্টি, কৃষ্টি, তাসদ্বীপের কৃষ্টি। বাঁচাও সেই কৃষ্টি।

……………………………

গোলাম।। এ কী হল, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি, হায় কৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তাসের দেশ

কৃষ্ণ

বল কৃষ্ণে কি ঐ কংসকারায় বেঁধে রাখা যায়।
আহা মাঠে মাঠে লক্ষ কৃষ্ণ অগ্নি বাঁশের বাঁশি বাজায়।

অজিত পাণ্ডে ঃ চন্দনপিড়ির অহল্যা গো

তিমির-বিদারী অলখ-বিহারী
কৃষ্ণ মুরারি আগত ঐ।
টুটিল আগল, নিখিল পাগল,
সর্বসহা আজি সর্বজয়ী।।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (ভক্তি-গীতি)

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ চৈতন্যচরিতামৃত

শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। আমি কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কৃষ্ণচরিত্র

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ।.......কৃষ্ণকথিত ধর্মের অপেক্ষা উন্নত, সর্বলোকহিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কৃষ্ণচরিত্র ৭/২

কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সভ্রান্ত রাজনীতিজ্ঞ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কৃষ্ণচরিত্র ৭/২

মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া যত দূর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দূর সর্বজ্ঞ। অপূর্ব অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, যাহার উপরে আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা হইতে চিকিৎসাবিদ্যা ও সঙ্গীতবিদ্যা, এমন কি অশ্বপরিচর্যা পর্যন্ত তাঁহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের পুনর্জীবন একের উদাহরণ ; বিখ্যাত বংশীবিদ্যা দ্বিতীয়ের এবং জয়দ্রথবধের দিবসে অশ্বের শল্যোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কৃষ্ণচরিত্র ৭/২

কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কৃষ্ণচরিত্র ৭/২

কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্বগুণের অভিব্যক্তিতে উজ্জ্বল। তিনি অপরাজেয়, অপরাজিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতিময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্মে অপরাঙ্মুখ—ধর্মাত্মা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্মজ্ঞ, লোকহিতৈষী, ন্যায়নিষ্ঠ, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শাস্তা, নির্মম, নিরহংকার, যোগযুক্ত, তপস্বী। তিনি মানুষী শক্তির দ্বারা কর্ম নির্বাহ করেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্র অমানুষ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কৃষ্ণচরিত্র ৭/২

কৃষ্ণ ঐতিহাসিক হইতে পারেন, কিন্তু মহাভারতের কৃষ্ণ যে সর্বাংশে ঐতিহাসিক কৃষ্ণের প্রতিরূপ তাহার কোনো প্রমাণ নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৃষ্ণচরিত্র (আধুনিক সাহিত্য)

মহাভারতের কবি-বর্ণিত কৃষ্ণচরিত্রের প্রত্যেক তথ্যটি প্রকৃত না হইতে পারে, কৃষ্ণের মুখে যত কথা বসানো হইয়াছে এবং তাঁহার প্রতি যত কার্যকলাপের আরোপ হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃত্তান্তটি প্রামাণিক না হইতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের যে মাহাত্ম্য তিনি পাঠকদের মনে মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন তাহাই সর্বাপেক্ষা মহামূল্য সত্য। কৃষ্ণ যে কথা বলেন নাই কিন্তু যে কথা কেবল কৃষ্ণই বলিতে পারিতেন সেই কথা কৃষ্ণকে বলাইয়া, কৃষ্ণ যে কাজ করেন নাই কিন্তু যে কাজ কেবল কৃষ্ণই করিতে পারিতেন সেই কাজ কৃষ্ণকে করাইয়া, কবি বাস্তবিক কৃষ্ণ অপেক্ষা তাঁহার কৃষ্ণকে অধিকতর সত্য করিয়া তুলিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৃষ্ণচরিত্র (আধুনিক সাহিত্য)

কেকারব

কবির কেকারব....বর্ষার গান ; কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে—সেইজন্যই মন তাহাতে অধিক মুগ্ধ হয়। মন তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেকখানি পায়, সমস্ত মেঘাবৃত আকাশ, ছায়াবৃত অরণ্য, নীলিমাচ্ছন্ন গিরিশিখর, বিপুল মূঢ় প্রকৃতির অব্যক্ত অন্ধ আনন্দরাশি।

বিরহিণীর বিরহবেদনার সঙ্গে কবির কেকারব এইজন্যই জড়িত। তাহা শ্রুতিমধুর বলিয়া পথিকবধূকে ব্যাকুল করে না—তাহা সমস্ত বর্ষার মর্মোদ্ঘাটন করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কেকাধ্বনি

এ পারে মুখর হল কেকা ওই, ও পারে নীরব কেন কুহু হায়।
এক কহে, 'আর-একটি একা কই, শুভযোগে কবে হব দুঁহু হায়'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা ১

কেতকী

শয়নঘরের হুকে
ছিন্নবৃন্ত বনের কেতকী দুলিল মনের সুখে।

আধঘুমে চাহি দেখিনু চমকি—ঝুলিছে সর্বনাশী
নিজ অঙ্গের নীলাম্বরীতে কণ্ঠে লাগায়ে ফাঁসি।

. . . .

মেঘে আর ঘুমে, ঘুমে আর মেঘে ডুবে গেছে যত তারা,
কোন কেতকীর শোকে গো বন্ধু তুমিও নিদ্রাহারা?

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ কেতকী (মরুমায়া)

কেতকীকেশরে কেশপাশ করো সুরভি,
ক্ষীণ কটিতটে গাঁথি লয়ে পরো করবী।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা ২

প্রেমেরি সে দানখানি, সে যেন কেতকী
রক্তরেখা এঁকে গায়ে
রক্তস্রোতে মধুগন্ধ দিয়েছে মিশায়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিপ্লব (সানাই)

কেরানি

দশটার কলকাতা এতো হতশ্রী উন্মাদ দুঃস্থ কেরানির পদভারে ক্লান্ত কলকাতা
উপচে পড়া মানুষের ভিড় ঠেলে মানুষের উর্ধ্বশ্বাস ছোটা মানুষের
শরীরসংস্থান দেখে মনে হয় একদিন মানুষই ছিলো বা আজ নেই
আজ শুধু ভারবাহী পশুর নির্বোধ দুঃখে ভারি করে পথের বাতাস।
প্রতিযোগিতার ঘৃণ্য কানাগলি পার হতে ফুরোয় কৃপণ দিনগুলি।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় ঃ সুখি গৃহকোণ তাতে শোভে গ্রামাফোন

সরকারি অফিসের প্রতিটি কেরানির চেয়ারই আজকাল এক একটা সিংহাসন।

শ্যামলতনু দাশগুপ্ত ঃ জান বদল

কোকিল

অরসজ্ঞ কাক চুষে জ্ঞান-নিম্বফলে।
রসজ্ঞ কোকিল খায় প্রেমাম্র-মুকুলে।। **কৃষ্ণদাস কবিরাজ** ঃ চৈতন্যচরিতামৃত

কোজাগর/কোজাগরী লক্ষ্মী

কোজাগরের লক্ষ্মী হের—এলেন আজি মূর্তিমতী,
চন্দনে ও আলিম্পনে অর্ঘ্য রচ ভাগ্যবতী ;
গাঁথ মালা শুভ্র ফুলে সাজাও ডালা লাজের রাশে ;
শ্বেতপাথরের থালা ভরাও নারিকেলের শুক্ল শাঁসে ;
শর্করা আর ছানার যোগে ভোগের থালা পূর্ণ কর,
শঙ্খপরা গৌর হাতে ঘৃতের দীপটি তুলে ধর ;
আত্মা ’পরে দৃষ্টি রাখ মনের ময়লা ফেল ধুয়ে—
শুভ্র প্রাণে শুক্ল বাসে প্রণাম কর চরণ ছুঁয়ে।
প্রণাম কর—উর্ধ্বে হের বিশ্বভুবন সিক্ত করে
মায়ের আশিস্-কিরণ-ধারা মাথার ’পরে পড়ছে ঝরে
চক্ষু-মনের তৃপ্তিভরা দীপ্তিমতী মূর্তিখানি—
দেখ্‌রে চেয়ে অবিশ্বাসী কোজাগরের লক্ষ্মীরানী।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ঃ কোজাগর-লক্ষ্মী

'কো জাগর্তী' হতে এই কথার উৎপত্তি, অর্থাৎ কে জেগে আছে। পুরাণের মতে, ঐদিন রাত্রে লক্ষ্মীদেবী এসে বলেন, কে জেগে আছ, আজ আমি তোমাকে ধন দেব। এইজন্য কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে জাগরণের প্রথা আছে।

সুধীরচন্দ্র সরকার : পৌরাণিক অভিধান

কঃ (কে) জাগর (জাগিতেছে)—এই পূর্ণিমায় কে জাগে ;........"ঘুমে লক্ষ্মী হন বিরূপা, জাগরণে লক্ষ্মীর কৃপা, নৈলে কেন জাগে কোজাগরে"—দাশরথি রায়। [লক্ষ্মী বলেন, এই পূর্ণিমায় যে জাগে, তাহাকে ধন দিব। এই তিথিতে অক্ষক্রীড়া নারিকেলজল পান ও চিপিটক ভক্ষণ বিহিত (তিথ্যাদি তত্ত্ব)]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গীয় শব্দকোষ

কোতোয়াল

কোতোয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশান হান হান হাঁকে॥

ভারতচন্দ্র রায় : অন্নদামঙ্গল

কোরআন/কোরআন শরীফ

কোরআনে জোর দেওয়া হয়েছে সেই সব চিন্তার উপরে যা সহজবোধ্য—সব মানুষের প্রতিদিনের জীবনের ভালোর সঙ্গে যা মুখ্যভাবে জড়িত। মানুষের সুনিয়ন্ত্রিত ও শুচিতাপূর্ণ জীবন যাপনের কথা, তাদের মধ্যে প্রেম-প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপনের কথা, ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার কথা, বার বার এতে ঘোষণা করা হয়েছে, আর বিশেষ করে বলা হয়েছে বিশ্বজগতের যিনি মঙ্গল-বিধাতা, যিনি সত্যস্বরূপ, তাঁর একান্ত আনুগত্য স্বীকারের কথা।

কাজী আবদুল ওদুদ : পবিত্র কোরআন—ভূমিকা

কোরআন শরীফ : আল্লাহ্‌র বাণীর সংকলন গ্রন্থ। এ কোনো মানুষের রচনা নয়—স্বয়ং আল্লাহ্‌ই এ গ্রন্থের রচয়িতা। দেবদূত হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ্‌র নিকট হতে বাণী নিয়ে শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর নিকট তা পৌঁছে দিতেন। হযরত মোহাম্মদের (দঃ) বয়স যখন চল্লিশ বছর সাত মাস, মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত হেরা পর্বতের গুহায় তিনি ধ্যানমগ্ন। ছশো দশ খ্রীষ্টাব্দের আঠাশে জুলাই মোতাবেক সতরই রমযান সোমবারে প্রথম তিনি বাণী প্রাপ্ত হন।

মাওলানা মোবারক করীম জওহর : ভূমিকা (কোরআন শরীফ)

সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন পরিবেশ ও পরিস্থিতির পটভূমিকায় আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ হয়েছে। একটি মানুষের জীবনে চলার পথে যা কিছু প্রয়োজন, সমাজজীবনে যা কিছু অপরিহার্য কোরআন শরীফে সে সকল সমস্যার উল্লেখ আছে ও তার সুন্দর সমাধানের ইংগিত আছে। মানবজীবনের এমন কোন দিক নেই, যেখানে কোরআন আলোকপাত করেনি। মানুষের ধর্মীয় জীবন কেমন হবে, কোন্ পথে গেলে অধ্যাত্ম জীবনের চরমোন্নতি সম্ভব, সমাজজীবনে মানুষ কেমনভাবে চলবে, এতিম-অনাথদের সঙ্গে কেমনভাবে ব্যবহার করবে, মানুষ আত্মীয়-স্বজন, পিতা-পুত্র-মাতার মধ্যকার সম্পর্ক কেমন হবে, কোন্ নীতি অনুসরণ করে আমরা ব্যবসা-বাণিজ্য করব, কিভাবে আমরা দান-খয়রাত করব, কিভাবে আমরা আমাদের উপার্জিত অর্থ ব্যয় করব, কিভাবে অপরাধীদের সাজা দেব, দাম্পত্য-জীবন কেমন হবে, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কে হবে, কে কতটুকু অংশ পাবে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমানদের ব্যবহার কেমন হবে, মৃত্যু কি, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা কি হবে,

কবর, কবর সংক্রান্ত ব্যাপারের বর্ণনা ইত্যাদি ইত্যাদি। পার্থিব এবং পারলৌকিক জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই যার উল্লেখ এবং সমাধান কোরআন শরীফে নেই। পৃথিবীর কোন গ্রন্থ আজ পর্যন্ত এমন বিস্তৃত এবং বিশাল পটভূমিকায় লিখিত হয়নি। ভাবতে অবাক লাগে এমন একটি সুসম্পূর্ণ সংবিধান হাতে থাকতে কেন আমরা ভুল পথে চলি? কেন আমাদের মাঝে এত হানাহানি ও অশান্তি? আসুন আজ হতে আমরা আমাদের ধর্মীয় ও কর্মীয় জীবনে এই ঐশ্বরিক সংবিধানকে মেনে চলার শপথ নিই।

মাওলানা মোবারক করীম জওহর ঃ ভূমিকা (কোরআন শরীফ)

কোলাজ

ফরাসী ক্রিয়াপদ 'কোলে' বা সাঁটা থেকে কোলাজ এই বিশেষ্য শব্দটি এই শতকের গোড়ায় চিত্ররচনার একটি বিশিষ্ট পদ্ধতির পরিচায়ক হিসাবে দেখা দিয়েছে। ইংরাজিতে তদুপরি পেপার কাটিং এন্ড পেসটিং কিংবা কাটা কাগজ সেঁটে তৈরি—এই অভিব্যক্তি প্রচলিত থাকলেও কোলাজ শব্দটি তার বিশেষ তাৎপর্যের জন্যই ইংরাজিতে গৃহীত হয়েছে।.....

কোলাজ এসেছিল সামাজিক ভাঙনের অভিব্যক্তি হিসাবে। প্রথার জড়ত্ব ভেঙে শিল্পরচনায় যে কোনো জিনিষের ব্যবহারযোগ্যতা এর দ্বারা সিদ্ধ করা হয়েছিল। ভাঙনের অভিব্যক্তি হিসাবে দেখা দিলেও কোলাজ একটি পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। মাধ্যমগতভাবে কোলাজ তেল, জল, খড়ি মাধ্যমের সঙ্গে অন্বিত হয়েই দেখা দিয়েছিল, আলাদা অস্তিত্বে নয়।

শোভন সোম ঃ চিত্রভাবন

ফরাসী ভাষায় কোলাজ (collage) কথাটার মানে জোড়া লাগানো। আঠা দিয়ে টুকরো টুকরো কাগজ জোড়াকেই কোলাজ বলা হয়। পরে একটি নির্দিষ্ট অর্থ হলো—খবরের কাগজের অংশ কেটেকেটে ক্যানভাসের ওপর জুড়ে ফেলে কোনো একটি নতুন রকম ছবি তৈরী করা। এইভাবে তৈরী ছবির নাম collage.

সাহিত্যের ক্ষেত্রে collage-এর অবশ্য এমন সুচারু ব্যাখ্যা নেই, তবে বিভিন্ন লেখকের বিখ্যাত পংক্তির ব্যবহারে যদি কোনো রচনা সজ্জিত হয় তবে তাকে collage বলা চলে।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ঃ বাংলা সাহিত্যের নানারূপ

কৌতুক

এ কী কৌতুক নিত্যনূতন
ওগো কৌতুকময়ী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অন্তর্যামী (চিত্রা)

সুখে....স্মিত হাস্য........কৌতুকে........উচ্চ হাস্য......। ভৌতিক জগতে আলোক এবং বজ্র ইহার তুলনা।........কৌতুক আমাদের চিত্তের উত্তেজনার কারণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৌতুকহাস্য (পঞ্চভূত)

ভালোবাসার নবাঙ্কুরে গোপনে জলসিঞ্চন তরুণীদের পক্ষে বড়ো কৌতুকের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পুত্রযজ্ঞ (গল্পসল্প)

কৌতূহল

কৌতূহলের একটা প্রধান অঙ্গ নূতনত্বের লালসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৌতুক হাস্যের মাত্রা (পঞ্চভূত)

ক্রন্দন

জনম-ক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন
যুগে যুগে জীবে জীবে হল চিরন্তন।....
যত কাঁদি তত জপি আদি আলোকের
ক্রন্দনের বীজ—ওম্ ওম্ ওম্।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ অন্ধকার (মরুশিখা)

বিশ্বের ক্রন্দন-বিচলিত নারায়ণ,
আঁখি তাঁর অশ্রুতে ভরিল,—
গোলোকে হল না ঠাঁই, শিবজটা বহি তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ গঙ্গাস্তোত্র (মরুশিখা)

নিশিদিন আপনার ক্রন্দন গাহিলে
ক্রন্দনের নাহি অবসান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মঙ্গলগীত (কড়ি ও কোমল)

ক্রিকেট

ক্রিকেট। ইংরেজিতে শব্দটার একটা যোগরূঢ় অর্থ আছে ঃ ভদ্রতা। 'কিউ' ভেঙে কেউ যদি অন্যায়ভাবে ডিঙিয়ে যেতে চায় তখন আমরা বলি ঃ দ্যাটস নট ক্রিকেট।

নারায়ণ সান্যাল ঃ এক. দুই....তিন...

কোনও ভারতীয় যা ইচ্ছে তাই করেছে। বিশ্বায়নের দাপটে ক্রিকেটের কৌলীন্যের দফা-গয়া। বিশ্বকাপ জিতলে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে। অতঃপর বিশ্বজয়ের বারো-ইয়ারি আনন্দের কথা ভেবে কলকাত্তাইয়া হুতোমের মতো নক্সা লিখতে হবে ঃ "পাঠক। ফুটবল আমল শীতকালের সূর্যের মতো অস্ত গ্যালো। মেঘান্তের রৌদ্রের মতো ক্রিকেটু খেলার প্রতাপ বেড়ে উঠলো। বড় বড় গোলপোস্ট সমূলে উচ্ছিন্ন হলো। কঞ্চিতে ব্যাট-উইকেট তৈরি হতে লাগলো। নবো মুনসি, ছিরে বেণে ও পুঁটে তেলি ক্রিকেটার হলো।"

বিশ্বজিৎ রায় ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা (২২.৩.২০০৩)

কুড়ি বছর আগেও ভারতীয় ক্রিকেট ছিল এলিটদের খেলা। সেটা সীমাবদ্ধ ছিল অর্থনৈতিকভাবে সচ্ছল শ্রেণীর মধ্যে। এই 'এলিটিজম'কেই এক ধাক্কায় চুরমার করে দিয়েছিল ১৯৮৩-র জয়। সেই জয়ের পর থেকেই আমরা মধ্যবিত্তরা বুঝতে পারি। পড়াশোনার পাশাপাশি ক্রিকেট খেলেও কেরিয়ার করা যায়।

বোরিয়া মজুমদার ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা (২২.২.২০০৩)

ক্রোধ

আমাদের রাজনৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্রোধ কখনই বৈপ্লবিক উত্তরণে পৌঁছয় না। ক্রুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারেও আমরা সাবধানী। আমাদের ক্রোধেরও একটা প্যাটার্ণ তৈরী হয়ে গেছে।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বৈপ্লবিক থিয়েটার এবং আমাদের আজকের কাজ

অত্যাচারিত হলে যে রাগ করে না, প্রতিকারও করে না, সে অক্রোধী কিন্তু কাপুরুষ, অমানুষ, জীবনধারণের অযোগ্য। যে ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হয়ে পাপ করে ফেলে, সে হঠকারী দুষ্কর্মা, কিন্তু তার পৌরুষ আছে। যে ক্রোধের বশে ধর্মাধর্মের জ্ঞান হারায় না এবং অন্যায়ের যথোচিত প্রতিকার করে, সেই শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) ঃ ভীমগীতা

ক্লান্ত

....এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে।

জীবনানন্দ দাশ ঃ আট বছর আগের একদিন

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।

জীবনানন্দ দাশ ঃ বনলতা সেন

ক্লান্তি

ক্লান্তি টানে অঙ্গ মম প্রিয়ার মিনতি-সম—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অশেষ (কল্পনা)

ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু,
পথে যদি পিছিয়ে পড়ি কভু।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলেখা ৩

ক্লাসিক

মার্ক টোয়েন-এর কথা, ক্ল্যাসিকস এমন এক সাহিত্য যাহা সকলেই মনে করেন, পড়া উচিত ছিল, কিন্তু কেউ পড়িতে চাহেন না। বলাবাহুল্য, এই উক্তি সকলের পক্ষে সত্য নয়। রোমানরা "ক্ল্যাসিকস" বলিতে বুঝিতেন সেই সাহিত্যকর্ম যা উচ্চবর্গের মানুষদের জন্য রচিত। এ সব কেতাবের লেখকদের বলা হইত 'স্ক্রিপটার ক্ল্যাসিকস'। আর নিম্ন বর্গ বা আমজনতার জন্য যাঁহারা লিখিতেন, তাঁহাদের বলা হইত 'স্ক্রিপ্টাস প্রোলেটারিয়াস'। এই বিভাজন অবশ্য ক্রমে বিলীন হইয়া যায়। 'ক্ল্যাসিক' তক্‌মা সাঁটিয়া দেওয়া হয় সেই সব সৃষ্টির ললাটে, যাহাতে রহিয়াছে উচ্চ আদর্শ, গভীর ভাব, রচনার লালিত্য ও পারিপাট্য এবং যাহার শিল্প সৌন্দর্য প্রশ্নাতীত। আদিতে গ্রিকদের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মতোই তাহাদের সৃজনশীল সাহিত্য এবং ভাব-ভাবনা বিধৃত রচনামাত্রই গণ্য হইত 'ক্ল্যাসিক' বলিয়া।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ সম্পাদকীয় ২০-৪-২০০৩

একটা বৃহৎ মনশ্চৈতন্যের ভূমিকায়,—শান্ত, সর্বব্যাপক, সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে ক্লাসিক আদর্শের জন্ম। তাতে প্রাচীনত্ব এবং চিরন্তনত্ব দুটি উপাদানই বিদ্যমান। শুধু পুরোনো কালের জিনিষ হলেই 'ক্ল্যাসিক' হয় না। গাম্ভীর্য, সারল্য, প্রশান্তি—এই সব গুণবাচক বিশেষ্য-সমাবেশের মধ্য দিয়েই সে আদর্শের কতকটা ধারণা লাভ করা সম্ভব।

হরপ্রসাদ মিত্র ঃ সাহিত্যের নানাকথা—ক্ল্যাসিক ও রোমান্টিক

ক্লাসিসিজম

ক্লাসিসিজম সাধারণ অর্থে সাহিত্যে রোমান্টিকতার বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি। ক্লাসিসিজম্-এর বৈশিষ্ট্য হল পরিমিতিবোধ, ভারসাম্যবোধ, সংযম এবং আঙ্গিক-সচেতনতা। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্য এই অর্থে 'ক্লাসিকাল' অর্থাৎ ধ্রুপদী। ব্যাপক অর্থে গ্রিক ও রোমান সাহিত্যের অনুকরণে রচিত সাহিত্যকেও 'ক্লাসিকাল' সাহিত্য আখ্যা দেওয়া হয়। ক্লাসিসিজম-এর তাত্ত্বিক অর্থ হল নিয়ম, প্রথা এবং প্রচলিত শৃঙ্খলার অনুসরণ, তাৎক্ষণিক প্রেরণা নয়।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্যের শব্দার্থকোশ

ক্ষমতা

ক্ষমতা থাকলে হয়তো হাতে বেড়ী পরানো যায়, কিংবা গতিরুদ্ধ করা যায় কোনো কলম্বাসের। কিন্তু মস্তিষ্কে পরাবার মতো শেকল তো আজও আবিষ্কৃত হয় নি।

আজিজুল হক ঃ কারাগারে ১৮ বছর

ক্ষমতায় অন্ধ অহঙ্কারে অস্ত্রাঘাত করতে করতে সেই অস্ত্র একদিন প্রতিহত হয়ে আসে—লাগে নিজের গলাতেই। অত্যাচারের রূপটা স্পষ্ট হয় যত বেশি—বিদ্রোহের রক্তবীজ ততই বেশি পরিমাণে বংশবিস্তার করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

মানুষের অত্যন্ত কাছে যাইবার যে ক্ষমতা সে একটা দুর্লভ ক্ষমতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ইংরেজ ও ভারতবাসী (রাজাপ্রজা)

অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি

ক্ষমতা জিনিষটা যেখানে পড়ে-পাওয়া জিনিস, যার কোনো যাচাই নেই,....যাকে যোগ্যতার কোনো প্রমাণ দিতে হয় না, সেখানে.....সে কেবল হীনতার সৃষ্টি করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ—৫১

ক্ষমতা আছে আমাদের মগজে, অক্ষমতা আমাদের পকেটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ল্যাবরেটরি

ক্ষমতার মদ অত্যন্ত কড়া, সেলামের মোহ মজ্জার মধ্যে জড়িত হইয়া যায় এবং প্রেস্টিজের অভিমান ধর্মের কাছেও মাথা হেঁট করিতে চায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্টপফোর্ড ব্রুক (পথের সঞ্চয়)

ক্ষমা

ক্ষমা করতে জানলেই
সব সময় ক্ষমা করা যায় না।
যারা ভাতের নাম করে
ভাতকে অপমান করে
তাদের ক্ষমা করা কি ভাতের সাজে!

কমলেশ সেন ঃ একমুঠো ভাতের জন্যে

চাটুকারিতা আর ধূর্তামির ব্যূহে অভিমন্যু দিনগুলি একটা একটা করে পেরিয়ে আসি শেষতম সম্মানের লক্ষ্যে,
যারা কবোষ্ণ হাত বাড়ায় তাদের জন্য বাতাসের কাছে গচ্ছিত রাখি বিশুদ্ধ শব্দের ঘ্রাণ
বাকি যারা গোপনে ছুরি চালায় ছায়াশরীরে,
বিষ মেশায় আমাদের পরিস্রুত জলে, তাদের জন্য ক্ষমা শুধু শব্দহীন ক্ষমা।

বিশ্বজিৎ রায় ঃ বীজ (কবোষ্ণ ৪/১)

ক্ষমা শুধু শক্তের ভূষণ নহে, সময়বিশেষে শক্তের ব্রহ্মাস্ত্রও ক্ষমা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথ ও পাথেয়

যিনি অসতর্কভাবে রথ হাঁকান অসতর্ক পদাতিককে তিনি কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পয়লা নম্বর (গল্পগুচ্ছ)

যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রশ্ন (পরিশেষ)

ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে
ভালো আর মন্দেরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্যামা

ক্ষয়

জন্মের সঙ্গে যেমন মৃত্যুর সম্পর্ক সেই রকম শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে জীর্ণতার। কোনো জিনিসই ক্রমাগত মাথা তুলে ছড়িয়ে যেতে পারে না, একসময় তার ক্ষয় শুরু হয়। ওটা একটা প্রসেস।......রামায়ণে আছে—'সর্বে ক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ পতনান্তাঃ সমুচ্ছ্রয়া। সংযোগী বিপ্রয়োগান্তা মরণান্তং তু জীবিতম্॥'—সব সঞ্চয়ের শেষে ক্ষয়, উন্নতির অন্তে পতন, মিলনের শেষে বিচ্ছেদ, জীবনেরও অন্তে মরণ।

বিমল কর ঃ দিনান্ত

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই ওরে ভয় নাই ;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সুপ্রভাত

ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্রহৃদয়ের স্বভাব এই যে, সে যে পরিমাণে অযাচিত উপকার প্রাপ্ত হয় সেই পরিমাণে অকৃতজ্ঞ হইয়া উঠে। যাহা-কিছু সহজেই পায় তাহাই আপনার প্রাপ্য বলিয়া জানে ; নিজের দিক হইতে যে কিছুমাত্র দেয় আছে তাহা সহজেই ভুলিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চারিত্রপূজা

যাহারা অপরিষ্কৃত ক্ষুদ্র ঘরে বাস করে, প্রায় দেখা যায়, তাহাদের মন সেইরূপ অপরিষ্কৃত, ক্ষুদ্র।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পালামৌ

খবর

খবর আসে।
দিগ্‌দিগন্ত থেকে বিদ্যুদ্বাহিনী খবর ;
যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়—
—এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।

• **সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ** খবর (ছাড়পত্র)

খাদ্য

যদি আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবীর যাবতীয় প্রাকৃতিক সম্পদ ঠিক ভাবে কাজে লাগান যায় তবে কাহারও জন্য খাদ্য সম্পদের অভাব হইবে না। প্রাচুর্যের পরিসীমা থাকিবে না।

মেঘনাদ সাহা ঃ কাব্য ও বিজ্ঞান

খিদে

খিদের কাছে পাপ নেই রে বাবা! জানিস তো অগ্নিকে বলে পাবক, অগ্নিতে সকল পাপ নষ্ট করে। জঠরাগ্নির বাড়া তো আর অগ্নি নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ও রানী ১।২

নিঝুম নিশুত রাতে, একা শুয়ে তেতালাতে, খালিখালি খিদে পায় কেন রে?

সুকুমার রায় ঃ হ য ব র ল

খুঁৎ

আকাশের গায়ে কিবা রামধনু খেলে,
দেখে চেয়ে কত লোক সব কাজ ফেলে ;
তাই দেখে খুঁৎ-ধরা বুড়ো কয় চটে,
দেখছ কি, এই রং পাকা নয় মোটে।।

সুকুমার রায় ঃ আকাশের গায়ে

খুশি

আলোর খুশি উঠল জেগে
ধানের শিষে শিশির লেগে,
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই যে উথলে,
মরি, হায় হায় হায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

খুনী

খুনী এবং নারীধর্ষকদের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

প্রফুল্ল রায় ঃ ক্রান্তিকাল

খেলা

খেলার জগতে হিংসে থাকে না
থাকে শুধু হারজিত। **শরতকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ** বন্ধের দিন

মানবহৃদয় নিয়ে এত অবহেলা,
খেলা যদি, কেন হেন মর্মভেদী খেলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কেন (কড়ি ও কোমল)

জানি জানি, তুমি আমার চাও না পূজার মালা,
ওগো খেলার সাথি!
এই জনহীন অঙ্গনেতে গন্ধপ্রদীপ জ্বালা,
নয় আরতির বাতি।
তোমার খেলায় আমার খেলা মিলিয়ে দেব তবে
নিশীথিনীর স্তব্ধ সভায় তারার মহোৎসবে,
তোমার বীণার ধ্বনির সাথে আমার বাঁশির রবে
পূর্ণ হবে রাতি।
তোমার আলোয় আমার আলো মিলিয়ে খেলা হবে,
নয় আরতির বাতি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খেলা (পূরবী)

স্বর্গের খেলা মর্ত্যের ম্লান ধূলায় হেলায়,
দুঃখেরে লয়ে আনন্দ খেলে দোলন-খেলায়,
শৌর্যের খেলা ভীরু মাধুরীর আসঙ্গে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ "আঁধারের লীলা আকাশে"

সংসারে যে হতভাগ্য শিশু খেলার জিনিস অপর্যাপ্ত পাইয়া থাকে, তাহার খেলা মাটি হইয়া যায়। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি**

খেলা-শুরুও খেলা, খেলা-ভাঙাও খেলা। খেলার আরম্ভে হল বাঁধন, খেলার শেষে হল বাঁধন খোলা।.......এই খেলা ভাঙার খেলা বীরের খেলা। শেষ পর্যন্ত যে ভঙ্গ দিল না তারই জয়। বাঁধন ছিঁড়ে যে চলে যেতে পারল, পথিকের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল পথে, তারই জন্যে জয়ের মালা। পিছনে ফিরে ভাঙা খেলনার টুকরো কুড়োতে গেল যে কৃপণ তার খেলা পুরো হল না—খেলা তাকে মুক্তি দিল না। খেলা তাকে বেঁধে রাখলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিশিষ্ট (নবীন)

—সময় জিনিসটাই যে খেলা, কেবল চলে যাওয়াটাই তার লক্ষ্য।
—তাহলে কাজটা?
—চলার বেগে যে ধুলো উড়ে কাজটা তাই, ওটা উপলক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী—১ম দৃশ্য

যখন খেলি তখন খেলাটাই হয় বড়ো, যার সঙ্গে খেলি তাকে নজর করি নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী—৪র্থ দৃশ্য

.....জন্তুদেরও যথেচ্ছ খেলার অবকাশ আছে, কিন্তু জীবনে তাদের খেলাটা গৌণ। তাছাড়া তাদের খেলাও প্রকৃতির অনুগত।.......কিন্তু, মানুষের যে কাজটাকে লীলা বলা যায় অর্থাৎ যা তার কোনো দরকারের আমলে আসে না, কথায় কথায় সেইটেই হয়ে ওঠে মুখ্য, ছাড়িয়ে যায় তার প্রাণ-যাত্রাকে। সেইটের দ্বারাই তার শ্রেষ্ঠতার পরিচয়। অবকাশের ভূমিকায় মানুষ সর্বত্রই আপন অমরাবতী-রচনায় ব্যস্ত, সেখানে তার আকাশ-কুসুমের কুঞ্জবন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানুষের ধর্ম

খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজনসাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেইজন্যে খেলার মধ্যে জীবনযাত্রার নকল এসে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্যের পথে—তথ্য ও সত্য

ভাঁটা-পড়া বেলায়,
ঘাসের উপরে ছড়িয়ে-পড়া বিকেলের আলোতে
গাছেদের নিস্তব্ধ খুশি,
মজ্জার মধ্যে লুকোনো খুশি
পাতায় পাতায় ছড়ানো খুশি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাণের রস (শ্যামলী)

নূতন করিয়া ভাঙা আর গড়া পুরানো হাটের মেলা
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী নিত্য নাটের খেলা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ (হাট)

খেঁকি

খেঁকি কুকুর বলিয়া একটি বিশেষ জাত আছে.......কিন্তু সিংহের জাতে খেঁকি সিংহ কখনও শুনা যায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সার লেপেল গ্রিফিন (সমূহ-পরিশিষ্ট)

খেয়া

ফুলের বার নাইকো আর ফসল যার ফললো না—
চোখের জল ফেলতে হাসি পায়—
দিনের আলো যার ফুরাল, সাঁঝের আলো জ্বলল না,

সেই বসেছে ঘাটের কিনারায়।
ওরে আয়
আমায় নিয়ে যাবি কে রে
বেলাশেষের শেষ খেয়ায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ খেয়া (খেয়া)

অরণ্যে শিরীষশাখে অকস্মাৎ উঠিল উচ্ছ্বসি
বসন্তের হাওয়ার খেয়াল। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ বিরহ (মহুয়া)

খোকা

"খোকা যাবে বেড়ু করতে তেলিমাগীদের পাড়া" এস্থলে 'বেড়ু করতে' না বলিয়া "বেড়াইতে" বলিলেই প্রচলিত ভাষার গৌরব রক্ষা করা হইত কিন্তু তাহাতে খোকাবাবুর বেড়ানোর গৌরব হ্রাস হইত। পৃথিবীসুদ্ধ লোক বেড়াইয়া থাকে, কিন্তু খোকাবাবু 'বেড়ু' করেন। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ ছেলেভুলানো ছড়া—১

বাহির হতে তুমি তারে
যেমনি কর দুষী
যত তোমার খুশি,
সে বিচারে আমার কী বা হয়।
খোকা বলেই ভালোবাসি,
ভালো বলেই নয়॥ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ বিচার (শিশু)

খোঁজ

বাংলা দেশে পিলে যকৃত অম্লশূল এবং কনের জন্য তো কাউকে খোঁজ করতে হয় না, তারা আপনি এসে চেপে ধরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ত্রীর পত্র (গল্পগুচ্ছ)

খোঁপা

কানড় খোঁপায় কনক চাঁপা।

মুকুন্দরাম ঃ চণ্ডীমঙ্গল

খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মারতে চায়, মাথাটা ঠিক আছে তো?

ঘরে বাইরে ঃ বিমলার আত্মকথা

খ্যাঁক-শেয়ালি

স্বভাবটা যার বদ্ খেয়ালি,
খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে মিছে,
সব-তাতে দাঁত খিঁচে,
তারে নাম দিব খ্যাঁকশেয়ালি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নামকরণ (প্রহাসিনী-সংযোজন)

খ্যাত

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক
আমি তোমাদের লোক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ

খ্যাতি

খ্যাতি—অপরিচিত লোক যখন চিনি বলে সেই অবস্থা।

প্রমথনাথ বিশী ঃ কমলাকান্তের জল্পনা

যে খ্যাতির সম্বল অল্প তার সমারোহ যতই বেশি হয়, ততই তার দেউলে হওয়া দ্রুত ঘটে।......আতশবাজির অভ্রবিদারক আলোকটাই তার নির্বাণের উজ্জ্বল তর্জনী সংকেত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রচনাবলী (বিশ্বভারতী)-১ ঃ অবতরণিকা

খেলনা

আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িব না ধরণীতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নির্ভয় (মহুয়া)

গঙ্গা

ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাস—সেই তো ভগবদ্ সঙ্গীত। গঙ্গাতীরে বাস—এই তো স্বর্গবাস। গঙ্গার জলে স্নান, গঙ্গাকে অবলোকন, গঙ্গার নাম স্মরণ, গঙ্গার মাহাত্ম্য সংলাপন—অমৃতময় এ জীবন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ গঙ্গাবতরণ

গঙ্গা ত্রিলোকপাবনী, ত্রিপথগা। দ্যুলোকে তাঁর নাম সুরধুনী—মন্দাকিনী, ভূলোকে তিনি অলকনন্দা—ভাগীরথী, আর পাতালে তিনি ভোগবতী।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ঃ দশহরা, দশধারা

পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে
শ্যামবিটপিঘন-তট-বিপ্লবিনী,
ধূসর-তরঙ্গ-ভঙ্গে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ গঙ্গা

চির-ক্রন্দনময়ী গঙ্গে!
কুলু কুলু কল কল প্রবাহিত আঁখি-জল
দেব-মানবের একসঙ্গে!
বিশ্বের ক্রন্দন-বিচলিত নারায়ণ,
আঁখি তার অশ্রুতে ভরিল,—
গোলোকে হল না ঠাঁই, শিবজটা বহি তাই
শতধারা ধরণীতে ঝরিল।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ গঙ্গাস্তোত্র

গঙ্গার জলে ময়লা এসে মিশলে গঙ্গা কি নোংরা হয়?

প্রবোধকুমার সান্যাল ঃ মহাপ্রস্থানের পথে

কলকাতার ধারে গঙ্গা....ক্লিষ্ট কলুষিত শৃঙ্খল জর্জর। ......গঙ্গাকে কলকাতা কিংকরী করেছে, সখী করে নি, তাই অবমানিত নদী হারিয়েছে তার রূপলাবণ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পারস্যে ৬

গঙ্গানদী ভারতের একটি বৃহৎ পরিচয়কে বহন করে। ভারতের বহু দেশ বহু কাল ও বহু চিত্তের ঐক্যধারা তার স্রোতের মধ্যে বহমান। এই নদীর মধ্যে ভারতের পরিচয়-বাণী আছে। হিমাদ্রির স্কন্ধ থেকে পূর্বসমুদ্র পর্যন্ত লম্বমান এই গঙ্গানদী। সে যেন ভারতের যজ্ঞোপবীতের মতো, ভারতের বহুকাল জ্ঞান ধর্ম তপস্যার স্মৃতিযোগসূত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৃহত্তর ভারত

সূর্যাস্তের নিস্তরঙ্গ গঙ্গায় নৌকা ভাসাইয়া দিয়া গঙ্গার পশ্চিম পারের শোভা যে দেখে নাই সে বাংলার সৌন্দর্য দেখে নাই বলিলেও হয়। এই পবিত্র শান্তিপূর্ণ অনুপম সৌন্দর্যচ্ছবির বর্ণনা সম্ভবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সরোজিনী প্রয়াণ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা
তার দুই চোখে দুই জলের ধারা
মেঘনা যমুনা।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : গঙ্গা আমার মা পদ্মা আমার মা

গঙ্গা—যিনি (ব্রহ্মলোক হইতে) পৃথিবীতে গমন করিয়াছেন, ইহাই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ।

সুবলচন্দ্র মিত্র : সরল বাঙ্গালা অভিধান

গণতন্ত্র

জনগণকে ভোলাবার পক্ষে গণতন্ত্র অতি উত্তম উপায় ; কিন্তু যদি তারা সত্যই মনে করে, তারাই শাসন-ব্যবস্থার কর্তা, তখনই দুর্দিন।.....মূঢ় জনতা নিজের ভালমন্দ বোঝে না ; অন্য একজনকে তাদের হয়ে সে কাজ করতে হয়—একেই বলে গণতন্ত্র।

প্রমথনাথ বিশী : মৌচাকে ঢিল

আজব গণতন্ত্র রে ভাই আজব গণতন্ত্র
গণের জোরেই গণকে ঠকায় গণদ্বেষী মন্ত্র॥...
চোর ডাকাতও মুক্তি পেলো, মুক্তি পেলো খুনে
বন্দী করে রাখলো শুধু ওদের গুণে গুণে॥
কারণ ওরা ধৈর্যহারা তরুণ দেশব্রতী,
ছাড়লে ওদের শাসক শোষক স্বৈরাচারীর ক্ষতি॥

বিমলচন্দ্র ঘোষ : বন্দী করে রাখলো শুধু ওদের

গণতন্ত্রে এটাই মজা।
আজ যে প্রজা কাল সে রাজা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : দেয়ালের লিখন

গণনাট্য

গণনাট্য কথাটা অনেকের কাছে বড়ই বিপজ্জনক, কারণ তার মধ্যে মিশে আছে বহু বছরের একটা দাবি—নাটক মানে সংগ্রাম, নাটক সংগ্রামের হাতিয়ার।

উৎপল দত্ত : ক্যাবারে নাট্য

গণনাট্য সঙ্ঘ যে নাটক করে সেগুলো গণনাটক, মানুষের নাটক। সে নাটকে পয়সা রোজগারের কোন ফিকির বা ফন্দী থাকে না। বাস্তব ঘটনা, সংগ্রামী কাহিনী, এসব নিয়েই এ নাটকগুলো করা হয়।

জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় : নাট্যজিজ্ঞাসা - কিছু ভাবনা

গণনাট্য আন্দোলন নাট্যজগতের সংকীর্ণ গণ্ডি ভেঙে দিয়ে নাটকের ব্যাপ্তি ঘটায় এবং তাকে শ্রমজীবী মানুষের জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে যথার্থ জাতীয় চরিত্র দেয়। গ্রামের চাষী আসে নাটকের চরিত্র হয়ে, আসে কারখানার শ্রমিক, আসে খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ।.....গণনাট্য সংঘের যাঁরা উদ্যোক্তা ছিলেন তাঁদের প্রত্যয় ছিল সর্বহারার মানবতাবাদে।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা

গণনাট্য তখনই সম্ভব হইবে যখন গণেরা নাট্যের অনুষ্ঠান করিবে।

বিজন ভট্টাচার্য : পাক্ষিক অভিনয় (১.৮.১৯৭২)

মানুষের কল্যাণে রুটির লড়াই-এর সঙ্গে প্রাণের লড়াইকে একসূত্রে বেঁধে নাট্য আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই গণনাট্যের মর্মকথা।

বিজন ভট্টাচার্য : শারদীয় কালান্তর ১৩৭৪

গণিত

ভোলানাথ লিখেছিল,
তিন চারে নব্বই
গণিতের মার্কায়
কাটা গেল সর্বই।
তিন-চারে বারো হয়
মাষ্টার তারে কয় ;
‘লিখেছিনু ঢের বেশি’
এই তার গর্বই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খাপছাড়া

উচ্চ অঙ্গের গণিতের মধ্যে যে-একটি গভীর সৌষম্য, যে একটি ঐক্যরূপ আছে, নিঃসন্দেহে গাণিতিক তার মধ্যে আপনাকে নিমগ্ন করে। তার সামঞ্জস্যের তথ্যটি শুধু জ্ঞানের নয়, তা নিবিড় অনুভূতির ; তাতে বিশুদ্ধ আনন্দ। কারণ, জ্ঞানের যে উচ্চশিখরে তার প্রকাশ সেখানে সে সর্বপ্রকার প্রয়োজননিরপেক্ষ, সেখানে জ্ঞানের মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্যতত্ত্ব

গণেশ

গণেশের হাতির মুণ্ডে মানুষের সিদ্ধির মূর্তি। এই সিদ্ধির দুই দিকে দুই জন্তুর চেহারা, একদিকে রহস্যসন্ধানকারী সূক্ষ্ম ঘ্রাণ তীক্ষ্ণদৃষ্টি খরদন্ত চঞ্চল কৌতূহল, সেটা ইঁদুর, সেইটেই বাহন ; আর একদিকে বন্ধনে-বশীভূত বন্যশক্তি, যা দুর্গমের উপর দিয়ে বাধা ডিঙিয়ে চলে, সেই হল যান ;—সিদ্ধির যানবাহন-যোগে মানুষ কেবলই এগিয়ে চলেছে। তার ল্যাবরেটরিতে....ইঁদুর আর তার য়েরোপ্লেনের মোটরে আছে হাতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রী। জাভা-যাত্রীর পত্র-৩

গদি

জগৎটা কারুর একার মামার বাড়ি নয়। গদি যার জগৎ তার। সোর্ড ইজ মাইটিয়ার দ্যান পেন। কাজের চেয়ে প্রতিশ্রুতি বড়।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ঃ কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

গদ্য

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, গদ্য হচ্ছে লেখক-প্রতিভা বিচারের নিকষ পাথর—‘গদ্য কবীনাং নিকষং বদন্তি’। লেখকের প্রতিভা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তার বিচারের নিকষ পাথর হচ্ছে গদ্য। অর্থাৎ গদ্য হল যুক্তির ভাষা, তথ্য প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠার ভাষা। চিন্তামূলক রচনার প্রধান বাহন হচ্ছে গদ্য। অপরদিকে ছন্দের ধ্বনিতরঙ্গ ও কল্পনার অনুষঙ্গে কবিতা রসসংবাদী হয়ে ওঠে।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভূমিকা (বিষয় ঃ প্রবন্ধ)

বাংলা সাহিত্যে ‘আধুনিকতা’র ভিত্তি স্থাপিত হতে পেরেছিল গদ্য ভাষার লিখ্য রূপ প্রবর্তনের ফলে। যা কিছু লেখায় ধরা আছে, তাই লিখিত। কিন্তু লিখ্য গদ্য বলতে স্বতন্ত্র এক ভাষাচরিত্রকেই বুঝি—যেটা মৌখিক ভাষার থেকে আলাদা। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি তাই নাম দিতে চেয়েছিলেন ‘লৈখিক’ গদ্য। সেই রূপাধারেই সাহিত্যের জগতে গদ্য ভাষার অনুপ্রবেশের ছাড়পত্র।.....‘লিখ্য’ ভাষা যাকে বলি, সে কাগজ-কলমের সহায়তায় সর্বদেশকালের চেনা-অচেনা সকল মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে চায়। সর্বজনবোধ্য নয় কেবল, সর্বজনবেদ্যও হতে গিয়ে সে ভাষা গঠনের পরিপাটি

শৃঙ্খলা দাবি করে, কেবল প্রাঞ্জলতার জন্যেই নয়, চিত্তাকর্ষকতার জন্যেও। অপরিচিত—অজ্ঞাত জনকেও আপন ভাবনার জগতে টানতে গেলে কথাকে আকর্ষণীয় হতেই হয়।

ভূদেব চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য়)

পদ্য হল সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে!
গদ্য এল অনেক পরে।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
সুশ্রী কুশ্রী ভালো মন্দ তার আঙ্গিনায় এল
ঠেলাঠেলি করে।
....আকাশে উঠে পড়ল, গদ্যবাণীর মহাদেশ।
কখনো ছাড়লে অগ্নিনিশ্বাস,
কখনো ঝরালে জলপ্রপাত।
কোথাও তার সমতল, কোথাও অসমতল ;
কোথাও দুর্গম অরণ্য, কোথাও মরুভূমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নাটক (পুনশ্চ)

গদ্যকাব্য

গদ্য বলতে বুঝি যে-ভাষা আলাপ করবার ভাষা ; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে ভাষা তাই পদ্য। আর রসাত্মক বাক্যকেই আলংকারিক পণ্ডিত কাব্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। এই রসাত্মক বাক্য পদ্যে বললে সেটা হবে পদ্যকাব্য আর গদ্যে বললে হবে গদ্যকাব্য। গদ্যেও অকাব্য ও কুকাব্য হতে পারে, পদ্যেও তথৈবচ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছন্দ—চিঠিপত্র

এমন মেয়ে দেখা যায় যার সহজ চলনের মধ্যেই বিনা ছন্দের ছন্দ আছে।.....সে মেয়ের চলনটাই কাব্য, তাতে নাচের তাল নাই বা লাগল, তার সঙ্গে মৃদঙ্গের বোল দিতে গেলে বিপত্তি ঘটবে।......গদ্যকাব্যেরও এই দশা। সে নাচে না, সে চলে।.....সেই গতিভঙ্গি আবাঁধা। ভিড়ের ছোঁয়া বাঁচিয়ে পোষাকী শাড়ির প্রান্ত তুলে-ধরা, আধা ঘোমটা-টানা সাবধান চাল তার নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছন্দ—চিঠিপত্র

এ কথা বলা বাহুল্য যে, গদ্যকাব্যেও একটা আবাঁধা ছন্দ আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছন্দ—চিঠিপত্র

গদ্যকাব্যে অতিনিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাঙাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশরীতিতে যে একটি সসজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠনপ্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে। অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেক দূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব এই আমার বিশ্বাস....।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পুনশ্চ—ভূমিকা

গদ্য ও পদ্য

সংসারে যে অনেক অভাব, অনেক জোড়াতালি!—
তার তরে, ভাই বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি,

কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে,
তখন, ওহো—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

মোহিতলাল মজুমদার : গদ্য ও পদ্য

গদ্যে প্রধানত অর্থবান্ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান্ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। ব্যূহ শব্দটা এখানে অসার্থক নয়। ভিড় জমে রাস্তায়, তার মধ্যে সাজাইবাছাই নেই, কেবল এলোমেলো চলাফেরা। সৈন্যের ব্যূহ সংহত সংযত, সাজাইবাছাইয়ের দ্বারা সবগুলি মানুষের যে সম্মিলন ঘটে তার থেকে একটা প্রবল শক্তি উদ্ভাবিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছন্দ—গদ্যছন্দ

মানুষের সামাজিক বিকাশের জন্মাবধি গদ্য ছিল আটপৌরে প্রয়োজন সাধনের ভাষা, পদ্য এসেছিল তার পেছনে পেছনে মনের কথা প্রকাশ করতে। পদ্যের চাহিদা ছিল হৃদয়ের 'অনির্বচনীয়' ভাবাবেগকে প্রকাশ করা, ব্যবহারিক গদ্যে তা সম্ভব নয় ভেবেই ছন্দে-অলংকারে ছিল তার বিশেষিত সজ্জা। আধুনিক মনোবৃত্তির প্রবণতা আবেগের চেয়েও বেশি বিচার-চিন্তার দিকেই, ইমোশন-এর চেয়ে 'রিজনিং'-এর দিকে। পদ্যের সাজানো রূপাধারে তা প্রাঞ্জল হতে পায় না ; কিংবা প্রাঞ্জলতার দাবির চাপে তার সাজসজ্জা শিথিল হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'চৈতন্যচরিতামৃত' কাব্যে পদ্য পয়ার যেমন গেছে গদ্যায়ত হয়ে। অতএব ব্যবহারের সীমার বাইরে গদ্যের ওপরে নতুন দাবি এল বোঝার কথাকে গুছিয়ে বলার ; তাতেই তার মাত্রা বদল।

ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য়)

গন্ধ

কুঁড়ির ভিতরে কাঁদিছে গন্ধ অন্ধ হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ—৯

চুলের গন্ধে ফুলের গন্ধে মিলে
পিছে পিছে তব বাতাসে চিহ্ন দিলে
বাসনার রেখা টানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বীথিকা—কৈশোরিকা

কুন্তলফুলগন্ধ আসে অন্তর মন্দিরে
উন্মদ সমীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান—"সে আসে ধীরে"

আকাশ থেকে মাছি কেমন করে ঘায়ের খবর পায়, সর্বনাশের একটু গন্ধ পেলেই কোথা থেকে সব কুমন্ত্রী এসে জোটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গৃহপ্রবেশ—১ম অঙ্ক

তরুণ রৌদ্রে তপ্ত মাটির মৃদুশ্বাসে
তুল্‌সিঝোপের গন্ধটুকু ঢুকছে ঘরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছুটির লেখা (বীথিকা)

শিশুর নবনীত কোমল দেহের যে স্নেহোদ্‌বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্প চন্দন গোলাপজল আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত এক শ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লোকসাহিত্য। ছেলেভুলানো ছড়া-২, ভূমিকা

নাগকেশরের গন্ধ সে-যে কোন্ বেণীবন্ধে বাঁধা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নীলমণিলতা : (বনবাণী)

বৃষ্টিভেজা যে ফুলহার
শ্রাবণসাঁঝে তব প্রিয়ার
বেণীটি ছিল ঘেরি,
গন্ধ তারি স্বপ্নসম
লাগিছে মনে, যেন সে মম
বিগত জনমেরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পাঠিকা (বীথিকা)

....তোমার সুগন্ধ কেশপাশ
নন্দনের আনিত নিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পোড়ো বাড়ি (বীথিকা)

ছেড়েফেলা শাড়িগুলো
নানা দিনের নিমন্ত্রণের
ফিকে গন্ধ ছড়িয়ে দিল ঘরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাসাবদল (সানাই)

তোমার চুলের ফুলের গন্ধে
জাগে নির্জন রাতের দীর্ঘশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মায়া (সানাই)

গন্ধ ভারি হয়ে জমে উঠেছে, গন্ধের কুয়াশা যেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মালঞ্চ—৫

ডিনার-টেবিলে
খাবার গন্ধ, মদের গন্ধ, অঙ্গরাগের সুগন্ধ যায় মিলে—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রা (আকাশ প্রদীপ)

শিউলি ফুলের গন্ধটি....কচি গায়ের গন্ধের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শরৎ—পরিচয়

নিমফুলের গন্ধ অন্ধকার ঘরে নিয়ে এল অনির্বচনীয়ের আমন্ত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শাপমোচন

স্যাওলাধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা পাতার সুগন্ধঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বসল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৬

আষাঢ়ের ভরসন্ধ্যায় চামেলি ফুলের গন্ধ......।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সতেরো বছর—লিপিকা

গরম হাওয়ায় ঝাপসা গন্ধ আসছে আমের বোলের, খবর আসছে মহানিমের মঞ্জরীতে মৌমাছির বসেছে মেলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্মৃতি (পুনশ্চ)

গভীর

আমার প্রাণে গভীর গোপন মহা-আপন সে কি,
অন্ধকারে হঠাৎ তারে দেখি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

গভীরে নামো যেখানে শান্তি, যেখানে স্তব্ধতা, যেখানে জীবনমরণের সম্মিলন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্রাবণগাথা

গম্ভীর

নীল-অঞ্জন ঘন পুঞ্জছায়ায় সমবৃত অম্বর হে গম্ভীর!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান

অত্যন্ত গম্ভীর মুখ।........মিটিয়রলজিষ্ট......মুখ দেখলে ঝড়ের সিগনাল দিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চোরাই ধন—২ গল্পগুচ্ছ

গরবী

যবে রানীর মতন বসিব রতন-আসনে,
যবে বাঁধিব তোমারে নিবিড় প্রণয়শাসনে,
যবে দেবীর মতন পুরাব তোমার বাসনা,
ওগো তখন হে নাথ, গরবীরে কোরো মার্জনা
কোরো মার্জনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কল্পনা—মার্জনা

গরীব

গরীব আমরা, রূপ আমাদের মানায় না। আমাদের জীবনও বেমানান।

আবুল বাশার : ডানামেলা বৃশ্চিক

গরিবদের ভোটটা নিয়ে কুনো রকমে একবারে গদিতে বসতে পারলে হয়—গরিবকে তখন কলা দ্যাখাবো! যারা গদিতে বসে তারা সবাই বড়লোক—নামে মোদের বন্ধু! দু-বচ্ছর 'মন্ত্রী' থাকলে টাকার পাহাড় জমাবে আর মোদের বংশধররা পিঁপড়ের সারির মতন খাবি খাবে বেকার হয়ে। মাঝে মাঝে দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে যদি এরা কিছু কমে তো কমবে ; ভারতের 'হেঁদু-মোছলমান' লড়ালড়ি শিখবে, শিবের গাজন শালা গরিবরাই ধ্বংস হবে। গরিব হল শালা ভগমানের চোখের জল! গরিব ই-একটা জাত—শালা কুকুরের ল্যাজ—যতই ঘি দিয়ে টানো সিধে করা যাবে না।

আবদুল জব্বার : বদলিওয়ালা (বাংলার চালচিত্র)

বড়লোক ও ধনীদের কাছে আমি ধর্মপ্রচার করতে চাই না। আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না না,—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালোবাসি।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—৫

ওদের জন্যে পৃথিবীতে টেঁকাই হল দায়—
এই গরীবগুলোর জন্যে ;
দিন রাত্তির পথে ঘাটে ভয়ঙ্কর জ্বালায়—
যেন, হয়ে উঠেচে হন্যে।.....
তেল মাখে না, সোপ মাখে না, মাথায় ওড়ে খুসকী,
বোটকা গায়ে গন্ধ ;
গয়নাতে যে নারীর বাহার আছে সে সব হুঁস কি?
পেটটা নিয়েই অন্ধ।

সতীশচন্দ্র ঘটক : গরীবদের অত্যাচার

গরু (দ্র. গোরু)

গরু তো আমি।...........দশটা পাঁচটার অফিস-পাড়ার গরু। শান্ত স্বভাব ; শিং টিং নেই।

বিজন ভট্টাচার্য : ছায়াপথ

গর্দভ (দ্র. গাধা)

হে গর্দভ! .....তুমিই গায়ক। ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার প্রভৃতি সপ্ত সুরই তোমার কণ্ঠে। অন্যে বহুকাল তোমার অনুকরণ করিয়া, দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখিয়া, অনেক প্রকার কাশি অভ্যাস করিয়া, তোমার মত স্বর পাইয়া থাকে। হে ভৈরবকণ্ঠ! ঘাস খাও।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : গর্দভ (লোকরহস্য)

হে গর্দভ! .....বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই এজন্য তুমি শান্ত, বেগ দেন নেই এজন্য তুমি সুধীর, বুদ্ধি দেন নাই এজন্য তুমি বিদ্বান ; এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : গর্দভ (লোকরহস্য)

গর্ব

গর্ব আমার নাই রহিল প্রভু,
চোখের জল তো কাড়বে না কেউ প্রভু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—৬৪

সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—১৩

যদি মিথ্যা গর্ব করিতে হয় তবে 'আমার সাহস আছে' এই মিথ্যা গর্বই সবচেয়ে মার্জনীয়।.....ভয় নাই বলিয়া যে লোক মিথ্যা অহংকারও করে, অন্ততঃ তাহার লজ্জা আছে, এ সদ্‌গুণটারও প্রমাণ হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মা ভৈঃ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

গলা

গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না ; যদি শব্দমন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার গলায় পঞ্চম লাগে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বসন্তের কোকিল (কমলাকান্ত)

...এর গলার সুরে যে একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে?.....এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে—নিকোটিনের ঝাঁজ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তোমাকে গলা সাধতে হবে লোকালয় থেকে দূরে ব'সে। তারপর বুঝে নেবেন চিত্রগুপ্ত, যদি সইতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—১

বাস্‌রে কী গলা। মনে হল মহাদেবের মহাবৃষভটার ঘাড়ে এসে পড়েছে মহাদেবীর মহাসিংহটা—অতিলৌকিক সিংহনাদে আর বৃষগর্জনে মিলে দ্যুলোকের নীলমণিমণ্ডিত ভিতটাতে দিলে ফাটল ধরিয়ে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :** সে—১২

গলি

আমাদের এই শানবাঁধানো গলি, ...উপরের দিকে যেটুকু নজর চলে তাতে সে আকাশের রেখা দেখতে পায়—ঠিক তার নিজেরই মতো সরু, তার নিজেরই মতো বাঁকা। সেই ছাঁটা আকাশটাকে জিজ্ঞাসা করে, "বলো তো দিদি, তুমি কোন্ নীল শহরের গলি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গলি-লিপিকা

অজগরের ভূতের মতন গলির পরে গলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাসাবাড়ি—ছড়ার ছবি

গল্প

শুধু শিশু বয়সের নয়, সকল বয়সেই মানুষ হল গল্পপোষ্য জীব।....পশুপাখির জীবন হল আহার নিদ্রা সন্তানপালন ; মানুষের জীবন হল গল্প। কত বেদনা, কত ঘটনা, সুখদুঃখ, রাগবিরাগ, ভালোমন্দের কত ঘাতপ্রতিঘাত। ইচ্ছার সঙ্গে ইচ্ছার, একের সঙ্গে দশের, সাধনার সঙ্গে স্বভাবের, কামনার সঙ্গে ঘটনার সংঘাতে কত আবর্তন। নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হতেই প্রশ্ন এই,—"কী হল হে, কী খবর, তার পরে"। এই 'তার পরে'র সঙ্গে 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবী মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে। তাকেই বলি জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গল্প (লিপিকা)

বড়ো গল্প....মাল-বোঝাইওয়ালা।.....ছোটো গল্প....বোঝা বইবার জন্যে....নয়, একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।....ছোট গল্পের আদি ও অন্তের মাঝখানে বিশেষ একটা ছেদ থাকে না—ওর আকৃতিটা গোল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তিনসঙ্গী—পরিশিষ্ট—ছোটগল্প

একালে গল্পের কৌতুহলটা হয়ে উঠেছে মনোবিকলনমূলক। ঘটনাগ্রন্থন হয়ে পড়েছে গৌণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৌকাডুবি—সূচনা

গল্প করতে গিয়ে মাষ্টারি কর না,—এই তোমার বাহাদুরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক—৪২

গল্প ফুরোয় না, গল্প-বলিয়ের দিন ফুরোয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—৯

বুদ্ধির মাত্রাটা একটু কমাতে যদি না পার তাহলে গল্প বলা ছেড়ে দাও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—৩

গল্প হচ্ছে মনের ম্যাসাজ, চিত্তের ডলাইমলাই, পড়লে মেজাজ চাঙ্গা হয়।

রাজশেখর বসু (পরশুরাম) : জটাধরের বিপদ

গহনা

স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে, সে না দেখাইয়া বাঁচে না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কপালকুণ্ডলা

গা

গা খাটিয়ে মরতে হবে, গায়ে প'ড়ে নিতে হবে নানা দায়। কখনো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াবে, কখনো গালমন্দ গা পেতে নেবে, কখনো নেবে না, কখনো কাজে গা লাগবে, কখনো লাগবে না।....গা থাকা সত্ত্বেও কুঁড়েমি দেখে লোকে বলবে, কিছুতে ওর গা নেই। কখনো গা ঘুরবে, কখনো গা কেমন করবে, গা ঘুলিয়ে যাবে। কখনো গা ভার হবে, কখনো গা মাটি-মাটি করবে, গা ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করবে, গা সির্‌সির্‌ করবে, গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করতে থাকবে। সংসারটা কখনো হবে গা-সওয়া, কখনো হবে উল্টো। কারো কথায় গা জ্ব'লে যাবে, কারো কথায় গা যাবে জুড়িয়ে। বন্ধুবান্ধবদের কথা শুনে গায়ে জ্বর আসবে। এত মুস্কিল একখানা গা নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—২

গাইয়ে

পায়ে পড়ি শোনো ভাই গাইয়ে,
মোদের পাড়ার থোড়া দূর দিয়ে যাইয়ে॥
হেথা সা রে গা মা-গুলি সদাই করে চুলোচুলি,
কড়ি কোমল কোথা গেছে তলাইয়ে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

গাছ

গাছের ছায়ায় একটা মায়া আছে। একটুতেই তার সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমৃত্যু দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে সেই ছায়ায়।

অমরেন্দ্র নাথ সান্যাল : সুধাকে আমি দেখিনি

গাছই তো সভ্যতার প্রথম কবিতা।

কমল মুখোপাধ্যায় : মুক্ত কবিতা (কালো অশ্বারোহী ও নীল তারা)

আমরা যখন শ্বাস-প্রশ্বাস করি তখন প্রশ্বাসের সঙ্গে এক প্রকার বিষাক্ত বায়ু বাহির হইয়া যায় ; তাহাকে অঙ্গারক বায়ু বলে। ইহা যদি পৃথিবীতে জন্মিতে থাকে তবে সকল জীবজন্তু অল্পদিনের মধ্যে এই বিষাক্ত বায়ু গ্রহণ করিয়া মরিয়া যাইতে পারে।....যাহা জীবজন্তুর পক্ষে বিষ, গাছ তাহাই আহার করিয়া বাতাস পরিষ্কার করিয়া দেয়। গাছের পাতার উপর যখন সূর্যের আলোক পড়ে তখন পাতাগুলি সূর্যের তেজের সাহায্যে অঙ্গারক বায়ু হইতে অঙ্গার বাহির করিয়া লয়।

জগদীশচন্দ্র বসু : উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু (অব্যক্ত)

গাছগুলি....ইহাদের একটা জীবন আছে....ইহাদের মধ্যেও আমাদের মত অভাব দুঃখ কষ্ট দেখিতে পাই। জীবন ধারণ করিবার জন্য ইহাদিগকেও সর্বদা ব্যস্ত থাকিতে হয়। কষ্টে পড়িয়া ইহাদের মধ্যেও কেহ কেহ চুরি ডাকাতি করে। মানুষের মধ্যে যেরূপ সদগুণ আছে, ইহাদের মধ্যেও তাহার কিছু কিছু দেখা যায়। বৃক্ষদের মধ্যে একে অন্যকে সাহায্য করিতে দেখা যায় ইহাদের মধ্যে একের সহিত অপরের বন্ধুত্ব হয়। তারপর মানুষের সর্বোচ গুণ স্বার্থত্যাগ— গাছে তাহাও দেখা যায়। মা নিজের জীবন দিয়া সন্তানের জীবন দানে। উদ্ভিদেও সচরাচর তাই দেখা যায়। গাছের জীবন মানুষের জীবনের ছায়া মাত্র।

জগদীশচন্দ্র বসু : গাছের কথা

সত্যিই একটা গাছের ধ্যান যদি করা যেত!....
একটা গাছকে যদি ঠিক ঠিক নিজের ভেতর ভাবা যায়। কত দিক থেকে দেখা যায়। কত ভাবে ভেঙে দেওয়া যায়। কত আকার আবার সবটা মিলে একটাই গাছ। সে কখনও সূর্যাস্তের একটা গাছ। কখনও একটা গাছের ভোরবেলা। কখনও বা রাত্রি বৃক্ষ। কত রকম রূপ।

জয় গোস্বামী : সাঁঝবাতির রূপকথারা

শিশু হতে শিশুতর
গাছগুলি বোবা প্রাণে ভর-ভূর ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মহুয়া—নাম্নী-করুণী

—সেদিন পশু নেই, পাখি নেই, জীবনের কলরব নেই, চারদিকে পাথর আর পাঁক আর জল।....সমস্ত জীবের অগ্রগামী গাছ, সূর্যের দিকে জোড় হাত তুলে বলেছে, 'আমি থাকব, আমি বাঁচব, আমি চিরপথিক, মৃত্যুর পর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে অন্তহীন প্রাণের বিকাশতীর্থে যাত্রা করব রৌদ্রে-বাদলে, দিনে-রাত্রে।' গাছের সেই রব আজও

উঠছে বনে বনে, পর্বতে প্রান্তরে, তাদেরই শাখায় পত্রে ধরণীর প্রাণ বলে উঠছে— 'আমি থাকব, আমি থাকব।' বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে ; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য সঞ্চয় করে ; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাই (গল্পগুচ্ছ)

ওই গাছগুলো বিশ্ববাউলের একতারা, ওদের মজ্জায় মজ্জায় সরল সুরের কাঁপন, ওদের ডালে ডালে পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন। যদি নিস্তব্ধ হয়ে প্রাণ দিয়ে শুনি তাহলে অন্তরের মধ্যে মুক্তির বাণী এসে লাগে। মুক্তি সেই বিরাট প্রাণসমুদ্রের কূলে, যে-সমুদ্রের উপরের তলায় সুন্দরের লীলা রঙে রঙে তরঙ্গিত, আর গভীরতলে 'শান্তম্ শিবম্ অদ্বৈতম্'। সেই সুন্দরের লীলায় লালসা নেই, আবেশ নেই, জড়তা নেই, কেবল পরমা শক্তির নিঃশেষ আনন্দের আন্দোলন....তারা ধরণীর ধ্যানমন্ত্রের ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভূমিকা—বনবাণী

সেদিন, সকালে
হাওয়ার তালে হাততালি দিলে গাছের পাতা।
আজ তাদের নাচ বনে বনে,
কাল তাদের ধুলোয় লুটিয়ে-পড়া—
তা নিয়ে নেই বিলাপ, নেই নালিশ।
বসন্ত-রাজদরবারের নকিব ওরা ;
এ বেলায় ওদের কাজ, জবাব মেলে ও বেলায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্যামলী (শ্যামলী)

গাছগুলো যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, ওদের মধ্যে যেন একটা না-জানা ভাব আছে। সেই ভাবনায় বর্ষায় মেঘের ছায়ায় নিবিড় হয়, শীতের সকালের রৌদ্রে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেই না-জানা ভাবনার ভাষায় কচি পাতায় ওদের ডালে বকুনি জাগে, গান ওঠে মঞ্জরীতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে

গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি সন্ধ্যায় সকালে—
প্রতি গাছে জল দিই, ফুল দেয় পরিবর্তে গাছ।
এই দেওয়া-নেওয়া চলে অনুচ্চারিত মৃদু প্রেমে,
গাছ ও মানুষে বোঝে এই প্রেম আর কেউ নয়।
গাছের ভিতরে গিয়ে বসি আমি সন্ধ্যায় সকালে॥

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ গাছ কথা বলে

মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। হতাশ করতে পারে। গাছ কিন্তু করে না। পরিচর্যা করলে সময়ে ফুলে ফলে ভরে উঠবেই। সন্তান বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সরে পড়তে পারে। সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে বিপথে যেতে পারে। গোলাপ পরিচর্যায় গোলাপই দেবে। কামিনী ভরে যাবে বর্ষার আগমনে। শীতের চন্দ্রমল্লিকা, ডালিয়া রোদ ঝলসানো বৈশাখে হলুদ সোঁদাল। আইনস্টাইন শেষ জীবনে হতাশাগ্রস্ত এক পত্রলেখককে উপদেশ দিয়েছিলেন—লাভ নেচার, বি-ফ্রেন্ড অ্যানিম্যালস। প্রকৃতিকে ভালোবাসলে সেন্ট পারসেন্ট রিটার্ন পাওয়া যায়। কোনও সন্দেহ নেই। আর জীবজগৎ থেকে মনের মত একটি কুকুর। সব নিঃসঙ্গতা ভরে যাবে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ঃ শশধর হাকসলি অ্যান্ড গুড

গাজন

গাজনের বাজনা বাজা!
কে মালিক কে সে রাজা?
কে দেয় সাজা, মুক্ত-স্বাধীন সত্য কে রে?

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (দেশাত্মবোধক—কারার ঐ লৌহকপাট)

গাজন বাংলা দেশের লৌকিক উৎসব।......বাংলা দেশে ইহা বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক দেবতার নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে, যেমন শিবের গাজন, ধর্মের গাজন, নীলের গাজন, আদ্যের গাজন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই উৎসবের লক্ষ্য সূর্য এবং তাহার পত্নী বলিয়া কল্পিত পৃথিবী। সূর্যের সঙ্গে পৃথিবীর বিবাহ দেওয়াই এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। চৈত্র মাস হইতে বর্ষার প্রারম্ভ পর্যন্ত সূর্য যখন প্রচণ্ড অগ্নিময় রূপ ধারণ করে তখন সূর্যের তেজ প্রশমন ও সুবৃষ্টি লাভের আশায় কৃষিজীবী সমাজ এই অনুষ্ঠানের উদ্ভাবন করিয়াছিল। গ্রাম্য শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসবের অনুষ্ঠান হয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ ভারতকোষ

গাধা (দ্র. গর্দভ)

ঘোড়ার পেট গাধার পিঠ
খালি থাকে কদাচিৎ।

বাংলা প্রবাদ

আমরা চিরকাল বেসুরো লোককে গাধার সহিত তুলনা করিয়া আসিতেছি, অথচ বলিতেছি গাধাই আমাদিগকে প্রথম সুর ধরাইয়া দিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ—পঞ্চভূত

গান (দ্র. সঙ্গীত)

কখন কী-ভাবে যে কোন গান জীবন আশ্চর্যভাবে মুখর করে তোলে। চারপাশে মনে হয় ব্যাপ্ত জীবন—আকাশ গভীর নীল—পৃথিবীর অদূরে তখন শুকতারাটি প্রবলভাবে জ্বলে ওঠে। দক্ষিণের হাওয়া বয়ে মনের মধ্যে কারা কেবল কথা কয়ে যায়। চারপাশে তখন এক অপার সৌন্দর্য খেলা করে বেড়াতে থাকে। এরই নাম বোধ হয় জীবনের সুষমা। কখনও অতর্কিতে আসে, কখনও আবার গভীর এক রহস্যলোকে সে হারিয়ে যায়।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ অরণ্য আসছে (বেলা শেষের গান)

আমার গানের মালা আমি করব কারে দান।
মালার ফুলে জড়িয়ে আছে করুণ অভিমান॥.....
বিরহে যার প্রেম-আরতি আঁধার লোকের অরুন্ধতী
নাম-না-জানা সেই তপতী তার তরে এই গান।
মালা করনু তারে দান॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (কাব্য-গীতি)

গান শুনে কাঁদবার ভাগ্য তো সহজে হয় না; নিজে না কাঁদলে তো পরে কাঁদে না। কিন্তু গান গাইতে গাইতে কাঁদতে পারে এমন গাইয়ে কোথায়?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নিশিপদ্ম

হাত যন্ত্র বাজায় না, বাজায় প্রাণ; গলা গান গায় না, গায় মন।

প্রমথ চৌধুরী ঃ বীণাবাই

যে কথা বলিতে চাহে প্রাণ
সে শুধু হইয়া উঠে গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ-সংযোজন—৩

দূর আকাশের ঘুম-পাড়ানি মৌমাছিদের মন-হারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৩৫

গানের সুরে আসনখানি পাতি পথের ধারে।
ওগো পথিক, তুমি এসে বসবে বারে বারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কেতকী

গানে গানে তব বন্ধন যাক টুটে
রুদ্ধবাণীর অন্ধকারে কাঁদন জেগে উঠে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

ঘরে আমার রাখতে যে হয় বহু লোকের মন—
অনেক বাঁশি, অনেক কাঁসি, অনেক আয়োজন।
বঁধুর কাছে আসার বেলায় গানটি শুধু নিলেম গলায়
তারি গলার মাল্য করে করব মূল্যবান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান—রাজপুরীতে বাজায় বাঁশি (গীতলেখা ৩)

গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি
তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান—গানের ভিতর দিয়ে (গীতবীথিকা)

তোমায় গান শোনাব তাই তো আমায় জাগিয়ে রাখ
ওগো ঘুম-ভাঙানিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান—(গীতমালিকা ১)

একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিত হবে দুইজনে
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে।
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গানভঙ্গ (কাহিনী)

যা কিছু মোর ছড়িয়ে আছে
জীবন-মরণে
গানের টানে মিলুক এসে
তোমার চরণে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ গীতাঞ্জলি (এবার নীরব করে) ৫৯

মন দিয়ে যার নাগাল নাহি পাই,
গান দিয়ে সেই চরণ ছুঁয়ে যাই। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ গীতাঞ্জলি (তুমি যখন গান) ৭৮

কথাকে সামান্য উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া সুর শুনানোই হিন্দী গানের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু বাংলায় সুরের সাহায্য লইয়া কথার ভাবে শ্রোতাদিগকে মুগ্ধ করাই কবির উদ্দেশ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছন্দ

সৃষ্টির গভীরতার মধ্যে যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পন চলছে, গান শুনে সেইটেরই বেদনাবেগ যেন আমরা চিত্তের মধ্যে অনুভব করি। ভৈরবী যেন সমস্ত সৃষ্টির অন্তরতম বিরহব্যাকুলতা, দেশমল্লার যেন অশ্রুগঙ্গোত্রীর কোন্ আদি নির্ঝরের কলকল্লোল। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ ছন্দ

বাক্য যেখানে শেষ হইয়াছে সেইখানে গানের আরম্ভ।...বাক্য যাহা বলিতে পারে না গান তাহাই বলে।...গুন্ গুন্ করিতে করিতে যখনই একটা লাইন লিখিলাম 'তোমার গোপন কথাটি সখী, রেখোনা মনে',—তখনই দেখিলাম, সুর যে-জায়গায় কথাটি উড়াইয়া লইয়া গেল, কথা আপনি সেখানে পায়ে হাঁটিয়া গিয়া পৌঁছিতে পারিত না। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি**

গান যে গায় গান তারই। গানটা আমার কি তোমার, এই অত্যন্ত বাজে প্রশ্ন যদি না ভুলিয়ে দিলে তাহলে সে-গান গানই নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তপতী

গানগুলি বেদনার খেলা যে আমার,
কিছুতে ফুরায় না সে আর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বেদনার লীলা (পূরবী)

আমার গান আমাকে ছাড়িয়ে যায়—সে এগিয়ে চলে।
আমি পিছনে চলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী—২য় দৃশ্য

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান,
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—২৮

গানগুলি মোর শৈবালেরই দল—
ওরা বন্যাধারায় পথ যে হারায়
উদ্দাম চঞ্চল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্ত

শ্রেষ্ঠ গান এমন পর্যাপ্তিতে এসে স্তব্ধ হয়, যার উপরে আর একটি মাত্র সুরও যোগ করা যায় না।....সেই থামাকে সীমা বলা যায় না। সে এমন একটি শেষ যার শেষ নেই। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ মানুষের ধর্ম

সংসারে ক্ষুদ্রকালটাই সত্য হয়ে দেখা দেয়....চিরকালটা থাকে আড়ালে; গানে চিরকালটাই আসে সামনে, ক্ষুদ্রকালটা যায় তুচ্ছ হয়ে, তাতেই মন মুক্তি পায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ—৫০

গান শুনে চোখে জল ভরে আসছে।.....আমার মনে হচ্ছে যা পাবার জিনিষ তাকে হাতে পাবার জো নেই ; তাকে হাতে পাবার দরকার নেই।....খোঁজার মধ্যেই সমস্ত পাওয়া যেন সুধাময় হয়ে আছে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ রাজা—৫

যবে কাজ করি
প্রভু দেয় মোরে মান।
যবে গান করি
ভালোবাসে ভগবান॥ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ লেখন

গানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

গানের তুল্য জিনিষ নাই, ফ্রেঞ্চ ফাউল কাটলেট ইহার কাছে তুচ্ছ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তা তা থৈ থৈ

অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গুণে গান আজ ব্যবসাদার, পুঁজিপতিদের হাতে গিয়ে পড়েছে। গান আজ আর আর্ট নয়, গান আজ মুনাফা শিকারের অস্ত্র। সঙ্গীত-শিল্পীরা আজ আর শিল্পী নন, আজ তাঁরা ব্যবসাদারের দালাল।....আজ ব্যবসাদাররা কাঁচামাল হিসেবে গায়ক সুরশিল্পী এদেরকে কিনে নিয়ে, 'তৈরিমাল' হিসেবে গানকে বাজারে ছাড়ছেন। যন্ত্র তার সহায়, গান আজ সিনেমার কুক্ষিগত। যে কোন বৃহৎ ইন্ডাস্ট্রীর মতো গানও একটা ইন্ডাস্ট্রী। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় এই পরিণতি অধবারিত।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় ঃ আধুনিক বাংলা গান [ট্র্যাজেডি পেরিয়ে]

আধুনিক বাংলা গান কখনও চলে সোহাগী নদীর মত, নেচে নেচে কাছে এসে, না হয় লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে দূরে পালিয়ে। আবার কখনও চলে ধীরে ধীরে উদাসমনে সমভূমে, দুপাশ সবুজে ভরিয়ে। গানের নদী চিরকালই বহতা থাকতে চায়। লক্ষ্য তার মহাকাল। **সমীরকুমার গুপ্ত ঃ** উড়ো মেঘ

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি,
খাসা তোর চেঁচানি!
শুনে শুনে আনমন
নাচে মোর প্রাণমন।
তোর গানে পেঁচি রে
সব ভুলে গেছি রে—
চাঁদ মুখে মিঠে গান
শুনে ঝরে দু'নয়ান। **সুকুমার রায় ঃ** প্যাঁচা আর প্যাঁচানি (আবোল তাবোল)

লাল গানে নীল সুর, হাসি-হাসি গন্ধ। **সুকুমার রায় ঃ** হ য ব র ল

গান্ধী

গান্ধী মহারাজের শিষ্য
কেউবা ধনী, কেউবা নিঃস্ব,
এক জায়গায় আছে মোদের মিল—
গরিব মেরে ভরাই নে পেট,
ধনীর কাছে হই নে তো হেঁট,
আতঙ্কে মুখ হয় না কভু নীল।......
চলল যারা গৃহছাড়ি
ঘুচল তাদের অপমানের শাপ—
চিরকালের হাতকড়ি যে,
ধুলায় খসে পড়ল নিজে,
লাগল ভালে গান্ধীরাজের ছাপ। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** গান্ধী মহারাজ (মহাত্মা গান্ধী)

রক্তে বেজেছে উৎসব, আজ হাত ধরো গান্ধীজী।
....
মনে হয় শুধু তোমারই মধ্যে আমরা যে বেঁচে আছি—
তোমাকে পেয়েছি অনেক মৃত্যু-উত্তরণের শেষে,
তোমাকে গড়ব প্রাচীর, ধ্বংস-বিকীর্ণ এই দেশে।
দিক্‌দিগন্তে প্রসারিত হাতে তুমি যে পাঠালে ডাক,
তাই তো আজকে গ্রামে ও শহরে স্পন্দিত লাখে লাখ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ মহাত্মাজীর প্রতি (ঘুম নেই)

গাম্ভীর্য

গাম্ভীর্য নির্বোধের মুখোশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রক্তকরবী

যাদের গায়ের জোর যেমন বেশী, তাদের স্বভাবও হয় তেমনি শান্ত।

সৈয়দ মুজতবা আলী : দেশে বিদেশে

গাল দেওয়া

গাল দিয়ে শুধু অপমান করা যায়....মতের প্রতিষ্ঠা করা যায় না। শক্ত কথাই সংসারে সবচেয়ে দুর্বল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শেষ প্রশ্ন—২৫

গীতবিতান

গীতবিতানের পাতা থেকে উড়ে যাচ্ছে নানা রঙের পাখি, তাদের ঠোঁটে নানা রঙের অক্ষর।

অমিতেশ মাইতি : কার ছবি মুখছবি

গীতিকবিতা

কবির "intense personal emotion"-ই গীতিকবিতার প্রাণ।....কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি কল্পনা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের পাখায় ভর করে একটি নিটোল রসমূর্তি ধারণ করে, সেই সঙ্গীতময় বাকমূর্তির নাম গীতিকবিতা।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : গীতিকাব্য

একক জীবনের দুঃখসুখ আশা আনন্দেরই প্রতিধ্বনি বাজে গীতিকবিতায়।...কল্পনায় কবি পরিচিত রূপের পৃথিবীকে পরিচয়ের অতীত অপরূপ জগৎ করে গড়ে তোলেন মনের মাধুরী মিশিয়ে ; কবি-কল্পনার এই আশ্চর্য যাদুই হলো গীতিকবিতার প্রাণ।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু : বাংলা সাহিত্যের নানারূপ

গুন্ডা

গুন্ডারা কোনও দলের হয় না। দলই গুন্ডাদের হয়।

জয় গোস্বামী : আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭.৪.২০০৩

গুমোর

বিদ্যা যাদের কম, গুমোর হয় তাদেরই বেশি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিপ্রদাস

গুরু

গুরুজন-অপমান মৃত্যুর সমান।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : নর-নারায়ণ (৪/১)

জীবনে পথ দেখায় যে—সেই মানুষের গুরু।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : গণদেবতা

যিনি যথার্থ গুরু, তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্‌বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন।

প্রমথ চৌধুরী : বই পড়া

গুরু হচ্ছেন সেই আধার যাঁর মধ্য দিয়ে আধ্যাত্মিক শক্তি তোমার কাছে পৌঁছয়।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—৪

গুরুর সহিত শিষ্যের সম্পর্ক জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পর্ক। গুরু আমার নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয়, তারপর মাতা, তারপর পিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—৪

গুরুর পথ গুরুর আঙিনাতেই যাওয়ার পথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (চতুরঙ্গ) শ্রীবিলাস ২

য়ুরোপীয়েরা আমাদের আধুনিক গুরু, সুতরাং তাঁহাদের কাছ হইতে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অজ্ঞতাটুকুও আমরা শিখিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজকুটুম্ব—সমূহ, পরিশিষ্ট

যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর শালা' গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

এ গৃহে শান্তি করুক বিরাজ মন্ত্র-বচন-বলে,/পরম ঐক্যে থাকুক সকলে, ঘৃণা যাক দূরে চলে ;/পুত্রে পিতায়, মাতা দুহিতায় বিরোধ হউক দূর,/পত্নী পতির মধুর মিলন হোক্ আরো সুমধুর ;/ভায়ে ভায়ে যদি দ্বন্দ্ব থাকে তা হোক্ আজি অবসান,/ভগিনী যেন গো ভগিনীর প্রাণে বেদনা না করে দান ;/জনে জনে যেন কর্মে বচনে তোষে সকলের প্রাণ,/নানা যন্ত্রের আওয়াজ মিলিয়া উঠুক একটি গান।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : মাঙ্গলিক (অথর্ব-বেদ)

গৃহ

গৃহ-শ্রী। লক্ষ্মীর চরণচিহ্ন। **উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় :** গঙ্গাবতরণ

গৃহিণী

বাঙ্গালীরা আপন গৃহিণীকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী দেখে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কপালকুণ্ডলা

আমি ছাড়িব ঘর যাব দেশান্তর
কি মোর ঘর করণে।
হয়ে স্বতন্তর কর তুমি ঘর
লয়ে গুহ গজাননে।।
দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি
ক্ষুধায় অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিণী দুর্জন ঘর হৈল বন
বাস করি তরুমূলে।।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল

কোমরে-আঁচল-জড়ানো গৃহিণীপনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অকাল ঘুম (শ্যামলী)

লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
'পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে'।
আমি কহিলাম 'আরে রাম রাম! নিবারণ সাথে যাবে'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পুরাতন ভৃত্য (কাহিনী)

সব যেন বিচ্ছিরি সব যেন খালি
গিন্নীর মুখ যেন চিমনির কালি। **সুকুমার রায় :** হুলোর গান

গেছোবাবা

—গেছো বাবার ব্যাপারটা কী শুনি।
—বাবা যে গাছে চড়ে বসবে সেই গাছই হবে কল্পতরু।
তলায় দাঁড়িয়ে হাত পাতলেই যা চাইবি তাই পাবি রে।
—খবর পেলি কার কাছ থেকে?
—খোকড় গাঁয়ের ভেকু সর্দারের কাছ থেকে।

বাবা সেদিন ডুমুর গাছে চড়ে বসে পা দোলাচ্ছিল ; ভেকু জানে না, তলা দিয়ে যাচ্ছে, মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চিটেগুড়, তামাক তৈরি করবে। বাবার পায়ে ঠেকে তার হাঁড়ি গেল টলে—চিটেগুড়ে তার মুখ চোখ গেল বুঁজে। বাবার দয়ার শরীর ; বললে, ভেকু, তোর মনের কামনা কী খুলে বল্। ভেকুটা বোকা ; বললে, বাবা, একখানা ট্যানা দাও, মুখটা মুছে ফেলি। যেমনি বলা, অমনি গাছ থেকে খসে পড়ল একখানা গামছা। মুখ চোখ মুছে উপরে যখন তাকালো তখন আর কারো দেখা নেই। যা চাইবে কেবল একবার। বাস, তারপরে কেঁদে আকাশ ফাটালেও সাড়া মিলবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে

গৃহিণীপনা

ভালো গৃহিণীপনায় স্বল্পকেও যথেষ্ট করিয়া তুলিতে পারে ; যতটুকু আছে তাহার যথাযোগ্য বিধান করিতে পারিলে তাহার দ্বারা প্রচুর ফল পাওয়া গিয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সঞ্জীবরুদ্র (আধুনিক সাহিত্য)

গেরিলা

গেরিলা যুদ্ধ ছাড়া ভারতের মুক্তি নেই। সশস্ত্র গেরিলাবাহিনী ছাড়া মুক্তি নেই সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে, মুক্তি নেই শোষণ থেকে। বার বার হয়তো পরাজিত হবে ভারতের গেরিল্লাবাহিনী আর বার বার সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে জন্ম নেবে নতুন গণফৌজ, যার রাইফেলের গর্জনে সূচিত হবে মুক্ত, শোষণহীন, শ্রমিক-কৃষকের ভারতবর্ষ।

উৎপল দত্ত ঃ দিল্লী চলো

গোপন

অগ্নি আর পাপ অধিক দিন গোপন থাকে না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দুর্গেশনন্দিনী

খোলা জায়গাতেই গোপনীয় জিনিষ সবচেয়ে নিরাপদে থাকে। সন্দেহ জাগে না কারও। **বনফুল ঃ জঙ্গম**

নির্মাণ হইবার অবস্থায় গোপনের আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ইংরেজ ও ভারতবাসী (রাজাপ্রজা)

আজি শ্রাবণঘনগহন মোহে গোপন তব চরণ ফেলে
নিশার মতো, নীরব ওহে, সবার দিঠি এড়ায়ে এলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলিপি—৩

তোমার গোপন কথাটি, সখী, রেখো না মনে।
শুধু আমায়, বোলো আমায় গোপনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমালা

গোপন কথাটি রবে না গোপনে,
উঠিল ফুটিয়া নীরব নয়নে।
না না না, রবে না গোপনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তাসের দেশ

যত গোপনে ভালোবাসি পরান ভরি
পরান ভরি উঠে শোভাতে—
যেমন কালো মেঘে অরুণ আলো হেসে
মাধুরী জেগে ওঠে প্রভাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গুপ্ত প্রেম (মানসী)

গোঁফ

সতী সাধ্বী যেমন সর্বহারা হইয়াও এয়োতের লক্ষণ শাঁখা-জোড়াটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা সুষেণবাবুও তেমনি সমস্ত কর্তৃত্ব খোয়াইয়া পুরুষত্বের চিহ্ন স্বরূপ এই গোঁফ জোড়াটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছেন।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) : রাতারাতি

মহিষশৃঙ্গ মুলাজোড়
গুলাফেতা পাতালফোঁড়
উবুখোঁচা বেলাপাঁতি
গোঁফ হয় এই ছয় জাতি। প্রচলিত কথা

গোঁফকে বলে তোমার আমার— গোঁফ কি কারো কেনা?
গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।

সুকুমার রায় : গোঁফ চুরি (আবোল-তাবোল)

গোধূলি

—বেলা বয়ে যায়!
গোধূলির শেষ সীমানায়
ধূম্র মৌন সাঁঝে
নিত্য নব দিবসের মৃত্যুঘণ্টা বাজে!

জীবনানন্দ দাশ : পিরামিড (ঝরা পালক)

গোধূলির রং লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা হতেছে নরম।

জীবনানন্দ দাশ : মানুষ যা চেয়েছিল (বেলা আবেলা কালবেলা)

যব গোধূলি সময় বেলি।
ধবনি মন্দির-বাহির ভেলি,
নব জলধরে বিজুরী-রেহা
দ্বন্দ্ব পসারিয় গেলি॥

বিদ্যাপতি : বৈষ্ণব পদাবলী

অস্তে গেলা দিনমণি ; আইলা গোধূলি,—
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী।

মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য

গোধূলিগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।
আমার যা কথা ছিল হয়ে গেল সারা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি।
সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী।
অরি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

শেষ করে দিল পাখি গান গাওয়া,
নদীর উপরে প'ড়ে এল হাওয়া,
ওপারের তীর, ভাঙ্গা মন্দির
আঁধারে মগন রে।
আসিছে মধুর ঝিল্লিনূপুরে
গোধূলি লগন রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোধূলি লগ্ন (খেয়া)

কলকাতার...গোধূলির যে আভা তাহাতে আলোকের প্রফুল্লতাও নাই, অন্ধকারের আবরণও নাই—তাহা বিষাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রুহীন করিয়া তোলে, তাহা কর্ম ও আশ্বাসের বল হরণ করে অথচ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের শান্তি আনয়ন করে না। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ চোখের বালি—৫৬

জুড়ালো রে দিনের দাহ, ফুরালো সব কাজ,
কাটল সারা দিন।
সামনে আসে বাক্যহারা স্বপ্নভরা রাত
সকলকর্মহীন।
তারি মাঝে দিঘির জলে যাবার বেলাটুকু,
এইটুকু সময়
সেই গোধূলি এল এখন, সূর্য ডুবু-ডুবু—
ঘরে কি মন রয়?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দিঘি (খেয়া)

গোরু (দ্র. গরু)

যুদ্ধ জিনতে এসেছিল রথে বেঁধে গোরু।

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ

হিতোপদেশ কি বুঝবি শোন রে বেটা গোরু।

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ

গোরু তিনজনের ; গোরু প্রথম বয়সে গুরুমশায়ের ; মধ্যবয়সে স্ত্রীজাতির ; শেষ বয়সে উত্তরাধিকারীর ; দড়ি ছিঁড়িবার সময় কাহারও নহে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কমলাকান্তের জোবানবন্দী (কমলাকান্তের দপ্তর)

দুর্ভাগ্য আর গোরুর গাড়ি আসে যখন
আসে ভিড় ক'রে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ অপর পক্ষ (শ্যামলী)

বাহিরে চারি দিকেই যখন হাওয়া-বদল, পাতা-বদল, রঙ-বদল, আমরা তখনও গোরুর গাড়ির বাহনটার মতো পশ্চাতে পুরাতনের ভারাক্রান্ত জের সমানভাবে টানিয়া লইয়া একটানা রাস্তার ধুলা উড়াইয়া চলিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্তযাপন (বিচিত্র প্রবন্ধ)

গোলাপ

অরুণ-রাঙা গোলাপ কলি কে নিবি সহেলী আয়।
গালে যার গোলাপী আভা এ ফুল-কলি তারে চায়॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাব্য-গীতি

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে, মধুপ, হোথা যাস নে—
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাস নে॥....
'মরমে যাহা গোপন আছে গোলাপে তাহা বলিব—
বলিতে যদি জ্বলিতে হয় কাঁটারই ঘায়ে জ্বলিব'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

বলি, ও আমার গোলাপ-বালা বলি, ও আমার গোলাপ-বালা—
তোলো মুখানি, তোলো মুখানি — কুসুমকুঞ্জ করো আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমালা

ব্যথার প্রলাপে মোর গোলাপে গোলাপে জাগে বাণী,
কিশলয়ে কিশলয়ে কৌতূহলকোলাহল আনি
মোর গান হানি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তপোভঙ্গ (পূরবী)

শরমে জড়িত কত-না গোলাপ
কত-না গরবী করবী
কত-না কুসুম ফুটেছে তোমার
মালঞ্চ করি আলা।
আমি চাহিতে এসেছি শুধু একখানি মালা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রার্থী (কল্পনা)

সযত্ন সেচনসিক্ত নবোন্মুক্ত এই গোলাপের
রক্ত পত্রপুটে
কম্পিত কুণ্ঠিত কত অগণ্য চুম্বন ইতিহাস
রহিয়াছে ফুটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্ত (কল্পনা)

চাহিয়া প্রভাত রবির নয়নে
গোলাপ উঠিল ফুটে।
"রাখিব তোমায় চিরকাল মনে"
বলিয়া পড়িল টুটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

গৌর/গৌরাঙ্গ (দ্র. চৈতন্য)

বর্ণচোরা ঠাকুর এল রসের নদীয়ায়—তোরা দেখবি যদি আয়।
তারে কেউ বলে শ্রীমতী রাধা কেউ বলে তায় শ্যামরায়॥
কেউ বলে তার সোনার অঙ্গে রাধা কৃষ্ণ খেলেন রঙ্গে ;
আবার কেউ বলে তা'য় গৌর-হরি, কেউ অবতার বলে তায়॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভক্তিগীতি

গৌরাঙ্গের দুটি পদ যার ধন সম্পদ
সে জানে ভকতি রস সার।
গৌরাঙ্গের মধুর লীলা যার কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্মল ভেল তার॥

নরোত্তমদাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

পরশমণির সাথে কি দিব তুলনা রে
পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা।
আমার গৌরাঙ্গের গুণে নাচিয়া গাইয়া রে
রতন হইল কত জনা॥

পরমানন্দ ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

যদি গৌরাঙ্গ না হত কি মেনে হইত
কেমনে ধরিতাম দে।
রাধার মহিমা প্রেমরসসীমা
জগতে জানাত কে॥
মধুর-বৃন্দাবিপিন-মাধুরী
প্রবেশ-চাতুরী-সার।
বরজ-যুবতী-ভাবের ভকতি
শকতি হইত কার॥

বাসুদেব ঘোষ (নরহরি সরকার) ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

গৌরচন্দ্রিকা

গৌরচন্দ্রিকা—গৌরচন্দ্রসম্বন্ধিনী গীতি ; কীর্তনারম্ভে গৌরচন্দ্রের কৃপা প্রার্থনাদিবিষয়ে ভক্তের গীতি। [গৌরচন্দ্র কীর্তনের প্রবর্তক ; এই হেতু কীর্তনগায়কেরা কীর্তনের প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা গাইয়া থাকেন।]

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ

পালাবদ্ধ রস-কীর্তনের পূর্বে তার মুখবন্ধস্বরূপ গৌরাঙ্গবিষয়ক যে পদ গীত হয়, তাকে বলে গৌরচন্দ্রিকা।

সনাতন গোস্বামী ঃ বৈষ্ণব পদাবলী পরিচয়

গৌরব

মানুষের সমস্ত প্রয়োজনকে দুরূহ করিয়া দিয়া ঈশ্বর মানুষের গৌরব বাড়াইয়াছেন। পশুর জন্য মাঠ ভরিয়া তৃণ পড়িয়া আছে, মানুষকে অন্নের জন্য প্রাণপণ করিয়া মরিতে হয়।.....আমাদের অন্নমুষ্টি আমাদের গৌরব। পশুর গাত্রবস্ত্রের অভাব একদিনের জন্যও নাই,.....গাত্রবস্ত্র মনুষ্যত্বের গৌরব। আত্মরক্ষার উপায় সঙ্গে লইয়া মানুষ ভূমিষ্ঠ হয় নাই,.....কোমল ত্বক এবং দুর্বল শরীর লইয়া মানুষ যে আজ সমস্ত প্রাণিসমাজের মধ্যে আপনাকে জয়ী করিয়াছে, ইহা মানবশক্তির গৌরব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসবের দিন (ধর্ম)

যতটা পাওয়া যায়, ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায়—ভোগকে খর্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চোখের বালি—৫২

যুরোপে লাগাম-পরা অবস্থায় মরা একটা গৌরবের কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নববর্ষ (ভারতবর্ষ)

যাক আর সব,
আপন গৌরবে রাখি তোমার গৌরব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—৫৪

নিজেরে করিতে গৌরব দান নিজেরে কেবলই করি অপমান,

আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া ঘুরে মরি পলে পলে
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রহ্মসঙ্গীত

গ্রন্থ (দ্র. বই)

সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন।

কেশবচন্দ্র সেন : জীবনবেদ

গ্রন্থাগার (দ্রঃ লাইব্রেরি)

আপাতদৃষ্টিতে গ্রন্থাগার একটি স্থিতিশীল বস্তু বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে একটি সজীব গতিময় সত্তার অস্তিত্ব রয়েছে, কেননা, গ্রন্থই মানুষের উপলব্ধির ধারক ও বাহক, গ্রন্থের মাধ্যমেই মানুষের প্রতিভার স্পন্দন অনুভূত হয়। অফুরান প্রাণের ঐশ্বর্য তাই এখানে বদ্ধমূল।

পীযূষকান্তি মহাপাত্র ও ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী : গ্রন্থাগার বিজ্ঞান পরিচয়

জগতের অনন্ত গ্রন্থাগার তোমারই মনে।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী ১/২৪

জনসাধারণের গ্রন্থাগার আধুনিক কালে জনসাধারণের বিশ্ববিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হয়।

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় : গ্রন্থাগার দর্পণ

গ্রাম

আজকাল গ্রামের ছেলে মেয়েরাও সাধারণ সরল জীবন যাপন করতে চায় না। তাদের দৃষ্টি এখন ভোগ্যপণ্যের দিকে। তারা দূরদর্শনের প্রসাধনদ্রব্যের বিজ্ঞাপন দেখতেই শুধু ভালোবাসে না, প্রসাধন দ্রব্যের মালিকও হতে চায়।....সারা গ্রামে এত শব্দ, বর্ণ, গন্ধের ঐশ্বর্য ছড়িয়ে আছে কিন্তু এই সহজ সরল বিনা পয়সার সৌন্দর্যের দিকে তাদের চোখ নেই। পুরো গ্রাম, নদী, সরোবর, বন উপবন, ফুল ফল, পাখি, আকাশ বাতাস নিয়ে যে একটি বিশাল বিউটি পার্লার—সেটা তাদের মনে ধরে না। নন্দনতত্ত্ব শেখার আসল জায়গা, অন্তত গ্রামের লোকের কাছে, সেটাই প্রথম ধাপ তা তাদের মনে হয় না।

নার্গিস সাত্তার : শিশু শিক্ষক শিক্ষা

গ্রামের গোরুচরা মাঠ, খেয়াঘাটের বটচ্ছায়া, অবকাশের আবেশে ভরা মধ্যাহ্ন এবং ঝিল্লিরবে আকম্পিত সন্ধ্যা-বেলাকার নিস্তব্ধতা। তাহারই সুরে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চতুরঙ্গ। শচীশ—৫

গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মদিন (সেঁজুতি)

ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুই বিঘা জমি (কাহিনী)

ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্বপ্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,
আখের খেতের পারে, কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শৈশবসন্ধ্যা (সোনার তরী)

গ্রাম্যতা

আমি যখন ইচ্ছা করি যে আমাদের দেশের গ্রামগুলি বেঁচে উঠুক, তখন কখনও ইচ্ছে করিনে যে গ্রাম্যতা ফিরে আসুক। গ্রাম্যতা হচ্ছে সেইরকম সংস্কার, বিদ্যা, বুদ্ধি, বিশ্বাস ও কর্ম যা.....বর্তমান যুগের যে প্রকৃতি তার সঙ্গে.....যা কেবল মাত্র পৃথক নয়, যা বিরুদ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাশিয়ার চিঠি—উপসংহার

গ্রীষ্ম

আর ত' বাঁচিনে প্রাণে বাপ্ বাপ্ বাপ্
বাপ্ বাপ্ বাপ্ এ কি গুমটের দাপ॥
বিষহীন হয়ে গেল বিষধর সাপ।
ভেক তার বুকে মুখে মারিতেছে লাফ॥
বিকল হয়েছে সব, শরীরের কল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥
জল দে জল দে বাবা জলদেরে বল।
দে জল দে জল বাবা দে জল দে জল॥.....
গ্রীষ্ম করে বিশ্বনাশ দৃশ্য ভয়ঙ্কর।
সৃষ্টি আর নাহি হয় দৃষ্টির গোচর॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঃ গ্রীষ্ম

গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া, তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। সাবিত্রী-মন্ত্র জপ করিতে কখনো বা সে নিশ্বাস ধারণ করিয়া রাখে, তখন গুমটে গাছের পাতা নড়ে না ; আবার যখন সে রুদ্ধ নিশ্বাস ছাড়িয়া দেয় তখন পৃথিবী কাঁপিয়া উঠে। ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আষাঢ় (বিচিত্র প্রবন্ধ)

ঘড়ি

ঘড়িতে ঐ যে ছুঁচোলো মিনিটের কাঁটা দেখছ উনি যে কেবল কানের কাছে টিক টিক করে সময় নির্দেশ করেন তা নয়—অনেক সময় প্যাঁট প্যাঁট করে বেঁধেন.....রাত্তির দশটার পর আমি যদি বাইরে থাকি তাহলে প্রতি মিনিট আমাকে একটি করে খোঁচা মেরে মনে করিয়ে দেন ঘরে আমার অন্ন ঠাণ্ডা এবং গৃহিণী গরম হচ্ছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোড়ায় গলদ

ঘড়িতে পনেরো মিনিট অন্তর ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা বাজিত,......প্রহরগুলো যেন একে একে নিলাম হইয়া যাইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি

বেজে উঠল কি সময়ের ঘড়ি?
এসো তবে আজ বিদ্রোহ করি,
আমরা সবাই যে যার প্রহরী
উঠুক ডাক।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ বিদ্রোহের গান (ঘুম নেই)

ঘর

ঘর তো শুধু একটা আস্তানা নয়,
নয় শুধু মাথার ওপরে ছাদ, মানুষের কাছে

তার পরিচয় ঢের গভীর, বিস্তৃত, বিচিত্র
গাছের শিকড় যেমন তার অস্তিত্বের চাবিকাঠি
অদৃশ্য গোপনে প্রাণের রসদ সংগ্রহ করে
পৌঁছে দেয় শাখা-প্রশাখায়, পত্রগুচ্ছে, ফুলে ফলে
ও পল্লবে, মানুষের ঘরও তেমনি তার
শিকড়ের ইতিকথা, তার জীবন ও সংগ্রাম,
তার সামাজিক, মানবিক ইতিবৃত্ত।

কৃষ্ণ ধর ঃ ঘরে ফেরার দিন

ঘর কৈলুঁ বাহির বাহির কৈলুঁ ঘর।
পর কৈলুঁ আপন আপন কৈলুঁ পর।।

চণ্ডীদাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী (কি মোহিনী জান বন্ধু)

ঘর যেমনই হোক। সাজালেই সেজে ওঠে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে

হেথায় তিনি কোল পেতেছেন
আমাদের এই ঘরে।.....
দিনের শেষে ফিরি যখন
নানা কাজের পরে,
দেখি তিনি একলা বসে
আমাদের এই ঘরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৪৯

আমাদের ঘরগুলো এক-একটা ছাঁচ, মাটির মানুষ গড়বার জন্যেই। তাই তো এতকাল ধরে বিদেশী বাজিকর এত সহজে তেত্রিশ কোটি পুতুলকে নাচিয়ে বেড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুই বোন

ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা-যাওয়া—
পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাঁশি (পরিশেষ)

ঘরটাকে তার ছাড়িয়ে গেল ঘরেরই আসবাবে।
মনটাকে তার ঠাঁই দিল না ধনের প্রাদুর্ভাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বেসুর (বিচিত্রিতা)

ধনীর প্রাসাদ বিকট ক্ষুধিত রাহু
বস্তুপিণ্ড-বোঝায় বদ্ধ বাহু।
মনে পড়ে সেই দীনের রিক্ত ঘরে
বাহুবিমুক্ত আলিঙ্গনের তরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

যে ঘরওআলা ঘরে বাস করে না সে যতবড়ো ক্ষমতাশালীই হোক, তার শাসনের চেয়ে যে দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৯

বড়ো ঘর বড়োর ভান করে মাত্র।
আসল বড়োকে বাইরে ঠেকিয়ে রাখে অবজ্ঞায়।
আমার ছোটো ঘর বড়োর ভান করে না।

অসীমের প্রতিযোগিতার স্পর্ধা তার নেই
ধনী ঘরের মূঢ় ছেলের মতো।
আকাশের শখ ঘরে মেটাতে চাই নে ;
তাকে পেতে চাই তার স্বস্থানে,
পেতে চাই বাইরে পূর্ণভাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক। পনেরো

ঘর সবারই থাকে—
কারো কারো ফেরা হয়ে ওঠে না।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মিড়

ঘাতক

দল এবং ঝাণ্ডা বদলালেই ঘাতকরা নিষ্কৃতি পায়।

মহাশ্বেতা দেবী ঃ হাজার চুরাশীর মা

ঘাস

কাঁচা বাতাবির মতো সবুঝ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারো ইচ্ছে করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে ঘসি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

জীবনানন্দ দাশ ঃ ঘাস (বনলতা সেন)

জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে—আর এই বাংলার ঘাস
রবে বুকে ; এই ঘাস ঃ
এই ঘাস ঃ এরি নিচে কঙ্কাবতী শঙ্খমালা করিতেছে বাস
তাদের দেহের গন্ধ, চাঁপাফুল মাখা ম্লান চুলের বিন্যাস
ঘাস আজো ঢেকে আছে।

জীবনানন্দ দাশ ঃ জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে....(রূপসী বাংলা)

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস,
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।

জীবনানন্দ দাশ ঃ বিভিন্ন কোরাস-৩ (সাতটি তারার তিমির)

কোন মনুষ্য বড় ক্রুদ্ধ হইলে বলিয়া থাকে, 'আমি কি ঘাস খাই'? আমি জানি, মনুষ্যদিগের স্বভাব এই, তাহারা যে কাজ করে, অতি যত্নে তাহা গোপন করে। অতএব যেখানে তাহারা ঘাস খাওয়ার কথায় রাগ করে, তখন অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে যে, তাহারা ঘাস খাইয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল

ঘাসের ওপর বসে পৃথিবীকে বড়ো কাছে মনে হয়।

বীরেন সাহা ঃ ঘাসের শরীর জুড়ে

ঘাসে আছে ভিটামিন, গোরু ভেড়া অশ্ব
ঘাস খেয়ে বেঁচে আছে, আঁখি মেলে পশ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খাপছাড়া (১৮)

ঘুম

ঘুমাইতে দাও শান্ত রবিরে, জাগায়ো না জাগায়ো না
সারা জীবন যে আলো দিল, ডেকে তার ঘুম ভাঙায়ো না॥

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য-গীতি

ঘুমাও, ঘুমাও! দেখিতে এসেছি, ভাঙিতে আসিনি ঘুম।
কেউ জেগে কাঁদে, কারও চোখে নামে নিদালির মরসুম॥

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য-গীতি

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে আমার গানের বুলবুলি।
করুণ চোখে চেয়ে আছে সাঁঝের ঝরা ফুলগুলি॥

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য-গীতি

মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর......।

কাজী নজরুল ইসলাম : চোখের চাতক

পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে।

জীবনানন্দ দাশ : মৃত্যুর আগে (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

ঘুম যখন আসবে তখনই দরজা খোলবার সময় আসবে রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিত্রাণ ১/১

সুখের মরণসম ঘুমঘোর আসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মরণস্বপ্ন (মানসী)

নরম ঘুমের ঘোর ভাঙল?
দেখ চেয়ে অরাজক রাজ্য,
ধ্বংস সমুখে কাঁপে নিত্য
এখনো বিপদ অগ্রাহ্য?

সুকান্ত ভট্টাচার্য : অদ্বৈধ (ঘুম নেই)

ঘুষ/ঘুস

ঘুস পেলে আমলা তুষ্ট।

বাংলা প্রবাদ

ঘুসের টাকা ফুস।

বাংলা প্রবাদ

নামে ঘুসকে আমরা ঘুস বলি, কিন্তু ঘুসের তো আর একটা নাম নয়। শ্রীকৃষ্ণের শতনামের মত তারও অসংখ্য নাম।

বিমল মিত্র : আমি

ভীষণ ঘুসের রাজত্ব ওখানে।.....দুনিয়ার যত ব্যবসাদার নরকে একটু বাড়তি সুখের জন্য দরাজ হাতে পয়সা ঢেলে যাচ্ছে।

শংকর : যাবার বেলায়

হাকিম-হুকিম জজ-বাহাদুর
        সবাই জানে ঘুসের কথা।
কেউ ঘুচাতে পারলে না কই
        রাজদ্বারে এই কুপ্রথা।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত : বিচারালয় (বিদূষক ১৩২৯)

ঘুষ....কোনও অখণ্ড মণ্ডলাকার বস্তু নয়।....রোম নগরীর মত তার চরিত্রও একদিনে নির্মিত নয়।

সম্পাদকীয় ঃ আজকাল—২৭.৫.২০০৩

ঘোড়া

এই প্রাণীটি হচ্ছে ঘোড়া।....

সৃষ্টিকর্তা এর গড়নের মধ্যে মরুৎ আর ব্যোম্ একেবারে ঠেসে দিলেন। ফল হল এই যে, এর মনটা প্রায় ষোলো-আনা গেল মুক্তির দিকে। হাওয়ার আগে ছুটতে চায়, অসীম আকাশকে পেরিয়ে যাবে বলে পণ করে বসে। অন্য সকল প্রাণী কারণ উপস্থিত হলে দৌড়য় ; এ দৌড়য় বিনা কারণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লিপিকা

দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আসে,
বর্ষা আসে হইয়া ঘোরালো,
সমস্ত আকাশজোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া
চিকমিকে বিদ্যুতের আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষা-যাপন (সোনার তরী)

আদিম কালের চাঁদিম হিম,
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম।
ঘনিয়ে এল ঘুমের ঘোর,
গানের পালা সাঙ্গ মোর।

সুকুমার রায় ঃ আবোল-তাবোল

চক্ষু

রূঢ় দীপের আলোক লাগিল
ক্ষমাসুন্দর চক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অভিসার (কথা)

মহেন্দ্রের বজ্র হতে কালো চক্ষে বিদ্যুতের আলো
আনো, আনো ডাকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আহ্বান (পূরবী)

চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্বহৃদয় ভরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৩৬

সে কী আশ্চর্য চক্ষু! সে চক্ষু বড়ো কি ছোটো, কালো কি কটা সে তর্ক মনেই আসে না—প্রথম নজরেই মনে হয় এই দৃষ্টির একটা অসন্দিগ্ধ প্রভাব আছে। তাহাতে সংকোচ নাই, দ্বিধা নাই, তাহা একটা স্থির শক্তিতে পূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা—১ম পরিঃ

চক্ষে আমার তৃষ্ণা ওগো, তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন, সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চণ্ডালিকা

কালো চক্ষুপল্লবের কাছে
থমকিয়া আছে

স্তব্ধ ছায়া পাতি
হাসির খেলার সাথী
সুগম্ভীর স্নিগ্ধ অশ্রুবারি ;
যেন তাহা দেবতারি
করুণা-অঞ্জলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নাম্নী—কাজলী (মহুয়া)

যেন তার চক্ষুমাঝে
উদ্যত বিরাজে
মহেশের তপোবনে নন্দীর তর্জনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নাম্নী—জয়তী (মহুয়া)

সিক্তপক্ষ্ম দুটি চক্ষু দিয়া
সমস্ত লাঞ্ছনা যেন লইল মুছিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিশোধ (কথা)

রহি আমি দু-চক্ষুর অঞ্জলি পাতিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রোগশয্যায়—৫২

চন্দ্র

চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিজের ও সাধারণের (কণিকা)

সামনে পূর্ণচন্দ্র,
বন্ধুর অকস্মাৎ হাস্যধ্বনির মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট—এক

যবে চন্দ্র দূরে দেয় দেখা
শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে
নদীপ্রান্তে জনশূন্য বালুকার তীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বসুন্ধবা (সোনার তরী)

চমৎকার

শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি সুন্দর হইয়াও যেরূপ রোগী মরে, আমাদের বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াও কার্য নষ্ট হয়, এখানেও ইহার দৃষ্টান্ত প্রত্যহ দেখিতেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সফলতাব সদুপায় (আত্মশক্তি)

একি চমৎকার, দেশে এল ফাঁক তালের কারবার,
গরীব মারা কল বসেছে, হুঁশিয়ার ভাই হুঁশিয়ার।
গরীবের খোশামোদ করে যখন আসে ভোটের কাল,
ভোট ফুরালে মেম্বার হলে তখন তাদের চক্ষু লাল।

রমেশ শীল : একি চমৎকাব

চম্পা

চম্পা! তোমার মায়ার অন্ত নেই,
কত না পারুল-রাঙানো রাজকুমার
কত সমুদ্র কত নদী হয় পার!

ঘোচাও চম্পা, দুস্থ ছদ্মবেশ,
এ মাহ্ ভাদরে ভরা বাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণমনে মুখ।

বিষ্ণু দে ঃ সাত ভাই চম্পা (সাত ভাই চম্পা)

জাগে জাগে জাগে ওই নৈদাঘ সূর্য,
বাজে বাজে তার রৌদ্রক তূর্য ;
বসন্ত অবসান,
কে রাখে ফুলের মান?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!
পাতা হতে মাথা তুলি ভাস্করে নমি কে
চাবে সে রুদ্রমুখে, চাবে নির্নিমেখে?
কে পিয়ে অনলরাশি
হাসিবে তরল হাসি?
চম্পা গো চম্পা গো জা—গো—!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ পারুলের আহ্বান (সায়ম্)

আমারে ফুটিতে হল বসন্তের অন্তিম নিশ্বাসে ;
বিষণ্ণ যখন বিশ্ব নির্মম গ্রীষ্মের পদানত ;
রুদ্র তপস্যার বনে আধ-ত্রাসে আধেক উল্লাসে,
একাকী আসিতে হল—সাহসিকা অপ্সরার মত।
সূর্যের বিভূতি তবু লাবণ্যে দিতেছে তনু ভরি ;
দিনদেবে নমস্কার! আমি চম্পা! সূর্যের সৌরভ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ চম্পা

চর

দূরপ্রসারিত চর
শূন্য আকাশের নিচে শূন্যতার ভাষ্য করে যেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আরোগ্য—৪

জোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে
দেশের প্রধান চর।
অতি সাধুমত আকারপ্রকার
এক তিল নাহি মুখের বিকার,
ব্যবসা যে তাঁর মানুষশিকার
নাহি জানে কোনো নর। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ পুরস্কার (সোনার তরী)

চরণ

থাকিতে চরণ মরণে কি ভয় নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল শরণ জয় শ্রীচরণ ভরসা॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ শ্রীচরণ ভরসা

তোমার চরণে প্রভু শতেক পরণাম।
তোমার চরণে প্রভু লিখ দাসীর নাম॥
লিখিতে দাসীর নাম লাগে যদি পায়।
মাটিতে লিখিয়া নাম চরণ দিও তায়॥ **চণ্ডীদাস** ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে, নিয়ো না, নিয়ো না সরায়ে—
জীবন মরণ সুখ দুখ দিয়ে বক্ষে ধরিব জড়ায়ে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতলেখা—২

ঠেকব চরণ 'পরে
আমি বাঁচব চরণ ধরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—৪

চরণ বলতে কী বোঝায় তা ওরা জানবে কী করে? ছাগলের খুরের মতো সরু সরু ঠেকোওআলা জুতোর মধ্যে লক্ষ্মীদের পা কড়া জেনানার মধ্যে ওরা বন্দী করে রেখেছে। সাইক্লোপীডিয়াওয়ালার সাধ্য কী পায়ের মহিমা বোঝে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ—৪৪

চরিত্র

চরিত্র সৃষ্টি অর্থাৎ চরিত্রদের পারস্পরিক সম্পর্ক, দ্বন্দ্ব, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ঘাত, অন্তর্ঘাত, প্রতিঘাত ও সংঘাতের নিপুণ প্রতিচ্ছবির মধ্য দিয়ে মানবীয় রীতিতে চরিত্রের অন্তর্লোককে এক নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে দর্শক বা পাঠকের কাছে তুলে ধরার দুরূহ প্রচেষ্টাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলাই হল নাট্যকারের কাজ। জীবনকে জীবনের সমগ্রতায় উপলব্ধি করানোর গুরুদায়িত্ব নাট্যকার বহন করেন এবং তা করতে গিয়ে নাট্যকারের সৃজনীমুখে স্পন্দিত সময়ের অনুরণনে প্রবৃত্তি, বোধ ও চেতনার সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়ে ওঠে এক একটি সজীব বাস্তব চরিত্র।

অচিন্ত্যকুমার বসু : দুই বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলা থিয়েটার

নাট্যকারের মূল লক্ষ্য চরিত্র সৃষ্টি। ঘটনা সংলাপ ও তার বিভিন্ন চিন্তাধারার সুষ্ঠু সমন্বয়ে নাট্যকার চরিত্র সৃষ্টি করেন। চরিত্র চিত্রণে সম্ভাব্যতা বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখা একান্ত আবশ্যক।....নাটকে অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের কোনো স্থান নেই। যে চরিত্র নাটকের অগ্রগতিকে সাহায্য করে না, তাকে বর্জন করাই উচিত। নাট্যচরিত্র ক্রিয়া আবেগ ও অন্তর্দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সংবেদনশীল হয়ে ওঠে।

দীপক চন্দ্র পোদ্দার : বাংলা থিয়েটারে সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটক

যে চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সমন্বিত হইয়াছে, সেই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা মহৎ।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—৪

চরিত্র শব্দের অর্থই এই—যাতে করে চলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন—ব্রহ্মবিহার

উপন্যাস শৈলীর পক্ষে চরিত্রসৃষ্টি যে শুধু গোড়ার কথা তাই নয়,—কোনো চরিত্রই গল্পের স্থিরভূমি আঁকড়ে থাকে না, ঘটনাচক্রে তার উত্তরণ ঘটে।

লিলি দত্ত : জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

চরিত্রের সম্পদ যাঁহার আছে তাহার অন্য সম্পদ আপনি আসে।

শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ

—আমি মনে করি, মানুষের সবচেয়ে বড় সম্পত্তি হলো ক্যারেকটর অর্থাৎ চরিত্তির।....
—আমার ধারণা ছিল, সম্পত্তিই হলো মানুষের সবচেয়ে বড় ক্যারেকটর অর্থাৎ চরিত্তির।

সুবোধ ঘোষ : পঙ্কতিলক

চলচ্চিত্র

ভারতের উঠতি যন্ত্রযুগে সাধারণের জন্য যাবতীয় নতুন জীবনভাষ্যের প্রয়োজন

মেটাবার একমাত্র উপায় চলচ্চিত্র। প্রমোদ ও শিল্পকলার সহজ সমন্বয়ের রাজপথ এখনো চলচ্চিত্রেই অবস্থিত এবং তার ভবিষ্যৎ সুদূরবিস্তৃত।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত : বই নয় ছবি

চলচ্চিত্র কেবলমাত্র অবসর বিনোদনের সামগ্রী নয়, এটা একটা সিরিয়াস আর্টও বটে।

সত্যজিৎ রায় : চলচ্চিত্রের ভাষা : সেকাল ও একাল (বিষয় চলচ্চিত্র)

ভাল ছবি কাকে বলে? ভাল গল্প মানেই কি ভাল ছবি?....আসলে কাহিনী মাত্রেরই দুই দিক আছে—এক হলো তার বক্তব্য, আর এক হলো তার ভাষা। এই দুয়ে মিলে গল্প। গল্পের আর্ট এই বলার ভঙ্গীতে। ভাল গল্প বলার দোষে নষ্ট হয়ে যায়, সামান্য কাহিনী বলার গুণে শিল্পমণ্ডিত হয়ে ওঠে। চলচ্চিত্র শিল্পও তার ভাষায়, তার বিন্যাস-কৌশলে। যেখানে ভাষা দুর্বল, সেখানে গল্প ভাল হলেও ছবি শিল্প-সাফল্য লাভ করতে অক্ষম। চলচ্চিত্রের এই ভাষা ছবির ভাষা। পরিচালককে এই ভাষা জানতে হবে, এর ব্যাকরণ তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে।

সত্যজিৎ রায় : বাংলা চলচ্চিত্রের আর্টের দিক (বিষয় চলচ্চিত্র)

কাহিনী নির্বাচনের প্রথম কাজ হল চিত্রনাট্য-রচয়িতার, ইনি কাহিনীকে চলচ্চিত্রের ছাঁচে ঢেলে সাজান। এ কাজটা লেখার কাজ। কিন্তু এই লেখার কোন সাহিত্যিক মূল্য নেই, বা না থাকলেও কিছু এসে যায় না। চিত্রনাট্যের ভাষা হলো ছবির ভাষায় লিখিত ইঙ্গিত মাত্র। এর মূল্য কাঠামো বা 'স্কেলিটন' হিসেবে। মঞ্চের নাটকের মত এখানেও কাহিনীকে অঙ্কে ও দৃশ্যে ভাগ করতে হয়। কিন্তু দৃশ্যের মধ্যেও দৃষ্টিকোণ পরিবর্তনের বা শট পরিবর্তনের রীতি আছে। তার সঙ্গে নাটকের কোন মিল নেই। এ একেবারে সিনেমার নিজস্ব রীতি। সিনেমার ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করলে এই রীতি আয়ত্ত করা সম্ভব নয়।

সত্যজিৎ রায় : বাংলা চলচ্চিত্রের আর্টের দিক (বিষয় চলচ্চিত্র)

চা

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশ মান চাহি না।
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই এক 'প্যালা' চা।.....
আমার সংসার কেবা বল কার—দারা সুত বাপ মা।
আমার জগতে যাহা কিছু সার—প্রাতে এক প্যালা চা।
চা—চা—চা—প্রাতে এক প্যালা চা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : কল্কি-অবতার

হায় হায় হায় দিন চলি যায়।
চা-স্পৃহ চঞ্চল চাতকদল চল চল চল হে॥
টগ বগ-উচ্ছল কাথলিতল-জল কল কল হে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

কাকাকে বলতে পার চাচা-ই
সকালে চেঁচান জোরে 'চা চাই'।
চাদর চাটাই কাচা গালিচা
চাইলেই চারিদিকে খালি চা খালি চা।
কাকা বলে : চা বিনা
চাকরি না, চাবি না—

আদৌ যায় না করা যাচাই
চা ছাড়া হয় না বাপু বাঁচাই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ চা-চা কাহিনী

চাই/চাওয়া

হৃদয়ের কাছে আমি আগে কত গোলাপ চেয়েছি
এখন পাঁউরুটি চাই, সিমেন্টের পরিমিট চাই।....
মানুষ মেঘের কাছে আগে কত কবিতা চেয়েছে
এখন পেট্রোল চায়, প্রমোশন, পাশপোর্ট চায়।

পূর্ণেন্দু পত্রী ঃ আগুনের কাছে আগে (প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ)

খুন হয়েছিনু বাছা চুন চেয়ে চেয়ে। **ভারতচন্দ্র রায় ঃ** অন্নদামঙ্গল

যাহা তাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৭

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্য মাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এস স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ এবার ফিরাও মোরে (চিত্রা)

রাত্রি যেমন লুকিয়ে রাখে
আলোর প্রার্থনাই—
তেমনি গভীর মোহের মাঝে
তোমায় আমি চাই।
শান্তিরে ঝড় যখন হানে
শান্তি তবু চায় সে প্রাণে,
তেমনি তোমায় আঘাত করি
তবু তোমায় চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৮৮

আমার মন বলে 'চাই, চা ই, চাই গো—যারে নাহি পাই গো'।
সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে—
'নাই, না ই নাই গো'॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তাসের দেশ

হয় বীর্যের সঙ্গে বলিতে হইবে, 'চাই', নয় বীর্যেরই সঙ্গে বলিতে হইবে 'চাই না'। 'চাই' বলিয়া কাঁদিব, অথচ লইবার শক্তি নাই—'চাই না' বলিয়া পড়িয়া থাকিব, কারণ চাহিবার উদ্যম নাই—এমন ধিক্কার বহন করিয়াও যাহারা বাঁচে, যম তাহাদিগকে নিজগুণে দয়া করিয়া না সরাইয়া লইলে তাহাদের মরণের আর উপায় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মা ভৈঃ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

আজি বিজন ঘরে নিশীথরাতে আসবে যদি শূন্য হাতে
আমি তাইতে কি ভয় মানি!
জানি জানি, বন্ধু, জানি—
তোমার আছে তো হাতখানি॥

চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোমতে,
এখন সময় হল তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

হেথা যে গান গাইতে আসা, আমার হয়নি সে গান গাওয়া—
আজও কেবলই সুর সাধা, আমার কেবল গাইতে চাওয়া॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

পান্থ তুমি, পান্থজনের সখা হে,
পথিক-চিত্তে তোমার তরী বাওয়া।
দুয়ার খুলে সমুখ-পানে যে চাহে
তার চাওয়া যে তোমার পানে চাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—৯৫

চাকরি

চাকরি করলে মনুষ্যত্বহীন হয়ে যেতে হয়, নিজের স্বাধীনতা ক্রমশ লোপ পেয়ে ভবিষ্যৎ জীবনটা অন্ধকারময় হয়ে ওঠে।

অন্নদাঠাকুর : স্বপ্নজীবন

আগের জন্মে যারা চরম পাপ করেছে, তারাই তো এজন্মে চাকরি করে।

নীললোহিত : অর্ধেক মানবী

চাকরি করা ঝকমারি—চাকরে কুকুরে সমান—হুকুম করিলেই দৌড়িতে হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র : আলালের ঘরের দুলাল

চুল চিরিয়া বিচার করেন, ওজন করিয়া কথা বলেন। চাকরির উন্নতিই তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

বনফুল : জঙ্গম (২য় অধ্যায়)

মেয়ে মানুষের সিঁথের সিঁদুর আর বেটাছেলের চাকরি একবার ঘুচলে আর সহজে জোটে?

বিমল মিত্র : কড়ি দিয়ে কিনলাম

চাঁদ

চাঁদ চকোরে অধরে অধরে
পিয়ো সুধা প্রাণ ভরে
প্রেম সোহাগে প্রেম অনুরাগে
আদরে মন চোরে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : আলিবাবা

চাঁদ নয় তো রুপোর থালা,
আকাশ জুড়ে তারার মালা!

পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় : ছড়া ছবিতে বর্ণমালা

ও চাঁদ, চোখের জলের জাগল জোয়ার দুখের পারাবারে।
হল কানায় কানায় কানাকানি এই পারে ওই পারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

চাঁদের সহিত বিরহ বাত পয়ার এবং জোয়ার-ভাঁটার একটা যোগ আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মীমাংসো (ব্যঙ্গ কৌতুক-প্রবন্ধ)

যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি।
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু সুধামুখী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হৃদয়ধর্ম (চৈতালি)

চাঁদের আলো যেন দীর্ঘ তরবারি
নেমে আসে মাথার ওপরে।

সুজিত সরকার : নিঃশেষ

চাটুকার

নিকৃষ্টের কর্তব্য, আপন অপেক্ষা প্রধান ব্যক্তিদিগের সমাদর ও মর্যাদা করে। কিন্তু কাহারও নিকট নিতান্ত নম্র অথবা চাটুকার হওয়া অনুচিত। মনুষ্যের অবস্থা যত হীন হউক না কেন, আপনার মান অপমানের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া, দাসবৎ অন্যের অনুবৃত্তি করা, কোন ক্রমেই বিধেয় নহে ; লোকে তাদৃশ পুরুষকে নিতান্ত অপদার্থ জ্ঞান করে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : নীতিবোধ

চিকিৎসক (দ্র. ডাক্তার, বৈদ্য)

চিকিৎসকের খালি রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করলেই কাজ শেষ হয়ে যায় না। রোগীর প্রতি গভীর মমত্ব ও সহানুভূতি থাকা দরকার। যখন রোগীদের চিকিৎসা করবে, তখন তাকে নিজের ভাই, বোন, পিতা বা মার তুল্য ভেবে সেই ধরনের ব্যবহার করবে। চিকিৎসকের এই মমত্বই রোগীর নিরাময়ের একটা বড় অঙ্গ।

অরুণ দত্ত : শেষ চেষ্টা

চিকিৎসকরা অন্যান্য পেশাদারদের তুলনায় সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসাবে দিনযাপন করিতে অভ্যস্ত। এই অভ্যাস ত্যাগ করার সময় আসিয়াছে। পেশাগত নিষ্ঠা, দক্ষতা ও দায়বোধের যাঁহাদের অভাব নাই, তাঁহারা দায়িত্বজ্ঞানহীন চিকিৎসককুল হইতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করুন। এখনও জনসাধারণের কাছে তাঁহাদের মর্যাদার আসন অক্ষতই রহিয়াছে।

সম্পাদকীয় (আগে নিরাময় করুন নিজেকে) : আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৮.৬.২০০২

চিকিৎসা যদি কেবল আর পাঁচটা পেশার মতোই একটা পেশা হয়, তবে যাহারা পয়সা দিয়া চিকিৎসা-পরিষেবা ক্রয় করিতেছে সেই জনসাধারণ (এ ক্ষেত্রে রোগী ও তাহার আত্মীয়স্বজন) চিকিৎসকদের কাছে পেশাদার দক্ষতা ও দায়বদ্ধতাই দাবি করিবেন এবং চিকিৎসকরাও কোনও বিশেষাধিকার কিংবা বিশেষ বাড়তি সম্মান বা মর্যাদা দাবি করিতে পারিবেন না, চিকিৎসা-বিভ্রাটের জন্য তাঁহাদের আইন অনুযায়ী খেসারত দিতে হইবে। তাহার সঙ্গে যথার্থ মর্যাদার কোনও সম্পর্ক নাই।

সম্পাদকীয় (আগে নিরাময় করুন নিজেকে) : আনন্দবাজার পত্রিকা—১৮.৬.২০০২

চিকিৎসকরা কেবল ঈশ্বরের মতো রোগীদের জীবনমৃত্যুর নিয়ামকই নন, তাঁহার মতোই দেশের আইনি ব্যবস্থার ধরা ছোঁয়ার বাহিরে, এমন একটা ধারণা জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল ছিল। নিজেদের অভ্রান্ততার তত্ত্ব প্রচার করিয়া এক শ্রেণীর চিকিৎসক সর্বদাই রোগীদের সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিতেন।....ঈশ্বরপ্রতিম অভ্রান্ততার আত্মপ্রতারণা হইতে তাঁহারা ভুল চিকিৎসায় রোগীর মৃত্যু ঘটাইবার দায়ে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদির স্তরে অবতরণ করিয়াছেন।

সম্পাদকীয় (রোগী, চিকিৎসা, আইন) : আনন্দবাজার পত্রিকা। ১.৬.২০০২

সমাজের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতা এবং নিজেদের কুলের ঐতিহ্য যেন চিকিৎসকরা বিস্মৃত না হন। কিন্তু বেদনার সঙ্গে বলতে হয়, সমাজব্যবস্থায় অর্থের ভূমিকাই প্রধান

হয়ে ওঠায় বহু ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের সেই দায়বদ্ধতা হারিয়ে যাচ্ছে।.....চিকিৎসকদের আরও মানবিক হওয়া প্রয়োজন।.....এক শ্রেণীর চিকিৎসক ক্রমশই এতটা কমার্শিয়াল হয়ে পড়ছেন যে চিকিৎসার সঙ্গে মানবিকতার দিকটি ভুলে যাচ্ছেন।

সম্পাদকীয় (চিকিৎসকের দায়বদ্ধতা) : সংবাদ প্রতিদিন ১.৬.২০০২

চিকিৎসকদের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও আস্থা কমে যাচ্ছে এর দুটি মূল কারণ আছে। প্রথমটি হল, ডাক্তারদের একাংশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জীবিকা শুরুর পূর্বে অসুস্থ মানুষকে সুস্থ করে তোলার, ব্যাধির যন্ত্রণা ও ক্লেশ লাঘব করার, নিঃস্বার্থভাবে সেবার ব্রত গ্রহণের যে শপথ গ্রহণ করেছেন তা বিস্মৃত হয়ে শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনেই মগ্ন হয়েছেন। অন্যায়, অনৈতিক অসৎ পথ ও উপায় গ্রহণে, মানুষের দুর্বলতম মুহূর্তের পূর্ণ সুযোগ নিতে তাঁরা এতটুকু দ্বিধা, বিবেকের দংশন বোধ করেন না। কার্যত তাঁরা চিকিৎসক না হয়ে অর্থ উপার্জনের যন্ত্রে পরিণত হন। এঁদের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু এঁদের জন্যেই মানুষের মনে সমগ্র চিকিৎসক সমাজের বিরুদ্ধে অনাস্থা, ক্ষোভ ও অভিযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন ঘটছে শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রের মতোই।

অন্যদিকে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মানুষের প্রলোভন ও প্ররোচনায় ডাক্তারদের বিরুদ্ধে কারণে-অকারণে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ লাভের আশায় মামলা করার প্রবণতা বাড়ছে।

নিমাইসাধন বসু : চিকিৎসা সঙ্কট—এক অশনি সংকেত (বর্তমান ৯.৯.২০০২)

রোগী রোগ হইতে মুক্ত হইলে পরে যদি চিকিৎসক বেতন চায়, তবে রোগী প্রায় সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন যে, আমি নিজে আরাম হইয়াছি ; এ বেটা অনর্থক ফাঁকি দিয়া টাকা লইতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কমলাকান্তের দপ্তর (ইউটিলিটি বা উদর দর্শন)

বৈজ্ঞানিক হত্যার নাম চিকিৎসা।

প্রমথনাথ বিশী : মৌচাকে ঢিল

চিকিৎসকের কিছু দায়বদ্ধতা থাকা দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহারা সেই দায় মানেন না। এমনকী রোগী বা তাঁহার আত্মীয়স্বজনদের চিকিৎসা সংক্রান্ত কোনও তথ্য তাঁহারা জানাইতে চাহেন না। জানিতে চাহিলে নিজেদের বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং কেহ কেহ অপরিমেয় ঔদ্ধত্যও দেখাইয়া থাকেন।

সম্পাদকীয় (রোগী, চিকিৎসা, আইন) : আনন্দবাজার পত্রিকা—১.৬.২০০২

চিকিৎসাশাস্ত্র

চিকিৎসাশাস্ত্রের মর্মকথা বলি ; রোগ আছে কিন্তু চিকিৎসা বলে কোন শাস্ত্র নেই। রোগ হলে কতক বাঁচবে কতক মরবে ; চিকিৎসাতেও কতক বাঁচবে কতক মরবে ; কাজেই চিকিৎসা শেখবার কোন দরকার দেখি না, কেবল সাহস করে গিয়ে চিকিৎসা আরম্ভ করতে হবে। তবে পারতপক্ষে ঔষধ না দেওয়াই ভাল। তাতে মরবার সম্ভাবনা বেড়ে যায় মাত্র।

প্রমথনাথ বিশী : মৌচাকে ঢিল

চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল কটি কথা মনে রাখবে। প্রথম, মানুষ অমর নয়, কাজেই মানুষ মরলে বিস্মিত না হয়ে দোষ তার ওপরে চাপিয়ে দেবে।....দ্বিতীয় রোগ হলেই মানুষ মরে না, কাজেই বেঁচে উঠলে তার সমস্ত কৃতিত্ব নিজেরা গ্রহণ করবে।....তৃতীয়, রোগের চেয়ে ওষুধেই মানুষ বেশি মরে,—এ রহস্য কারও কাছে প্রকাশ করবে

না।....রোগীর বাড়িতে গিয়ে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা না করে আগেই পারিশ্রমিক আদায় করে নেবে।.....নিজের ব্যাধি হলে কখনও চিকিৎসক ডাকবে না।

প্রমথনাথ বিশী : মৌচাকে ঢিল

চিঠি

চিঠিপত্র দুটি মনের ঘাত-প্রতিঘাত।

অন্নদাশঙ্কর রায় : সত্যাসত্য

চিঠি হল মানুষের মানসলিপি। **জরাসন্ধ** : মসিরেখা

চিঠিপত্র হল জানালার মত, খুলে দিলেই পৃথিবীর কিছুটা চোখে পড়ে।

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : পত্রলেখক রবীন্দ্রনাথ

মানব মনের দুটি আয়না—একটি চোখ, অপরটি চিঠি। মানুষের অন্তরের প্রতিচ্ছবি যেমন ধরা পড়ে চোখের আয়নায়, তেমনি লেখকের অন্তরের কথাটি প্রকাশ হয়ে পড়ে তার চিঠিতে। আত্মান্বেষণ ও আত্মোদঘাটনের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম পত্র।

নিমাইচন্দ্র পাল : ছিন্নপত্র—রবীন্দ্র জীবন কোষ

যদি কোনো লেখকের সবচেয়ে ভালো লেখা তার চিঠিতেই দেখা দেয় তা হলে এই বুঝতে হবে যে, যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে তারও একটা চিঠি লেখাবার ক্ষমতা আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইন্দিরাদেবীকে লিখিত পত্র

চিঠিপত্রে যে আমরা কেবল প্রত্যক্ষ আলাপের অভাব দূর করি তা নয়, ওর মধ্যে আরও একটু রস আছে যা প্রত্যক্ষ দেখাশোনায় নেই......চিঠিতে মানুষকে দেখবার এবং পাবার জন্য আরো একটা নতুন ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হয়েছে।....যারা চিরকাল অবিচ্ছেদে চব্বিশ ঘণ্টা কাছাকাছি আছে, যাদের মধ্যে চিঠি লেখালেখির অবসর ঘটেনি, তারা পরস্পরকে অসম্পূর্ণ করেই জানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছিন্নপত্র

চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে বকে-যাওয়া। এই বকে-যাওয়াটাই মনের জীবনের লীলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাভা-যাত্রীর পত্র—২

চিঠির সাহিত্যে ধরা দেয় লেখকের কাছ-ঘেঁষা জগতের দৈনিক ছায়া-প্রতিচ্ছায়া, ধ্বনি প্রতিধ্বনি তার ক্ষণিক হাওয়ার মর্জি ; আর তার সঙ্গে প্রধানত মিলিয়ে থাকে সদ্যপ্রত্যক্ষ সংসার পথের চলতি ঘটনা নিয়ে আলাপ প্রতিলাপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভূমিকা-পথে ও পথের প্রান্তে

সমুদ্রের দূর তীরে যে ধরণী আপনার নানা-রঙ আঁচলখানি বিছিয়ে দিয়ে পুবের দিকে মুখ করে একলা বসে আছে,.....তার কোলের উপর একখানি চিঠি খসে পড়ল কোন্ উপরের থেকে। সেই চিঠিখানি বুকের কাছে তুলে ধরে সে একমনে পড়তে বসে গেল ; তালতমালের নিবিড় বনচ্ছায়া পিছনে রইল এলিয়ে নুয়ে-পড়া মাথার থেকে ছড়িয়ে পড়া এলোচুল।

....প্রতিদিন সেই একই চিঠি।....ধরণী পাঠ করছে কত যুগ থেকে। সেই পাঠ-করাটা আমি মনে মনে চেয়ে দেখছি। সুরলোকের বাণী পৃথিবীর বুকের ভিতর দিয়ে, কণ্ঠের ভিতর দিয়ে, রূপে রূপে বিচিত্র হয়ে উঠল। বনে বনে হল গাছ, ফুলে ফুলে হল গন্ধ, প্রাণে প্রাণে হল নিশ্বসিত। একটি চিঠির সেই একটি মাত্র কথা, সেই আলো। সেই সুন্দর, সেই ভীষণ ; সেই হাসির ঝিলিক ঝিকিমিকি, সেই কান্নার কাঁপনে কুলকুল।

এই চিঠির পড়াটাই সৃষ্টির স্রোত ; যে দিচ্ছে আর যে পাচ্ছে সেই দুজনের কথা এতে মিলেছে, সেই মিলনেই রূপের ঢেউ। সেই মিলনের জায়গাটা হচ্ছে বিচ্ছেদ। কেননা, দুর-নিকটের ভেদ না ঘটলে স্রোত বয় না, চিঠি চলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য : রাণার (ছাড়পত্র)

চিড়িয়াখানা

চিড়িয়াখানার কোনো দরকার নেই। যাদের ভিতরে রাখবার, তারা বাইরে সব ছাড়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ল্যাবরেটরি—১ (তিনসঙ্গী)

চিত্ত

চিত্ত আমার হারালো আজ মেঘের মাঝখানে—
কোথায় ছুটে চলেছে সে কোথায় কে জানে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

চিত্ত পিপাসিত রে
গীতসুধার তরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিমালা

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্ত যেথা ভয়শূন্য (নৈবেদ্য)

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারততীর্থ (গীতাঞ্জলি)

চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবান দর্শন হয় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

চিত্রকল্প

ইংরেজি প্রতিশব্দ ইমেজ, 'ইমেজারি' (Imagery)। সাহিত্যে চিত্রকল্পের উদ্দেশ্য হল ভাষার মাধ্যমে কোনও বস্তু, কার্য, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় এমন কোনও অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতি, এমনকী কোনও বিমূর্ত ধারণাকে ব্যক্ত করা। প্রচলিত অর্থে চিত্রকল্পের মধ্যে দৃশ্যমান চিত্রের অর্থ নিহিত আছে, কিন্তু বহু চিত্রকল্পেই লেখক দৃশ্যমান ও অ-দৃশ্যমান দুধরনের ধারণাই প্রকাশ করতে পারেন। মূল লাতিন শব্দের অর্থ হল 'সাদৃশ্য সৃষ্টি করা'।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যের শব্দার্থকোশ

যে শব্দচিত্রের মধ্যে ইন্দ্রিয়বোধের স্বাদ ফুটে ওঠে, তারই নাম সাহিত্যের চিত্রকল্প।

'চিত্রকল্প' নামটি এই কারণে বাঞ্ছনীয় যে ওতে চোখে দেখবার দৃশ্যের সংকেত তো আছেই, তার অতিরিক্ত আরো সব ইন্দ্রিয়বোধের বৈচিত্র্য রয়েছে।

হরপ্রসাদ মিত্র : সাহিত্যের নানাকথা

চিন্তা

উচ্চ চিন্তা, উচ্চভাব নিরন্তর মনের মধ্যে মন্থন করলে ব্যক্তিত্বের উপর তার ছাপ পড়ে, ব্যক্তিত্ব পরিশুদ্ধ হয়। চিন্তাকে বৈজ্ঞানিক আর শিল্পসম্মত পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করবার চেষ্টা করলে চিন্তার শ্লথতা ও আলস্য, যুক্তির অসংগতি, চিন্তার ধোঁয়াটেপনা ইত্যাদি শতবিধ দোষ দূর হয়।

নারায়ণ চৌধুরী : লিখিয়ে ও পড়িয়ে (সাহিত্যভাবনা)

বাড়ে চিন্তা যত চিন্তা কর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—৪।৪

চিন্তার রাজ্যে যে রাজা উজীর, বাস্তবক্ষেত্রে সে প্রায় অপদার্থ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : সূত্রসন্ধান (ক্রীড়াভূমি)

চিরকাল

চিরকাল রবে মোর প্রেমের কাঙাল—
এ কথা বলিতে চাও বোলো।
এই ক্ষণটুকু হোক সেই চিরকাল ;
তার পরে যদি তুমি ভোলো
মনে করাব না আমি শপথ তোমার.....।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দায়মোচন (মহুয়া)

চিরদিন

চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়।
আজিকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (ভক্তি-গীতি)

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারি আমি
রূপের পূজারি
সারা সন্ধ্যা সারা নিশি রূপ বৃন্দাবনে বসি
হিন্দোলয়ে দোলে নারী আনন্দে নেহারি।

দেবেন্দ্রনাথ সেন : প্রকৃতি

চিরদিন বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিবার আয়োজন করিতে গেলে বস্তুত যতদিন রাখা সম্ভব হইত তাহাকেও হ্রস্ব করিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সফলতার সদুপায় (আত্মশক্তি)

আলো তার পদচিহ্ন
আকাশে না রাখে—
চলে যেতে জানে, তাই
চিরদিন থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ফুলিঙ্গ—৩৩

চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

চুরিকে লোকহিত নাম না দিলে শুনতে খারাপ লাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা—১১

চুরি বিদ্যাতে যম পাকা, দামি জিনিসের 'পরেই তার লোভ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ত্রীর পত্র (গল্পগুচ্ছ)

অনুচরগণের চুরির উচ্ছিষ্টেই তো চিরকাল বড়োঘর পালিত। চুরি করিবার চাতুরী যাহার নাই, মনিবের বিষয়রক্ষা করিবার বুদ্ধিই বা তাহার জোগাইবে কোথা হইতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হালদার গোষ্ঠী (গল্পগুচ্ছ)

চুল

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য।

জীবনানন্দ দাশ ঃ বনলতা সেন (বনলতা সেন)

তোমারি চুলের মতো ঘন কালো অন্ধকার,
তোমারি আঁখির তারকার মতো অন্ধকার ;
তবু চলে এসো ; মোর হাতে হাত দাও তোমার—
কঙ্কা, শঙ্কা করো না।

বুদ্ধদেব বসু ঃ শেষের রাত্রি

ঝড় এনেছ এলোচুলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতালি—১৬

তোমার কালোচুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

চুলের রং যেন ফিঙের পালক, চুল হবে যেন পম্পা সরোবরের ঢেউ।
.....স্নান করে......ভিজে চুল পিঠে মেলে দিয়েছে, যেন বাদল শেষের রাত্তির।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজরানী (গল্পসল্প)

এলোচুলে বহে এনেছ কী মোহে
সেদিনের পরিমল?
বকুলগন্ধে আনে বসন্ত
কবেকার সম্বল?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লীলাসঙ্গিনী (পূরবী)

চেনা

কাউকে চেনে পরশ আমার,
কাউকে চেনে ঘ্রাণ,
কাউকে চেনে বুকের রক্ত,
কাউকে চেনে প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অবারিত (খেয়া)

—আমাকে সে যে চিনেছে
তা জানলেম আমাকে লক্ষ্য করে না বলেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ক্যামেলিয়া (পুনশ্চ)

চেতনাস্রোত [চেতনাপ্রবাহ পদ্ধতি]

চেতনাস্রোত ঃ মানবমনে ইন্দ্রিয়বোধের বিস্তার, অনুভূতি বা স্মৃতির অবিরাম নিরবচ্ছিন্ন স্রোত। বিশেষ ধরনের সাহিত্যিক পদ্ধতি যেখানে কোনও চরিত্রে চেতনার অন্তপ্রক্রিয়া

বিধৃত হয়। যাতে নানা খণ্ড খণ্ড ছবি, ঘটনা, স্মৃতির টুকরো সংলগ্ন পরম্পরা ধরে নয়, অসংলগ্ন অনুষঙ্গসূত্রে মনের উপর দিয়ে অনবরত ভেসে যায়। ইংরাজিতে বলা হয় স্ট্রিম অব্ কনশাস্নেস (Stream of Consciousness)। শব্দটি অনেক সময় অন্তর্লীন স্বগতোক্তির (Interior monologue) সঙ্গে সমার্থক রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু চেতনাস্রোত হল বিষয়, অন্তর্লীন স্বগতোক্তি হল বিশেষ প্রকাশরীতি।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় : সাহিত্যের শব্দকোশ

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—৬

চেরাপুঞ্জি

চেরাপুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পার গোবি-সাহারার বুকে?

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : ঘুমের ঘোরে (মরীচিকা)

চেষ্টা

নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরশপাথরও পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অবস্থা ও ব্যবস্থা (আত্মশক্তি)

চেষ্টা করিলেই যে সকল সময়েই সিদ্ধিলাভ হয় তাহা না হইতেও পারে, কিন্তু.....চেষ্টা না করিয়া যে ব্যর্থতা তাহা পাপ, তাহা কলঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দেশনায়ক (সমূহ)

চেহারা

এ কী চেহারা। প্রচণ্ড-ঝড়ের ঝাপ্টা-খাওয়া ছেঁড়া-পাল ভাঙা-মাস্তুল জাহাজের মতো ভাবখানা ; চোখদুটো কেমনতরো, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ রোগা, কাপড় ময়লা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চতুরঙ্গ—৪

ভালো দেখতে বললে সবটা বলা হয় না। ওর চেহারায় আছে একটা কঠিন আকর্ষণশক্তি। যেন একটা বজ্র বাঁধা আছে সুদূরে ওর অন্তরে, তার গর্জন কানে আসে না, তার নিষ্ঠুর দীপ্তি মাঝে মাঝে ছুটে বেরিয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চার অধ্যায়—১

জেদালো দুষ্টমি-ভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল ঝাঁকড়ামাকড়া, কচি শামলা রং, চঞ্চল চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে। খাকি রঙের শর্ট পরা, কোমর পর্যন্ত ছাঁটা সেই রঙেরই একটা বোতাম-খোলা জামা, বুক বের করা ; শর্টের দুই-দিককার পকেট নানা বাজে সম্পত্তিতে ফুলে-ওঠা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চার অধ্যায়—২

একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুটজুতা-পরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নিচে কালি-পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা ; বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্যন্ত যেটা খুশি হইতে পারে। আর একটি বেঁটে খাটো, অত্যন্ত দাড়ি-গোঁফ-সঙ্কুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিবি, কালো-কালো, গোলগাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরকুমার সভা

তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী,......দুষ্কর্ম করিবার এই তো ঠিক উপযুক্ত চেহারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ডিটেকটিভ (গল্পগুচ্ছ)

বয়স নিতান্ত অল্প নহে, কিন্তু শক্তসমর্থ চেহারা। সামনের কিছু কিছু চুল পাকিয়াছে, কিন্তু কাঁচার অংশই বেশি।.......জরা যেন কেবলমাত্র ডিক্রী পাইয়াছে, কিন্তু দখল পাইতেছে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৌকাডুবি

ভৃত্যের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পুরাতন ভৃত্য (কাহিনী)

চেহারা দেখে বোধ হল অপ্সরী—যদিচ অপ্সরীর চেহারা কি রকম পূর্বে কখনো দেখিনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বশীকরণ (ব্যঙ্গকৌতুক)

স্বল্পজলা বৈশাখী নদীর স্রোতঃপথে মাঝে মাঝে চর পড়ে যে রকম দৃশ্য হয় তেমনি চেহারা। শিথিলবিস্তারিত দেহ, কিছু মাংসবহুল, তবু চাপা পড়েনি যৌবনের ধারাবশেষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঁশরি—১।১

রাঘুবংশিক চেহারা 'শালপ্রাংশুরমহাভুজঃ', রৌদ্রে পুড়ে ঈষৎ ম্লান গৌরবর্ণ, ভারি মুখ দাড়িগোঁফ-কামানো, চুড়িদার সাদা পায়জামা, চুড়িদার সাদা আচকান, সাদা মসলিনের পাঞ্জাবি কায়দার পাগড়ি, শুঁড়তোলা সাদা নাগরাজুতো, দেহটা যে ওজনের কণ্ঠস্বরটাও তেমনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঁশরি—১।২

দেখবামাত্র বিস্ময় লাগে। চেহারা সতেজ সবল সমুন্নত। রঙ যাকে বলে কনকগৌর, ফিকে চাঁপার মতো, কপাল নাক চিবুক যেন কুঁদে তোলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঁশরি—১।২

কী চেহারা....। যেন একতাল মাংস নিয়ে বিধাতা গড়তে শুরু করেছিলেন, শেষ করে উঠতে ফুরসত পান নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তধারা

চেহারা দেখে.....মনে হল যেন ভূমিকম্পের পরেকার আলো-নেবা চুড়ো-ভাঙা মন্দির।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ—৫১

....চেহারায় রূপের চেয়ে লাবণ্য বড়ো। কেমন করে মন টানে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবিবার (তিনসঙ্গী)

প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—৪

চৈতন্য, শ্রীচৈতন্য, চৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্য চেয়েছিলেন ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, পুরুষ-নারীর হৃদয়ধর্মে সংহত এক মানবিক সমাজসম্পর্ক : জ্ঞান ও বুদ্ধির শুষ্কতা নয়, ভক্তি ও প্রেমের সরসতা। জীবনবচর্যায় কাঠিন্য কর্কশতা নয়, স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য ; তামসিকতা নয়, সাত্ত্বিকতা ; দেহে-বেশে মালিন্যহীনতা, পরিচ্ছন্নতা ও শুচিতা ; পাণ্ডিত্যের হুংকার নয়, বৈদগ্ধ্যের নম্রতা। জীবনের সর্বস্তরে রূপরসগন্ধগানের স্পর্শ ; এমনকী নামকরণেও শ্রী ও শোভনতা : শ্রীবাসের দাসী 'দুঃখীর' নাম পালটে রেখেছিলেন 'সুখী'; 'শুহিয়া' (শুয়ে) নামের এক শিশুর নাম দিয়েছিলেন 'জয়ানন্দ', উত্তর জীবনে কবি হয়ে যিনি তাঁরই মঙ্গলগান করেছিলেন। মধ্যযুগের বাঙালির রূঢ় রুক্ষ বামাচারী চরিত্রে তিনি

লেপন করেছিলেন সদাচারের চন্দন, কর্কশ জীবনচর্যায় এনেছিলেন শ্রী ও রুচির প্রসাধন। হৃদয়ধর্মের সঙ্গে শ্রী—জাতি হিসেবে বাঙালি চরিত্রের এই প্রকৃতির নির্মাতাই শ্রীচৈতন্য। একটি সমগ্র জাতিকে তিনি, আক্ষরিক অর্থে, নাচতে ও গাইতে শিখিয়েছেন। *“নাচিতে জানি না তমুঁ/নাচিয়ে গৌরাঙ্গ বলি/গায়িতে জানিনা তুমুঁ গাই।” (পরমানন্দ)*

অবন্তীকুমার সান্যাল : শ্রীচৈতন্য এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত
(দেশ ৪.৩.২০০২)

শ্রীচৈতন্য কীর্তনের মধ্যে দিয়ে আদ্বিজচণ্ডালে নামপ্রেম প্রচার করে ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, মূর্খ-বিদ্বান, পাপী-পুণ্যবান—সকলকে এক অখণ্ড ভাবৈক্যসূত্রে বেঁধেছেন। তাঁর প্রধান শিক্ষা—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র আরাধ্য। তাঁর আরাধনায় জাতিকুলাদির কোনও বিচার নেই—“শ্রীকৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার”। জীবমাত্রেই কৃষ্ণদাস। ফলে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে সকল মানুষই পরস্পরের আত্মার আত্মীয়। আর কৃষ্ণভজনার সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে তাঁর নামকীর্তন। এই নামের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সর্বশক্তি সঞ্চার করেছেন। স্বরচিত ‘শিক্ষাষ্টক’-এর শ্লোকে শ্রীচৈতন্য বলেছেন—নামের স্মরণে কোনও নিয়মিত কাল নেই ; ‘নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ’। তাই শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, কর্মকালে, কর্ম-অবসরে, সর্বদা হরিনাম কীর্তনীয়—‘কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ’।

কাননবিহারী গোস্বামী : দেশ ৪-৩.২০০২

পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ভক্তির আচার্যদের অন্যতম—শ্রীচৈতন্য, প্রেমে পাগল চৈতন্য।....তাঁর সম্প্রদায়ের এখন অত্যন্ত অবনতি হয়েছে....তথাপি তাঁর সম্প্রদায় দরিদ্র, নিপীড়িত, দুর্বল, জাতিচ্যুত, পতিত, সমাজে পরিত্যক্ত সমস্ত মানুষেরই আশ্রয়স্থল।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—৮

শ্রীচৈতন্যদেব মহাত্যাগী পুরুষ ছিলেন।.....আর তিনি যে প্রেমের ভাব নিজের জীবনে দেখালেন তা স্বার্থশূন্য কামগন্ধহীন প্রেম।.......কাম থাকতে প্রেম হয় না—এক বিন্দু থাকতেও হয় না। মহাত্যাগী, মহাবীর পুরুষ ভিন্ন ও প্রেমের অধিকারী কেউ নয়।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী—৯

চৈতন্য-জীবন বাঙালীর হৃৎপদ্মের শতদলরূপী পূর্ণবিকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে শতধা-বিচ্ছিন্ন বাংলার বহু চেষ্টিত মিলন-চর্যা সার্থক পরিণাম লাভ করেছে।......যে নবজাগ্রত জাতীয় চৈতন্যের উৎসমুখে সমগ্র মধ্যযুগীয় প্রাণ-প্রবাহ স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ লাভ করেছিল,—এই যুগের মিলনানন্দময় সাহিত্যিক অভ্যুদয় যে-বিকাশের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি,—চৈতন্যদেব ছিলেন সেই নবোদ্ভূত সার্বিক জাতীয় চৈতন্যের অধিদেবতা।

ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (১ম)

চৈত্র

বর্ষ তখনো হয় নাই শেষ
এসেছে চৈত্র-সন্ধ্যা।
বাতাস হয়েছে উতলা আকুল
পথতরুশাখে ধরেছে মুকুল
রাজার কাননে ফুটেছে বকুল
পারুল রজনীগন্ধা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অভিসার (কথা)

কার যেন এই মনের বেদন
চৈত্র মাসের উতল হাওয়ায়,
ঝুমকো-লতার চিকন পাতা
কাঁপে রে কার চম্‌কে-চাওয়ায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান।

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায়—২

ফাল্গুনের অতিতৃপ্তি ক্লান্ত হয়ে যায়,
চৈত্রে সে বিরলরসে নিবিড়তা পায়,
.....প্রৌঢ় যৌবনের পূর্ণ পর্যাপ্ত মহিমা
লাভ করে গৌরবের সীমা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নামকরণ (আকাশপ্রদীপ)

চৈত্র যে যায় পত্রঝরা,
গাছের তলায় আঁচল বিছায়
ক্লান্তি-অলস বসুন্ধরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষমধু (মহুয়া)

চৈত্রমাস ঠেকল এসে শেষ হপ্তায়।
আকাশে-ভাসা বসন্তের নৌকায়।
পাল পড়েছে ঢিলে হয়ে।
দূর্বাঘাস উপবাসে শীর্ণ ;
....মৌসুমি চারায়
ফুলগুলি রং হারিয়ে সংকুচিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষসপ্তক—এগারো

চৈত্রের সেতারে বাজে
বসন্ত বাহার,
বাতাসে বাতাসে উঠে
তরঙ্গ তাহার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—৮৬

চোখ

'চোখ গেল চোখ গেল' কেন ডাকিস রে
'চোখ গেল' পাখি (রে)।
তোর ও চোখে কাহার চোখ পড়েছে নাকি রে
'চোখ গেল' পাখি রে॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ লোকগীতি (বুলবুল)

চোখে যার চোখ পড়ে তার ওষুধ নাইরে—তার ওষুধ নাই।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ লোকগীতি (বুলবুল)

এই চোখ
তুমি ছাড়া কিছুই দেখে না তাই
তোমায় দিলাম।

মৃণাল বসুচৌধুরী : প্রেমের কবিতা

চোখ যে ওদের ছুটে চলে গো—
ধানের বাটে মানের বাটে
রূপের হাটে দলে দলে গো॥
দেখব বলে করেছে পণ,
দেখবে কারে জানে না মন—
প্রেমের দেখা দেখে যখন
চোখ ভেসে যায় চোখের জলে গো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন। প্রস্তাবন

চোখে.....অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন রৌদ্র ঠিকরে পড়ল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উপসংহার (লিপিকা)

দুষ্টু চোখদুটো
যেন কালো আগুনের ফিনকি-ছড়ানো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্যামলী। কণিকা

সঞ্চিত হয়ে আছে এই চোখে
কত কালে কালে কত লোকে লোকে
কত নব নব আলোকে আলোকে
অরূপের কত রূপদরশন.
কত যুগে যুগে কেহ নাহি জানে
ভরিয়া ভরিয়া উঠেছে পরানে
কত সুখে দুখে, কত প্রেমে গানে
অমৃতের কত রসবরষন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—২১

নির্মল নীল আকাশের নীচে দিনগুলি যেন কাহার চোখের উন্মীলিত দৃষ্টি এবং রাতগুলি যেন কাহার চোখের আনত পল্লবের লজ্জাজড়িত ছায়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা—২১ পরিঃ

সরল বিশ্বাসের কী স্নিগ্ধসুধা ভোর-বেলাকার শুকতারার আলোটির মতো তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে। বিমলার আত্মকথা

ক্লান্ত গোরুর মতো ধৈর্যভারপূর্ণ চোখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে। নিখিলেশের আত্মকথা

কালপুরুষের নক্ষত্রের মতো......উজ্জ্বল দুই চোখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে। বিমলার আত্মকথা

তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন-আকাশের তৃষ্ণার মতো জ্বলে উঠতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে। বিমলার আত্মকথা

চোখ দুটো যেন পথ-হারানো তারার মতো অসীমের দিকে তাকিয়ে, যেন কিসের সন্ধানে কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীরে হাজার হাজার বৎসর ধরে এই রকম করে তাকিয়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে। বিমলার আত্মকথা

ড্যাবা ড্যাবা চোখদুটো দূরের থেকে লালায়িত স্পর্শে যেন আমার অপমান করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চার অধ্যায়—২

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চার অধ্যায়—২

বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পতিতা (কাহিনী)

কালো চোখের উপর একটা কিসের ছায়া আরও ঘন কালো হয়ে নেমে এল—ঘুমের উপর যেন স্বপ্ন, দিগন্তে যেন প্রথম শ্রাবণের সঞ্চার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরীর পরিচয় (লিপিকা)

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক।
দেবে লিখে রাজার টিকে প্রসন্ন ঐ চোখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রজাপতির নির্বন্ধ

তার বড়ো বড়ো দুটি কালো চোখ আজ অচঞ্চল, তমালে ডালে বৃষ্টির দিনে ডানা-ভেজা পাখির মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাণী (লিপিকা)

তড়িৎশিখা ক্ষণিক দীপ্তালোকে
হানতেছিল চমক তোমার চোখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভর্ৎসনা (ক্ষণিকা)

ঘন ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ কালো চোখ কাউকে যেন সামনে থেকে দেখে না, অল্প একটু দেখে সমস্তটা দেখে নেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ—২৯

রমণীর চোখ পতঙ্গের মতো—আভরণের দীপ্তিতে সকলের আগে ছুটে এসে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা—১৫

হঠাৎ তোমার চোখে দেখিয়াছি সন্ধ্যালোকে আমার সময় আর নাহি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ কাণ্ড (পূরবী)

জীবনের আদ্যলীলায়.....কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধখোলা একটা ছুরির ঝলক আনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১৪

চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারা-সম
চিরপরিচয়-ভরা ঐ কালো চোখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

ঘন ভুরু দুটোর নিচে চোখদুটো যেন মন্ত্রে থেমে যাওয়া দুটো বুলেটের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—১২

চোখের চাওয়ার হাওয়ায় দোলায় মন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান। "কার চোখের চাওয়ায়"

চোখের জল

কার চোখে কত জল
কেবা তা মাপে?

প্রেমেন্দ্র মিত্র : জং

তিনি চোখের জল মোছান কিন্তু চোখের জল ঘোচান না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন

চোখের জলে কি সেই অমৃত নেই যাতে এক নিমেষের চাউনিকে চিরকাল বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একটি চাউনি (লিপিকা)

চোখের জল বয়ে যাক্ না। মুক্তিপথের ধুলো ওই জলে মরবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটীর পূজা—১

তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রশ্ন (লিপিকা)

ঝাউগাছের বীথিকার ভিতর দিয়ে কোথা থেকে এই একটা নদীর স্রোত চলে আসছে, এ যেন কোন্ দুপুররাতের চোখের জল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী

চোর

খাইতে পাইলে কে চোর হয়?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিড়াল (কমলাকান্ত)

চুরি হয়ে গেছে রাজকোষে,
চোর চাই যে-করেই হোক।
হোক-না সে যেই-কোন লোক, চোর চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্যামা

ছড়া

ছড়ার মধ্যে যে মিল ফুটিয়া উঠে তাহা সুরের মিল, ভাবের মিল নহে। ছড়ার জগতে শিশু ছন্দের পক্ষীরাজের উপর চড়িয়া তাহার এলোমেলো খেয়াল ও খুশীর জগতে ঘুরিয়া বেড়ায়। সেখানকার রাস্তাঘাটগুলি অচেনা ও অনির্দিষ্ট, কিন্তু পক্ষীরাজের চলা থামে না, টগবগ করিয়া সে ক্রমাগত ছুটিয়া চলে। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'বালক নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না—সে সম্প্রতিমাত্র নিয়মহীন ইচ্ছানন্দময় স্বর্গলোক হইতে নামিয়া আসিয়াছে। আমাদের মতো সুদীর্ঘকাল নিয়মের দাসত্বে অভ্যস্ত হয় নাই, এইজন্য সে ক্ষুদ্র শক্তি অনুসারে সমুদ্রতীরে বালির ঘর এবং মনের মধ্যে ছড়ার ছবি স্বেচ্ছামত রচনা করিয়া মর্তলোকে দেবতার জগৎলীলার অনুকরণ করে'।

অজিতকুমার ঘোষ : বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা

ছড়া যদি কৃত্রিম হয় তবে তা ছড়াই নয়, তা হালকা চালের পদ্য। তাতে বাহাদুরি থাকতে পারে, কারিগরি থাকতে পারে, কিন্তু তা আবহমানকাল প্রচলিত খাঁটি দেশজ ছড়ার সঙ্গে মিশ খায় না।

অন্নদাশঙ্কর রায় : ছড়াসমগ্র

আমাদের সাবেক কালের ছড়া ছিল মৌখিক ঐতিহ্যের। মুখে মুখে কাটা হতো, কানে শুনে মনে রাখা হতো। কাগজ কলম নিয়ে মাথা খাটিয়ে বানানো হতো না। ঠাকুমা দিদিমা মাসীপিসীর বা চাষাভুষার অশিক্ষিত মুখের ছড়া এক জিনিষ আর চালাক

চতুর সেয়ানা লেখকের পাকা হাতের ছড়া আর এক জিনিষ।.....তা আবহমানকাল প্রচলিত খাঁটি দেশজ ছড়ার সঙ্গে মিশ খায় না।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ ছড়া সমগ্র

ছড়া হয় আকস্মিক, ইররেগুলার। সেখানে আর্ট আছে, আর্টিফিসিয়ালিটির স্থান নেই। ছড়া হবে ইররেগুলার, হয়ত একটু আন্‌ইভেন। বাকপটুতা, কারিকুরি নয়।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ ছড়া সমগ্র

এটা তো আত্মস্বাতন্ত্র্যের যুগ। চেহারায় পোষাক আচরণে সকলে প্রায় একরকম হলেও শিল্পে সাহিত্যে প্রত্যেকে নিজস্বতায় বিশ্বাসী। তাই আধুনিক ছড়ায় লোকছড়ার কালেকটিভ সেন্সটা আর নেই। আজ প্রত্যেকের লেখার একটা নিজস্ব ঢং এসেছে।.....তবে সব ছড়াই তো আর ছড়া নয়। বেশীর ভাগই পদ্য।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ ছড়া সমগ্র

ছড়া আর কবিতায়
নেই কোনো দ্বন্দ্ব
ছড়ায় ছন্দ বড়
কবিতায় ধন্দ।
ছড়া যায় ছড়িয়ে
হৃদয়কে নড়িয়ে
কবিতায় খুঁজে পাই
মননের গন্ধ।

অশোক রায়চৌধুরী ঃ ছন্দের ডানা মেলে

ছড়ার মধ্যে একটি চিরত্ব আছে। কোনোটির কোনো কালে কোনো রচয়িতা ছিল বলিয়া পরিচয় মাত্র নাই এবং কোন্ শকের কোন্ তারিখে কোন্‌টা রচিত হইয়াছিল এমন প্রশ্নও কাহারও মনে উদয় হয় না। এই স্বাভাবিক চিরত্বগুণে ইহারা আজ রচিত হইলেও পুরাতন এবং সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও নূতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছেলেভুলানো ছড়া (লোকসাহিত্য)

ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত-পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো।.....ইহারা আপনি জন্মিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছেলেভুলানো ছড়া (লোকসাহিত্য)

আমি ছড়াকে মেঘের সহিত তুলনা করিয়াছি। উভয়েই পরিবর্তনশীল। বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান।—দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহির। মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানব জগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে। লঘুকায় বন্ধনহীন মেঘ আপন লঘুত্ব এবং বন্ধনহীনতা-গুণেই জগদব্যাপী হিতসাধনে স্বভাবতই উপযোগী হইয়া উঠিতেছে, এবং ছড়াগুলিও ভারহীনতা অর্থবন্ধনশূন্যতা এবং চিত্রবৈচিত্র্য-বশতই চিরকাল ধরিয়া শিশুদের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছে—শিশুমনোবিজ্ঞানের কোনো সূত্র সম্মুখে ধরিয়া রচিত হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছেলেভুলোনো ছড়া (লোকসাহিত্য)

ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে.....একটি আদিম সৌকুমার্য আছে ; সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তি সংগতিহীন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছেলেভুলানো ছড়া (লোকসাহিত্য)

ছেলেভোলাবার ছড়া শুনলে একটা কথা স্পষ্ট বোঝা যায়, এতে অর্থের সংগতির দিকে একটুও দৃষ্টি নেই, দৃষ্টি দেবার দরকার বোধ করা হয় নি। যুক্তি বাঁধন-ছেঁড়া ছবিগুলো ছন্দের ঢেউয়ের উপর টগ্‌বগ্ করে ভেসে উঠছে, ভেসে যাচ্ছে। স্বপ্নের মতো একটা আকস্মিক ছবি আর-একটা ছবিকে জুটিয়ে আনছে। একটা শব্দের অনুপ্রাসে হোক বা আর-কোনো অনির্দিষ্ট কারণে হোক, আর-একটা শব্দ রবাহূত এসে পড়ছে। আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে অবচেতন চিত্তের এই সমস্ত স্বপ্নের লীলাকে স্থান দেবার একটা প্রেরণা দেখা যায়। আধুনিক মনস্তত্ত্বে মগ্নচৈতন্যের সক্রিয়তার উপর বিশেষ দৃষ্টি পড়েছে। চৈতন্যের সতর্কতা থেকে মুক্তি দিয়ে স্বপ্নলোকের অসংলগ্ন স্বতঃসৃষ্টিকে কাব্যে উদ্ধার করে আনবার একটা প্রয়াস দেখতে পাই।

সুদুর কাল থেকে আজ পর্যন্ত এই কাব্য যারা আউড়িয়েছে এবং যারা শুনেছে তারা একটা অর্থের অতীত রস পেয়েছে ; ছন্দতে ছবিতে মিলে একটা মোহ এনেছে তাদের মনের মধ্যে। সেইজন্যে অনেক নামজাদা কবিতার চেয়ে এর আয়ু বেড়ে চলেছে। এর ছন্দের চাকা ঘুরে চলেছে বহু শতাব্দীর রাস্তা পেরিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলা ভাষা পরিচয়

গড়িয়ে গড়িয়ে
আকাশ থেকে পড়ল ছড়া
  মাটির উপর ছড়িয়ে।
চাঁদ সুরুজের আলো মাখা
  ফুলের গন্ধ ভরা
মায়ের বুকের ভালোবাসায়
  স্বপন দিয়ে গড়া।

সুফিয়া কামাল ঃ ছড়ার ছড়া

ছন্দ

ছন্দ হল ভাষার ধ্বনি ও নৈঃশব্দ্যের উচ্চারণ আর বিরামের সুশৃঙ্খল ও আবর্তনময় বিন্যাস।

পবিত্র সরকার ঃ ছন্দতত্ত্ব ছন্দরূপ

ছন্দ মানেই গতি এবং গতি মানেই জীবন। নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহ, চন্দ্র-সূর্য, অর্থাৎ গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটাই যে এই ছন্দে অবিরাম আবর্তমান। মানুষ যে কোন আদি যুগ থেকে এই ছন্দের খেলা খেলছে তার কি কোনো হিসেব আছে! নাচের ভঙ্গি, গানের ছন্দ, কথার ছন্দ, রেখার ছন্দ—এসব নিয়েই তো চিরকাল খেলছে মানুষ। এই খেলা কি কোনোদিন থেমেছে, না থামবে! তাছাড়া, স্ত্রীজাতিকে তো শুধু বিষয়বস্তুরূপেই জানি না। তার বাইরে বিচিত্র রসের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার হিসেবেও পাই। ছন্দ তো এই রসভাণ্ডারের প্রধান উপকরণ। পুরুষের প্রাণকম্পন কি এই রসানুভূতির ওপরই নির্ভরশীল নয়। এবং এই কম্পন যে বিশ্বব্যাপী প্রাণকম্পনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ তাতে আর সন্দেহ কি?

পরিতোষ সেন ঃ ছন্দপাগল (আমসুন্দরী ও অন্যান্য রচনা)

লতাই হোক আর স্ত্রী-অঙ্গই হোক, ফুলই হোক আর পাখির ডানাই হোক, জলই

হোক আর মেঘই হোক—যেদিকে দৃষ্টি যায় সেদিকেই ছন্দের এই লীলাময়ী, মায়াময়ী রূপ। তাই তো বলি, প্রাণের সঙ্গে ছন্দেরও এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। রক্তের সঙ্গে নাড়ির যেমন, গাছের সঙ্গে আলোর যেমন, মাছের সঙ্গে সরোবরের যেমন, ফুলের সঙ্গে রেণুর যেমন, এও তেমনি। ছন্দ ছাড়া যেমন কাব্য নেই, বাদ্য ছাড়া যেমন নৃত্য নেই, রঙ ছাড়া যেমন ছবি নেই, তেমনি ছন্দ ছাড়া জীবন নেই।

পরিতোষ সেন ঃ ছন্দপাগল (আমসুন্দরী ও অন্যান্য রচনা)

অধরা মাধুরী ধরেছি ছন্দোবন্ধনে
ও যে সুদূর রাতের পাখি
গাহে সুদূর রাতের গান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

কাব্যের লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়কে অতিক্রম করা ; সেই বিষয়ের চেয়ে বেশিটুকুই হচ্ছে অনির্বচনীয়। ছন্দের গতি কথার মধ্য থেকে সেই অনির্বচনীয়কে জাগিয়ে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছন্দের অর্থ (ছন্দ)

কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছন্দের অর্থ (ছন্দ)

চলতি ভাষায় আমরা বলি কথাকে ছন্দে বাঁধা। বাঁধা বটে, কিন্তু সে বাঁধন বাইরে রূপের দিকে ; ভাবের দিকে মুক্তি। যেমন সেতারে তার বাঁধা, এর থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ সেই সেতারের বাধা তার, সুরের বেগে কথাকে অন্তরে দেয় মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছন্দ (গদ্যছন্দ)

ছন্দের প্রথম উল্লাস মানুষের বাক্যহীন দেহেই। তারপরে দেহের ইশারা মেলে ভাষার ইশারায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছন্দের প্রকৃতি (ছন্দ)

ছন্দের বৈচিত্র্যই রূপের বৈচিত্র্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলা ভাষা পরিচয় (১১)

মেঘদূতের কথা ভেবে দেখো। মনিব একজন চাকরকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে, গদ্যে এই খবরের মতো এমন খবর তো সর্বদা শুনছি। কেবল তফাত এই যে, রামগিরি অলকার বদলে হয়তো আমরা আধুনিক রামপুরহাট হাটখোলার নাম পাচ্ছি। কিন্তু মেঘদূত কেন লোকে বছর বছর ধরে পড়ছে।......কারণ.......ছন্দোময় চলমানতার মধ্যেই সত্যের আনন্দ রূপ। আর্টে কাব্যে গানে প্রকাশের সেই আনন্দমূর্তি ছন্দের দ্বারা ব্যক্ত হয়।.....ছন্দ মানুষের শুধু খেয়ালের নয়, প্রয়োজনের একটা বড়ো সৃষ্টি ; ছন্দ তার সংস্কৃতির ধাত্রী, ছন্দ তার স্মৃতির ভাণ্ডারী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলা ভাষা পরিচয় (১১)

ছবি

আকাশ যেমন রঙের ইঙ্গিতে ভাব ব্যক্ত করে ছবিও কতকটা তাই।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিল্পায়ন

শব্দের সঙ্গে রূপ দিয়ে জড়িয়ে বাক্য হল উচ্চারিত ছবি। তেমনি চিত্র হল রূপ-রঙ, ভাব-ভঙ্গী ইত্যাদি নিয়ে চিত্রিত কথা।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিল্পায়ন

হকুসাই বলত, যে চলতে পারে না, সে দৌড়বে কী! যে দৌড়তে পারে না, সে নাচবে কী। ড্রইং হল ছবি আঁকার চলার মত, আঙ্গিকনৈপুণ্য হল দৌড়নো আর সার্থক ছবি হল নাচ—অর্থাৎ রূপ ও রসের সর্বাঙ্গসুন্দর ছন্দ।

নন্দলাল বসু ঃ শিল্পীর মন শিল্পীর চোখ—কানাই সামন্ত

তুমি কি কেবলই ছবি শুধু পটে লিখা।
কবির অন্তরে তুমি কবি।
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—৬

আলোকের স্মৃতি ছায়া বুকে করে রাখে, ছবি বলি তাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

ফটোগ্রাফের মধ্যে সব আছে, কিন্তু আর্টিস্টের ছবির মধ্যে সব নেই;.........তাতে যে ফাঁকা থাকে সেইখানে রসজ্ঞের মন কাজ করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি-৩০.৯.১৯২৪

ছবি বলতে আমি কী বুঝি.....। মোহের কুয়াশায়, অভ্যাসের আবরণে, সমস্ত মন দিয়ে জগৎটাকে "আছে" বলে অভ্যর্থনা করে নেবার আমরা না পাই অবকাশ, না পাই শক্তি। সেইজন্যে জীবনের অধিকাংশ সময়ই আমরা নিখিলকে পাশ কাটিয়েই চলেছি। সত্তার বিশুদ্ধ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েই মারা গেলুম।

ছবি, পাশ কাটিয়ে যেতে আমাদের নিষেধ করে। যদি সে জোর গলায় বলতে পারে "চেয়ে দেখো", তাহলেই মন স্বপ্ন থেকে সত্যের মধ্যে জেগে ওঠে। কেননা, যা আছে তাই সৎ ; যেখানেই সমস্ত মন দিয়ে তাকে অনুভব করি সেইখানেই সত্যের স্পর্শ পাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—১৫.২.১৯২৫

অনেক খবর করে রাজা আপন ছবি আঁকায়,
তার পানে কি রসিক লোকে কেউ কখনো তাকায়?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবি-আঁকিয়ে (ছড়ার ছবি)

রং আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দেশই ছবির প্রধান জিনিষ। অনির্দিষ্টতা গানে আছে, গল্পে আছে, কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।.....চিত্রের প্রধান কাজই চিৎকে দিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্বচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অন্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশ্য তবেই দৃশ্যে আপনার প্রতিরূপ দেখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা Photography হতে পারে, কিন্তু সে কি ছবি হবে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্য ও নীতি (সাহিত্য)

ছবির কাজ হচ্ছে সার্থক দেখা দেখানো ; যারা নিরর্থক অধিক দেখে তারা বস্তু দেখে বেশি, ছবি দেখে কম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্যের পথে—কবির অভিভাষণ

ছলনা

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায়
তাই ভাবি মনে।

মধুসূদন দত্ত : আত্মবিলাপ

বুঝি গো আমি বুঝি গো তব
ছলনা—
যে কথা তুমি বলিতে চাও
সে কথা তুমি বল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ—৪

কী করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়া প্রবাসে ভ্রমিলি পথ হারাইলি গহনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়—মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দৃষ্টিদান

সুখ গেছে, আছে সুখের ছলনা
হৃদয়ে তোর।
প্রেম গেছে, শুধু আছে প্রাণপণ
মিছে আদর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভুলভাঙ্গা (মানসী)

ছাই

সকল জ্বালার সুব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : বহ্নিস্তুতি (মরীচিকা)

ছাগল

রসভরা রসময় রসের ছাগল।
তোমার কারণে আমি হয়েছি পাগল॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : পাঁঠা

ছাতা/ছাতি

ছিলে কি আর শুধুই ছাতি, তুমিই ছিলে ছড়ি,
গ্রীষ্মকালে ঘাম মুছেছি তোমায় রুমাল করি।
হাত চলে না পিঠে যেথায়, চুলকে দিতে তুমিই সেথায়,
তোমায় দিয়ে আম পেড়েছি পাঁচিল 'পরে চড়ি।

কালিদাস রায় : ছত্র বিয়োগ

পেটের উপর বুকের বসতি, বুকের উপর মাথা,
তাহারও উপর সুখের বসতিঁ, মাথার উপর ছাতা।.....
রোদে আর জলে, খরা কি বাদলে, সমান সাথের সাথী।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : ছাতার কথা (মরুমায়া)

ছাত্র

এ জীবন ভেঙে পড়ে শ্যামল সরস করে
ছাত্রধারা বয়ে চলে যায়,

ফেনিলতা উচ্ছলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা,
উত্তালতা সকলি মিলায়।

কালিদাস রায় ঃ ছাত্রধারা

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল।
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান,
ঊর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল।
আমরা ছাত্রদল।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ছাত্রদলের গান

আমরা ধরি মৃত্যু-রাজার
যজ্ঞ-ঘোড়ার রাশ।
মোদের মৃত্যু লেখে মোদের
জীবন-ইতিহাস।
হাসির দেশে আমরা আনি
সর্বনাশী চোখের জল।
আমরা ছাত্রদল॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ছাত্রদলের গান

ছাত্রের........প্রতিভার যাতে বিকাশ হয় শিক্ষকদের তাই করা চাই। ইউনিভার্সিটির বাঁধা বই পড়লে বা গোটাকতক পাশ করলে প্রতিভার বিকাশ হয় না।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

বস্তুর মর্মে যে সত্য নিহিত আছে, সেই সত্যের দ্বারে তো আমরা ছাত্রদের পৌঁছে দিতে পারিনি। তাই তাদের মনও আমরা পাইনি, ফলে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে শ্রমিক ও কারখানার কর্তাদের সম্পর্কের মত। পদে পদেই তাই ছাত্ররা আজ বিদ্রোহ করে।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঃ শিশু ও বিজ্ঞান

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,
সবার আমি ছাত্র,
নানান ভাবের নতুন জিনিষ
শিখছি দিবারাত্র ;
এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়
পাঠ্য যে-সব পাতায় পাতায়
শিখছি সে-সব কৌতূহলে
সন্দেহ নাই মাত্র।

সুনির্মল বসু ঃ সবার আমি ছাত্র

ছাত্রজীবনের উদ্দেশ্যে শুধু পরীক্ষা পাশ ও স্বর্ণপদক লাভ নহে—দেশসেবার জন্য প্রাণের সম্পদ ও যোগ্যতা অর্জন করা।

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ ছাত্র-যুব আন্দোলন (নেতাজীর বাণী)

ছাত্রদের ভিতর থেকেই জন্ম নেয় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ এবং রাজনীতিক।.....চরিত্র এবং পৌরুষের বিকাশের জন্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণ প্রয়োজন।

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ পাঞ্জাব এবং বাংলা, ছাত্র এবং রাজনীতি

ছাদ

ছাদে যেওনাকো, সেখানে আকাশ অনেক বড়,
সীমানাহীন।
তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা,—স্বপন সব
হবে বিলীন।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ ছাদে যেওনাকো

ছায়া

ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি আছে আমাদের পাড়াখানি দিঘি তার মাঝখানটি তালগাছ তারি চারিভিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আমাদের পাড়া

ছায়া ঘনাইছে বনে বনে, গগনে গগনে ডাকে দেয়া।
কবে নবঘন-বরিষণে গোপনে গোপনে এলি কেয়া॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা ১

রহিয়া রহিয়া বিপুল মেঘের 'পরে
নব তৃণদলে বাদলের ছায়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি ৯৯

আজগুবি নয়, আজগুবি নয়, সত্যিকারের কথা—
ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হল ব্যথা!
ছায়া ধরার ব্যবসা করি তাও জানোনা বুঝি?
রোদের ছায়া, চাঁদের ছায়া, হরেকরকম পুঁজি!

সুকুমার রায় ঃ ছায়াবাজি

নিমের ছায়া ঝিঙের ছায়া তিক্ত ছায়ার পাক,
যেই খাবে ভাই অঘোর ঘুমে ডাকবে তাহার নাক।
চাঁদের আলোয় পেঁপের ছায়া ধরতে যদি পারো,
শুঁকলে পরে সর্দিকাশি থাকবে না আর কারো।

সুকুমার রায় ঃ ছায়াবাজি

ছুটি

ভারতবর্ষ বৈচিত্র্যময় দেশ, বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ, বস্তুত পার্বণের সংখ্যা তেরোয় থামিয়া নাই, ধর্মীয় এবং ধর্মনিরপেক্ষ পার্বণের পর পার্বণ সৃষ্টি হইতেছে, তবে শেষ অবধি এই সকল বহুমুখী ধারা আসিয়া মিলিয়া যায় একটি মহাসমুদ্রে, তাহার নাম ছুটির সমুদ্র। সম্বৎসর রকমারি উপলক্ষে ছুটি পালন করা এই জাতির ধর্মে পরিণত হইয়াছে।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ সম্পাদকীয় (১৪.৪.২০০৩)

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হাহা, হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। আহা, হাহা, হা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেফালি

যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা

ছেলে

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ হইতে হবে'—এই যার পণ।

কুসুমকুমারী দাসী : আদর্শ ছেলে

ছেলেকে সৎ করিতে হইলে, আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত।

প্যারীচাঁদ মিত্র (আলাল) : আলালের ঘরের দুলাল

ছেলেবেলা

জগতে সর্বস্তরের মানুষের জীবনে সঞ্চিত হয়ে থাকে একটি অক্ষয় ও অমূল্য সম্পদ—সেটি তার ছেলেবেলার স্মৃতি। জীবন প্রারম্ভের জমা এই তোষাখানায় রূপ ও পরিচিত প্রত্যেক মানুষের নিজের মতন স্বতন্ত্র। এই তোষাখানায় স্বেচ্ছাধীন প্রবেশ ও নিরীক্ষণ একমাত্র এর মালিকই করতে পারে অহরহ, তার জীবনের শেষক্ষণ পর্যন্ত।

চিন্তামণি কর : আমার ছেলেবেলা (আনন্দবাজার পত্রিকা—৪.৫.১৯৮৬)

ছেলেবেলা কত দূর? প্রৌঢ়ত্ব যেখান থেকে শুরু সেখান থেকে যতটা, বার্ধক্যের সীমানা থেকে তা কি অনেক দূর আর ঝাপসা? তাই তো হওয়া উচিত।....কিন্তু মজার কথা এই যে, বয়স বাড়ার সঙ্গে জীবনের দিনগুলো পেরিয়ে যাওয়া যেন চলন্ত ট্রেনের কামরায় বসে জানলা দিয়ে বাইরে চেয়ে থাকার মত।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : আমার ছেলেবেলা

ছেলেবেলা একেবারে যায় না। শুধু মনে নয়, শরীরেও থেকে যায়। বাধর্ক্যকে তো এমনি এমনি দ্বিতীয় শৈশব বলে না।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : আমার ছেলেবেলা (আনন্দবাজার পত্রিকা—৫.১.১৯৮৬)

ছোট

জীবন এত ছোট কেনে?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কবি

ছোটলোক

জজ-সাহেবের আদালত থেকে মা চণ্ডীর মন্দির পর্যন্ত ছোটলোকের কথা বিশ্বাস করবার তো কেউ নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দেনাপাওনা

ছোটগল্প

ছোটগল্প হচ্ছে প্রতীতি (Impression)-জাত একটি সংক্ষিপ্ত গদ্য-কাহিনী যার একতম বক্তব্য কোনো ঘটনা বা কোনো পরিবেশ বা কোনো মানসিকতাকে অবলম্বন করে ঐক্য-সংকটের মধ্য দিয়ে সমগ্রতা লাভ করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্যে ছোটগল্প

ছোটোগল্প প্রথমত ছোটো হওয়া চাই, তার পর তা গল্প হওয়া চাই।

প্রমথ চৌধুরী : ছোটোগল্প

ছোটগল্পে পূর্ণ চাঁদের আলোক-দোলায় নিজের অফুরন্ত রূপকে যেন বিস্মিত করে দেখেন জীবন-শিল্পী পদ্মদীঘির ফটিক-জলে। পূর্ণিমা নিশীথের গভীর নিস্তব্ধতায় জলের তলায় দুটি পা ছড়িয়ে ঘাটের ওপরে এসে বসে সারাদিনের বিস্রস্তি-ক্লান্ত

তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে।
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে।

জীবনানন্দ দাশ ঃ হায় চিল (বনলতা সেন)

সঙ্গীবিহীন চিল উড়ে যায় ডাকি
নীল অদৃশ্যপানে ;
আকাশপ্রিয় পাখি........................।
স্তব্ধ ডানা প্রখর আলোর বুকে
যেন সে কোন্ যোগীর ধেয়ান মুক্তি-অভিমুখে।
তীক্ষ্ণ তীব্র সুর
সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্ম হয়ে দূরের হতে দূর
ভেদ করে যায় চলে।
বৈরাগী ওই পাখির ভাষা মন কাঁপিয়ে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছড়ার ছবি—আকাশ

ফুটপাতে এক মরা চিল!
চমকে উঠলাম ওর করুণ বীভৎস মূর্তি দেখে।
অনেক উঁচু থেকে যে এই পৃথিবীটাকে দেখেছে
লুণ্ঠনের অবাধ উপনিবেশ ;
যার শ্যেন দৃষ্টিতে কেবল ছিল
তীব্র লোভ আর ছোঁ মারার দস্যু প্রবৃত্তি—
তাকে দেখলাম, ফুটপাতে মুখ গুঁজে পড়ে।....
ও পড়ে রইল ফুটপাতে,
শুকনো, শীতল, বিকৃত দেহে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ চিল (ছাড়পত্র)

চিহ্ন

চিহ্ন পড়ে, তারে ঢাকে নতুন চিহ্ন এসে ;
কোনো চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে রয় না অবশেষে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চলাচল (সেঁজুতি)

চুপ

চুপ করো অবিশ্বাসী। কথা কোয়ো না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ডাকঘর—৩

ওর মনটা ভোরবেলাকার আকাশের মতো চুপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী

দুই মানুষের মাঝে যে অসীম আকাশ সেখানে সব চুপ, সেখানে কথা চলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মেঘদূত (লিপিকা)

তোমার এই চুপ করে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৭

চুম্বন

একটি চুম্বন
ললাটে রাখিয়া যাও, একান্ত নির্জন
সন্ধ্যার তারার মতো ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জ্যোৎস্নারাত্রে (চিত্রা)

ছোট ছোট মেঘগুলি সাদা সাদা পাখা তুলি
চলে যায় চাঁদের চুমো নিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদায় (ছবি ও গান)

অয়ি প্রিয়া,
চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া
বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ,
উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ সুধাপূর্ণ সুখ
রোখো ওষ্ঠাধরপুটে—ভক্ত ভৃঙ্গ তরে
সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে
সরসসুন্দর ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

উতল সাগরের অধীর ক্রন্দন
নীরব আকাশের মাগিছে চুম্বন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

একটি চুম্বন গড়ি
দোঁহে লব ভাগ করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সান্ত্বনা (চিত্রা)

আকাশের চুম্বনবৃষ্টিরে
ধরণী কুসুমে দেয় ফিরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ফুলিঙ্গ—২০

চুরি

"করিব না চুরি" কভু বলিও না আর।
কেন করিবে না চুরি, ভাবো একবার।
উন্নতি চাহে যারা
আগে চুরি করে তারা
চুরি করে হতে হয় নেতা জনতার
একবার চুরি নহে কর শতবার।

অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় : চুরি-মাহাত্ম্য

যদি আমি চুরি করিয়া, মানুষের হাত এড়াইতে পারি, ঈশ্বরের নিকট কখনও পরিত্রাণ পাইব না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : আখ্যানমঞ্জরী প্রথম ভাগ—লোভ সংবরণ

চোর হইয়া ধনবান হওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া নির্ধন হওয়া ভাল ; তাহাতে চিরকাল নির্ভয়ে ও মনের সুখে থাকা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : আখ্যানমঞ্জরী প্রথম ভাগ—লোভ সংবরণ

চুরি কে না করে? মিথ্যা কথা কে না কয়? বঞ্চনা কাহাতে নাই? তবে বড়লোক ধরা পড়ে না ; আমার মত ছোটলোকেই ধরা পড়ে। ছোটলোকে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, আর বড়লোকে কথার কৌশলে, বুদ্ধির জোরে চুরি করে। আমরা অসভ্য চোর, তাহারা সভ্য চোর।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু : কালাচাঁদ

নিঃসঙ্গ জীবনের রূপ। ফটিক জল স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ,—নিজের সামনে নিজের স্বচ্ছ পূর্ণ প্রতিবিম্বের পাশে অতল জলে ডুবে আছে পূর্ণ চাঁদ। পাশে জীবনের পদ্মবন ঘুমিয়ে থাকে,—ক্লান্ত মৌমাছিরাও আর গুনগুন করে না। ক্বচিৎ কারণে-অকারণে দীঘির স্থির জলে চঞ্চলতা জাগে যদি, প্রশান্ত ঢেউ-এর ভাঁজে ভাঁজে তখনো জীবন-বিম্বটি পূর্ণরূপের উজ্জ্বলতায় কেবল হাসে আর কাঁপে। পরে কাঁপতে কাঁপতে আবার সুস্থির-সম্পূর্ণ অখণ্ড রূপের মাধুরীতে নিশ্চল হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের উত্তাপ তাতে রয়েছে,—রয়েছে তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা-সংগ্রামের বস্তুনিবিড় স্পর্শ। কিন্তু শিল্পীর একক অনুভবের নিভৃত অতলতায় সকল বৈচিত্র্য, সব বিস্তার ডুব দিয়েছে শ্বাস রুদ্ধ করে। নিরুদ্ধশ্বাস জীবনের সেই ডুবে-থাকা মুহূর্তটিকে ছোটগল্পকার তুলে ধরেন তাঁর শিল্পের মুকুরে। জীবন সেখানে প্রাণতপ্ত কিন্তু নিস্তরঙ্গ ; সংসক্ত কিন্তু গভীর ; পূর্ণ হয়েও প্রশান্ত।

ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প ও গল্পকার

মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালপালার পুনরাবৃত্তি। সেই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটা ফল ফলে ওঠে—সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটো গল্প।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছোটোগল্প (শেষ কথা)

ছোটগল্প ঘটনা-শুক্তিতে নিহিত একটি ক্ষুদ্র, নিটোল মুক্তা, ছোট ঝিনুকে পরিবেশিত এক বিন্দু জীবন-রসনির্যাস, ললাটলিপিতে উৎকীর্ণ এক-বাক্যাত্মক একটি গাঢ়বদ্ধ জীবনানুশাসন।.....একটি ক্ষুদ্র আখ্যানখণ্ডে সমগ্র জীবন-তাৎপর্য প্রতিবিম্বিত করাই ইহার উদ্দেশ্য ও শিল্পরূপের প্রেরণা। এ যেন কথাশিল্পের কারুকার্য-খচিত একটি ছোট পাত্রে সমগ্র জীবন-প্রবাহের গতিবেগ ও সমুদ্রাভিসারের ইঙ্গিতটুকু ধরিয়া রাখা।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : ছোটগল্প

জনগণ

জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়।

কাজী নজরুল ইসলাম : ফরিয়াদ

দেশের জনগণই সুস্থ দেশজ সংস্কৃতির বাহক। তাই দেশের সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করতে হ'লে জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলি এবং তাদের বশংবদ রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম একান্ত প্রয়োজন।

প্রণব কুমার নায়ক : সম্পাদকীয়—ঈক্ষণ (জানুয়ারী, ০৩)

জনতা

জাগে নবভারতের জনতা
এক জাতি এক প্রাণ একতা।

অতুলপ্রসাদ সেন : গান

কত বুলবুলি খেল কত ধান,
কত মা গাইল বর্গীর গান,
তবু বেঁচে থাক অমর প্রাণ
এ-জনতার।

বিষ্ণু দে : এ জনতার (সাত ভাই চম্পা)

আমরা মাছটি খাবো। আঁশ খাবে জনসাধারণ।

পূর্ণেন্দু পত্রী ঃ সাম্প্রতিক দিনগুলি (প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ)

পেটে ভাত নেই, মাথায় বুদ্ধি নেই—এইরকম কতকগুলি জীব নিয়েই তো জনসাধারণ।

সুবোধ ঘোষ ঃ তিলাঞ্জলি

জননী

জননী গো, লহ তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে
কাঁদিছে তব চরণ-তলে ত্রিংশতি নর-নারী গো।

অতুলপ্রসাদ সেন ঃ গান

জননী! জননী! আবার জাগো শুভ্র শারদ-প্রাতে
আঁখি তোল অনসিত অনাহত মহিমাতে।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (দেশাত্মবোধক)

এবার নবীন মন্ত্রে হবে জননী তোর উদ্বোধন।
নিত্যা হয়ে রইবি ঘরে হবে না তোর বিসর্জন।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বিজয়া (ভক্তি-গীতি)

জন্মে মুখে কান্না দিলে, দিলে ভাসান ভেলা
একূল-ওকূল কালিঢালা কালনাগিনীর দ'য়
রাত মজাল ডোবাল দিন ঢেউয়ের ছেলেখেলা
সামনে যে জল, জল পেছনে ভরাডুবির ভয়।

....

ক্ষুদিরামের মা আমার কানাইলালের মা—
জননী যন্ত্রণা আমার জননী যন্ত্রণা॥

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ঃ জননী যন্ত্রণা

প্রেম ভাল, তার আগে ভাল দেশপ্রেম, রমণী শেখার আগে
মানুষ তো চিরকাল জননীকেই প্রথম শিখেছে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ এসো, আরো একবার চেষ্টা করি

আমি যা কিছু স্পর্শ করি
সেখানেই,
হে জননী,
তুমি।
আমার হৃদয়বীণা
তোমারই হাতে বাজে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ জননী জন্মভূমি

জনযুদ্ধ

জনযুদ্ধের দশটি নীতি। এক, প্রথমে ছোট ছোট ছড়িয়ে-পড়া শত্রুদলকে আক্রমণ করো ; পরে শক্তিশালী ফৌজকে দুই, আগে গ্রামাঞ্চল দখল করো, পরে শহর। তিন, কোনো জায়গা দখলে রাখাটা বড় কথা নয়, শত্রুর শক্তি ক্ষয় করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। চার, প্রতি যুদ্ধে শত্রুর পাঁচ-ছ গুণ বেশি সৈন্য সমাবেশ করো, শত্রুকে ঘেরাও ক'রো যাতে কেউ পালাতে না পারে। পাঁচ, যে-যুদ্ধ জিততে পারবে কিনা সন্দেহ থাকে, সে যুদ্ধ লড়ো না। ছয়, জনতার নিজের কায়দায় লড়ো। সাহস, মরতে ভয় না পাওয়া, ক্লান্তিহীন পরপর যুদ্ধ লড়ার ক্ষমতা, এসবই জনতার নিজস্ব। সাত,

শত্রু যখন পথ চলছে, সেটাই হচ্ছে তাকে আক্রমণ করার শ্রেষ্ঠ সময়। আট, দুর্বল শহর দখল করার সময়ে, সব সুরক্ষিত স্থান দখল করো, বাদ দিও না। নয়, শত্রুর অস্ত্র কেড়ে নাও ; তার লোকদের কেড়ে নাও ঃ আমাদের ফৌজের লোকশক্তি ও অস্ত্রশক্তির উৎস হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র। চেয়ারম্যান মাও ঠিক ঠিক বুঝেছেন। শত্রুই অস্ত্র যোগায় আমাদের।.......দশ, লড়াইয়ের ফাঁকে ফাঁকে পুরো বিশ্রাম নাও, নিজেদের শিক্ষিত ক'রে তোলো।

উৎপল দত্ত ঃ তীর

জনযুদ্ধ যে জনগণের যুদ্ধ।.....জনগণের ওপর নির্ভর করেই এ যুদ্ধ জেতা যায়।.....মানুষকে খুব দরকার।

শৈবাল মিত্র ঃ অজ্ঞাতবাস

জন্ম

রবিবারে জন্মায়
কবি বলে যশ পায়।
সোমবারে জন্ম
তার হয় ধন্ম।
মঙ্গলবারে জাত
বীর বলে বিখ্যাত।
জন্ম কি বুধবার?
বুদ্ধিটি ক্ষুরধার।
বৃহস্পতিবারে জাত
বিদ্বান বলে জ্ঞাত।
জন্ম শুক্রবার
আলো করে রূপ তার।
শনিবারে জন্মায়
ধনী হয়ে মান পায়।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ ভাগ্য (ছড়া সমগ্র)

.......এক ব্যক্তি ধরাধামে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কেবল জন্মগ্রহণে পরিতুষ্ট না হইয়া, মৃত্যুগ্রহণ পর্যন্ত করেন।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পাঁচু ঠাকুর (১ম খণ্ড)

....বার-বার মরতে হয় মানুষকে, নতুন করে
জন্ম নেবার জন্য,
শুধু জন্ম-জন্মান্তর নয়, একই জন্মে তার এই মৃত্যু আর পুনরুত্থান,
শুধু একজনের নয়, সকল মানুষের—।

বুদ্ধদেব বসু ঃ শীতরাত্রির প্রার্থনা

জন্ম মৃত্যু

জন্মের পর মৃত্যু, তারপর আবার জন্ম। ঠিক যেমন ঢেউয়ের পর ঢেউ। চলতে চলতে পড়ে যাওয়া, আবার ওঠা। কে যেন আমাদের নিয়ে দিনরাত এই খেলা খেলছে। এ খেলার শেষ নেই।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ ঘরের পথ (শ্রেষ্ঠ গল্প)

জন্মদিন

আজি তব জন্মদিনে এই কথা করাব স্মরণ—
জয় করে নিতে হয় আপনার জীবন মরণ
আপন অক্লান্ত বলে দিনে দিনে ; যা পেয়েছ দান
তার মূল্য দিতে হবে, দিতে হবে তাহারে সম্মান
নিত্য তব নির্মল নিষ্ঠায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উত্তিষ্ঠত জাগ্রত

নবসূত্রে পড়ে আজি গাঁথা
নব জন্মদিন। জন্মোৎসবে এই-যে আসন পাতা
হেথা আমি যাত্রী শুধু, অপেক্ষা করিব, লব টিকা
মৃত্যুর দক্ষিণহস্ত হতে, নূতন অরুণলিখা
যবে দিবে যাত্রার ইঙ্গিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মদিন (সেঁজুতি)

নিজের জন্মদিন বৎসরের অন্য ৩৬৪ দিনের চেয়ে নিজের কাছে কিছুমাত্র বড়ো নয়। যদি অন্যের কাছে তার মূল্য থাকে তবেই তার মূল্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মোৎসব (শান্তিনিকেতন)

জন্মদিন আসে বারে বারে
মনে করাবারে—
এ জীবন নিত্যই নূতন
প্রতি প্রাতে আলোকিত
পুলকিত
দিনের মতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ফুলিঙ্গ

আকাশে এত নান্দনিক আলো, আজ কি চাঁদের জন্মদিন?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : সমুদ্রের এপারে ওপারে (নীরা হারিয়ে যেওনা)

জন্মদিন মৃত্যুদিন

আজ আসিয়াছে কাছে
জন্মদিন মৃত্যুদিন, একাসনে দোঁহে বসিয়াছে,
দুই আলো মুখোমুখি মিলিছে জীবনপ্রান্তে মম
রজনীর চন্দ্র আর প্রত্যুষের শুকতারা সম—
এক মন্ত্রে দোঁহে অভ্যর্থনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মদিন (সেঁজুতি)

জন্মভূমি/জনমভূমি

যেইদিন ও চরণে ডালি দিনু এ জীবন,
হাসি অশ্রু সেইদিন করিয়াছি বিসর্জন।
হাসিবার কাঁদিবার অবসর নাহি আর,
দুঃখিনী জনম-ভূমি,—মা আমার, মা আমার!.....
যতদিন না ঘুচিবে তোমার কলঙ্ক-ভার,
থাক্ প্রাণ, যাক্ প্রাণ—মা আমার, মা আমার!

কামিনী রায় : মাতৃপূজা

ধনধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ;
ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবেনাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সাজাহান

নমোনমো নম সুন্দরী মম জননী জন্মভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুই বিঘা জমি

জন্মান্তর

যেন জন্মান্তরে তোমার মত গুণের দেবর পাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ সীতার বনবাস

প্রতিটি অণু পরমাণু জল মাটির সাথে কোথাও একটা
জন্মান্তর লুকিয়ে থাকে।

তাপস রায় ঃ মন খারাপের গল্প

জবা

বল্ রে জবা বল্—
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল।
মায়া তরুর বাঁধন টুটে
মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ বিহ্বল।
তোর সাধনা আমায় শেখা, জীবন হোক সফল॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভক্তিগীতি

মায়ের পায়ের জবা হয়ে ওঠ না ফুটে মন।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভক্তিগীতি

জয়

জয় হোক জয় হোক—
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক,
সত্যের জয় হোক, জয় হোক।
সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি
সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি
হোক ক্ষয় ক্ষয় হোক জয় হোক জয় হোক॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান

জল

জলের উচ্ছ্বাসে কোটি গলার ডাক
আমাকে তোলপাড় করেছিল,
আমি পৃথিবীর আলোয় ঘুরে
অদৃশ্য তট আর আমার দোসরদের কথা ভেবেছিলাম।

অরুণ মিত্র ঃ শুধু রাতের শব্দ নয়

জলের উঠেছে দাঁত কার সাধ্য দেয় হাত,
আঁক্ করে কেটে লয় বাপ্।
কালের স্বভাবদোষ ডাক ছাড়ে ফোঁস ফোঁস
জল নয় এ যে কালসাপ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঃ শীত

চিক্কণ কালো জলে
মুমূর্ষু আলো আহত কৃষ্ণ সর্পের মত চলে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ ঘুমের ঘোর

ঘন কালো দিঘিজলে
পিছনে ফিরিয়া-চাওয়া আঁখি জ্বলোজ্বলো
করে ছলোছলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অনাগতা (বিচিত্রিতা)

সবুজ স্বচ্ছজল
সাপের চিকন দেহের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছেলেটা (পুনশ্চ)

জল শুধু জল,
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।
মসৃণ চিক্কণ কৃষ্ণ কুটিল নিষ্ঠুর
লোলুপ লেলিহজিহ্ব সর্পসম ক্রূর
খল জল ছল ভরা ; তুলি লক্ষ ফণা
ফুঁসিছে গর্জিছে নিত্য করিছে কামনা
মৃত্তিকার শিশুদের লালায়িত মুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দেবতার গ্রাস

কালো জল কটাক্ষিয়া চলে ঘুরি ঘুরি,
যেন সে ছলনা-ভরা সুগভীর চুরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিষ্ফল উপহার (কাহিনী)

মানুষের জন্যে জল চাই, অমৃত নয়। অমৃতে তৃষ্ণা মেটে না।

সমরেশ মজুমদার ঃ সাতকাহন (২য় পর্ব)

জাত

মানুষের জাত দুটি, ভাল আর মন্দ।....তবে একটা কথা, এ সংসারে যার পয়সা আছে তার জাত আছে।.....তরতর করে ওপরে উঠবি, দেখবি সব জাতগুলো সুড়সুড় করে একদিন তোর পায়ের কাছে এসে দাঁড়াবে।

এ. মান্নান ঃ শিরীষের জাত নেই

জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান দেশাত্মবোধক

মানুষ যতক্ষণ বাঁচে, ততক্ষণই তো তার জাতপাত।.....মরে গেলে সব জাত এক।

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ঃ এক আঁজলা জল (শ্রেষ্ঠ গল্প)

ছোট ছেলেকে বুকে তুলে নিলেই বুঝতে পারা যায় যে, জাত নিয়ে কেউ পৃথিবীতে জন্মায় না। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ** গোরা—(৩য় পরিচ্ছেদ)

সুন্দরের কোনো জাত নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জলপাত্র (পরিশেষ)

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।
লালন বলে, জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।........
জগৎ বেড়ে জেতের কথা
লোকে গৌরব করে যথা-তথা
লালন সে জেতের ফাতা
বিকিয়েছে সাত বাজারে।

লালন ফকির : গান

জাতিস্মর

জাতিস্মর হওয়া আত্মার খুব উঁচু অবস্থার পরিচয়।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : তারানাথ তান্ত্রিক

জাদু/যাদু/জাদুকর

সাহিত্য বলে জাদুকর একজন অভিনেতা। তিনি ঐন্দ্রজালিকের অভিনয় করেন।

পি. সি. সরকার (জুনিয়র) : জাদু জীবন

যাদু-বিশ্বাস ও যাদু-সংস্কারের প্রভাব পৃথিবীর সব দেশের লোকসমাজেই অল্পবিস্তর দেখা যায়। এ বিশ্বাস-সংস্কারের প্রতিফলন প্রতিদিনের জীবনচর্যায়, আচারে-অনুষ্ঠানে, প্রথা-পালনে। বয়সের গাছপাথর নেই এ সমস্ত বিশ্বাস-সংস্কারের। এগুলি লোকস্মৃতি-বাহিত, লোক-ঐতিহ্যে পর্যবসিত, লোকসাধারণের রক্তমজ্জায় মিশ্রিত। উদ্ভব আদিম সমাজে।

প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত শক্তিকে বশ করার আকাঙ্ক্ষা থেকেই যাদুর উদ্ভব। যাদু ব্যাপারটি অবশ্য অতিপ্রাকৃত। যাদু হল—"the art of compulsion of the supernatural ; also, the art of controlling nature by supernatural means" [Maria Leach (ed)–Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend].

মানস মজুমদার : লোকঐতিহ্যের দর্পণে

আদিম মানুষের জীবন ছিল প্রতি পদে বিঘ্ন-সংকুল। বন্যপ্রাণীর আক্রমণ, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্পাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নানানতর অসুখ-বিসুখ, মানুষের গুপ্ত শত্রুতা প্রভৃতি তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এ সবের প্রতিরোধে সে অলৌকিক শক্তির দ্বারস্থ হয়েছে। অমঙ্গল ও অশুভের প্রতি মানসিক ভয় আর দুর্বলতা আদিম মানুষকে যাদুনির্ভর করেছে : 'Magic has to serve the most varied purposes—it must subject natural phenomena to the will of man, it must protect the individual from his enemies and from dangers and it must give him power to injure his enemies".[Sigmund Freud–Totem and Taboo

মানস মজুমদার : লোকঐতিহ্যের দর্পণে

পৃথিবীর নীচের তলায় পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা সোনা—সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে। ফুল ফুটছে—সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি, সহজের থেকে ওই প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারিনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রক্তকরবী

যমের কাছে জাদু শিখেছি, জাগাতে পারিনে। জাগরণ ঘুচিয়ে দিতেই পারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

এ তো বড়ো রঙ্গ যাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাচের পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রঙ্গ

জানানা

স্ত্রীজাতির মন কখনো জানা যায় না, ঐ জন্যেই তাদের বলে জানানা।

প্রমথনাথ বিশী ঃ কলাচর্চা

জায়গা

নিষ্প্রয়োজনের জায়গাটাই হৃদয়ের জায়গা। এইজন্য ফলের চেয়ে ফুলেই তাহার তৃপ্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষা

পৃথিবীতে আজকের দিনের জায়গায় কালকের দিনের জায়গা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১৩

জার্নালিজম

কাব্যের ধারণাশক্তি.....কেবলমাত্র ঘটনার টুকরো কুড়িয়ে সরাসরি বাক্যে গ্রন্থনশক্তি নয়। সেভাবে জার্নালিজম-এর নগদ মূল্য মেলে, পরিবেশের চমক লাগানো যায়। প্রত্যক্ষ সংগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে খরচ করবার কৌশলীবিধি সৃষ্টিশীলতার মুখ্য পরিচয় নয়, অধিক ক্ষেত্রে সেটা কাব্যপ্রকাশের বিরুদ্ধ পথ।.....রিপোর্টার-বৃত্তির প্রাবল্য আধুনিক ধারণাশক্তিকে বিড়ম্বিত করে, কেননা তার মধ্যে অভিষিক্ত চৈতন্যের স্থিরবিদ্যুৎ নেই, যাতে তল পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছয়।

অমিয় চক্রবর্তী ঃ কাব্যে ধারণাশক্তি

না ভাবিয়া লিখিলে জার্নালিজম, ভাবিয়া লিখিলে সাহিত্য।

প্রমথনাথ বিশী ঃ বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা

জার্নালিজমের বিশিষ্ট লক্ষণ সমাজ-চৈতন্য, সাহিত্যের বিশিষ্ট লক্ষণ জীবন-চৈতন্য।

প্রমথনাথ বিশী ঃ বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা

যুগধর্মের নিয়মানুসারে সাহিত্য ও জার্নালিজমের গুরুত্বে তারতম্য ঘটিয়া গিয়াছে। বৈশ্য জার্নালিজম সাহিত্য-ব্রাহ্মণের আসর জবর দখল করিয়া উপবীত ধারণ করিয়াছে। *আবার সাহিত্যও নিজের নাম ও জাতি ভাঁড়াইয়া জার্নালিজমের দলে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—অনেক সময়েই চিনিবার উপায় নাই।*

প্রমথনাথ বিশী ঃ বাঙালীর জীবনসন্ধ্যা

জারি/জারী (গান)

পূর্ব মৈমনসিংহের জারিগান বাংলার লোকসঙ্গীতের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।........জারিগান বীর ও করুণ রস মিশ্র রচনা—কারবালার যুদ্ধ বৃত্তান্ত ইহার বিষয়। বীর-রসাত্মক এই কাহিনীর উপর ইহাতে একটি অতি করুণ কাহিনী আছে—তাহা হজরত ইমাম হোসেন ও হাসানের হত্যা। 'জারীগান বাংলার মুসলমানদের চিরপ্রিয় করুণাত্মক গান'। জারীগানের মত ব্যথার সুর অন্য কোন গানে ধ্বনিত হইয়া উঠে নাই।

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে, এমন তীব্রভাবে অন্য কোন পল্লীগানে যুদ্ধ করা হয় নাই।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ঃ বাংলার লোকসাহিত্য

ফারসী = জারী (ক্রন্দন করা)। পূর্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ গ্রাম্য গানের সুর।.....কারবালায় নিহত শহীদকে অবলম্বন করিয়া রচিত করুণরসাত্মক গীত। মহরমের সময় বাঙ্গালার বহু স্থানে গীত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ঃ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

জাহ্নবী

....তোমা-কাছে মৃত্যুবন্দী প্রেতের আহ্বান—
ডাক দিল, আনো আনো প্রাণ—
.......তুমি যে প্রাণের ছবি,
হে জাহ্নবী—
ধরণীর আদিসুপ্তি ভেঙে দিয়ে যেথা যাও চলে
জাগ্রত কল্লোলে
গানে মুখরিয়া ওঠে মাটির প্রাঙ্গণ,
দুই তীরে জেগে উঠে বন ;
তট বেয়ে মাথা তোলে নগরনগরী
জীবনের আয়োজনে ভাণ্ডার ঐশ্বর্যে ভরি ভরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভাগীরথী (সেঁজুতি)

জিজ্ঞাসা

হে সমুদ্র চিরকাল কী তোমার ভাষা?
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা।
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর?
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির নিরুত্তর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কণিকা

জিনিস

একটা জিনিস
হয় চুরি যায়, নয় ত হারায়,
নয় মারা যায় ঠগের দ্বারায়,
তা না হলে থাকে,—এ ছাড়া তাহার—
কী যে হতে পারে জানি নে ত আর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লক্ষ্মীর পরীক্ষা (২য় পর্ব)

জিরাফ

জিরাফের বাবা বলে,—
খোকা তোর দেহ
দেখে দেখে মনে মোর
কমে যায় স্নেহ।
সামনে বিষম উঁচু,
পিছনেতে খাটো,

এমন দেহটা নিয়ে
কী করে যে হাঁটো।
খোকা বলে—আপনার
পানে তুমি চেয়ো ;
মা যে কেন ভালোবাসে
বোঝে না তো কেহ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : খাপছাড়া—৮০

জিহ্বা

বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে।
তৃষার্ত জিহ্বার মতো ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুখ (চিত্রা)

জীবন

একটাই তো জীবন, একে যেমন-তেমন
খরচ করতে ইচ্ছে করে না।

অজিত বাইরী : একটাই তো জীবন

এই তো জীবন। দেয় যেমন, নেয়ও তেমন।

অমল দত্ত : আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫.৬.২০০২
(বিশ্বকাপ ফুটবলের আলোচনা প্রসঙ্গে)

জীবন দিয়াও যদি একটা জীবন রক্ষা করা যায়, জন্ম সার্থক মনে করি।

শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুর : স্বপ্নজীবন

জীবনটা ওই। নানা রঙের খেলা। যে জীবনের রঙ বোঝে না, তার জীবন তো মৃত। শুধু কলের পুতুলের মত হাত পা নেড়ে সংসার করে যাওয়া। সংসার কি দেবে? কিচ্ছু না।

কণা বসু মিশ্র : যজ্ঞশালা (বন্ধ দরজা)

জীবনটা নাটকের চেয়ে জটিল, তার
চরমতম বিন্দু এখনও এক অধরা রহস্য।

কৃষ্ণ ধর : দ্বিতীয় নায়িকা

হায়! জীবন এত ছোট কেনে!
এ ভুবনে
জীবনে যা মিটল নাকো, মিটবে কি হায় তাই মরণে?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কবি

একটাই জীবন। তাকে নিয়ে কতো কিছু করা যায়।

দেবী রায় : বোকা চিল

জীবন মানেই তো বর্তমান। যা অতীত তা এই মুহূর্তে নেই। যা অনাগত তাও এ মুহূর্তে অনুপস্থিত। অতীত মানে স্মৃতি, ভবিষ্যৎ মানে স্বপ্ন অথবা সম্ভাবনা। একমাত্র বর্তমানই স্পর্শযোগ্য, তাই বর্তমানই জীবন।

নিরূপ মিত্র : সবুজ রোদে খেলা

জীবনটা শুরু কাটালে তুমি বেশ—
দুধের বোতলে শুরু,
মালের বোতলে ডুবে,
স্যালাইন বোতলে হলে শেষ।

পি. সি. সরকার (জুনিয়র) ঃ তিন বোতলের গল্প (জাদু জীবন)

জীবন কোনো দিন শূন্যে গিয়ে থামে না। তবে দুঃখ? হ্যাঁ, দুঃখ আছে। আছে বলেই আশা দিয়ে ভালোবাসা দিয়ে বিশ্বাস দিয়ে তার সঙ্গে যুঝতে হবে।

বিমল কর ঃ সুধাময়

জীবন কি? আয়ুকে রক্ষা করার ইচ্ছা, আত্মাকে রক্ষা করার ইচ্ছা, মুক্তির পিপাসা, প্রেম আর আনন্দ। সৎকে রক্ষা করো, সত্তাকে রক্ষা করো—জীবন পূর্ণ হবে।

বিমল কর ঃ সুধাময়

নানা লোভে ক্রূরতায় আজ আমরা ক্ষতবিক্ষত।....কিন্তু জীবন তবু হার মানে না, তার শিকড় আমাদের মনের গভীরে, দুর্মর প্রাণ নৈর্ব্যক্তিক আবেগে নির্নিমেষ চোখ মেলে থাকে, উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দেশ, আসন্ন সমাজ কাঁপে চৈতন্যের সম্ভাবনায়, অবশ্যম্ভাবিতায়, বীজ কম্প্রনীল অন্ধকারে বর্শার ফলার মতো, পাহাড়ের চূড়ার মতন। বিস্বাদের মধ্যেই উজ্জীবনের সমাধান হেঁকে যায়। উদয়াচলে মেশে অস্তাচলের রক্তস্রোত, ভগ্নদূতের মুখে জাগে মিছিলের প্রবল আশা, প্রাণের কবি অতীতের সিঁড়ি ভাঙে আর গায় ভাবীকালের ভাষা।

বিষ্ণু দে ঃ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ

শুধু দিনযাপনের শুধু প্রাণধারণের গ্লানি,
শরমের ডালি,
নিশি-নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভক্ষতি-টানাটানি, অতিসূক্ষ্ম ভগ্ন-অংশ-ভাগ,
কলহ সংশয়—
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষশেষ (কল্পনা)

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যতকিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই ;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন ;
ততক্ষণ
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে, পক্ককেশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—১৮০

'সংসারে জিনেছি' ব'লে দুরন্ত মরণ
জীবনবসন তার করিছে হরণ।
যত বস্ত্রে টান দেয়, বিধাতার বরে
বস্ত্র বাড়ি চলে তত নিত্যকাল ধ'রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বস্ত্রহরণ (কণিকা)

জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানুষের ধর্ম—পরিশিষ্ট। মানবসভ্যতা—৩

পরের মুখের হাসির লাগিয়া অশ্রুসাগরে ভাসা—
জীবনের সুখ খুঁজিবারে গিয়া জীবনের সুখ নাশা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মায়ার খেলা। "ওলো রেখে দে সখী"

এই জীবনটা ভালো কিংবা মন্দ কিম্বা যা-হোক-একটা-কিছু
সে কথাটা বুঝব কখন, দেখব কখন ভেবে আগুপিছু!
একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তি (পলাতকা)

যাক এ জীবন,
যাক নিয়ে যাহা টুটে যায় যাহা
ছুটে যায়, যাহা
ধূলি হয়ে লোটে ধূলি-'পরে, চোরা
মৃত্যুই যার অন্তরে, যাহা
রেখে যায় শুধু ফাঁক।
যাক এ জীবন, পুঞ্জিত তার জঞ্জাল নিয়ে যাক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাবার মুখে (সেঁজুতি)

আমাদের প্রতিদিন পূর্বদিনের পুনরাবৃত্তি মাত্র, আমাদের ক্ষুদ্র জীবন একটি ধারাবাহী উন্নতির কাহিনী নহে। সেই প্রতিদিবসের উদরপূর্তি, প্রতি রাত্রের নিদ্রা, বৎসরের মধ্যে এই ঘটনা ও ইহারই আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানগুলিরই তিন-শ-পঁয়ষট্টিবার করিয়া পুনরাবর্তন—এই তো আমাদের জীবন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রামমোহন রায় (চারিত্রপূজা)

মগ্ন হয়ে জীবনের
মাঝখানে, কে জেনেছে জীবনের সুখ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ও রানী—৫।৬

জীবন যখন ঝর্ণার মতো.....তখন সে ঝর্ণারূপেই সুন্দর, যখন নদী.....তখন সে নদীরূপেই সার্থক, যখন.....নানা উপনদী ও জলধারা এসে মিলে তাকে শাখাপ্রশাখায় ব্যাপ্ত করে দিলে তখন মহানদরূপেই তার মহত্ত্ব—তার পরে সমুদ্রে এসে যখন সে সংগত হল তখন সেই সাগরসংগমেও তার মহিমা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পূর্ণ (শান্তিনিকেতন)

যেখানে কাজের দাবি অতিমাত্র.......অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত......আপনাকে প্রচার করার দিকে মানুষের একান্ত প্রয়াস,.......সেখানে মৃত্যুর রূপ অত্যন্তই শূন্য এবং বিভীষিকাময় এবং জীবন সেখানে নিরন্তর মথিত, ক্ষুব্ধ, পীড়িত ও শতসহস্র কলের কৃত্রিম তাড়নায় গতিপ্রাপ্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ (শান্তিনিকেতন)

ছুটি আছে শুধু দু-দিন
ভালোবাসার মতো
কাজের জন্য জীবন হলে
দীর্ঘ জীবন হত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ (কণিকা)

জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব চেয়ে সকরুণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১৩

আমৃত্যুর দুঃখের তপস্যা এ জীবন,
সত্যের দারুণ মূল্য লাভ করিবারে,
মৃত্যুতে সকল দেনা শোধ করে দিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ লেখা—১১

পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে সরে থাকার জন্য মনু আদেশ করেছেন.....। জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্মের জন্যে প্রস্তুত হতে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তার পরে পঁচিশ বছর পূর্ণ শক্তিতে কাজ করবার সময়।.....কর্মের বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্যে আরও পঁচিশ বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবি মাঝখানটাতে ; আরম্ভেও নয়, শেষেও নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের পথে—পঞ্চাশোর্ধ্বম্

খ্যাপার মতন কেন এ জীবন,
অর্থ কী তার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অন্তর্যামী (চিত্রা)

আর্থিক অবস্থার চেয়ে....ঐশ্বর্যের দৃষ্টান্ত বড়ো হইয়াছে। তার ফল হইয়াছে। জীবনযাত্রাটা.....প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কৃপণতা (পরিচয়)

জড়িয়ে গেছে সরু মোটা
দুটো তারে
জীবনবীণা ঠিক সুরে তাই
বাজে না রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১২৮

জীবনে ফুল ফোটা হলে
মরণে ফল ফলবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—৩৮

সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে
মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভরে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—৪৭

জীবন যখন ছিল ফুলের মতো
পাপড়ি তাহার ছিল শত শত।
আজ বুঝি তার ফল ধরেছে, তাই
......রসের ভারে তাই সে অবনত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিমাল্য—৩৭

জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে-বাইরে—নিখিলেশের আত্মকথা

জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোটো হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে, তার পরে বড়োকে এক মুহূর্তে কাত করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা ব'লে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে-বাইরে—সন্দীপের আত্মকথা

জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে-বাইরে। সন্দীপের আত্মকথা

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন। আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু কিছু বদলে মুছে পুরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মতো একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুলব, এই তাঁর অভিপ্রায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে-বাইরে—নিখিলেশের আত্মকথা

জীবনে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হাতে বেদনার যে-জাল বোনা হইতে থাকে তার নক্সা কোনো শাস্ত্রের নয়, ফরমাশের নয় ;—তাই তো ভিতরে বাহিরে বেমানান হইয়া এত ঘা খাইতে হয়, এত কান্না ফাটিয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ। শচীশ—৭

বুদ্ধির উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে জীবনের সব ভার সয় না।....রসের উপর ভর করিলাম, দেখিলাম সেখানে তল বলিয়া জিনিসটাই নাই। বুদ্ধি আমার নিজের, রসও যে তাই। নিজের উপরে নিজে দাঁড়ানো চলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ—শ্রীবিলাস—৫

যাত্রাতরী বেয়ে
পিছু ফিরে আর্ত চক্ষে যেন নাহি দেখি চেয়ে চেয়ে
জীবন ভোরের শেষ উচ্ছিষ্টের পানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্মদিন (সেঁজুতি)

যেখানে জীবন অধিক,......সেখানে ভালো মন্দ দুই-ই প্রবল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নূতন ও পুরাতন (স্বদেশ)

একখানি জীবনের প্রদীপ তুলিয়া
তোমারে হেরিব একা ভুবন ভুলিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—৩৭

জীবন হইতে প্রতিদিন অনেক ভুলিয়া, অনেক ফেলিয়া, অনেক বিলাইয়া তবে আমরা অগ্রসর হইতে পারি।.....প্রত্যেক কথা, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক ঘটনার উপর যে ব্যক্তি বুক দিয়া চাপিয়া পড়ে সে অতি হতভাগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিচয় (পঞ্চভূত)

জীবন তো আমাদের অনেককেই ভরে রাখে তার সুখ ও দুঃখের দানে, এক হাতে তার ভালোবাসার দাক্ষিণ্য, অন্য হাতে বেদনার দান।

সুদিন চট্টোপাধ্যায় ঃ ধুলায় হয়েছে ধূলি

জীবন তো এই রকমই—নানা বর্ণে বেদনায় রঞ্জিত এক উপন্যাসের মতো।

সুদিন চট্টোপাধ্যায় ঃ বিচিত্র ভাবনা

জীবনের সার কথা পিশাচের উপজীব্য হওয়া,
নির্বিকারে, নির্বিবাদে সওয়া
শবের সংসর্গ আর শিবার সদ্‌ভাব।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ নরক

জেবন-মরণ দুই ভাই—একই সঙ্গে জন্ম লয় মায়ের জঠরে। একই সঙ্গেতে বাড়ে। দু-ভাইয়ে কত ছলচাতুরি, কত লুকোচুরি খেলা। তবে কথা কি কালসাপ লিয়ে মানুষের বসবাস। তমু মানুষের ই কথাটো খ্যাল হয় না গো। তমু মানুষ কী করে সব ভুলে থাকে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ অলীক মানুষ

বলো না কাতর স্বরে বৃথা জন্ম এ সংসারে
এ জীবন নিশার স্বপন ;
দারা পুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার
বলে জীব করো না ক্রন্দন।....
কর না সুখের আশ, পরো না দুখের ফাঁস
জীবনের উদ্দেশ্য তা নয় ;
সংসারে সংসারী সাজ করো নিত্য নিজ কাজ
ভবের উন্নতি যাতে হয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবন-সঙ্গীত

জীবনচরিত

জীবনচরিতপাঠে দ্বিবিধ মহোপকার লাভ হয়। প্রথমতঃ, কোন কোন মহাত্মারা অভিপ্রেতসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইবার নিমিত্ত যেরূপ অক্লিষ্ট পরিশ্রম, অবিচলিত উৎসাহ, মহীয়সী সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তর অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন এবং কেহ বহুতর দুর্ব্বিষহ নিগ্রহ ও দারিদ্র্যনিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াও যে ব্যবসায় হইতে বিচলিত হয়েন নাই, তৎসমুদায় আলোচনা করিলে এক কালে সহস্র উপদেশের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, আনুষঙ্গিক তত্তদ্দেশের তত্তৎকালীন রীতি, নীতি, ইতিহাস ও আচার পরিজ্ঞান হয়। যে বিষয়ের অনুশীলনে এতাদৃশ মহার্থ লাভ সম্পন্ন হইতে পারে তাহাকে অবশ্যই শিক্ষা কার্য্যের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইবেক।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ জীবন চরিত—প্রথম বারের বিজ্ঞাপন

কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনাপরম্পরার বিবৃতিমাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ৎ-পরিমাণে তাহাও উদ্দেশ্য বটে। .....একজনের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য ব্যক্তি শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক, ইহা .... জীবন প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা

জীবনচরিত সমাজের নিগূঢ় শক্তি ও অভিব্যক্তির সূত্র ধরাইয়া দেয়।

বিপিনচন্দ্র পাল ঃ সত্তর বৎসর

যে মহাত্মা জীবনযাত্রার আদর্শ দেখাইয়াছেন তাঁহারই জীবনচরিত সার্থক ; যাঁহারা সমস্ত জীবনের দ্বারা কোনো কাজ করিয়াছেন তাঁহাদেরই জীবন আলোচ্য। যিনি কবিতা লিখিয়াছেন, গান তৈরি করিয়াছেন, তিনি কবিতা এবং গানই দান করিয়া গেছেন, তিনি জীবন দান করিয়া যান নাই, তাঁহার জীবনচরিতে কাহার কী প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চারিত্রপূজা

জীবনতরী

বারেক ফেলা, বারেক তোলা, ফেলতে ফেলতে যাওয়া—
একেই বলে জীবন-তরীর চলন্ত দাঁড় বাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পালের নৌকা (সেঁজুতি)

জীবনদেবতা

জীবন দেবতা কবিজীবনের দ্বৈত সত্তা। সমগ্র জীবনের মধ্যে আত্মপ্রকাশের যে প্রেরণা, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেই জীবন দেবতা বলিয়াছেন। এই জীবনদেবতা কবি জীবনের নিয়ন্ত্রী দেবতা—কবির অন্তর্নিহিত সৃজনীশক্তি। কবির অন্তরের অন্তরালে ইঁহার অধিষ্ঠান। অন্তরের অন্তরালবাসিনী এই দেবতা কবিকে নিরন্তর কাব্যসৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন, রূপ ও রসরচনার প্রেরণা দিয়াছেন। যে প্রেরণা, যে শক্তি কবিকে নব নব সৃষ্টির পথে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনিই 'জীবন দেবতা'।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : রবি-রশ্মি (প্রথম খণ্ড)

জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : পুতুল নাচের ইতিকথা

'এখানেও তুমি জীবনদেবতা!' কহিনু নয়নজলে।
সেই মধুমুখ, সেই মৃদুহাসি, সেই সুধা-ভরা আঁখি—
চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো, চিরদিন দিল ফাঁকি!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সিন্ধুপারে (চিত্রা)

জীবনের ভালমন্দের ভার বোধ করি জীবনদেবতার ওপর, মানুষ সেখানে নিতান্ত অসহায়।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : দিনলিপির কয়েকটি পাতা (নন্দন, মার্চ ২০০৩)

জীবননাট্য

জীবন-নাট্য : এধরনের নাটক রচনায় কল্পনার অবকাশ নাই। নাটক তো আর হুবহু biography হতে পারে না। সুতরাং নাটকীয় সিচুয়েশন তৈরী করার জন্য দু একটি কাল্পনিক চরিত্রেরও অবতারণা।

মহেন্দ্র গুপ্ত : মাইকেল

সংসারে অধিকাংশ বড়ো বড়ো জীবননাট্য যবনিকার আড়ালেই জমতে থাকে, পঞ্চমাঙ্কের শেষে সেই যবনিকা হঠাৎ উঠে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পয়লা নম্বর (গল্পগুচ্ছ)

জীবনবিধাতা

জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহো নমস্কার!
লহো এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : নমস্কার

জীবনমুখী

(আজ) রাতের পাখি গায় একাকী জীবনমুখী গান।

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য : আনন্দবাজার পত্রিকা—৪.৫.২০০০

জীবনযাত্রা

জীবনযাত্রাটা প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কৃপণতা (পরিচয়)

জীবনসংগ্রাম

আমরা যে ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিম সমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :**

জীবনসূর্য

সন্ধ্যার সময় অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকাইয়া ভাবিবে, আমার জীবন-সূর্যও তো এমনিভাবে একদিন অস্তমিত হইবে।

আজই—এই মুহূর্তেই যদি সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনসূর্যও অস্তমিত হয়, রাত্রির অন্ধকারের মত মৃত্যুর করাল ছায়া আসিয়া আমাকে যদি এখনই কবলিত করে, তবে আমি কী লইয়া এই পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিব? আমার সেই পাথেয় কি সংগৃহীত হইয়াছে? যে জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য কি উদ্‌যাপিত হইয়াছে?

কই, হয় নাই তো। তবে আমি এখনও চুপ করিয়া বসিয়া আছি কেন?......এমনিভাবে চিন্তা করিয়া জীবন গঠনের আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা, চেষ্টা যত্নকে তীব্রতর করিয়া তুলিবে।

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ : প্রণবানন্দ উপদেশ

জীবনী

পৃথিবীর ঘাস, মাটি, মানুষ, পশু ও পাখি—সবার জীবনী লেখা হলে
আমার একার আর আলাদা জীবনী লেখা না হলেও চলে যেত বেশ।
আমার সকল ব্যথা প্রস্তাব প্রয়াস তবু সবই লিপিবদ্ধ থেকে যেত।
তার মানে মানুষের, বস্তুদের, প্রাণীদের জীবন প্রকৃতপক্ষে পৃথক পৃথক
অসংখ্য জীবন নয়, সব একত্রিত হয়ে একটি জীবন মোটে ; ফলে
আমি যে আলেখ্য আঁকি তা বিশ্বের সকলের যৌথ সৃষ্টি এই সব ছবি।

বিনয় মজুমদার : এ জীবন

লটারিতে পেল পীতু
        হাজার পঁচাত্তর,
জীবনী লেখার লোক
        জুটিল সে-মাত্তর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : খাপছাড়া—৭৮

জুতো

খুরওআলা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১৪

মনে করো, জুতো হাঁটছে, পা রয়েছে স্থির—আকাশ-পাতাল এতোল বেতোল
মনে করো, শিশুর কাঁধে মড়ার পাল্কি ছুটেছে নিমতলা—পরপারে
বুড়োদের লম্বালম্বি বাসরঘরী নাচ—।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়।

জ্ঞান

নির্ভেজাল জ্ঞানকে এখন পৃথিবীর লোকেরা আর বিদ্যে মনে করে না। ওসব যারা পড়ে তাদের লোকে খুব করুণা করে—মনে মনে মুখ্যু ভাবে।

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় : যমুনাবতী সরস্বতী (ভাঙা সময়ের কথকতা)

কার্য-কারণের সম্বন্ধানুভূতিই জ্ঞান।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় : জ্ঞানের প্রমাণ

কি হবে দিবা-আলোকে, জ্ঞান বিনা সব অন্ধকার।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী

এদেশে শুধু বই পড়িয়ে বিদ্যা শেখানো হয়।.....নিজের চেষ্টায় বিশ্বরাজ্যের নানাপ্রকার অদ্ভুত ঘটনা নিপুণ চক্ষে পর্যবেক্ষণ করতে হয়, তবেই প্রকৃত জ্ঞানার্জন হয়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় : অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

জ্ঞানের প্রদীপ যেখানেই জ্বালো-না কেন, তাহার আলোক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে ; ভাবের ফুল যেখানেই ফুটুক না কেন, তাহার গন্ধ দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।

প্রমথ চৌধুরী : অভিভাষণ

জ্ঞানের আলো সাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল ; অপর পক্ষে, রূপের আলো রঙিন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফুল।

প্রমথ চৌধুরী : রূপের কথা

জ্ঞান চিরন্তন।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী

আপনাকে নীচ মনে করা এবং অপরকে সর্বদা শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং তাহার মঙ্গল কামনা করাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সম্পূর্ণতার চিহ্ন।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী-৬

এই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

জ্ঞানে মনুষ্যমাত্রেরই তুল্যাধিকার।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বাঙ্গালা ভাষা—বিবিধ প্রবন্ধ

জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে পারি বটে কিন্তু জ্ঞানে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়? জানিলেই কি পাওয়া যায়?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ধর্মতত্ত্ব—একাদশ অধ্যায়

জ্ঞান বহির্জগৎ সম্বন্ধীয় বিচারশক্তি এবং বিজ্ঞান অন্তর্জগৎ সম্বন্ধীয় বিচারশক্তি।

মধুসূদন সংহিতা ২/১৫

তাঁর (সোরেন কিয়ের্কেগার্ড) মতে জ্ঞানী ব্যক্তি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। গোষ্ঠী বা জনজীবনের সমর্থন কামনা নেই তাঁর। রাজনৈতিক সম্মানের মুখাপেক্ষী নন তিনি।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : সাহিত্যের মানচিত্র—দ্বীপ থেকে মহাদেশ

শিব অংশে জন্মালে, জ্ঞানী হয় ; ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বোধের দিকে জ্ঞান সর্বদা যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

এই দেহমন্দির অন্ধকারে রাখতে নাই, জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়। জ্ঞানদীপ জ্বেলে ঘরে ব্রহ্মময়ীর মুখ দেখ না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

জ্ঞানের দুটি লক্ষণ, প্রথম অভিমান থাকবে না ; দ্বিতীয় শান্ত স্বভাব।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণথামৃত

কাঠে আগুন আছে, অগ্নিতত্ত্ব আছে, এর নাম জ্ঞান। সেই কাঠ জ্বালিয়ে ভাত রেঁধে খাওয়া ও খেয়ে হৃষ্টপুষ্ট হওয়ার নাম বিজ্ঞান। পায়ে কাঁটা ফুটলে আর একটি কাঁটা আহরণ করতে হয় ; তার পর পায়ের কাঁটাটি তুলে দুটি কাঁটা ফেলে দেয়। তেমনি অজ্ঞানকাঁটা তুলবার জন্য জ্ঞানকাঁটা জোগাড় করতে হয়। অজ্ঞান নাশের পর জ্ঞান অজ্ঞান দুই-ই ফেলে দিতে হয়। তখন বিজ্ঞান।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

জ্ঞান বাইরে নয়। আমাদের ভিতরেই অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। তার যে সন্ধান পায়, তার

বই শাস্ত্র বা পাণ্ডিত্যের দরকার হয় না। আপনা-আপনিই সে জগৎ জয় করে।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ঃ তব কথামৃতম

জ্ঞানের আলোয় যখন আঁধার মোছে তার খবর বুঝতে পারো কি?

সৌম্যেন্দু ঘোষ ঃ নটী

জ্যোতিষ, জ্যোতিষী

জ্যোতিষ শাস্ত্র যে একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত নয়, উপরন্তু অমঙ্গলজনক, এই সত্য কথাটা স্পষ্ট করে বুঝে নিতে হবে। মানুষ নিজেই তার নিজের ভাগ্য গড়ে অথবা এক শ্রেণীর মানুষ আর এক শ্রেণীর মানুষের জন্য দুঃখ ও দুর্ভাগ্য বয়ে আনে—যুক্তি দিয়ে এই পরম সত্যটি বুঝতে হবে।

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?

জ্যোতিষশাস্ত্রকে কিছুতেই বিজ্ঞান বলা যেতে পারে না।

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান?

এক বিশেষ সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিতে আজকের মানুষ ধর্মান্ধতা, অন্ধবিশ্বাস, পূর্বজন্ম-পরজন্ম, নিয়তি-নির্দেশিত জীবন—ইত্যাদি অবৈজ্ঞানিক বোধের শিকার এবং সেই পটভূমিই হল জ্যোতিষবিশ্বাসের লালনগৃহ।

উৎসে মানুষ ঃ বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ

হতাশাক্লিষ্ট, সমস্যা জর্জরিত, অসহায় মনের অবলম্বন জ্যোতিষ, তখন সেই ব্যক্তিকে যুক্তি-তর্ক-জ্ঞান দিয়ে মুক্তির পথ দেখানো যায় না।

উৎসে মানুষ ঃ বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ

জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার উপর কিছুমাত্র বিশ্বাস করিবে না। আমি উহার অনেক পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এক্ষণে ইহাতে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পুত্রকে লেখা পত্র

ফলিতজ্যোতিষ সম্পূর্ণ নিরর্থক, বর্তমানে বিজ্ঞানে ফলিত জ্যোতিষের কোন সার্থকতা উপলব্ধি হয় না।

মেঘনাদ সাহা ঃ বিজ্ঞান ও চৈতন্য

জ্যোতিষবিদ্যার ষোলআনাই যে ফাঁকি।

ভবানীপ্রসাদ সাহু ঃ কোনটা মানবো কোনটা মানবো না

জ্যোতিষ বিজ্ঞান নয়—ভ্রান্ত বিজ্ঞান।......নোবেল পুরস্কারজয়ী জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী এস. চন্দ্রশেখর ঘোষণা করেছেন (1990) ঃ আমরা নানারকম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি—মহাকাশের গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র অথবা অন্যান্য যে কোনও জ্যোতিষ্কই মানুষের জীবনে কোনও রকম কোনও প্রভাব বিস্তারে অসমর্থ ; আর তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, সময় এসেছে সারা পৃথিবীর প্রতারক জ্যোতিষীদের বিরুদ্ধে বিপ্লবাত্মক আন্দোলন শুরু করা।

সন্তোষ কুমার ঘোড়ই ঃ বুজরুকি বিজ্ঞান

জ্যোৎস্না

মধুময় জ্যোৎস্নায় জল স্থল মগ্ন যেন ঘুমে।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বপ্নপ্রয়াণ

শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ আনন্দমঠ

আজ জ্যোৎস্নারাতে সবাই গেছে বনে
বসন্তের এই মাতাল সমীরণে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

নীরব রজনী দেখো মগ্ন জোছনায়।
ধীরে ধীরে, অতি ধীরে, অতি ধীরে গাও গো।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমালা

চাঁদেরে করিতে বন্দী মেঘ করে অভিসন্ধি,
চাঁদ বাজাইল মায়াশঙ্খ
মন্ত্রে কালী হল গত, জ্যোৎস্নার ফেনার মতো
মেঘ ভেসে চলে অকলঙ্ক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—৮২

ঝঞ্ঝা

সহসা ঝঞ্ঝা তড়িৎ শিখায়
মেলিল বিপুল আস্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অভিসার (কথা)

ঝটিকা

ঝটিকা করিছে হা হা আশ্রয়-আলয় তার ছাড়ি
বাজায়ে অরণ্যবীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মহাস্বপ্ন (প্রভাতসংগীত)•

ঝড়

ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে
তেমনি করে তোমায় আমি জানি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে (সম্রাট)

ঝড় বহে মনে হয়, ও যেন রে ঝড় নয়,
অন্ধকার দুলিছে কাঁপিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আর্তস্বর (ছবি ও গান)

....ধেয়ে এসেছে কালবৈশাখীর ঝড়
গেরুয়া পতাকা উড়িয়ে,
ঘোড়সওয়ার বর্গি সৈন্যের মতো,—
কাঁপিয়ে দিয়েছে শাল-সেগুনকে,
নুইয়ে দিয়েছে ঝাউয়ের মাথা,
হায়-হায় রব তুলেছে বাঁশের বনে,
কলাবাগানে করেছে দুঃশাসনের দৌরাত্ম্য।
ক্রন্দিত আকাশের নিচে ঐ ধূসর বন্ধুর
কাঁকরের স্তূপগুলো দেখে মনে হয়েছে
লাল সমুদ্রে তুফান উঠল,
ছিট্‌কে পড়ছে তার শীকরবিন্দু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খোয়াই (পুনশ্চ)

ঝড় এনেছ এলোচুলে,—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতালি—১৬

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে,
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে।
.....অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি।
ঝড় যে তোমার জয়ধ্বজা তাই কি জানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমাল্য—৬৭

তোরা বলেছিলি তাকে
'বাঁধিয়াছি ঘর।
মিলেছে পাখির ডাকে
তরুর মর্মর।
পেয়েছি তৃষ্ণার জল,
ফলেছে ক্ষুধার ফল,
ভাণ্ডারে হয়েছে ভরা লক্ষ্মীর সঞ্চয়।'
ঝড় বিদ্যুতের ছন্দে
ডেকে ওঠে মেঘমন্দ্রে—
'নয়, নয়, নয়'।

....

যায় ছিঁড়ে, যায় উড়ে—
বলেছিলি মাথা খুঁড়ে,
'এ দেখি প্রলয়'।
ঝড় বলে, 'ভয় নাই,
যাহা দিতে পারো তাই
রয়, রয়, রয়।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঝড় (পূরবী)

দিক্‌হারানো ঝড় বইছে এলোমেলো,
বিশ্বজোড়া অদৃশ্য খাঁচায় মহাকায় পাখি
চারদিকে ঝাপট মারছে পাখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তেঁতুলের ফুল (শ্যামলী)

বালি উড়িয়া সূর্যাস্তের রক্তচ্ছটাকে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, কশাহত কালো ঘোড়ার মসৃণ চর্মের মতো নদীর জল রহিয়া রহিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে; পরপারের স্তব্ধ তরুশ্রেণীর উপরকার আকাশে একটা নিঃস্পন্দ আতঙ্কের বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে.......সেই জলস্থল-আকাশের জালের মাঝখানে নিজের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মেঘমধ্যে জড়িত আবর্তিত হইয়া উন্মত্ত ঝড় একেবারে দিশাহারা হইয়া আসিয়া পড়িল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুঃখ (ধর্ম)

পলাশকানন ধৈর্য্য হারায় রঙের ঝড়ে—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবীন

....বিদ্যুৎচঞ্চুবিদ্ধ দিগন্তকে ছিনিয়ে নিতে এল
কালো শ্যেনপাখির মতো....ঝড়,

সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠল যেন, কেশর-ফোলা সিংহ,—
.....হতাশ বনস্পতি ধুলায় পড়ল উবুড় হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট—৩

হেঁকে উঠল ঝড়,
লাগাল প্রচণ্ড তাড়া,
সূর্যাস্তসীমার রঙিন পাঁচিল ডিঙিয়ে
ব্যস্ত বেগে বেরিয়ে পড়ল মেঘের ভিড়,
বুঝি ইন্দ্রলোকের আগুন-লাগা হাতিশালা থেকে
গাঁ গাঁ শব্দে ছুটছে ঐরাবতের কালো কালো শাবক
শুঁড় আছড়িয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট—৯

বজ্রদন্ত কড়মড়ি ছুটিতেছে ঝড়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রকৃতির প্রতিশোধ—১৩ দৃঃ

ঝরনা/ঝর্ণা

অচল গিরিশিখর ’পরে সাগর করে দাবি,
ঝর্‌না পড়ে নাবি ;
সুদূর দিক্‌রেখার পানে চায়,
অকূল অজানায়
শঙ্কাভরে তরল স্বরে কহে,
নহে গো, নহে নহে ;
এড়ায়ে যাবে বলি
কত-না আঁকাবাঁকার পথে চলে সে ছলছলি ;
বিপুলতর হয় সে-ধারা গভীরতর সুরে,
যতই আসে দূরে ;
উদারহাসি সাগর সহে অবুঝ অবহেলা,—
একদা শেষে পলাতকার খেলা
বক্ষে তার মিলায় কবে, মিলনে হয় সারা—
পূর্ণ হয় নিবেদনের ধারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অপরাজিত (মহুয়া)

ঝর্‌না তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্যতারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নির্ঝরিণী (মহুয়া)

ফেনার-নূপুর-পরা ঝর্‌না—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রক্তকরবী

....ঝরনা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরনাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শরৎ (পরিচয়)

চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হাসির পাথেয় (বনবাণী)

ঝর্ণা! ঝর্ণা! সুন্দরী ঝর্ণা!
তরলিত চন্দ্রিকা! চন্দন-বর্ণা!
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তনুভরি যৌবন, তাপসী অপর্ণা!
ঝর্ণা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : ঝর্ণা

ঝাঁক

কাজ করছি, খাচ্ছি দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি, কাজ করছি ;
খাচ্ছি দাচ্ছি, চকচকে ব্লেডে দাড়ি কামাচ্ছি, দু'বেলা
পার্কে যাচ্ছি, মাইক্রোফোনী কথা শুনছি
ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাচ্ছি।

শামসুর রাহমান : দুঃস্বপ্নের একদিন

ঝাঁঝালো

নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর—একটুকু ঝাঁঝালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষরক্ষা—৪।৩

বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্স।.....মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা।......ঠোঁট দুটিতে.....বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব......।......উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুর্‌ফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত ;—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১৪

ঝাঁটা

যা দেবী ঘর দ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিষবৃক্ষ**

.....সরকারি ঝাঁটায় পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বদেশী সমাজ (আত্মশক্তি)

ঝুমুর

'ঝুমুর' আদিরসমুখ্য প্রেমের গান। এ গান দেহসম্পৃক্ত। নরনারীর জৈবিক আকর্ষণ এ গানে প্রাধান্য পায়। আদিতে রক্ত-মাংসের বাস্তব নারীই ছিল ঝুমুর গানের নায়িকা। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাবে নায়িকার স্থান গ্রহণ করেন শ্রীরাধা।

মানস মজুমদার : *লোকসাহিত্য-পাঠ*

ঝুলন

ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে নূতন খেলা
রাত্রিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বসিব দুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্ঝা আসিয়া অট্ট হাসিয়া মারিবে ঠেলা ;
আমাতে প্রাণেতে খেলিব দুজনে ঝুলন খেলা
নিশীথবেলা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঝুলন (সোনার তরী)

ঝোলাগুড়

কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খটকা,
ঝোলাগুড় কিসে দেয়? সাবান না পটকা।

সুকুমার রায় : নোটবুক

কিন্তু সবার চাইতে ভালো—
পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়।

সুকুমার রায় : ভাল রে ভাল

টপ্পা

টপ্পা হিন্দী শব্দ, আদি অর্থ লম্ফ, তাহা হইতে রূঢ়ার্থে সংক্ষেপ ; ......অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল অপেক্ষা যে গান সংক্ষেপতর, তাহার নাম টপ্পা।....উহার গতি দ্রুত ও প্রকৃতি হালকাবশতঃ উহা ঈশ্বরবিষয়ক গানের উপযোগী নহে।.....উহা হাস্য আনন্দ প্রণয় তামাসা উল্লাস প্রভৃতি লঘুভাবউদ্দীপনবিষয়ে সম্যক উপযোগী।

কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় : গীতসূত্রসার

টপ্পায় কাব্যের একটি প্রাধান্য আছে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র : বাংলার গীতিকার ও বাংলা গানের নানাদিক

কাপ্তেন উইলার্ড বলেছেন, টপ্পা ছিল রাজপুতানার উষ্ট্রচালকদের গীত।.....হিন্দীতে টপ্পা শব্দের অর্থ লাফিয়ে যাওয়া। টপ্পায় এই যে তানের কাজ, এ যেন এক স্বর থেকে আর এক স্বরে চটুলভাবে টপকে টপকে যাওয়া,—এ থেকেও টপ্পা কথাটা এসে থাকতে পারে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র : বাংলার গীতিকার ও বাংলা-গানের নানাদিক

টাকা

টাকায় কি মানুষ কিনে নেওয়া যায়।

অমর মিত্র : ধুলো মেঘ হয়

ভগবানের নাম হল টাকা। চাঁদির জুতো মারলে সব সিদে (সিধে) হয়ে যায়।

আবদুল জব্বার : থানার দালাল (বাংলার চালচিত্র)

টাকা হল গাঙের বালি। যখন আসে রাশি রাশি। যখন যায় ভাঁটার টানে বেরিয়ে যায়।

আবদুল জব্বার : শ্যামগঞ্জের বড় সরদার (বাংলার চালচিত্র)

সবাই টাকার বশ, টাকাতেই যত রস।
টাকা যার তার যশ, ব্যাপ্ত হয় দিক দশ,
ধনরূপ মদ গন্ধে ত্রিভুবন ভরেছে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : বোধেন্দু বিকাশ

টাকা, টাকা—টাকা চাই। গোটা সংসার যেন হাঁ করে আছে মানুষের সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করবার জন্য। এই তো সমাজ। এই তো আমাদের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত দুর্ভাগা

জীবনের বেদনার করুণ কাহিনী। বিদ্যা, বুদ্ধি, শিল্প, সংস্কৃতি—মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি সবই যেন টাকার বেদীমূলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ক্রীতদাসের মতো।

কনক মুখোপাধ্যায় ঃ শিল্পী

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ—টাকা সর্বোত্তম,
টাকা মর্ম, টাকা কর্ম, টাকাই বিক্রম।
সংসারে সবাই সঙ্—টাকা মাত্র সার
টাকার চাকার তলে কোটি নমস্কার।।

জেলেপাড়া সঙ ঃ গান

—টাকা এত হীন হল কিসে? টাকা কি কতগুলো রূপোর চাকতি? টাকা হচ্ছে বর্তমানের আরাম, অতীতের সার্থকতা, ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। টাকাটা ছোট হল কিসে?

—ওরই জন্যে সংসারে কত হানাহানি, অশান্তি।

—অমৃত নিয়েও তো দেবাসুরে লড়াই হয়েছিল, তাতে কি প্রমাণ হয় অমৃত হীনবস্তু! টাকাও হীন নয়।

প্রমথনাথ বিশী ঃ পারমিট

যে বাড়ীতে টাকা আছে জানে, অহরহ সেই বাড়ীতে মনুষ্যেরা যাতায়াত করিতে থাকে,—এমনই ভক্তি, কিছুতেই সে বাড়ী ছাড়ে না—মারিলেও যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল (লোকরহস্য)

আজকাল সমাজে টাকাই ভগবান, কুবেরেরই জয়-জয়কার।

বনফুল ঃ নির্মোক

কেবল টাকার জোরে সুখে থাকা যায় না। বেঁচে থাকবার প্রেরণা চাই একটা, সে প্রেরণার উৎস হওয়া চাই মহৎ কোন দার্শনিক জিজ্ঞাসা অথবা ভালবাসা।

বনফুল ঃ হাটে বাজারে

টাকা থাকলে মেড়াকান্ত, দেশের মধ্যে বুদ্ধিমন্ত।

বাংলা প্রবাদ

টাকায় নিভায় মনের জ্বালা, আপন বাপে ডাকে শালা।

বাংলা প্রবাদ

টাকা যে মানুষ জমিয়েছে অনেক পাপ জমিয়েছে সে তার সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ল্যাবরেটরি

টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্যন্ত। কিন্তু এতে ভগবান লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

টাকা হলেই মানুষ আর এক রকম হয়ে যায়, সে মানুষ থাকে না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

টাকা থাকলেই বড় মানুষ হয় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

টাকার অহঙ্কার করতে নেই। যদি বলো আমি ধনী, তো ধনীর আবার তারে বাড়া তারে বাড়া আছে। সন্ধ্যার পর যখন জোনাকি পোকা উঠে, সে মনে করে আমি এই জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু নক্ষত্র যেই উঠলো অমনি তার অভিমান চলে গেল। তখন নক্ষত্ররা ভাবতে লাগলো আমরা জগৎকে আলো দিচ্ছি। কিন্তু পরে চন্দ্র

উঠলো, তখন নক্ষত্রেরা লজ্জায় মলিন হয়ে গেল। চন্দ্র মনে করলেন আমার আলোতে জগৎ হাসছে। আমি জগৎকে আলো দিচ্ছি। দেখতে দেখতে অরুণ উদয় হলো, সূর্য উঠছেন। চাঁদ মলিন হয়ে গেল, খানিকক্ষণ পরে আর দেখাই গেল না। ধনীরা যদি এইগুলি ভাবে, তাহলে ধনের অহঙ্কার হয় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

টাকার বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত পাওয়ার মতন কোনো কিছুই পাওয়া যায় না এই জীবনে। ভালোবাসা, প্রীতি, প্রেম, মান, যশ কিছুই নয়। টাকা একটা ফালতু ব্যাপার। ভালোবাসা-প্রেম-প্রীতি কিনতে পারা যায়, শুধু ভালোবাসা-প্রেম-প্রীতি দিয়েই। আর স্থায়ী মান যশ পাওয়া যেতে পারে শুধু গুণপনা দিয়েই। হয়তো টাকা বা ক্ষমতা ভাঙিয়েও সেসব পেয়ে থাকেন কেউ কেউ। কিন্তু সেই সব থাকার নয়। থাকেও না। টাকা আর ক্ষমতা ফুরোলেই সেই মান-যশও উবে যায়।

বুদ্ধদেব গুহ ঃ বাসনাকুসুম

মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পল্লীসমাজ

টাকা ধর্ম টাকা স্বর্গ
এ মন্ত্র মা তুই শিখালি,
এখন টাকা পেলেই তার বদলে
রাজি সবই দিতে ডালি।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ঃ উজিরী প্রার্থনা (বিদূষক ১৩৩১)

টঙ্কা বিনে কি ধন আছে সংসারে
বলরে ভাই উচ্চৈঃ স্বরে।
দিবানিশি বসি-বসি টাকা ধ্যান করে।
টাকা ভিন্ন হয় না পুণ্য মান্যগণ্য কে করে?
টাকার গুণে, মূর্খজনে, মহাজ্ঞানী নাম ধরে।
টাকা পেলে বোবায় বলে, পঙ্গু উঠে পাহাড়ে॥

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ঃ ধন (বিদূষক ১৩৩০)

টাকা হলে সংসারী মানুষের আর কি হওয়ার থাকে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ বনমালীর বিষয়

টাকার এক অদ্ভুত গন্ধ।....গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে মনে হয়—ভাই, বোন, বাবা, মা এমন কি নিজের সন্তানও কেউ নয়। একটা ব্যক্তি-স্বার্থের ভয়ংকর আকাঙ্ক্ষা মনের ভেতর থেকে সিন্দবাদের দৈত্যের মত উঠে আসে।

শ্যামলতনু দাশগুপ্ত ঃ ঝড়ের গর্জনে

বিপদোদ্ধারিণি টঙ্কে!
পাপ-নিরত-জন-দোষ-প্রক্ষালিনি, ভূষণ কলঙ্ক-পঙ্কে।
কত পদপদবী লব্ধ হইল তব শুভ্রবরণ-পরভাবে,
কত মারামারি গণ্য হইল সাধু, তব মহিমাময় রাবে ;
ঘুরিছ ঝননি এ মানবরাজ্যে কত শত সুচতুর হাতে,
করি সুখ্যাতিত কত গরু-গর্দ্দভ তাম্বুল-শূন্য করঙ্কে।

সতীশচন্দ্র ঘটক ঃ টঙ্কাস্তোত্র (লালিকা)

টাকার টঙ্কারে শুনি : মায়া এ পৃথিবী।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পলাতক

টিভি

টিভি যে সর্বনাশ করছে বাচ্চাদের এ নিয়ে এখন আর কোনও জোরদার বিতর্ক নেই। পাঁচ থেকে পনেরো বছরের ছেলেমেয়েদের সহবত, শিক্ষা, মূল্যবোধ—এ সব কিছুকে গোড়াতেই চুরমার করে দিচ্ছে টেলিভিশন। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ মনোবিদ ই. নিউসন ও অন্যান্যরা জানাচ্ছেন, টিভিবাহিত সেক্স আর ভায়োলেন্স নষ্ট করে দিচ্ছে টিন এজারদের ভালমন্দের বোধটাকেই। প্রায় সব দেশেই ছোট্ট বাচ্চাদের আরও চাওয়া আর চাইতে চাইতে, পেতে পেতে একটা সময় না পেয়ে হতাশায় ভেঙে পড়ার ক্রমাগত বাড়তে থাকা প্রবণতার পেছনে টিভির দায়িত্ব অনেকটাই। বাঙ্গালোরের 'ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব মেন্টাল হেলথ'-এর বিজ্ঞানীরা শিশুমনে হিংসার পেছনে টিভির প্রভাব খুঁজে দেখতে এ সংক্রান্ত গবেষণার ফলাফল নিয়ে সমীক্ষা চালিয়েছেন দীর্ঘকাল। কী বলছে সেই সমীক্ষার ফলাফল? টিভিতে দেখা অপরাধ কম বয়সের ছেলেমেয়ে আর টিন এজারদের মধ্যে উস্কে দিচ্ছে হিংসাত্মক প্রবণতাকে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যখন তখন দেখা যাচ্ছে অস্থিরতা, ওদের আগ্রাসী বা আক্রমণাত্মক মনোভাব বাড়ছে।

শ্যামল চক্রবর্তী : টিভি নয়, কম্পিউটারও নয়, শেষ ভরসা সেই বই
(বর্তমান ৩১.১.২০০৩)

টুসু

রাঢ় অঞ্চলে লৌকিক শস্যোৎসবকে টুসু উৎসব বলা হয়। অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে ধান পাকার পর এই উৎসব হয়।

বাংলা দেশের টুসু গানের মধ্যে জীবনের সুখদুঃখ, দৈনন্দিন জীবনের নানা সমস্যার কথা প্রকাশ পায়। টুসু গানের হাসিকান্নার মধ্যে গ্রাম্য সরল জীবনের হৃদয়ের স্পর্শ পাওয়া যায়।

গৌরী ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্য রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

টুসু পরব প্রকৃতপক্ষে এক আঞ্চলিক লোক-উৎসব। 'লোক' অর্থে প্রকৃতি-নির্ভর কিছুটা আদিম জীবনাবদ্ধ মানুষের গোষ্ঠীকে বুঝায়, যাদের দিনচর্যায় বা জীবনযাত্রায় তথাকথিত বিদগ্ধ বা পরিশীলিত জীবনের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েনি।....

টুসু প্রকৃতপক্ষে মাটির পুতুল, কন্যাসমভাবে তাকে নিয়ে উৎসব। এই পরবের অনুষ্ঠানে মাহাতো, ভূমিজ, মুন্ডা, কড়া, বাগাল লোধা, এমন কি সাঁওতালরা অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রধান ভূমিকা নিয়ে থাকে মহিলারা।....ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোন ভূমিকা এতে নেই।

প্রবোধকুমার ভৌমিক : টুসু পরব (প্রণব রায় সম্পাদিত মেদিনীপুর)

টেরাকোটা

শেষ-মধ্য ও আধুনিক যুগের শুরুতে স্থাপিত বাংলার মন্দির সমকালীন সমাজ ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক অভিব্যক্তি হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। বাংলার মন্দিরশিল্পে টেরাকোটা অলঙ্করণের বিস্ময়কর উত্থান এযুগেই।

তাপস রায় : রাঢ় বাংলার মন্দিরকলায় ইউরোপীয় উপস্থিতি

মধ্যযুগের বাংলায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব নবজাগরণের পথ খুলে দিল। আবার নতুন করে বাঙালি জেগে উঠল। উচ্চমানের পদাবলী সাহিত্য সৃষ্ট হল।....শ্রীচৈতন্যের ধর্মান্দোলনের ফলে বাংলার মন্দিরস্থাপত্য ও টেরাকোটাশিল্পে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার হল। এক পৌরাণিক নবজাগরণে দেব-দেবীরা নতুন মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। টেরাকোটাশিল্পে স্থান হল দেব-দেবীদের মাহাত্ম্যগাথা। মল্লভূমি-বিষ্ণুপুরে সতেরো শতকে যে উৎকৃষ্ট টেরাকোটা মন্দিরগুলি তৈরি হয়, তা মল্লরাজাদের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর।

প্রণব রায় : মেদিনীপুর ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তন (ভূমিকা)

ট্রাম

প্যাঁচ কিছু জানা আছে কুস্তির?
ঝুলে কি থাকতে পারো সুস্থির?
নইলে
রইলে
ট্রাম না-চড়ে—
ভ্যাবাচাকা রাস্তায় পড়ে বেঘোরে।

অজিত দত্ত : নইলে

ট্রামের লাইনের পথ ধরে হাঁটি : এখন গভীর রাত
কবেকার কোন সে জীবন যেন টিটকারি দিয়ে যায়
তুমি যেন রড ভাঙা ট্রাম এক—ডিপো নাই, মজুরির প্রয়োজন নাই
কখন এমন হলে হায়!
আকাশে নক্ষত্রে পিছে অন্ধকারে
কবেকার কোন সে জীবন ডুবে যায়।

জীবনানন্দ দাশ : ট্রাম লাইনের পথ ধরে

অবসন্ন ট্রাম বাস কলের পৃথিবী সব তখন গিয়েছে চলে ঘরে
তবুও মানুষ—সে যে কল নয়—পথ থেকে আরো দূর পথের ভিতরে
একা একা চলে যায়—।

জীবনানন্দ দাশ : রেনকোট কাঁধে রেখে

স্বেচ্ছাতন্ত্র ছেড়ে, দ্বৈতাচারী ট্রামই ভালো,
ইচ্ছার দায়িত্বহীনতা ছেড়ে সংস্কারের বাঁধা সড়ক।

বিষ্ণু দে : টপ্পা-ঠুংরী

ট্রাডিশন

আমি দিব্যচক্ষু পেয়েছি। প্রকৃত ভারতবর্ষের নিখুঁত একটা ছবি আমার সামনে ফুটে উঠল।—সেই tradition সমানে চলেছে, তার কোথাও পরিবর্তন ঘটেনি।

এস ওয়াজেদ আলি : ভারতবর্ষ

ট্র্যাজেডি

দুঃখময় নিষ্ঠুর জীবনের উপলব্ধিই হল জীবনের সত্যতম নিবিড়তম উপলব্ধি।.....তাই ট্র্যাজেডি শিল্পসাধনার মহত্তম সৃষ্টি।

অজিতকুমার ঘোষ : নাটকের কথা

ঘটনা যদি আকস্মিক হয়, বা দৈব ইচ্ছায় ঘটে, তবে মহৎ ট্র্যাজেডি সৃষ্টি অসম্ভব।

ট্র্যাজেডির মূল কথাই হল মানবচরিত্রের জটিলতা, ঘটনাটা উপলক্ষ মাত্র। মানুষের ইচ্ছায়, মানুষে মানুষে সংঘর্ষে ট্র্যাজেডি সৃষ্টি হয়।

উৎপল দত্ত ঃ চায়ের ধোঁয়া

করুণ রস এবং ট্রাজিক রস দুটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু।....করুণ রস বিগলিত মন্দাকিনী, ট্রাজিক রস ঘনীভূত বেদনার নিটোল মুক্তা। একটি কোমল, অপরটি কঠিন। একটি যদি ঝরাফুল, অপরটি তবে উৎপাটিত মহীরুহ। একটি চন্দ্রালোক, অপরটি বিদ্যুৎ। একটি যদি মধুর ও মনোহর, অপরটি তবে ভয়ঙ্কর ও সুন্দর। করুণরসে তটিনীর কলস্বর, ট্রাজিক রসে সমুদ্রের কলরব।....করুণ রস আমাদের আর্দ্র করে ,ট্রাজেডিতে আমরা স্তম্ভিত হই। শেষ কথা এই যে, করুণরস নিঃসন্দেহে করুণ, ট্রাজিক রস নিশ্চিতরূপেই নিষ্করুণ।

চিত্তরঞ্জন লাহা ঃ বাংলা নাটক (বিষয় ঃ প্রবন্ধ)

ট্রাজেডি ও কমেডি

কমেডির হাস্য এবং ট্র্যাজেডির অশ্রুজল দুঃখের তারতম্যের উপর নির্ভর করে।.... কমেডিতে পরের অল্প পীড়া দেখিয়া আমরা হাসি এবং ট্র্যাজেডিতে পরের অধিক পীড়া দেখিয়া আমরা কাঁদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৌতুকহাস্য (পঞ্চভূত)

ট্রেন

ট্রেন যেন জীবনের রূপক।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ কুয়াশা

ঠকা/ঠকানো

ঠক ভরা দরবার ছলে লয় ঘর দার।

ভারতচন্দ্র রায় ঃ অন্নদামঙ্গল

ঠকালে পয়সা হয়। চারিদিকে কত লোক ঠকিয়ে চলেছে! পৃথিবীটা কি ঠকের দুনিয়া হবে? সে তো নরক!

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ঃ তোতারাম

ঠাট

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে।
এবে বুড়া তবু কিছু গুড়া আছে শেষে।।

ভারতচন্দ্র ঃ বিদ্যাসুন্দর

ঠাট্টা

ঠাট্টার সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

নিরূপ মিত্র ঃ হীরা মোতি

সব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করলে মানুষের জীবনটাই হালকা আর অর্থহীন হয়ে যায়।

নীললোহিত ঃ তোমার তুলনা তুমি

ডাক

যে সুন্দর, তাকে ডাকি ; যে ভাল, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে তাকেই ডাকি। এই যে আশ্চর্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বসন্তের কোকিল (কমলাকান্ত)

ভালো করে না ডাকতে পেরেই আমাদের বুকের ভিতরটা এমন শুকিয়ে এসেছে।....গলা খোলে না......রাজ্যের পুঁথি পড়ে পড়ে গলা বুজে গিয়েছে।.....এমন হয়েছে আজ কান্না হলেও বেধে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন—৪

তুমি ডাক দিয়েছ কোন্ সকালে কেউ তা জানে না,
আমার মন যে কাঁদে আপন-মনে কেউ তা মানে না।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (অচলায়তন)

ফিরে ফিরে ডাক দেখি রে পরান খুলে
ডাক ডাক ডাক ফিরে ফিরে।
দেখব কেমন রয় সে ভুলে॥
সে ডাক বেড়াক বনে বনে, সে ডাক শুধাক জনে জনে,
সে ডাক বুকে দুঃখে সুখে ফিরুক দুলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতমালিকা ২)

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতচর্চা ১)

বিনা-প্রয়োজনের ডাকে
ডাকব তোমার নাম,
সেই ডাকে মোর শুধু শুধুই
পুরবে মনস্কাম।
শিশু যেমন মাকে
নামের নেশায় ডাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতিমাল্য ৩২)

তুমি কি এসেছ মোর দ্বারে
খুঁজিতে আমার আপনারে?
তোমারি যে ডাকে
কুসুম গোপন হতে বাহিরায় নগ্ন শাখে শাখে,
সেই ডাকে ডাকো আজি তারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটীর পূজা-১ম অঙ্ক

ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারিনে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।....এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল, সেই মিলনের লগ্নটি সার্থক করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্ত্যের ডাকনাম।....একটি নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নিচে আসছে, নিচে থেকে উপরে উঠে চলেছে। মানুষের জীবনেও কি ওই রকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না।...যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে.....ডাক দিয়েছি, নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ওই রঙিন মেঘের কাছে পর্যন্ত পৌঁছল, সামনের ওই পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—৬

আমার রক্তে নিয়ে আসে তোমার সুর—
ঝড়ের ডাক, বন্যার ডাক, আগুনের ডাক,
পাঁজরের উপর আছাড়-খাওয়া
মরণ-সাগরের ডাক
ঘরের শিকল-নাড়া উদাসী হাওয়ার ডাক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঁশিওয়ালা (শ্যামলী)

সব চেয়ে সহজ ডাক—প্রিয়তমে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সম্ভাষণ (শ্যামলী)

ডাক্তার (দ্র. চিকিৎসক, বৈদ্য)

আজকাল দু-এক বাঙ্গালী ডাক্তার মধ্যে মধ্যে পেসেন্টের বাড়ী ভূত সেজে দেখা দেন।.....এরা কলকেতা মেডিকেল কলেজের এডুকেটেড ভূত।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ((হুতোম) : হুতোম প্যাঁচার নক্সা

ডাক্তার-বৈদ্যতে রোগ সারাতে পারে, মৃত্যুরোগ সারাতে পারে না।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য-নিকেতন

ইনি কোথায় ডাক্তারি শিখেছিলেন, কলকাতায় কি বোম্বাই কি রেঙ্গুনে, তা লোকে জানে না।....ইনি হচ্ছেন খাঁটি হ্যামার-ব্র্যান্ড, অর্থাৎ হাতুড়ে।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) : যদু ডাক্তারের পেশেন্ট

আধুনিক ডাক্তাররা স্বভাবতই হৃদয়হীন হইয়া পড়ে। রুগীকে তাহারা এক্সপেরিমেন্টের সামগ্রী মনে করে।....তারপর ডাক্তারেরা একাধারে চোর ও খুনী। খুন করে রোগীকে, চুরি করে তাহার অভিভাবকের সর্বস্ব। আসল কথা, গভর্মেন্ট ডাক্তারদের সার্টিফিকেট ও বিদ্যা (কি বিদ্যা এবং কতখানি?) দিয়া ছাড়িয়া দেয়, কিন্তু এই মুক্ত-পাগলের দল (বদ্ধ-পাগলেরা তো গারদে থাকে, তাহাদের খারাপ কাজ করিবার শক্তি সীমাবদ্ধ।) যে কি কাণ্ড করিয়া বেড়ায়, তাহার খোঁজ রাখে না। এই বৈজ্ঞানিক জহ্লাদদের উপরে গভর্মেন্টের আরও কড়া শাসন রাখা আবশ্যক।

প্রমথনাথ বিশী : ডিনামাইট (ভূমিকা)

ডাক্তারদের যে ব্যবহার, যদি তারা মানুষের রক্তে এবং রক্তাধিক অর্থে অতিরঞ্জিত না হইত, তবে তাদের হাস্যকর বলা যাইত ; কিন্তু নিরীহ রোগীর অর্থে যাদের অস্ত্র সিক্ত, তাদের হাস্যকর বলিবে কে?

অধিকাংশ ডাক্তার চিকিৎসা-ব্যাপারে পুরাদস্তুর ব্যবসায়ী ; কিন্তু ব্যবসায়িক সাধুতা বলিয়া যে একটা অদ্ভুত গুণের প্রাদুর্ভাব বর্তমানকালে হইয়াছে, তাও এদের নাই।....খুব গোড়ার একটা কথা তারা ভুলিয়া যায়, ডাক্তার হইলেও তারা মানুষ।

এই সব বৈজ্ঞানিক পানিপাঁড়ের দল রোগীকে প্রাণের ভয় দেখাইয়া অধিকাংশ সময়ে কেবল রং-গোলা জলের ব্যবস্থা দিয়া তার ধন হরণ করে ও আশানুযায়ী টাকা আদায় করিতে না পারিলে অনেক সময় প্রাণটাও ফাউ হিসাবে আদায় করিয়া লয়। আমরা বিজ্ঞানের নামে, প্রাণের ভয়ে এই বৈজ্ঞানিক বর্গীর উপদ্রব সহ্য করিতেছি।

প্রমথনাথ বিশী : মৌচাকে ঢিল (ভূমিকা)

যাহারা পয়সা দিয়া ডাকে তাহাদের চিকিৎসা করার আর একটা মুশকিল তাহারা রোগ না সারিলে ডাক্তারকেই দায়ী করে। তাহারা পয়সাটাকেই মানে এবং অর্থের বিনিময়ে সব কিছুই সম্ভবপর বলিয়া মনে করে। মৃত্যু যে জীবনের অনিবার্য পরিণাম তাহা তাহারা জানে হয়ত, কিন্তু মানে না। তাহারা মনে করে কিছু অর্থব্যয় করিলে

বুঝি নিয়তির হাত এড়াইতে পারিবে এবং ডাক্তার তাহা এড়াইতে সাহায্য করে, সে জন্যই তাহাকে পয়সা দেওয়া, সে যদি ঠিক মত তাহা করিতে না পারে তাহা হইলে সে আবার কিসের ডাক্তার!

বনফুল ঃ নির্মোক

কলকাতার ডাক্তাররা ধনে প্রাণে মারেন।

বনফুল ঃ নির্মোক

ডাক্তারিতে রোগীর অপেক্ষা রোগীর আত্মীয়স্বজনের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখিতে হয়। পশার জমাইবার ইহাই মূলমন্ত্র।

বনফুল ঃ নির্মোক

ডাক্তারি বিদ্যার গভীরতা লইয়া কি হইবে যদি প্রাণ না থাকে?.........আমাদের বিদ্যা অতিশয় অল্প। এই অল্পবিদ্যার সহিত যদি সহৃদয়তা না থাকে তবে ইহা লইয়া ব্যবসায় করিবার চেষ্টা জুয়াচুরির নামান্তর মাত্র।

বনফুল ঃ নির্মোক

পাড়াতে এসেছে এক নাড়িটেপা ডাক্তার,
দূর থেকে দেখা যায় অতি উঁচু নাক তার।
নাম লেখে ওষুধের,
এ দেশের পশুদের
সাধ্য কি পড়ে তাহা এই বড়ো জাঁক তার।
যেথা যায় বাড়ি বাড়ি
দেখে যে ছেড়েছে নাড়ি,
পাওনাটা আদায়ের মেলে না যে ফাঁক তার।
গেছে নির্বাকপুরে ভক্তের ঝাঁক তার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খাপছাড়া

ডাক্তারী কর্ম খুব উচ্চ কর্ম বলে অনেকের বোধ আছে। যদি টাকা না লয়ে পরের দুঃখ দেখে দয়া করে কেউ চিকিৎসা করে তবে সে মহৎ, কাজটিও মহৎ। কিন্তু টাকা লয়ে এসব কাজ করতে করতে মানুষ নির্দয় হয়ে যায়। ব্যবসার ভাবে টাকার জন্য হাগা, বাহ্যের রং এই সব দেখা—নীচের কাজ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

আমি ডাক্তার কবিরাজের জিনিষ খেতে পারি না। যারা লোকের কষ্ট থেকে টাকা রোজগার করে। ওদের ধন যেন রক্ত পুঁজ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

আমরা পশ্চিমবাংলার কলকাতাতেই ছিলুম, ডাক্তার। মরে যমদূত হয়েছি।....আমরা প্রত্যেকেই এক একজন জাঁদরেল ডাক্তার ছিলুম। রুগীদের কোন ফালতু প্রশ্নের জবাব দিতুম না। প্রেসক্রিপসান ঠুকেই পকেটে টাকা পুরতুম। যমদূত বলে হেঁজিপেঁজি ভেবো না।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ঃ কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

সব মিলিয়ে ডাক্তাররা যেন আজকের সমাজের চোখে সমাজের বন্ধু নন, সমাজশত্রু ও ভিলেনরূপে পরিগণিত হতে চলেছেন।....মুষ্টিমেয় সংখ্যক চিকিৎসকের ঔদ্ধত্যের কারণে সমগ্র চিকিৎসকসমাজ আজ কাঠগড়ায়। শতরূপ পাঁচ দশজন 'ব্ল্যাকশিপের'

ব্যবহারের খেসারত সমগ্র চিকিৎসক সমাজকে দিতে হচ্ছে। চিকিৎসকরাও সমাজের বাইরে নন। এই সমাজ একদিকে চিকিৎসকদের (কিছু সংখ্যক) অর্থলোলুপতাকে ঘৃণা করছে অপরদিকে নিজের ছেলেকে 'ডাক্তার করে' তাকে টাকা উপার্জনের মেশিন করার জন্য লাখ লাখ টাকা ব্যয় করতেও পিছপা নয়। পশ্চিমবঙ্গে না হলে প্রচুর ডোনেশন দিয়ে বাঙ্গালোর থেকেও ছেলেকে "ডাক্তার" তৈরির উৎকট বাসনায় মগ্ন। এই সমাজে এইভাবে তৈরি হওয়া ডাক্তারের কাছ থেকে কতটুকু মানবতা পাওয়া যেতে পারে? তা ছাড়া সমাজে সকলেই যখন হৃদয়হীনতার পরিচয় দিচ্ছে তখন শুধু ডাক্তারসমাজের কাছে কেন মানবতার ঠিকা দেওয়া হবে?

স্বপন কুমার গোস্বামী ঃ সংবাদ প্রতিদিন ১৮.৬.২০০২

ডাক্তারি

জল, জোলাপ, জোচ্চোরি এই তিন নিয়ে ডাক্তারি।

বাংলা প্রবাদ

ডুব

ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন।
তলাতল পাতাল খুঁজলে পাবি রে প্রেম রত্ন ধন॥
ডুব ডুব ডুব ডুবলে পাবি হৃদয় মাঝে বৃন্দাবন।
দীপ দীপ দীপ জ্ঞানের বাতি হৃদে জ্বলবে অনুক্ষণ॥

কুবীর ঃ গান

ডুব দেরে মন কালী বলে।
হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জলে।
রত্নাকর নয় শূন্য কখন, দু-চার ডুবে ধন না পেলে,
জ্ঞান সমুদ্রের মাঝে রে মন, শক্তি-রূপা মুক্তা ফলে॥ ....
কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে আহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক-হলদি গায় মেখে যাও ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে॥
রতন-মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে ঝাঁপ দিলে মন, মিলবে রতন ফলে ফলে॥

রামপ্রসাদ সেন ঃ শাক্ত পদাবলী

ডোম্বি

নগর বাহিরে ডোম্বি তোহরি কুড়িয়া
ছোই ছোই যাইসি বাহ্মণ নাড়িয়া।

কাহ্নুপাদ ঃ চর্যাগীতি

তন্ত্র

তন্ত্রমন্ত্রে 'ভাণ্ডই ব্রহ্মাণ্ড'। তন্ত্র সাধনার মূল ভিত্তি জীবদেহ। 'কায়সাধন'ই প্রকৃতপক্ষে শক্তি সাধনা। তন্ত্রমতে জীবজন্মের অশেষ প্রশংসা। জীবের সঙ্কোচ আবরণ মুক্ত করে জীবকে শিবরূপে প্রতিষ্ঠা করাই এর লক্ষ্য। জীব স্বদেহেই স্থূল নাদকে কেন্দ্র করে পরানাদের স্পন্দন অনুভব করেন। কুণ্ডলিনী-জাগরণ, ষট চক্রভেদ, সহস্রার কমলে সামরস্যের আনন্দ-উল্লাস প্রভৃতি এই সাধনার অঙ্গ। অশুদ্ধ চৈতন্যের শুদ্ধ চিতিশক্তিরূপে প্রতিষ্ঠাই শক্তি-সাধনার শেষ প্রাপ্তি।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ঃ শক্তিতত্ত্ব ও শক্তিসাধনা (বিষয় ঃ প্রবন্ধ)

শক্তিদেবীর মহিমা বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তন্ত্রশাস্ত্রে। ব্যাপক অর্থে তন্ত্র বলিতে যে-কোন সাধন-শাস্ত্র বুঝায়। তন্ত্রে গণেশ, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতিরও পূজার নির্দেশ আছে ; মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে ব্রহ্ম-উপাসনার পদ্ধতি পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ 'তন্ত্র' শক্তিপ্রধান শাস্ত্র। প্রকারভেদে শক্তির তত্ত্ব ও উপাসনা-পদ্ধতি বর্ণনা করাই তন্ত্রের লক্ষ্য। তন্ত্রের সংখ্যাও অসংখ্য। আগম, ডামর, যামল প্রভৃতিও তন্ত্র। তন্ত্রের প্রধান উপাস্য মাতৃকাশক্তি। স্ত্রীমাত্রই শক্তি। প্রকৃতি (primeval matter) ; বৈদিক স্ত্রীদেবতা সরস্বতী, মহী, রাত্রি ; পৌরাণিক দেবতা দুর্গা, লক্ষ্মী, গঙ্গা ; লৌকিক দেবতা ষষ্ঠী, শীতলা, মঙ্গলচণ্ডী সকলেই শক্তির মূর্তি। এক কথায় স্ত্রীলিঙ্গবোধক যাবতীয় পদার্থ এই শক্তির প্রতীক। সংখ্যাতীত তন্ত্রগ্রন্থে লক্ষ লক্ষ মহাশক্তির উল্লেখ রহিয়াছে ঃ 'শত লক্ষ মহাবিদ্যা তন্ত্রাদৌ কথিতা প্রিয়ে' (সিদ্ধ যামল)। ইহাদের মধ্যে প্রধান দশমহাবিদ্যা—কালী তারা মহাবিদ্যা....।

তন্ত্র আর্য্য-প্রণীত শাস্ত্র ; কিন্তু ইহার মধ্যে কি তত্ত্বে, কি সাধনায় আদিমতম সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। তন্ত্রে বেদাচার, দক্ষিণাচারের উল্লেখ থাকিলেও তান্ত্রিক দেবতা ও উপাসনাপদ্ধতি লৌকিক ধারারই ধারক। তন্ত্রোক্ত বামাচার বেদ-বিরোধী। এই জন্যই তন্ত্রের প্রতি ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের মনোভাব তির্যক। ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক আচার-অনুষ্ঠান তন্ত্র হইতে গৃহীত হইলেও তন্ত্রাচারের বিরুদ্ধে বিরূপ মন্তব্য করিতে তাঁহারা ত্রুটি করে নাই।

তন্ত্রে আর্যও আর্যেতর ধারার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। আদিমতম জাতির মধ্যে মাতৃপূজার যে ধারা ছিল, যাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বেদে, দর্শনে, পুরাণে তাহাদেরই একটি সুসংহত রূপ দেখা যায় তন্ত্রে। সমন্বয়ের রূপটিই তন্ত্রের স্বরূপ। তাই ইহাতে স্থূল ভৌতিক তত্ত্ব ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, অর্থহীন মন্ত্র এবং গূঢ়ার্থব্যাঞ্জক মন্ত্র, কবিত্ব ও দার্শনিকতা এবং আভিচারিক ষট্‌কর্ম (শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন ও মারণ), বৈধ এবং অবৈধ আচার একাধারে সমীভূত হইয়াছে। তন্ত্রে একদিকে যেমন বলা হইয়াছে ঃ

মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
ম-কারং পঞ্চ দেবেশি শীঘ্রং সিদ্ধিপ্রদায়কম্॥ (মহানির্বাণতন্ত্র)

তেমনই আবার ইহাদের আধ্যাত্মিক অর্থের প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে,

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্তিতম্॥.....
কুলকুণ্ডলিনী শক্তির্দেহিনাং দেহধারিণী।
তয়া শিবস্য সংযোগো মৈথুনং পরিকীর্ত্তিতম্॥ (বিজয়তন্ত্র)

উপাসনা-পদ্ধতি যাহাই হউক, তন্ত্রগ্রন্থে মাতৃকাশক্তির একচ্ছত্র প্রভাব। তন্ত্রের ধ্যান, জ্ঞান, স্তবস্তুতি, জপ, হোম, মন্ত্র, মণ্ডল সব কিছুর লক্ষ্য জগন্মাতা। মাতৃ-তান্ত্রিক জাতির মাতৃভাবাসক্তির শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তন্ত্রশাস্ত্র। ইহা শক্তি-উপাসনার কল্পভাণ্ডার।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ঃ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা

তপস্যা

ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার মূলমন্ত্র হল তপস্যা। শ্রেয় ও প্রেয়র দ্বন্দ্বের মধ্যে সত্য উপলব্ধির জন্য প্রজ্ঞার প্রয়োজন। তপস্যাবলে সেই প্রজ্ঞার মাধ্যমে আমরা জীবনের পরম সত্য শ্রেয়কে উপলব্ধি করতে পারি। এতেই ঈশ্বরের সাধনা ও সমাজকল্যাণের পথ প্রশস্ত হতে পারে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ঃ সম্পাদকের কলমে (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভারততীর্থ

বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়। কেবলমাত্র তপস্যার মধ্য দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ। আরও তপস্যা আছে সামনে, স্থূল আবরণ যুগে যুগে ত্যাগ করতে করতে সে হবে দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছোটোগল্প (তিনসঙ্গী-পরিশিষ্ট)

জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের—নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১০

তপস্বিনী

আকাশে আকাশে তারাগুলি যেন তামসী তপস্বিনীর নীরব জপমন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শাপমোচন

তপোবন

ভারতবর্ষের যে আদর্শ তপোবন সে তপোবন শরীরের বিরুদ্ধে আমার, সংসারের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসের একটা নিরন্তর হাতাহাতি যুদ্ধ করবার মল্লক্ষেত্র নয়।.....যা-কিছু সমস্তের সঙ্গে ত্যাগের দ্বারা বাধাহীন মিলন, এইটেই হচ্ছে তপোবনের সাধনা। এইজন্যেই তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে ভারতবর্ষের আত্মীয়-সম্বন্ধের যোগ এমন ঘনিষ্ঠ যে, অন্য দেশের লোকের কাছে সেটা অদ্ভুত মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তপোবন (শান্তিনিকেতন)

তরঙ্গ

তটের পায়ে মাথা কুটে
তরঙ্গদল ফেনিয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৩৩

শৈলতটের পায়ের পরে
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৩৬

তরঙ্গের বাণী সিন্ধু
চাহে বুঝাবারে।
ফেনায়ে কেবলই নেমে।
মুছে বারে বারে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ

তরুণ

অন্ধকারাচ্ছন্ন এই যুগের ওপারে
আছে এক শুদ্ধশীল তরুণ সমাজ
আছে শুভবোধ
এইটুকু জেনে যাক তারা
অন্ধকারই শেষ কথা নয়
এই যুদ্ধ রক্ত হিংসা দ্বেষের ওপারে
আরেক চেতনার আলো জ্বলে ওঠে নিস্তব্ধ আঁধারে—।

অনন্ত দাশ ঃ শিকড়ের টানে ফেরা

অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চলরে চলরে চল।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান

তর্ক

বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর।

বাংলা প্রবাদ

—মিথ্যে তর্ক কোরো না।
—অর্থাৎ তুমি তর্ক করবে, আমি করব না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবিবার (তিনসঙ্গী)

তর্কের বিষয়টা কী, অধিকাংশ সময়ে তাহা বুঝিবার পূর্বেই তর্ক বাধিয়া যায়। সেটা যতই কম বোঝা যায়, তর্কের বেগ ততই প্রবল হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শব্দতত্ত্ব—বাংলা ব্যাকরণ।

তর্কের বেলায় গৃহিণীর যুক্তিতে অকাট্য বলে কাজের বেলায় নিজের যুক্তিতে চলাই সৎপরামর্শ—গোয়ার্তুমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শোধবোধ ২য় দৃশ্য

তলিয়ে যাওয়া

আমরা তলিয়ে যাচ্ছি। রাশি রাশি মিথ্যে ভয় আর দুর্বলতার মধ্যে আমরা তলিয়ে যাচ্ছি। আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। সময় আসছে—সময়।

শ্যামলতনু দাশগুপ্ত ঃ শীতের আগুন

তলোয়ার

তলোয়ার গুলোর কোনোটা খায়......নিমক, কোনোটা খেয়ে বসেছে........ঘুস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রথের রশি

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—৩৬

তস্কর

নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে?
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে?

মধুসূদন দত্ত ঃ মেঘনাদবধ কাব্য

তাজমহল

তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ কি তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোম্‌তাজ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সাম্যবাদী

কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শা-জাহান

তামাক

সর্বশ্রমসংহারিণী তামাকু দেবীর সেবা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিষবৃক্ষ

তারা

এমন দিন কি হবে তারা।
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।

রামপ্রসাদ সেন ঃ শাক্ত পদাবলী

চোখে কেমন লাগছে ধাঁধা—
লাগছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হল,
কিম্বা জোনাক হল তারা।

সতেন্দ্র নাথ দত্ত ঃ দূরের পাল্লা

তিনি

তিনি চেনালে লেখক
তিনি চাইলে প্রচার
তিনি দিলেই প্রাইজ।

মতি মুখোপাধ্যায় ঃ মিডিয়া

তিমির

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

জীবনানন্দ দাশ ঃ তিমিরহননের গান (সাতটি তারার তিমির)

তিমির দিগভরি ঘোর রজনী
অথির বিজুরিক পাতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিনরাতিয়া।

বিদ্যাপতি ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

তিমিরদুয়ার খোলো—এসো, এসো নীরবচরণে।
জননী আমার, দাঁড়াও এই নবীন অরুণকিরণে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলিপি—২

তিমির-অবগুণ্ঠনে বদন তব ঢাকি
কে তুমি মম অঙ্গনে দাঁড়ালে একাকী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা ১

তীর্থ

তীর্থভ্রমণের এক প্রধান অঙ্গ সাধুসঙ্গ।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ গঙ্গাবতরণ

তীর্থে থাকলে অমঙ্গল হয় না, কারো কোনো অভিশাপ ফলে না।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারানাথ তান্ত্রিক

তুমি

তুমি এলে—ভালোবাসার যোগ্য হল ঘর।
তুমি এলে—বন্ধ ঘরে বাতাস এলো।
স্বর্ণচাঁপা আলোয় ভরে গেল ঘর।

অজিত বাইরী : প্রেমের কবিতা

তোমারি আঁখির মত আকাশের দুটি তারা
চেয়ে থাকে মোর পানে নিশীথে তন্দ্রাহারা।
সে কি তুমি? সে কি তুমি?......
বৈশাখী ঝড়ে রাতে চমকিয়া উঠি জেগে
বুঝি অশান্ত মম আসিলে ঝড়ের বেগে,
ঝড় চ'লে যায় কেঁদে ঢালিয়া শ্রাবণ-ধারা।
সে কি তুমি? সে কি তুমি?

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (কাব্য-গীতি)

তুমি তো একটা রূপকথা দিয়ে তৈরি।

জয় গোস্বামী : সাঁঝবাতির রূপকথারা

তুমি জল—তুমি ঢেউ—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
তোমার দেহের বেগ—তোমার সহজ মন
ভেসে যায় সাগরের জলের আবেগে!
কোন্ ঢেউ তার বুকে গিয়েছিল লেগে
কোন্ অন্ধকারে
জানে না সে!—কোন্ ঢেউ তারে
অন্ধকারে খুঁজিছে কেবল
জানে না সে!—রাত্রির সিন্ধুর জল,
রাত্রির সিন্ধুর ঢেউ
তুমি এক! তোমারে কে ভালোবাসে!—তোমারে কি কেউ
বুকে করে রাখে!
জলের আবেগে তুমি চলে যাও,—
জলের উচ্ছ্বাসে পিছে ধূ-ধূ জল তোমারে যে ডাকে!

জীবনানন্দ দাশ : সহজ (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

আকাশ যদি একটা রঙ্গমঞ্চ হত ; প্রত্যেক নক্ষত্র যদি এক একটি পবিত্র চরিত্র হত; জ্যোৎস্না যদি একটা অনাবিল সঙ্গীত হত; তো সে মহানাটকের নায়িকা হতে তুমি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : মেবার পতন

তোমার চোখের দিকে তাকালে, আমার কেন যেন নীল আকাশ,
প্রথম উষার সূর্যোদয়, উন্মীলিত শ্বেতপদ্ম, মন্দিরের
সামনে বহতা নদীটির কথা মনে পড়ে।....
তুমি কাছে এলে পদ্মের গন্ধ পাই, ধূপবাতির নীল গন্ধ,
শান্ত একটি রূপায়ত দূর দিগন্ত কাছে এসে দাঁড়ায়।

নচিকেতা ভরদ্বাজ : একটি শুদ্ধ ভালোবাসার কবিতা

তুমি আমার আকাশ,
—আমার দুরন্ত স্রোতে কম্পমান
তোমার পরিচয়।
তুমি আমার অরণ্য!
আমার ঝঞ্ঝাবেগের
প্রশ্রয় ও প্রতিবিম্ব!

প্রেমেন্দ্র মিত্র : ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে (সম্রাট)

তুমি আছো, তুমি আছো,
এ-বিস্ময় সওয়া যায়নাকো ;
অরণ্য কাঁপিছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : নীল দিন (সম্রাট)

কুলহীন সমুদ্র,
দিগন্তহীন আকাশ,
তুমি তো আমার সে-ই!

প্রেমেন্দ্র মিত্র : সৌরভ (সম্রাট)

এ জগতে দুঃখ নেই, পাপ নেই, শোক নেই, ভয় নেই, মৃত্যু নেই.....আছে শুধু আনন্দ, অমরত্ব, বিরাটত্ব। আর তুমিই তার অধিকারী। অতএব ওঠো, জাগো—তৎ ত্বমসি, তুমিই সেই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : দেবযান

ছোট তুমি নও। তুমিই দেব, তুমিই দেবী, তুমিই সগুণ ঈশ্বর—তুমিই জগৎকারণ নিরুপাধি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ—একই আছে, আর কিছু নেই জগতে—একম্ এব অদ্বিতীয়—পৃথিবী বা পরলোক সব দুদিনের খেলা, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু—বার বার আসা-যাওয়া—সব অনিত্য—জেগে ওঠা—ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : দেবযান

তুমি, যে তুমিই ওগো
সেই তব ঋণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে
শুধি চিরদিন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তুমি (স্ফুলিঙ্গ)

আমি উড়ে বেড়াই আমি ঘুরে বেড়াই
আমি সমস্ত দিনমান পথে পথে পুড়ে বেড়াই
কিন্তু আমার ভালো লাগে না যদি ঘরে ফিরে না দেখতে পাই
তুমি আছো, তুমি।

শঙ্খ ঘোষ : তুমি

তুমি আমার বিশুদ্ধ জল, তুমি আমার পাপ
তোমায় ফেলে কলসী ভরে রাখবো মনস্তাপ?....
এই আভাতে আমি আঁধার আমি হেমের অমাঃ
তুমি আমার সমস্ত পাপ, তুমি আমার ক্ষমা।

সুরাইয়া খানম : অমর পূর্ণিমা

তেল/তৈল

তৈল বিনা কৈলু স্নান করিনু উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল

যাহা বলের অসাধ্য, যাহা বিদ্যার আসাধ্য, যাহা ধনের অসাধ্য, যাহা কৌশলের অসাধ্য, তাহা একমাত্র তৈল দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ তৈলদান

যে তৈল দিতে পারে সে সর্বশক্তিমান, কিন্তু তৈল দিলেই হয় না। দিবার পাত্র আছে, সময় আছে, কৌশল আছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ তৈলদান

তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যের স্বভাব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিড়াল

তোতলামি

মনের তোতলামি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ ক্রীড়াভূমি (ক্রীড়াভূমি)

তোমার/তোমাকে

সমস্ত ভোর ছড়িয়ে পড়ে তোমার পায়ে পায়ে
সমস্ত নীল সূর্য নিয়ে স্তোত্র লেখা হয়
তোমার রূপ সংকেতের চিত্রাভাস চুলে
তোমার হাতে অন্ধকার, উপমা বুক জুড়ে
তোমাকে তাই ফিরিয়ে আনি রাতের বিস্ময়ে।

অমিতাভ গুপ্ত ঃ ফিরিয়ে আনি

ত্যাগ

শাস্ত্রকার নিবৃত্তি-পথকে শ্রেষ্ঠ করিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক অকৃত্রিম আনন্দ ত্যাগের পথেই আছে। ভোগের পথে রোগ, শোক, পরিতাপ, কলহ, বাদ-বিসংবাদ এবং হিংসা, দ্বেষ, ঈর্ষা, অসূয়া প্রভৃতির নিত্যলীলা।

অন্নদাঠাকুর ঃ স্বপ্নজীবন

ত্যাগ, ত্যাগ....। ত্যাগী না হলে তেজ হবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী ৭

ধর্মের প্রথম প্রমাণ হলো—ত্যাগ। ত্যাগ না হলে কোন ধর্ম হতে পারে না।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ঃ ঈশ্বর দর্শনের উপায় জপ-ধ্যান

ত্যাগ ছাড়া ধর্মজীবন হয় না।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ঃ ঈশ্বর দর্শনের উপায় জপ ধ্যান

মনে ত্যাগ হলেই হলো, তা হলেও সন্ন্যাসী।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ত্যাগের রূপ দেখো ঐ ঝরনায়,
নিয়ত গ্রহণ করে তাই নিয়তই করে দান।
নিজেকে যে শুকিয়েছে যদি সেই হল ত্যাগী,
তবে সব-আগে শিব ত্যাগ করুন অন্নপূর্ণাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালের যাত্রা। কবির দীক্ষা

"অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ".....কিন্তু ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো আনা, এমন-কি পনেরো আনাও ত্যজতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে-বাইরে—সন্দীপের আত্মকথা

রস ভরে উঠলে তবেই তো ত্যাগ সহজ হয়। মেঘ যখন জলে ভারি হয় তখনই জল বর্ষণ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার সভা—৫।২

মেয়েরা সেইখানেই ত্যাগ করে যেখানে তাহাদের প্রবৃত্তি ত্যাগ করায়, তাহাদের সন্তানের জন্যে, প্রিয়জনের জন্যে। পুরুষের যথার্থ ত্যাগের ক্ষেত্র প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নরনারী (পঞ্চভূত)

সংসারে যে ব্যক্তি কিছু হারায় নাই সে কিছু পায় নাই। অমনি যাহা আমাদের হাতে আসে, তাহাকে আমরা সম্পূর্ণ পাই না ; ত্যাগের দ্বারা আমরা যখন তাহাকে পাই, তখনি যথার্থ তাহা আমাদের অন্তরের ধন হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৌকাডুবি—৪১

শেষ ত্যাগ হোক তব ভিক্ষাঝুলি, নববসন্তের
আগমনে অরণ্যের শেষ শুষ্ক পত্রগুচ্ছ যথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—১২

কামনা না করে তো ত্যাগ করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা—১৫

....ত্যাগ নিজেকে রিক্ত করার জন্যে নয়, নিজেকে পূর্ণ করার জন্যেই। ত্যাগ মানে আংশিককে ত্যাগ সমগ্রের জন্য, ক্ষণিককে ত্যাগ নিত্যের জন্য, অহংকারকে ত্যাগ প্রেমের জন্য, সুখকে ত্যাগ আনন্দের জন্য।.....ত্যাগের দ্বারা ভোগ করবে, আসক্তির দ্বারা নয়।....ত্যাগকে দুঃখরূপে অঙ্গীকার করে নেওয়া নয়, ত্যাগকে ভোগরূপেই বরণ করে নেওয়া উপনিষদের অনুশাসন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তপোবন—(শান্তিনিকেতন)

ত্যাগ করবার কৃত্রিম চেষ্টাতেই ফাঁস আরো বেশি করে আঁট হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরশরতন (শান্তিনিকেতন)

.....ত্যাগ জিনিসটা শূন্যতা নয়, তা অধিকারের পূর্ণতা। নাবালক যখন সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকারী না হয় তখন সে দান বিক্রয় করতে পারে না—তখন তার কেবল ভোগের ক্ষুদ্র অধিকার থাকে, ত্যাগের মহৎ অধিকার থাকে না। আমরা যে অবস্থায় কেবল জমাতে পারি, কিন্তু প্রাণ ধরে দিতে পারি নে, সে অবস্থায় আমাদের সেই সঞ্চিত সামগ্রীর সম্বন্ধে আমাদের স্বাধীনতা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ত্যাগ (শান্তিনিকেতন)

থমকে

ঈশান কোণে থমকে আছে হাওয়া,
মেঘে মেঘে আকাশ আছে ঘেরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিবাহ (কথা)

থাকা

থাকাটা আকস্মিক,
না-থাকাই সে তো দেশকাল ছেয়ে
চেয়ে আছে অনিমিখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শূন্যঘর (পরিশেষ)

থামা

থামতে চাই না আমরা, থামা মানে মৃত্যু নিথরতা
স্পন্দহীন ধূসরতা, নামহীন বিস্মরণে ডুবে
সব ইচ্ছা মরে যাবে, অন্ধকারে গাদাগাদি শুয়ে
কাটাবে প্রাক্তন কাল,
এই থামা প্রাণ বিরোধিতা।

কৃষ্ণ ধর : কালের নিসর্গ দৃশ্য

থিয়েটার

মানুষ সামাজিক জীব। সংঘবদ্ধতা তার মূল বৈশিষ্ট্য। সমাজের মধ্য দিয়েই সে চায় ভালোভাবে বেঁচে থাকতে, সে চায় সুন্দর জীবন, সে স্বপ্ন দেখে সার্থক জীবনের।.....থিয়েটার সমাজের দর্পণ। সমাজ ব্যবস্থার প্রতিফলন। সুন্দর ও সুস্থভাবে বেঁচে থাকার অন্তরায় যে সমাজ ব্যবস্থা, সেই সমাজ ব্যবস্থার অভিশাপ শিল্পীর তুলির আঁচড়ে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে। সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসেন শিল্পী কলাকুশলী। সমাজব্যবস্থার জমে থাকা গ্লানি থেকে সমাজের বুক চিরে উঠে আসে নাট্যকারের রক্তগোলাপ।

অচিন্ত্য কুমার বসু : দুই বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলা থিয়েটার

অর্থনৈতিকভাবে থিয়েটার মধ্যবিত্ত শিল্প।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় : পেশাদার হতেই হবে।

জীবনের সংগ্রামই হল থিয়েটারের সংগ্রাম।

ঊষা গাঙ্গুলী : সাক্ষাৎকার (শারদ সংলাপ)

মধ্যবিত্ত জীবনের একদিকে যেমন রয়েছে লোভ, লালসা, সুবিধা—অপরদিকে সামাজিক দায়বদ্ধতা, রাজনৈতিক সচেতনতা, জীবনের আদর্শ। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে আমাদের থিয়েটারে। আমার আমিত্ব যখন বৃহত্তর হয়ে ওঠে, তখন দায়বদ্ধতার কাজ ক্ষুণ্ণ হতে থাকে।

ঊষা গাঙ্গুলী : সাক্ষাৎকার (শারদ সংলাপ)

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তনে থিয়েটারের ভূমিকা সহায়কের, সহযোগী অস্ত্রের। মানুষকে তার সামগ্রিক সামাজিক পারিপার্শ্বিকের মধ্যে ধরাটা থিয়েটারের কাজ।....রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন যেমন একটা রাজনৈতিক প্রয়াস তার পাশাপাশি সেই পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলা থিয়েটারের কাজ।

দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় : শারদ সংলাপ

নিজের অধিকার এবং দায়িত্ব সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা থিয়েটারের কাজ। সমাজের মুষ্টিমেয়ের বদলে বেশীর ভাগ মানুষের স্বপ্ন—সুন্দর জীবন, বিশ্বমানবের অগ্রগতির সঙ্গে নিজের ছন্দ-গতিকে মিলিয়ে দেখাতে শেখায় আমাদের থিয়েটার। বিশ্বজনীন সৌভ্রাতৃত্বের জন্মদাতা আমাদের থিয়েটার। আমাদের থিয়েটার মানেই চেতনা, মুক্তি, স্বাধীনতা, প্রেম। সমাজের প্রগতিশীল ধারাগুলির সঙ্গে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক মানেই আমাদের থিয়েটার।

নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত : সাক্ষাৎকার (শারদ সংলাপ)

বাংলা থিয়েটার মূলত মধ্যবিত্তের থিয়েটার।

বিষ্ণু বসু : সাক্ষাৎকার (থিয়েটার ভাবনা)

মাটির কাছাকাছি আর জীবনের কাছাকাছি কোন পালা বাঁধতে চাই—যা মানুষকে ভাবাবে—যে নাটকে মানুষ তার যুগচেতনাকে অতিক্রম করে আরও উন্নত কোন

জীবন চাহিদা আরও উন্নত কোন সমাজ চাহিদার অনুসন্ধান করবে, বহিরাগত পর্যবেক্ষকের মতো নয়, অন্তর্গত ভাবনার শরিক হয়ে, আমি বিশ্বাস করি ভিন্ন ভিন্ন নাটকের, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কাছে পৃথক পৃথক আবেদন থাকে। তবু জীবনের অতলান্তে পৌঁছানোর তাগিদে মানুষের আদ্যন্ত লড়াইয়ের কিছু সত্যের আহ্বান আসলে যেহেতু এক, আর জীবন্ত মানুষই যেহেতু থিয়েটারের কেন্দ্রে তাই নিজের সমাজ পরিবেশকে নিরীক্ষণ—না কেবল নিরীক্ষণ নয়, গভীরে অনুভব করতে পারলেই আমার সেই আদর্শ থিয়েটার সম্ভব হবে।

মণীশ মিত্র : যে থিয়েটার করতে চাই (বিষয় থিয়েটার)

বিলাতের নকলে আমরা যে থিয়েটার করিয়াছি তাহা ভারাক্রান্ত একটা স্ফীত পদার্থ। তাহাকে নড়ানো শক্ত, তাহাকে আপামর সকলের দ্বারের কাছে আনিয়া দেওয়া দুঃসাধ্য, তাহাতে লক্ষ্মীর পেঁচাই সরস্বতীর পদ্মকে প্রায় আচ্ছন্ন করিয়া আছে।....বাগানকে যে অবিকল বাগান আঁকিয়াই খাড়া করিতে হইবে এবং স্ত্রীচরিত্র অকৃত্রিম স্ত্রীলোককে দিয়াই অভিনয় করাইতে হইবে, এরূপ অত্যন্ত স্থূল বিলাতি বর্বরতা পরিহার করিবার সময় আসিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রঙ্গমঞ্চ

থিয়েটারের কর্মীদের অবশ্যই থিয়েটারকে তরবারির মত ব্যবহার করতে হবে।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় : সমাজ ও সংস্কৃতি

থিয়েটার মানেই যে বিদ্যা আর বিনোদনের মেলবন্ধন। হাত দুটোকে ভূত আর ভবিষ্যতের দিকে বাড়িয়ে পা-দুটো দিয়ে সাম্প্রতিকে হাঁটা। হোক না সে 'কৃষ্ণকুমারী' কিংবা 'নব-নাটক'। আর ঠিক সময়ে ঠিক কথাটা বলতে না পারলে আমাদের অবস্থা হবে 'নব-নাটক'-এর সেই বিরহিণী বউ-এর মতো যে ঘাটে জল আনতে গিয়ে গেয়ে উঠেছিল—

'মন যে আমার কেমন কেমন করে।
বলি কারে, বলি কারে।'

সলিল সরকার : থিয়েটারের কলকাতা

থিয়েটার অন্যান্য শিল্পের মতই এক শিল্পভঙ্গী, একধরনের সামাজিক সচেতনতা যা মানুষের জীবন, জাতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতি থেকে অবিচ্ছিন্ন। থিয়েটারের বিকাশ বা অবক্ষয়, তার বিভিন্ন ভঙ্গীর চিন্তার বা ধারার বিকাশ, সামাজিক জীবনে থিয়েটারের অবস্থিতি এবং সমসাময়িক জীবনের সঙ্গে থিয়েটারের সম্পর্ক এ সব কিছুই নির্দিষ্ট হয় সামাজিক কাঠামো ও তার চিন্তাগত চাহিদা বা আকাঙ্ক্ষায়। সাধারণ থিয়েটার যখন সমাজের সমসাময়িক প্রগতিশীল চিন্তার জারকে জারিত হয়, তখন থিয়েটারে শিল্পসম্মত ব্যাপকত্ব লক্ষ্য করা যায় ; তখনই থিয়েটার মানবিক আদর্শ, মানুষের জটিল অন্তর্জগৎ, তার সামাজিক আকাঙ্ক্ষা—সব কিছু আত্মস্থ করে হয়ে ওঠে সামাজিক দর্পণ।

সত্য বন্দোপাধ্যায় : থিয়েটার ও জাতীয়তাবোধ (শূদ্রক ১৩৯৪)

থিয়েটারের গান

থিয়েটারের অন্যান্য উপচারের মতোই স্থান-কাল-পাত্র বিচারে সহযোগী ভূমিকা পালন করে সংগীত। নাট্য নিয়ন্ত্রিত নাট্যসংগীতের ব্যবহারিক প্রয়োগে দেখা যায় আবহসংগীতের পাশাপাশি জায়গা করে নেয় গান। রচিত নাট্য-অংশ হিসেবে নয়

নাট্যপরিবেশনকালে যে গান থিয়েটারি প্রযোজনার অঙ্গাঙ্গী সহযোগীতা মঞ্চগীতি বা থিয়েটারের গান। আর সেক্ষেত্রে গান সংলাপের পরিপূরক।

দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা থিয়েটারের গান, নান্দী-পট, সাহিত্য অকাদেমি, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৯

বাংলা মঞ্চনাটকের ধারা লক্ষ করলে দেখা যায়, গানই ছিল নাট্যের প্রাণ, গানের মধ্যে দিয়েই ফুটে উঠত নাট্যঘটনা, নাট্যসংঘাত। সময়ের তালে পা রেখে পাল্টে গেছে তার রূপরেখা। নানা প্রতিভার ছোঁয়ায় জন্ম নিয়েছে নতুন নতুন নাট্যচিন্তা। সংগীতও সেই নিরীক্ষারই সঙ্গী। মঞ্চভাবনার বহু বিবর্তনের সঙ্গেই তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠেছে সংগীতের সমৃদ্ধ ধারা—থিয়েটারের গান বা মঞ্চগীতি—যা কখনো সুরের মায়ায়, কখনো ভাবের আবেগে, কখনো কাব্যের টানে নাট্যে এনে দিয়েছে গতি। সুরনিবদ্ধ সৌন্দর্যে প্রাণ পেয়েছে বঙ্গরঙ্গমঞ্চ।

দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলার মঞ্চগীতি (১৭৯৪-১৮৭২)

থিয়েটারের ভাষা

নাটকে যেটুকু লেখা আছে যাকে আমরা টেক্সট বলি তাকে ছাড়িয়ে যায় থিয়েটার। ফলে থিয়েটারের ভাষার সঙ্গে নাট্য-সংলাপের ফারাকটা সহজেই চোখে পড়ে। যদিও নাট্য-সংলাপ থিয়েটারের ভাষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ কিন্তু নাট্য সংলাপই থিয়েটারের ভাষা নয়। নাটকের লিখিত অবয়বটুকুর চেয়ে অনেক বেশি স্তরের প্রতিভাসে অনেক বেশি জটিল হয়ে থিয়েটারের ভাষা প্রকাশিত হয়। মঞ্চসজ্জা, আলো, সঙ্গীত, নেপথ্য শব্দ ও মঞ্চের ওপরের অভিনয় সমস্ত কিছু মিলিয়ে এমন একটা ঘটনা ঘটে যা আশ্চর্যরকমভাবে থিয়েটারকে চলমান সত্তা দান করে।

অপূর্ব দে : থিয়েটারের ভাষা (অনুষ্টুপ, ১৪০৬)

প্রতিমুহূর্তে থিয়েটারের ভাষা বদলে যাচ্ছে। আর বদলে যাচ্ছে বলেই থিয়েটার এত সজীব, এত জীবন্ত। আসলে গানের সঙ্গে কথার, কথার সঙ্গে শব্দের, শব্দের সঙ্গে আলোর, আলোর সঙ্গে মঞ্চসজ্জার, আবার মঞ্চসজ্জার ধাঁচের সঙ্গে রঙের, গানের বাণীর সঙ্গে সুরের সর্বত্র সংঘাত এবং এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই থিয়েটার এগিয়ে চলে তার লক্ষ্যের দিকে। নানা ভাঙচুর এবং অলিগলির মধ্য দিয়েই তাকে চলতে হয়। এই চলার পথেই সে বাঁক পরিবর্তন করে নদীর মতো যা সহজে চোখে পড়ে না।

অপূর্ব দে : থিয়েটারের ভাষা (অনুষ্টুপ ১৪০৬)

দণ্ড

অপরাধীর যথার্থ দণ্ড না হইলে, সমাজের অমঙ্গল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : আবার অতি অল্প হইল

আহা, লাল পাগুড়ী বেঁধে মাথে রাজা হলে মথুরাতে
বাঁশি ছেড়ে দণ্ড হাতে বঁধু হলে দণ্ড দাতা।
কলঙ্কিনী রাধার দণ্ড না দিলে মান থাকে কোথা?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ডাকহরকরা

দয়া

যাঁর চক্ষু দয়ার অশ্রুতে সিক্ত হয়, তিনি দেবতার মধ্যে দেবতা।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ : অশ্রু

আর্তের প্রতি যে বিশেষ প্রীতি-ভাব, তাহাই দয়া।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ধর্মতত্ত্ব

দয়ার পর ধর্ম নাই, হিংসার পর পাপ নাই।

বাংলা প্রবাদ

পর প্রতি দয়া আর হিত-আচরণে।
শরীরের শোভাবৃদ্ধি, নহে ত চন্দনে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নীতি-কুসুমাঞ্জলি

দয়া দিয়ে হবে গো মোর জীবন ধুতে।
নইলে কি আর পারব তোমার চরণ ছুঁতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি৭৫

দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে ; প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ় বীর্য এবং কঠিন অধ্যবসায় আবশ্যক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চারিত্রপূজা

সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম জীবে দয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছিন্নপত্রাবলী—১১৭, ২২.৩.১৮৮৪

আমার জিনিষ, আমার জিনিষ বলে—সেই সকল জিনিষকে ভালোবাসার নাম মায়া। সবাইকে ভালোবাসার নাম দয়া।....মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়, ভগবান থেকে বিমুখ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

দয়া সর্বভূতে ভালোবাসা; সমদৃষ্টি। কারু ভিতর যদি দয়া দেখ যেমন বিদ্যাসাগরের সে জানবে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্বভূতের সেবা হয়। দয়াতে চিত্তশুদ্ধি হয়। ক্রমে বন্ধনমুক্তি হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

দয়া! পরোপকার! তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরোপকার করো?.....দয়া ঈশ্বরের ; মানুষ আবার কি দয়া করবে?

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত (বঙ্কিমের সঙ্গে কথা)

যার ভেতরে দয়া নেই, সে কি মানুষ?

সারদাদেবী ঃ মাতৃসান্নিধ্যে—ঈশানানন্দ

দরদ

দরদ তোদের বুইঝা গেছি
চোর খুনিদের ছা
ভোট দিব না ভোট দিব না যা।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় ঃ চার প্রহরের কবিতা

দরদী

ওগো নিঠুর দরদী, এ কি খেলছ অনুক্ষণ!
তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন।...
ডাকিলে কও না কথা, কী নিঠুর নীরবতা!
আবার ফিরে চাও, বল, 'ওগো শুনে যাও,
তোমার সাথে আছে আমার অনেক কথন'।

অতুলপ্রসাদ সেন ঃ গীতিগুঞ্জ

দরিদ্র

দরিদ্ররা রাজনীতির গিনিপিগ সে আর নতুন কথা কী।......দরিদ্রবহুল দেশে গিনিপিগের অভাব নেই। কে আমাদের গিনিপিগ আর কে ওদের গিনিপিগ, সেটাই একমাত্র বিচার্য।

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় : আনন্দবাজার পত্রিকা (৭.৫.২০০২)

ধনীর দোষেই দরিদ্র চোর হয়। পাঁচ শত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন? যদি করিল, তবে সে তাহার খাইয়া যাহা বাহিয়া পড়ে, তাহা দরিদ্রকে দিবে না কেন? যদি না দেয়, তবে দরিদ্র অবশ্য তাহার নিকট হইতে চুরি করিবে ; কেন না, অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিড়াল (কমলাকান্তের দপ্তর)

দরিদ্র যদি প্রতিজ্ঞা আঁকড়াইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে আরও একটা জিনিষ চিরদিনের জন্য আঁকড়াইয়া থাকিতে হয়, সে জিনিষটা দারিদ্র্য।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : নীলাঙ্গুরীয়

স্কুল কলেজ পুড়িয়ে মূর্তি ভেঙে কোনো দর্শন নাকচ করা যায় না। ভুল দর্শনকে সঠিক দর্শন দিয়ে ঠেকাতে হয়। গায়ের জোরে কোনো মনীষী, নেতা, মতবাদ, রাষ্ট্রতত্ত্বকে ধ্বংস করা যায় না।

শৈবাল মিত্র : অজ্ঞাতবাস

দল

সবার উপরে দলীয় স্বার্থ তাহার ওপরে নাই।

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় : সুরে সুরে সুর মেলাতে (দেশ ১৮.৩.২০০৩)

দেশের লোকের ছাড়ছে নাড়ি।
বাড়ছে দলের গাড়ি বাড়ি॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : দেয়ালের লিখন

দলিত

দলিত সাহিত্য এক নবমুক্তি আন্দোলনের চারণগীতিকা। দীর্ঘ সুষুপ্তি থেকে জেগে ওঠা দলিত মানুষের জীবন চর্চা এবং চর্যার ধারাবহিকতা থাকবে তার মধ্যে। দলিত সাহিত্য সৃষ্টির গুরুভার/গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য চাই লড়াকু সৈনিকের শক্তি আর মনোবল।

রেনেসাঁ বা নবজাগরণ বলা যাবে না তাকে। জোর করে ঘুম পাড়িয়ে রাখা দলিত মানুষের বীভৎস দুঃস্বপ্ন ভেঙ্গে জেগে ওঠার অপর নাম দলিত সাহিত্য এবং "সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে লাগবে লড়াই মিথ্যে ও সাঁচার।" অচলায়তনের নিগড় ভেঙ্গে বর্ণহীন শ্রেণীহীন এক শাশ্বত ভারতের জাগরণ, দলিত ভূমিপুত্রদের আত্মশক্তিতে নিজেদের শক্তি-সম্ভব এক সোনাঝরা সকালের জন্য অতন্দ্র তপস্যা। তাই দলিত সাহিত্য অন্য এক নবজাগরণ। দলিত সাহিত্য ভারতীয় তথাকথিত বর্ণাভিমানী অভিজাত বর্গের প্রগতি বিরোধী রক্ষণশীল, সনাতন সাহিত্য সভায় হাজার হাজার বছরের ঘৃণা, অবদমন, প্রতারণা, ঈশ্বর ব্যবসা, অহঙ্কার, শ্রেণী শোষণ ও আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি আপসহীন বিস্ফোরণ। তথাকথিত নান্দনিক আভিজাত্য ও আধিপত্যের পবিত্র ধর্মসভায় একটি দুঃসহ, দুর্বিনীত ও একটি জরুরী উত্থান। ভারতীয় ভূমিপুত্র

ও অন্ত্যজ বর্গ এবং তাদের সহযোদ্ধা অগ্রসর মানবতাবাদীরাও এই উত্থান সভার রাজন্যবর্গ।

সনাতন জীর্ণ, অন্ধ, কু-আচার, সামাজিক অনুশাসন এবং সামন্ত, পুঁজিদার ও মহন্তদের অববোধের অচলায়তনের বিরুদ্ধে দলিত সাহিত্য শেষযুদ্ধে রত।

অনিল সরকার ঃ দলিত সাহিত্য একটি নবউত্থান
(ঐকতান গবেষণা পত্র, ফেব্রুয়ারী—৯৮)

দলিত বলতে আমরা কাদের বোঝাব! এক কথায় বলতে গেলে যাদের উপর দলন বা অত্যাচার করা হয়েছে। সে অত্যাচার অর্থ লুণ্ঠনের জন্য হতে পারে বা বর্ণগত কারণে হতে পারে। অর্থাৎ এক গোষ্ঠী বা ব্যক্তি অন্য গোষ্ঠী বা ব্যক্তিকে দাবিয়ে রাখেন। অত্যাচার বা নিপীড়ন চালান। সেই অত্যাচারিত বা নিপীড়িত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকেই আমরা দলিত বলে চিহ্নিত করতে পারি।

উপেন কিস্‌কু ঃ দলিত সাহিত্য ও সাঁওতালী ভাষা (দলিত সাহিত্য)

দলিত লেখকরা তাঁদের আত্মজীবনীতে 'আত্মা'কেই 'বস্তু' করে তুললেন। তাই তাঁদের আত্মকথা হয়ে ওঠে বাস্তবের দলিল। তাঁরা নিজেরাই হয়ে উঠলেন তাঁদের সাহিত্যের বিষয়। **দেবেশ রায়** ঃ দলিত

শতকরা নব্বুই জন দলিত মানুষই সত্যিকার ভারতবর্ষ। কিন্তু তারাই সর্বহারা। অর্থহারা, ভূমিহারা, জ্ঞানহারা, মানহারা। এই দলিত মানুষের বেদনার বাণী, অধিকারের দাবি, প্রতিবাদের কণ্ঠ, কান্নার অশ্রু আর বিদ্রোহের দলিলই দলিত সাহিত্য।

নীতীশ বিশ্বাস ঃ সম্পাদকীয় প্রতিবেদন (দলিত সাহিত্য)

দলিত সাহিত্য নিছক সাহিত্য কর্ম নয়—দলিত সাহিত্য একটা আন্দোলনের নাম। এই আন্দোলনের অভিমুখ জাতিভেদ বর্ণভেদের ঊর্ধ্বে উঠে উন্নত মানবতার চর্চায় নিবদ্ধ। **মনোহর বিশ্বাস** ঃ দলিত সাহিত্য ও তার আন্দোলন (দলিত সাহিত্য)

দাঙ্গা

কেনো এখনো ধর্মের নামে, বর্ণের নামে, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে দাঙ্গা বাধে অথবা বাধবার মতো পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়? সাম্প্রদায়িকতা তো, সে যে নামেই লালিত, আচরিত বা সংঘটিত হোক না কেনো, তা মানব-সংসারের বিরোধী।

আখতার হুসেন ঃ ভূমিকা (সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী গল্প)

—মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইবে?

—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা করিয়া বেড়াইব।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি।

সমরেশ বসু ঃ আদাব

দান

দান করা তো জমা রাখা ; ছেলেপিলের ঘরে দান ধর্ম চাই ; না হলে মঙ্গল হয় না।

অন্নদাঠাকুর ঃ স্বপ্নজীবন

দান মাত্রই শ্রেষ্ঠ; তবে সকাম-নিষ্কাম ভেদে ফলের তারতম্য আছে। ভোগের দ্বারা সকাম দান ক্ষয় হয় ; আর নিষ্কাম দান অক্ষয়। নিষ্কাম দান হতে ক্রমশ ভোগ-বাসনা দূর হয়, চিত্তশুদ্ধি হয়, প্রাণে শান্তি আসে ; ত্রিতাপ জ্বালার নিবৃত্তি ঘটে।

অন্নদাঠাকুর ঃ স্বপ্নজীবন

দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিলে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কবির কৈফিয়ত

দুর্বল আত্মার তামসিক দানে
দেবতার তৃতীয় নেত্রে আগুন ওঠে জ্বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালের যাত্রা—কবির দীক্ষা

বিধির প্রথম দান এ বিশ্বসংসারে
মাতৃস্নেহ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কর্ণ কুন্তীসংবাদ (কাহিনী)

নিষেধে নিরুদ্ধ যে-সম্মান
তাই তব দান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিচয় (মহুয়া)

আপনারে দান সেই তো চরম দান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিচয় (মহুয়া)

জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে যথা মেঘের অঞ্জলি
পূর্ণ করি দেয় সন্ধ্যা, দান করি চরম আলোর
অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্ররশ্মির—
সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি ঘোষণার আগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—৬

জীবনে যা-কিছু তব সত্য ছিল দান
মূল্য চেয়ে অপমান করিয়ো না তারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—১২

আমি যাহা দিতে পারি সামান্য সে দান
হোক ফুল, হোক তাহা গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—১০

যে-দান সত্য তারদ্বারা বাইরের ধন বিনাশ পায়, অন্তরের ধন বিকাশ পেতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্ত

হাতের দান হাতে-হাতেই চুকিয়ে দাও......হৃদয়ের দান, যত অপেক্ষা করবে তত তার দাম বাড়বে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

অল্পস্বল্প যাদের আছে
দানে যশ পায় লোকের কাছে;
ধনীর দানেতে ফল নাহি ফলে,
যত দেও তত পেট বেড়ে চলে—
কিছুতে ভরে না লোকের স্বার্থ,
ভাবে 'আরো ঢের দিতে যে পারত'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লক্ষ্মীর পরীক্ষা ২য় দৃশ্য (কাহিনী)

প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লোকহিত (কালান্তর)

আমার হৃদয় প্রাণ
সকল করেছি দান
কেবল শরমখানি রেখেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লজ্জা (সোনার তরী)

বাতি আপনাকে আপনি যে পরিমাণে দান করবে সেই পরিমাণে তার আলোক উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। যে পরিমাণে নিজের প্রতি তার দানের উপকরণ বিশুদ্ধ হবে সেই পরিমাণে তার শিখা ধূমশূন্য হতে থাকবে। নিজের প্রকাশযজ্ঞে আমাদের যে নিরন্তর দান সে সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পিতার বোধ (শান্তিনিকেতন)

আমার যা-কিছু দেবার তা শূন্যের মধ্যে ত্যাগরূপে দেব না, সংসারের মধ্যে দানরূপে দিতে হবে। এই দানের দ্বারাই আত্মার ঐশ্বর্য প্রকাশ হবে, ত্যাগের দ্বারা নয়। আত্মা নিজে কিছু নিতে চায় না, সে দিতে চায়, এতেই তার মহত্ত্ব। সংসার তার দানের ক্ষেত্র এবং অহং তার দানের সামগ্রী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন—মৃত্যু ও অমৃত

টাকাকড়ি শক্তিসামর্থ্য সমস্তই সত্য, যদি তা দান করি যদি তা নিজে নিতে চাই তো সমস্তই মিথ্যা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মৃত্যু ও অমৃত (শান্তিনিকেতন)

যাদের টাকা আছে তাদের দান করা উচিত। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, সৎ কাজে যায়।....যে দান ধ্যান করে সে অনেক ফল লাভ করে ; চতুর্বর্গ ফল।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

দাবাগ্নি

স্ফুলিঙ্গ দাবাগ্নি হবে কবে?

শুভ বসু ঃ বারুদ মাখা সুর (স্বপ্নে ও বিভ্রমে)

দাবি

সকল দাবি ছাড়বি যখন
পাওয়া সহজ হবে।
এই কথাটা মনকে বোঝাই,
বুঝবে অবোধ কবে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমাল্য—৬০

দাবি করিবার সাহস যাহাদের নাই তাহারাই কোনোমতে অভাবের সঙ্গে আপোষ করিয়া দিন কাটায়—তাহারাই বলে, অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। তাহাতে হয় এই যে, সেই অর্ধের মধ্য হইতেও কেবল অর্ধ বাদ পড়িয়া যায় এবং পণ্ডিত আপনার পাণ্ডিত্যের মধ্যে ক্রমাগত পণ্ড হইতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সমুদ্রপাড়ি (পথের সঞ্চয়)

দাম

সারা দিন গান বাঁধবার ছলে
কিছু না চাইতে

জীবনের কাছে যেটুকু পেলাম,
ফাঁকি দিয়ে পাওয়া যাবে না, হৃদয়, তারও পুরো দাম
দিয়ে যেতে হবে, নইলে সে-দেখা কিছু না, সে-পাওয়া কিছু না। তাহলে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : পূর্বরাগ (নীলনির্জন)

সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটীর পূজা—১

দামামা

দামামা ঐ বাজে,
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়—
নইলে কেন এত অপব্যয়,
....হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন খেতে।
....পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মদিনে—১৬

দামী

বিধাতার দামী দান থাকে লুকোনো
বিনা দামের প্রশ্রয়ে,
সুলভ ঘোমটার নিচে থাকে
দুর্লভের পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট—২

দাম্পত্য

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিস ছিল ; সে তো কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে—নিখিলেশের আত্মকথা

দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১১

দায়

তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যাণ্ড নোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয় ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মণিহারা (গল্পগুচ্ছ)

বুদ্ধিমানেরা পেটের দায়
লক্ষ্মীমানেরে ঠকিয়ে খায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লক্ষ্মীর পরীক্ষা—১ (কাহিনী)

আনন্দের দায়ের মতো দায় আর কোথায় আছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সমাজে মুক্তি (শান্তিনিকেতন)

দারিদ্র্য

মানুষের দারিদ্র্যকে নিয়ে সুখী সম্পদশালী ব্যক্তিরা রাজনীতি বা ধর্মের নামে চিরকালই পরীক্ষানিরীক্ষা করেছে, ইতিহাসে সেই চর্চা বহুযুগ ধরে চলছে। কারো হাতে গান্ধীর কেতাব, কারো হাতে মার্ক্স সাহেবের গ্রন্থ, কারো বা খোদায়ী পুস্তক, নবীর হাদিস। কিন্তু এ-তর্ক বৃথা। ভাবলেই মন ধূ ধূ করে। বিষণ্ণ হয়।

আবুল বাশার : ফুলবউ

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান
তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান
কণ্টক মুকুট শোভা—দিয়াছ, তাপস,
অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।

কাজী নজরুল ইসলাম : দারিদ্র্য

দারিদ্র্য অসহ
পুত্র হয়ে জায়া হয়ে কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি। কে বাজাবে বাঁশি?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি?

কাজী নজরুল ইসলাম : দারিদ্র্য

দারিদ্র্যে তাঁরই মহত্ত্ব মহৎ যিনি ঐশ্বর্যে। মহাদেব ভিক্ষা নেন পাবেন বলে নয়—আমাদের দানকে করতে চান সার্থক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবির দীক্ষা (কালের যাত্রা)

ঐশ্বর্যকে অধিকার করিবার শক্তি যাহাদের আছে দারিদ্র্য তাহাদেরই ভূষণ।...ত্যাগের দারিদ্র্যই ভূষণ, অভাবের দারিদ্র্য ভূষণ নহে ; শিবের দারিদ্র্যই ভূষণ, অলক্ষ্মীর দারিদ্র্য কদর্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রার পূর্বপত্র (পথের সঞ্চয়)

দালাল

আল্লাকে পেতে গেলে যেমন পীরের দরকার তেমনি দারোগাকে ধরতে গেলে চাই থানার দালাল।

আবদুল জব্বার : থানার দালাল (বাংলার চালচিত্র)

আমি একজন রেসপেক্টেবল দালাল।

নারায়ণ সান্যাল : এক. দুই...তিন....

মায়ের কাছে যেতে হলেও দালাল লাগে নাকি?

বরেন গঙ্গোপাধ্যায় : বেস্পতির এক বাবু ছিল (শ্রেষ্ঠ গল্প)

দাস/দাসত্ব

দাসত্ব-প্রথা এখনও লোপ পায়নি। কেবল তার বাইরের রূপটা বদলেছে মাত্র। দাস-দাসী বিক্রয়ের আলাদা হাট-বাজার নেই আজকাল। সমাজের বুকের উপরই ঘরে ঘরে সে হাট বসেছে। ধূর্ত ধনীর কাছে অসহায় দুর্বলরা স্বেচ্ছায় আত্মবিক্রয় করছে। না করে উপায় নেই তাদের।

বনফুল : হাটে বাজারে

ভগবান তোমাকে গ্রহণ করিয়াছেন দাসরূপে। যেরূপ তাঁহার ইচ্ছা তোমারদ্বারা তদ্রূপ কার্যই করাইবেন, তুমি তাহাতে দ্বিধা বুদ্ধি করিও না। মেথরের কার্যও জগতে

আবশ্যকীয়,—তাহা করিবার লোক না থাকিলে ভারতবর্ষের অনেক শহরে লোক বাস করা অসম্ভব হইত। সেই কার্য যদি আবশ্যকীয়ই হয়, তবে তাহাও তো কাহারো দ্বারা করাইতে হইবে। অতএব ভগবান তাঁহার রচিত সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত তোমারদ্বারা যে কার্য করান তাহা তোমার বিচারে ঘৃণিত ও নিন্দনীয় কার্য হইলেও তুমি তাহাতে নিজের কর্তৃত্ব মিথ্যাকল্পে গ্রহণ করিয়া ক্লেশ বোধ করিও না। এই ভাবটি সর্বদা অন্তরে রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং সমস্ত অবসাদ ঝাড়িয়া ফেলিবে।

স্বামী সন্তদাসজী : বাণী ও জীবনী

মানসিক দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে আলোকিত সত্যের পথে.....পৌঁছতে বই এবং পত্র-পত্রিকা সাহায্য করে।

সুদিন চট্টোপাধ্যায় : বিচিত্র ভাবনা

দিগম্বর

জন্মেছি দিগম্বর বেশে, মরব বিশ্বাম্বর হয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঁশরি—১।৩

দিদি

জননীর প্রতিনিধি
কর্মভারে অবনত অতি-ছোটো দিদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দিদি

এক কক্ষে ভাই লয়ে, অন্য কক্ষে ছাগ,
দুজনেরে বাঁটি দিল সমান সোহাগ।
পশুশিশু, নরশিশু—দিদি মাঝে প'ড়ে
দোঁহারে বাঁধিয়া দিল পরিচয়ডোরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিচয় (চৈতালি)

দিদিমণি,
অফুরান সান্ত্বনার খনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আরোগ্য—১৯

দিন-রাত্রি

আমার অজ্ঞাতসারে
পুরাতন প্রগল্‌ভ দিনরাত্রি আসা-যাওয়া করে,
নদীর জোয়ারে, অন্ধকারে, তিলে-তিলে পৃথিবী মরে,
বুঝি, পিঙ্গল বালুচর সর্বভুক্ত, অবিনশ্বর।

সমর সেন : রোমন্থন

দীপ

আপনারে দীপ করি জ্বালো,
দুর্গম সংসারপথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উত্তিষ্ঠত নিবোধত

দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে,
ধীরে ধীরে এসে তুমি যেয়ো না গো ফিরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (নবগীতিকা ১)

তারার দীপ জ্বালেন তিনি
        গগনতলে
থাকেন চেয়ে ধরার দীপ
        কখন জ্বলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

আপনারে দীপ করি জ্বালো,
        আপনার যাত্রাপথে
আপনিই দিতে হবে আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ ২৬

সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি
        পথচাওয়া নয়নের বাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ ২৩৪

দীপান্বিতা

ওগো আমার দুঃখরাতের
        আঁধার সরণী!
ভিড়াও তোমার প্রাণের ঘাটে
        প্রাণের তরণী।
কিসের ক্ষতি অন্ধকারে,
মন যদি মন চিনতে পারে—
এক নিমেষে উঠবে হেসে
        আমার ধরণী ;
ওগো প্রাণের দীপান্বিতা—
        হৃদয় হরণি।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ঃ দেয়ালি

দুঃখ

দুঃখ, দুঃখেরই মতন উপমাহীন,
নির্জন বুকের গভীরে নির্জন।

অজিত বাইরী ঃ আমার প্রেম—আমার পুনর্জন্ম

তুমি কেন দুঃখ পেলে
দুঃখ আমার নাম
দুঃখ কালো পাড়ের শাড়ি
তোমায় পরালাম॥

আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ ঃ প্রেমের কবিতা

সুখী মানুষের ঘরে দুঃখ আসে, পা ঝুলিয়ে বসে ডানলোপিলোর কুশনে
পা চাটে পালিত বিড়াল, বসে চেয়ারে, বিছানায় শুয়ে থাকে সুখী মানুষেরই মতো
দুঃখ অনুরূপ আসে শোভন সুন্দর বড়ো সুবিন্যস্ত সংযত শালীন
সব খোয়ানোর দুঃখে চীৎকার করে না যাতে প্রতিবেশীদের শান্তি নষ্ট হতে পারে
ইতর মানুষ বড়ো ভেঙে পড়ে ; ....
দুঃখী মানুষের পাশে ছায়া হয়ে ঘোরে দুঃখ, মেঝে ও বালিশে লেপটে থাকে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় ঃ সুখী মানুষের ঘরে

মানুষ যতই মিশুক আর আমুদে হোক না কেন, আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই, সকলের অজান্তে, লুকিয়ে রয়েছে এক দুঃখ।....ট্রামে-বাসে, রাস্তা-ঘাটে, যে-কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হয়, মনে মনে বলি তাকে, "আমাকে ঠকাতে পারবে না তুমি। তোমার অন্তরে কোনো কোণে লুকিয়ে আছে এক গুরুভার দুঃখ। দুঃখটা যে কি, জানি না ; কিন্তু যা-ই হোক না কেন, আছে। আর আছে বলেই তোমাকে ভালোবাসি, মনে প্রাণে ভালোবাসি।"

ফাদার দ্যতিয়েন ঃ ডায়েরির ছেঁড়া-পাতা

দুঃখের তো প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ বিষবৃক্ষ

জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত শুধুই তো কেবল দুঃখ পাওয়া। তার মধ্যেই এই একটুখানি সুখ মৃত্যু।

বিমল মিত্র ঃ আত্মহত্যার আগের ঘটনা

সুখের দিনে মনে থাকে না
দুঃখ তোমার কতো আপন!

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সুখের দিনে মনে থাকে না

চোরই হোক আর রাজাই হোক—পরের দুঃখে কাতর হয়েছ কি মরেছ।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ঃ কানামাছি খেলা

দুঃখই জগতে একমাত্র সকল পদার্থের মূল্য।....মাতৃস্নেহের মূল্য দুঃখে, পাতিব্রত্যের মূল্য দুঃখে, বীর্যের মূল্য দুঃখে, পুণ্যের মূল্য দুঃখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুঃখ (ধর্ম)

যাহাকে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন। যে-দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অল্প হয় না ; রাত্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্বাণ।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দৃষ্টিভঙ্গি

দুখ পশে যবে মর্মের মাঝখানে
তোমার লিখন-স্বাক্ষর যেন আনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য ১০০

বন্ধুরা ধার চায়, দাম চায় দোকানি,
চাকর বাকর চায় মাসহারা-চোকানি
ত্রিভুবনে এই আছে অতি বড়ো তিন দুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিণয়মঙ্গল (প্রহাসিনী)

দুঃখ দেখা দিয়েছিল ; খেলায়েছি দুঃখনাগিনীরে ব্যথার বাঁশির সুরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক ৭

আপনি যে দুখ ডেকে আনি সে যে
জ্বালায় বজ্রানলে—
অঙ্গার করে রেখে যায়, সেথা
কোন ফল নাহি ফলে।
তুমি যাহা দাও সে যে দুঃখের দান।
শ্রাবণধারায় বেদনার রসে
সার্থক করে ত্রাণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভার (খেয়া)

দুঃখকে লাভের দিক দিয়া স্বীকার করার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই ; দুঃখকে প্রেমের দিক দিয়া স্বীকার করাই আধ্যাত্মিকতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রার পূর্বপত্র (পথের সঞ্চয়)

কাছের পাওনাকে নিয়ে বাসনার যে দুঃখ তাই পশুর, দূরের পাওনাকে নিয়ে আকাঙ্ক্ষার যে দুঃখ তাই মানুষের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

এমন দুঃখ আছে যাকে ভোলার মত দুঃখ আর নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

দুঃখের আঁধার রাত্রি বারে বারে
এসেছে আমার দ্বারে ;
একমাত্র অস্ত্র তার দেখেছিনু
কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট ভঙ্গি যত—
অন্ধকারে ছলনার ভূমিকা তাহার।
যত বার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস
তত বার হয়েছে অনর্থ পরাজয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষলেখা ১৪

আমি কি দুখেরে ডরাই
দুখে দুখে জন্ম গেল আর কত দুখ দাও দেখি তাই।

রামপ্রসাদ সেন ঃ শাক্তপদাবলী

সবাই নিজের দুঃখ জানিয়ে দুঃখ কম করে ফেলতে চায়।

শরৎচন্দ্র ঃ চরিত্রহীন

কোন বড় ফলই বড় রকম দুঃখ-ভোগ ছাড়া পাওয়া যায় না।

শরৎচন্দ্র ঃ শ্রীকান্ত ২য় (১১)

দুঃসময়

দুঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তখন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সফলতার সদুপায় (আত্মশক্তি)

দুঃসাহস

যাহা পাস তাই ভালো,
হাসিটুকু, কথাটুকু
নয়নের দৃষ্টিটুকু
প্রেমের আভাস।
সমগ্র মানব তুই পেতে চাস।
এ কী দুঃসাহস!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিষ্ফল কামনা (মানসী)

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিবেচনা ও অবিবেচনা (কালান্তর)

দুনিয়া

দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক,
বাবা সব হ্যায় ফাঁক।
ধনের গৌরব কেন মিছা কর জাঁক,
বাবা মিছা কর জাঁক।

পেয়েছ যে কলেবর, দৃশ্য বটে মনোহর,
মরণ হইলে পর পুড়ে হবে খাক।
আমি আমি অহঙ্কার, আমার এ পরিবার,
কোথায় রহিবে আর, আমি আমি যাক্
দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাঁক॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : সব হ্যায় ফাঁক

দুয়ার

আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা।
তোরা নিসাড় হইয়া আয় লো সজনি
আঁধার পেরিয়ে আলা॥

চণ্ডীদাস : বৈষ্ণব পদাবলী

কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?
জয় অজানার জয়।
এই দিকে তোর ভরসা যত, ওই দিকে তোর ভয়!
জয় অজানার জয়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি

যদি এ আমার হৃদয়দুয়ার
বন্ধ রহে গো কভু
দ্বার ভেঙে তুমি এসো মোর প্রাণে
ফিরিয়া যেয়ো না প্রভু॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—৫

দুর্গা

হেই মাগো দুগ্‌গা
তোমার দশ হাতে অস্ত্র মিছাই
লুটেপুটে নিলেক অসুর
ভুখা পেটে দিন ধিতাই।

অরুণ চট্টোপাধ্যায় : হেই মাগো দুগ্‌গা

জয় যোগেন্দ্রজায়া, মহামায়া মহিমা অসীম তোমার।
একবার দুর্গা দুর্গা দুর্গা বলে যে ডাকে মা তোমায়,
তুমি কর তায় ভবসিন্ধু পার।

এন্টনী ফিরিঙ্গী : শাক্ত পদাবলী

তুমি তার' তার' তার', না তার' তার',
আপনার গুণে তরবো ;
দুর্গা-নাম-তরী, মস্তকেতে করি,
যতন করিয়ে রাখবো।
আমার অন্তে শমন এলে, অজপা ফুরালে
দুর্গা দুর্গা বলে ডাকবো।

এন্টনী ফিরিঙ্গী : শাক্ত পদাবলী

দুর্গা। যিনি দুর্গ অর্থাৎ সঙ্কট হইতে ত্রাণ করেন। তন্ত্রে-দ্ (দৈত্য নাশ-সূচক) উ (বিঘ্ন নাশ-সূচক) + র্ (রোগঘ্নবাচক) + গ্ (পাপঘ্নবাচক) + আ—বধকর্ত্রী অর্থে (যিনি দুর্গ নামক অসুর বিনাশ করিয়াছেন).....পরমাপ্রকৃতি ; বিশ্বের আদিকারণ।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ঃ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

দুর্গাপুজো আমার কাছে ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে একটা সাংস্কৃতিক আবহ হিসাবে অনেক বেশি সমাদৃত। এই আবহে আমি সত্যিকারের হিন্দুত্ব খুঁজে পাই। এ সেই হিন্দুত্ব যা সমস্ত মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে।

পি সি সরকার (জুনিয়র) ঃ সংবাদ প্রতিদিন ১৪.১০.২০০১

পুরাণ আমাদের জানায় দুর্গম অসুরকে বধ করেছেন যিনি তিনিই দুর্গা। ভক্তদৃষ্টি আমাদের বলে যিনি মানবের দুর্গতি হরণ করেন তিনিই দুর্গা।.......

শ্রীদুর্গার মহিষাসুর বধ হল মূলকাহিনী। দেবীর সঙ্গে মহিষাসুরের যুদ্ধ।......ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "যদিও একবার কোনো নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই তবুও অনুমান করা যায় যে, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী তথা দেবী মাহাত্ম্য গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযানকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছিল"।

'বৃহৎবঙ্গ' গ্রন্থে বলেছেন—"আলেকজাণ্ডারের অভিযান সম্ভবত হিন্দুরা একটা পৌরাণিক উপাখ্যানে পরিণত করিয়া জাতীয় গৌরবের স্মৃতি এখন পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। সকলেই অবগত আছেন, আলেকজাণ্ডার মহিষের শিং শিরস্ত্রাণ স্বরূপ ব্যবহার করিতেন। ইনি কি চণ্ডীর মহিষাসুর?"

পূর্বা সেনগুপ্ত ঃ দুর্গা রূপে রূপান্তরে

তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, অভয়দায়িনী অভয়া, মঙ্গলকারিণী সর্বমঙ্গলা।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঃ ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্ত সাহিত্য

দকার দৈত্যনাশ, উকার বিঘ্ননাশ, রকার রোগনাশক, গকার পাপনাশ ও আকার ভয় শত্রুনাশ হেতু 'দুর্গা।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বঙ্গীয় শব্দকোষ

দুর্বল

ভগবান একেবারে দুর্বলেরও আত্মরক্ষার কিছু না কিছু উপায় রেখে দেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঃ কালা হীরা (বাছাই গল্প)

অন্তরে যারা যত বেশী ভীরু যত বেশী দুর্বল,
নীতিবিদ তারা তত বেশী করে সত্য-কথন ছল।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ মিথ্যাবাদী

দুর্বলের অবলম্বন মিথ্যা কথা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ রাজসিংহ

কাপুরুষ, দুর্বলগণই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবলচিত্ত ব্যক্তিগণ সদাই নীতিপরায়ণ।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী—৬

যে-মানুষ হাড়ে দুর্বল, দুর্বলের যম সে ;— তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায়

দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা

যে দুর্বল, সবলের পক্ষে সে তেমনই ভয়ঙ্কর, হাতির পক্ষে যেমন চোরাবালি। এই বালি বাধা দিতে পারে না বলেই সম্মুখের দিকে অগ্রসর করে না, কেবলই নিচের দিকে টেনে নেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র—৩ (কালান্তর)

আজকের দিনে দুর্বল যত ভয়ঙ্কর দুর্বল, জগতের ইতিহাসে আর কোনেদিনই ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র—৩ (কালান্তর)

দুর্বল লোকের পক্ষে অপমান পরিপাক করবার শক্তিটাই ভালো ; শোধ তোলবার সখটা তার পক্ষে নিরাপদ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুকুট

যে প্রবল, যে ধনবান, যে ধর্মজ্ঞান-বিরহিত, তাহার অত্যাচার হইতে বাঁচিবার কোন পথ দুর্বলের নাই। কোথাও ইহার নালিশ চলে না, ইহার বিচার করিবার কেহ নাই—ভগবান কান দেন না, সংসারে চিরদিন ইহা অবারিত চলিয়া আসিতেছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দেনাপাওনা

শুনিয়াছি নাকি বিলাত প্রভৃতি ম্লেচ্ছ দেশে পুরুষের মধ্যে একটা কুসংস্কার আছে, স্ত্রীলোক দুর্বল এবং নিরুপায় বলিয়া তাহার গায়ে হাত তুলিতে নাই। এ আবার একটা কি কথা! সনাতন হিন্দু এ কুসংস্কার মানে না। আমরা বলি, যাহারই গায়ে জোর নাই, তাহারই গায়ে হাত তুলিতে পারা যায়। তা সে নর-নারী যাই হোক না কেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিলাসী

পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি। শক্তির দুঃসাহস, বুদ্ধির দুঃসাহস, আকাঙ্ক্ষার দুঃসাহস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিবেচনা ও অবিবেচনা (কালান্তর)

দূর

সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি—
কাছের জিনিস দূরে রাখে তার থেকে তুই দূরে রবি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

সবার চেয়ে কাছে আসা
সবার চেয়ে দূর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমাল্য

দূরে গিয়ে বাড়াই যে ঘুর,
সে দূর শুধু আমারই দূর—
তোমার কাছে দূর কভু দূর নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমাল্য

আকাশের দূরত্ব যে চোখে তারে দূর ব'লে জানি,
মনে তারে দূর নাহি মানি।
কালের দূরত্ব সেও যত কেন হোক—না নিষ্ঠুর
তবু সে দুঃসহ নহে দূর।
আঁধারের দূরত্বই কাছে থেকে রচে ব্যবধান,
চেতনা আবিল করে, তার হাতে নাই পরিত্রাণ।
শুধু এই মাত্র নয়—
সে-যে সৃষ্টি করে নিত্যভয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রলয় (বীথিকা)

দূর এসেছিল কাছে,
ফুরাইলে দিন, দূরে চলে গিয়ে আরো সে নিকটে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

দূরে দূরে, সে অনেক দূরে, বহু বহু দূরে। সেখানে চোখ যে যায় না। সেই জগতের সকল আরম্ভের প্রান্তে, সেই উদয়াচলের প্রথমতম শিখরটির কাছে ; যেখানে প্রতিদিন উষার প্রথম পদক্ষেপটি পড়লেও তবু তাঁর আলো চোখে এসে পৌঁছোয় না, অথচ ভোরের অন্ধকারের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ওঠে-সেই অনেক অনেক দূরে। সেইখানে হৃদয়টি মেলে দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকো, ধীরে ধীরে একটু একটু করে দেখতে পাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শারদোৎসব

দূষণ

গোটা দক্ষিণ এশিয়ার আকাশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে দূষণের এক পুরু আস্তরণ। আর তাতে বাধা পেয়ে ভারতে আগের চেয়ে দশ শতাংশ কম সূর্যের আলো আসছে। এর ফলে ক্ষতি হচ্ছে কৃষির। বৃষ্টিপাতের পরিচিত ধাঁচটিও বদলে যাচ্ছে। হাজার হাজার মানুষ বিপদের মুখে পড়তে চলেছেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিবেশ কর্মসূচীর (ইউ এন ই পি) সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানীরা এই তথ্য দিয়েছেন। গত এক দশকে বিশ্বের এই অংশে যে চমকপ্রদ আর্থিক সাফল্য এসেছে, সেটা 'এশিয়ার বাদামী ধূম্রজালের' ফলে ব্যর্থ হয়ে যাবে, বিজ্ঞানীদের পর্যবেক্ষণ থেকে এমনই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে। ইউ এন ই পি-র ৫৩ পাতার রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতে গবেষণা চালিয়ে দেখা গিয়েছে, দূষণের ফলে শীতের সময় ধান উৎপাদন ১০ শতাংশ কমে যেতে পারে। এব্যাপারে রিপোর্টের ব্যাখ্যা হল, দূষণের আবরণে রয়েছে অ্যাসিড আর সেই অ্যাসিড থেকে ঝরে পড়তে পারে অ্যাসিড বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টির ফসল ও গাছপালা নষ্ট করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। দূষিত ছাই গাছের পাতায় পড়বে। সেই ছাই ভূপৃষ্ঠে পড়া কম সূর্যের আলোর ক্ষতির মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। ধূম্রজাল সৃষ্টিকারী দূষণে শ্বাসপ্রশ্বাসজনিত অসুখের মাত্রা বেড়ে যাবে।

বর্তমান ঃ ১২.৮.২০০২

দৃশ্যপট

অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল ; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত ; অনধিকার প্রবেশ করে সচলতার মধ্যে থাকে সে মূক, মূঢ়, স্থাণু ; দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে.....আমাদের দেশে চিরপ্রচলিত যাত্রার পালাগানে লোকের ভিড়ে স্থান সংকীর্ণ হয় বটে কিন্তু পটের ঔদ্ধত্যে মন সংকীর্ণ হয় না। এই কারণেই যে নাট্যাভিনয়ে আমার কোন হাত থাকে সেখানে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্যপট ওঠানো-নামানোর ছেলেমানুষিকে আমি প্রশ্রয় দিইনে। কারণ, বাস্তবসত্যকেও এ বিদ্রূপ করে, ভাবসত্যকেও বাধা দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তপতী (ভূমিকা)

দৃষ্টি

শিল্প সাধকের দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি। **অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিল্পায়ন**

যে-দৃষ্টির সঙ্গে মনের যোগ নেই সে তো দেখা নয়, তাকানো।

যাযাবর ঃ দৃষ্টিপাত

হাসিমাখা তব আনত দৃষ্টি
.....অঙ্গে অঙ্গে অমৃত বৃষ্টি— **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অন্তর্যামী (চিত্রা)**

দুই চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতিদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ্য ঠিক করিয়া আছে, অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা—২

তাঁর অনিমেষ দৃষ্টি বহু দূরে তাকিয়ে,
গোধূলি-আকাশের তারার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চণ্ডালিকা—২

মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে
রভসলালসে মোর নিদ্রালস তনু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা—৩

সেই প্রেমদৃষ্টিপাত
এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে অঙ্গেতে পড়ে
সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেখে যায়
বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা—৩

দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে, কেড়ে নিতে আসিছে আমায়;—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা—৩

তরল তব সজল দিঠি মেঘের চেয়ে কালো;
আঁখির পাতা যেমন আছে এমনি থাকা ভালো!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরায়মানা (ক্ষণিকা)

শ্রাবণে দিগন্তপারে
যে গভীর স্নিগ্ধ দৃষ্টি ঘন মেঘভারে
দেখা দেয়, নবনীল অতি সুকুমার,
সে দৃষ্টি না জানি ধরে কেমন আকার
নারীচক্ষে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানসসুন্দরী (সোনারতরী)

স্নিগ্ধ দৃষ্টি সুগম্ভীর
স্বচ্ছ নীলাম্বর-সম। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :** মানসসুন্দরী (সোনারতরী)

চক্ষুর স্বভাবই হচ্ছে সে কোনো জিনিসকে ভেঙে ভেঙে দেখে না, একেবারে সমগ্র করে দেখে। সে স্পেক্ট্রস্কোপ যন্ত্র দিয়ে দেখার মতো করে দেখে না—সে আপনার মধ্যে সমস্তকে বেঁধে নিয়ে আপন করে দেখতে জানে।......আত্মবোধের দৃষ্টি যখন খুলে যায় তখন সে-ও তেমনি অত্যন্ত সহজেই আপনাকে এক করে এবং পরম একের সঙ্গে আনন্দে সম্মিলিত করে দেখতে পায়। সেই রকম করে সমগ্র করে দেখাই তার সহজ ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মবোধ (শান্তিনিকেতন)

অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে, কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে.......নারাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—৬

দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো বুলিয়ে নিয়ে বললে—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১৫

দেওয়া

মানুষের জন্য দেওয়াতে আছে অসীম আনন্দ।

আজিজুল হক : কারাগারে ১৮ বছর (২য়)

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি
মরেছি হাজার মরণে—
নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উদাসীন (ক্ষণিকা)

দেখা

চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে—অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন

বাস্তবকে যত একান্ত করে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে—আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিখিলেশের আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

যখন দেখবার সামগ্রী বেড়ে ওঠে তখন দেখাটাই কমে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপানযাত্রী—১৩

দেখিবার জিনিস ঢের আছে, কেবল মন দিবার মূল্য দিই না বলিয়া দেখিতে পাই না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হিমালয়যাত্রা (জীবনস্মৃতি)

দেখা হয়ে চুকেছে মনে ক'রে দেখা বন্ধ কর, তাই তো দেখা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি—৯।২।২৫

যাকে উদাসী ভাবে দেখি তাকে পুরো দেখি নে ; যাকে প্রয়োজনের প্রসঙ্গে দেখি তাকে-ও না ; যাকে দেখার জন্যই দেখি তাকেই দেখতে পাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিমযাত্রীর ডায়ারি—১২।২।২৫

বাস্তবকে চোখে দিয়া দেখি, আর সত্যকে মন দিয়া ছাড়া দেখিবার জো নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথের সঞ্চয়। অন্তর বাহির

চোখের আলোয় দেখেছিলেম চোখের বাহিরে।
অন্তরে আজ দেখব, যখন আলোক নাহি রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী—৪র্থ দৃশ্য

আঁধার একেরে দেখে একাকার ক'রে,
আলোক একেরে দেখে নানাদিক ধ'রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

আগে দেখে নাও অন্তরে, বাইরে দেখবার দিন আসবে তার পরে। নইলে ভুল হবে, ছন্দ যাবে ভেঙে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শাপমোচন

দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো বিদ্যের অন্তর্গত। চুরি বিদ্যের মতোই, তার সার্থকতার প্রমাণ হয় যদি না পড়ে ধরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১৪

ভ্রূ কুঁচকিয়ে কী দেখে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, তার দেখাটা যেন চোখের উঞ্ছবৃত্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সহযাত্রী (পুনশ্চ)

বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে

দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশিরবিন্দু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—১৬৪

দেবতা

দেবতা তবুও ধরেছে মলিন ঝাঁটা,
স্পর্শ বাঁচায়ে পুণ্যের পথে হাঁটা,
সমাজধর্মে আছি বর্মেতে আঁটা,
ঝোড়ো হাওয়া আর ঐ পোড়ো দরজাটা
মেলাবেন, তিনি মেলাবেন॥

অমিয় চক্রবর্তী ঃ সংগতি

যাঁহার দ্বারা অনেকের উপকার হয়, তিনি আমোদ-প্রমোদে বিরত হইয়া, ভোগবিলাস পরিহার করিয়া, জগতের হিতের নিমিত্ত অর্থোপার্জনে বা জ্ঞানোপার্জনে সময় অতিবাহিত করেন, তিমিরাবৃত এই সংসারে তিনি দেবতাস্বরূপ।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ কঙ্কাবতী

দেবতার কাছে এসে দাঁড়ালেই যে আমি আপন দেবত্বকে অনুভব করি!

প্রবোধকুমার সান্যাল ঃ মহাপ্রস্থানের পথে

দেবতা পান পূজা, মানুষ পায় প্রীতি।

প্রবোধকুমার সান্যাল ঃ মহাপ্রস্থানের পথে

দেবতারা আস্তিক-আত্মায় বিশ্বাস, ঈশ্বরে-পরলোকে বিশ্বাস রাখে। অসুরেরা বলছে—ইহলোকে এই পৃথিবী ভোগ কর, এই শরীরটাকেই সুখী কর। দেবতা ভাল, কি অসুর ভাল, সে কথা হচ্ছে না। বরং পুরাণের অসুরগুলোই তো দেখি মনিষ্যির মতো, দেবতাগুলো তো অনেকাংশে হীন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দেবতা লইয়া ব্যবসা করিতে পারিলে অল্পদিনে বড় মানুষ হওয়া যায়।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ঃ শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী

নরদেবতার মতো বালাই আর নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গিন্নি (গল্পগুচ্ছ)

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে,
আপন জেনে আদর করি নে।
পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,
বন্ধু বলে দু-হাত ধরি নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৯২

দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্ত্যলোকেই তাঁরা দেখা দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে-বাইরে—সন্দীপের আত্মকথা

যারা বনেদি দেবতা তাদের এত উগ্রতা নেই। সংসারে হঠাৎ-দেবতারাই সাংঘাতিক। তাদের পূজা করায় ব্যর্থতা, না পূজা করায় সর্বনাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তপতী—১

দয়ালু দেবতাকে মানুষ মুখের কথায় ফাঁকি দেয়, হিংসালু দেবতাকে দেয় দামী অর্ঘ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নটীর পূজা—৩

দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই
প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে ; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৈষ্ণবকবিতা (সোনার তরী)

ভক্তেরা মন্দিরে
পূজারীর কৃপা বহু দামে কিনে
পূজা দিয়ে যায় ফিরে......
তখন একাকী বৃথা-বিচিত্র
পাষাণভিত্তি-মাঝে
দেবতার বুকে জান সে কী ব্যথা বাজে।
বেদীর বাঁধন করি ধূলিসাৎ
অচলেরে দিয়ে নাড়া
মানুষের মাঝে সে-যে পেতে চায় ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানী (পরিশেষ)

বাইরে দেবতাকে রেখে স্তবে অনুষ্ঠানে পুজোপচারে শাস্ত্র পাঠে বাহ্যিক বিধিনিষেধ-পালনে উপাসনা করা সহজ কিন্তু আপনার চিন্তায়, আপনার কর্মে, পরম মানবকে উপলব্ধি ও স্বীকার করা সবচেয়ে কঠিন সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানুষের ধর্ম—৩

বৈজ্ঞানিক..... বলেন, দেবতাকে প্রিয় বললে দেবতার প্রতি মানবিকতা আরোপ করা হয়। আমি বলি, মানবত্ব আরোপ করা নয়, মানবত্ব উপলব্ধি করা। মানুষ আপনার মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধ অবলম্বন ক'রে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেচে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানুষের ধর্ম

বিসর্জন করিয়াছি সকল দেবতা,
কেবল অনঙ্গদেব রয়েছেন বাকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ও রানী—১।১

দেবতা যে চায় পরিতে গলায়
মানুষের গাঁথা মালা।
মাটির কোলেতে তাই রেখে যায়
আপন ফুলের ডালা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

দেবমন্দির-আঙিনাতলে শিশুরা করেছে মেলা,
দেবতা ভোলেন পূজারি দলে, দেখেন শিশুর খেলা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

যেখানে আমরা মানুষকে ভালোবাসি সেখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছেলে ভুলানো ছড়া—১ (লোকসাহিত্য)

পৃথিবীতে বর্বর মানুষ জন্তুর পর্যায়ে।.....তপস্যার ভিতর দিয়ে সে হয়েছে জ্ঞানী মানুষ।........আরও স্থূলত্ব বর্জন করতে হবে, তবে সে হবে দেবতা।........অতীতে দেবতা ছিলেন না, দেবতা আছেন ভবিষ্যতে, মানুষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষকথা (তিনসঙ্গী)

দেবত্ব

বীরত্ব ছাড়া মানুষ দেবত্বে উঠতে পারে না।

শ্রীঅরবিন্দ : শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী

যে মূল বাসনা আসক্তি ত্যাগ করে শুদ্ধ মুক্ত হয়েছে-সেই দেবত্ব প্রাপ্ত হয়েছে, ভগবান তাকেই কৃপা করেছেন। দৃষ্টি উদার ও স্বচ্ছ না হলে কেউই উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয় না, অথচ মানুষকে দেবত্বে নিয়ে যাবার জন্যে উর্ধ্বলোকে কত ব্যবস্থা, কত আগ্রহ। তবুও কেন অন্ধত্ব ঘোচেনা মানুষের।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : দেবযান

দেবস্থান

দেবস্থানের উপযোগী বেশভূষা করাও যে ধর্মেরই এক অঙ্গ।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : হিমালয়ের পথে পথে

দেবালয়

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।

ভারতচন্দ্র রায় : অন্নদামঙ্গল

চান ভগবান প্রেম দিয়ে তাঁর
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইট পাথরের জয়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

দেশ

আমাদের এই দেশ হচ্ছে এতিম্‌খানা (অনাথ আশ্রম)। যেখান থেকে, যতদূর থেকেই যে আসুক, সকলের জন্যেই খোলা আছে এ দরজা। যার খুশি দু হাত ভরে নিয়ে যাক ; কিন্তু আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে যেমন কেউ সমুদ্র শুকিয়ে ফেলতে পারে না—তেম্‌নি এই দেশকেও শূন্য করবার ক্ষমতা নেই কারো।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার

দেশ মানুষের সৃষ্টি। দেশ মৃন্ময় নয়, সে চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেত দেশ প্রকাশিত।....দেশ মাটিতে তৈরি নয়, দেশ মানুষের তৈরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অবতরণিকা, রবীন্দ্র-রচনাবলী ১ (বিশ্বভারতী)

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১০৮

সাধারণত আমাদের দেশের লোকেরা স্বজাতি ও স্বদেশের আলোচনায় কিছু-না-কিছু মুরুব্বিয়ানা ফলাইয়া থাকে ; তাকে গভীরভাবে সত্যভাবে বিশ্বাস করে না। এইজন্য মুখে কবিত্ব করিবার বেলায় দেশের সম্বন্ধে যাহাই বলুক, দেশের প্রতি তাহাদের ভরসা নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা—১১

দেশকে ভালো না বাসলে তাকে ভালো করে জানবার ধৈর্য থাকে না, তাকে না জানলে তার ভালো করতে চাইলেও তার ভালো করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা—১৩

দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি, কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিমলার আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

আজকাল পৃথিবী জোড়া একটা আপিস-রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়েছে, সেটা কোন বিশেষ দেশ নয়।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপান যাত্রী—১৩

সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি
সেই ঘর মরি খুঁজিয়া।
দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি
সেই দেশ লব যুঝিয়া।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ—১৪

আমরা যাকে দেশ বলি, বাইরে থেকে দেখতে সে ভূগোলের এক অংশ, কিন্তু তা নয়। পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন আছে তার বায়ুমণ্ডল, যেখানে বয় তার প্রাণের নিশ্বাস, যেখানে ওঠে তার গানের ধ্বনি, যার মধ্যে দিয়ে আসে তার আকাশের আলো, তেমনি একটা মনোমণ্ডল স্তরে স্তরে এই ভূ-ভাগকে অদৃশ্য আবেষ্টনে ঘিরে ফেলেছে—সমস্ত দেশকে সেই দেয় অন্তরের ঐক্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলা ভাষা-পরিচয় ৭

দেশ কেবল ভৌমিক নয়, দেশ মানসিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানুষের ধর্ম—১

এদেশ আমার গর্ব
এ-মাটি আমার কাছে সোনা
এখানে মুক্তির লক্ষ্যে হয় মুকুলিত
আমার সহস্র সাধ, সহস্র বাসনা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : ঘোষণা

পরাধীন ভারতবর্ষে আমরা (আমরা যারা প্রথম স্বাধীনতা দিবসের প্রথম উত্তেজনায় উপস্থিত ছিলাম) দেশকে কেবল গাছপালা নদীনালা পাহাড় পর্বত বলে জানতাম না। দেশ একটা সম্পূর্ণ জীবন, একটা ধারণা, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। দেশ আমার গোটা পৃথিবী।

হোসেনুর রহমান : প্রথম স্বাধীনতার স্মৃতি (সংবাদ প্রতিদিন—৬.৮.২০০২)

দেশনেতা

শক্তিমানের চক্ষুলজ্জা থাকবে না। নেইও। দেশ নেতারাই তার প্রমাণ।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

দেশসেবক

একালের দেশসেবকদের দেখিয়া সেকালের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন, রাষ্ট্রগৌরব সুভাষচন্দ্রের কথা মনে হয়। তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের মুখ আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিত। আর ওই দেখ একালের দেশসেবকদের নাম এই শহরের দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মতো লাগিয়া আছে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত : আর কি তেমন আসিবে না? (দেশ ১৬.৪.৮৯)

দেশের লোক

বিদেশ-বিভূঁইয়ে দেশের লোক গেলে সে পকেটমার না শঙ্করাচার্য, সেকথা কেউ শুধায় না।
সৈয়দ মুজতবা আলী : কিসের সন্ধানে (পঞ্চতন্ত্র)

দেহ

আত্মা—যাকে নিয়ে মানুষের এত, তিনি হলেন দেহাশ্রয়ী। দেহ নইলে তিনি নিরাশ্রয় নিরালম্ব—তাঁর আর কিছু থাকে না।.....যে মন্দিরে দেবতা থাকেন, সে মন্দিরের অযত্ন হলে দেবতা থাকবেন কি করে। দেহকে পীড়া দিয়ে তাকে অকালে চলে যেতে বাধ্য করলে—সেও যে একধরনের আত্মহত্যা হয়, শরীরের একটু যত্ন নিতে হবে।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্যনিকেতন

দেহের দেউলে দেবতা নিবসে—তার অপমান দুর্বিসহ!

মোহিতলাল মজুমদার ঃ কালাপাহাড়

যখের কড়ি আগলে আছিস মোক্ষ আশায় মূর্খ কে?
অর্ঘ্য দে।
মর দেহের চেয়ে মূর্খ মোক্ষ নয় মহার্ঘ রে!
অর্ঘ্য দে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ ইহবাদী (প্রথমা)

দেখা দিল দেহের অতীত কোন্ দেহ এই মোর
ছিন্ন করি বস্তুবাঁধন-ডোর।
শুধু কেবল বিপুল অনুভূতি,
গভীর হতে বিচ্ছুরিত আনন্দময় দ্যুতি,
শুধু কেবল গানেই ভাষা যার,
পুষ্পিত ফাল্গুনের ছন্দে গন্ধে একাকার;
নিমেষহারা চেয়ে—থাকার দূর অপারের মাঝে
ইঙ্গিত যার বাজে।
যে দেহেতে মিলিয়ে আছে অনেক ভোরের আলো,
নাম-না-জানা অপূর্বেরে যার লেগেছে ভালো,
যে-দেহেতে রূপ নিয়েছে অনির্বচনীয়
সকল প্রিয়ের মাঝখানে যে প্রিয়,
পেরিয়ে মরণ সে মোর সঙ্গে যাবে—
কেবল রসে, কেবল সুরে, কেবল অনুভাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অমর্ত্য (সেঁজুতি)

দেহখানি তার চিক্কণ কালো,
যত দেখি তত লাগে ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চণ্ডালিকা নৃত্যনাট্য—১ম দৃশ্য

ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তনু (কড়ি ও কোমল)

পরিপূর্ণদেহ
মঞ্জরিত বল্লরীর মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

সুকুমার উজ্জ্বল দেহ,
দেবশিল্পী কুঁদে বের করেছে
বিদ্যুতের বাটালি দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক—৩৩

দেহপট

অমৃত অমৃতভাষী তার তরে বঙ্গবাসী
দুই বিন্দু অশ্রু কিগো ঢালিবে চিতায়,
দেহপট সঙ্গে নট সকলি হারায়।

অমৃতলাল বসু ঃ মিত্র স্মৃতি (অমৃতলাল মিত্র স্মরণে)

দৈত্য

ব্যক্তিটি একটি মাত্র কিন্তু তার গোলমাল করবার যন্ত্র বিস্তর। এইটেই হচ্ছে দৈত্যের লক্ষণ।........নিজের কুড়িটা নাসারন্ধ্রে নাক ডাকবার সময় রাবণের হয়তো ঘুমের ব্যাঘাত হত না, কিন্তু তার প্রতিবেশীর কথাটা চিন্তা করে দেখো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পয়লা নম্বর (গল্পগুচ্ছ)

দৈব

দৈবে তুমি কখন নেশায় পেয়ে
আপন মনে যাও তুমি গান গেয়ে গেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

আমি যে রমণী সেটা.....অপরূপ দৈবী মহিমা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে বাইরে

দৈব কিম্বা পুরুষকার
বিশ্বরাজ্য কোন রাজার?
কাহার বিরাট কাহার স্বরাট,
কাহার প্রকাশ সঙ্গোপন?
দৈব কিম্বা পুরুষকার
নিদান, বিধান কোন রাজার
কর্ম-সাক্ষী বিজয়-লক্ষ্মী
কোন মহানে করে বরণ?

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ঃ নরনারায়ণ-প্রস্তাবনা

চিরদিন সংসারে অত্যাচারিত, পীড়িত, দুর্বল বলিয়া মানুষের সহজ অধিকার হইতে যাহারা সবলের দ্বারা প্রবঞ্চিত, নিজের উপর বিশ্বাস করিবার কারণ যাহারা দুনিয়ায় খুঁজিয়া পায় না, দেবতা ও দৈবের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পথের দাবী

দৈবাৎ

মানুষ কি চোখ চাইলেই দেখা যায়! দৈবাৎ হাতে ঠেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোড়ায় গলদ—১।১

মেয়েদের মধ্যেও দৈবাৎ কোথাও কোথাও বুদ্ধির প্রমাণ মেলে......।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ল্যাবরেটরি (তিনসঙ্গী)

দোল (দ্র. হোলি)

দোল পূর্ণিমা। কে কাকে নিয়া কখন দুলিয়াছে। সেই যে দোলা দিয়াছিল তারা তাদের দোলনায়, স্মৃতির অতলে তারই ঢেউ। অমর হইয়া লাগিয়া গিয়াছে গগনে পবনে বনে বনে, মানুষের মনে মনে। মানুষ নিজেকে নিজে রাঙায়। তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না। প্রিয়জনকে রাঙায়, তাতেও পূর্ণ তৃপ্তি পায় না—তখন তারা আত্মপর বিচার না করিয়া, সকলকেই রাঙাইয়া আপন করিয়া তুলিতে চায়।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ তিতাস একটি নদীর নাম

আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়।
দখিনার দোল লেগেছে দোলন চাঁপায়॥
দোলে আজ দোল ফাগুনে।
ফুল-বান আঁখির তূণে
দুলে আজ বিধুর হিয়া মধুর ব্যথায়॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাব্য-গীতি

দোল কি কেবল.....দোলনাতেই আছে? আকাশে চন্দ্র-সূর্য দোলে, বৎসরে-বৎসরে দিনে দিনে ছয় ঋতুও দিবারাত্রি দোলে, জোয়ার-ভাটায় নদী-সমুদ্রের জল দোলে, বৈশাখী ঝড়ে তালগাছের মাথা দোলে। আবার দেখ....ঢেঁকি কচকচ করিয়া দোলে, ঘাটে বাঁধা ডিঙিখানা স্রোতের তাড়ায় ডাইনে বাঁয়ে দোলে। ঘরের ঘড়িটার পেন্ডুলাম টক-টক শব্দ করিয়া দোলে, শিরার ভিতরকার রক্তের স্রোতও দিবারাত্রি দোল খায়। এই জগতে ভগবানের দোলের উৎসবের যেন শেষ নাই—আশ্চর্য ব্যাপার! হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু সবই দোলের লীলা।

জগদানন্দ রায় : দোলনা

কে রঙ লাগালে বনে বনে।
ঢেউ জাগালে সমীরণে॥
আজ ভুবনের দুয়ার খোলা দোল দিয়েছে বনের দোলা—
দে দোল! দে দোল! দে দোল!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

দোল লেগেছে এবার। পাওয়া আর না-পাওয়ার মাঝখানে এই দোল। এক প্রান্তে মিলন আর এক প্রান্তে বিরহ, এই দুই প্রান্ত স্পর্শ করে করে দুলছে বিশ্বের হৃদয়। পরিপূর্ণ আর অপূর্ণের মাঝখানে এই দোলন। আলোতে ছায়াতে ঠেকতে ঠেকতে রূপ জাগছে জীবন থেকে মরণে, বাহির থেকে অন্তরে। এই ছন্দটি বাঁচিয়ে যে চলতে চায় সে তো যাওয়া-আসার দ্বার খোলা রেখে দেয়। কিন্তু, ওই-যে হিসাবি মানুষটা দ্বারে শিকল দিয়ে আঁক পাড়ছে তার শিকল-নাড়া দাও তোমরা। ঘরের লোককে অন্তত আজ এক দিনের মতো ঘরছাড়া করো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবীন

ওরে গৃহবাসী, তোরা খোল্ দ্বার খোল্
লাগল-যে দোল।
স্থলে জলে বনতলে
লাগল-যে দোল।
খোল্ দ্বার খোল্।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবীন

উড়ে কুন্তল, উড়ে চঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল
বাজে কঙ্কণ বাজে কিঙ্কিণী
মত্ত বোল।
দে দোল্ দোল্।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঝুলন (সোনার তরী)

প্রাণেতে আমাতে মুখোমুখী আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয়-লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঝুলন (সোনার তরী)

আলোকরসে মাতাল রাতে
বাজিল কার বেণু।

দোলের হাওয়া সহসা মাতে
ছড়ায় ফুলরেণু।......
লাগিল দোল জলে স্থলে
জাগিল দোল মনে,
সোহাগিনীর হৃদয় তলে
বিরহিণীর মনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দোল (নটরাজ)

শ্রীচৈতন্যের জন্মের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা বলে কোন ধর্ম-অনুষ্ঠান ছিল না। যেদিন তাঁর জন্ম হয় সেদিন ছিল ফাল্গুনী পূর্ণিমা। যে ক্ষণে জন্ম হয় সে ক্ষণে চন্দ্রগ্রহণ লেগেছিল। সেজন্য নবদ্বীপময় হরিধ্বনি ও শঙ্খ-ঘণ্টার রোল উঠেছিল। লোকে দলে দলে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল। সেই থেকে ফাল্গুনী পূর্ণিমার আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যের শুরু। চৈতন্যের জন্মদিন বৎসরের মধ্যে সর্বশুভদিন—সকল বৈষ্ণব ভক্তের কাছে, কি বাংলাদেশে, কি ব্রজধামে। চৈতন্যের তিরোভাবের পর সনাতন-রূপ-গোপাল ভট্ট জীব প্রমুখ বৈষ্ণব গোস্বামীরা যখন বৈষ্ণবের আচরণীয় বিধিসকল সংস্কৃতে গ্রন্থ বদ্ধ করলেন তখন স্বভাবতই পশ্চিমাঞ্চলের লোক উৎসব—যাতে লৌকিক গান ও ছড়ার সূত্রে কৃষ্ণের প্রেমকথার সংযোগ ছিল—তাকে গ্রহণ করে দোলযাত্রার ব্যবস্থা করা হল। সেই দোল লীলা বাংলাদেশেও এল, এখানে দোলযাত্রা হল। পশ্চিমাঞ্চলে কিন্তু হোলি স্বতন্ত্র উৎসব রূপে রয়ে গেল।
দোল-যাত্রা আসলে দোলা-যাত্রা, দোলায় অর্থাৎ শিবিকায় চড়ে স্ফূর্তি করতে করতে শোভাযাত্রা। যাত্রা কথাটির মানেই হল অনায়াস গমন—জলে অথবা স্থলে। যে উৎসবে দেব-বিগ্রহ অথবা দেবপূজকেরা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থান হতে স্থানান্তরে গমন করেন তাই-ই ছিল 'যাত্রা'। যেমন রথযাত্রা, দোলযাত্রা, স্নানযাত্রা। অশোক তাঁর এক অনুশাসনে বলেছেন যে, তিনি অনেক আয়োজন আড়ম্বর করে 'বিহারযাত্রা' করেছিলেন। আমার মনে হয়, সে 'বিহার' যাত্রা দোলা-লীলার মতো বসন্ত-বিহার—যদি স্থলপথে হয়, তবে স্নানযাত্রার মতো শোভাযাত্রা। জঙ্গল দোলা স্থাবরে পরিণত হয়ে আমাদের দোলযাত্রায় রূপ পেয়েছে।

সুকুমার সেন : দোলের কথা (বিচিত্রা)

দোষ

ছোট যারা তারাই দোষ করে। বড়দের দোষ ধরতে নেই। বড়রা নেতা।

জয় গোস্বামী : আনন্দবাজার পত্রিকা (২৭.৪.২০০৩)

দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

দাশরথি রায় : পাঁচালী

মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নের দোষ কেন।
আঁখি কি মজাতে পারে না হলে মনমিলন॥

রামনিধি গুপ্ত : গান

মন-গরীবের কি দোষ আছে, তারে কেন নিন্দা কর মিছে?

রামপ্রসাদ সেন : শাক্তপদাবলী

দোস্ত

খাঁটি দোস্ত কখনও দুষমন হয় না! তাহলে দুনিয়াটা এ্যাদ্দিন উল্টে যেত।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : নিষিদ্ধ প্রান্তর

দৌড়

গোড়ায় যেখানে বেশি লজ্জা দেখা যাচ্ছে,—ওর নাম কী—ভালবাসার দৌড়টাও সেখানে বড্ড বেশি হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৈকুণ্ঠের খাতা—২

দ্বন্দ্ব

কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ॥

ভারতচন্দ্র ঃ অন্নদামঙ্গল

জীবনে যখন আত্মবিরোধ ঘটে, তখন হৃদয়ের এক তারের সঙ্গে আর এক তারের অসামঞ্জস্যের বেসুর কর্কশ হইয়া উঠে, তখন কেবলমাত্র বুঝাইয়া কোনো ফল পাওয়া যায় না—মজাইয়া দিতে না পারিলে দ্বন্দ্ব মিটে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সঞ্চয় ধর্মের নবযুগ

দ্বার

দক্ষিণদ্বারী ঘরের রাজা,
পূর্বদ্বারী তার প্রজা ;
পশ্চিমদ্বারীর মুখে ছাই,
উত্তরদ্বারীর খাজনা নাই।

বাংলা প্রবাদ

দ্বিজ

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মুরতি।
পদ্মপত্র পদ্মনেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥

কাশীরাম দাস ঃ মহাভারত

দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ সেবা-সাম

দ্বিধা

মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে সে দিন ভরা সাঁঝে।
যেতে যেতে দুয়ার হতে কী ভেবে ফিরালে মুখখানি—
কী কথা ছিল যে মনে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

……নদীর নেই কোনো দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্রপুট—১৫

দ্বিধা ভরে পিক মৃদু কুহুতান
কুহরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা (কথা)

দ্বীপ

আজ আমরা যতই নিকট হই
সহোদর ভাই বন্ধুও বা—
তবুও যেন সংযোগবিহীন টুকরো টুকরো দ্বীপ।

গিরিশংকর ঃ **সঙ্কটের ছায়া**

অবশ্য মানুষ মাত্রেই বুঝি, এমনি এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, সৃষ্টির রহস্যসাগরে ঘেরা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ **কুয়াশা**

পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মতো উর্ধ্বমুখে শয়ান রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৌকাডুবি—৩

নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ
প্রবাল দিয়ে ঘেরা,
শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে
সাগর-বিহঙ্গেরা।
নারিকেলের শাখে শাখে
ঝোড়ো বাতাস কেবল ডাকে,
ঘন বনের ফাঁকে ফাঁকে
বইছে নগনদী
সোনার রেণু আনব ভরি
সেথায় নামি যদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী (ক্ষণিকা)

দ্বৈত

সকলের চেয়ে দুর্বিপাক হচ্ছে অ-মনের মতো দ্বৈত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—২৯।৯।২৪

ধন

ধনে যার অহঙ্কার, তার দুয়ারে যাই না আর।

বাংলা প্রবাদ

ধনে সুখ নয়, মনে সুখ।

বাংলা প্রবাদ

মোর কিছু ধন আছে সংসারে,
বাকি সব ধন স্বপনে নিভৃত
স্বপনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৩

ক্ষতির ধনেরে ক্ষয় হতে দেওয়া ভালো,
কুড়াতে কুড়াতে শুকায়ে সে হয় কালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বীথিকা। ক্ষণিক

জীবনে অনেক ধন পাই নি,
নাগালের বাইরে তারা ;
হারিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি
হাত পাতি নি বলেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তেঁতুলের ফুল (শ্যামলী)

না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে,
দিবসে সে ধন হারায়েছি আমি, পেয়েছি আঁধার রাতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখসঞ্চয়ের ভার নেয় তখন......সুখের পরিবর্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দৃষ্টিদান (গল্পগুচ্ছ)

মস্ত ধনের মস্ত দরিদ্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পুরোনো বাড়ি (লিপিকা)

আমার যা শ্রেষ্ঠ ধন সে তো শুধু চমকে ঝলকে,
দেখা দেয়, মিলায় পলকে।
বলে না আপন নাম, পথেরে শিহরি দিয়া সুরে
চলে যায় চকিত নূপুরে।
সেথা পথ নাহি জানি,
সেথা নাহি যায় হাত, নাহি যায় বাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—১০

ধন জিনিসটাকে আমাদের দেশ সচেতনভাবে অনুভব করিতেই পারিল না, এইজন্য আমাদের দেশের কৃপণতাও কুশ্রী, বিলাসও বীভৎস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বোম্বাই শহর (পথের সঞ্চয়)

ঘরটাকে তার ছাড়িয়ে গেল ঘরেরই আসবাবে।
মনটাকে তার ঠাঁই দিল না ধনের প্রাদুর্ভাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বেসুর (বিচিত্রিতা)

কাঙাল যে জন পায় না সে ধন,
পায় সে কেবল ভিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভিক্ষু (পরিশেষ)

যা তোরা যা সখী, যা শুধা গে
ওই আকুল অধর আঁখি কী ধন যাচে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মায়ার খেলা—৪র্থ দৃশ্য

ধনের ধর্মই অসাম্য। জ্ঞান ধর্ম কলাসৌন্দর্য পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করিলে বাড়ে বই কমে না, কিন্তু ধন জিনিসটাকে পাঁচজনের কাছ হইতে শোষণ করিয়া লইয়া পাঁচজনের হাত হইতে, তাহাকে রক্ষা না করিলে সে টেঁকে না। এইজন্য ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লোকহিত—কালান্তর

পেয়েছি যে-সব ধন,
যার মূল্য আছে,
ফেলে যাই পাছে।
যার কোনো মূল্য নাই,
জানিবে না কেও,
তাই থাকে চরম পাথেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—১৩৮

ধনতন্ত্র

ধনতন্ত্রের বাঁচবার একটাই পথ—আত্মহত্যা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপ

ধনী

ধনীর মাথায় ধর ছাতি
নির্ধনের মাথায় মার লাথি।

বাংলা প্রবাদ

ত্যাগের ধনে মানুষ ধনী, চুরির ধনে নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালের যাত্রা। কবির দীক্ষা

ঐশ্বর্যের আড়ম্বরই বিলাতি ধনীর প্রধান শোভা, মঙ্গলের আয়োজন ভারতের ধনীর প্রধান শোভা। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ বারোয়ারি-মঙ্গল (ভারতবর্ষ)

ধন্য

সেই ধন্য নরকুলে
লোকে যারে নাহি ভুলে
মনের মন্দিরে সদা সেবে সর্ব্বজন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ বঙ্গভূমির প্রতি

ধন্য রে আমি অনন্তকাল,
ধন্য আমার ধরণী।
ধন্য এ মাটি, ধন্য সুদূর
তারকা হিরণবরনী।......
যা হয়েছি আমি ধন্য হয়েছি,
ধন্য এ মোর ধরণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—১৪

আমার সকল কাঁটা ধন্য করে
ফুটবে গো ফুল ফুটবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমাল্য—৪৯

ধন্য সেই মুগ্ধ মূর্খ ক্ষীণতনুলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনাঙ্গিনী
সামান্য ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্যবল, তপস্যার তেজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা—১

ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—৪৭

ধন্য আমি হেরিতেছি আকাশের আলো
ধন্য আমি জগতেরে বাসিয়াছি ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চৈতালি। প্রভাত

ধরণী

ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার-আলো,
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধরাতল (চৈতালি)

উজ্জ্বলনীলবসনপ্রান্ত
সুন্দর শুভ ধরণী। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ নগরসংগীত (চিত্রা)

ধরণী পড়িয়া থাকে
চরণ ধরিয়া। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ রাজা ও রানী—২।২

ধরণী শক্তিমানদের জন্যে জমা করে রেখেছেন তাঁর দুর্গম জঠরে কঠিন খনিজ পদার্থ, এই নিয়ে দিগ্বিজয় করেছে তারা, আর গরিবদের জন্যে রয়েছে তার উপরের স্তরে ফসল—হাড় বেরিয়েছে তাদের পাঁজরায়, চুপ্‌সে গেছে তাদের পেট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ কথা (তিনসঙ্গী)

ধরা

যিনি সব জায়গায় আপনি ধরা দিয়ে বসে আছেন তাঁকে একটা জায়গায় ধরতে গেলেই তাঁকে হারাতে হয়। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ অচলায়তন—৬

ধরা দিয়েছি গো আমি আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

ধরা নাহি দিলে ধরিব দু পায় ;—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পুরস্কার (সোনার তরী)

ধরা সে যে দেয় নাই, দেয় নাই,
যারে আমি আপনারে সঁপিতে চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্যামা

ইন্দ্রের ঐশ্বর্য নিয়ে, হে ধরিত্রী, আছো তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শুভ্র সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্মদিন (সেজুঁতি)

ধর্ম

পরমাত্মা অনাদি অনন্ত সত্যস্বরূপ। তাঁকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করাকেই ধর্ম বলে। প্রত্যক্ষভাবে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব উপলব্ধিই ধর্ম। এ' ছাড়া ধর্মের আর কোন অর্থ হয় না।

সত্যকে সমগ্রভাবে সকল দিক দিয়ে ও অবিকৃতরূপে জানাই ধর্ম। যুক্তিবিচার (reason) ও নৈতিক পবিত্রতার পরাকাষ্ঠায় মানুষ ধর্মলাভের অধিকারী হয়।

প্রকৃত ধর্মের প্রকৃতি বিশ্বজনীন ও অসাম্প্রদায়িক। ধর্মকে ঠিক ঠিক ভাবে জানতে হ'লে সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, সঙ্কীর্ণতা ও যুক্তিহীন বিশ্বাসকে একেবারে ত্যাগ করতে হবে। **স্বামী অভেদানন্দ** ঃ উপদেশমালা

প্রকৃত ধর্ম কখনও বিজ্ঞানের যুক্তিকে অস্বীকার করে না, বরং বিজ্ঞানের সত্যান্বেষী নির্দেশ ধর্মলাভের সহায়ক।

স্বামী অভেদানন্দ ঃ উপদেশমালা

আসল ধর্ম সম্পূর্ণরূপে সাধনাসাপেক্ষ। শাস্ত্রপাঠ, বিচারবিতর্ক, আলাপ-আলোচনা কিম্বা কোনও আচার-নিয়ম পালন গৌণ ব্যাপার। আসল ধর্ম সম্পূর্ণরূপে সত্যতত্ত্বের প্রকাশ করে। অলীক ও আজগুবি বিষয়ে বিশ্বাস, যাদুবিদ্যা, ভোজবাজী, ইন্দ্রজাল, ভুতুড়ে কাণ্ড, সম্মোহন-বিদ্যা, অভিচার প্রভৃতি কখনই ধর্মের বিষয় নয়। আসল ধর্মের সঙ্গে এই সব সত্যবিরোধী ব্যাপারের কোনই সম্বন্ধ নাই।

স্বামী অভেদানন্দ ঃ উপদেশমালা (কালী-তপস্বী)

ধর্মের উপরেই জগতের সত্য প্রতিষ্ঠিত। ধর্মই জগতের জীবন।

আনন্দময়ী মা ঃ পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা (গুরুপ্রিয়া/গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী)

একটা ধর্ম কখনো সঙ্কীর্ণ, অনুদার হইতে পারে না। ধর্ম সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য চিরদিনই বিশ্বের সকলের কাছে সমান সত্য। কোন ধর্ম শুধু কোন এক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের জন্য নয়। তাহা বিশ্বের।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ছুঁৎমার্গ (নজরুল রচনা সম্ভার-৩)

পাঁচিল থেকে টুপ করে লাফিয়ে পড়ছে বেড়াল
বেড়াল এবাড়ি ওবাড়ির রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে ধর্ম খায়
তৃতীয় বিশ্বে ধর্ম খুব সুস্বাদু।

তাপস রায় ঃ বিড়াল বিষয়ে এক কিস্তি

ধর্ম সংসারে মানুষকে ঈশ্বর এবং স্বর্গ বৈকুণ্ঠ না দিক, তাকে পুণ্য দেয়, পবিত্রতা দেয়, জীবনে পরমানন্দ দেয়, শান্তি দেয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কীর্তিহাটের কড়চা

যদ্দারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কৃষ্ণচরিত্র

যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয় তাহাই ধর্ম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দেবতত্ত্ব, হিন্দুধর্ম

যেমন সব মানুষ এক ঈশ্বরের সন্তান, সেই রকম সব ধর্ম সেই এক ধর্মের সন্তান। কিন্তু তাদের মধ্যে এত ভ্রাতৃবিরোধ কেন, জানি না। পৃথিবীতে ধর্মের নামে যত রক্তপাত হয়েছে, আর কিছুর জন্য বোধ হয় তত হয় নাই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় ঃ মেবার পতন

বড়লোকই বল, আর গরিবই বল, ধর্মকে কেউ পছন্দ করে না; কিন্তু এখনও ধর্মের এইটুকু প্রেস্টিজ আছে যে, তার ভাব দেখলে লোকে প্রকাশ্যে ঠাট্টা করতে পারে না। সত্যি কথা তো সত্যিই কেউ আর বলে না ; কিন্তু মজা এই যে, সত্যিবাদী লোককে সবাই মনে মনে এখনও ভয় করে।....'সত্যি কথা', 'ধর্ম' ওগুলোকে ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে এখনও কাজ দেয়।

প্রমথনাথ বিশী ঃ ঘৃতং পিবেৎ (মানিভিলা)

চার ধরনের মানুষ ধর্ম তৈরি করেছে, তারাই ধর্ম ভোগ করে। এক নম্বর ভিতু, নার্ভের অসুখ এর, এই বিশাল জগৎ-ব্যাপারের সামনে. জীবনের জটিলতার সামনে এ ভয়ে জুজু হয়ে যায়। বোঝে না ভুবন বিশাল হলেও তার ওপর মোটেই ভুবনের ভার ন্যস্ত নয়। দু'নম্বর ক্ষমতালোভী, এ দেখে বেশ মজা তো, ধর্মের ভয় দেখিয়ে বা লোভ দেখিয়ে অনেক মানুষের ওপর দিব্যি ছড়ি ঘোরানো যায় তো! পাওয়াও যায় অনেক কিছু! এরা ভণ্ড, পাপিষ্ঠ, স্বার্থান্ধ, সব ধর্মের চার্চ এরা চালায়। তিন নম্বর কবি। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবতে ভাবতে প্রকৃতির অপার সৌন্দর্য এবং রহস্য অবলোকন করতে করতে এঁরা নানান অলঙ্কারের মধ্যে দিয়ে নিজেদের বিস্ময়, আকর্ষণ, ভক্তি প্রকাশ করেন, এঁরা কল্পনা করেন কোটি দেব-দেবী, তাঁদের নিয়ে বহু পুরাণ, এঁরা দেখেন পাখা-মেলে-উড়ে আসা দেবদূত, কণ্ঠ শোনেন জিব্রাইলের, এঁরা কল্পনা করেন এক জ্যোতির্ময় শিশু কোনও পিতার সাহায্য ছাড়াই ভূমিষ্ঠ হচ্ছে এবং বৃদ্ধ প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা তার পূজা করছেন। আর চার নম্বর হলেন দার্শনিক, আইডিয়া বা ভাবের জগতের লোক এঁরা, এঁরা কোনও না কোনও একটা তত্ত্ব দিয়ে বিশ্বরহস্যকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন, বিশ্বসংসারকেই নৈতিক পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করেন। এই চারটে শ্রেণীর মধ্যে একজনের ভেতর একাধিক প্রবৃত্তি থাকতে পারে। কিন্তু ধর্মের পেছনে যে উদ্দেশ্য-শক্তি কাজ করছে তাতে এই চারটে ধারায় ভাগ করে ফেললে বুঝতে সুবিধে হবে!......

বাণী বসু ঃ একুশে পা

ধর্ম এমন একটি ভাব—যা পশুকে মনুষ্যত্বে ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।

বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী - (৫/৪০৯)

মানুষের মধ্যে যে দেবত্ব প্রথম থেকে আছে, তার বিকাশই ধর্ম।

বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী (পত্রাবলী)

পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ। শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ। অপরকে ভালবাসাই ধর্ম, অপরকে ঘৃণা করাই পাপ। ঈশ্বর ও নিজ আত্মাতে বিশ্বাসই ধর্ম, সন্দেহই পাপ। অভেদ-দর্শনই ধর্ম, ভেদ-দর্শনই পাপ।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী-১০

প্রত্যেক ধর্মের পতাকার উপর লিখিত হইবে—'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।'

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ চিকাগো বক্তৃতা

শোনো শোনো অমৃত পুত্রেরা
শৃণ্বন্তু বিশ্বে
ধর্ম এক মধুর মদিরা
চিরশব্দময় ওই নদী
তাকে করো অন্ধ ও বধিরা।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ঃ শৃণ্বন্তু (আগুনের ডানা)

ধর্ম তো একটাই—মানবধর্ম। খ্রীষ্টের একটা ধর্ম, বুদ্ধের একটা ধর্ম—তা হবে কেমন করে? সকলের ধর্মই মানবধর্ম।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ঃ মানবধর্ম

ভারতবর্ষে তথাকথিত ধর্মগুলি আজকাল একেবারেই অসহ হয়ে পড়েছে। এক ধর্মাবলম্বী অপর ধর্মাবলম্বীকে বলছে তোমাকে আমার ধর্মের বিধিবিধানগুলো মেনে চলতেই হবে। কেন যে চলতে হবে তার যুক্তি হচ্ছে লাঠির গুঁতো।

মুজফ্ফর আহমদ ঃ সাম্প্রদায়িকতার বিষম পরিণাম

ধর্ম আর ধর্মতন্ত্র এক জিনিষ নহে, ও যেন আগুন আর ছাই।.....মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কর্তার ইচ্ছায় ধর্ম

ধর্ম নহে সম্পদের হেতু,......
নহে সে সুখের ক্ষুদ্র সেতু ;
ধর্মেই ধর্মের শেষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান্ধারীর আবেদন (কাহিনী)

ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের সঙ্গে মৈত্রী করো, তখন কোনো তর্ক না করেই কথাটাকে মাথায় করে নেব। ধর্মের এ কথাটা আমার কাছে মহাসমুদ্রের মতই নিত্য। কিন্তু ধর্ম যখন বলে—মুসলমানের ছোঁয়া অন্ন গ্রহণ করবে না তখন আমাকে প্রশ্ন করতেই হবে—কেন করব না?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালান্তর

ভালোমানুষি ধর্ম নয়, তাতে দুষ্ট মানুষকে বাড়িয়ে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা

ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য

ধর্ম যদি অন্তরের জিনিষ না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে

তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয় এমন আর কিছুই না। এই 'ডগমা' অর্থাৎ শাস্ত্রমতকে বাহির হইতে পালন করা লইয়া.....ইতিহাস কত বার রক্তে লাল হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছোটো ও বড়ো (কালান্তর)

অপরাধ করা ছাত্রদের এবং ক্ষমা না করা শিক্ষকদের ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে-জন মারে আর শুধু মরে।.....
যে-পূজার বেদি রক্তে গিয়েছে ভেসে
ভাঙো ভাঙো, আজি ভাঙো তারে নিঃশেষে,—
ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো,
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক আনো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধর্মমোহ (পরিশেষ)

ধর্ম.....আলোর মতো ; তাহার পাওয়া এবং দেওয়া একই কথা, তাহা একেবারে একসঙ্গেই ঘটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধর্মশিক্ষা (সঞ্চয়)

মানুষেরও সকলের চেয়ে বড়ো চাওয়াটি তাহার ধর্ম। ইহাই তাহার আপনাকে পরম আপনের মধ্যে চাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধর্মশিক্ষা (সঞ্চয়)

ধর্ম কেবলই মানুষকে বলিতেছে, তুমি অমৃতের পুত্র, ইহাই সত্য ; ব্যবহাররত মানুষের স্খলন পদে পদে হইতেছে তবু ধর্ম তাহার সত্য পরিচয়কে উচ্চে ধরিয়া রাখিতেছে ; মানুষ বলিতে যে কতখানি বুঝায় ধর্ম তাহা কোনোমতেই মানুষকে ভুলিতে দিবে না ; ইহাই তাহার সর্বপ্রধান কাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধর্মের অধিকার : সঞ্চয়

ধর্মের বিকারেই গ্রীস মরিয়াছে, ধর্মের বিকারেই রোম বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমাদের দুর্গতির কারণ আমাদের ধর্মের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধর্মের অধিকার (সঞ্চয়)

সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয়.....। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটীর পূজা

ভয়ের তাড়া খেলেই ধর্মের মূঢ়তার পিছনে মানুষ লুকোতে চেষ্টা করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটীর পূজা

প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠধর্ম আছে, তাহা মানব সাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্ম যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (ভারতবর্ষ)

ধর্মকে ভারতবর্ষ.....মানবের সমস্ত জীবনব্যাপী একটি বৃহৎ বনস্পতিরূপে দেখিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতবর্ষের ইতিহাস (ভারতবর্ষ)

মৃত্যুর ধর্মই এক, প্রাণধর্ম নানা,
দেবতা মরিলে হবে ধর্ম একখানা। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন**

ধর্ম.....রিলিজন নহে, সামাজিক কর্তব্যতন্ত্র ;—তাহার মধ্যে ....রিলিজন পলিটিক্স সমস্তই আছে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সমাজ ভেদ (স্বদেশ)**

বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যস্থাপন—ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বদেশী সমাজ (আত্মশক্তি)

যে দেশে প্রধানত ধর্মের মিলেই মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধন তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। সে দেশ স্বয়ং ধর্মকে দিয়ে যে বিভেদ সৃষ্টি করে সেইটে সকলের চেয়ে সর্বনেশে বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের মূল্য সেইটেকেই সহজ প্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি। যে দেশে ধর্মই সেই বুদ্ধিকে পীড়িত করে রাষ্ট্রিক স্বার্থবুদ্ধি কি সে দেশকে বাঁচাতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিন্দুমুসলমান (কালান্তর)

লড়াই ঝগড়া বাদাবাদি করে আর যাকেই পাওয়া যাক না, ধর্ম বস্তুটিকে পাবার জো নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ গৃহদাহ

মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকার একটা ধর্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পল্লীসমাজ

যে কোন ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বর্তমান হিন্দু মুসলমান সমস্যা

ধর্ম স্বর্গে নিয়ে যেতে পারে, মর্ত্যে কিন্তু ডোবায়। ওটা নির্বোধের জন্য।

সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ দাদার দুরভিসন্ধি

ধর্ম নিপাত যাক। ধর্মই মানুষের জীবনে যাবতীয় কষ্ট আর গ্লানির মূলে। ধর্ম মানুষকে হিন্দু অথবা মুসলমান করে। ধর্ম মানুষের স্বাভাবিক চেতনা আর বুদ্ধিকে ঘোলাটে করে। তার চোখে পরিয়ে দেয় ঘানির বলদের মতো ঠুলি।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ অলীক মানুষ

ধর্ম মানুষের মধ্যে সীমারেখা টেনেছে—সৃষ্টি করেছে জটিল সব ব্যবধান। ধর্ম পরিপূর্ণ মানবিক বিকাশের পথে বাধা এনেছে। অতএব—ধর্মকে অস্বীকার করা ভালো। সুযোগ পেলেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা দরকার।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ নিষিদ্ধ প্রান্তর

ধর্মকাব্য/ধর্মগ্রন্থ

রস-সৃষ্টি দ্বারা আনন্দ প্রদান করাই কাব্যরচনার অন্যতম লক্ষ্য। কিন্তু রসসৃষ্টির উপকরণরূপে 'ধর্ম্ম' বস্তুটিকে অনেকেই নীরস বলিয়া মনে করেন; তাহার কারণও যে না আছে, তাহা নয়। তবে ধর্ম্মকে সব সময় যতটা নীরস বলিয়া গণনা করা হয়, ততটা নীরস মনে করিবার হেতু নাই। ধর্মাচরণরূপে যাহাকে জ্ঞানের বিষয় করা হয়, যাঁহাকে যোগমার্গে অনুভব করিবার চেষ্টা করা হয়, অথবা যাঁহাকে ভক্তির ডোরে বাঁধা হয়, তিনি রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। তিনি ব্রহ্মই হউন, ঈশ্বরই হউন বা লোক সম্পর্কে প্রেমিক বা জননীই হউন—সর্ব্বক্ষেত্রেই তাঁহার রস-সত্তা অম্লান। তাঁহার সাধনও শুষ্ক জ্ঞান মাত্র নয়, নীরস যোগাযোগ নয়, কেবল আনুষ্ঠানিক পূজাঅর্চ্চনা নয়। বিশেষ করিয়া রাসেশ্বরী বা রাসেশ্বরীর সাধনা সর্বথা ভাবাশ্রয়ী ও রসাশ্রয়ী অতএব সাধ্য সাধন উভয়ই যখন রস-কেন্দ্রিক, তখন তদ্বিষয়ক কাব্যও স্বাভাবিক ভাবেই রসোত্তীর্ণ হইয়া উঠিবার দাবী রাখে। 'অখিল রসামৃত'ই ধর্ম্মমূলক কাব্যে রসবিন্দুরূপে প্রকাশিত হন। এই জন্যই ধর্ম্মমূলক রচনা নিছক ধর্ম্মশাস্ত্র হইয়া থাকে না, অনেক সময় তাহা কাব্য পদবাচ্য হইয়া উঠে।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ঃ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা

কাব্যোৎকর্ষ বিচারের প্রধান কষ্টিপাথর 'জীবন'। জীবনের বহুবিচিত্র প্রকাশই সাহিত্য। যে সাহিত্য জীবনরসে পরিপূর্ণ, তাই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ঃ 'We care for literature primarily on its deep and lasting human significance. A great book grows directly out of life ; in reading it we are brought into large, close and fresh relations with life and in that fact lies final explanation of its power' (Hudson). .....

পাশ্চাত্য সমালোচকের বিচারে ধর্মমূলক গ্রন্থাদির কাব্যমূল্য সংশয়িত। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম্ম সম্পর্কে এ অভিযোগ কোনক্রমেই খাটে না। এখানে ধর্ম্মবোধ জীবনের সহিত ওতপ্রোত, জীবন ধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে গ্রথিত। ভারতীয় সাধক জীবনকে পরিহার করেন নাই বলিয়াই তাঁহাদের লেখনীতে 'গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ পুরাণ'-এর প্রকাশও কাব্য হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের মহাসৌভাগ্য যে, এ দেশের অধিকাংশ সাধক জীবন-দ্রষ্টা কবি। কবি ও ঋষি শব্দ এ দেশে সমার্থক। বৈদিক ঋষি কবি, তাই বৈদিক সূক্ত কবিত্বময় ; উপনিষদের ঋষি কবি, তাই ব্রহ্ম তাঁহাদের দৃষ্টিতে আনন্দস্বরূপ। তাঁহারা বলেন, আনন্দ হইতেই জীব ও জগতের উদ্ভব, 'আনন্দাদ্ধ্যের খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে', —এই আনন্দদ্বারাই জগৎ বাঁচে, এই আনন্দেই জগৎ লীন হয়। তাঁহাদের দৃষ্টিতে 'ইয়ং পৃথিবী সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু', 'সর্ব্বাশ্চ মধুমতী'। বেদ-উপনিষদের ঋষিগণ তাই সকাম হইয়া, শ্রীকাম হইয়া এই জগতে বাঁচিয়া থাকিবার আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, বলিয়াছেন, 'জীবেম শরদঃ শতম্।' এ প্রার্থনা জীবনপ্রেমিকেরই প্রার্থনা। এদেশের বেদ-উপনিষদ শুধু ধর্ম্ম গ্রন্থ নয়, কাব্য।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী ঃ শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা

ধর্মঘট

ধর্মঘট বলে একটা বস্তু আছে, কিন্তু নিরুপদ্রব ধর্মঘট বলে কোথাও কিছু নেই। সংসারে কোন ধর্মঘটই কখনো সফল হয় না, যতক্ষণ না পিছনে তার বাহুবল থাকে। শেষ পরীক্ষা তাকেই দিতে হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পথের দাবী

ধর্মনিরপেক্ষ

সবধর্মকে স্বীকৃতি দিলে—ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া যায় না।.....ধর্মনিরপেক্ষতা মানে—নন রেকগনিশন অব এনি সুপার-ন্যাচরাল ফোর্স! যে কোন ধর্মকেই অস্বীকার করা।

আজিজুল হক ঃ কারাগারে ১৮ বছর (২য়)

ধাঁধা

সংসারটাই একটা ধাঁধাঁ। তার চাইতেও বড় ধাঁধা ঘরের লোকটি।

পরিতোষ সেন ঃ সংসারটাই একটা ধাঁধা

চোখে কেমন লাগছে ধাঁধা
লাগছে যেন কেমন প্যারা
তারাগুলো জোনাক হ'ল
কিংবা জোনাক হ'ল তারা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ দূরের পাল্লা

ধান্দাবাজ

ভগবান সবসময় ধান্দাবাজদের সাহায্য করেন।

সমরেশ মজুমদার ঃ সাতকাহন (২য় পর্ব)

ধার্মিক

প্রকৃত ধার্মিক লোক সর্বত্রই উদার হয়ে থাকেন।

বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী-৫

তুমি যে ধার্মিক হচ্ছ, তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, তুমি ক্রমশ হাসিখুশি হয়ে থাকবে। যদি কেউ গোমড়া মুখে থাকে—তবে তা বদহজমের জন্য হতে পারে, কিন্তু তা ধর্ম নয়।....বিষণ্ণ মুখ ভয়ংকর।

বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী—১

ধর্মসমূহের মধ্যে সারবস্তু কি আছে না আছে তা জানিনে। কিন্তু এদেশে প্রতিনিয়ত চোখে দেখতে পাচ্ছি যে বেশী ধার্মিক হওয়ার মানেই হচ্ছে বেশী সঙ্কীর্ণ হওয়া। আমি যত বেশী ধার্মিক হব, তত বেশী অন্য ধর্মাবলম্বীকে ঘৃণা করব, এই হচ্ছে আমার ধার্মিকত্বের পরিচয়।

মুজফ্‌ফর আহমদ ঃ সাম্প্রদায়িকতার বিষম পরিণাম (গণবাণী, ১/৮)

ধূপ

আপনার মনে পুড়িব একাকী গন্ধবিধুর ধূপ।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি

ধূপ আপনারে মিলাইতে চাহে গন্ধে,
গন্ধ সে চাহে ধূপেরে রহিতে জুড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—১৭

আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছুই আলো।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

ধূপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার
পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারি ধার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

ধূলি

লক্ষ্মীদেবীর মালার থেকে
ছিন্ন পড়ে আছে
ধুলির সঙ্গে মিলিয়ে গিয়ে
টুকরো রতন কত—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কাঠবিড়ালি (বীথিকা)

লিখন তোমার ধুলায় হয়েছে ধূলি,
হারিয়ে গিয়েছে তোমার আখরগুলি।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

তারপরে আছে করুণ ধুলি আঁচল বিছিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবীন

নামগ্রাসী, আকারগ্রাসী, সকল-পরিচয়গ্রাসী
নিঃশব্দ মহা ধুলিরাশির মধ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্রপুট—৩

ধূসর

ধূসর জীবনের গোধূলিতে ক্লান্ত আলোয় ম্লানস্মৃতি।
সেই সুরের কায়া মোর সাথের সাথি, স্বপ্নের সঙ্গিনী,
তারি আবেশ লাগে মনে বসন্তবিহ্বল বনে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

সন্ধ্যা হয়ে আসে ;
সোনা-মিশোল ধূসর আলো ঘিরল চারিপাশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরের খেয়া (ছড়ার ছবি)

ধূপের ধোঁয়ায় ধূসর বাসরগেহ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভ্রষ্ট লগ্ন (কল্পনা)

ধৈর্য

ধৈর্য নির্বোধের শেষ সম্বল।

প্রমথনাথ বিশী ঃ কমলাকান্তের জল্পনা

প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে ধৈর্য ধরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান্ধারীর আবেদন

ধ্বংস

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন—জীবনহারা অ-সুন্দরে করতে ছেদন।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ প্রলয়োল্লাস

মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা,
.....তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রম সংশোধনে।
আজ তিনি নররূপী দানবের বংশে
মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধ্বংস (গল্পসল্প)

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রোগশয্যায়—৩

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ উটপাখি

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগ পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন আত্মা।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ মে দিনের কবিতা (পদাতিক)

ধ্বজা

সাগর—দেখতে কেমন?
নয়ন—রূপের ধ্বজা। যেন গালফুলো গোবিন্দের মা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দেবী চৌধুরানী

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ওই-যে তিনি, ওই-যে বাহির পথে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

উড়েছে তোমার ধ্বজা মেঘরন্ধ্রচ্যুত তপনের
জলদর্চিরেখা,
করজোড়ে চেয়ে আছি উর্ধ্বমুখে, পড়িতে জানি না
কী তাহাতে লেখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষশেষ (কল্পনা)

ধ্বনি

যেথা.....আদিপিতামহী পড়ে বিশ্ব-পাঁচালির ছড়া
ইঙ্গিতের অনুপ্রাসে গড়া—
কেবল ধ্বনির ঘাতে বক্ষস্পন্দে দোলন দুলায়ে
মনেরে ভুলায়ে
নিয়ে যায় অস্তিত্বের ইন্দ্রজাল সেই কেন্দ্রস্থলে,
বোধের প্রত্যূষে যেথা বুদ্ধির প্রদীপ নাহি জ্বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধ্বনি (আকাশপ্রদীপ)

মাঠ ধূধূ করছে, রৌদ্র করছে ঝাঁঝাঁ ; মানেওয়ালা কথায় এর ব্যাখ্যা অসম্ভব। তার কারণ, অর্থের চেয়ে ধ্বনি সহজে মনে প্রবেশ করে ঃ উস্‌খুস্‌ নিস্‌পিস্‌ ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ কাচুমাচু শব্দের ধরাবাঁধা অর্থ নেই। তাদের কাছ থেকে যেন উপরিপাওনা আদায় হয়, তাতে ব্যাকরণী টাঁকশালের ছাপ নেই।.....

দব্‌দব্‌ ঝন্‌ঝন্‌ টন্‌টন্‌ কন্‌কন্‌ কুট্‌কুট্‌ কর্‌কর্‌ তিড়িক্‌ তিড়িক্‌ ঘিন্‌ঘিন্‌ ঝিম্‌ঝিম্‌ সুড়্‌সুড়্‌ সির্‌সির্‌। এই ধ্বনিগুলির সঙ্গে অনুভূতির কোনোই শব্দগত সাদৃশ্য নেই, তবু এই নিরর্থক শব্দগুলির দ্বারা অনুভূতির যেমন স্পষ্ট ধারণা হয় এমন আর কিছুতেই হতে পারে না। ....

রঙের বোধকে ধ্বনি দিয়ে প্রকাশ করায় বাংলা ভাষার একটা আকুতি দেখতে পাওয়া যায় ঃ টুক্‌টুকে টক্‌টকে দগ্‌দগে লাল, ধব্‌ধবে ফ্যাক্‌ফেকে ফ্যাট্‌ফেটে সাদা, মিস্‌মিসে কুচ্‌কুচে কালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়

ধ্যান

রাজা বসেছেন ধ্যানে,
বিশজন সর্দার
চীৎকাররবে তারা
হাঁকিছে—'খবরদার'।

ধরাতল কম্পিত,
পশুপ্রাণী লম্ফিত,
রানীরা মূর্চ্ছা যায়
আড়ালেতে পর্দার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খাপছাড়া—২২

তোমারে নিরখি ধ্যানে সব হতে স্বতন্ত্র করিয়া
অনন্ত ধরিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধ্যান (বীথিকা)

সত্যযুগে ইন্দ্রদেবের ছিল রসজ্ঞান,
মস্ত মস্ত ঋষিমুনির ভেঙে দিতেন ধ্যান—
ভাঙন কিন্তু আর্টিসটিক ; কবিজনের চক্ষে
লাগত ভালো, শোভন হত দেব্‌তাদিগের পক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধ্যানভঙ্গ (প্রহাসিনী)

শাল-তাল-শিরীষের মিলিত মর্মরে
বনান্তের ধ্যানভঙ্গ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পঁচিশে বৈশাখ (পূরবী)

ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে। আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ধ্রুবতারা

কুটীরতলে দিবস হলে গত
জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মতো—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভর্ৎসনা (ক্ষণিকা)

চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারা-সম
চিরপরিচয় ভরা ওই কালো চোখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়
ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়
জানে না কেউ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ কবিতার খসড়া

নকশাল

নকশাল মারতে হবে শুনলে পোষা গুণ্ডাবাহিনীগুলোর চোখে-মুখে যে 'কিলার ইনস্টিংক্ট' ফুটে উঠত, সাতের দশকের সে-সব-মুখ যারা না দেখেছে তাদের বোঝানো যাবে না।

আজিজুল হক ঃ কারাগারে ১৮ বছর

নকশালবাড়ি শুধু একটা ঘটনা নয়। একটা আইডিয়াও বটে। একটা ধারণা, মাও-ৎ সে-তুং-এর চিন্তা।

উৎপল দত্ত ঃ তীর

নকশালবাড়ির আন্দোলন ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা—এক নতুন প্রত্যয় সংযোজিত করে। সে-মাত্রা সে-প্রত্যয় হচ্ছে, ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংশোধনবাদের নির্দিষ্ট রূপকে চিহ্নিত করা, পার্লামেন্টারি পথ, না সশস্ত্র জনযুদ্ধের পথ তা নির্দেশিত করা। সশস্ত্র সংগ্রামের পথ ভারতবর্ষের রাজনীতিতে বারবার অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত সাবলীল এবং সংগঠিতভাবে এসেছে। বিকশিত হয়েছে। তাত্ত্বিকরূপ পরিগ্রহ করেছে। এই তত্ত্বগতরূপ সেই মুহূর্তে এবং এখনও সঠিক। বুর্জোয়া পার্লামেন্টের গহ্বরে প্রবেশ করে 'সময় হয়নি' এ অজুহাত দীর্ঘ সত্তর বছর ধরে টেঁকে না। শাসকশ্রেণীর নিজস্ব ক্রুর প্রশাসন এবং সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে জনগণের মঙ্গল সাধন করা যায় না, এই অবিসংবাদী মার্কসীয় সত্যটি আবার দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে ১৯৬২ সালের পর থেকেই। উচ্চারিত হয়েছে জনগণের নিজস্ব গণফৌজের কথা।

কমলেশ সেন ঃ সংকলন প্রসঙ্গে (নকশালবাড়ি)

নখ

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা॥

ভারতচন্দ্র রায় ঃ অন্নদামঙ্গল

নগর

আজি এই প্রভাতের আশীর্বাদখানি
লও তব মাথে,

হে নগরী,
লও তব ধূলি-ধূম-ধূম্র-জটা-বিভূষিত শিরে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : নগর-প্রার্থনা (প্রথমা)

মধ্যাহ্নে নগর-মাঝে পথ হতে পথে
কর্মবন্যা ধায় যবে উচ্ছলিত স্রোতে
শত শাখা-প্রশাখায়—নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হয়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণভিত্তির 'পরে—চৌদিক আকুলি
ধায় পান্থ, ছুটে রথ, উড়ে শুষ্ক ধূলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—২২

চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি—
সেই তো নগরী।
এ তো শুধু নহে ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা—১৬

নট/নটী

অমৃত অমৃতভাষী তার তরে বঙ্গবাসী
দুই বিন্দু অশ্রু কিগো ঢালিবে চিতায়,
দেহপট সঙ্গে নট সকলি হারায়।

অমৃতলাল বসু : মিত্র স্মৃতি (অমৃতলাল মিত্র স্মরণে)

নট মনকে যেন দুই খণ্ড করিয়া অভিনয় করেন—এক খণ্ডে মন নিজ ভূমিকায় তন্ময়, অপর খণ্ড সাক্ষীস্বরূপ—দেখে যে, তন্ময়ত্ব ঠিক হইতেছে কিনা—প্রতিযোগী অভিনেতা (Co-actor) ঠিক চলিতেছে কিনা—যদি সে তাহার ভূমিকা ভুলিয়া থাকে, তবে তাহার প্রত্যুত্তর উপযোগী হইবে কিনা—রঙ্গালয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত দর্শক শুনিতে পাইতেছে কিনা?—এই সকল বিষয়ের প্রতি কলাবিদ্যাবলে নটের এককালীন দৃষ্টি থাকে ও তৎসঙ্গে অভিনয়ও চলে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : অভিনয়-বিদ্যা

নগরীর নটী চলে অভিসারে
যৌবনমদে মত্তা।
অঙ্গে আঁচল সুনীল বরণ
রুনুঝুনু রবে বাজে আভরণ—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অভিসার

চিত্রকর তাঁহার চিন্তা চিত্রে প্রকশ করেন, কবি তাঁহার কল্পনা ভাষায় মূর্ত্তি দেন, ভাস্কর পাষাণের রেখার মধ্যে কল্পনাকে রূপ দেন, নাট্যকার চরিত্র বিশ্লেষণে লিপির চাতুর্য্য দেখান, কিন্তু নট—একাধারে চিত্রকর, ভাস্কর, কবি এবং নাট্যকার,—সকলের কৃতিত্ব দখল করিয়া আপন কণ্ঠ ও আপন কায়া দ্বারা নিজের কৃতিত্ব নাট্যরসিক ও নাট্য অনুরাগীজনের মনের মধ্যে অধিক করিয়া দেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ি : অভিনয় কলা

নটরাজ

আমি চিরদুর্দম, দুর্বিনীত, নৃশংস,
মহা-প্রলয়ের আমি নটরাজ, আমি সাইক্লোন, আমি ধ্বংস।

কাজী নজরুল ইসলাম : বিদ্রোহী

জীবন—মহাদেবের নৃত্য দেখতে কি পাস, শুনিস কিরে কানে?
মুগ্ধ করি মগ্ন মোহের গানে!
তাতা থিয়া তাতা থিয়া—ঠোকাঠুকি নীহারিকার মানায়,
তাতা থিয়া—সিন্ধু নাচে বক্ষে জ্বালা বাড়বানল-জ্বালায়,
তারি সাথে যুগে-যুগে দোলে, দোলে, দোলে
নটরাজের নাচন চির-নারী-মাতার কোলে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : নটরাজ (প্রথমা)

নটরাজ যে পুরুষ তিনি, তাণ্ডবে তাঁর সাধন,
আপন শক্তি মুক্ত ক'রে ছেঁড়েন আপন বাঁধন ;
দুঃখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয় ;
জয়ের নৃত্যে আপনাকে তাঁর জয়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ক্যাণ্ডীয় নাচ (নবজাতক)

নটরাজের তাণ্ডবে তাঁহার এক পদক্ষেপের আঘাতে বহিরাকাশে রূপলোক আবর্তিত হইয়া প্রকাশ পায়, তাঁহার অন্য পদক্ষেপের আঘাতে অন্তরাকাশে রসলোক উন্মথিত হইতে থাকে। অন্তরে বাহিরে মহাকালের এই বিরাট নৃত্যচ্ছন্দে যোগ দিতে পারিলে জগতে ও জীবনে অখণ্ড লীলারস উপলব্ধির আনন্দে মন বন্ধনমুক্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটরাজ। ভূমিকা

নৃত্যের তালে তালে নটরাজ, ঘুচাও সকল বন্ধ হে।
সুপ্তি ভাঙাও, চিত্তে জাগাও মুক্ত সুরের ছন্দ হে॥
.....নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া,
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।
তোমার বিশ্ব-নাচের দোলায়
বাঁধন পরায়, বাঁধন খোলায়
যুগে যুগে কালে কালে, সুরে সুরে তালে তালে
অন্ত কে তার সন্ধান পায় ভাবিতে লাগায় ধন্দ হে॥
নমো নমো নমো
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটরাজ—নৃত্য

নত

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে।
সকল অহঙ্কার আমার ডুবাও চোখের জলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি

নত হই, ছোটো নাহি হই কোনোমতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নম্রতা (কণিকা)

যেখানে প্রেমের সম্বন্ধ সেইখানেই নত হওয়ায় গৌরব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজভক্তি (রাজাপ্রজা)

নতি

এমন যেন না হয় মতি
ভয়েতে কারে করিব নতি—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানী (কথা)

নতুন (দ্র. নূতন, নবীন)

এসো পৃথিবীতে হে নতুন,
আজ তোমার শুভ জন্মদিন।

বীরেন সাহা ঃ পিছিয়ে যাও, পিছিয়ে যাও

নতুনকে দেখতে হলে, মনকে একটু বিশেষ করে বাতি জ্বালাতে হয়। পুরোনোকে দেখতে হলে, ভালো করে চোখ মেলতেই হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপান-যাত্রী—১৩

আমরা নতুন চাইনে, আমরা চাই নবীনকে।.....মাধবী বছরে বছরে বাঁকা করে খোঁচা মেরে সাজ বদলায় না, অশোক পলাশ একই পুরাতন রঙে নিঃসঙ্কোচে বারে বারে রঙিন। চিরপুরাতনী ধরণী চিরপুরাতন নবীনের দিকে তাকিয়ে বলছে ‘লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল!’

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবীন

তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে-ক্ষণ
ও মোর ভালোবাসার ধন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী

নদী

নদীর বুকে সকাল বড় সুন্দর।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ তিতাস একটি নদীর নাম

নদীর একটা দার্শনিক রূপ আছে। নদী বহিয়া চলে ; কালও বহিয়া চলে। কালের বহার শেষ নাই। নদীরও বহার শেষ নাই। কতকাল ধরিয়া কাল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বহিয়াছে। তাঁর বুকে কত ঘটনা ঘটিয়াছে। কত মানুষ মরিয়াছে।.....আবার শত মরণকে উপেক্ষা করিয়া কত মানুষ জন্মিয়াছে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ তিতাস একটি নদীর নাম

এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে, এই ত নদীর খেলা।
(রে ভাই) এই ত বিধির খেলা॥
সকাল বেলা আমির রে ভাই ফকীর সন্ধ্যাবেলা॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ লোকগীতি

শেষ বসন্তের নদীর রূপ গৈরিকবসনা তপঃশীর্ণা বৈরাগিনীর মতো, বালুময় তীরে-তীরে তার পিঙ্গলজট রুদ্র সন্ন্যাসীর আনাগোনা ; তার পর একদিন সেই নদীর সর্বাঙ্গে নামে বর্ষা, আসে জোয়ারের বেগ, দুই কূল তার প্রাণের ঐশ্বর্যে আন্দোলিত হয়ে ওঠে। জীবনেও তাই।

প্রবোধকুমার সান্যাল ঃ মহাপ্রস্থানের পথে

বাতাস বহে বেগে,
লজ্জা ছেড়ে নাচে নদী
শূন্যে বাঁধনহীন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অনাহত (খেয়া)

ভরা চোখের মতো......নদী
করবে ছলছল,—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান শোনা (খেয়া)

নদী অজগর সম ফুলে
গিলে খেতে চায় দুই কূলে।
...... নদী রোগা হয়ে আসে

কাদা দেখা দেয় দুই পাশে।
বোরোয় ঘাটের সোপান যত
যেন বুকের হাড়ের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নদী

মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব,.....ভারকে কেবলই সে ভারি কোরে তোলে ; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে,......সে আপনার ভার লাঘব করেছে ব'লেই বিশ্বের ভার লাঘব করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী—সূচনা

ওগো নদী, আপন বেগে পাগল-পারা,
আমি স্তব্ধ চাঁপার তরু গন্ধভরে তন্দ্রাহারা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী

ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধো-জাগা নয়নের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—৪১

ধারে ধারে নদী
কলরবধারা দিয়ে নিঃশব্দেরে করিছে মিনতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসী (সানাই)

নদী লাবণ্যবতী—তার রূপে নারীর রূপের সংকেত। কিন্তু পর্বত পৌরুষদীপ্ত, প্রবল ব্যক্তিত্বে পরিপূর্ণ।.....দৃঢ় কিন্তু দিব্যকান্তি। জোর করে ভয় দেখায় না, ভয়ের উদ্রেক হয়, সম্ভ্রম জাগায়।

সমীর রক্ষিত ঃ পাহাড়, ডায়না এবং অপু

নন্দনতত্ত্ব

ইংরেজি 'এস্‌থেটিক্‌স' (Aesthetics)-এর বাংলা প্রতিশব্দ হল 'নন্দনতত্ত্ব'। 'এসথেটিক্‌স' শব্দটি এসেছে গ্রিক 'এইসথেটিকস্‌' ধাতু থেকে। মূল শব্দগত অর্থ 'দেখা', চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা। সৌন্দর্য বীক্ষণ এবং সৌন্দর্যের স্বরূপ নির্ণয় করাই নন্দনতাত্ত্বিক দর্শনের উদ্দেশ্য। শিল্প-সাহিত্য-সৌন্দর্যবোধ সম্পর্কিত এই শব্দটির অন্য নামও আছে—যেমন 'কলাতত্ত্ব' (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) এবং 'কান্তিবিদ্যা' (বিষ্ণু দে)। অতীতে প্লেটো আরিস্‌তোতল এবং হিউম প্রমুখ দার্শনিকরা সৌন্দর্যের বস্তুবাদী ও ভাববাদী ব্যাখ্যা করেছেন। আধুনিককালে শিল্প ও সত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয়ই নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্ররূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্যের শব্দার্থকোশ

নব

নব বসন্তের দানের ডালি,
এনেছি তোদেরই দ্বারে,
আয় আয় আয়
পরিবি গলার হারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চণ্ডালিকা

নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত লব শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাতীয় সঙ্গীত

নব আনন্দে জাগো আজি নবরবিকিরণে
শুভ্র সুন্দর প্রীতি-উজ্জ্বল নির্মল জীবনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত

তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে,
এসো গন্ধে বরনে গানে গানে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত

নববর্ষ

নববর্ষের দিন ছুটির দিন হিসাবে উদ্‌যাপনের কোনও প্রয়োজন আছে কি? যে সব দেশে কাজের দিনে কাজ হয়, তাহারা ছুটির মাধ্যমে বর্ষবরণ করুক। বাঙালিকে কাজ শিখিতে হইবে। নববর্ষ হউক কাজের দিন। যাহাকে সাধু বাংলায় বলে, শুভারম্ভ।

আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ সম্পাদকীয় ১৪.৪.১৪০৩

নবীন

নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। মহারাজা-বাহাদুর আকাশে যে জয়ধ্বজা ওড়ান, আজ সে নতুন, কাল সে পুরানো। কিন্তু সূর্যের রথে যে অরুণধ্বজা ওড়ে, কোটি কোটি যুগ ধরে প্রতিদিনই সে নবীন।.....নতুন আসে অকস্মাতের খোঁচা দিতে, নবীন আসে চিরদিনের আনন্দ দিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কবির অভিভাষণ—প্রেসিডেন্সী কলেজের
রবীন্দ্র-পরিষদ্—১৩৩৪

আজ নবীন মেঘের সুর লেগেছে আমার মনে।
আমার ভাবনা যত উতল হল অকারণে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা-২

নয়ন

নয়ন-ভরা জল গো তোমার আঁচল-ভরা ফুল।
ফুল নেবো, না অশ্রু নেবো ভেবে হই আকুল॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাব্য-গীতি

নয়নে আনিলে নূতন চেনার হাসি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৈশোরিকা (বীথিকা)

কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশকুসুম-চয়নে।
সব পথ এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দুখানি নয়নে—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য—

আমা-পানে চাহিয়ে তোমার
আঁখিতে কাঁপিত প্রাণখানি।
আনন্দে বিষাদে মেশা সেই নয়নের নেশা
তুমি তো জানো না তাহা—আমি তাহা জানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নারীর উক্তি (মানসী)

.....তোমার নয়ন দুটি কালো
আলোরে করিত আরো আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পোড়োবাড়ি (বীথিকা)

জনপদবধূ তড়িৎ-চকিত-নয়না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষামঙ্গল (কল্পনা)

নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায় না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত

অভয় আশ্বাস-ভরা নয়ন বিশাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

আমার নয়ন, তব নয়নের নিবিড় ছায়ায়
মনের কথার কুসুমকোরক খোঁজে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সন্ধান (মহুয়া)

আমি ধরা দিয়েছি গো আকাশের পাখি,
নয়নে দেখেছি তব নূতন আকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হৃদয় আকাশ (কড়ি ও কোমল)

নরনারী

কোনদিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনদিন,
গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত
আমাকে কেন জাগাতে চাও?

জীবনানন্দ দাশ ঃ অন্ধকার (বনলতা সেন)

শক্তির দুটো অংশ আছে—এক অংশ ব্যক্ত, আর-এক অংশ অব্যক্ত ; এক অংশ উদ্যোগ, আর-এক অংশ বিশ্রাম ; এক অংশ প্রয়োগ, আর-এক অংশ সম্বরণ। শক্তির এই সামঞ্জস্য যদি নষ্ট কর তা হলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু সে ক্ষোভ মঙ্গলকর নয়। নরনারী সমাজশক্তির দুই দিক ; পুরুষই ব্যক্ত, কিন্তু ব্যক্ত বলেই যে মস্ত তা নয় ; নারী অব্যক্ত, এই অব্যক্ত শক্তিকে যদি কেবলই ব্যক্ত করবার চেষ্টা করা হয় তা হলে সমস্ত মূলধন খরচ করে ফেলে সমাজকে দ্রুতবেগে দেউলে করবার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা—১৭

নর কহে, 'বীর মোরা যাহা ইচ্ছা করি'।
নারী কহে জিহ্বা কাটি, 'শুনে লাজে মরি'।
'পদে পদে বাধা তব' কহে তারে নর।
কবি কহে, 'তাই নারী হয়েছে সুন্দর'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৌন্দর্যের সংযম (কণিকা)

নরক

অন্ধকারে চৌরাশীটা নরকের কুণ্ড।
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড॥

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ (লঙ্কাকাণ্ড)

কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক?
কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক—
মানুষেতে সুরাসুর।

ফজলুল করিম ঃ স্বর্গ ও নরক

নরকেও সুন্দর আছে, কিন্তু সুন্দরকে কেউ সেখানে বুঝতেই পারে না, নরকবাসীর সবচেয়ে বড়ো সাজা তাই!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

নশ্বর

মানুষ নশ্বর পদার্থ, সোনা তার চেয়ে বেশি দিন টেঁকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা—৬৩

নষ্ট

কেউ কাউকে নষ্ট করতে পারে না কখনো। নিজে ছাড়া নিজেকে নষ্ট করার সাধ্য আর কারো নেই।

চিত্তরঞ্জন মাইতি ঃ কিন্নরী

কিছু না করিয়া যে সময় নষ্ট তাহার চেয়ে অনেক বেশি লোকসান করি কিছু করিয়া যে সময়টা নষ্ট করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি

কাজ না করিয়া অনেকে সময় নষ্ট করে সন্দেহ নাই, কিন্তু কাজ করিয়া যাহারা সময় নষ্ট করে তাহারা কাজও নষ্ট করে, সময়ও নষ্ট করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিচিত্র প্রবন্ধ—পনেরো-আনা

নষ্ট হল দিনের পর দিন,
অনেক শিখে পক্ক হল মাথা,
অনেক দেখে দৃষ্টি হল ক্ষীণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মাতাল (ক্ষণিকা)

বড়ো বড়ো রুল-কাটা কাগজ
নষ্ট বাবা করেন না কি রোজ?
আমি যদি নৌকো করতে চাই
অম্‌নি বল, 'নষ্ট করতে নাই'।
সাদা কাগজ কালো
করলে বুঝি ভালো?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিশু—সমালোচক

নাক

বাজিল কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাঁখ।
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নাসিকার ডাক॥
শাঁখ নাক গর্জনে গভীর মহাশব্দ।
শঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে থাকে স্তব্ধ॥

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ

তোমার বিজ্ঞাপন তোমার নাকের উপর। বিশ্বকর্মার হাতে এ নাক দুবার তৈরী হতে পারে না—ছাঁচ তিনি মনের ক্ষোভে ভেঙে ফেলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তির উপায়—তৃতীয় দৃশ্য

যেমন উঁচু তেমনি চওড়া নাকটা,
সমস্ত মুখের সে বারো-আনি অংশীদার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সহযাত্রী (পুনশ্চ)

আমার খুড়ামশাই একবার জন-দুই মাড়োয়ারী রমণীর নামে নালিশ করিতে গিয়াছিলেন, তাহারা রেলগাড়ীতে না-কি খুড়ার নাক-কান প্রবল পরাক্রমে মলিয়া দিয়াছিল।

শুনিয়া খুড়িমা আমার দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, আচ্ছা আমাদের বাঙালীর ঘরে ঘরে যদি ওর চলন থাকত!

শরৎচন্দ্র ঃ শ্রীকান্ত ৩য়

নাগরিক

নাগরিক ঐশ্বর্যের তাপে সৌরশক্তি ম্লান মনে হয়।

অদীপ ঘোষ ঃ শূন্য কম শক্তিশালী নয় (অলৌকিক চুম্বকের টান)

প্রখর নাগরিক, চাঁচা মাজা ঝকঝকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১৪

নাগরী

চার্চ-চূড়া-মুকুটিত সাদা ধবধবে নগরীটি একটি পরিপাটী তন্বী নাগরীর মতো কোলের কাছে সমুদ্র-দর্পণ রেখে নিজের মুখ দেখে হাসছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ য়ুরোপযাত্রীর ডায়ারি

নাচ

রক্ত নাচে ত্রাসের উতরোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রচ্ছন্না (মহুয়া)

দেখলাম নাচ যেন মঞ্জরিত শালতরুশ্রেণীতে
বসন্তবাতাসের মত্ততা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শাপমোচন (পুনশ্চ)

আমি আধুনিক বটে, কিন্তু নাচ সম্বন্ধে......প্রাচীনপন্থী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্রাবণগাথা

আলোর নাচ নাচায় চাঁদ সাগরজলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাগরিকা (মহুয়া)

নাটক

আজকের নাটকের সবচেয়ে বড় ভয় এখানে, নাটক সাহিত্যশিল্পের অধীন না হয়ে মঞ্চশিল্পের অধীন হয়ে পড়েছে। তাই অভিনয়ের ক্ষেত্রে তা যতখানি সার্থক হয়ে উঠেছে, চিরন্তন রস আস্বাদনের ক্ষেত্রে ততখানি সফল হতে পারছে না। আজকের নাটক শুধুমাত্র অভিনেয়, পাঠ্য নয়।

অজিতকুমার ঘোষ ঃ আধুনিক নাটক ও নাট্যমঞ্চ

নাটক যখন সাহিত্যপদবাচ্য হয় তখন তা মঞ্চোপযোগীও হয়।

উৎপল দত্ত ঃ চায়ের ধোঁয়া

বর্তমানকে লঙ্ঘন করে চিরন্তনকে ধরা যায় না—অন্তত নাটকে না। বর্তমানের হয়েই সর্বকালের হতে হবে।

উৎপল দত্ত ঃ চায়ের ধোঁয়া

মানুষ সমাজবদ্ধ—আর এই সমাজবদ্ধ জীবনের অনুকরণেই রচিত হয় নাটক। তাই নাট্যশাস্ত্রকার ভরতমুনি নাটককে 'লোকবৃত্তানুকরণম' বলে অভিহিত করেছেন।

দীপকচন্দ্র পোদ্দার ঃ বাংলা থিয়েটারে সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটক

নাটকের শিল্প-সৌকর্য যতই থাক, তার সামাজিক মূল্য বিশেষ আছে কিনা সেটাই বিচার্য বিষয়।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভূমিকা (শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রবন্ধ)

নাটক মঞ্চে যত জনপ্রিয়ই হোক না কেন, সেগুলির আসল জীবনীশক্তি নিহিত থাকে সাহিত্য কর্মের মধ্যে।.....অতুলনীয় জীবনাশ্রয়ী কাব্যরস না থাকলে শেকসপীয়রের

নাট্যরাজি ইতিহাসের বস্তু হয়ে থাকতো আর সাহিত্য মূল্য না থাকলে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী' হয়তো পোকায় কাটতো। সুতরাং দেখা যায়, মঞ্চরূপের ওপর নাটকের সাফল্য নির্ভর করলেও তার চরম সার্থকতা নির্ভর করে না। যা করে তার সাহিত্যমূল্যের ওপর।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নাটকের সাহিত্যমূল্য

আজকাল দেখছি পরিচালকের যুগ। পরিচালকই যেন মুখ্য। নাটক গৌণ। নাটককে গৌণ করেই নাটকের এই দুর্গতি।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বর্তমান বাংলা থিয়েটারে প্রগতির বিচার

নাটক অন্যান্য সব সাহিত্য কর্মের চেয়ে দুরূহ। সাহিত্যের এই শাখাটি অন্য লেখার চেয়ে বাড়তি কিছু যোগ্যতা দাবী করে। শাস্ত্রকারেরা বলেন সব creative art এর পরাকাষ্ঠা হল নাটক। দৃশ্য, শ্রুতি, আলো, ধ্বনি, আকার, গতি ও আয়তন—সব ক'টি শিল্প মাধ্যম সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয় সার্থক নাট্যকারকে। অর্থাৎ নাটক সর্বতোমুখী প্রতিভা দাবী করে।

নিরূপ মিত্র ঃ বাংলা ভাষায় মৌলিক নাটকের অভাব কেন?

আমরা ভালো নাটক অভিনয় করতে চাই, যে নাটকে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞানের প্রকাশ ও মহত্তর জীবনগঠনের প্রয়াস আছে।

বহুরূপী ঃ প্রচারপত্র

আন্তর্জাতিক ও জাতীয় প্রেক্ষাপটে এবং সমকালের আলোকে প্রত্যেক দেশে নাটক যেমন জরুরী, তেমনি শাশ্বতের দরবারে নাট্য-শিল্প গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের চিন্তায়, মননে ও কর্মোদ্যগে এই শিল্পের ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকরী। ইতিহাসের নানা বাঁকে নাটকের কাছ থেকে মানুষ পেয়েছে প্রেরণা, দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার। আজ নতুন শতাব্দীর সূচনায় দাঁড়িয়ে বিশ্ব-নাট্য আমাদের নতুন দিশা দেবে, এ ভরসা রাখি।.....আমাদের থিয়েটার যেমন বিশ্ব-থিয়েটারের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করবে, তেমনি দেশ কাল ও পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থাকবে—তাই আমরা চাইব।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ঃ বিশ্বনাট্যদিবস

ইহজীবনের জরুরী সমস্যা আমাদের নাটক যেমন তুলে ধরেছে, এমন আর কেউ ধরেনি। উৎপীড়ন অনাচার অবিচার ভণ্ডামি..... চারপাশের যতো শয়তানীর মুখোশ ছিঁড়েছে আমাদের নাটক, অক্লান্তভাবে নির্মমভাবে এবং ব্যতিক্রমহীন ভাবে। আমাদের নাটকের অন্য নাম প্রতিবাদ, আক্রমণ। সাহিত্যের অন্য শাখার মতো সে মাঝে মাঝেও এই কর্তব্য ভুলে ছুটির বাতাসে আন্দোলিত হয়নি, বিগত চল্লিশ বছরের মধ্যে হয়নি। প্রতিবেশী সিনেমার মতো সে কখনো বিলাসী হয়নি, আপোষী হয়নি।

মনোজ মিত্র ঃ অলীক সুনাট্য রঙ্গে

মানুষকে নিয়ে সাহিত্য, সেই মানুষই নাটক থেকে হারিয়ে গেছে। আলোছায়ায় ঘেরা গভীর গোপন মানুষ, অন্তর্লোকের বাসিন্দা মানুষ আমাদের ছেড়ে গেছে। আছে শুধু রূপহীন নিরাকার বক্তব্যের আদিম বস্তুপিণ্ড। চরিত্র নামক কয়েকটা মাউথপীসের মুখে সেই পিণ্ড ভাগ করে দিয়েই নাট্যকাররা কাজ সারতে পারেন। নাটক লেখার সহজ সরল একটা ছক তৈরী হয়েছে, কিছু উত্তাপ আর কিছু অভিশাপ দিয়ে বোনা এক হাততালি দেওয়া ছক।

মনোজ মিত্র ঃ অলীক সুনাট্য রঙ্গে

আমরা অনেক বাঁকাচোরা, জটিল কুয়াশাময়, বিদেশী অনুকৃতির ধন্দ পার হয়ে আজ হয়ত বুঝতে পারছি নাটককে সোজাসুজি মানুষের হৃদয়ের কাছে যেতে হবে।

মমতাজউদ্দীন আহমেদ ঃ ওভারল্যান্ড ২৯.৫.৯২

নাটক দেখতে যারা আসে, পশ্চিম মহাদেশে তাদের বলে অডিয়েন্স্ অর্থাৎ শ্রোতা। কিন্তু ভারতবর্ষে নাটককে বলেছে দৃশ্যকাব্য অর্থাৎ তাতে কাব্যকে আশ্রয় করে চোখে দেখার রস দেবার জন্যেই অভিনয়। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাভা-যাত্রীর পত্র—১১**

শকুন্তলা নাটকে কবির নির্দেশবাক্য—রথবেগং নাটয়তি। বোঝা যাচ্ছে, রথবেগটা নাচের দ্বারাই প্রকাশ হত, রথের দ্বারা নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাভা-যাত্রীর পত্র—১৪

স্ত্রৈণ স্বামী যেমন লোকের কাছে উপহাস পায়, নাটক তেমনি যদি অভিনয়ের অপেক্ষা করিয়া আপনাকে নানা দিকে খর্ব করে, তবে সেও সেইরূপ উপহাসের যোগ্য হইয়া উঠে। নাটকের ভাবখানা এইরূপ হওয়া উচিত যে, 'আমার যদি অভিনয় হয় তো হউক, না হয় তো অভিনয়ের পোড়াকপাল—আমার কোনোই ক্ষতি নাই।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রঙ্গমঞ্চ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

নাটক তো অভিনয়ের জন্যেই লেখা একটা বিশিষ্ট শৈলী। ঠিক যেমন চলচ্চিত্রের জন্য যে সিনারিও বা শ্যুটিং স্ক্রিপ্ট লেখা হয় সেগুলো যেমন স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তারা সম্পূর্ণতা পায় চলচ্চিত্রে গৃহীত হবার পর। নাটকও তেমনি মঞ্চাভিনয়ের উদ্দেশ্যেই লেখা।

শম্ভু মিত্র : কাকে বলে নাট্যকলা

থিয়েটারে প্রযোজনার ভিত্তি হল নাটক যার মাধ্যমে থিয়েটার নিজেকে প্রকাশ করে। নাটকই থিয়েটারের শিল্পগত ক্ষমতা, মতাদর্শ, ভিত্তি নির্দিষ্ট করে। একই সঙ্গে নাটক, থিয়েটারের শিল্পগত মাত্রা আয়ত্ত করে।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় : থিয়েটার ও জাতীয়তাবোধ (শূদ্রক ১৩৯৪)

গান যেমন গায়কের অপেক্ষা করে, নাটকও তেমনি অভিনয়ের অপেক্ষা করে। রঙ্গমঞ্চের বাইরে নাটক আধখানা মাত্র। অথবা তাও নয়, একটা কাঠামো এবং কিছু সঙ্কেত। নাট্যশিল্প সম্পূর্ণ হয় নাট্যকারের সৃষ্টি আর অভিনেতৃবর্গের সৃষ্টি—এই দুই সৃষ্টির মিলনে। নাট্যরচনায় যার প্রথম ধাপ, অভিনয়ে তার সম্পূর্ণতা বিধান।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় : ট্র্যাজেডি পেরিয়ে

নাটক অতীত হবে না। পায়ে পায়ে চলা যার তার সাময়িক বিশ্রামকে কেউ থেমে যাওয়া বলে ভুল করতে পারেন। যদিও আর কারও আর কোথাও চলাটা রয়েই যায়। কেননা আজ প্রসেনিয়ামের নাভিশ্বাস উঠলেও পথনাটকের চলা নতুন নতুন করে উদ্ভাবিত হয়ে উঠছে। সে তো থিয়েটারেরই পথ চলা।

সলিল সরকার : থিয়েটারের কলকাতা

বাংলা নাটক আজ বড়ো বেশি খর্বকায় মানুষের খবরদারি করার আখড়া।

সলিল সরকার : থিয়েটারের কলকাতা

নাটমঞ্চ

আধুনিক য়ুরোপীয় নাট্যমঞ্চের প্রসাধনে দৃশ্যপট একটা উপদ্রবরূপে প্রবেশ করেছে। ওটা ছেলেমানুষি। লোকের চোখ ভোলাবার চেষ্টা।........এবং অনেক স্থলে স্পর্ধা।......নাট্যকাব্য দর্শকের কল্পনার উপরে দাবি রাখে, চিত্র সেই দাবিকে খাটো করে, তাতে ক্ষতি হয় দর্শকেরই। অভিনয় ব্যাপারটা বেগবান, প্রাণবান, গতিশীল ; দৃশ্যপটটা তার বিপরীত......দর্শকের চিত্তদৃষ্টিকে নিশ্চল বেড়া দিয়ে সে একান্ত সংকীর্ণ করে রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তপতী (ভূমিকা)

নাটক ও নাট্যশালা

রাজনীতি এবং সমাজনীতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে আমাদের সমাজজীবন এবং এই

সমাজজীবনকে কখনই অবহেলা করতে পারে না আমাদের নাটক বা নাট্যশালা। জাতীয় এবং সমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও স্বপ্ন যদি নাটক ও নাট্যশালায় প্রতিফলিত না হয়, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা লক্ষ্যভ্রষ্ট। নাটক ও নাট্যশালা জ্ঞানাঞ্জন শলাকারূপে জাতির চেতন ও অবচেতন মনে অধঃপতনের দুষ্ট ক্ষতগুলি সম্পর্কে চৈতন্য সঞ্চার করে জাতিকে যদি সঙ্কট উত্তরণের মন্ত্রে উদ্দীপ্ত না করে, তবে সে নাটক ও নাট্যশালা ভ্রষ্ট।

মন্মথ রায় : সারা বাংলা নাট্য সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ (প্রয়াগ ১৯৮৭)

জাতির পরিচয় তার রঙ্গমঞ্চে ; সুতরাং জগতে বড় জাতি বলে পরিচিত হতে হলে উন্নত নাট্যশালার প্রয়োজন।.....নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্যগীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস—নাট্যে সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মুকুটমণি নাট্য। অভিনয় ব্যতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী : নাট্যশালা প্রসঙ্গে

নাট্য

অ্যারিস্তোফেনিস যেমন বলেছিলেন 'হে কোরাস দল তোমাদের উচিত হ'ল তোমাদের জ্ঞানমতো রাষ্ট্রকে সৎ পরামর্শ দেওয়া' ; তেমনই আমরা বলব, 'হে বিশ্ব নাট্য নেতৃত্ব-বৃন্দ, আপনাদের মহৎ ও সৎ সৃজন দ্বারা বিশ্বরাষ্ট্রের প্রভুদের মানবীয় সভ্যতার কল্যাণে ব্রতী হতে বলুন'।

নৃপেন্দ্র সাহা : ভাষণ, ২৯তম বিশ্বনাট্য কংগ্রেস

নাট্যে মঞ্চসজ্জা, রঙ্গবস্তু ও পাত্রপাত্রী এবং মঞ্চ-পরিসরের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তার টানাপোড়েন বুঝে নেয়াটা খুবই জরুরী। নাট্যে যে রঙ ব্যবহৃত হয় তা প্রেক্ষাপটের-মঞ্চসজ্জার-পোষাকের-রঙ্গবস্তুর এবং আলোর। যে রেখা ব্যবহৃত হয় তা মঞ্চসজ্জার-রঙ্গবস্তুর এবং অভিনেতা অভিনেত্রীদের শরীরের রেখা। চিত্রপটের চিত্রের মতো স্থাণু নয়, সদা পরিবর্তনশীল চলন্ত সেই ছবির স্তরে ক্রম-উন্মোচিত হতে থাকে কাহিনী, নাট্যে গল্প তাই দৃশ্য হয়ে ওঠে। দৃশ্য নাট্যের এক অতি জরুরী এবং আবশ্যিক যোগান। সংস্কৃত নাটককে তাই 'দৃশ্যকাব্য' বলা হতো। ইংরেজীতে 'থিয়েটার' শব্দটি এসেছে যে গ্রীক শব্দ 'থিয়েট্রন' থেকে তার মূলে আছে যে ক্রিয়াপদ 'থিয়াওমেই' তার অর্থ হলো 'দেখা', আর 'থিয়া' মানে হল 'স্পেকটাকল'—যা দর্শনীয়।

সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় : নাট্যের ভাষা (স্যাস ১৯৮৯)

নাট্যকার

নাট্যকারদের একদিকে সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীদ্বন্দ্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হতে হবে, অন্যদিকে সামাজিক সমস্যার প্রতিটি সমস্যাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে বিশ্লেষণ করে উদ্ভাসিত করতে হবে সত্যের আলোকে। জনগণের চিন্তা-ভাবনা অনুভব ইচ্ছার উত্তরণ ঘটানো নাট্যকারের দায়িত্ব।

অচিন্ত্য কুমার বসু : দুই বিশ্বযুদ্ধ ও বাংলা থিয়েটার

ভালো নাট্যকার মাত্রেই জনপ্রিয় নাট্যকার।

উৎপল দত্ত : চায়ের ধোঁয়া

নাটক আর অভিনয় দুই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। অভিনেতার কারবার তো নাটক নিয়ে। তিনি যে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছেন তা তো নাটকেরই সত্য। নাটকের মধ্যেই সেই সত্য নিহিত।.....নাট্যকারের ওপর আস্থা না থাকলে কোনও অভিনেতার পক্ষেই সম্ভব নয় নাটককে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

অহীন্দ্র চৌধুরী : অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকার (দৃশ্যকাব্য ১৯৬৫)

নাটকের মূল আদর্শ হবে মানুষের কল্যাণ। যাতে মানুষের কল্যাণ হয় সেই চেষ্টাতেই আত্মনিয়োগ করবেন নাট্যকার। এই আদর্শবোধই হবে তাঁর অন্তঃপ্রেরণা।....(নাট্যকার, অভিনেতা আর পরিচালকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা) নিঃসন্দেহে নাট্যকারের। নাট্যকার যা লেখেন তার ওপরই তো নির্ভর করে চলতে হয় পরিচালক এবং অভিনেতাকে। নাট্যকারের ভাবনাও বক্তব্যকে পরিচালক সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করবেন। নাট্যকারের সৃষ্টির ওপর আস্থা রাখতে হবেই।

অহীন্দ্র চৌধুরী : অভিনেতা-পরিচালক-নাট্যকার (দৃশ্যকাব্য ১৯৬৫)

নাট্যকাররা মানুষের জীবনকাব্য রচয়িতা। মানুষের জীবনই তাঁদের সৃষ্টির উপাদান। কোনো রাষ্ট্রীয় বিধান যদি অগণিত মানুষের দুঃখের কারণ বা অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় তবে নাট্যকারগণ স্বাভাবিক ভাবেই মানুষের কল্যাণের জন্য সেই অকল্যাণকর রাষ্ট্রীয় বিধানের বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে পারেন না। কারণ তখন সেটা শুধু তাঁদের নিজেদের কথাই নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের সঙ্গে তা মিলিত কণ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি।

নিজের যুগের মধ্যে থেকেও যিনি অতীত ও ভবিষ্যৎকে বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন তিনি শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। যে অতীতের পরিণতি বর্তমান এবং বর্তমানের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ নিহিত তার সূত্রটি ধরাই নাট্যকারের সাধনা। বৈজ্ঞানিকের বিশ্লেষণশক্তি ও দার্শনিকের সত্যোপলব্ধি সমন্বিত হয় যে নাট্যকারের চিন্তাধারায় তিনিই মহান নাট্যকার। ত্রিকালমানস রূপ পরিগ্রহ করে তাঁর নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে। তিনি সৃষ্টি করে যান কালোত্তীর্ণ নাটক।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : সর্বহারার মানবতা

নাট্যক্রিয়া

নাট্যক্রিয়া এক শিল্পকর্ম যা মানুষকে উন্নীত করে। সমাজকে সচেতন করে, চিন্তাশীল করে!

শাঁওলী মিত্র : ত্রস্ত সময় ধ্বস্ত সংস্কৃতি

নাট্য....রূপকার

নাটক কেমন করে নাট্য হয়ে ওঠে সে যেন এক আশ্চর্য কাহিনী।.....গল্প বা উপন্যাস বা কবিতার মত নাটকও তো সাহিত্যেরই অঙ্গ। নাট্যকার, যিনি নাটক লেখেন, তিনি সেই ভাষার জাদু দিয়ে নাটকটা গড়েন। আর যিনি 'নাট্য' গড়ে তোলেন ঐ নাটক থেকে? তিনি তো আর এক রূপকার। তিনি কেবলই ছবি দেখেন। ত্রিমাত্রিক, চতুর্মাত্রিক। তিনি রঙ দেখেন। তিনি চরিত্রগুলোকে দাঁড় করিয়ে, বসিয়ে ছবি রচনা করেন। তিনি 'আলোর—হ্যাঁ, কখনো কেবল 'আলো'রই ব্যবহারে নাটকীয় মূর্তি রচনা করেন! মঞ্চের রঙ, আলোর রঙ, তাঁর কল্পনাকে মূর্ত করে তোলে। তিনি সংলাপের ধ্বনি শুনতে পান। তিনি সংলাপ বলার সুর দিয়ে, বাচনভঙ্গী দিয়ে শব্দনকশা তৈরী করেন। কখনো বা তিনি কেবল নৈঃশব্দ্য দিয়ে তাপিত করে তোলেন মঞ্চের বাতাস। কখনো মঞ্চে বাস্তবতা তৈরী করা হয়। কখনো বা কেবল আভাস দিয়েই আনা যায় বাঞ্ছিত ফল। কখনো আভাসও নয়, কিছুই থাকে না মঞ্চে—এই প্রত্যেকটি দিকেরই কোনো অর্থ তো আছে! কিছু না কিছু তো প্রকাশ করছে এই দিকগুলো!

শাঁওলী মিত্র : এক শিশিক্ষুর অনুসন্ধান (স্যাস ১৯৯৩)

নাট্যনির্দেশক

নির্দেশকের ভূমিকা বা গুরুত্ব ঠিক কোথায়? এই প্রসঙ্গে Tovstonogov লিখেছেন : নির্দেশক ছাড়া থিয়েটার হয় না। নাট্যে, সৃষ্টির পথটা তৈরী করেন নির্দেশক। প্রতিটি

দিকই তার ওপর নির্ভরশীল। এর কোনো ব্যতিক্রম বা বিকল্প নেই। একটি প্রযোজনার মূল এবং সামগ্রিক দায় বর্তায় নির্দেশকের ওপর......নির্দেশককে যথার্থ অর্থেই শিক্ষিত এবং নানা বিষয়ে পারদর্শী জ্ঞানী হতে হবে। নাট্যে ব্যবহৃত হতে পারে এমন প্রতিটি শিল্প মাধ্যম সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন [সংশ্লিষ্ট কলা-বিশারদকে সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত করার জন্যই প্রযোজনা]—এমনকি প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক ব্যাপারে তার দক্ষতা থাকাটা নাট্যের স্বার্থেই জরুরি।

অরুণ মুখোপাধ্যায় ঃ নির্দেশনা ঃ অভিনয় ঃ নাট্যকলা ঃ অভিনেতা ঃ নির্দেশক (স্যাস-১৯৯৫)

নির্দেশকের কাজ হচ্ছে কারও ভাল অভিনয়টাকে ভেতর থেকে বার করে আনা।

শম্ভু মিত্র ঃ কাকে বলে নাট্যকলা

নাড়া

শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিচয়—শরৎ

নাড়ী

নগরের নাড়ী
উঠে স্ফীত তপ্ত হয়ে, নাচে সে আছাড়ি
পাষাণভিত্তির 'পরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—২২

নাম

স্বনামো পুরুষোধন্য, পিতৃনামে চ মধ্যম, শ্বশুরের নামে অধম, শালার নামে অধমাধম।

দীনবন্ধু মিত্র ঃ সধবার একাদশী

আমাদের এই গ্রামের নামটি খঞ্জনা,
আমাদের এই নদীর নামটি অঞ্জনা,
আমার নাম তো জানে গাঁয়ের পাঁচজনে—
আমাদের সেই তাহার নামটি রঞ্জনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ এক গাঁয়ে (ক্ষণিকা)

নাম আছে..........
বেশ একটু চওড়াগোছের নাম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ক্যামেলিয়া (পুনশ্চ)

মল্লিকা আজি কাননে কত,
সৌরভে ভরা তোমারি নামের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লিখন তোমার হয়েছে আজ—গীতবিতান

নামটা যেদিন ঘুচাবে, নাথ,
বাঁচব সেদিন মুক্ত হয়ে—
আপনগড়া স্বপন হতে
তোমার মধ্যে জনম লয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—১৪৪

আমারি নাম সকল গায়ে লিখা,
হয় নি পরা তব নামের টিকা,
তাই তো আমায় দ্বার ছাড়ে না দ্বারী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতালি (সংযোজন)—১১

প্রাচীন কালের বড়ো বড়ো নাম শুনিতে নিতান্ত মধুর নয়—যুধিষ্ঠির, রামচন্দ্র, ভীষ্ম, দ্রোণ, ভরদ্বাজ, শাণ্ডিল্য, জন্মেজয়, বৈশম্পায়ন ইত্যাদি। কিন্তু ওই সকল নাম অক্ষয়-বটের মতো আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের হৃদয়ে সহস্র শিকড়ে বিরাজ করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিঠিপত্র—১

ডাকলে তারে 'পুঁটলি' বলে
সাড়া দিত মরজি হলে,
ঝগড়াদিনের নাম ছিল তার স্বর্ণনলিনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঝাঁকড়া চুল (বিচিত্রিতা)

ভক্ত ১০১ নামে দেবতাকে ডাকে সে শুধু বিরহের আকাশকে পরিপূর্ণ করবার জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভূমিকা—নীলমণিলতা (বনবাণী)

মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক,
আমি তোমাদেরই লোক
আর কিছু নয়,
এই হোক শেষ পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিচয় (সেঁজুতি)

ভালোবেসে সখী, নিভৃতে যতনে
আমার নামটি লিখিয়ো—তোমার
মনের মন্দিরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

নামের পূজার অর্ঘ্য,
ভাবীকালের খ্যাতি,
সে তো প্রেতের অন্ন ;
ভোগশক্তিহীন নিরর্থকের কাছে উৎসর্গ-করা।
তার পিছনে ছুটে
সদ্য-বর্তমানের অন্নপূর্ণার
পরিবেশন এড়িয়ে যেয়ো না, মোহান্ধ!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক—আট

আজকে দিনের নাম
খাটবে না কালকের দিনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক—৪৫

নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৭

প্রিয়সখীর নামগুলি সব
ছন্দ ভরি করিত রব,
রেবার কূলে কলহংসের
কলধ্বনির মতো।
কোনো নামটি মন্দালিকা,
কোনো নামটি চিত্রলিখা,
মঞ্জুলিকা মঞ্জরিণী
ঝংকারিত কত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সেকাল (ক্ষণিকা)

আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—১৮

নামকরণ

মা যখন যেখানে, সেই স্থানের নামেই যে তাঁর নামকরণ। ঘটে বসলে ঘটেশ্বরী, বটগাছের নিচে বটেশ্বরী,.....থানায় বসলে থানেশ্বরী।

মনোজ মিত্র ঃ কুহুযামিনী

সন্তানের নামকরণকালে পিতামাতার মূঢ়তায় বিধাতাপুরুষ অন্তরীক্ষে থাকিয়া অধিকাংশ সময়ে শুধু হাস্য করিয়াই ক্ষান্ত হন না, তীব্র প্রতিবাদ করেন। তাই তাহাদের সমস্ত জীবনটা তাহাদের নিজেদের নামগুলোকেই আমরণ ভ্যাঙচাইয়া চলিতে থাকে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ অভাগীর স্বর্গ

একজনের মাথার ব্যারাম ছিল, সে সব জিনিষের নামকরণ করত। তার জুতোর নাম ছিল অবিমৃষ্যকরিতা, তার ছাতার নাম ছিল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, তার গাড়ুর নাম ছিল পরমকল্যাণবরেষু—কিন্তু যেই তার বাড়ির নাম দিয়েছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমনি ভূমিকম্প হয়ে বাড়িটাড়ি সব পড়ে গিয়েছে।

সুকুমার রায় ঃ হযবরল

যে-মানুষ নামজাদা তার নাম চাপা দিয়েই তাকে মারতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া
হিয়ায় দেবে হিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তাসের দেশ—২য় দৃশ্য

আমাদের........খাওয়া নামমাত্র, কাপড় পরাও তাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র

নামকীর্তন/নামসঙ্কীর্তন

নামকীর্তনে স্থান পবিত্র হয়, যে করে সে ত পবিত্র হয়ই, যে শোনে সেও পবিত্র হয়।

আনন্দময়ী মা ঃ পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা (গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী)

কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব জগৎ নিস্তার॥
হর্ষে প্রভু কহেন শুন স্বরূপ রামরায়।
নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়॥
নামসংকীর্ত্তন হৈতে পাপ সংসার নাশন।
চিত্তশুদ্ধি সর্বভক্তি সাধন উদগম॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এইমাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

ধর্মহীন মানুষ পশুর সমান। যাহার ধর্ম নাই, যে দুর্নীতিপরায়ণ, লোভী, পরশ্রীকাতর, ব্যভিচারী, অর্থলোলুপতায় হিতাহিত জ্ঞানশূন্য সে তো নরপিশাচ। ধর্মকে ছাড়িয়ে

মানুষ বাঁচিবে কিরূপে; সমাজ বাঁচিবে কিরূপে, জাতি বাঁচিবে কিরূপে। তাই মহাপ্রভু কলির যুগধর্ম সর্ব্বোত্তম লোকধর্ম নামসংকীর্তনের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। যোগ অভ্যাস করিতে হইবে না, নির্জনে গিয়া তপস্যা করিতে হইবে না, যজ্ঞ করিতে হইবে না, অকপটে নাম কর, তোমার সর্বসিদ্ধি করতলগত হইবে। এই নামের স্মিত জ্যোৎস্না তোমার চিত্তদর্পণকে পরিমার্জিত করিবে।

হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : বাঙ্গালার কীর্তন ও কীর্তনিয়া

নারী

কেউ দেয় না। বানিয়ে নিতে হয়
মনের মতো নারী।

অরুণকুমার সরকার : সৃষ্টি

নারীকে খাঁচায় বন্ধ করে রাখাটা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। সে খাঁচা সোনারই হোক আর লোহারই হোক। পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজলে কোথাও কি পাওয়া যাবে, নারীকে খাঁচায় রেখে সে জাতি উন্নতি করেছে?

আফরোজা খাতুন : মুসলমান মেয়ে হওয়ার সমস্যা (প্রতিক্ষণ, মার্চ ১৯৮৯)

সাম্যের গান গাই—
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।
এ বিশ্বে যত ফুটিয়াছে ফুল, ফলিয়াছে যত ফল,
নারী দিল তাহে রূপ-রস-মধু-গন্ধ সুনির্মল।
তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখিয়াছ তার প্রাণ?
অন্তরে তার মোমতাজ্ নারী, বাহিরেতে শা-জাহান।

কাজী নজরুল ইসলাম : সাম্যবাদী

তবুও তোমায় জেনেছি নারী, ইতিহাসের শেষে এসে, মানবপ্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে।
মানবকে নয় নারী, শুধু তোমাকে ভালবেসে
বুঝেছি নিখিল বিশ্ব কীরকম মধুর হতে পারে।

জীবনানন্দ দাশ : তোমাকে (বেলা অবেলা কালবেলা)

যে-নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো
কবে যেন—আজকে হারিয়ে গেছে সব।

জীবনানন্দ দাশ : দুদিকে ছড়িয়ে আছে

নারী। জলের মত চঞ্চল, তাই জল ভালবাসে।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : ম্যাজিক

ভূমি আর নারী এই নিয়েই যত অনর্থ ঘটে পৃথিবীতে। ভূমির চেয়েও বোধ হয় নারীর হাট বেশী বিস্তৃত। বাপ বিক্রি করে কন্যাকে, মা বিক্রি করে কন্যাকে, স্বামী বিক্রি করে স্ত্রীকে, ভাই বিক্রি করে বোনকে ; নারী নিজে বিক্রি করে নিজেকে। পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ মহাভারতের শ্রেষ্ঠ ধার্মিক এবং মহৎ জন যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পাশায় জুয়াখেলায় পণ রেখে হেরেছিলেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : ফরিয়াদ

যদি নারী না করিতে বিধি,
তোমা হেন গুণনিধি
চিড়িয়াখানায় দিতাম রেখে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : বিরহ

লজ্জার সঙ্গে নারীকে ঘৃণাও রাখতে হয়, শ্রীমা বলেছেন। সাধারণ অর্থে 'ঘৃণা' বলতে আমরা যা বুঝি সেই ঘৃণার কথা এখানে বলা হচ্ছে না। এই ঘৃণার মধ্যে নিহিত আছে বীরত্বের ভাব.....এই 'ঘৃণা' হলো যা আমার আদর্শ-বিরুদ্ধ, যা আমার ঐতিহ্য-বিরুদ্ধ, যা আমার ধর্ম-বিরুদ্ধ, তার প্রতি সুতীব্র উপেক্ষা বা বিরূপতার ভাব। শ্রীমা যখন ঘৃণাকে রাখতে বলছেন তখন এই 'ঘৃণা'র কথাই বলছেন।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ : চিরন্তনী সারদা

নারীর মধ্যে রয়েচে একটি রসের প্রকৃতি, হ্লাদিনী শক্তি, সে-শক্তি পুরুষের মধ্যে স্ফুরিত করে আনন্দ, অনুপ্রেরণা, মন্দিরের নিদ্রিত দেবতার কানে-কানে বলে জাগরণী গান ; যেমন নদীর পথে নামে বর্ষার ঢল্, তার সর্বাঙ্গে আনে বেগ, তোলে জোয়ার, তাকে সক্রিয় করে, ছুটিয়ে নিয়ে চলে পরম লক্ষ্যের দিকে। এই হ্লাদিনী শক্তির ভাষান্তর হচ্ছে চার্ম।

প্রবোধকুমার সান্যাল : মহাপ্রস্থানের পথে

আমি তো চেয়েছি, নারী, তুমি পায়ের তলায় চন্দনে নিজের নাম লিখে
আমার বুকের মধ্যে সুগন্ধের সুর হয়ে পাতার মর্মরে জেগে ওঠো।

বার্ণিক রায় : দিব্য কবিতামালা

ভারতে নারীর আদর্শ মাতৃত্ব—সেই অপূর্ব, স্বার্থশূন্য, সর্বংসহা, নিত্য-ক্ষমাশীলা জননী।

বিবেকানন্দ : বাণী ও রচনা

প্রতীচ্যে নারী হলেন স্ত্রী, আর প্রাচ্যে নারী হলেন জননী।

বিবেকানন্দ : বাণী ও রচনা

নারীর সারা জীবনে এই একটি চিন্তা তাঁকে তৎপর রাখে যে, তিনি মাতা। আদর্শ মাতা হতে গেলে তাঁকে খুব পবিত্র থাকতে হবে।

বিবেকানন্দ : বাণী ও রচনা

ভারতের জন্য, বিশেষত নারী সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর—একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন।

বিবেকানন্দ : বাণী ও রচনা

নারী যার স্বতন্তরা সেজন জীবন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস॥

ভারতচন্দ্র রায় : অন্নদামঙ্গল

চিনি বটে যৌবনের পুরোহিত প্রেম দেবতারে,—
নারীরূপা প্রকৃতিরে ভালোবেসে বক্ষে লই টানি,
অনন্তরহস্যময়ী স্বপ্ন-সাথী চির-অচেনারে
মনে হয় চিনি যেন—এ বিশ্বের সেই ঠাকুরাণী।

মোহিতলাল মজুমদার : পান্থ

নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রানীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগি করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রানী। তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রানীর সুখ রহিল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মধ্যবর্তিনী

শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি, নারী!
পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
আপন অন্তরে হতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসী (চৈতালি)

মানুষের সৃষ্টিতে নারী পুরাতনী। নরসমাজে নারীশক্তিকে বলা যেতে পারে আদ্যাশক্তি। এই সেই শক্তি যা জীবলোকে প্রাণকে বহন করে, প্রাণকে পোষণ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নারী (কালান্তর)

নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পারস্যে

কোন ক্ষণে
সৃজনের সমুদ্রমন্থনে
উঠেছিল দুই নারী.....
একজনা উর্বশী, সুন্দর,
বিশ্বের কামনা রাজ্যে রানী,
স্বর্গের অপ্সরী।
অন্যজনা লক্ষ্মী সে কল্যাণী,
বিশ্বের জননী তাঁরে জানি,
স্বর্গের ঈশ্বরী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—২৩

প্রাণকে নারী পূর্ণতা দেয়, এই জন্যেই নারী মৃত্যুকেও মহীয়ান করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাঁশরি

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?.....
যাব না বাসরকক্ষে বধুবেশে বাজায়ে কিঙ্কিনী,—
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সবলা

শ্লথ প্রাণ দুর্বলের স্পর্ধা আমি কভু সহিব না।......
জীর্ণমজ্জা কাপুরুষে
নারী যদি গ্রাহ্য করে, লজ্জিত দেবতা তারে দুষে
অসহ্য সে অপমানে। নারী সে-যে মহেন্দ্রের দান
এসেছে ধরিত্রীতলে পুরুষেরে সঁপিতে সম্মান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্পর্ধা (মহুয়া)

ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন, গগনে নেহারি
ঘনঘটা, উর্দ্ধনেত্রে চাহে মেঘপানে ;
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়ানে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মেঘদূত (মানসী)

অন্য অরি নাহি ডরি নারীরে ডরাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মালিনী

আমি নারী, আমি মহীয়সী,
আমার সুরে সুর বেঁধেছে, জ্যোৎস্না-বীণায় নিদ্রাবিহীন শশী।
আমি নইলে মিথ্যা হত সন্ধ্যাতারা ওঠা,
মিথ্যা হত কাননে ফুল ফোটা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তি (পলাতকা)

নারীর বচনে মধু, হৃদয়েতে হলাহল ;
অধরে পিয়ায় সুধা, চিত্তে জ্বালে দাবানল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী

আমি নারী বলে আমাকে ভয় কর না? বিদ্যুৎ-শিখার হাত দিয়ে ইন্দ্র তাঁর বজ্র পাঠিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রক্তকরবী

সৃষ্টিকর্তা সংকল্প করেছেন পুরুষমেধ যজ্ঞ করতে—তারি সহায়তায় নারীদের ডাক পড়েছে। সবাই ছুটে আসছে, কেউ কণ্ঠ নিয়ে, কেউ কটাক্ষ নিয়ে। কারো বা কুটিল হাস্য, কারো বা কুঞ্চিত কেশকলাপ ; কারো বা সর্ষের তেল ও লঙ্কার বাটনা যোগে বুক-জ্বালানি রান্না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ রক্ষা

নারী জাতটা বিশুদ্ধ জলীয় ; তার কাঠিন্য নেই, চাঞ্চল্য আছে, চঞ্চলও করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—১২

নারীর একজাতীয় রূপ আছে যাহাকে যৌবনের অপর প্রান্তে না পৌঁছিয়া পুরুষে কোনদিন দেখিতে পায় না। **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** : দেনা পাওনা—৩

নারীর জন্য সতীত্ব, পুরুষের জন্য নয়। এ সতীত্বের চরম দাঁড়াইয়াছিল সহমরণে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : নারীর মূল্য

৫৭৮ খৃষ্টাব্দে আহূত ওসিয়ার ক্রীশ্চান ধর্ম সঙ্ঘে নাকি স্থির হইয়াছিল, স্ত্রীলোকের আত্মা নাই। ধর্মের জন্যে যে নারীজাতি মরে বাঁচে, যে ধর্ম-গ্রন্থের প্রত্যেক অক্ষরের প্রতি নারীর অচলা ভক্তি, সেই ধর্ম-গ্রন্থ লিখিবার সময় পুরুষ নারী জাতিকে কি শ্রদ্ধাই দেখাইয়া গিয়াছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : নারীর মূল্য

মণি মাণিক্য মহামূল্য বস্তু, কেন না, তাহা দুষ্প্রাপ্য। এই হিসাবে নারীর মূল্য বেশী নয়, কারণ সংসারে ইনি দুষ্প্রাপ্যা নহেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : নারীর মূল্য

মেয়েদের সম্বন্ধে সব পুরুষই সমান। মুখের ভদ্রতায় কেউ বা একটু হুঁসিয়ার, কেউ বা তা নয়। প্রয়োজন হলে দুটো মিষ্টি কথা বলে, প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে উগ্র মূর্তি ধরে। **শরৎচন্দ্র** : বিজয়া ৪/২

চাটুবাক্যের নানা অলঙ্কার গায়ে আমাদের জড়িয়ে দিয়ে যারা প্রচার করেছিল মাতৃত্বই নারীত্বের চরম সার্থকতা, সমস্ত নারীজাতিকে তারা বঞ্চনা করেছিল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শেষ প্রশ্ন-২৪

নারীর সত্যকার রূপ যে কতবড় দুর্লভদর্শন তাহা জগতের অধিকাংশ লোক জানে না। **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** : শেষের পরিচয়-৪

সমস্ত রমণীর অন্তরেই নারী বাস করে কি না, তাহা জোর করিয়া বলা অত্যন্ত দুঃসাহসের কাজ। কিন্তু নারীর চরম সার্থকতা যে মাতৃত্বে, এ কথা বোধ করি গলা বড় করিয়াই প্রচার করা যায়। **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** : শ্রীকান্ত ২য়

বোধ হয় অত্যন্ত দুঃখের মধ্য দিয়াই নারীর সত্যকার গভীর পরিচয়টুকু লাভ করা যায়। তাঁহাকে চিনিয়া লইবার এমন কষ্টিপাথরও আর নাই। তাঁহার হৃদয় জয় করিবার এতবড় অস্ত্রও পুরুষের হাতে আর দ্বিতীয় নাই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শ্রীকান্ত ৩য়

নারী আন্দোলন

নারী আন্দোলন মুক্তিরই আন্দোলন—শোষণ থেকে, বৈষম্য থেকে, অশিক্ষা এবং কুসংস্কার থেকে, ধর্মীয় নিপীড়ন থেকে। এর উদ্দেশ্য মেয়েমানুষ থেকে মানুষ হওয়া। কিন্তু এই নতুন মূল্যবোধের আকাঙ্ক্ষাকে ভীত চোখে দেখছে আজকের যুগের ভোগ্যপণ্য নির্ভর সমাজ। ভোগ্যপণ্যের এই লেনদেনের সঙ্গে সবরকম প্রচার মাধ্যমের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই দেখা যাচ্ছে যে, যখন নারী দাবী তুলছে গৃহাশ্রমের অর্থনৈতিক স্বীকৃতি ও মুল্যায়নের তখনই বাজারে আসছে রাশি রাশি কাজ হালকা করার জিনিস। তার সঙ্গে জোরদার বিজ্ঞাপন যার সারকথা হল আজকের নারী ঘরে বাইরে সমান দক্ষ।

মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় : মেয়ে মানুষের মানুষ হওয়ার সমস্যা (প্রতিক্ষণ মার্চ ১৯৮৯)

নারী দিবস

সব মেয়েরা যদি এরকম একটা দিনে নিজেরা একত্রিত হতে পারে, তা হলে তাদের শক্তি বাড়ে।.....নারীদিবসের যৌক্তিকতা নিয়ে কোনও সংশয়ই হওয়া উচিত নয়।.....এই দিনটার জন্যই মেয়েরা একটি বিরাট কমিউনে নিজেদের কথা বলার সুযোগ পায়।

উষা গঙ্গোপাধ্যায় : নিজেদের কথা বলার সুযোগের দিন
(সংবাদ প্রতিদিন ৮.৩.২০০৩)

মহিলারা পৃথিবীর অর্ধ জনজাতি, সমাজের অর্ধেক ভাগ। কিন্তু তা সত্ত্বেও সুদীর্ঘ দিন ধরে এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মেয়েদের নানাভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে, দমনপীড়ন করা হচ্ছে, মেরে ফেলা হচ্ছে, ধর্ষণ করা হয়েছে। সুচতুরভাবে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত ঐতিহাসিক ভয়ঙ্কর সত্য। এর প্রতিবিধানের জন্য ৮ মার্চ দিনটিকে আন্তর্জাতিক নারীদিবস হিসাবে ঘোষণা করা হল। বিবেচনার সঙ্গে দিনটির তাৎপর্য বুঝে পালন করা উচিত। মহিলারা অন্তত একটা দিনের জন্য তো বুঝল তাদেরও তাৎপর্য আছে।

কৃষ্ণা বসু : সান্ত্বনা পুরস্কার নয় (সংবাদ প্রতিদিন ৮.৩.২০০৩)

নারীদিবস এক প্রতীকী চাবুকের মতো। অচেতন মানুষদের মনে করিয়ে দেয় যে, নারীদেরও মানুষের মতো বাঁচার অধিকার আছে এবং সে অধিকার অর্জন করার মতো শক্তিও তাদের আছে। নারীদিবস মনে করিয়ে দেয় যে, মেয়েরা পাল্টে যাচ্ছে বলেই পৃথিবীটা পাল্টাচ্ছে।

মল্লিকা সেনগুপ্ত : প্রতীকী চাবুক (সংবাদ প্রতিদিন ৮.৩.২০০৩)

আন্তর্জাতিক নারীদিবসের প্রয়োজনীয়তা ছিল, আছে এবং থাকবে। এ যুদ্ধ চলবে যতদিন না সমস্ত মেয়ে তার উপযুক্ত সম্মান, সমানাধিকার পায়। তবে এই দিনটিকে কখনই সারা বছর বনাম একটা দিন হিসাবে দেখা ঠিক নয়। এই দিনটা হল কেন্দ্রীয় দিন, যে দিন থেকে শুরু করে সারা বছর ধরে চলবে সে আন্দোলন। আমার প্রশ্ন, মানবাধিকার থাকা উচিত কি না, তা নিয়ে তো কোনও প্রশ্ন ওঠে না? তা হলে এই দিনটার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন কেন? আমি মনে করি এটাও নারীর প্রতি তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া কিছু নয়।

যশোধরা বাগচী : দিনটা হল কেন্দ্রীয় দিন (সংবাদ প্রতিদিন ৮.৩.২০০৩)

নাস্তিক

নাস্তিক বলিলেই মূঢ় বোঝায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সাংখ্যদর্শন (বিবিধ প্রবন্ধ)

তিনি তখনকার কালের নামজাদা নাস্তিক। তিনি ঈশ্বরে অবিশ্বাস করিলে বলিলে কম বলা হয়, তিনি না-ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ—জ্যাঠামশায় ২

নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর,
ধার্মিকতার করে না আড়ম্বর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধর্মমোহ (পরিশেষ)

ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাশিয়ার চিঠি

নিকেতন

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে॥
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ সব তোর পর কেউ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন ভুলিছ আপন জনে॥

অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ঃ গান

দীর্ঘ পথশেষে
জীবযাত্রা-অবসানে ক্লান্তপদে রক্তসিক্তবেশে
উত্তরিব একদিন শ্রান্তিহরা শান্তির উদ্দেশে
দুঃখহীন নিকেতনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ এবার ফিরাও মোরে (চিত্রা)

নিখিল

নিখিলের স্রষ্টা তুমি, তোমার উদ্দেশে আর্জি তাই,
মোর এই সৃষ্টিকার্য উৎসৃষ্ট করিনু সন্তর্পণে।

বুদ্ধদেব বসু ঃ বন্দীর বন্দনা

নিজ

যে শুধু নিজের সুখ-সুবিধা, আরাম-বিরাম নিয়া থাকে সে কি আর মানুষ? দেশের দুঃখ-দুর্দশায় যার প্রাণ কাঁদে না, জাতি ও সমাজের বিপদে আপদে যে ব্যথা অনুভব করে না, সে তো নিতান্ত জড় পদার্থ, গাছ পাথরের সঙ্গে তাহার পার্থক্য কি? এরূপ লোক লক্ষ লক্ষ থাকিলেই বা দেশের কি আসে যায়? নিজের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য মানুষ যেরূপ প্রাণপাত করে, অপরের দুঃখকষ্ট ঠিক নিজের মত অনুভব করিয়া যখন তেমনিভাবে তাহা নিবারণের জন্য প্রাণপাত করিতে পারিবে, তখনই প্রকৃত জাতির সেবার সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে।

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ ঃ শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ উপদেশ

নিজেকে নিয়ে যার যত চিন্তা, অস্বস্তি, আত্মমগ্নতা, তার বাস্তববুদ্ধি তত কম ; আঘাত সহ্য করার শক্তি সামান্যই, আত্মনির্ভরশীলতা প্রায় শূন্য।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ সূত্রসন্ধান (ক্রীড়াভূমি)

নিন্দা

যাকে সামনে সমীহ করতে বাধ্য হতে হয়, তাকে আড়ালে নিন্দে করতে না পেলে বাঁচবে কেমন করে মানুষ?

আশাপূর্ণা দেবী ঃ প্রথম প্রতিশ্রুতি

বোধ হয় বড় হলেই লোকে নিন্দে করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কৃষ্ণকান্তের উইল

রসনায় নৃত্য করি চপল চঞ্চল
নিন্দা শ্রান্ত হয়ে পড়ে, দিয়ো না তাহারে
নিঃশব্দে আপন শক্তি বৃদ্ধি করিবারে
গোপন হৃদয়দুর্গে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান্ধারীর আবেদন (কাহিনী)

যারা নিন্দা করে তারা নিন্দা ভালোবাসে বলিয়াই করে, সত্য ভালোবাসে বলিয়া নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ

নিন্দা না থাকিলে পৃথিবীতে জীবনের গৌরব কি থাকিত। একটা ভালো কাজে হাত দিলাম, তাহার নিন্দা কেহ করে না—সে ভালো কাজের দাম কী!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরনিন্দা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদগতি সে লাভ করে না। পৃথিবীতে নিন্দা দোষীকে সংশোধন করিবার জন্য আছে তাহা নহে, মহত্ত্বকে গৌরব দেওয়া তাহার একটা মস্ত কাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরনিন্দা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

নিন্দুক

ওকে তুমি বল নিন্দুক,—তা সত্য।
সত্যকে বাড়িয়ে তুলে বাঁকিয়ে দিয়ে ও নিন্দে বানায়—
যার নিন্দে করে তার মন্দ হবে বলে নয়,
যারা নিন্দে শোনে তাদের ভালো লাগবে বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অপরাধী (পুনশ্চ)

নিমন্ত্রণ

তুমি আমায় ডেকেছিলে ছুটির নিমন্ত্রণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ,
ধন্য হল, ধন্য হল মানবজীবন॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

আকাশে আলোতে
নিমন্ত্রণ আসে যেন কোথা হতে,
পথ রুদ্ধ চারিধারে,
মুখ ফুটে বলিতে না পারে
অলক্ষ্য কী আচ্ছাদনে কেন যে আবৃতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঝামরী (মহুয়া)

নিমেষ

প্রতি নিমেষের কাহিনী
আজি বসে বসে গাঁথিস নে আর,
বাঁধিস নে স্মৃতিবাহিনী।
.....নিমেষে নিমেষে হয়ে যাক শেষ
বহি নিমেষের কাহিনী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উদ্বোধন (ক্ষণিকা)

রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথের বাঁধন (মহুয়া)

নিমেষের তরে শরমে বাধিল
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরমবেদনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মায়ার খেলা—৫ম দৃশ্য

নিয়তি

নিয়তির কার্য্য, কোন কালে হয় নাই
মানবের কল্পনা-চালিত।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ঃ নর-নারায়ণ

তুরঙ্গসম অন্ধ নিয়তি,
বন্ধন করি তায়
রশ্মি পাকড়ি আপনার করে
বিঘ্ন বিপদ লঙ্ঘন ক'রে
আপনার পথে ছুটাই তাহারে
প্রতিকূল ঘটনায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গুরুগোবিন্দ (কথা)

অহো দুরবৃত্তা নিয়তি!.....দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবসন লম্বকচ্ছে কামিনী-মনোমোহন নির্লজ্জ নাগরমূর্তি ধারণ করিয়াছেন। গম্ভীর প্রকৃতি গণপতি কদলীতরুর সহিত গোপন পরিণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছেন এবং মহাযোগী মহেশ্বর গঞ্জিকা-ধুস্তুর-সিদ্ধি-পানে উন্মত্ত হইয়া মহাদেবীর সহিত অশ্রাব্য ভাষায় কলহ করিয়া নীচ জাতীয় স্ত্রীপল্লীর মধ্যে আপন বিহারক্ষেত্র বিস্তার করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বর্গীয় প্রহসন (ব্যঙ্গকৌতুক)

নিয়ম

যে নিয়ম সত্য তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অচলায়তন

.....কেবল ভালোই লাগে, কিন্তু ভালো লাগবার কোনো নিয়ম নেই। আমাদের ঠিক তার উল্টো, ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু নিয়মটা থাকবেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি (ব্যঙ্গকৌতুক)

ফাগুন মাসে পূর্ণিমাতে
যে নিয়মটা চলে
রাগ কোরোনা চৈত্র মাসে
সেটা ভঙ্গ হলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অসাবধান (ক্ষণিকা)

সংসারের শ্রেষ্ঠ জিনিষ মাত্রেই নিজের নিয়ম নিজেই সৃষ্টি করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার সভা—২।৪

শক্তি.....নিয়মকে মানে......কেবল নিয়মকে মানিবার জন্য নহে, আপনাকেই মানিবার জন্য।......শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই.....মানে ; .....যেখানে আমরা নিয়ম মানি সেখানে দাসের মতো মানি, যেখানে মানি না সেখানে দাসের মতোই ফাঁকি দিই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথের সঞ্চয়—খেলা ও কাজ

শোনা যায় জগতে হরণ-পূরণের একটা নিয়ম আছে।.....আপিসেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আমাদের যেমন বেতন অল্প, তেমনি খাটুনি এবং লাঞ্ছনা অধিক এবং সাহেবের ঠিক তাহার বিপরীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পয়সার লাঞ্ছনা—(ব্যঙ্গকৌতুক)

নিয়ম তোরা মানবি, আমরা মানব। বড়োলোকের আবার নিয়ম কী। সবাই যদি নিয়ম মানবে তবে নিয়ম গড়বে কে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—৩।১

যেথায় আলোক সেইখানে ছায়া
এই তো নিয়ম ভবে,
....রূপের কাছে চিরদিন তাই
.....ক্ষুধা জাগিয়া রবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাহুর প্রেম (ছবি ও গান)

নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার ; মর্তে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১৫

হয় অবিশ্রাম চলো এবং জীবনচর্চা করো, নয় বিশ্রাম করো এবং বিলুপ্ত হও, পৃথিবীর এইরূপ নিয়ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নতুন ও পুরাতন (স্বদেশ)

উঠিলেও নিয়ম, নামিলেও নিয়ম, স্থির থাকিলেও নিয়ম, নিয়ম কাটাইবার যো নাই। প্রকৃতির রাজ্য বস্তুতই নিয়মের রাজ্য।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী : নিয়মের রাজত্ব

নিরঞ্জন

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন-প্রশান্ত-মনে
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।
দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে, স্ফুরিছে অধর 'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মূল্যপ্রাপ্তি (কথা)

নিরপেক্ষ

এই সমাজে নিরপেক্ষতা এক ধরনের ভণ্ড আত্মতুষ্টি।

দুলেন্দ্র ভৌমিক : আততায়ী (নকশাল আন্দোলনের গল্প)

নিরুদ্দেশ

অস্ত রবির শেষ আলোটির মতো
তরী নিশীথমাঝে যাবে নিরুদ্দেশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—৮৩

পথিক মেঘের দল জোটে ঐ শ্রাবণ-গগন-অঙ্গনে
মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্রাবণগাথা

নিরুপায়

ভরা পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে দু ধারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সোনার তরী (সোনার তরী)

নির্জনতা

নির্জনতা আত্মার উন্নতির একটি প্রধান উপায়। নিম্নজগতের কোনো প্রভাব এই উত্তুঙ্গ জনহীন পর্বতচূড়ায় এঁদের [সাধুদের] দেহমন স্পর্শ করে না। নির্জনতায় এঁরা শক্তি অর্জন করেন। ব্রহ্মজ্যোতি এদের মনে প্রবেশ করে ধীরে ধীরে ঐ অবস্থায়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : দেবযান

নির্জনতার মধ্যে, অবসরের মধ্যে জ্ঞানের প্রকাশ—ভাবের আবির্ভাব। যথার্থ পুরুষ সর্বদাই সেই নির্লিপ্ত নির্জনতার মধ্যে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নরনারী (পঞ্চভূত)

জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—২

নির্ঝর/নির্ঝরিণী

পাষাণ-গিরির বাঁধন টুটে নির্ঝরিণী আয় নেমে আয়।
ডাকছে উদার নীল-পারাবার আয় তটিনী আয় নেমে আয়॥

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য-গীতি

প্রথম যেদিন ফাল্গুনতাপে
নবনির্ঝর জাগে,
মহাসুদূরের অপরূপ রূপ
দেখিতে সে পায় আগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অগ্রদূত (পরিশেষ)

ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী
কলনৃত্যে বাজাইয়া মাণিক্যকিঙ্কিণী
কল্লোলে মিশিতেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিজয়িনী (চিত্রা)

চঞ্চল নির্ঝরধারা গুহা হতে বাহিরি আলোকে
আপনাতে আপনি চকিত, যেন কবি বাল্মীকির
উচ্ছ্বসিত অনুষ্টুভ। স্বর্গে যেন সুরসুন্দরীর
প্রথম যৌবনোল্লাস, নূপুরের প্রথম ঝংকার,
আপনার পরিচয়ে নিঃসীম বিস্ময় আপনার,.......
সেই নিরন্তর হাসি অবলীল গতিচ্ছন্দে বাজে
কঠিন বাধায় কীর্ণ শঙ্কায় সংকুল পথমাঝে
দুর্গমেরে করি অবেহলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হাসির পাথেয় (বনবাণী)

নির্দয়

এসো দুঃসহ, এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

কেন দয়িতের মিনতিকে
অভাবিত উচ্চহাস্যে উড়াইয়া দেয় দিকে দিকে।
তার পরে আপনার নির্দয় লীলায়
আপনি সে ব্যথা পায়,
ফিরে যে গিয়েছে তারে ফিরায়ে ডাকিতে কাঁদে প্রাণ ;
আপনার অভিমানে করে খান্‌খান্‌॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নাম্নী—হেঁয়ালী (মহুয়া)

নির্ভীক

নির্ভীক কেননা নিঃস্ব,—। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ কোপাই (পুনশ্চ)

দেখিতে দেখিতে গুরুর মন্ত্রে
জাগিয়া উঠেছে শিখ—
নির্মম নির্ভীক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বন্দী বীর (কথা)

নির্মম

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এই কথাটাই বুঝিয়েছিলেন—নির্দয় হবে না, কিন্তু কর্তব্যের বেলা নির্মম হতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায়—১

নির্লিপ্ত

শুধু কবিত্বে নয়, সকল প্রকার কারুকলাতেও কারুকরের চিত্তের একটা নির্লিপ্ততা থাকা চাই। মানুষের অন্তরের মধ্যে যে সৃষ্টিকর্তা আছে, কর্তৃত্ব তাহারই হাতে না থাকিলে চলে না। রচনার বিষয়টাই যদি তাহাকে ছাপাইয়া কর্তৃত্ব করিতে যায়, তবে তাহা প্রতিবিম্ব হয়, প্রতিমূর্তি হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি

নিশ্চল

নিশ্চলের যে ভয়ংকর চলা তাহার রুদ্রবেগ যদি দেখিতে চাও তবে দেখো ওই নক্ষত্রমণ্ডলীর আবর্তনে, দেখো যুগ-যুগান্তরের তাণ্ডবনৃত্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আষাঢ় (বিচিত্র প্রবন্ধ)

নিশ্চিত

এসো ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিৎ ;
অনিশ্চিত এ সংসারে একথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা, সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিং টিং ছট্ (সোনার তরী)

নিশ্বাস

বায়ু যেন বহে আসে নিশ্বাসের মতো,
সাথে লয়ে পল্লবের মর্মর-বিলাপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রকৃতির প্রতিশোধ—৮ম দৃশ্য

তপ্ত হাওয়ায় আসছে.........বাতাবিফুলের নিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মালঞ্চ—১

সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

নিঃশ্বাস-বীজনে মোর কাঁপিবে কুন্তল তব,
মুদিবে নয়ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সান্ত্বনা (চিত্রা)

অঙ্গের কুঙ্কুমগন্ধ কেশধূপবাস
ফেলিল সর্বাঙ্গে মোর উতলা নিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বপ্ন (কল্পনা)

নিষেধ

—কেন?
—কেন কী রে, ওটা যে নিষেধ।
—কেন নিষেধ?
—শোনো একবার। নিষেধ, তার আবার কেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন

নিস্তব্ধ নিষেধসম প্রসারিল কর
লতাশৃঙ্খলিত বন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিশোধ (কথা)

নীল গিরিশ্রেণী-'পরে দূরে যায় দেখা
দৃষ্টি রোধ করি ; যেন নিশ্চল নিষেধ
উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ
যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবনদ্বারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বসুন্ধরা (সোনার তরী)

নিষ্ঠুর

যে মানুষ হাড়ে দুর্বল, দুর্বলের যম সে—তার মতো নিষ্ঠুর কেউ হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চার অধ্যায়—২

মানুষকে যে-বিধাতা ভালবাসেন তিনি নিষ্ঠুর, জন্তুকেই তিনি প্রশ্রয় দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চার অধ্যায়—১

.....রবি অতি নিষ্ঠুর
নলিন-মিলন-অভিলাষে
কত নরনারীক মিলন টুটাওত
ডারত বিরহ-হুতাশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভানুসিংহের পদাবলী—১২

অঘ্রানে শীতের রাতে নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মূল্যপ্রাপ্তি (কথা)

অতি দুর্দাম কৌতুকরত
যৌবনমদে নিষ্ঠুর যত
যুবতীরা মিলি পাগলের মতো
আগুন লাগালো কুটিরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সামান্য ক্ষতি (কথা)

নিষ্ফল

আমি রব নিষ্ফলের হতাশের দলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কর্ণকুন্তীসংবাদ

অতি ইচ্ছা চলে অতি বেগে। দেখিতে না
পায় পথ ; আপনারে করে সে নিষ্ফল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী (৫/১)

নিস্তব্ধ

সভা হল নিস্তব্ধ!
বন্দার দেহ ছিঁড়িল ঘাতক
সাঁড়াশি করিয়া দগ্ধ।
স্থির হয়ে বীর মরিল, না করি'
একটি কাতর শব্দ।
দর্শকজন মুদিল নয়ন,
সভা হল নিস্তব্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বন্দী বীর (কথা)

হিল্লোলিত হৈমন্তিক মঞ্জরীর মাঝে
কপোতকূজনাকুল নিস্তব্ধ প্রহরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বঙ্গলক্ষ্মী (কল্পনা)

নীচ

গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্মতি।

মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১০৮

নীর

স্নিগ্ধ শান্ত সুগভীর নাহি তল, নাহি তীর,
মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হৃদয়যমুনা (সোনারতরী)

নীরদ

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে
পুলক মুকুল অবলম্ব।।
স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
বিকশিত ভাব কদম্ব।।
কি পেখলুঁ নটবর গৌর-কিশোর।

গোবিন্দদাস : বৈষ্ণব পদাবলী

নীরদ নীল নয়ন নীরজ নিন্দিত। **গোবিন্দদাস** : বৈষ্ণব পদাবলী

ঝন্ ঝন্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্ রিম্ ঝিম্
বরখত নীরদপুঞ্জ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভানুসিংহের পদাবলী—১৩

নীল

ওরে নীল যমুনার জল বল্ রে মোরে বল্।
কোথায় ঘনশ্যাম আমার কৃষ্ণ ঘনশ্যাম।।
আমি বহু আশায় বুক বেঁধে যে এলাম ব্রজধাম।।

কাজী নজরুল ইসলাম : ভক্তি-গীতি

**নীলাম্বরী শাড়ি পরি' নীল যমুনায়/কে যায় কে যায় কে যায়।
যেন জলে চলে থল-কমলিনী/ভ্রমর নূপুর হয়ে বোলে পায় পায়।**

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ রাগ প্রধান

নীল! নীল!
সবুজের ছোঁয়া কি না, তা বুঝি না,
ফিকে গাঢ় হরেক রকম
কম-বেশী নীল!
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল
ক'টা গাঙ্ চিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ সাগর থেকে ফেরা

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায় সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর!
বনলক্ষ্মীর কম্পিত কায়, চঞ্চল অন্তর—
ঝঙ্কৃত তার ঝিল্লির মঞ্জীর হে গম্ভীর॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

হেরিয়া শ্যামল ঘন নীল গগনে,
সেই সজল কাজল আঁখি পড়িল মনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল,
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

নুন

লুনের ছবি (লবণ পুত্তলিকা) সমুদ্র মাপতে গিছল।....কত গভীর জল তাই খপর দেবে। খপর দেওয়া আর হল না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া। কে আর খপর দিবেক?

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

মা নুন খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল॥

রামপ্রসাদ সেন ঃ শাক্ত পদাবলী

নূতন (দ্র. নবীন)

নূতনত্বে আর নবীনত্বে প্রভেদ আছে। নূতনত্ব কালের ধর্ম, নবীনত্ব কালের অতীত। মহারাজাবাহাদুর আকাশে যে জয়ধ্বজা ওড়ান আজ সে নতুন, কাল সে পুরানো।.....সূর্যের রথে যে অরুণধ্বজা ওড়ে কোটি কোটি যুগ ধরে প্রতিদিনই সে নবীন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কবির অভিভাষণ (সাহিত্যের পথে)

আর-সমস্ত নূতনকে মানুষ খুঁজিয়া বাহির করে, কিন্তু নূতন মানুষ! এমন উদ্‌বেগের বিষয় আর-কিছুই নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খেলা ও কাজ (পথের সঞ্চয়)

হে নূতন,
দেখা দিক আর-বার জন্মের প্রথম শুভক্ষণ॥
তোমার প্রকাশ হোক কুহেলিকা করি উদ্ঘাটন
সূর্যের মতন।

রিক্ততার বক্ষ ভেদি আপনারে করো উন্মোচন।
ব্যক্ত হোক জীবনের জয়,
ব্যক্ত হোক তোমামাঝে অসীমের চিরবিস্ময়।
উদয়দিগন্তে শঙ্খ বাজে, মোর চিত্তমাঝে
চিরনূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

হে দুর্দম, হে নিশ্চিত, হে নূতন, নিষ্ঠুর নূতন,
সহজ প্রবল,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষশেষ (কল্পনা)

পুরানো মাঝে যা কিছু ছিল
চিরকালের ধন
নূতন, তুমি এনেছ তাই
করিয়া আহরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

নূপুর

আমি যার নূপুরের ছন্দ বেণুকার সুর—
কে সেই সুন্দর কে।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাব্য-গীতি

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি,
মরেছি হাজার মরণে—
নূপুরের মত বেজেছি চরণে
চরণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উদাসীন (ক্ষণিকা)

নূপুর বেজে যায় রিনিরিনি।
আমার মন কয়, চিনি চিনি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিবিতান

নৃত্য

আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ,
আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বিদ্রোহী

নৃত্যের মঞ্চে দেহ আর আত্মাকে যোগযুক্ত করবে, তবেই তোমার দেহের শাখায় শাখায় ফুটে উঠবে আনন্দের ফুল।

চিত্তরঞ্জন মাইতি ঃ মোহিনী

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে কে যে নাচে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরূপরতন

কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে ডাইনে বাঁয়ে দুই হাতে,
সুপ্তি ছুটে নৃত্য উঠে নিত্য নূতন সংঘাতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কালের মন্দিরা যে (গীতবিতান)

নৃত্যে তোমার মুক্তির রূপ, নৃত্যে তোমার মায়া।
বিশ্বতনুতে অণুতে অণুতে কাঁপে নৃত্যের ছায়া।.....

নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্র ভানু।
তব নৃত্যের প্রাণবেদনায় বিবশ বিশ্ব জাগে চেতনায়
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে,
সুখে দুখে হয় তরঙ্গময় তোমার পরমানন্দ হে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

কম্পিত বটপত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চোখের বালি—১০

কিরণকুন্তলজাল এলায়ে চৌদিকে
রুদ্রতালে নৃত্য করে এ মহাপ্রকৃতি।
আলোক আঁধার ছায়া, জীবন মরণ,
রাত্রি দিন, আশা ভয়, উত্থান পতন,
এ কেবল তালে তালে পদপেক্ষ তার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রকৃতির প্রতিশোধ—৭ম দৃশ্য

যখন আদিদেবের আহ্বানে সৃষ্টি-উৎসব জাগল তখন তার প্রথম আরম্ভ হল আকাশে আকাশে বহ্নিমালার নৃত্যে। সূর্যচন্দ্রের নৃত্য আজও বিরাম পেল না, ষড়্ ঋতুর নৃত্য আজও চলেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সুরলোকে আলোক-অন্ধকারের যুগলনৃত্য, নরলোকে-অশ্রান্ত নৃত্য জন্মমৃত্যুর ; সৃষ্টির আদিম ভাষাই এই নৃত্য, তার অন্তিমেও উন্মত্ত হয়ে উঠবে এই নৃত্যের ভাষাতেই প্রলয়ের অগ্নিনটিনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্রাবণগাথা

নেতা

আমি বলি, ওরে কথা শোন ক্ষ্যাপা, দিব্যি আছিস্ খোশহালে।
প্রায় 'হাফ'-নেতা হয়ে উঠেছিস, এবার এ দাঁও ফসকালে
'ফুল' নেতা আর হবিনে যে হায়!
বক্তৃতা দিয়ে কাঁদিতে সভায়
গুঁড়ায়ে লঙ্কা পকেটেতে বোকা এই বেলা ঢোকা! সেই তালে
নিস তোর ফুটো ঘরটাও ছেয়ে, নয় পস্তাবি শেষকালে।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ আমার কৈফিয়ৎ

নেতা হতে যেয়ো না, সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবিয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী—৫

ছবিটা না দেখেই ছেলে পড়ল ঃ অ-এ অবরোধ
আ-শিখতেই তুমুল কাণ্ড, ছেলে পড়ল ঃ আউট
লাউড স্পীকারে কান, ছেলে শিখল, ই-এ ইলেকশন
লেখাপড়া ওর হবে না ঃ হতাশ মা গেলেন রান্না ঘরে
বাবা ফতোয়া দিলেন ঃ না হোক, যদি পার্টি করে নেতা হয়
আমাদের মতো ইঁদুর হয়ে গর্তে থাকতে হবে না।

মতি মুখোপাধ্যায় ঃ অ-আ-ই

এ মেলে ও মেলে বলেই তো মশায়, আপনারা এম-এল-এ। আপনারা দেশের 'নেতা' অর্থাৎ 'দেতা' নেহি।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ঃ দাদাঠাকুর (নলিনীকান্ত সরকার)

শক্তি সকলের মধ্যে নামে না। যার মধ্যে নামে সেই হয় নেতা। নেতারাই দেবতা। সেই দেবতাকে নৈবেদ্য দাও। কিসের নৈবেদ্য! কলা নয়, মুলো নয়, ভোট, ভোট দাও।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

নেশা

মানের নেশার ঝোঁকে।.......

দেবেন্দ্রনাথ সেন : অশোক গুচ্ছ

দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,—
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না? এ কি দায়!

মাইকেল মধুসূদন দত্ত : আত্ম-বিলাপ

মানুষের যা-হোক-একটা-কিছু নেশা চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নষ্টনীড়

নেশাখোর সব সহিতে পারে, পারে না শুধু তাহার বুদ্ধিভ্রষ্টতার উল্লেখ সহিতে।

শরৎচন্দ্র : বিরাজ বৌ

নৈবেদ্য

ধরণীর প্রতিদান রৌদ্রের দানের।
সূর্যের মন্দিরতলে পুষ্পের নৈবেদ্য থাকে পাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আরোগ্য ৩

ন্যাকামি

একেবারে সাব্লাইম ন্যাকামি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঁশরি—২য় দৃশ্য

ন্যায়

ন্যায় জিনিবারে কহে অসত্যবচন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত

সাবধান, সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্র দীপ্ত—মূর্তিমান।

মুকুন্দ দাস : সাবধান, সাবধান

তোমার ন্যায়ের দণ্ড প্রত্যেকের করে
অর্পণ করেছ নিজে, প্রত্যেকের 'পরে
দিয়েছ শাসনভার হে রাজাধিরাজ!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তোমার ন্যায়ের দণ্ড (নৈবেদ্য ৭০)

ন্যায় অন্যায় জানি নে, জানি নে, জানি নে—
শুধু তোমারে জানি, তোমারে জানি
ওগো সুন্দরী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্যামা

ন্যায়শাস্ত্র

কোনো মানুষের কথায় বা কাজে সংগতি নেই একথা বলে তাকে বাগিয়ে নেওয়া যায় না, রাগিয়ে দেওয়া হয় মাত্র। ন্যায়শাস্ত্রের দোহাই পাড়লে অন্যায়ের প্রচণ্ডতা বেড়ে ওঠে—যারা পোলিটিকাল বা গার্হস্থ্য অ্যাজিটেশনে শ্রদ্ধাবান তাদের এ কথাটা মনে রাখা উচিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পাত্র ও পাত্রী (গল্পগুচ্ছ)

পছন্দ

দুটো-একটা কাপড় চোপড় ছাড়া জীবনের কটা জিনিষই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে।......আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারিনি।.....তবু তো আপনাকে কম ভালবাসিনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোড়ায় গলদ ১।৩

পঞ্চম

গলাবাজিতে সংসার শাসিত হয় বটে, কিন্তু কেবল চেঁচাইলে হয় না ; যদি শব্দ মন্ত্রে সংসার জয় করিবে, তবে যেন তোমার স্বরে পঞ্চম লাগে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বসন্তের কোকিল (কমলাকান্ত)

বেজে ওঠে পঞ্চমে স্বর, কেঁপে ওঠে বন্ধ এ ঘর,
বাহির হতে দুয়ারে কর কেউ তো হানে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

পঞ্চশর

পঞ্চশরের বেদনামাধুরী দিয়ে
বাসররাত্রি রচিব না মোরা প্রিয়ে—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

আমি পঞ্চশর, সখা ;.......এক শরে হাসি,
অশ্রু এক শরে ; এক শরে আশা, অন্য
শরে ভয় ; এক শরে বিরহ-মিলন—
আশা-ভয়-দুঃখ-সুখ, এক নিমেষেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা ৫

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী,
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মদনভস্মের পর (কল্পনা)

পঞ্চায়েত

পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা রাজ্যের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় একটি শক্ত পরিকাঠামো। যে কোনো রাজ্যে অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালু রাখতে হলে প্রয়োজন একটি সুবিন্যস্ত পরিকাঠামোর। নিঃসন্দেহে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা সেই সুবিন্যস্ত পরিকাঠামো জোগাতে সাহায্য করেছে।

ঈশিতা মুখোপাধ্যায় ঃ পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত ব্যবস্থার এক দশক

পঞ্জিকা

হিন্দুর তিথি ইত্যাদি গণনা, শুভ অশুভ দিনের মতবাদ, কতকগুলি মধ্যযুগীয় ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত হিন্দুপঞ্জিকা একটা কুসংস্কারের বিশ্বকোষ মাত্র।

মেঘনাদ সাহা ঃ বিজ্ঞান ও চৈতন্য

পণ (প্রতিজ্ঞা)

নব বৎসরে করিলাম পণ—
লব স্বদেশের দীক্ষা,
তব আশ্রমে তোমার চরণে,
হে ভারত, লব শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—১৩

ধর্ম্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান,
নীরব হয়ে নম্র হয়ে পণ করিয়ো প্রাণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা—৪

সখি লো, সখি লো, নিকরুণ মাধব
        মথুরাপুর যব যায়,
করল বিষম পণ মানিনী রাধা,
রোয়বে না সো, না দিবে বাধা,
কঠিন-হিয়া সই, হাসয়ি হাসয়ি
        শ্যামক করব বিদায়।
মৃদু মৃদু গমনে আওল মাধা,
বয়ন-পান তছু চাহল রাধা,
চাহয়ি রহল স চাহয়ি রহল,
দণ্ড দণ্ড সখি চাহয়ি রহল,
মন্দ মন্দ সখি নয়নে বহল
        বিন্দু বিন্দু জল-ধার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভানুসিংহের পদাবলী—১৬

পণ (যৌতুক)

করেছি পণ, নেব না পণ
        বৌ যদি হয় সুন্দরী।
কিন্তু আমায় বলতে হবে
        স্বর্ণ দেবে কয় ভরি।
স্যাকরা ডেকে দেখব নিজে
        আসল কিংবা কম্‌দরী।
সোনায় হবে সোহাগা যে
        বৌ যদি হয় সুন্দরী।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ পণ (ছড়া সমগ্র)

বিনা পণে দিব বিয়া!—এ কোন ব্যাভার?
কোথা গেল সেই শব্দ দশটী হাজার?

দেবেন্দ্রনাথ সেন ঃ বিংশ শতাব্দীর বর

না, আমাদের দেশে যৌতুকের বালাই নেই। প্রথাটা—সবাই জানে—এদেশেও উঠে গিয়েছে; পাকা-দেখার দিনে বাঙ্গালী ভাবী শ্বশুর শুধু বলবেন, "যৌতুক ?.....আমাদের কি এত ছোটলোক ভেবেছেন? স্বয়ং লক্ষ্মী আমাদের বাড়িতে আসছেন, তার উপর আমরা আবার পণ নেব?.....কনে-কে সাজাবেন, গোছাবেন, এই আর কি!.....আমরা কি মেয়ের ব্যবসা করি? কিংবা বউমা শ্যামবর্ণা ব'লে আমরা কি আপনাদের কাছে কোহিনুর দাবি করব?.....ভরি বাইশেক সোনা দিলেই যথেষ্ট। আবার ধরুন, বউমা অনার্সে ফার্স্ট ক্লাস মিস করেছে ব'লে আমরা কি আপনার কাছে বিদেশী গাড়ি চাইব?.....অ্যাম্বাসাডার দিলেই তো চলবে, খুবই চলবে। আমাদের দুই ঘর পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে, আর আমরা কি না লোভ দেখাব? ভেবেছেন কি মশায়? দেখুন বরং ঃ আপনার মেয়ে তা ক্লাসিকাল গান শেখে নি, তাই ব'লে আপনাদের জামাই কি রাজকুমার না রায় বাহাদুর যে আলিপুরে বাড়ি চেয়ে বসবে?......না, ওকে বরঞ্চ বিলেত পাঠানোর বন্দোবস্ত করুন ; পড়াশোনা শেষ ক'রে ফিরবে যখন,

দেখবেন ঐ অ্যাম্বাসাডারে কত জায়গায় কত মজা ক'রে বউমাকে ঘোরাবে। ইতিমধ্যে গাড়িটা আমাদের গ্যারাজেই থাক।..........”

বউমার ছ'টি বোন আছে—ছোট বোন। কারো রঙ আবার অতি-গৌর নয়, ক্লাসিকাল গাওয়ার মতো গলা নেই, আর বি.এ.-তে ওরা যে ফার্স্ট ক্লাস পাবে, তারও সম্ভাবনা অল্প। হরিহরের কাছে প্রার্থনা ঃ ওদেরও কপালে যেন ঘটে এমনই উদার এক শ্বশুরের সাক্ষাৎ।

ফাদার দ্যতিয়েন ঃ ডায়েরির ছেঁড়াপাতা

ছেলের বিয়ে দিতেও তুমি
ঠিক রেখেছ ধর্মটিকে,
পণের টাকা আদায় করে
পথে বসাও বৈবাহিকে।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ঃ ব্রাহ্মণ-গান

চাকুরিজীবি অবিবাহিত ভদ্রলোকের ছেলেদের ব্যাপারটা সত্যি লজ্জাজনক। এইসব মধ্যবিত্ত তরুণরা বড় বড় কথা বলে, অফিসে পাড়ায় বিপ্লব করে, কিন্তু পণের টাকা, কন্যার কোষ্ঠী মিলিয়ে ছাড়া বিয়ের কথা ভাবতে পারে না।

সমরেশ বসু ঃ শুভ্রা সন্ধ্যা সংবাদ

পণ্ডিত

যখন আমরা বড়ো কথা, বইয়ের কথা লইয়া আলোচনা করিতে পারি, কিন্তু সহজ আলাপ, সামান্য কথা আমাদের মুখ দিয়া ঠিকমত বাহির হইতে চায় না, তখন বুঝিতে হইবে, দৈবদুর্যোগে আমরা পণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছি, কিন্তু আমাদের মানুষটি মারা গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আবরণ (শিক্ষা)

পণ্ডিতেরা বিবাদ করে লয়ে তারিখ সাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সেকাল (ক্ষণিকা)

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল—
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।.....
কটা-চুল নীলচক্ষু কপিশকপোল
যবন পণ্ডিত আসে বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাঁটাছোটা কুর্তি—
গ্রীষ্মতাপে উষ্মা বাড়ে, ভারি উগ্রমূর্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিং টিং ছট (সোনার তরী)

পণ্ডিতেরা অনেক জানে-শোনে—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র। কিন্তু শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে? বিবেক-বৈরাগ্য চাই। বিবেক-বৈরাগ্য যদি থাকে, তবে তার কথা শুনতে পারা যায়। যারা সংসারকে সার করেছে, তাদের কথা নিয়ে কি হবে!

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ভেবে দেখলাম এ সংসারে আমিই শুধু পণ্ডিত,
সকল শাস্ত্রে পারদর্শী সকল বিদ্যায় মণ্ডিত।
বুঝলে না তা কেউ অবশ্য এইটে আমার দুখ্‌খু,
কিন্তু বুঝবে কেমন করে? সব যে আকাট মুখখু।

সতীশচন্দ্র ঘটক ঃ আমার পাণ্ডিত্য

পতাকা

জাতীয় পতাকা জাতির সমষ্টিগত মর্যাদাবোধের প্রতীক।

অমরনাথ রায় **:** ভারত আমার

তোমার পতাকা যারে দাও তারে
বহিবারে দাও শকতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **:** নৈবেদ্য—২০

পতি

পতির প্রধান গুণ স্ত্রী-ভক্তি, যে পতি স্ত্রী-কে না ভক্তি করে, সে ব্যভিচারী....., আর আমরা যদি স্বামীকে দমন করতে না পারবো, তবে আমাদের হাই এডুকেশনের ফল কি?

অমৃতলাল বসু **:** বিবাহ-বিভ্রাট

পতি কাছে নাই পতি বিনা আর
কে আছে নারীর সম্বল,
কাঁচা আঁব দুটো পেড়ে আন সখি
গুড় দিয়ে রাঁধি অম্বল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় **:** বিরহ

কি কব পতির কথা লাজে মাথা হেঁট।
মোটাসোটা মোর পতি বড় ভুঁড়ো পেট॥

ভারতচন্দ্র রায় **:** অন্নদামঙ্গল

পতিব্রতা

স্বামী হবে এঞ্জিনিয়র আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনি, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, ...পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **:** ল্যাবরেটরি (তিনসঙ্গী)

পত্র (দ্র. চিঠি)

পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
নবীন প্রাণের পত্র আসে
পলাশ জবায় কনক-চাঁপায় অশোকে অশ্বত্থে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **:** বকুলগন্ধে বন্যা (গীতবিতান)

আহা, বাগবাজারের রসগোল্লার ন্যায় তাঁর পত্রখানি রসে চোবানো, বোধ হয় পত্রখানি নিংড়ালে টস টস রস পড়ে।

শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার) **:** কেয়াবাৎ মেয়ে

যত বিচিত্র মানুষ, তত বিচিত্র তার পত্র।

সমরেশ বসু **:** অমৃতকুম্ভের সন্ধানে

পত্রলেখা

যেমন আছ তেমনি এসো
আর কোরো না সাজ।
বেণী না হয় এলিয়ে রবে,
সিঁথে না হয় বাঁকা হবে
নাই বা হল পত্রলেখায়
সকল কারুকাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর **:** চিরায়মানা (ক্ষণিকা)

কুঙ্কুমেরই পত্রলেখায়
বক্ষ রইত ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সেকাল (ক্ষণিকা)

......অর্ধচ্যুত বসন-অন্তরে
চন্দনের পত্রলেখা বাম পয়োধরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বপ্ন (কল্পনা)

পত্রসাহিত্য

সাহিত্যিকের লেখা পত্র যখন ব্যক্তিগত সীমানা অতিক্রম করে সর্বজনীন সাহিত্য-আবেদনসম্পন্ন হয়ে ওঠে তখন তাকে পত্র-সাহিত্য আখ্যা দেওয়া যায়। বস্তুনিষ্ঠ মনন ও সাহিত্যিকের কল্পনার গভীরতা পত্র-সাহিত্যের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাহিত্যের শব্দার্থকোশ

পথ

পথের দেবতা আঙুল বাড়াইয়া সম্মুখের পথটা দেখাইয়া দিলেন। সেই পথ ধরিয়াই চলিয়াছি। পথের আদি জানি, অন্ত জানি না। শুধু অবিরাম চলিতে হইবে, এইটুকু জানি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্মৃতি বিস্মৃতির দর্পণে

পথ কেবলই পথের ভিতর হারায়
অন্তহীন একা।

অসীম রেজ ঃ বাক্যহীন তুমি স্তব্ধ একা (আগুন শেষের বেলা)

এইত তোমারও পথ—ইতিহাসের পথ, জীবনের পথ, মানবতীর্থের পথ....All roads lead to communism, মানব মুক্তির দিকে, ভালবাসার রাজ্যে।

গোপাল হালদার ঃ আর একদিন (ত্রিদিবা)

সেই সব হারানো পথ আমাকে টানে ;—
কেরমানের নোনা মরুর ওপর দিয়ে,
খোরাশান থেকে বাদক্শান,
পামিরের তুষার-পৃষ্ঠ ডিঙিয়ে, ইয়ারকন্দ থেকে খোটান।
শ্রান্ত উটের পায়ে-পায়ে যেখানে উড়েছে মরুর বালি,
চমরীর খুরে লেগেছে. বরফ-গলা কাদা!

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ পথ (সম্রাট)

আজ এই রাস্তার গান গাইব,—এই নগরের শিরা-উপশিরার!
এই রাস্তার ধূলির গান!.....
যে মানুষ প্রথম পথ সৃষ্টি করেছিলো মানুষের সঙ্গে মেলবার জন্যে
তাকে নমস্কার!
সে-পথ আরো বিস্তৃত হোক,
যে-পথ মানুষকে বৃহৎ করেছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ পথ (প্রথমা)

সারথি চালান যিনি জীবনের রথ
তিনিই জানেন শুধু কার কোথা পথ।
আমি ভাবি আমি বুঝি পথের প্রহরী,
পথ দেখাইতে গিয়ে পথ রোধ করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আশীর্বাদ (গীতালি)

আমায় ছ জনায় মিলে পথ দেখায় বলে পদে পদে
পথ ভুলি হে।

নানা কথার ছলে নানান মুনি বলে, সংশয়ে তাই দুলি হে॥
.............শত ভাগ মোর শত দিকে ধায়,
আপনা-আপনি বিবাদ বাধায়—
কারে সামালিব, এ কি হল দায়—
একা যে অনেকগুলি হে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রহ্মসঙ্গীত

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক পথ ভুলে মরো ফিরে।
খোলা আঁখি-দুটো অন্ধ করে দে আকুল আঁখির নীরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ত্যাগ (গল্পগুচ্ছ)

শ্বেত পাথরেতে গড়া
পথখানি ছায়া-করা
ছেয়ে গেছে ঝরে-পড়া বকুলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দিনশেষে (চিত্রা)

যেপথ কাছে নিয়ে আসে সেই পথই দূরে নিয়ে যায়—তাই মনে হয়, ঘরের মধ্যে নিশ্চল হয়ে মিলন স্থায়ী হয় না, পথে বেরিয়ে পড়লে তবেই পথিকের সঙ্গে বিচ্ছেদ এড়ানো যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবীন

গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ
আমার মন ভুলায় রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিত্রাণ—৪। ১

এই পথটি বহুবিস্মৃত পদচিহ্নের পদাবলী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পায়ে চলার পথ (লিপিকা)

পথ কি নিজের শেষকে জানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পায়ে চলার পথ (লিপিকা)

দেবদারুর ছায়া বেয়ে বাঁকা পথ নীরব মিনতির মতো পাহাড়কে জড়িয়ে ধরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রথম চিঠি (লিপিকা)

কলসী লয়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা—
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধূধূ,
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দিঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বধূ (মানসী)

পথ আছে শতলক্ষ, শুধু আলো নাই—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালিনী—৪

জন্তুরা পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁরা পথনির্মাতা, পথপ্রদর্শক। বুদ্ধকে যখন কোনো একজন লোক চরমতত্ত্বের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তিনি বলেছিলেন, "আমি চরমের কথা বলতে আসিনি, আমি বলব পথের কথা।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানুষের ধর্ম—দুই

বক্র শীর্ণ পথখানি দূর গ্রাম হতে
শস্যক্ষেত্র পার হয়ে নামিয়াছে স্রোতে
তৃষার্ত জিহ্বার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুখ (চিত্রা)

যাওয়া-আসার একই যে পথ
জান না তা কি অন্ধ?
যাবার পথ রোধিতে গেলে
আসার পথ বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ফুলিঙ্গ—২০৪

পথে এবার নামো সাথী
পথেই হবে এ পথ চেনা।

সলিল চৌধুরী : পথে এবার নামো সাথী

পথনাটক

পথনাটকে.....স্পষ্ট তীক্ষ্ণ যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ থাকে এবং তার দ্বারা সাধারণ মানুষের মনের অজস্র প্রশ্নের ও দ্বন্দ্বের যতটা সম্ভব স্বচ্ছ উত্তর দিয়ে মানুষকে নাটকের বক্তব্যের পক্ষে, যুক্তির পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা পথনাটকের বৈশিষ্ট্য।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : গ্রুপ থিয়েটার (৯/২)

লেনিন বলেছিলেন—'দু রকমের প্রচার আমাদের করতে হবে—প্রোপাগান্ডা এবং অ্যাজিটেশন'। প্রোপাগান্ডা হল একটা সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে মানুষকে, মানুষের আস্থা নাড়িয়ে দেয়, মানুষের অনাস্থা জাগিয়ে তোলে এই সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে। .....এই হচ্ছে প্রোপাগান্ডা। আর অ্যাজিটেশন হচ্ছে—একটা তাৎক্ষণিক ইস্যুর ওপর মানুষকে ক্রুদ্ধ করে তোলে। পথনাটিকা হচ্ছে এই অ্যাজিটেশনের অংশ।.....পথনাটিকা মানুষের ক্ষোভকে, ঘৃণাকে সংঘবদ্ধ করে।

উৎপল দত্ত : গ্রুপ থিয়েটার (৯/২)

পথনাটিকা বা পোস্টার নাটিকার একটাই উদ্দেশ্য—জনমানুষকে সরাসরি সচেতন ও উজ্জীবিত করা।

চিররঞ্জন দাস : গ্রুপ থিয়েটার (৯/২)

পথনাটক লিখতে গিয়ে নাটককারেরা সাধারণত দুটি রীতি অনুসরণ করে থাকেন। শ্রেণীসংগ্রামের মূলতত্ত্বকে স্বীকার করে তাঁরা সমাজকে ভাগ করে নেন মূল দুটি শ্রেণীতে—উৎপীড়ক ও উৎপীড়িত, পুঁজিপতি ও সর্বহারায়। একদিকে থাকেন মালিক, জোতদার, মজুতদার এবং তাঁদের তাবেদার সরকার—এক কথায় শাসকশ্রেণী। অন্যদিকে থাকেন চাষী মজুর মধ্যবিত্ত—যাঁরা সর্বহারা শ্রেণীর প্রতিভূ।

বিষ্ণু বসু : থিয়েটার ভাবনা

পথনাটকের মূল ঐতিহ্য লোকায়ত।.....এ. নাটক খুঁজতে বিদেশে যেতে হয় না, এ নাটক রয়েছে আমাদের দেশে গাঁয়ে গঞ্জের পথে-ঘাটে মেলায় পার্বণে।.....পথ নাটকের মূল উদ্দেশ্য প্রচার করা।

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় : পথনাটকের কথা

পথনাটিকা মূলত অ্যাজিটেশনের ভূমিকাই পালন করে।.....আবার পথনাটিকা যে শুধু তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হতে পারে তা নয়, সার্থকভাবে প্রস্তুত করতে পারলে দীর্ঘস্থায়ী আবেদনও সৃষ্টি করতে পারে।

শিশির সেন : গ্রুপ থিয়েটার

পথিক

পৃথিবীতে কে পথিক নহে; আমি পথিক, তুমি পথিক, রাজা পথিক, ভিখারী পথিক, সমস্ত সংসারটাই যে পথিক, যে চলে সেই পথিক।

জলধর সেন : তিহ্‌রী

আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি।
সন্ধ্যাবেলার চামেলি গো, সকালবেলার মল্লিকা
আমায় চেন কি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতপঞ্চাশিকা

পথিক মেঘের দল জোটে ওই শ্রাবণগগন-অঙ্গনে।
শোন্ শোন রে, মন রে আমার, উধাও হয়ে নিরুদ্দেশের সঙ্গ নে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতমালিকা ২

তোমার বাস কোথা যে পথিক ওগো, দেশে কি বিদেশে।
তুমি হৃদয়-পূর্ণ-করা ওগো, তুমিই সর্বনেশে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বসন্ত

পথিক যে জন পথে পথেই পায় সে পৃথিবীকে,
মুক্ত সে চৌদিকে।...........
পলে পলে পার যারা হয় মাটির পরে মাটি
প্রত্যেক পদ হাঁটি
নাইকো সেপাই, নাইকো কামান, জয়পতাকা নাহি—
আপন বোঝা বাহি........
সবার চেয়ে মানুষ ভীষণ, সেই মানুষের ভয়
ব্যাঘাত তাদের নয়।
তারাই ভূমির বরপুত্র, তাদের ডেকে কই,
তোমরা পৃথ্বীজয়ী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভ্রমণী (ছড়ার ছবি)

পদবী

যাঁরা খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন তাঁদের পদবীর [উপাধি ইত্যাদি] দরকার হয় না।

রাজশেখর বসু : ভাষার মুদ্রাদোষ ও বিকার

পদ্ম

জাগো, হে পবিত্র পদ্ম, জাগো তুমি প্রাণের মৃণালে,
চিরন্তনে মুক্তি দাও ক্ষণিকার অম্লান ক্ষমায়।
ক্ষণিকেরে করো চিরন্তন।

বুদ্ধদেব বসু : রূপান্তর

পদ্মা

বালুস্তূপে মগ্ন দীর্ঘ মাস্তুলের শিরে
দেখিনু জ্বলিছে দীপ্তি আসন্ন তিমিরে
সন্ধ্যা তারকার,
হে পদ্মা তোমার!

প্রমথনাথ বিশী : হে পদ্মা

ভয়ংকরী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মতো কৃশ নির্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তরপাড়ে জনশূন্য তৃণশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ

ধূ করিতেছে, এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসী নদীর নিতান্ত মুখের কাছে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে ; পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক-একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙিয়া ভাঙিয়া পড়িতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিশীথে (গল্পগুচ্ছ)

পদ্মা নদীর ধারে,
যে নদীর নেই কোন দ্বিধা
পাকা দেউলের পুরাতন ভিত ভেঙে ফেলতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্রপুট—১৫

হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার।
একদিন জনহীন তোমার পুলিনে,
গোধূলির শুভলগ্নে হেমন্তের দিনে,
সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান
তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পদ্মা

হেরিব অদূরে পদ্মা, উচ্চতটতলে
শ্রান্ত রূপসীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে
প্রসারিয়া তনুখানি, সায়াহ্ন-আলোকে
শুয়ে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

ভেসে যায় তরী
প্রশান্ত পদ্মার স্থির বক্ষের উপরি
তরল কল্লোলে।

বৃদ্ধ জেলে গাঁথে জাল নতশির করি
রৌদ্রে পিঠ দিয়া। উলঙ্গ বালক তার
আনন্দে ঝাঁপায়ে জলে পড়ে বারম্বার
কলহাস্যে ; ধৈর্যময়ী মাতার মতন
পদ্মা সহিতেছে তার স্নেহ-জ্বালাতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সুখ (চিত্রা)

পদ্য

সংসারে যে অনেক অভাব, অনেক জোড়াতালি!—
তার তরে ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি ;
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে,
তখন, ওহো—পদ্য লেখো হাস্য-কলোচ্ছ্বাসে।

মোহিতলাল মজুমদার ঃ গদ্য ও পদ্য

নারীকে আর পুরুষকে যেই মিলিয়ে দিলেন বিধি
পদ্য কাব্যে মানবজীবন পেল মিলের নিধি।
.....প্রোটন এবং ইলেকট্রনের যুগল মিলনেই
জগৎটা যে পদ্য তাহার প্রমাণ হল সেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মিলের কাব্য (প্রহাসিনী)

যে সময় পুরুষমানুষ কানে কুণ্ডল, হাতে অঙ্গদ পরত, পদ্য জিনিষটা সেই যুগের ; ডিমক্রাটিক যুগের জন্যে গদ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষরক্ষা ২।১

যে-সব লোকে পদ্য লেখে,
তাদের ধরে খাঁচায় রেখে।
কানের কাছে নানান সুরে,
নামতা শোনায় একশ উড়ে,
সামনে রেখে মুদীর খাতা—
হিসেব কষায় একুশ পাতা।

সুকুমার রায় : একুশে আইন (আবোল তাবোল)

পবিত্র

ভালকর্ম দেখিলে করেন প্রশংসন।
মন না মানিলে করে পবিত্র ভর্ৎসন॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত

আমার সকল অঙ্গে তোমার পরশ
লগ্ন হয়ে রহিয়াছে রজনী-দিবস
প্রাণেশ্বর, এই কথা নিত্য মনে আনি
রাখিব পবিত্র করি মোর তনুখানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য ৭৫

পবিত্রতা

পবিত্রতাই জাতির জীবনীশক্তি।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী (২)

পবিত্রতা যদি পোষাক হয় তবেই ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নূতন ও পুরাতন (স্বদেশ)

পয়সা

বাঙালি সমাজে একটি নতুন দেবী দেখা দিয়াছে। এটি পয়সা দেবী।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী : ধর্মত্যাগী বাঙালি

অত্যন্ত সাধারণ পয়সা, হাটে হাটে হাতে হাতে ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে যাওয়া, মলিন হয়ে যাওয়া পয়সা, তাম্রগন্ধী পয়সা, কুবেরের আদিম স্বরূপ, যা রূপোয় সোনায় কাগজে দলিলে নানা মূর্তি পরিগ্রহ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রকর (গল্পগুচ্ছ)

পয়সার বিনিময়ে মনের দুঃখ যে গলে জল হয়ে যায়।

সুচিত্রা মিত্র : মনে রেখো

পরচর্চা

পরচর্চা—অন্য সর্বপ্রকারে বিড়ম্বিত জীবনের একমাত্র সুখ।

প্রমথনাথ বিশী : কমলাকান্তের জল্পনা

পরের ঘরের কথা না বলাই ভালো।
কিন্তু মুখ বুজে থাকা সেও সুকঠিন,
অন্তত আমার পক্ষে—বঙ্গ জননীর
সন্তানেরা, জানোই তো, কথঞ্চিৎ পরচর্চাপ্রিয়।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী : অলঙ্কারচন্দ্রিকা (অভিনব গুপ্ত অনুসরণে)

পরনিন্দা

পরনিন্দা সমাজের কণায় কণায় যদি মিশিয়া না থাকিত তবে নিশ্চয়ই একটা বড়ো রকমের অনর্থ ঘটিত। উহা লবণের মতো সমস্ত সংসারকে বিকার হইতে রক্ষা করিতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরনিন্দা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

পরমাণু

আমরা জানি যে, বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু দিয়ে পদার্থ গঠিত। এই পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে, দশকোটি পরমাণুকে পাশাপাশি সাজালে তার মাপ হবে মাত্র এক সেন্টিমিটারের মতো। আবার ঐ ক্ষুদ্র পরমাণুর গঠন কেমন? তার গঠন হল অনেকটা সৌরজগতের মতো। সৌরজগতের মাঝখানে যেমন সূর্য আছে এবং গ্রহাদি তার চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে, পরমাণুর মধ্যে তেমন রয়েছে একটি নিউক্লিয়াস, আর তার চারপাশে ঘুরছে এক বা একাধিক ইলেকট্রন।

জয়ন্ত বসু : পদার্থ বিজ্ঞানের বিস্ময়

পরমায়ু

দীর্ঘ আয়ু হলেই পরমায়ু হয় না, আর আয়ু স্বল্প হলেও সেটা পরমায়ু হয় না এমন নয়। যার জীবন পবিত্র পরমানন্দময়, পরমায়ু হল তার।.....শক্তি চর্চা করেও মানুষ দীর্ঘায়ু হয়। রোগকে সহ্য করে, এমন কি জয় করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য-নিকেতন

পরস্বহরণ

পরস্বহরণ নিতান্ত অপকর্ম। অপকর্ম করিয়া পৃথিবীর সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া অপেক্ষা, ধর্মপথে থাকিয়া, দুঃখে কালযাপন করা ভাল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : আখ্যানমঞ্জরী-প্রথম ভাগ, ধর্মভীরুতা

পরাজয়

মর্ম চায় পরাজয়, সত্য চায় জয়,
মনুষ্যত্ব চায় নিষ্ঠুরতা।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : নর-নারায়ণ

পরিচয়

অস্তিত্ব গুটিয়ে রাখি, পরিচয় দিতে গলা কাঁপে ঃ
জোর দিয়ে বলতে পারি না এই আমিও মানুষ।
কিছুক্ষণ আগে যারা এসে দাঙ্গা করে নিয়ে গেছে
আমাদেরই মেয়ে, বউ, তারাও যে মানুষেরই কেউ!

কুমারেশ চক্রবর্তী : রাস্তা পড়ে আছে খালি ২২

প্রদীপের পরিচয় তার শিখায়, মানুষের পরিচয় তার প্রাণে।

ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতের সংস্কৃতি

মুক্ত করো ভয়, দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা

প্রভাতে এই যে দুলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোন নামধাম
আছে? এর কি শুধায় কেহ পরিচয়?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা

সজনে পাতার মত যাদের হাল্কা পরিচয়,
দুলুক খসুক শব্দ নাহি হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্মদিন (সেঁজুতি)

মানুষ বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়

যবে আমি পুছিলাম
"কী তোমার নাম"?
হাসিয়া দুলালে মাথা, বুঝিলাম তবে
নামেতে কি হবে।
আর কিছু নয়
হাসিতে তোমার পরিচয়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিদেশী ফুল (পূরবী)

উলঙ্গের কোনো পরিচয় নেই, বানিয়ে-তোলা কাপড়েই
কেউ-বা রাজা, কেউ-বা ভিখিরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

পরিচালক (নাটক)

নাট্যশিক্ষক বা পরিচালক যিনি তাঁর প্রথম ও প্রধান কাজ নাটকখানির প্রতিটি শব্দ, অর্থ, ভাব, চরিত্র তাৎপর্য বিচার ও উপলব্ধি করা, নাট্যতত্ত্বের আলোকে নাটকখানির স্বরূপ ও শ্রেণী নিরূপণ করা এবং নাট্যোপস্থাপনা রীতির পরিপ্রেক্ষিতে নাটকখানির অভিনয় সম্ভাবনা বিচার করে দেখা। এই কাজটি করতে নাট্যতত্ত্বের বিশেষ জ্ঞান অপরিহার্য।.......পরিচালককে শুধু নাটকের ভাষ্যকার হলেই চলবে না। তাঁকে নাটকের প্রয়োগকর্তা হতে হবে।......পরিচালককে প্রয়োগনিপুণ হতে হলে একদিকে তাঁকে হতে হবে আঙ্গিক-বাচিক-সাত্ত্বিক অভিনয়ে সুদক্ষ শিল্পী, অন্যদিকে তাঁকে রাখতে হবে রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যরচনা, আলোকসম্পাত, রূপারোপ প্রভৃতির পরিচয়। জানতে হবে শব্দতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, আলোকতত্ত্ব, রঙ্গমঞ্চের গঠন প্রভৃতি।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা

আমি যেহেতু থিয়েটারের লোক, তাই নাটক লেখার সময় মঞ্চটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। চরিত্রগুলো কে কোথায় দাঁড়াবে, কোন জায়গায় climax তৈরী হবে, কোন sequence এ কি ধরনের আলো ব্যবহৃত হবে, কোথায় কি ধরনের Music effect হবে— সেটা মনের পর্দায় ফুটে ওঠে। লিখতে লিখতেই অবচেতন মনে নাটক একটা production scheme তৈরী হয়ে যায়। লেখার সময় নাটকেই আমার একাগ্রতা থাকছে, কিন্তু অবচেতন মনে নাটকের প্রয়োগ-সংক্রান্ত যাবতীয় পরিকল্পনা করে ফেলি। নাটক লেখার সময় subconsciously আমার পরিচালক সত্তা কাজ করে যায়।

স্বপন দাস ঃ অন্তরঙ্গ আলাপন (অঙ্কুর)

পরিচ্ছন্ন

মনে পবিত্রতা রাখতে হলে বাইরেও পরিচ্ছন্ন থাকা প্রয়োজন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ হিমালয়ের পথে পথে

পরী

পরীদের বাস মেঘের রাজ্যে। পরীরা খুব উপকারী ও সরলপ্রাণ হয়, কখনও কারো অনিষ্ট করে না। পরী যেন স্বপ্নজগতের রানী।

শীলা বসাক ঃ বাংলার ব্রত পার্বণ

—পরী দেখা যায়?
—দেখা যায়, কিন্তু চেনা যায় না। তারা ছদ্মবেশে থাকে। কখনো কখনো যখন চলে যায় পরিচয় দিয়ে যায়, আর ধরবার পথ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরীর পরিচয় (লিপিকা)

পরোপকার

পরোপকারই জীবন, পরহিতচেষ্টার অভাবই মৃত্যু।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী (চিঠিপত্র)

পর্দা

বাবুরা যখন পূজার ছুটিতে আপনাদের কাজের সংসার হইতে দূরে পশ্চিমে হাওয়া খাইতে যান, তখন ঘরের বধূর পর্দা উঠিয়া যায়। বর্ষায় আমাদের হৃদয়-বধূর পর্দা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আষাঢ়

জগতের উপর সন্ধ্যার অন্ধকার পর্দা পড়িলে প্রণয়ীদের মধ্যে.....মনের পর্দা উঠিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা—১৭

উস্‌খুস্‌-করা মনের যত-সব এলোমেলো ইচ্ছে ভিতরের আঁধার কোঠায় ঘুর খেয়ে খেয়ে দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে বেড়ায়। এদের কথা মেয়েরা পর্দার বাইরে কিছুতে স্বীকার করতে চায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায় ২

পর্বত

প্রতি পর্বতই আপনার মহোচ্চতার গরিমাতে স্তব্ধ হইয়া পশ্চাতে হেলিয়া রহিয়াছে, কাহাকেও শঙ্কা নাই।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আত্মজীবনী

তিনটি পর্বতশ্রেণী তিনটি সভ্যতার উন্নতির স্মারকরূপে দণ্ডায়মান, হিমালয়—ভারতীয় আর্যসভ্যতার, সিনাই—হিব্রুসভ্যতার, অলিম্পাস—গ্রীকসভ্যতার।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী ১০

পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—৩৬

পর্বতমালা আকাশের পানে চাহিয়া না কহে কথা,
অগমের লাগি ওরা ধরণীর স্তম্ভিত ব্যাকুলতা। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ লেখন

পলাশি

এই কি পলাশি ক্ষেত্র? এই সে প্রাঙ্গণ?
যেইখানে,—কি বলিব?—বলিব কেমনে!
অদৃষ্টের সেই ক্রীড়া, মহা আবর্ত্তন,
মানবের এক ক্ষুদ্র কর পরশনে।
যেইখানে মোগলের মুকুটরতন

খসিয়া পড়িল আহা! পলাশির রণে?
যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে?
দুর্ব্বল বাঙ্গালি আজি, মানস নয়নে,
দেখিবে সে রণক্ষেত্র।

নবীনচন্দ্র সেন : পলাশীর যুদ্ধ (৩।১)

পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধ হয় নাই। একটা রঙ-তামাসা হইয়াছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বাঙ্গালার ইতিহাস (বিবিধ প্রবন্ধ)

পলিটিক্স (দ্র. রাজনীতি)

ভালো মানুষরা পলিটিক্স করে না। তাদের করার দরকার হয় না।......ডাকাতেরা দল করে, ভালো মানুষেরা নয়। তারা তো কিছু বাগিয়ে নিতে চায় না।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু

পৃথিবীর বড়ো বড়ো রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরী হচ্ছে সেখানে মসলাগুলো সব মিথ্যে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিখিলেশের আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

পলিটিক্সেও ধর্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চলবে না।....সত্যের জন্যে মানুষ মরে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে, তা হলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে।.....কিন্তু বিদেশ থেকে এ কী পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিখিলেশের আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

আমাদের আধুনিক পলিটিক্সের শুরু থেকেই আমরা নির্গুণ দেশপ্রেমের চর্চা করেছি, দেশের মানুষকে বাদ দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রায়তের কথা (কালান্তর)

আমাদের শাস্ত্রে বলে, সংসারটা উর্ধ্বমূল অবাক্‌শাখ। উপরের দিক থেকে এর শুরু, নীচে এসে ডালপালা ছড়িয়েছে। অর্থাৎ নিজের জোরে দাঁড়িয়ে নেই, উপরের থেকে ঝুলছে।....আমাদের পলিটিক্‌সও সেই জাতের।....এই জিনিসটি শিকড় মেলেছে উপরওয়ালাদের উপর মহলে—কি আহার কি আশ্রয় উভয়েরই জন্যে এর অবলম্বন সেই উর্ধ্বলোকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রায়তের কথা (কালান্তর)

আজ এই পলিটিক্স থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও দলাদলির বীজ প্রবেশ করছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মহাত্মা গান্ধী

পল্লী

বিশ্বকে চাই কিন্তু তাকে একটি নীড়ের ভিতরেও চাই। পল্লী সেই নীড়।

অম্লান দত্ত : সমাজ সংগঠনের পথের সন্ধান

কত গভীর তৃপ্তি যে গো লুকিয়ে আছে পল্লী-প্রাণে,
জানুক কেহ নাইবা জানুক—সে কথা মোর মনই জানে!

গোলাম মোস্তাফা : পল্লী মা

যাকে যথার্থ ধর্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পল্লীসমাজ

আমার পল্লী-রাণী,
লুপ্ত তোমার দীপ্ত গরিমা কণ্ঠে নাইকো বাণী।
গৌরবময়ী, গৌরবহীনা দাঁড়াইয়া অয়ি ভিখারিনী দীনা,
উজ্জ্বল-শ্যাম-সুন্দর দেহে পড়িয়াছে কালো ছায়া।

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ঃ পল্লী-রাণী

পল্লীসাহিত্য

পল্লীসাহিত্য হচ্ছে লোকসাহিত্যের মার্জিত ও অভিজাত সাহিত্যের অমার্জিত রূপ।.....পল্লীসাহিত্যের এক কোটিতে আছে অভিজাত সাহিত্য—অন্য কোটিতে আছে লোকসাহিত্য। অভিজাত সাহিত্য ও লোকসাহিত্য—এ দুয়ের মাঝখানে যে সাহিত্য রয়েছে তাকেই পল্লীসাহিত্য আখ্যা দিতে পারি।

প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ বাংলা কাব্যে পল্লীকবিতার ধারা

সাহিত্যের ভাণ্ডারে দান করবার মত পল্লীর নূতন সম্পদেরও অভাব নেই।

মহম্মদ শহীদুল্লাহ ঃ পল্লীসাহিত্য—বাংলা সাহিত্যের কথা

পাওনা

আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয়, সে মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৭

পাওয়া

নিজের চেষ্টার দ্বারা যতটুকু ফল পাই তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, সোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে পরশপাথরও পাওয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অবস্থা ও ব্যবস্থা (আত্মশক্তি)

হাত দিয়ে পেতে হবে কী তাহে আনন্দ—
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খাপছাড়া—সংযোজন ১৪

অনেক পাওয়ার মাঝে মাঝে কবে কখন একটুখানি পাওয়া।
সেইটুকুতেই জাগায় দখিন হাওয়া॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতপঞ্চাশিকা

সকল দাবি ছাড়বি যখন
পাওয়া সহজ হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমাল্য—৬০

ভগবান আমাদের দিতেই পারেন, কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিষও আমরা পাইনে এমনি আমাদের পোড়া কপাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে-বাইরে

যাকে আর কেউ পায় নি মানুষ তাকে পেতে চায়। তাতে যে পাওয়ার পরিমাণ বাড়ে তা নয়, কিন্তু পাওয়ার অভিমান বাড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপানযাত্রী—৫

ভোগের মধ্যে কেবলমাত্রই পাওয়া, পশুর পাওয়া ; আর সম্ভোগের মধ্যে পাওয়া না-পাওয়া দুই-ই মিলেছে, সে হল মানুষের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—১১.২.২৫

প্রীতি দিয়ে পাওয়া যায় আপন লোককে, পরকে পাওয়া যায় ভয় জাগিয়ে রেখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তধারা

শিখারে কহিল
হাওয়া,
"তোমারে তো চাই
পাওয়া।"
যেমনি জিনিতে চাহিল ছিনিতে
নিবে গেল দাবি-দাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেরকম পায় সেই আর কি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৮

পাকা

পাকা পাতাই তো ঝরবার সময় নতুন পাতাকে জাগিয়ে দিয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরূপরতন

কারও কারও মাথা পাকবার আগে মুখটা পাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রজাপতির নির্বন্ধ—৫

ভালো তলোয়ার যেমন বাঁকা
তেমনি বক্রবুদ্ধি পাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লক্ষ্মীর পরীক্ষা (কাহিনী)

পাখা

কাণ্ডটা বুঝেছি পাকা, উঠেছে তোর মরণ পাখা।

দাশরথি রায় ঃ পাঁচালী

হে হংসবলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
......বেদনার ঢেউ উঠে জাগি
সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী।......
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা-৩৬

পাখি/পাখী

পথহারা পাখী কেঁদে ফিরি একা   আমার জীবনে শুধু আঁধারের লেখা।
বাহিরে অন্তরে ঝড় উঠিয়াছে   আশ্রয় যাচি হায় কাহার কাছে!
বুঝি দুখ-নিশি মোর   হবে না হবে না ভোর,
ফুটিবে না আশার আলোক-রেখা॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাব্যগীতি

পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল।
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল॥

উঠ শিশু মুখ ধোও পর নিজ বেশ।
আপন পাঠেতে মন করহ নিবেশ॥

মদন মোহন তর্কালঙ্কার ঃ প্রভাত

পাখিদের অকারণ গান
সাধুবাদ দিতে থাকে জীবনলক্ষ্মীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আরোগ্য ২

পাখি আমার নীড়ের পাখি অধীর হল কেন জানি—
আকাশ-কোণে যায় শোনা কি ভোরের আলোর কানাকানি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কাব্যগীতি

কোন্ রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে বারে বারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা-২

পাখিরে দিয়েছ গান, গায় সেই গান।
তার বেশি করে না সে দান।
আমারে দিয়েছ স্বর, আমি তার বেশি করি দান,
আমি গাই গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা-২৮

বসন্তের পাখি গান করে, বর্ষার পাখি উড়ে চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্রাবণ গাথা

সুকোমল হাতখানি লুকাইল 'আসি
আমার দক্ষিণ করে কুলায় প্রত্যাশী
সন্ধ্যার পাখির মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বপ্ন (কল্পনা)

পাগল

ভবের পাগল নয়, ভাবের পাগল।

অন্নদাঠাকুর ঃ স্বপ্নজীবন

ওরা আমাকে পাগল ভাবে কারণ মানুষের দুঃখ দেখলে আমার চোখে জল আসে।

ধনঞ্জয় বৈরাগী ঃ আর হবে না দেরী

পাগলের কোন সমস্যা নাই, একমাত্র পাগলামি ছাড়া। সে সমস্যাও আবার প্রকৃতিস্থের কাছে। প্রকৃতিস্থ না থাকিলে সেই শেষ সমস্যাটিও নাই। কাজেই যত শীঘ্র প্রকৃতিস্থের সংখ্যা লোপ পায় পৃথিবীর ততই মঙ্গল।

প্রমথনাথ বিশী ঃ পাগলের পরিসংখ্যান

নূতন কথা যে বলে, সেই পাগল বলিয়া গণ্য হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ কমলাকান্ত

পাগল হইয়া বনে বনে ফিরি
আপন গন্ধে মম
কস্তুরীমৃগসম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ-৭

পাগল যে তুই, কণ্ঠ ভরে
জানিয়ে দে তাই সাহস করে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা ২

পাগল শব্দটা আমাদের কাছে ঘৃণার শব্দ নহে। খ্যাপা নিমাইকে আমরা খ্যাপা বলিয়া ভক্তি করি ; আমাদের খ্যাপা-দেবতা মহেশ্বর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পাগল (বিচিত্র প্রবন্ধ)

পুরুষ ও মেয়ে

আমরা চাই মেয়েদের মাধুর্য, ওরা চায় পুরুষের ঐশ্বর্য। তারই সোনালি পূর্ণতার উপরে ওদের প্রকাশের ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড্‌। প্রকৃতির এই ফন্দি পুরুষদের বড়ো করে তোলবার জন্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবিবার (তিনসঙ্গী)

পুরুষ আপন চারিদিকে জন্মায় আবর্জনা,
মেয়ে এসে নিত্য তারে করিছে মার্জনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রোগশয্যায়—১২

পুরোহিত

সঠিকভাবে পৌরোহিত্য সম্পন্ন করিতে হইলে, পুরোহিতের সংস্কৃতশাস্ত্রে পারদর্শিতা থাকা আবশ্যক,—বহু শাস্ত্র অধ্যয়নের আবশ্যক,—যোগী হওয়া আবশ্যক।

সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য : নিবেদন (পুরোহিত-দর্পণ)

পুলিশ

পুলিশ মানে নিরাপত্তা নয়, পুলিশ মানে আতঙ্ক।

অঞ্জন বসু : সংবাদ প্রতিদিন—১৩.৭.২০০২

পুলিশের চাকরি করব, আবার আলতুফালতু কয়েদিদের অনুভূতি ও যন্ত্রণায় সমব্যথী হতে হবে—এ আবার কোন দেশের আবদার?

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় : আনন্দবাজার পত্রিকা—৬.৮.২০০২

কোন কালে ব্যারিকেড নাটকে উৎপল দত্ত মশাই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, পুলিশ কখনও গুলি চালায় না, গুলি চালাতে বাধ্য হয়। অথচ দেখুন এখনও সব্বাই ভুল করে বলে—পুলিশ গুলি চালিয়েছে।

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় : মহামান্য জর্জ বুশ ...... আনন্দবাজার পত্রিকা—৩.৪.০৩

পেটানো, হেনস্থা করা, গালাগালি করা, এগুলো পুলিশী কাজের স্বাভাবিক ধারা।

আজিজুল হক : কারাগারে ১৮ বছর

চক্ষুলজ্জা থাকিলে পুলিশে চাকরী করা সুকঠিন হইবে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : স্বর্ণলতা

পুলিশের হাসি দুর্লভ।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) : শিবলাল

পুলিশ ও লোকাল ট্রেন কদাচ সময়মত আসে।

প্রমথনাথ বিশী : কমলাকান্তের জল্পনা।

এ সংসারে পূজনীয় যদি কেউ থাকে তবে সে পুলিশ, কারণ 'কুলিশ পাণি' পুলিশই এ যুগের ইন্দ্র।

প্রমথনাথ বিশী : কমলাকান্তের জল্পনা

পুলিশ লাইনে যারা চাকরি করে তারাও মানুষ এবং সেইজন্যেই তাদের sentiment থাকা বোধহয় অস্বাভাবিক কিছু নয়। **রবীন্দ্র ভট্টাচার্য** : বিচার

ঘরের খবর পাইনে কিছুই, গুজোব শুনি নাকি
কুলিশপাণি পুলিশ কোথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠি (পূরবী)

পুলিশ একবার যে চারায় অল্পমাত্রও দাঁত বসাইয়াছে সে চারায় কোনো কালে ফুলও ফোটেনা, ফলও ধরে না। উহার লালায় বিষ আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছোটো ও বড়ো (কালান্তর)

কুম্ভির যেমন খাঁজ কাটা দাঁতের মধ্যে শিকারকে বিদ্ধ করিয়া জলের তলে অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি করিয়া হতভাগ্যকে চাপিয়া ধরিয়া অতলস্পর্শ থানার মধ্যে অন্তর্হিত হওয়াই পুলিশ কর্মচারীর স্বাভাবিক ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি-শিক্ষারম্ভ।

এখন দুর্বৃত্ত আর পুলিশের মধ্যে তফাত করব কি করে?

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় : আনন্দবাজার পত্রিকা (৭.৮.২০০২)

এ্যালসেশিয়ান কুকুর এবং পুলিশ যে ড্রেসেই থাকুক (তিনি) বেশ অস্বস্তিবোধ করেন।

শংকর : খারাপ লোকের খপ্পরে।

পুলিশ যে আইনসঙ্গত খুনী, এ সত্য কে না জানে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : যাও পাখি

পুলিশের পক্ষে সবই সম্ভব। মাঝরাতে যে পুলিশ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ছাড়াই রাজনৈতিক কর্মী কোনও অধ্যাপককে অথবা কোনও সরকারি অফিসারকেও থানায় নিয়ে এসে অত্যাচার করতে পারে, তারাই আবার ঘৃণ্য খুনের আসামির পলায়নের পিছনে মদত দিতে পারে। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো আমাদের পুলিশের চিরকালের ব্যাপার। নিরীহ মানুষ তাদের ভয়ে কাঁপে, আর মস্তান দুর্নীতিবাজ খুনের আসামিরা তাদের সঙ্গে খানাপিনা চালায়। আইনের তথাকথিত রক্ষকদের চরিত্রই এমন। তাই তো এই পুলিশের দিকে অভিযোগ তুলে বলা হয়, এরাই হচ্ছে সবচেয়ে সংগঠিত অপরাধী বাহিনী।

সম্পাদকীয় : সংবাদ প্রতিদিন (১২.৯.২০০২)

পুলিশ তো পুলিশই। ইদানীং দেখছি, তারাও বাড়াবাড়ির ভুল স্বীকার করছে। অদ্ভুত, না?

সমরেশ বসু : বিবেক

নির্ব্বাচনপূর্বক সচ্চরিত্র ও কর্ম্মঠ কর্ম্মচারিদিগকে উন্নত এবং অসচ্চরিত্রদিগকে দূরীকৃত না করিলে, পুলিশ বিভাগ কখনও সংশোধিত হইবে না। দেশের গুণ্ডা ও বদমাইশ যে সকল ব্যক্তি পুলিশে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বে কেবল প্রজারই রক্ত পান ও সর্ব্বনাশ করিত, অশাসনে ক্রমেই গবর্ণমেন্টের গাত্রেও হাত দিতে আরম্ভ করিয়াছে।

হরিনাথ মজুমদার : গ্রামবার্তা প্রকাশিকা

পুষ্প

পর্বতের গাত্রেতে বিবিধ প্রকারের তৃণ-গুল্মাদি যে জন্মে তাহার শোভা চমৎকার। তাহা হইতে যে কত জাতি পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা সহজে গণনা করা যায় না। শ্বেতবর্ণ রক্তবর্ণ পীতবর্ণ নীলবর্ণ স্বর্ণবর্ণ, সকল বর্ণের পুষ্প যথা তথা হইতে নয়নকে আকর্ষণ করিতেছে। এই পুষ্প সকলের সৌন্দর্য ও লাবণ্য, তাহাদিগের নিষ্কলঙ্ক পবিত্রতা দেখিয়া সেই পরম পবিত্র পুরুষের হস্তের চিহ্ন তাহাতে বর্তমান বোধ হইল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মজীবনী

আমি সেই ছোট ছোট শ্বেত পুষ্পগুলির উপরে অখিলমাতার হস্ত পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলাম। এই বনের মধ্যে কে বা সেই সকল পুষ্পের সুগন্ধ পাইবে, কে বা তাহাদের সৌন্দর্য দেখিবে ; তথাপি তিনি কত যত্নে, কত স্নেহে, তাহাদিগকে সুগন্ধ দিয়া লাবণ্য দিয়া, শিশিরে সিক্ত করিয়া, লতাকে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তাহার করুণা ও স্নেহ

আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিল। নাথ! যখন এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পগুলির উপরে তোমার এত করুণা, তখন আমাদের উপর না জানি তোমার কত করুণা।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আত্মজীবনী

পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ 'একা কে গায় ওই?' (কমলাকান্ত)

পুষ্পধনু

ভস্ম অপমানশয্যা ছেড়ে, পুষ্পধনু।
দিকে দিকে ঘুরে বেড়াও ডন্‌জুয়ানের বেশে।
গন্ধমাদন এনে দিলে বৃথায় কে সে হনু?
হে অতনু, তনুবিহীন বেড়াও দেশে দেশে!......
ডনের প্রেত শরীরহীন ঘুরে বেড়ায় আজো
ড্রইংরুমে—হে অতনু! বীরতনুতে সাজো।

বিষ্ণু দে ঃ শিখণ্ডীর গান—কথকতা

যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু তারি ফুলে ফুলে, হে অতনু,
আমার পূজানিবেদনের দৈন্য দিয়ো ঘুচায়ে॥ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা**

পুষ্পোদ্যান

পুষ্পোদ্যান নাই দেখিয়া বুঝিয়াছি যে তোমার গৃহে নারায়ণ নাই।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ মাধবীলতা

পূজা

আমার সকল দুখের প্রদীপ জ্বেলে দিবস গেলে করব নিবেদন—
আমার ব্যথার পূজা হয় নি সমাপন॥
যখন বেলা-শেষের ছায়ায় পাখিরা যায় আপন কুলায়-মাঝে,
সন্ধ্যাপূজার ঘণ্টা যখন বাজে,
তখন আপন শেষ শিখাটি জ্বালবে এ জীবন—
আমার ব্যথার পূজা হবে সমাপন॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতপঞ্চাশিকা

জীবনে যত পূজা হল না সারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা॥
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

তোমার মোহন রূপে কে রয় ভুলে!.......
জানি গো আজ হাহারবে তোমার পূজা সারা হবে
নিখিল-অশ্রু-সাগর-কূলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতালি ১৬

তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি।
বুঝতে পারি কখন্ তুমি দাও-যে ফাঁকি।
ফুলের মালা দীপের আলো ধূপের ধোঁওয়ার
পিছন হতে পাই নে সুযোগ চরণ ছোঁওয়ার,
স্তবের বাণীর আড়াল টানি তোমায় ঢাকি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমাল্য ৮১

পূজাতে দেবতাদের বোধ হয় বড়ো একটা কিছু আসে যায় না, কেননা সেটা তাদের বৈধ বরাদ্দ। কিন্তু মানুষের নাকি ওটা অবৈধ পাওনা, এই জন্যে ঐটের লোভ তাদের অসামাল করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পাত্র ও পাত্রী-১ (গল্পগুচ্ছ)

তোমাদের পূজা পূজাই নয়, বেতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তধারা

নীরব আমার পূজা তাই,
স্তবগান নাই,
আর্দ্র স্বরে ঊর্ধ্বপানে চেয়ে নাহি ডাকে,
স্তব্ধ হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মৌন (বীথিকা)

এই সে পরম মূল্য
আমার পূজার—
না পূজা করিলে তবু
শাস্তি নাই তার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ-৩৯

পূজার্থিনী

আমাদের দেশের পূজার্থিনী মহিলা......। কি শুচিশুভ্র রূপ-সজ্জা, স্নান সেরে গরদ বা তসরের শাড়ি-পরা, ভিজা চুল—এলো করে কাঁধ বেয়ে পিঠের উপর ছড়িয়ে রাখা, এক হাতে নৈবেদ্যের থালা—চন্দন ধূপকাঠি, অপর হাতে সদ্য তোলা ফুলের সাজি,—মুখভরা স্নিগ্ধ পবিত্র ভাব। ধন-দৌলতের জৌলুস নয়, উজ্জ্বল বর্ণবিন্যাসের বিকিরণ নয়—সহজসুন্দর ভক্তি-প্লুত অপূর্ব মূর্তি।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ হিমালয়ের পথে পথে

পূরবী

রাজার প্রাসাদ হতে অতদূর বাতাসে
ভাসিছে পূরবীগীতি আকাশে।
......পরাণ কেন কে জানে উদাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দিনশেষে (চিত্রা)

দেখো না কি, হায়, বেলা চলে যায়,—
সারা হয়ে এল দিন!
বাজে পূরবীর ছন্দে রবির
শেষ রাগিণীর বীন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লীলাসঙ্গিনী (পূরবী)

পূর্ণ

পূর্ণের উৎসবে দেওয়া আর পাওয়া, একেবারে একই কথা, ঝর্ণার এক প্রান্তে কেবলই পাওয়া অভ্রভেদী শিখরের দিক থেকে, আর এক প্রান্তে কেবলই দেওয়া অতলস্পর্শ সমুদ্রের দিকপানে।........অন্তহীন পাওয়া আর অন্তহীন দেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন আবর্তন এই বিশ্ব। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবীন**

আমি চাই সেইখানে মিলাইতে প্রাণ
যে সমুদ্রে 'আছে' 'নাই' পূর্ণ হয়ে রয়েছে সমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ প্রতিষ্ঠা—পলাতকা

পূর্ণিমা

পূর্ণিমানিশীথে যবে দশদিকে পরিপূর্ণ হাসি
দূরস্মৃতি কোথা হতে বাজায় ব্যাকুল-করা-বাঁশি—
ঝরে অশ্রুরাশি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উর্বশী (চিত্রা)

দেখো দেখো, চন্দ্রমা তিথির পর তিথি পেরিয়ে আজ তার উৎসবের তরণী পূর্ণিমার ঘাটে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। নন্দনবন থেকে কোমল আলোর শুভ্র সুকুমার পারিজাতস্তবকে তার ডালি ভরে আনল। সেই ডালিখানিকে ওই কোলে নিয়ে বসে আছে কোন্ মাধুরীর মহাশ্বেতা। রাজহংসের ডানার মতো তার লঘু মেঘের শুভ্র বসনাঞ্চল স্রস্ত হয়ে পড়েছে ওই আকাশে, আর তার বীণার রুপোর তন্তুগুলিতে অলস অঙ্গুলিক্ষেপে থেকে থেকে গুঞ্জরিত হচ্ছে বেহাগের তান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবীন

মধুনিশি পূর্ণিমার ফিরে আসে বার বার,
সে জন ফেরে না আর যে গেছে চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা

আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে কী এনেছিস বল্,
হাসির কানায় কানায় ভরা কোন্ নয়নের জল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষবর্ষণ

শ্রাবণের পূর্ণিমাতে পূর্ণতা কোথায়? ও তো বসন্তের পূর্ণিমা নয়।
—বসন্ত পূর্ণিমাই তো অপূর্ণ। তাতে চোখের জল নেই কেবলমাত্র হাসি। শ্রাবণের শুক্ল রাতে হাসি বলছে আমার জিত, কান্না বলছে আমার। ফুল ফোটার সঙ্গে ফুল ঝরার মালাবদল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষবর্ষণ

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময় :
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য : হে মহাজীবন (ছাড়পত্র)

পৃথিবী

পৃথিবীর রাজপুরী খোলা চারিধার,
কোনো ঘরে চাবি নেই, মুক্ত দুয়ার।

অজিত দত্ত : পরিচয়

কাউকে হারিয়ে ফেলে হাহাকার করতে বসবে এতো সময় পৃথিবীর হাতে নেই।

আশাপূর্ণা দেবী : আদিম

পৃথিবীটা এখন উল্টোদিকে ঘুরছে। যে যত চালাক তার তত পয়সা। যে যত সাধু তার তত দুঃখু।......পয়সা হচ্ছে অথচ ঠকাচ্ছে না এমন মানুষ দেখেছিস?

মোহিত চট্টোপাধ্যায় : তোতারাম

পৃথিবীতে জন্মেছি পৃথিবীকে সেটা খুব কষে বুঝিয়ে দিয়ে তবে ছাড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐকতান (জন্মদিন ১০)

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঐকতান (জন্মদিন ১০)

পৃথিবী নিজের ধুলোমাটির জন্যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কী করবে, বেচারার নড়ে বসবার জায়গা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোড়ায় গলদ

অচল অবরোধে আবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী,
গিরিশৃঙ্গমালার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্না পৃথিবী,
নীলাম্বুরাশির অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্দ্রমুখরা পৃথিবী,
অন্নপূর্ণা তুমি সুন্দরী, অন্নরিক্তা তুমি ভীষণা।
এক দিকে আপক্বধান্যভারনম্র তোমার শস্যক্ষেত্র—
সেখানে প্রসন্ন প্রভাতসূর্য প্রতিদিন মুছে নেয় শিশিরবিন্দু
কিরণ-উত্তরীয় বুলিয়ে দিয়ে ;
অস্তগামী সূর্য শ্যামশস্যহিল্লোলে রেখে যায় অকথিত এই বাণী
'আমি আনন্দিত'।
অন্য দিকে তোমার জলহীন ফলহীন আতঙ্কপাণ্ডুর মরুক্ষেত্রে
পরিকীর্ণ পশুকঙ্কালের মধ্যে মরীচিকার প্রেতনৃত্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পৃথিবী (পত্রপুট)

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পৃথিবী (পত্রপুট)

প্রিয়া এই পৃথিবী আমাদের প্রিয়া। এই সুন্দরী পৃথিবী। সে চাচ্ছে আমাদের যা আছে সমস্তই—আমাদের হাতের স্পর্শ, আমাদের হৃদয়ের গান—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী ৪র্থ দৃশ্য

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের। তোমার মৃত্তিকা-সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল অসংখ্য রজনীদিন
যুগযুগান্তর ধরি ; আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তৃণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসুন্ধরা (সোনার তরী)

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি।
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো।
এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম,
অবাক পৃথিবী! সেলাম, তোমাকে সেলাম।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ অনুভব (ছাড়পত্র)

পেট

মন ভরানোর চেয়ে আমার সমাজে পেট ভরানোর ক্রাইসিসটাই বেশি ভয়ানক।

আবুল বাশার ঃ ফুলবউ

হৃদয়টা যাই হোক, পেটটা ছোট নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ—২

খাইট মন চিড়া খাইয়া প্যাটে বুলায় হাত।

শিবের গান (বরিশাল)

পেট আর ইজ্জত, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোনো মতেই ক্ষমা নয়।

সুবোধ ঘোষ ঃ ফসিল

পেত্নী

পিরিতের পেত্নীও ভাল। **বাংলা প্রবাদ**

পেনসন

গোলামগিরি মোলাম বটে
পেন্সন পেলে বুড়ো কালে।
সবার ভাগ্যে ঘটে কি তা?
অধিকাংশই পটল তোলে।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ঃ কেরানি-বিদায় (জঙ্গীপুর সংবাদ ১৩২২)

পেনসিল

এই দেখ পেনসিল নোটবুক এ-হাতে,
এই দেখ ভরা সব কিলবিল লেখাতে।
ভালো কথা শুনি যেই চট্‌পট্‌ লিখি তায়
ফড়িঙের কটা ঠ্যাং, আরশুলা কি কি খায় ;
আঙুলেতে আঠা দিলে কেন লাগে চট্‌চট্‌
কাতুকুত দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্‌।
দেখে শিখে পড়ে শুনে বসে মাথা ঘামিয়ে
নিজে নিজে আগাগোড়া লিখে গেছি আমি এ।
কাল থেকে মনে মোর লেগে আছে খট্‌কা,
ঝোলাগুড় কিসে দেয়? সাবান না পটকা।

সুকুমার রায় ঃ নোট বই (আবোল তাবোল)

সাত দুগুণে চোদ্দোর নামে চার, হাতে রইল পেনসিল।

সুকুমার রায় ঃ হ য ব র ল

পেয়ালা

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো,
এরই 'পরে তবে আঁখির আভাস দিয়ো হে দিয়ো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

ফুলগুলি যেন আলো পান করবার
শিল্প-করা পেয়ালা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্রপুট—৮

অযোগ্যতা হচ্ছে শূন্য পেয়ালা, কৃপা দিয়ে ভরা সহজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শোধবোধ—৩

পৈতে

স্কন্ধে ঝুলে পড়ে আছে শুধু পৈতেখানা
তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—১।১

পোকা

সবই তো পোকা, মানুষ কই? সব পিলপিল করছে।

আবুল বাশার : ডানামেলা বৃশ্চিক

হাঁপ ছাড় হ্যাঁস্‌ফ্যাঁস্ ওরকম হাঁ করে—
মুখে যদি ঢুকে বসে পোকা মাছি মাকড়ে?

সুকুমার রায় : সাবধান (আবোল তাবোল)

পোড়া

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখখানি জাগে রে!
এত লোক আছে তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগে রে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রজাপতির নির্বন্ধ—৪

যে ইঁট পাঁজায় পুড়েছে তা দিয়ে ঘর তৈরী করলে আর ঘর পোড়বার ভয় থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রজাপতির নির্বন্ধ—১০

পৌষ

পৌষে প্রবল শীত সুখী সর্বজনে।
তৈল তূলা তনূনপাৎ তাম্বুল তপনে॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে, আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে,
মরি হায় হায় হায়॥
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে—
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটির আঁচলে,
মরি হায় হায় হায়॥
....আলোর হাসি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে—
ধরার খুশি ধরে না গো, ওই-যে উথলে,
মরি হায় হায় হায়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে (গীতবিতান)

প্যাঁচা

তবুও তো প্যাঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

জীবনানন্দ দাশ : আট বছর আগের একদিন

থুরথুরে অন্ধ প্যাঁচা এসে
বলেনি কি ; ‘বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
জানায়নি প্যাঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?
চমৎকার ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার!’

জীবনানন্দ দাশ : আট বছর আগের একদিন

আউল, অর্থাৎ প্যাঁচা............পৌরাণিক, মাইথলজিকাল, ওর বয়েস নেই, কেবল আছে বিদ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুই বোন

প্যাঁচা কয় প্যাঁচানি,
খাসা তোর চ্যাঁচানি!
শুনে শুনে আন্‌মন
নাচে মোর প্রাণমন!....
তোর গানে পেঁচি রে
সব ভুলে গেছি রে—
চাঁদা মুখে মিঠে গান
শুনে ঝরে দুনয়ান।

সুকুমার রায় : প্যাঁচা আর প্যাঁচানি

প্রকাশক

প্রকাশকরা যে কি জাতীয় জীব, তাহাদের কবল হইতে লাভের কড়ি বাহির করা কত কঠিন, অধিকাংশ লেখকের তাহা অনবগত থাকিবার কথা নয়।

প্রমথনাথ বিশী : পরিহাস বিজল্পিতম (পরিশিষ্ট)

ভিক্ষা চাই না—প্রাপ্য টাকা। প্রকাশকেরা যদি এই বিবেচনাটুকু না করেন তাহলে ভাল লেখা হবে কেমন করে? সাহিত্যের উন্নতি অবনতি যে তাদেরই হাতে!......এই তো বই-এর.....প্রকাশকের ব্যবহার। এই নিয়ে আমাদের বেঁচে থাকতে হবে। ভাল লিখতে হবে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় : দিনলিপির কয়েকটি পাতা
(নন্দন মার্চ ২০০৩)

প্রকৃতি

প্রকৃতির সংস্পর্শ-বর্জিত শিক্ষা কখনও মানুষকে পূর্ণতায় পৌঁছে দিতে পারে না।

অনিন্দিতা দত্ত : *রবীন্দ্র পত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন*

প্রকৃতির কাছে এলে আমরা সবাই.......পবিত্র হই।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : ম্যাজিক

তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি প্রণাম! তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই—জীবের প্রাণনাশে সংকোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্বসুখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার!

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চন্দ্রশেখর—৮

সুন্দরী সে প্রকৃতিরে জানি আমি—মিথ্যা-সনাতনী!
সত্যেরে চাহি না তবু, সুন্দরের করি আরাধনা
কটাক্ষ-ঈক্ষণ তার—হৃদয়ের বিশল্যকরণী!
স্বপনের মণিহারে হেরি তার সীমন্ত-রচনা!

মোহিতলাল মজুমদার : পান্থ

বাহিরের এই প্রকৃতির কাছে মানুষ শিখিবে কিবা?
মায়াবিনী নরে বিপথযাত্রী করিছে রাত্রি দিবা।
চটক বা চখা কি জানে প্রেমের? বকে কি শিখাবে ধর্ম্ম?
সহজ-স্বাধীন হিংস্র শ্বাপদ বুঝাবে জীবন মর্ম্ম!
বজ্র লুকায়ে রাঙা মেঘ হাসে পশ্চিমে আন্‌মনা—
রাঙা সন্ধ্যার বারান্দা ধরে রঙিন বারাঙ্গনা!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ দুঃখবাদী

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ দুঃখবাদ

প্রকৃতির......মতো......সর্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন, অথচ সর্বদাই ক্রিয়াসক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অতিথি (গল্পগুচ্ছ)

প্রকৃতির সহিত আমাদের যেন ভাইবোনের সম্পর্ক এবং ইংরেজ ভাবুকের যেন স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক। আমরা জন্মাবধিই আত্মীয়, আমরা স্বভাবতই এক। আমরা তাহাদের মধ্যে নব নব বৈচিত্র্য, পরিসূক্ষ্ম ভাবচ্ছায়া দেখিতে পাই না, এক প্রকার অন্ধ অচেতন স্নেহে মাখামাখি করিয়া থাকি। আর ইংরাজ, প্রকৃতির বাহির হইতে অন্তরে প্রবেশ করিতেছে। যে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে বলিয়াই তাহার পরিচয় এমন অভিনব আনন্দময়, তাহার মিলন এমন প্রগাঢ়তর। সেও নববধূর ন্যায় প্রকৃতিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে, প্রকৃতিও তাহার মনোহরণের জন্য আপনার নিগূঢ় সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। সে প্রথমে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া জানিত, হঠাৎ একদিন যেন যৌবনারম্ভে তাহার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া তাহার অনির্বচনীয় অপরিমেয় আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য আবিষ্কার করিয়াছে। আমরা আবিষ্কার করি নাই, কারণ আমরা সন্দেহও করি নাই, প্রশ্নও করি নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৌন্দর্য্যের সম্বন্ধ (পঞ্চভূত)

প্রকৃতির সবুজ সেবায়
অন্তর পবিত্র হোক, মুছে যাক চক্ষের কলুষ
যার এই ধরণীর প্রতি প্রেম নেই, সেই মানুষ কখনো
নারীর প্রেমিক হতে পারে?

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ রাজসভায় মাধবী

হায় রে প্রকৃতি সনে মানবের মন
বাঁধা আছে কি বন্ধনে বুঝিতে না পারি,
নতুবা যামিনী-দিবা-প্রভেদে এমন
কেন হেন উঠে মনে চিন্তার লহরী?

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কবিতাবলী

প্রজা

পাপিষ্ঠ হইলে রাজা প্রজা সুখী নয়।
কুলধর্ম ক্রিয়া তার সব নষ্ট হয়॥

কাশীরাম দাস ঃ মহাভারত

প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী ; জমিদারেরা কস্মিনকালে কেহ নহেন—কেবল সরকারি তহশিলদার।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বঙ্গদেশের কৃষক (বিবিধ প্রবন্ধ)

সমাজের নেতৃত্ব বিদ্যাবলের দ্বারাই অধিকৃত হউক, বাহুবলের দ্বারা, বা ধনবলের দ্বারা, সে শক্তির আধার প্রজাপুঞ্জ।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বর্তমান ভারত

প্রজাপতি

প্রজাপতি! প্রজাপতি! কোথায় পেলে ভাই এমন রঙীন পাখা
টুকটুকে লালনীল ঝিলিমিলি আঁকাবাঁকা।।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাব্য-গীতি

ছেলেটির হাতে বন্দী প্রজাপতি শিশুসূর্যের মতো হাসে ;
তবু তার দিন শেষ হয়ে গেল ঃ একদিন হতই তো, যেন এই সব
বিদ্যুতের মত মৃদু ক্ষুদ্র প্রাণ জানে তার ; যতোবার হৃদয়ের গভীর প্রয়াসে
বাঁধা ছিড়ে যেতে যায়—পরিচিত নিরাশায় তত বার হয় সে নীরব।

জীবনানন্দ দাশ ঃ দেশ কাল সন্ততি

ওরে প্রজাপতি, মায়া দিয়ে কে যে
পরশ করিল্ তোরে
অস্তরবির তুলিখানি চুরি ক'রে।
বাতাসের বুকে যে চঞ্চলের বাসা
বনে বনে তুই বহিস তাহারি ভাষা,
অপ্সরীদের দোল-খেলা ফুলরেণু
পাঠায় কে তোর দুখানি পাখায় ভরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চঞ্চল (নটরাজ)

দলে দলে প্রজাপতি রৌদ্র হতে নিতেছে কাঁপায়ে
নীরব আকাশবাণী শেফালির কানে কানে বলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—৬

প্রজাপতি ভাবিয়া না পায়
কাহারে তার প্রাণ চায়,
তুলিয়া অলস পাখা দুটি
ভ্রমিতেছে ফুল হতে ফুলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিশির (সন্ধ্যাসংগীত)

কতদিন ভাবে ফুল উড়ে যাব কবে,
যেথা খুশি সেথা যাব ভারি মজা হবে।

তাই ফুল একদিন মেলি দিল ডানা—
প্রজাপতি হল, তারে কে করিবে মানা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সহজ পাঠ

প্রণতি

হে উদাসীন পৃথিবী,
আমাকে সম্পূর্ণ ভোলবার আগে
তোমার নির্মম পদপ্রান্তে
আজ রেখে যাই আমার প্রণতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট-তিন

আকাশের প্রশান্ত প্রণতি
নেমেছে মন্দিরচূড়া 'পরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানসী (সানাই)

প্রণয়

মনের ঐক্যই প্রণয়ের মূল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বাল্যবিবাহের দোষ

সংসার বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কপালকুণ্ডলা

প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কপালকুণ্ডলা

মনুষ্যে মনুষ্যে প্রণয় বৃদ্ধির জন্য কি একটা কল হয় না?

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আমার মন (কমলাকান্তের দপ্তর)

বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিশাপ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চন্দ্রশেখর

একটা জুতোর মধ্যে দুটো পা ঢোকে না, তা দুই পায়ে যতই প্রণয় থাক্।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোড়ায় গলদ—৩।২

তোমার আমার এই-যে প্রণয়
নিতান্তই এ সোজাসুজি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সোজাসুজি

প্রণাম

প্রণাম আমাদের নিজস্ব। আমাদের মাতৃদুগ্ধের সহিত সে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাচীনত্বের অজ্ঞাত ইতিহাসের সহিত সে আমাদের যোগরক্ষা করিয়া আসিতেছে।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রণাম

তুমি মহাপুরুষ, অপরাধ করবার শক্তি আমার যত, ক্ষমা করবার শক্তি তোমার তার চেয়ে অনেক বেশি। প্রভু, অসম্মান করতে বসেছি, তবু প্রণাম গ্রহণ করো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চণ্ডালিকা—১

তপন-উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,
'অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে,
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিরে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নতিস্বীকার (কণিকা)

সোনার মুকুট ভাসাইয়া দাও।
সন্ধ্যা মেঘের তরীতে।
যাও চ'লে রবি বেশভূষা খুলে
মরণ মহেশ্বরের দেউলে
নীরব প্রণাম করিতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

প্রতাপ জিনিষটা যেখানে থামে সেইখানে নিবে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভূমিকা (ঋণশোধ)

প্রতিজ্ঞা

কেউ যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, পতনে তার আসে যায় না কিছু, সে আবার উঠে দাঁড়ায়, এগিয়ে চলে আবার।

শ্রীঅরবিন্দ : শ্রীঅরবিন্দ ও তাঁর বাণী

ইলিশ মাছ অমনি দিব্যি থাকে, ধরলেই মারা যায়—প্রতিজ্ঞাও ঠিক তাই, তাকে বাঁধলেই তার সর্বনাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রজাপতির নির্বন্ধ—১

প্রতিবাদ

আমার প্রতিবাদের ভাষা
আমার প্রতিরোধের আগুন
দ্বিগুণ জ্বলে যেন দ্বিগুণ।

সলিল চৌধুরী : গান—আমার প্রতিবাদের ভাষা

প্রতারণা

কোনও শাস্ত্রেই খুড়র প্রকৃতরূপ বিদ্যা ও ব্যুৎপত্তি নাই; কেবল লোকের চক্ষে ধূলিপ্রক্ষেপ করিয়া, দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছেন।.......
প্রতারণা করিবার ক্ষমতা থাকিলে বিদ্যার প্রয়োজন করে না ; কারণ, বিদ্যা না থাকিলেও, প্রতারণা বলে, অনেকে বিদ্বান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। আর, প্রতারণা করিবার ক্ষমতা না থাকিলে, বিদ্যায় কোনও ফল নাই ; কারণ, ধূর্ত ও চালাক না হইলে, যথার্থ পণ্ডিত ব্যক্তিও, বিদ্বান বলিয়া, প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : আবার অতি অল্প হইলে

প্রতিবেশী

যাই কেন বলুক না প্রতিবেশী নিন্দুক
খুব কষে আঁটা যেন থাকে তব সিন্দুক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিণয়মঙ্গল

প্রতিবেশীর কাছে মই চেয়ে দেখেছি, বলেছেন সিন্দুকে আছে। জাল চেয়ে দেখেছি, বলেছেন জালে সরষে বাঁধা আছে। বিপন্ন আত্মীয়কে মধ্য রাতে হাসপাতালে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি চেয়ে দেখেছি, বলেছেন ড্রাইভারের কাছে চাবি, ওঃ অফুলি সরি, গামছা দিয়ে বেঁধে রাখুন, পরাণটাকে যদি বেঁধে রাখা যায় জীবনটাকেও এক রাত বেঁধে রাখা যাবে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

বঙ্গবাসীমাত্রই সজ্জন ; বঙ্গে কেবল প্রতিবাসীরাই দুরাত্মা। যাহা নিন্দা শুনা যায় তাহা·

কেবল প্রতিবাসীর। প্রতিবাসীরা পরশ্রীকাতর, দাম্ভিক, কলহপ্রিয়, লোভী, কৃপণ, বঞ্চক। তাহারা আপনাদের সন্তানকে ভাল কাপড়, ভাল জুতা পরায়, কেবল আমাদের সন্তানকে কাঁদাইবার জন্য।.....যাহাদের প্রতিবাসী নাই, তাহাদের ক্রোধ নাই। তাহাদেরই নাম ঋষি। ঋষি কেবল প্রতিবাসী-পরিত্যাগী গৃহী। ঋষির আশ্রম পার্শ্বে প্রতিবাসী বসাও, তিন দিনের মধ্যে ঋষির ঋষিত্ব যাইবে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পালামৌ

প্রতিভা

প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানরা কথাটা মেনে নেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ কেন লিখি

কাজের তারতম্য আছে। দক্ষতারও তারতম্য আছে। প্রতিভা ওই দক্ষতা অর্জনের বিশেষ ক্ষমতা। কোন বিশেষ প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মায় না।.....প্রতিভাও তো জনসাধারণের সম্পত্তি। জনসাধারণ না থাকলে কারখানার উৎপাদনের যেমন মানে হয় না, প্রতিভার উৎপাদনও তেমনি অর্থহীন হয়ে যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ প্রতিভা

অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা। প্রতিভা সেই শক্তিকেই বলে, যে শক্তির মূল আপনারই আনন্দের মধ্যে ; বাহিরের নিয়ম বা তাড়না বা প্রলোভনের মধ্যে নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধর্মের অর্থ (সঞ্চয়)

.....যাহার তার ছিঁড়িয়া যায় সে হয় উন্মাদ, আর যাহার তার অশ্রুতপূর্ব সুরে বাজিয়া উঠে সে হইল প্রতিভাবান। পাগলও দশের বাহিরে, প্রতিভাবানও তাই ; কিন্তু পাগল বাহিরেই থাকিয়া যায়, আর প্রতিভাবান দশকে একাদশের কোঠায় টানিয়া আনিয়া দশের অধিকার বাড়াইয়া দেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পাগল (বিচিত্র প্রবন্ধ)

পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস

প্রতিভার মস্ত দায়িত্ব। ওতো কারও নিজের জিনিষ নয়। ওর জবাবদিহি অনন্তকালের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ল্যাবরেটরি

প্রত্যেক বড় শিল্পী শুধু জ্ঞানযোগী ও ভক্তিযোগীই নন, কর্মযোগীও বটেন, অর্থাৎ জ্ঞান-ভাব-কর্ম শক্তির সমবায়েই বড় প্রতিভা গঠিত। প্রতিভা 'আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' কোন কিছু নয় ; প্রতিভা কোন অলৌকিক শক্তির প্রেরণা নয়, প্রতিভা সাধারণ মানুষেরই এক বা একাধিক বৃত্তির বিশেষ স্ফূর্তি। প্রতিভা যে অলৌকিক শক্তির কোন কৃপামাত্র নয়, প্রতিভাও সাধনসাপেক্ষ।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ নাটক লেখার মূলসূত্র

বুদ্ধির নূতন নূতন যে উন্মেষ তাহার নাম প্রতিভা।

হরপ্রসাদ রায় ঃ পুরুষ পরীক্ষা

প্রতিমা

প্রতিমা দিয়ে কি পূজিব তোমারে এ নিখিল বিশ্ব তোমারই প্রতিমা।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ গান

বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বন্দে মাতরম (আনন্দমঠ)

যত দিন বাঁচি,
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পূজিব
ও প্রতিমা, নিত্য যথা আইলে রজনী,
সরসী হরষে পূজে কৌমুদিনী ধনে।

মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য

মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা করতে করতে সত্যের রূপ উদ্দীপন হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

প্রতিমার পূজা হয়, আর জীয়ন্ত মানুষের কি হয় না?

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

প্রতীক্ষা

নত শিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান্ধারীর আবেদন (কাহিনী)

বিলম্ব নাহিক তব, নাহি তব ত্বরা—
প্রতীক্ষা করিতে জান। শতবর্ষ ধরে
একটি পুষ্পের কলি ফুটাবার তরে
চলে তব ধীর আয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—৩৯

প্রত্যয়

বাক্যের ঝড় তর্কের ধুলি
অন্ধবুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে আপনার মাঝে—
নাহি তার কোনো ত্রাস। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—১১**

কিপ্‌টেমো ছিবলেমো ছেলেমো জ্যাঠামো ঠ্যাটামো ফাজ্‌লেমো বিট্‌লেমো পেজোমো হ্যাংলামো বোকামো বাঁদরামো গোঁড়ামো মাৎলামো গুণ্ডামো।.....গাল-বর্ষণের জন্যেই যেন পাঁকের পিণ্ড জমা করা হয়েছে।.......একটা প্রত্যয় দিয়ে বিশেষ করে মনের ঝাল মেটাবার উপায় বোধ করি আর-কোনো ভাষাতেই নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলাভাষা-পরিচয়

প্রত্যক্ষ

পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়।.....কখনও ত এ পর্যন্ত পরমেশ্বরকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম না। আপনারা বোধ হয় আইনের চশমা নাকে দিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পারেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কমলাকান্তের জোবানবন্দী (কমলাকান্ত)

......স্বদেশের সমস্ত দুঃখদুর্গতিদুর্বলতা ভেদ করিয়াও একটা মহৎ সত্যপদার্থকে প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে পাইত—সেইজন্য দেশের দারিদ্র্যকে কিছুমাত্র অস্বীকার না করিয়াও সে দেশের প্রতি এমন একটি বলিষ্ঠ শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা—১১

প্রদীপ

প্রদীপের এই এক অনিবার্যতা—আলোর কেন্দ্রেই দাহ থাকে।

অমিয়ভূষণ মজুমদার : রাজনগর

অনিমেষে
যে প্রদীপ জ্বলে তব শয্যাশিরোদেশে
সারা সুপ্তনিশি, সুরনরস্বপ্নাতীত
নিদ্রিত শ্রীঅঙ্গ-পানে স্থির অকম্পিত
নিদ্রাহীন আঁখি মেলি—সে প্রদীপখানি
আমি জ্বালাইয়া দিব গন্ধতৈল আনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আবেদন (চিত্রা)

আমার প্রদীপখানি অতি ক্ষীণকায়া,
যতটুকু আলো দেয় তার বেশি ছায়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আশীর্বাদ (গীতালি)

স্থির থাকো তুমি, থাকো তুমি জাগি
প্রদীপের মতো আলস তেয়াগি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গুরু গোবিন্দ (কথা)

নিবিয়া বাঁচিল নিশার প্রদীপ
উষার বাতাস লাগি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লজ্জিতা (কল্পনা)

মাটির প্রদীপ সারা দিবসের অবহেলা লয় মেনে,
রাত্রে শিখার চুম্বন পাবে জেনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

কুটিরতলে দিবস হলে গত
জ্বলে প্রদীপ ধ্রুবতারার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভর্ৎসনা (ক্ষণিকা)

প্রপঞ্চ

প্রপঞ্চ সকলি ;
মহাকাল করে খেলা পঞ্চভূত ল'য়ে,
ভাঙ্গে গড়ে ইচ্ছামত তার।
করি দেব-দৃষ্টি দান!

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : জনা ৫/৩

এ মায়া প্রপঞ্চময় ভবের রঙ্গমঞ্চ মাঝে
রঙ্গের নট নটবর হরি যারে যা সাজান সে তাই সাজে।

শাক্ত পদাবলী

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ এক বিশেষ প্রকরণের গদ্য রচনা, যাহা লেখকের মননশীলতার কাঠামোর উপর

যুক্তি এবং রসের আয়তন প্রতিষ্ঠা করিয়া পাঠকের সম্মুখে তত্ত্ব ও তথ্যের বিচার করার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়। যেসব প্রবন্ধে যুক্তিমালার বিন্যাস প্রবলতর সেগুলি বুদ্ধিসাপেক্ষ ; রসানুভূতির আবেদন যেগুলিতে প্রখরতর, সেগুলি রম্যরচনারূপে গণনীয়।

পল্লব সেনগুপ্ত ঃ ভারতশেষ

এসব কাজের আম্মো জানিএ প্রবন্ধ।

বড়ু চণ্ডীদাস ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

বস্তু-প্রধান-মনন ভূয়িষ্ঠ গদ্য রচনাকেই একালে প্রবন্ধ নামে অভিহিত করা হয়।

ভূদেব চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য়)

প্রবন্ধ নিঃসন্দেহে মননমূলক। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখেও বলা যায়, প্রবন্ধে মননেরই একাধিপত্য। তথ্য ও বিশ্লেষণ সহযোগে কোনো একটি চিন্তা পরিস্ফুট করাই প্রবন্ধের আশু উদ্দেশ্য।

লিলি দত্ত ঃ জীবনশিল্পী মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাহ

দাও সেই
প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহূর্তেই
জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া
উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

প্রবীণ

ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—১

প্রবৃত্তি

প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করে রচেছ আমায়
নির্মম বিধাতা মম! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার!
মনে করি, মুক্ত হব ; মনে ভাবি, রহিতে দেব না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।

বুদ্ধদেব বসু ঃ বন্দীর বন্দনা

......প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডার্ন্। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড়ো জানাটা মডার্ন্ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সন্দীপের আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

সমস্ত ঘরে আগুন লাগাইয়া দিয়া কেহ সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালায় না।......প্রবৃত্তিসম্বন্ধেও সেকথা খাটে। প্রবৃত্তিকে যদি একেবারে পুরামাত্রায় জ্বলিয়া উঠিতে দিই, তবে যে সৌন্দর্যকে কেবল রাঙাইয়া তুলিবার জন্য তাহার প্রয়োজন তাহাকে জ্বালাইয়া ছাই করিয়া তবে সে ছাড়ে ; ফুলকে তুলিতে গিয়া তাহাকে ছিঁড়িয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৌন্দর্যবোধ (সাহিত্য)

প্রভাত

প্রভাত, জগতের আশা, আশ্বাস, প্রতিদিবসের নান্দী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথপ্রান্তে—(বিচিত্র প্রবন্ধ)

আজ বুকের বসন ছিঁড়ে ফেলে
দাঁড়িয়েছে এই প্রভাতখানি,

আকাশেতে সোনার আলোয়
ছড়িয়ে গেল তাহার বাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিকাশ—(খেয়া)

প্রভাত কি রাত্রির অবসানে।
যখনি চিত্ত জেগেছে, শুনেছ বাণী,
তখনি এসেছে প্রভাত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শুচি (পুনশ্চ)

প্রভু

খেলিছ এ বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয় সৃষ্টি তব পুতুল খেলা, নিরজনে প্রভু নিরজনে।।
শূন্যে মহা আকাশে (তুমি) মগ্ন লীলা-বিলাসে
ভাঙিছ গড়িছ নিতি ক্ষণে ক্ষণে॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (ভক্তি-গীতি)

মানুষ প্রভুত্ব করতে পারে দুটো উপায়ে—এক, ভালবাসা দিয়ে মন জয় করে। দুই আস্ফালনের দ্বারা ভীতি উৎপাদন করে। প্রথমটা দুরূহ, কৃচ্ছ্র সাধনের পথ—বড্ড বেশী sacrifice করতে হয়, প্রাণ পর্যন্ত। যেমন ধরুন Jesus Christ! দ্বিতীয়টা Short cut রাস্তা। very effective.

নিরূপ মিত্র : আততায়ী

প্রভু আমার, প্রিয় আমার পরম ধন হে।
চিরপথের সঙ্গী আমার চিরজীবন হে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতলিপি (গীতবিতান)

প্রভেদ

প্রভু, তোমার বীণা যেমনি বাজে
আঁধার-মাঝে
অমনি ফোটে তারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতলেখা (গীতবিতান)

প্রভেদেরে মান যদি ঐক্য পাবে তবে,
প্রভেদ ভাঙিতে গেলে ভেদবৃদ্ধি হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

প্রমাণ

পিঠে কিল মেরে সেটাকে কিল প্রমাণ করতে মহামহোপাধ্যায়ের দরকার হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গল্পসল্প—বাচস্পতি

—কার্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন। তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।
—লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দুটিমাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিনজোড়া মুখ।
—এর থেকে প্রমাণ হয় আমাদের আর্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিনগুণ বেশি বলেই জানতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরকুমার সভা—২।২

সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজনের গরমিল হইল সেই তো মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি তো

কেহ সত্য হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া এককে মাপা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

ওদের সবচেয়ে বড়ো পণ্ডিত........প্রচার করেছেন, কথা বলেই মানুষ মরে। তিনি সংখ্যাগণনায় প্রমাণ করে দিয়েছেন, যারা কথা বলত সবাই মরেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—২

যার দ্বারা নিশ্চয়জ্ঞান হয় অর্থাৎ বিশ্বাস উৎপন্ন হয় তার নাম প্রমাণ।

রাজশেখর বসু ঃ বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি

প্রমাদ

চাঁদিনী যামিনী, মধু সমীরণ
আধো ঘুমঘোর, আধ জাগরণ,
চোখোচোখি হতে ঘটালে প্রমাদ।
কুহুস্বরে পিক গাহিয়া—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মায়ার খেলা—৪

প্রলয়

দরজায় কড়া নাড়ছে কে?
প্রলয়
আমরা আসছি।
কারা?
ঘাম বেচে খায় যারা
কারা যায়?
যারা জমায়।

অনিল সরকার ঃ আগামী শতাব্দী (ব্রাত্যজনের কবিতা)

তুমি লাস্যের চকিতে
বশ করেছো মৃত্যুকে, হে মৈত্রেয়ী প্রলয়!

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ নর্তকী

নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রথের রশি (কালের যাত্রা)

প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ অনেক সময় নেয়; সে এত সময় যে মনে হয়, ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই। কিন্তু মাটির উপর একবার যেই এতটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অমনি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে; তখন তাকে কোনোমতে আঁচল দিয়ে, বুক দিয়ে, প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিমলার আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে,
হে নটরাজ, জটার বাঁধন পড়ল খুলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তপতী

ওরে মন, ছাড়ো লোভ, ছাড়ো শোক, ছাড়ো ভয়।
সৃষ্টি নদী, ধারা তারি নিরন্তর প্রলয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধাবমান (পরিশেষ)

জলের ছায়া সে দ্রুত তালে বয়,
কঠিন ছায়া সে ঐ লোকালয়,
একই প্রলয়ের বিভিন্ন লয়
স্থিরে আর অস্থিরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পলায়নী-সেজুতি

প্রলয় তো বিধাতার চরম আনন্দ!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—৪।১

প্রসন্ন

কীর্তির দাবি করি না কিছুই
তীর্থই শুধু কৃত্য
মৃত্যুও যেন শেষ এসে দেখে
প্রসন্ন আছে চিত্ত॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : কীর্তি

প্রসন্ন হইল সর্ব জগতের মন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত

বিদায় নেবার সময় এবার হল—
প্রসন্ন মুখ তোলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্যামা

প্রসাধন

রূপ যেখানে আছে, প্রসাধনের সাধনা সেখানে না থাকিয়া যায় না।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রাচ্য প্রসাধন কলা

আমাদের প্রসাধন কলা প্রকৃতির সহিতও নানাভাবে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রাচ্য প্রসাধন কলা

প্রসাধন সাধনে চতুরা,
জানে সে ঢালিতে সুরা
ভূষণভঙ্গিতে
অলক্তের আরক্ত ইঙ্গিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নাম্নী—নাগরী (মহুয়া)

প্রহসন

প্রহসন (Farce)। প্রহসনের হাস্যরস সম্পূর্ণ ঘটনাগত এবং এতে কৌতুকরসেরই দুর্দমনীয় প্রাবল্য দেখা যায়। ঘটনার বাহ্য উদ্ভটত্ব, আকস্মিকতা ও অতিরঞ্জনই প্রহসনের প্রধান লক্ষণ। প্রহসনের মধ্যে চিন্তার কিংবা অনুভূতির স্থান নেই।....হিউমার থাক, আর ব্যঙ্গই থাক, প্রহসনের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু প্রবল ও অনর্গল কৌতুক সৃষ্টি করা।

অজিতকুমার ঘোষ : নাটকের কথা

প্রহসনের উদ্দেশ্য নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি। Satire থাকলেও তা humour-এ পর্যবসিত হয়।.....লঘু ঢঙে সংলাপের মাধ্যমে রচিত সংক্ষিপ্ত নাটক হল প্রহসন।

অশোককুমার মিশ্র : বাংলা প্রহসনের ইতিহাস

প্রাইভেট টিউটর

কোন ছেলে কোন বিষয়ে backward অর্থাৎ কাঁচা,—অমনি প্রাইভেট টিউটর লাগাও—

ইংলিশে একটি, সংস্কৃতে একটি, সব বিষয়ে একটি একটি। টিউটরের ঠ্যালায় বেচারি ছাত্র একবারে dull অর্থাৎ গাধা হয়ে ওঠে। নিজে ভাববার বা নিজের উপর নির্ভর করবার শক্তি তার একেবারে লোপ পায়।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় : অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ

প্রাচীন

....মনের পক্ষে প্রাচীন হয়ে উঠতে বয়সের দরকার হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন—১

ধূলিজঞ্জালের অপেক্ষা প্রাচীন পদার্থ মেলাই কঠিন ; তাই বলিয়া সেইটেই সবচেয়ে সত্য হইল, আর.......যে.......তাহাকে ক্রমাগত ধৌত করিতে চেষ্টা করিতেছে তাহাকেই কি মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পঞ্চভূত। সৌন্দর্যের সম্বন্ধ

প্রাণ

প্রাণই বহ্নি, বস্তুজগতের ঘটনাগুলি তার সমিধ, চিন্তা তার শিখা। চিন্তাই তো চৈতন্যকে প্রকাশ করে। চৈতন্য ওই শিখার দীপ্তিজ্যোতি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : বিচারক

শাস্ত্রে আছে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'। তাই প্রতিবাসীর গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুড়কো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালকার ছেলেরা সব হইল কি। পরের জন্য প্রাণ সমর্পণ! পাঁচ বৎসরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ! এ সকলই কলির মাহাত্ম্য!

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় : বীরবালা

গ্রাসাচ্ছদনের পর প্রাণ-চৈতন্যের উত্তরণ-পর্ব শুরু হবে।

বিজন ভট্টাচার্য : দেবী গর্জন

প্রাণের দুঃখ না যাক কিন্তু যাবে দুঃখের প্রাণ।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : ঘুমের ঘোরে—১

প্রাণ যতই কমে খাদ্যের মধ্যে তার পরিমাণ ততই বেশি হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন—৩

এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ তরঙ্গমালা রাত্রিদিন ধায়
সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্বদিগ্‌বিজয়ে,
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে লয়ে
নাচিছে ভুবনে ; সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে—বরষে বরষে
বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যুসমুদ্রদোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাঁটায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—২৬

নিজের মধ্যে মানুষের প্রাণটা নানা ভাবনায় ঘোলা হয়ে গেছে। তাই, প্রাণের বিশুদ্ধ রূপটি দেখতে হলে চাইতে হয় ঐ ঘাসের দিকে, ঐ গাছের দিকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রাণমন—৪ (লিপিকা)

নবীন প্রাণ এবং প্রবীণ ভয়, জীবের মধ্যে উভয়েই কাজ করিতেছে। ভয় বলিতেছে, 'রোস রোস,' প্রাণ বলিতেছে, 'দেখাই যাক-না।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিবেচনা ও অবিবেচনা (কালান্তর)

প্রাণ জাগিলেই কাহারও পরামর্শ না লইয়া আপনি সে চলিতে প্রবৃত্ত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিবেচনা ও অবিবেচনা (কালান্তর)

এ প্রাণ, রাতের রেলগাড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাতের গাড়ি (নবজাতক)

অনিঃশেষ প্রাণ
অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান,

……………………………………

মৃত্যুর কবলে লুপ্ত নিরন্তর ফাঁকি—
তবু সে ফাঁকির নয়, ফুরাতে ফুরাতে রহে বাকি ;
পদে পদে আপনারে শেষ করি দিয়া
পদে পদে তবু রহে জিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রোগশয্যায়—২

প্রাণের একটি রং আছে।.....তা কোমলতার রং।......যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল।........শরতের রংটি প্রাণের রং। ....প্রাণ জিনিষটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই;......প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে,।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শরৎ—পরিচয়

প্রাথমিক

প্রাথমিক স্তর মানুষের জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। এর ওপরেই গড়ে উঠবে উচ্চশিক্ষার এবং মনুষ্যত্বের ইমারত।
বিবেকানন্দের ভাষায় প্রাথমিক স্তর থেকেই 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত' করা উচিত। তবেই তারা বড় হয়ে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হতে শিখবে।

নার্গিস সাত্তার : শিশু শিক্ষক চিন্তা

প্রার্থনা

প্রার্থনা সাধনার বিশেষ অঙ্গ। প্রার্থনার শক্তি অমোঘ। প্রার্থনায় জীব ও জগতের প্রাণ অবস্থিত। যখন যা প্রাণে আসে তাঁকে জানাবে আর সরল ও ব্যাকুল হয়ে তাঁর প্রতি শরণাগতি প্রার্থনা করবে।

আনন্দময়ী মা : পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা (গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী)

প্রার্থনা করো—যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটী মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ।

কাজী নজরুল ইসলাম : আমার কৈফিয়ৎ (সর্বহারা)

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে
নাই বা দিলে সান্ত্বনা,
....দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।

দুখের রাতে নিখিল ধরা
যেদিন করে বঞ্চনা
তোমারে যেন না করি সংশয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৪

বরষি অমৃতরাশি বুদ্ধ শুধালেন হাসি,
'কহো বৎস, কী তব প্রার্থনা।'
ব্যাকুল সুদাস কহে, 'প্রভু আর কিছু নহে,
চরণের ধূলি এক কণা'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মূল্যপ্রাপ্তি (কথা)

ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে, শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব'!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যেতে নাহি দিব (সোনার তরী)

কেবল তাঁকে প্রার্থনা কর, আন্তরিক প্রার্থনা—হে ঈশ্বর, তোমার এই ভুবনমোহিনী মায়ার ঐশ্বর্য—আমি চাই না—আমি তোমায় চাই'। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করতে হয়। আন্তরিক হলে তিনি প্রার্থনা শুনবেনই শুনবেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

খুব কম লোক বলছে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে কোনও ফল হয়েছে। মিনিস্টারের কাছে চিঠি লেখা এবং ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা এক কথা।

শংকর ঃ যাবার বেলায়

প্রিয়া

মোর প্রিয়া হবে, এস রাণী।
দিব খোঁপায় তারার ফুল।......
আমার গানের সাত সুর দিয়া
তোমার বাসর রচিব প্রিয়া,
তোমারে ঘিরিয়া গাহিবে আমার
কবিতার বুলবুল॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান (কাব্যগীতি)

প্রথম যখন বিয়ে হল
ভাবলাম বাহা বাহা রে।
কি রকম যে হয়ে গেলাম,
বলবো তাহা কাহারে।.....
শঙ্কা হত প্রিয়া পাছে
কখন করে অভিমান,
উর্ব্বশীর ন্যায় পেখম তুলে
হাওয়ার সঙ্গে মিশে যান।....
দেখলাম পরে প্রিয়ার সঙ্গে
হলে আরো পরিচয়,

উর্ব্বশীর ন্যায় মোটেই প্রিয়ার
উড়ে যাবার গতিক নয়
বরং শেষে মাথার রতন
লেপ্টে রইলেন আঠার মতন
বিফল চেষ্টা বিফল যতন
স্বর্গ হতে হল পতন—
রচেছিলাম যাহারে
—ভাবলাম বাহা বাহা রে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ হাসির গান

আমার প্রিয়ার ছায়া
আকাশে আজ ভাসে, হায় হায়।
বৃষ্টিসজল বিষণ্ণ নিশ্বাসে, হায় হায়॥
আমার প্রিয়া মেঘের ফাঁকে ফাঁকে
সন্ধ্যাতারায় লুকিয়ে দেখে কাকে,
সন্ধ্যাদীপের লুপ্ত আলো স্মরণে তার আসে, হায়॥
আমার প্রিয়া ঘন শ্রাবণধারায়
আকাশ ছেয়ে মনের কথা হারায়॥
আমার প্রিয়ার আঁচল দোলে
নিবিড় বনের শ্যামল উচ্ছ্বাসে,—হায়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

অশোক-কুঞ্জ উঠত ফুটে
প্রিয়ার পদাঘাতে,
বকুল হত ফুল্ল প্রিয়ার
মুখের মদিরাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সেকাল (ক্ষণিকা)

প্রেত

পিশাচেরা আর পিশাচসিদ্ধ দলে উদ্বায়ু সন্ত্রাসে
ছেয়ে গেল দেশ.......
এই প্রেতলোক ভাঙতে তো হবে স্বপ্নের হলাহলে
সে সূর্যোদয়ে তুমিই তো ফুল।

বিষ্ণু দে ঃ এল সিনোরে (অন্বিষ্ট)

প্রেম

অভিধানে দুটি ছোট কথা
প্রেম আছে প্রীতিও
প্রথমটিতো কবেই খতম
বাকি শুধু দ্বিতীয়।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ দ্বিতীয়

প্রেমের দেবতা কোথায় কার জন্য ফাঁদ পাতিয়া রাখে কেউ কি বলিতে পারে?......কার সঙ্গে কার জোড়বাঁধা হইয়া থাকে তাও কেউ বলিতে পারে না। যাকে জীবনে কখনো দেখি নাই হঠাৎ একদিন তাকে দেখিয়া মনে হয় সে যেন চিরজনমের আপন। প্রেমের দেবতা অলক্ষ্যে কার সঙ্গে কখন কার গাঁটছাড়া বাঁধিয়াছেন কেউ জানে না।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ ঃ তিতাস একটি নদীর নাম

বইতে পারি না আমি এই গুরুভার
এত প্রেম কেন দিলে এতটুকু প্রাণে।
প্রেম জাগে দুনয়নে, প্রেম জাগে ঘ্রাণে
প্রেম জাগে তৃষাতুর হৃদয়ে আমার।

অরুণকুমার সরকার ঃ রিখিয়ায়

প্রেমিক মাত্রেই জানেন প্রেমের আঘাতের মধ্যেও তীব্র আনন্দ এবং আনন্দের মধ্যেও মর্মান্তিক বেদনা ওতপ্রোত ভাবে জড়ানো রয়েছে। প্রেমানুভূতিও প্রকৃত পক্ষে সুখ দুঃখ হর্ষবিষাদাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য বা বোধগম্য নয়, অন্য পর্যায়ের অনুভূতি সে। তাই তো প্রেমের বর্ণালীকে সঠিক বর্ণনা করবার ভাবনা খুঁজে পাই না আমরা, মনোবিজ্ঞানের সূক্ষ্মতর পরিভাষাও তার উপলব্ধ ঐশ্বর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে দিশা হারায়। কোনো অবুঝ সখীর কৌতূহলী প্রশ্ন যদি নিতান্তই নাছোড়বান্দা হয়ে ওঠে তবে এ ছাড়া কী-ই বা বলবার থাকে—

সখী কী পুছসি অনুভব মোয়।
সেই পিরীতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়।

আবু সয়ীদ আইয়ুব ঃ কবিতা ও প্রেম (পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা)

প্রেম যুদ্ধের মতো, নীতি মানে না।

আবুল বাশার ঃ আমার মতো একটা লোক

প্রেম একটা সোনামুঠি, তাকে বাঁধতে জানতে হয়।

আবুল বাশার ঃ হাওয়া একটা সংকেত

প্রতিদিনের হিসেব-নিকেশের জীবনে আর যাই হোক রোমান্টিকতা থাকে না। প্রেম যায় পালিয়ে।

কণা বসু মিশ্র ঃ নীলাঞ্জনা (বন্ধ দরজা)

প্রেম মৃত্যুঞ্জয়, প্রেম অমৃত, প্রেম গঙ্গাসাগরসঙ্গম। ওতে যে ডুবতে পারে তার মৃত্যু নেই, সে অমর, তার সকল মনস্কামনা পূর্ণ হয়—অপূর্ণ থাকে না। অশুচিকে শুচি করে, মর্ত্যকে স্বর্গ করে সকল গ্লানি নাশ করে।.....মানুষকে ভালবাসলাম, যে মানুষে আর ভগবানে ভেদ রইল না, আমার ভগবানকে ভালবাসা হয়ে গেল। জীবনে যাকে পাইনি মরণে তাকে পাবই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নিশিপদ্ম

তারেই বলে প্রেম—
যখন থাকে না future এর চিন্তা
থাকে নাক shame,—
তারেই বলে প্রেম।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ হাসির গান

জগতে যতই অপ্রেম বাড়ছে, প্রেম নিয়ে বাড়াবাড়ি ততই বাড়ন্ত। প্রেম এখন খুবই টপিকাল বিষয়।

নবনীতা দেবসেন ঃ ভালোবাসা কারে কয়

ছেলেবেলা থেকে প্রেম সম্বন্ধে আমরা যে আইডিয়া করেছিলাম প্রকৃত প্রেম করতে গিয়ে দেখলাম আইডিয়া এবং বাস্তবে অনেক তফারেন্স.....। আমার অভিজ্ঞতায় আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে প্রেম হল কুলের আচার যাহা চুষিতে ভালো কিন্তু, গিলিতে গলায় বাধে।

নিরূপ মিত্র ঃ পয়মন্ত কুমার (শ্রুত সংলাপ)

জানি মৃত্যু সীমাহীন, তবু প্রেম চির অনশ্বর।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় ঃ তথাপি (দর্পণে অনেক মুখ)

তুমি মোরে দিয়েছ কামনা, অন্ধকার অমারাত্রি সম
তাহে আমি গড়িয়াছি প্রেম, মিলাইয়া স্বপ্ন সুধা মম।

বুদ্ধদেব বসু ঃ বন্দীর বন্দনা

প্রেম আর করুণা পরস্পর ফুল আর সুতোর মত একসঙ্গে আছে। সুতোকে ফেলে মালা গাঁথা যায় না, ফুলকে বাদ দিয়ে সুতো নিয়ে মালা হয় না।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দেবযান

সত্যিকার প্রেম দুটি আত্মাকে পরস্পর সংযুক্ত করে। যে প্রেম যত কামনা বাসনাশূন্য সে প্রেম তত উঁচু।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দেবযান

মরণে কে হবে সাথী,
প্রেম ও ধর্ম জাগিতে পারে না বারোটার বেশী রাতি।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ ঘুমের ঘোরে (মরীচিকা)

প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ ঘুমের ঘোরে (মরীচিকা)

প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা। কিন্তু প্রবঞ্চিতকে দেয় কী? তাকে দেয় দাহ।

যাযাবর ঃ দৃষ্টিপাত

প্রেমে পড়লে নজর খুব উঁচু হয়, মনের ম্যাগনিফাইং পাওয়ার বেড়ে যায়।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) ঃ নীল তারা

প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকিলে রস নিবিড় হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরূপরতন রাজা

বিচ্ছেদেরি হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরে প্রেম, দেখা দেয় দুঃখের আলোতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অন্তর্ধান (মহুয়া)

পৃথিবীতে ভয়কে যদি কেহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করিতে পারে, বিপদকে তুচ্ছ করিতে পারে, ক্ষতিকে অগ্রাহ্য করিতে পারে, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিতে পারে, তবে তাহা প্রেম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসব (ধর্ম)

ভয় নিত্য জেগে আছে প্রেমের শিয়র-কাছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসবের দিন (পূরবী)

জয় করে তবু ভয় কেন তোর যায় না,
হায় ভীরু প্রেম, হায় রে।
আশার আলোয় তবুও ভরসা পায় না,
মুখে হাসি তবু চোখে জল না শুকায় রে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান

পরাণ দিয়ে প্রেমের দীপ জ্বালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

বিচ্ছেদের মুখে প্রেমের বেগ বাড়িয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা

দিয়ো না প্রেমের হাতে
আকাশকুসুম। বুকে রাখিবার ধন
দাও তারে, সুখে দুঃখে সুদিনে দুর্দিনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা

কেবলমাত্র লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চোখের বালি-৫

প্রেমের শিখা জ্বলল তখন, নিবল যখন চোখের পরিচয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছিন্নপত্র (পলাতকা)

প্রেম নিজেকে সার্থক করিতেই চায়, সে নিজেকে প্রমাণ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথ ও পাথেয় (রাজাপ্রজা)

প্রেম আমাদিগকে ভিতর হইতে বাহিরে লইয়া যায়, আপন হইতে অন্যের দিকে লইয়া যায়, এক হইতে আর একের দিকে অগ্রসর করিয়া দেয়। এইজন্যই তাহাকে পথের আলো বলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথপ্রান্তে (বিচিত্র প্রবন্ধ)

প্রেমের দুই বিরুদ্ধ পার আছে। এক পারে চোরা বালি আর এক পারে ফসলের খেত। এক পারে ভালোলাগার দৌরাত্ম্য, অন্য পারে ভালোবাসার আমন্ত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

নারীর প্রেম পুরুষকে পূর্ণশক্তিতে জাগ্রত করতে পারে ; কিন্তু সে প্রেম যদি শুক্লপক্ষের না হয়ে কৃষ্ণপক্ষের হয় তবে তার মালিন্যের আর তুলনা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

নারীর প্রেমে মিলনের গান বাজে, পুরুষের প্রেমে বিচ্ছেদের বেদনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

লুকানো প্রাণের প্রেম পবিত্র সে কত।
আঁধার হৃদয়তলে মানিকের মতো জ্বলে,
আলোতে দেখায় কালো কলঙ্কের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্যক্ত প্রেম (মানসী)

ব্যর্থ প্রেম দেখা দেয় রোষের ধরিয়া
ছদ্মবেশ!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিসর্জন

প্রেম সে কি কৃপণতা জানে,
আত্মরক্ষা করে আত্মদানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভীরু (বিচিত্রতা)

প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে—
কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে।
গরব সব হায় কখন টুটে যায়,
সলিল বহে যায় নয়নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা

এরা সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না।
    ......শুধু সুখ চলে যায়।
    এমনি মায়ার ছলনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা

প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হাল্কা হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ১ অরূপরতন

সংসারের জমি থেকে প্রেমকে উৎপাটিত করে আনলে সে আপনার রস আপনি জোগাতে পারে না, তার মধ্যে বিকৃতি ঘটতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—সূচনা

    অতি প্রেম
সহে না বিধির।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—৫।৭

রমণীর অনিমেষ প্রেম, দেবতার
ধ্রুবদৃষ্টি-সম, পবিত্র কিরণে তারি
দীপ্তি পায় বিপদের মেঘ, স্বর্ণময়
সম্পদের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—৫।৭

ফুলে ফুলে সবে ফাগুন আত্মহারা
প্রেম যে তখন মোহন মদের ধারা।
কুসুম-ফোটার দিন হলে অবসান
তখন সে প্রেম প্রাণের অন্নপান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

আগুনে পোড়া প্রেম, এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত বলেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা-১২

জেনো প্রেম চিরঋণী আপনার হরষে....
সব পাপ ক্ষমা করি ঋণশোধ করে সে।....
কলঙ্ক যাহা আছে দূর হয় তার কাছে,
কালিমার 'পরে তার অমৃত সে বরষে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্যামা-৪

ক্ষমার দীপ্তি দেয় স্বর্গের আলো
প্রেমের আনন্দেরে
    ভালো আর মন্দেরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্যামা ৪

প্রেমের আনন্দ থাকে
    শুধু স্বল্পক্ষণ,
প্রেমের বেদনা থাকে
    সমস্ত জীবন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ফুলিঙ্গ ১৪৩

প্রেম ছাড়া আর কী আমাকে স্নিগ্ধতা দিতে পারে? দুটি চোখের
অতলে স্নান করে শুচি না হলে আবার কি করে ফিরে পাব নিসর্গ?
প্রতিধ্বনিহীন এই পাথুরে নৈঃশব্দ্য থেকে আমার কান্না কী করে
পায়রার মতো উড়ে যাবে আকাশে?..........আজ আমি পরিচ্ছন্ন প্রেমের প্রার্থনা করি।

রাম বসু ঃ আর্তনাদ কোরো না

প্রেম বা ভালোবাসার এক নীলাঞ্জন মায়া আছে, সেই নীলকাজলের রেখা যার চোখে আঁকা হয়, সে সবকে দেখে সুন্দররূপে, আকর্ষণীয় রূপে। প্রেমের নীলাঞ্জন মায়া নজরুলের ভাষায় বাসনার সবুজবলাকা। এই কামনা সব বিবর্ণ ধূসর বিষণ্ণতাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে নয়নরঞ্জন সবুজিমায় দেয় ভরে।

রামজীবন আচার্য ঃ নজরুল কবিতা—ভাব ও রূপ—অনামিকা

বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না—ইহা দূরেও ঠেলিয়া ফেলে।

শরৎচন্দ্র ঃ শ্রীকান্ত (১ম)

মৃত্তিকার ভাণ্ড ভরি উচ্ছ্বসিত তোমার সে প্রেম
তারে আমি ভরিয়া নিলেম
আমার নয়ন ভ'রে, আমার হৃদয় ভ'রে
আর ভ'রে আমার দু'কর।
কী দুঃসহ সে আনন্দ, সেই প্রেম কী যে তীব্রতর!

মর্তের মৃত্তিকা হতে, দিগন্ত বিথার হতে
উচ্ছ্বসিত উদ্ভাসিত তোমার সে প্রেম।

সুফিয়া কামাল ঃ তোমার সে প্রেম

পৃথিবীতে সবই হয়তো পুরনো হয়ে যায়, কিন্তু প্রেম পুরনো হয় না। প্রেম একই সঙ্গে চিরাচরিত ও আধুনিক।....বেঁচে থাকার সংগ্রাম, জীবিকার অন্বেষণ, রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, এরই মধ্যে হয়ে চলে প্রেমের ফল্গুধারা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ প্রেমের গল্প (ভূমিকা)

প্রৌঢ়

প্রৌঢ়ত্ব প্রজ্ঞাবান করে।.....প্রজ্ঞা অর্জন করতে হয়, প্রৌঢ়ত্ব কালের ধর্ম এবং অনিবার্য।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ভূমিকা—সাহিত্যের মানচিত্র ঃ
দ্বীপ থেকে মহাদেশ

প্রেমিক

প্রেমাস্পদের ব্যক্তিস্বরূপের অন্তর্নিহিত মূল্য ও তার বিকাশের নির্দিষ্ট পথের অনুসন্ধানই প্রেমিকের সাধনা, সে-ব্যক্তিস্বরূপের পূর্ণতর উন্মেষের জন্য আত্মোৎসর্গ করাতেই প্রেমিকের আনন্দ।

আবু সয়ীদ আইয়ুব ঃ কবিতা ও প্রেম (পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা)

বিরহ যাকে স্পর্শ করেনি
প্রেমিক সে নয়।

দেবী রায় ঃ প্রেমিক

তোমার উড়ন্ত চুল, চোখের বনজ মেঘ
ভালোবেসে হতে পারি
অবিশ্বাসী পৃথিবীর সর্বশেষ আনত প্রেমিক।

সুনীল কুমার নন্দী ঃ ধর্ম

ফরেন

বাংলা পড়াতে, সেতার বাজাতে, তবলা বাজাতে আজকাল ফরেনে না গেলে কোনো প্রেস্টিজ হয় না।

শংকর : যাবার বেলায়

ফাঁকা

আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে?
কোন ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়?

বিষ্ণু দে : টপ্পা-ঠুংরি (চোরাবালি)

লোকালয়.....একটা নিরেট জিনিষ, তার মধ্যে ফাঁক মাত্রই ফাঁকা। সেই ফাঁকটাকে কোনো মতে চাপা দেবার জন্যে আমাদের মদ চাই, তাশপাশা চাই, রাজা উজির মারা চাই, নইলে সময় কাটে না।.....

বৃহৎ যেখানে আছে অবকাশ সেখানে ফাঁকা নয়, একেবারে পরিপূর্ণ। প্রবন্ধে কথা যেখানে থামে সেখানে কেবলমাত্র ফাঁকা। গানের কথা যেখানে থামে সেখানে সুর ভরাট।....সুর যত বৃহৎ হয় ততই কথার অবকাশ বেশী থাকা চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপানযাত্রী

সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পুরাতন ভৃত্য

যেটা সবচেয়ে দামী, সে হচ্ছে মনের ফাঁকা।......স্থানের ফাঁকা না পেলে যেমন ভালো করে বাঁচা যায় না, তেমনি সময়ের ফাঁকা, চিন্তার ফাঁকা না পেলে মন বড়ো করে ভাবতে পারে না ; সত্য তার কাছে ছোটো হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাতায়নিকের পত্র ২ (কালান্তর)

ফাল্গুন

অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি ফাল্গুনের মর্মে করে বাস,
দূর বিরহের দীর্ঘশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসবের দিন (পূরবী)

ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে—
ডালে ডালে ফুলে ফুলে পাতায় পাতায় রে,
আড়ালে আড়ালে কোণে কোণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী ১ম দৃশ্য

রূপের আগুন ফাগুনদিনের কাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা—২৬

দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে চোখে কানে কানে কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা-৪০

ফাগুন শিশুর মতো, ধূলিতে রঙিন ছবি আঁকে।
ক্ষণে ক্ষণে মুছে ফেলে, চলে যায়, মনেও না থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
বকুল বনে মাতাল হয়ে এল।
বোল ধরেছে আমের বনে বনে,
ভ্রমরগুলো কে কার কথা শোনে,
গুনগুনিয়ে আপন-মনে-মনে
ঘুরে ঘুরে বেড়ায় এলোমেলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হোরিখেলা (কথা)

ফাঁসি

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান;
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন্ বলিদান?
আজি পরীক্ষা, জাতির অথবা জাতেরে করিবে ত্রাণ?
দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

ফেরা

বড় কৌতূহল হয়। কিভাবে থাকবে তুমি যদি আমি না ফিরি আবার।......জেনে যেতে চাই ; জীবিতের কাছে মৃতের স্মৃতি কতদিন জেগে থাকতে পারে। সকালে চায়ের কাপে প্রথম চুমুক কতটা আনমনা হবে। বিকেলে চুল বাঁধতে গিয়ে একবারও কি মনে পড়বে আমি কেন ফিরে আসছি না ঘরে!

অনন্ত দাশ ঃ যদি না ফিরি (ভূতলবাসীর আত্মকথা)

ফের যদি ফিরে আসি ;
ফিরে আসি যদি
কোনো শুভ্র শরতের অম্লান প্রভাতে,
কিংবা কোনো নিদাঘের শুষ্ক রুক্ষ তপস্যার দ্বিপ্রহরে
কিংবা শ্রাবণের বৃষ্টি-ধরা ছিন্নমেঘ রাতে কোনো,—।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ যদি ফিরে আসি (প্রথমা)

আবার যদি ইচ্ছা কর আবার আমি ফিরে
দুঃখসুখের-ঢেউ-খেলানো এই সাগরের তীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

ফুটপাত

পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,
ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে
বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা,
বুকের ভিতরে বুক।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ সে বড়ো সুখের সময় নয়,
সে বড়ো আনন্দের সময় নয়।

ফুটবল

ফুটবল বিজ্ঞানের খেলা। পাশ্চাত্য দেশের লোকেরা বৈজ্ঞানিক প্রথায় খেলে ও নিয়মিত অনুশীলন করে বলে ফুটবল এত উন্নত হতে পেরেছে।

অরুণ দত্ত ঃ অভিশপ্ত হীরে

সমস্ত বাঙলাদেশের যৌবন আপনাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিল ফুটবলের মাঠে। মোহনবাগানের আগেই বিবেকানন্দ বুঝেছিলেন এ সত্য—বেদান্ত ছেড়ে তিনি ফুটবল খেলতে বলেছিলেন।

গোপাল হালদার : অন্যদিন (ত্রিদিবা)

ফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে সুন্দর খেলা। ভয়ঙ্কর সুন্দর।

চুনী গোস্বামী : আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭..৬.২০০২

গীতাপাঠের চেয়ে ফুটবল খেললে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হবে। আমাকে অতি সাহসের সঙ্গে এ-কথাগুলো বলতে হচ্ছে ; কিন্তু না বললেই নয়।....তোমাদের শরীর একটু শক্ত হলে তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝবে।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী ৩।২৪২

বাঙালির জীবন থেকে ফুটবল পিছনের সারিতে চলে গিয়েছে। শুধু কলকাতায় নয়, জেলা শহরেও।

রূপক সাহা : দেশ ১৮.২.২০০৩

ফুল

ঝরা ফুল দলে কে অতিথি সাঁজের বেলায় এলে কানন-বীথি ॥
চোখে কি মায়া ফেলেছে ছায়া যৌবন মদির দোদুল কায়া।

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য গীতি

ফুলবনে যদি বসন্ত এলো,
মনবনে নাহি এলো,
কেন মনবনে নাহি এলো?

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্যগীতি

ফুলের বনে আজ বুঝি সই রূপসায়রে ঢেউ লেগেছে।
ঘুমিয়ে পড়া শ্যাম ভ্রমরা গুণগুনিয়ে গান ধরেছে॥

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্যগীতি

ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি?
ভোরের হাওয়ায় কান্না পাওয়ায় তব ম্লান ছবি॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (রাগ-প্রধান)

ফুলে ফুলে মৃত্যুহীন জীবনের সৌরভই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় : অমরতার সন্ধানে

বিধি কোমর বেঁধে
আকাশটারে কাঁপিয়ে যখন সৃষ্টি দিলেন ফেঁদে,
আদ্যযুগের খাটুনিতে পাহাড় হল উচ্চ
লক্ষযুগের স্বপ্নে পেলেন প্রথম ফুলের গুচ্ছ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আশা (পূরবী)

মেঠো ফুলগুলো পায়ে এসে মাথা কোটে,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ক্যামেলিয়া (পুনশ্চ)

ফুল বলে, ধন্য আমি মাটির ’পরে,
দেবতা ওগো, তোমার সেবা আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে,
নাই ধূলি মোর অন্তরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চণ্ডালিকা—১

ফুলগুলি যেন আলো পান করবার
        শিল্প-করা পেয়ালা,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট—৮

হাসিমুখে নিয়ো ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিয়ো ফুল যদি সে ফুল শুকায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রাণ (কড়ি ও কোমল)

ফুলগুলোর মধ্যে কারা বলছে 'মনে রেখো', 'মনে রেখো', তাদের নাম তো মনে নেই কিন্তু মন যে উদাস হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী—৪

যে পারে সে আপনি পারে,
        পারে সে ফুল ফোটাতে।
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণপ্রাণের
        মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে
        পারে সে ফুল ফোটাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফুল ফোটানো (খেয়া)

ফুলগুলি গায়ে এসে পড়ে রূপসীর পরশের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যৌবনস্বপ্ন (কড়ি ও কোমল)

ফুলগুলি যেন কথা,
        পাতাগুলি যেন চারিদিকে তার
                পুঞ্জিত নীরবতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

.....ফুল যদি শুকিয়ে গিয়ে থাকে
তবে তারে সাজিয়ে রাখাই ভুল,
        মিথ্যে কেন কাঁদিয়ে রাখ তাকে?
......সময় যখন গেছে, তখন তারে
        ভুলো একেবারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিস্মরণ (পূরবী)

ফুলেরা সব চাহিয়া আছে
        আকাশ পানে মগন-মনা,
মুখেতে মৃদু বিমল হাসি
        নয়নে দুটি শিশির-কণা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাধ (প্রভাতসংগীত)

চারি দিকে ফুলগুলি   কচি কচি বাহু তুলি
        'কোলে নাও' 'কোলে নাও' বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্নেহময়ী (ছবি ও গান)

ফুলের বিছানা দেখে মনে হলো শূন্যতা যাবার
সময় হয়েছে। কোনো ভয় নেই।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : চতুর্দশপদ কবিতা—১

ফুল কখনও দাগা দেয় না। ফুল নিয়েই থাকা ভাল।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য : হলুদ গাঁদার বনে (যুগলবন্দী)

ফুলগুলো সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।
মালা
জমে জমে পাহাড় হয়,
ফুল
জমতে জমতে পাথর।
পাথরটা সরিয়ে নাও,
আমার লাগছে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : পাথরের ফুল

প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
এসে গেছে ধ্বংসের বার্তা,
দুর্যোগে পথ হয় হোক দুর্বোধ্য
চিনে নেবে যৌবন—আত্মা॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : মে-দিনের কবিতা

ফ্যাসীবাদ

ফ্যাসীবাদকে ভোটের বাক্সে রোখা যায় না—ব্যালট পেপার দিয়ে ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে লড়া যায় না—ফ্যাসিস্তদের বিরুদ্ধে লড়া মানেই বন্দুক হাতে লড়া। ওদের বন্দুকের বিরুদ্ধে পাল্টা বন্দুক ধরা—একটি ফ্যাসিস্ত মানে একটি বুলেট। আমাদের প্রত্যেকটি বুলেটে একেকটি ফ্যাসিস্তের নাম লেখা—আমাদের প্রত্যেকটি বুলেট এক একটি ফ্যাসিস্তের প্রাণ নেবে।

অমল রায় : গেব্রিয়েল পেরী

বই

ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার আগুনে পুড়তে পুড়তে ফিনিক্স পাখির মত বেঁচে থাকবে, ডানা মেলে আকাশে উড়বে এবং দিগন্তের মৃত্তিকা স্পর্শ করবে বই।

অমল সাহা : 'বৃষ্টি'র কথা।

বইয়ের বিকল্প বই।

অশোক কুণ্ডু : অশোক নিলয়

আরও বই কেনো—খুব ভাল কথা ; কিন্তু ভাল বই কেনো—আরও ভাল কথা। ভাল বই বলতে আমি বোঝাতে চাচ্ছি সৎ বই—অর্থাৎ সুলিখিত সাহিত্য-শিল্পসমৃদ্ধ বই, অসৎ বস্তুর মালিন্য থেকে যে বই মুক্ত। এবং অসৎ বস্তু অর্থে আমি বলতে যাচ্ছি সেই সমাজবিরোধী অশ্লীল কার্যকলাপের অপরিমিত বিলসন, যা পাঠকচিত্তকে খুশি যত-না করুক, তাকে বহুগুণে করে উত্তেজিত।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : *কিন্তু ভাল বই কেনো বই মেলা জুলাই ১৯৯৬)*

মানুষ এ কালে বই পড়ে না, পড়ে সংবাদপত্র।

প্রমথ চৌধুরী : বই পড়া

যে জাতির যত বেশি লোক যত বেশি বই পড়ে, সে জাতি যে তত সভ্য, এমন কথা বললে বোধ হয় অন্যায় কথা বলা হয় না।

প্রমথ চৌধুরী : বই পড়া (ভাবা-পাঠ সঞ্চয়ন)

ভালো বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *জুবেয়ার (আধুনিক সাহিত্য)*

ধন বল, আয়ু বল, অন্যমনস্ক ব্যক্তির ছাতা বল, সংসারে যত কিছু সরণশীল পদার্থ আছে বাংলা বই হচ্ছে সকলের সেরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পয়লা নম্বর (গল্পগুচ্ছ)

বই-কেনা শখটারে দিয়ো নাকো প্রশ্রয় ;
ধার নিয়ে ফিরিয়ো না, তাতে নাহি দোষ রয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিণয়মঙ্গল (প্রহাসিনী)

টিভি নয়, কমপিউটার নয়, শেষ ভরসা বলুন অথবা শেষ বন্ধু দ্য আলটিমেট ফ্রেন্ড, সেই বই-ই। পড়তেই হবে, কেন না বিকল্প নেই। নিজের মনের মধ্যে নিত্য নতুন 'জ্ঞানচক্ষু' ফোটাতে নিজের মধ্যে 'একান্ত জগৎ' তৈরি করে দিতে পারে না কমপিউটার, পারে শুধু বই। যত বাড়বে 'জ্ঞান চক্ষু', নতুন নতুন জগৎ তৈরি হবে মনে বই পড়তে পড়তে, তত কমবে হতাশা, উদ্বেগ। পার্থিব শোকতাপ, দুঃখযন্ত্রণা, না-পাওয়া, মান-অপমান ভুলে থাকা সহজ হবে ততই। সহজে গায়ে লাগবে না জীবনের হাজারটা আঘাত, ওঠানামা। বিশুদ্ধ আনন্দ পেতে, আনন্দ আর দুঃখকে একই রকম অবিচল থেকে মেনে নিতে শিখতে টিভির দিক থেকে ঘোরাতেই হবে মুখ বইয়ের দিকে। দয়া করে কেনা বইগুলোকে ঘর সাজানোর সামগ্রীতে পরিণত করে ফেলবেন না। 'স্ট্যাটাস' বাড়ানো ছাড়াও বইয়ের কাজ যে অনেক! বই যে অমূল্য।

ওমর খৈয়ামের সেই কথাগুলো মাথায় রাখুন, "মদ রুটি সব ফুরিয়ে যাবে, ঘোলাটে হয়ে আসবে প্রিয়ার কালো চোখ, বই তবু চিরযৌবনা—যদি তেমন বই হয়।"

শ্যামল চক্রবর্তী : টিভি নয়, কমিপউটারও নয়, শেষ ভরসা সেই বই
(বর্তমান ৩১.১.২০০৩)

রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্তযৌবনা—যদি তেমন বই হয়। তাই বোধ করি (ওমর) খৈয়াম তাঁর বেহেশতের সরঞ্জামের ফিরিস্তি বানাতে গিয়ে কেতাবের কথা ভোলেন নি।.....

মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মুহম্মদ শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'অল্লাম বিল কলমি' অর্থাৎ আল্লা মানুষকে জ্ঞানদান করেছেন 'কলমের মাধ্যমে'। আর কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে।

বাইবেল শব্দের অর্থ বই—বই par excellence. সর্বশ্রেষ্ঠ পুস্তক—The Book.

সৈয়দ মুজতবা আলী : বই কেনা

বউ/বৌ

যে বউ স্বামীর বাড়ি যায়, তার এক চোখে প্রজাপতি নাচে, আরেক চোখে থাকে জল।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : *তিতাস একটি নদীর নাম*

ও ললিতে রসকলিতে একটা কথা শুনসে।
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়োবাঁধা এক মিনসে॥
ঘটি নেয় না, বাটি নেয় না, নেয় না সোনার ঝারি।
যে ঘরেতে রাঙা বউ সেই ঘরেতে চুরি॥ **বাংলা ছড়া**

পুরুষ মাত্রেরই বউ না থাকলে বাতিক থাকে। কারো তাস, কারো থিয়েটার, কাব্যে দেশোদ্ধার আর কাব্য বা সাহিত্য কিংবা স্বামীজি।

যাযাবর : দৃষ্টিপাত

ও কোন ঘরের বউ গা। যেন নির্মাল্যের ফুল। হাতে সাদা শাঁখা, পরনে লালপেড়ে শাড়ি। স্নানের পর ঘড়ায় করে জল তুলে আনছে, সকালের আলো তার ভিজে চুলে আর ভিজে ঘড়ার উপর ঝিকিয়ে উঠছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুয়োরানীর সাধ (লিপিকা)

বউ চিরকালের জিনিষ। ঘাড় থেকে নামাবার উপায় নেই, জিয়ার্ডিয়া অ্যামিবায়োসিসের মত ক্রনিক কেস। সারা জীবন ভোগাবে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : লেপ (হালকা হাসি চোখের জল)

বঁধু

ছুঁওনা ছুঁওনা বঁধু এখানে থাক।
মুকুর লইয়া চাঁদমুখখানি দেখ॥

চণ্ডীদাস : পদাবলী

বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম
রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে হয় ও দুটি চরণ
সদা লয়ে রাখি বুকে॥

জ্ঞানদাস : পদাবলী

বঁধু কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হইও তুমি॥

দ্বিজ চণ্ডীদাস : পদাবলী

এখন না শুনলে বঁধু যৌবনের ভরে
পশ্চাতে কাঁদিতে হবে অঝোরঝরে।

বাংলা প্রবাদ

বঁধু তোমায় করব রাজা তরুতলে।
বনফুলের বিনোদমালা দেব গলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

বঁধু, কোন মায়া লাগল চোখে!
বুঝি দীপ্তিরূপে ছিলে সূর্যলোকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা

ওগো আমার বঁধু, তুমি ডুমুর ফুলের মধু।

রাজশেখর বসু পরশুরাম : দ্বান্দ্বিক কবিতা

বকুল

ওরে বকুল, পারুল, ওরে শাল-পিয়ালের বন,
কোনখানে আজ পাই
এমন মনের মতো ঠাঁই
যেথায় ফাগুন ভরে দেব দিয়ে সকল মন,
দিয়ে আমার সকল মন॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

বকুল গন্ধে বন্যা এল
দখিন-হাওয়ার স্রোতে—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তপতী

বকুল অজস্র সর্বনাশে
স্খলিত দলিত বনপথে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :** শাল (বনবাণী)

বকুল প্রাণের সুধা দিয়ে
বায়ুরে মাতাল করি তুলে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :** শিশির (সন্ধ্যা সংগীত)

বক্তা, বক্তৃতা

বক্তৃতার সুবিধা দেখুন, হাতে রইল নোট, মাথায় রইল পয়েন্ট, পয়েন্ট ঠিক থাকলে বক্তব্যটি নিজের লাইন ধরে স্টেশনে এসে পৌঁছবে, রাস্তায় মালগাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগবে না।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : আমরা ও তাঁহারা—সঙ্গীতের কথা

বক্তার স্বরভঙ্গীই বক্তৃতার সার।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সঙ্গীত (বিবিধ প্রবন্ধ)

বক্তা স্বামীর চেয়ে শ্রোতা স্বামী ঢের ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৌকাডুবি—৩৯

বক্তৃতার নামগন্ধ পেলে রক্ষে নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্র (মানসী)

ভাল বক্তার কাছে জনতা যুক্তিতর্ক চাহে না, যাহা মন্দ তাহা কেন মন্দ এ খবরে তাহাদের আবশ্যক হয় না। শুধু মন্দ যে কত মন্দ অসংখ্য বিশেষণ যোগে ইহাই শুনিয়া তাহারা চরিতার্থ হইয়া যায়। **শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় :** পথের দাবী

বঙ্গ

বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার আমার দেশ
কেন গো মা তোর মলিন বসন কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : গান

বঙ্গের অম্বর হতে দিকে দিগন্তরে
সহস্র বর্ষণধারা গিয়েছে ছড়ায়ে
প্রাণের আনন্দবেগে পশ্চিমে উত্তরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আশীর্বাদ, অতুলপ্রসাদ (পরিশেষে)

নমোনমো নম, সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি!
গঙ্গার তীর, স্নিগ্ধ সমীর, জীবন জুড়ালে তুমি।
অবারিত মাঠ, গগনললাট চুমে তব পদধূলি,
ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।

……………………………

বুকভরা মধু বঙ্গের বধু জল লয়ে যায় ঘরে—
মা বলিতে প্রাণ করে আনচান, চোখে আসে জল ভরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুই বিঘা জমি (কাহিনী)

বঙ্গদেশ গোঁফে-তেল গাছে কাঁঠালের দেশ। যত বড়ো না মুখ ততবড়ো কথার দেশ। পেটে পিলে, কানে কলম ও মাথায় শামলার দেশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র—৬

মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙালী বাস করি সেই তীর্থে—বরদ বঙ্গে ;

বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুক-মালা,
ভালে কাঞ্চন-শৃঙ্গ মুকুট, কিরণে ভুবন আলা,
কোল-ভরা যার কনক ধান্য, বুক-ভরা যার স্নেহ,
চরণে পদ্ম, অতসী অপরাজিতায় ভূষিত দেহ,
সাগর যাহার বন্দনা রচে শত তরঙ্গভঙ্গে,—
আমরা বাঙালী বাস করি সেই বাঞ্ছিত ভূমি বঙ্গে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : আমরা

বজ্র

বজ্রে যে জনা মরে,
নবঘনশ্যাম শোভার তারিফ সে বংশে কেবা করে?

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : দুখবাদী

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি,
সে কি সহজ গান।
সেই সুরেতে জাগব আমি
দাও মোরে সেই কান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—৭৪

বজ্রে তোলো আগুন করে
আমার যত কালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—৯১

বড়

—নিজেকে বড় মনে করা কি দোষের?
—বোকা লোকের পক্ষে দোষের,......বুদ্ধিমানের পক্ষে দোষের নয়।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) : নীল তারা

আমাদের পিতামহেরা যে বড়ো হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপর নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি সচেষ্ট ছিল, সেইজন্যই তাঁহারা বড়ো হইতে পারিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আত্মশক্তি—ভারতবর্ষীয় সমাজ

যে বড়ো সে নিষ্ঠুর। সর্বসাধারণের জন্য ন্যায়, আর অসাধারণের জন্য অন্যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে বাইরে—সন্দীপের আত্মকথা

বড়োর কাছে নিচু হইয়া আমরা বড়ো হইতে শিখি, মাথাটা তুলিয়া থাকিলেই যে বড়ো হই তাহা নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র—১

সব তাতে মানা করাটাই বড়োদের ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছেলেবেলা—৫

ছোটোগুলো হতে থাকে ছাই, আর বড়োটা জ্বলতে থাকে শিখা। এই হচ্ছে বড়ো হবার তত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রক্তকরবী

ও এত বড়ো যে, ওর দোষগুলোও ওকে নষ্ট করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রক্তকরবী

বড় হবার বীজ ভিটামিনে নেই, আছে চরিত্রে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : গরলপুত্র (হালকা হাসি চোখের জল)

বড়লোক

বড়লোকে কথা কয়
সবে বলে জয় জয়।

বাংলা প্রবাদ

বড়লোক যদি হইতে চাও মানুষকে ঠকাও, সকলের সর্বনাশ কর।.....ধনী হওয়ার এছাড়া দ্বিতীয় পন্থা নাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : কুষ্ঠরোগীর বৌ

বড়লোকের বাড়ি যেতে হলে ছোট হয়েই যেতে হয়। ভগবানকে পর্যন্ত বামন হয়ে ঢুকতে হয়েছিল বলিরাজার বাড়িতে।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত : দাদাঠাকুর (নলিনীকান্ত সরকার)

বণিক

আজকালকার দিনে আমাদের প্রত্যেককেই দাসখৎ লিখে দিতে হয়েছে বণিকরাজকে, তা থেকে কারো মুক্তি নেই।

বুদ্ধদেব বসু : ক্লাইভ স্ট্রিটে চাঁদ

বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিবাজি-উৎসব

এখন রাজা নেই, আছে রাজশক্তি। সেই শক্তি আছে জনকয়েক বড় ব্যবসাদারের হাতে। হয় স্বহস্তে করেন, না হয় লোক দিয়ে করান। বণিকবৃত্তিই এখন মুখ্যত রাজনীতি। শোষণের জন্যই শাসন। নইলে তার বিশেষ কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : তরুণের বিদ্রোহ

সমস্তক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক-সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

সমর সেন : একটি বেকার প্রেমিক

বৎসর

ভূত-রূপ সিন্ধু জলে গড়ায়ে পড়িল
বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে।
নিত্যগামী রথচক্র নীরবে ঘুরিল
আবার আয়ুর পথে।

মধুসূদন দত্ত : নূতন বৎসর

পুরাতন বৎসরের জীর্ণক্লান্ত রাত্রি
ওই কেটে গেল, ওরে যাত্রী।
তোমার পথের পরে তপ্ত রৌদ্র এনেছে আহ্বান
রুদ্রের ভৈরব গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা—৪৫

নব বৎসরে করিলাম পণ—
লব স্বদেশের দীক্ষা
তব আশ্রমে তোমার চরণে,
হে ভারত, লব শিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ—১৩

বধূ

বাংলাদেশের বধূ তুমি
বাঙলাদেশের মেয়ে,
তোমার দিঠি মধুর শ্রীটি
মধুর সবার চেয়ে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলাদেশের মেয়ে (ধানদূর্বা)

বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা—
রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা!

মোহিতলাল মজুমদার : বাঁধন

ওগো বধূ সুন্দরী, তুমি মধুমঞ্জরী,
পুলকিত চম্পার লহো অভিনন্দন—
পর্ণের পাত্রে ফাল্গুনরাত্রে মুকুলিত মল্লিকা-মাল্যের বন্ধন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (আনুষ্ঠানিক)

নূতন প্রেমে নূতন বধূ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অম্ল-মধুর—
একটুকু ঝাঁঝালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষরক্ষা

বধূনির্যাতন

আজকাল বধূনির্যাতন, স্বামীর অত্যাচার এত বেড়ে গেছে।.....সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েরাই মেয়েদের ঘর ভাঙছে।

কণাবসু মিশ্র : এক্সরে প্লেট

বন

এখানে বনাবলী কখনো গিরিশিরে, কখনো সাগরবেলায়, কখনো তটিনীতটে, কখনো হ্রদতীরে। বনভূমি কখনো বিন্ধ্যাচলে, কখনো হিমনগ উপত্যকায়, কখনো দক্ষিণ সমুদ্রসৈকতে, কখনো গোদাবরী মুরলা-মালিনীর সোপানদেশে, কখনো পম্পার উপান্তপ্রদেশে। বনবিতান কখনো ঘন বিজড়িত, কখনো তরল-বিরল। সব মিলে আরণ্য লাবণ্যের অনন্ত ঐশ্বর্য্য ও উন্মাদিনী মায়ার সম্ভার। এখানে নারকেল আছে, শাল আছে, পিয়াল আছে, আছে রসাল। এখানে তাল আছে, তমাল আছে, আছে নক্তমাল। এখানে গন্ধগুরু, কৃষ্ণাগুরু আছে, দেবতরু দেবদারু আছে, আছে ......পুন্নাগনমেরু এখানে তাম্বুলের সাথে গুবাক আছে, এলাচ আছে, লবঙ্গ আছে, আছে চন্দন।

রামজীবন আচার্য : কালিদাস-সাহিত্যে মানবেতর জীবজগৎ—কথামুখ

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পালামৌ

বনস্পতি

বনস্পতিতে ভগবানের প্রত্যক্ষ আবির্ভাব।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : দেবযান

বন্দুক

এই বন্দুকের জোরে অত্যাচার হয়, শোষণ হয়—আর এই বন্দুক। এ-সব কুছ রুখতে ভি পারে।

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ : লাটাখাম্বা

পৃথিবীতে নিয়ন্ত্রণের অধিকার কেবল তার, যার হাতে বন্দুক আছে।

নিরূপ মিত্র : আততায়ী

বন্ধু / বন্ধুত্ব

বন্ধুত্বই পারে সবকিছুর ফয়সালা করতে।

কণা বসুমিশ্র : এক্সরে প্লেট

পুরনো বন্ধুরা এখন নিছক বন্ধুর মতো,
বন্ধু কেউ নয়।

ব্রত চক্রবর্তী : কয়েক টুকরো হয়

দাও গো মুছে আমার ভালে অপমানের লিখা ;
নিভৃতে আজ, বন্ধু, তোমার আপন হাতের টিকা
ললাটে মোর পরতে দাও, ওগো, পরতে দাও ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন

ফুলের গন্ধ বন্ধুর মত জড়ায়ে ধরিছে গলে—
আমি একথা, এ ব্যথা, সুখব্যাকুলতা কাহার চরণতলে
দিব নিছনি ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

বন্ধু, রহো রহো সাথে
আজি এ সঘন শ্রাবণপ্রাতে।
ছিলে কি মোর স্বপনে সাথিহারা রাতে ॥
বন্ধু, বেলা বৃথা যায় রে
আজি এ বাদলে আকুল হাওয়ায় রে—
কথা কও মোর হৃদয়ে, হাত রাখো হাতে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

দুঃখের বরষায়
চক্ষের জল যেই
নামল
বক্ষের দরজায়
বন্ধুর রথ সেই
থামল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—১

গোলাপ যেমন একটি বিশেষ জাতের ফুল, বন্ধু তেমনি একটি বিশেষ জাতের মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথের সঞ্চয়

এক-একটি লোক আছেন পৃথিবীতে তাঁহারা বন্ধু হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। মানুষকে মঙ্গলদান করিবার শক্তি তাঁহাদের অসামান্য এবং স্বাভাবিক। আমরা সকলেই পৃথিবীতে কাহাকেও না কাহাকেও ভালোবাসি, কিন্তু ভালোবাসিলেও বন্ধু হইবার শক্তি আমাদের সকলের নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথের সঞ্চয়

মনের মধ্যে এই উন্মুক্ত বন্য জীবন আনিয়া দিয়াছে একটা মুক্তি ও আনন্দের অনুভূতি—যাহা কোথাও কখনও আসে না এই রকম বিরাট নির্জন প্রান্তর ও জনহীন অঞ্চল ছাড়া।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : আরণ্যক

বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ঃ পালামৌ

বর

তোমার কাছে এ বর মাগি,
মরণ হতে যেন জাগি
গানের সুরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতালি—৫৯

ঐ যে আকাশে পুবের বাতাসে
উতলা উঠেছে জেগে—
আজি মোর বর মোর কালো ঝড়
ছুটে আসে কালো মেঘে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চাঞ্চল্য (খেয়া)

না গণি মনের ক্ষতি ধনের ক্ষতিতে,
হে বরেণ্য, এই বর দেহ মোর চিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—৭৭

পথ পাশে মল্লিকা দাঁড়ালো আসি,
বাতাসে সুগন্ধের বাজালো বাঁশি।
ধরার স্বয়ম্বরে
উদার আড়ম্বরে
আসে বর, অম্বরে ছড়ায়ে হাসি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বরযাত্রা (মহুয়া)

আমি ছিলাম বর। সুতরাং, বিবাহ সম্বন্ধে আমার মত যাচাই করা অনাবশ্যক ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হৈমন্তী (গল্পগুচ্ছ)

বরবধূ

ওগো বর, ওগো বঁধু,
জান জান তুমি—ধুলায় বসিয়া এ বালা তোমারি বধূ।
রতন-আসন তুমি এরই তরে
রেখেছ সাজায়ে নির্জন ঘরে
সোনার পাত্রে ভরিয়া রেখেছ নন্দনবনমধু,
ওগো বর, ওগো বঁধু।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বালিকা বধূ (খেয়া)

তুচ্ছতার সংসারে, কেনাবেচার জগতে বরবধূরাও তুচ্ছ; কেউ বা জানে তাদের নাম, কেউ-বা তাদের আসন ছেড়ে দেয়। কিন্তু রসের নিত্যলোকে তারা রাজারানী। চারি দিকের ছোটো বড়ো সমস্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে কিংখাবের সিংহাসনে তাদের বরণ করে নিতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৃষ্টি (সাহিত্যের পথে)

বর্ণ, বরণ

গৌরবর্ণ তোমার চরণমূলে
ফলসাবরণ শাড়িটি ঘেরিবে ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিমন্ত্রণ (বীথিকা)

বর্ণভেদ

শোষণের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য ধর্মের নামে—ঈশ্বরের নামে বর্ণ বিভাজন। বর্ণ এবং শ্রেণী বিভাজন। একটি সোসিও-রিলিজিয়াস অপরটি সোসিও-ইকনমিক্যাল বিন্যাস। কেবল মাত্র ধর্ম তথা ঈশ্বরের নামে চলে আসছে বর্ণভেদের মতো ঘৃণ্য প্রথা।

অনিল সরকার : দলিত সাহিত্য : একটি নব উত্থান
(ঐকতান গবেষণা পত্র, ফেব্রু: '৯৮)

বর্ষা

কেঁদেও পাবে না তাকে বর্ষার অজস্র জলধারে।

অমিয় চক্রবর্তী : বৃষ্টি

ঋতুর মধ্যে বর্ষাই কেবল একা, একমাত্র। তাহার জুড়ি নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আষাঢ় (বিচিত্র প্রবন্ধ)

বর্ষাকে ক্ষত্রিয় বলিলে দোষ হয় না। তাহার নকিব আগে আগে গুরুগুরু শব্দে দামামা বাজাইতে বাজাইতে আসে, মেঘের পাগড়ি পরিয়া পশ্চাতে সে নিজে আসিয়া দেখা দেয়। অল্পে তাহার সন্তোষ নাই। দিগ্বিজয় করাই তাহার কাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আষাঢ় (বিচিত্র প্রবন্ধ)

বর্ষা ঋতুটা বিশেষভাবে কবির ঋতু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আষাঢ় (বিচিত্র প্রবন্ধ)

হুহু হুংকার, ঝর্ঝর বর্ষণ,
সঘন শূন্যে বিদ্যুৎঘাতে
        তীব্র কী হর্ষণ!
দুর্দাম প্রেম কি এ—
প্রস্তর ভেঙে খোঁজে উত্তর
        গর্জিত ভাষা দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অধীরা (সানাই)

বর্ষা নামিয়াছে ট্রামলাইনের মেরামতও শুরু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কর্তার ইচ্ছায় কর্ম

তপের তাপের বাধন কাটুক রসের বর্ষণে।
হৃদয় আমার, শ্যামল বঁধুর করুণ স্পর্শ নে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

নমো, নমো, নমো করুণাঘন, নমো হে।
        নয়ন স্নিগ্ধ অমৃতাঞ্জনপরশে,
        জীবন পূর্ণ সুধারসবরষে,
তব দর্শনধনসার্থক মন হে, অকৃপণবর্ষণ করুণাঘন হে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

আজ বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে ;
        চলেছে গরজি, চলেছে নিবিড় সাজে।
হৃদয়ে তাহার নাচিয়া উঠিছে ভীমা,
ধাইতে ধাইতে লোপ করে চলে সীমা,
কোন্ তাড়নায় মেঘের সহিত মেঘে
বক্ষে বক্ষে মিলিয়া বজ্র বাজে
বরষার রূপ হেরি মানবের মাঝে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১০০

বর্ষাঋতুটা মোটের উপরে শহুরে মনুষ্যসমাজের পক্ষে তেমন সুখকর নহে—ওটা আরণ্য প্রকৃতিরই বিশেষ উপযোগী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৌকাডুবি—১

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ রভসে
ঘন গৌরবে নব যৌবনবরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষামঙ্গল (কল্পনা)

বর্ষা নামে হৃদয়ের দিগন্তে
যখন পারি তাকে আহ্বান করতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক—পাঁচ

বসন

অন্তঃপুরের মেয়েদের বসনটা......দিগ্‌বসনের সুন্দর অনুকরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপানযাত্রী

বসন্ত

আয়রে বসন্ত তোর ও
কিরণ মাখা পাখা তুলে।
নিয়ে আয় তোর কোকিল পাখির
গানের পাতা গানের ফুলে।.....
নিয়ে আয় তোর কুসুমরাশি,
তারার কিরণ চাঁদের হাসি,
মলয়ের ঢেউ নিয়ে আয়
উড়িয়ে দে মোর এলোচুলে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ গান—আয় রে বসন্ত

আজি দখিন-দুয়ার খোলা—
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো।
দিব হৃদয়দোলায় দোলা,
এসো হে, এসো হে, এসো হে আমার বসন্ত এসো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরূপরতন

বসন্ত সে যায় তো হেসে, যাবার কালে
শেষ কুসুমের পরশ রাখে বনের ভালে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (স্বরবিতান ৫৩)

যে কেবল পালিয়ে বেড়ায়, দৃষ্টি এড়ায়, ডাক দিয়ে যায় ইঙ্গিতে,
সে কি আজ-দিল ধরা গন্ধে-ভরা বসন্তের এই সঙ্গীতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা ১

বসন্তে আজ ধরার চিত্ত হল উতলা,
বুকের, পরে দোলে দোলে দোলে দোলে রে তার পরানপুতলা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলেখা ১

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরো না বিড়ম্বিত তারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৫৫

অকৃতার্থ যৌবনের দীর্ঘশ্বাসে
বসন্তেরে করিল ব্যাকুল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা—২

রোদন ভরা এ বসন্ত, সখা কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিমরাগে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কী মনে ক'রে
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সংগীতের ইঙ্গিতের সাথে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা—১৬

আমার বসন্তরাতে চারি চক্ষে জেগে উঠেছিল
যে-কয়টি কথা
তোমার কুসুমগুলি, হে বসন্ত, সে গুপ্ত সংবাদ
নিয়ে গেল কোথা!

....

কয়েক বসন্তে তারা আমার যৌবনকাব্যগাথা
লয়েছিল পড়ি—
কণ্ঠে কণ্ঠে থাকি তারা শুনেছিল দুটি বক্ষোমাঝে
বাসনা-বাঁশুরি।

....

অমর বেদনা মোর, হে বসন্ত, রহি গেল তব
মর্মরনিশ্বাসে—
উত্তপ্ত যৌবনমোহ রক্তরৌদ্রে রহিল রঞ্জিত
চৈত্রসন্ধ্যাকাশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বসন্ত (কল্পনা)

বসন্তে.........প্রাণের অজস্রতা, বিকাশের উৎসব। তখন আত্মদানের উচ্ছ্বাসে তরুলতা পাগল হইয়া উঠে ; তখন তাহাদের হিসাবের বোধমাত্র থাকে না ; যেখানে দুটো ফল ধরিবে সেখানে পঁচিশটা মুকুল ধরাইয়া বসে। মানুষই কি কেবল......আপনাকে ফুটাইবে না, ফলাইবে না, দান করিতে চাহিবে না ; কেবলই কি ঘর নিকাইবে, বাসন মাজিবে ; ও যাহাদের সে বালাই নাই, তাহারা বেলা চারটে পর্যন্ত পশমের গলাবন্ধ বুনিবে। আমরা কি এতই একান্ত মানুষ। আমরা কি বসন্তের নিগূঢ় রসসঞ্চার বিকশিত তরুলতাপুষ্পপল্লবের কেহই নই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বসন্তযাপন (বিচিত্র প্রবন্ধ)

মদন, বসন্তসখা, ব্যগ্র কৌতূহলে
লুকায়ে বসিয়া ছিল বকুলের তলে
পুষ্পাসনে, হেলায় হেলিয়া তরু 'পরে
প্রসারিয়া পদযুগ নবতৃণস্তরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিজয়িনী (চিত্রা)

.........বসন্তপরশে
পূর্ণ ছিল বনচ্ছায়া আলসে লালসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিজয়িনী (চিত্রা)

বসন্ত নবীন
সেদিন ফিরিতেছিল ভুবন ব্যাপিয়া
প্রথম প্রেমের মতো কাঁপিয়া কাঁপিয়া
ক্ষণে ক্ষণে শিহরি শিহরি। সমীরণ
প্রলাপ বকিতেছিল প্রচ্ছায়সঘন
পল্লবশয়ন তলে ; মধ্যাহ্নের জ্যোতি
মূর্ছিত বনের কোলে ; কপোতদম্পতি
বসি শান্ত অকম্পিত চম্পকের ডালে
ঘন চঞ্চুচুম্বনের অবসরকালে
নিভৃতে করিতেছিল বিহ্বল কূজন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিজয়িনী (চিত্রা)

বসন্তে কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে?
দেখিস্ নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা—৩

বসন্ত নাহি এ ধরায় আর
আগের মতো,
জ্যোৎস্নাযামিনী যৌবনহারা
জীবনহত।
আর বুঝি কেহ বাজায় না বীণা,
কে জানে কাননে ফুল ফোটে কি না,
কে জানে সে ফুল তোলে কি না কেউ
ভরি আঁচোর—
কে জানে সে ফুলে মালা গাঁথে কি না
সারা প্রহর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভুলভাঙা (মানসী)

বসন্ত বায়ু, কুসুম-কেশর
গেছ কি ভুলি?
নগরের পথে ঘুরিয়া বেড়াও
উড়ায়ে ধূলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

বসন্ত ঋতুরই ধাতটা বায়ুপ্রধান—সেই বায়ুর প্রকোপেই বিরহমিলনের প্রলাপটা প্রবল হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্রাবণগাথা

দক্ষিণের দোলা-লাগা পাখি, জাগা বসন্ত প্রভাতে—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (পূরবী)

হৃদয়ের জগতেও একটা বসন্তের হাওয়া আছে—সে কোন্ স্বর্গ থেকে আসে, গলির মোড় থেকে আসে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ত্রীর পত্র (গল্পগুচ্ছ)

বসন্ত পাঠায় দূত
রহিয়া রহিয়া
যে কাল গিয়েছে তার
নিশ্বাস বহিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—১৫৭

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আজ বসন্ত।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ ফুল ফুটুক না ফুটুক

বহ্নি

মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়।.....রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পতঙ্গ (কমলাকান্ত)

তপন তপ্ত, চিরঅতৃপ্ত, অনন্তরূপ বহ্নি!
শিবললাটিকা, প্রলয়াত্মিকা তুমি দীপশিখা তন্বী।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ বহ্নিস্তুতি (মরীচিকা)

অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয়।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (স্বরবিতান ৪৪)

পলাশের কুঁড়ি
এক রাত্রে বর্ণবহ্নি জ্বালিল সমস্ত বন জুড়ি ;—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শুভযোগ (মহুয়া)

বাইশে শ্রাবণ

তোমার বৈশাখী আলো
শুভ্র স্ফটিকের মত জ্বলে
জলে, স্থলে,
সমুদ্রে, আকাশে, শালবনে ঃ
বাইশে শ্রাবণে।

দিনেশ দাস ঃ বাইশে শ্রাবণ

বাউল

বাতুল বা ব্যাকুল থেকে 'বাউল' নিষ্পন্ন হতে পারে—অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেমে যারা পাগল। অথবা আউল (আরবী) বা বাউর (হিন্দি—যার মানে বায়ুরোগগ্রস্ত) থেকেও এ শব্দ আসতে পারে। আরবী শব্দটির অর্থ—যাঁরা ঈশ্বরের একান্ত সেবক। যেদিক থেকেই হোক না কেন, ঈশ্বর প্রেমিক, স্বাধীনচিত্ত, জাতিসম্প্রদায়ের চিহ্নহীন একদল ভক্ত বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেমে বিশ্বাসী হয়ে বাউল নামে পরিচিত হয়েছিলেন।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত

পণ্ডিতেরা সত্য খোঁজেন গ্রন্থের মধ্যে, বাউলরা খোঁজেন মানুষের মধ্যে।

ক্ষিতিমোহন সেন ঃ বাংলার বাউল

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধরে ঝরোঝরো ঝরো ধারা।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা—১

বৃহদারণ্যকে একটি আশ্চর্য বাণী আছে—

অথঃ যোহন্যাং দেবতাম্ উপাস্তে
অন্যোহসৌ অন্যোহহম্ অস্মীতি
ন স বেদ, যথা পশুরেবং স দেবানাম্।

যে মানুষ অন্য দেবতাকে উপাসনা করে 'সেই দেবতা অন্য আর আমি অন্য' এমন কথা ভাবে, সে তো দেবতাদের পশুর মতোই।.....সেই কথাই আপন ভাষায় বলছে নিরক্ষর অশাস্ত্রজ্ঞ বাউল। সে আপন দেবতাকে জানে আপনার মধ্যেই, তাকে বলে মনের মানুষ। বলে, "মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানুষের ধর্ম—৩

বাউল বলতে চেয়েছে, চার দিকে অচিন্তনীয় অপরিসীম রহস্য, তারই মধ্যে চলেছে জীবনযাত্রা। সে বললে—

পরান আমার স্রোতের দীয়া
(আমায় ভাসাইলা কোন্ ঘাটে)।
আগে আন্ধার পাছে আন্ধার, আন্ধার নিসুইৎ-ঢালা।
আন্ধারমাঝে কেবল বাজে লহরেরি মালা
তার তলেতে কেবল চলে নিসুইৎ রাতের ধারা,
সাথের সাথি চলে বাতি, নাই গো কূলকিনারা।

নানা রহস্যে একলা-জীবনের গতি, যেমন চার দিকের নিসুৎ অন্ধকারে স্রোতে-ভাসানো প্রদীপের মতো—এমন সহজ উপমা মিলবে কোথায়। একটা শব্দ-বাছাই লক্ষ্য করা যাক ; লহরেরি মালা। উর্মি নয়, তরঙ্গ নয়, ঢেউ নয়, শব্দ জাগাচ্ছে জলে ছোটো ছোটো চাঞ্চল্য, ইংরেজিতে যাকে বলে ripples। অন্ধকারের তলায় তলায় রাত্রির ধারা চলেছে, ...রাত্রি স্তব্ধ হয়ে আছে.......তার প্রহরগুলি নিঃশব্দ নির্লক্ষ্য স্রোতের মত বয়ে চলেছে.........।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলা ভাষা পরিচয় ১৪/৪৭৬

বাউলদের ধর্ম মানবধর্ম।...........বাউলদের মধ্যে কত বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। কত দল কত মত। কিন্তু একে অপরকে গ্রহণ করেছে, সমর্থন করেছে। বাউলেরা শাস্ত্র মানে না, রসের ধারা চায়। ভাবের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়। এসব বাঙালির জীবনকে প্রতিমুহূর্তে স্পর্শ করে।

হোসেনুর রহমান : রবিবারের প্রতিদিন ২৯.৯.২০০২

বনের

মানুষ বাকস্বাধীনতাকে, মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে, ডেমোক্রেসিকে কী ভালই না বাসে!

নারায়ণ সান্যাল : এক. দুই.তিন.....

বাক স্বাধীনতা

বাগানটাকে দেখে মনে হয়
মোগল বাদশার জেনেনা,
রাজ-আদরে অলংকৃত,
কিন্তু পাহারা চার দিকে—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক—পঁচিশ

বাঘ/ব্যাঘ্র

অরণ্যময় অঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র পশুর প্রতিবেশী। সে সময় তাদের একমাত্র ভয়ের কারণ ছিল ঐ পশুটি। দৈব উপায়ে তার গ্রাস হতে রক্ষা পাবার জন্য ব্যাঘ্রের উদ্দেশ্যে বা কোন একটি সদা ক্রুদ্ধ প্রতিহিংসাপরায়ণ অশরীরী আত্মাকে ব্যাঘ্রকুলের অধিদেবতা কল্পনা করে তাকে নানারূপ প্রক্রিয়া দ্বারা তুষ্ট করে কৃপালাভের প্রয়াসী হয়। এইভাবে উক্ত অঞ্চলে ব্যাঘ্র পূজার প্রবর্তন ঘটে।

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু ঃ বাংলার লৌকিক দেবতা

হিংস্র ব্যাঘ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে ; দেহ দীপ্তোজ্জ্বল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন্ন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিতে শিকারের 'পরে
বিদ্যুতের বেগে ; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীব্র সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে, একবার লভি তার স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসুন্ধরা (সোনার তরী)

এক ছিল মোটা কেঁদো বাঘ,
গায়ে তার কালো কালো দাগ।
বেহারাকে খেতে ঘরে ঢুকে
আয়নাটা পড়েছে সমুখে।
এক ছুটে পালালো বেহারা
বাঘ দেখে আপন চেহারা।
গাঁ-গাঁ করে ডেকে ওঠে রাগে,
দেহ কেন ভরা কালো দাগে।.......
ফুলিয়ে ভীষণ দুই গোঁফ
বলে, চাই গ্লিসেরিন সোপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—৬

—তোমার বাঘ কি করে?
—রাত্তিরে যখন শুয়ে থাকি বাইরে থেকে ও জানালা আঁচড়ায়। খুলে দিলেই হাসে।
—তা হতে পারে। ওরা খুব হাসিয়ে জাত। ইংরেজিতে যাকে বলে হিউমরাস। কথায় কথায় দাঁত বের করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—৬

পরদিন সকালে কজন চাষা দেখতে পেলে একটি বৃদ্ধ বাঘ পগারের ভেতরে ধুঁকছে। চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল ডেপুটি বাবুর বাড়ি। তিনি বল্লেন—এমন বাঘ ত দেখিনি, গাধার মত রং। আহা শেয়ালে কামড়েছে, একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দি। একটু চাঙ্গা হোক, তারপর আলিপুরে নিয়ে যেও ; বকশিস মিলবে।

পরশুরাম ঃ দক্ষিণ রায়

বাঙলা

সপ্তগ্রাম থেকে গৌড়। বাঙলার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। কর্ণফুলী-ব্রহ্মপুত্র-পদ্মা-

গঙ্গার মায়া দিয়ে মাখানো। তাল-নারকেল-সুপুরীর জয়ধ্বজা উড়ছে হাওয়ায় হাওয়ায়। মেঘের ছায়ায় ছায়ায় স্বপ্ন দেখে নীল পাহাড়। রৌদ্রের ঝিলিক ঝলে নীলকণ্ঠ পাখির পাখায়। জ্যোৎস্নার দুধ-সমুদ্রে সাঁতার দিয়ে যায় হংস-বলাকা। পলিমাটির চন্দন ডাঙায় শ্বেত পদ্মের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে থাকে বকের দল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : পদসঞ্চার

দেখলুম, বাঙলার আসল পরিচয় প্রাসাদে নয়, বস্তিতে। শহরে নয়, পল্লীতে ; চাষা-ভূষো, তাঁতী জোলার মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রভেদ নাই ; প্রভেদ শুধু এইখানে, নবাবে আর রাজায়, পণ্ডিতে আর মৌলবীতে। আমি তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাব দায়ুদ খাঁ, যেখানে মুসলমানের আজান ধ্বনির সঙ্গে হিন্দুর কাঁসর ঘণ্টাধ্বনি মিশে এক স্বর্গীয় সঙ্গীতের সৃষ্টি করেছে।

ব্রজেন্দ্রকুমার দে : বাঙালি (যাত্রা পালা)

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (স্বরবিতান)

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (স্বরবিতান)

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল—
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (স্বরবিতান)

বাংলা দেশ কেবল মৃন্ময় পদার্থ নয়, তা চিন্ময়ও বটে।....অনেক পশুপক্ষীও বাংলার মাটিতে জন্মেছে। অথচ রয়েল বেঙ্গল টাইগারের হৃদয়ের মধ্যে বাঙালীর সঙ্গে একাত্মিকতার বোধ আত্মীয়তার রস-যুক্ত নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের পথে

বাঙালি বাংলা ভাষার বিশেষত্ব অবলম্ব, করিয়াই সাহিত্যের যদি উন্নতি করে তবেই হিন্দিভাষীদের সঙ্গে তাহার বড়ো রকমের মিল হইবে। সে যদি হিন্দুস্থানীদের সঙ্গে সস্তায় ভাব করিয়া লইবার জন্য হিন্দির ছাঁদে বাংলা লিখিতে থাকে তবে বাংলা সাহিত্য অধঃপাতে যাইবে এবং কোনো হিন্দুস্থানী তাহার দিকে দৃক্‌পাতও করিবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় (পরিচয়)

বাংলাভাষাকে নির্বাসিত করিয়া অন্য যে কোন ভাষাকেই আমরা গ্রহণ করি না কেন, তাহাতে আমাদের মনের স্বাতন্ত্র্যকে দুর্বল করা হইবে। সেই দুর্বলতাই যে আমাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বললাভের প্রধান উপায় হইতে পারে, একথা একেবারেই অশ্রদ্ধেয়।......কোনো বাহ্যিক উদ্দেশ্যের খাতিরে........আত্মপ্রকাশের বাহনকে বর্জন করা, আর মাংস সিদ্ধ করার জন্য ঘরে আগুন দেওয়া, একই জাতীয় মূঢ়তা।
বাংলাদেশে আমরা আছি জতুগৃহে, আগুন লাগাতে বেশিক্ষণ লাগে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হিন্দুমুসলমান (কালান্তর)

বাংলা থিয়েটার

বাংলা থিয়েটার কোথায়! আগ্রাসী বহুজাতিক সংস্থা এবং বিধ্বংসী বহুতলসৌধ

নির্মাতা কালাপাহাড়ের মত আমাদের শিল্পসংস্কৃতির সব কিছু নিদর্শন নিশ্চিহ্ন করিতে চাহে। কোনো প্রতিবাদ নাই, কোনো প্রতিরোধ নাই, কোনো প্রতিবিধান নাই।

অজিতকুমার ঘোষ : বাংলা নাটকের ইতিহাস

বাংলা, বাংলা দেশ, বাংলা ভাষা

মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা।
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালবাসা!
কি যাদু বাংলা গানে! গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে,
(এমন কোথা আর আছে গো!)
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা॥

অতুলপ্রসাদ সেন : বাংলা ভাষা

আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই
আমি আমার 'আমি'কে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই,
আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর
আমি এই বাংলার মায়াভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর।
বাংলা আমার জীবনানন্দ বাংলা প্রাণের সুখ,
আমি একবার দেখি, বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ।

প্রতুল মুখোপাধ্যায় : গান (নির্বাচিত গান)

বাংলা আমার মাতৃভাষা বাংলা আমার প্রাণ
বাংলা আমার হৃদয়হরণ বাংলা সারিগান।
বাংলা আমার চর্যাপদ গঙ্গারিড়ির কাল
বাংলা আমার শ্রীচৈতন্য বাংলা ইহকাল।...
বাংলা আমার বিশ্বভুবন বাংলা আমার দেশ
দুঃখ কষ্ট থাকুক যত যাব না বিদেশ
বাংলা আমার রামপ্রসাদ আর লালন সাঁয়ের গান
বাংলা মানে বুদ্ধ, যীশু, হিন্দু মুসলমান।

রাণা চট্টোপাধ্যায় : বাংলা নিয়ে ছড়া

বাঙ্‌লা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে
রোদ, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাঙ্‌লা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্য শিক্ষার অক্ষর,
কাননে কুসুম কলি ফোটে, গো-রাখালের বাঁশি
হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।

বাঙ্‌লা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি ; মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুম পাড়ানিয়া ছড়া কোন্ সে সুদূরে ; সত্তা তার
আশাবরী। নানী বিষাদ সিন্ধুর স্পন্দে দুলে
দুলে রমজানী সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া, আর
একুশের প্রথম প্রভাতফেরী—অলৌকিক ভোর।

শামসুর রাহমান : বাঙ্‌লা ভাষা উচ্চারিত হলে

সাবাস, বাংলা দেশ, এ পৃথিবী
অবাক তাকিয়ে রয় ঃ
জ্বলে পুড়ে-মরে ছারখার
তবু মাথা নোয়াবার নয়।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ দুর্মর (পূর্বাভাস)

আমরা যেন বাংলাদেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।
দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জানলা।
ওপারে যে বাংলা দেশ
এপারেও সেই বাংলা॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ পারাপার

কোন ভাষা মরমে পশি—
আকুল করি তোলে প্রাণ?
কোথায় গেলে শুনতে পাব—
বাউল সুরে মধুর গান?
চণ্ডীদাসের—রামপ্রসাদের—
কণ্ঠ কোথায় বাজে রে?
সে আমাদের বাংলাদেশ,
আমাদেরি বাংলা রে!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ কোন দেশে (বেণু ও বাণী)

বাংলাদেশের মেয়ে

আমি তোমার বাংলাদেশের মেয়ে।
সৃষ্টিকর্তা পুরো সময় দেন নি
আমাকে মানুষ ক'রে গড়তে—
রেখেছেন আধাআধি করে।
অন্তরে বাহিরে মিল হয় নি—
সে কালে আর আজকের কালে,
মিল হয় নি ব্যথায় আর বুদ্ধিতে,
মিল হয় নি শক্তিতে আর ইচ্ছায়।
আমাকে তুলে দেন নি এ যুগের পারানি নৌকায়,
চলা আটক করে ফেলে রেখেছেন
কালস্রোতের ও পারে বালুডাঙায়।
সেখান থেকে দেখি
প্রখর আলোয় ঝাপসা দূরের জগৎ;
বিনা কারণে কাঙাল মন অধীর হয়ে ওঠে;
দুই হাত বাড়িয়ে দিই,
নাগাল পাই নে কিছুই কোনো দিকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাঁশিওয়ালা (শ্যামলী)

বাঙালি/বাঙালী

বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা অপ্রীতিকর ছবিও আছে। অনেক বাঙালিই নিতান্ত প্রাদেশিকতায় আচ্ছন্ন। অবাঙালি ভারতীয়দের প্রতি বাঙালিদের মনোভাবে একটা অবজ্ঞার দিক থেকেই গেছে বহুদিন ধরে। 'মেড়ো', 'খোট্টা', 'উড়ে' ইত্যাদি শব্দের মধ্যে আজো তার প্রকাশ ঘটে।

অনুরাধা রায় : উনিশ শতকের বঙ্গীয় বুদ্ধিজীবীদের বাংলা ও ভারত

শহরে বাঙালী বড় মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে গাধার বেহদ্দ ; বুদ্ধিটা এমন সূক্ষ্ম যে নেই বল্লেও বলা যায় ; লেখাপড়া শিখতে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়য়।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম) : হুতোম প্যাঁচার নক্সা

শহরের অনেক বড় মানুষ—তাঁরা যে বাঙালীর ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন ; বাবু চুনোগুলির আনড্রু পিদ্রুসের পৌত্তুর বল্লে তারা বড় খুশী হন ; সুতরাং যাহাতে বাঙালীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম) : হুতোম প্যাঁচার নক্সা

জানবে সারা বিশ্বময় এই বাঙালি নিঃস্ব নয়,
জ্ঞান গরিমা শক্তি সাহস আজো এদের হয়নি শেষ।

গোলাম মোস্তাফা : কিশোর

আজ বাঙালির জাতীয় চরিত্র, পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু বাঙালির অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান বাঙালির মধ্যে বেশি প্রস্ফুট। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি ভদ্রলোক একটা তুচ্ছ ইংরেজিপনাতে নিজের ধর্ম হারাইতেছে ; দ্বিতীয়ত, পশ্চিমবঙ্গের বাঙালির মধ্যে অর্থলিপ্সা ও অর্থাভাব দুই-এরই প্রাবল্যে আদর্শপরায়ণতা ও আত্মত্যাগের প্রবৃত্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে। বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এই দোষগুলি এখনও বেশি দেখা যায় না। তাহারা অনেকে স্বাভাবিক সরল, ও সহজ বাঙালি রহিয়াছে।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী : পূর্ব্ববঙ্গের সমস্যা।

বাঙালীর মনে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া কতকগুলি জিনিস একেবারে নূতন করিয়া দেখা দিল—যেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব, দেশ ও দেশপ্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ধারণা, আবার কতকগুলি জিনিস নূতন চক্ষে, নূতন ভাবে দেখিতে শিখিলাম—যেমন ঈশ্বর, নরনারীর দৈহিক সৌন্দর্য, নরনারীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত সম্পর্ক।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী : বাঙালী জীবনে রমণী

বাঙালী আজ জীবনমরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। একটা সমগ্র জাতি মাত্র কেরাণী বা মসীজীবী হইয়া টিকিতে পারে না ; বাঙালী এতদিন সেই ভ্রান্তির বশবর্তী হইয়া আসিয়াছে এবং তাহারই ফলে আজ সে সকল প্রকার জীবনোপায় ও কর্মক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত। বৈদেশিকগণের ত কথাই নাই, ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ লোকের সহিতও জীবন সংগ্রামে আমরা প্রত্যহ হটিয়া যাইতেছি। বাঙালী যে নিজ বাসভূমে পরবাসী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা আর কবির খেদোক্তি নহে, রূঢ় নিদারুণ সত্য।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় : আত্মচরিত

বাঙালীর—সাধনা ডিগ্রী—তাই সিদ্ধি চাকুরী

প্রফুল্লচন্দ্র রায় : দ্র. জাতীয় উন্নতির উপায় (মেঘনাদ রচনা সংকলন)

আমার স্থির বিশ্বাস বাঙালীর দ্বারাই ভারতের সর্বাঙ্গীণ সাধনার পথ উন্মুক্ত হবে। কিন্তু এই গৌরবের পদ অধিকার করতে হলে বাঙালীর জীবনের আজ চাই সাধনা—

তিল তিল করে আত্মদান। বাঙালী আজ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে ব্যক্তিগত সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের কাজে লেগে পড়ে থাকলে ভারতের নিদারুণ দুর্দশা ঘুচবেই—আজ বিধাতার ইঙ্গিতে বাঙালীর সাধনা ভারতে সিদ্ধি আনয়ন করবে।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় : মেঘনাদ রচনা সংকলন

বাঙলাতে কোনো বাঙালিকে বড়ো লোক বলে মানে না, যতক্ষণ না সে মরে।

প্রমথ চৌধুরী : রাম ও শ্যাম

বাঙালির বিশ্বাস—মানুষের মতো মানুষ দেশে নাই, আছে শুধু বিদেশে।

প্রমথ চৌধুরী : রাম ও শ্যাম

বাঙ্গালীর......জাতীয় চরিত্রে পরনির্ভরতা ও অলসতার জায়গায় কর্মশীলতা ও আত্মনির্ভরতাকে প্রতিষ্ঠিত না করলে আমাদের মুক্তির উপায় নেই।

মেঘনাদ সাহা : জাতীয় উন্নতির উপায়

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক,
হে ভগবান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান-বাংলার মাটি, বাংলার জল

দুঃখসহার তপস্যাতেই হোক বাঙালির জয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠি (পূরবী)

সাতকোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালি করে—মানুষ কর নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বঙ্গমাতা (চৈতালি)

তৈল-ঢালা স্নিগ্ধ তনু
নিদ্রারসে ভরা,
মাথায় ছোটো বহরে বড়ো
বাঙালি সন্তান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দুরন্ত আশা

বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, কিন্তু বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ কিন্তু সবল নহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগর চরিত

বাঙালি বাংলাদেশে জন্মেছে বলেই যে বাঙালি তা নয়। বাংলাভাষার ভিতর দিয়ে মানুষের চিত্তলোকে যাতায়াতের বিশেষ অধিকার পেয়েছে বলেই সে বাঙালি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের পথে (সভাপতির অভিভাষণ)

বাঙালি চিরদিন দালালি করতেই পারে, কিন্তু দল গড়ে তুলতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের পথে (পঞ্চাশোর্ধম)

বুকে নাই আশা, মুখে নাই ভাষা নাহি সে পূর্ব খ্যাতি,
গৌরবময় বাঙালী এখন মুমূর্ষু এক জাতি।

সুনির্মল বসু : আমরা বাঙালী

যেখানে বাঙালী যেখানে কেবল দল আর দলাদলি।

সুনির্মল বসু : আমরা বাঙালী

বাঙালী মুসলমান

বাঙালি মুসলমানদের সামাজিক অবস্থা বড় করুণ। কেউ তাদের দলে নিতে চায় না। বাঙালি হিন্দুদের কাছে তারা শুধু মুসলমান, বাঙালি নয়। আবার বিহারী মুসলমানদের কাছে তারা মুসলমান নয়, বাঙালি। দুটি সত্তা নিয়ে কোথাও কলকে পাচ্ছে না বাঙালি মুসলমান। আমাদের ভাষা যেহেতু বাংলা, বিহারী মুসলমানদের কাছে বাঙালি মুসলমান নাকি হিন্দুরই সামিল।......বিহারী মুসলমানদের কাছে অচ্ছুত হয়ে বাঙালিদের দলে ভিড়ে নিজেকে গর্বিত করে তোলার চেষ্টা চালালে, সেখানে আবার আর এক ধাক্কা। "আরে, আপনাকে তো মুসলমান বলে চেনাই যায় না। ভেবেছিলাম আপনি বাঙালি।"

আজিজুল আজিজ ঃ বাঙালি মুসলমান (প্রতিদিন ২৬.১০.২০০২)

পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানের প্রাণশক্তি বেশি। আজ সে যতই বিক্ষুব্ধ বঞ্চিত বা নিপীড়িত হউক না কেন, সে সংখ্যার জোরে, মনের জোরে ও ভরসায় বাঙালিই আছে। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি অস্তমান, তাহারা উদীয়মান। পূর্ববঙ্গের মুসলমানের স্বাভাবিক বাঙালিত্ব বেশি।

নীরদচন্দ্র চৌধুরী ঃ পূর্ববঙ্গের সমস্যা

বাঁচা

সর্বস্বান্ত হয়েও তো কেউ কেউ
বাঁচার মন্ত্র জানে।

পূর্ণেন্দু পত্রী ঃ আমি আছি আমার শষ্যে বীজে (প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণ)

না বাঁচাবে আমায় যদি
মারবে কেন তবে।
কিসের তরে এই আয়োজন
এমন কলরবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতালি—৩২

বাঁচান বাঁচি, মারেন মরি,
বলো ভাই ধন্য হরি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

বাঁচবার চেষ্টাতেও মানুষ অনেক সময় মরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানুষের ধর্ম-১

বাঁশি

বাঁশি তার কোথায় বাজে। বাজে মোর দহন-জ্বালায়,
বাজে মোর ব্যথার মাঝে, কোথায় বাজে, কোথায় বাজে।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ 'আকাশবাণী' গীতি-আলেখ্য

বাঁশিতে সুর শুনিয়ে নূপুর রুন্‌ঝুনিয়ে
এলে আজি বাদল প্রাতে।
কদম-কেশর-ঝুরে পুলকে তোমারই পায়ে
তমাল বিছায় ছায়া শ্যামল আদুল গায়ে,
অলকা-পথ বাহি' আসিলে মেঘের নায়ে
নাচের তালে বাজিয়া ওঠে চুড়ি কাঁকন হাতে॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাব্য-গীতি

বাঁশী বাজান জানো না।
অসময়ে বাজাও বাঁশী পরাণ মানে না॥
যখন আমি বৈসা থাকি গুরুজনার মাঝে।
নাম ধইরা বাজাও বাঁশী আমি মইরি লাজে॥
চাঁদ কাজি বলে বাঁশী শুনে ঝুরে মরি।
জীমুনা জীমুনা আমি না দেখিলে হরি॥

চাঁদ কাজি : গান (বৈষ্ণব পদ)

মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানাহ বিশেষ॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী অতি অনুপাম।
কোন রন্ধ্রে রাধা বলি ডাকে আমার নাম॥
কোন রন্ধ্রে বাজে বাঁশী সুললিত ধ্বনি।
কোন রন্ধ্রে কেকা শব্দে নাচে ময়ূরিণী॥

জ্ঞানদাস : বৈষ্ণব পদাবলী

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইল রন্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হঁআ তার পাত্র নিশিবোঁ আপনা॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী।

বড়ু চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

যে পাওয়া শুধু রক্তে নাচে, স্বপ্নে যাহা গাঁথা,
        ছন্দে যার হল আসন পাতা,.......
        সে ভাষা মোর বাঁশিই শুধু জানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অন্তরতম (বীথিকা)

যে-কথাটা কান্না হয়ে বোবার মতন ঘুরে বেড়ায় বুকে
        উঠল ফুটে বাঁশির মুখে।
বাঁশির ধারেই একটু আলো, একটুখানি হাওয়া,
যে-পাওয়াটি যায় না দেখা স্পর্শ-অতীত একটুকু সেই পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কালো মেয়ে (পলাতকা)

    আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে॥
    ভরে রইল বুকের তলা, কারোকাছে হয় নি বলা,
    কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে॥
আমার চোখে ঘুম ছিল না গভীর রাতে,
চেয়ে ছিলেম চেয়ে থাকা তারার সাথে।
    এমনি গেল সারা রাতি, পাই নি আমার জাগার সাথি—
    বাঁশিটিরে জাগিয়ে গেলেম গানে গানে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতপঞ্চাশিকা)

মরিলো কার বাঁশি নিশিভোরে বাজিল মোর প্রাণে
ফুটে দিগন্তে অরুণকিরণকলিকা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে॥
ভেবেছিলাম ঘরে রব, কোথাও যাব না—
ওই-যে বাহিরে বাজিল বাঁশি, বলো কী করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতমালিকা)

সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে— বনমাঝে কি মনোমাঝে॥
বসন্তবায় বহিছে কোথায়,
কোথায় ফুটেছে ফুল,
বলো গো সজনী, এ সুখরজনী
কোন্‌খানে উদিয়াছে—বনমাঝে কি মনোমাঝে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতিমালা)

আমার অঙ্গে অঙ্গে কে বাজায় বাঁশি
আনন্দে বিষাদে মন উদাসী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা—৫

বাঁশি কি বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কি বলিতে চাহে, তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না ; কেবল দুটি চক্ষু ভরিয়া অশ্রুজলে জাগিয়া উঠিল এবং একটি আলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জয়পরাজয় (গল্পগুচ্ছ)

কলের বাঁশি যাহারা শুনিতেছে মাঠের "বাঁশের বাঁশরি" শুনিয়া তাহারা ব্যাকুল হয় এবং যাহারা বাঁশের বাঁশুরি বাজাইয়া থাকে কলের বাঁশি শুনিলে তাহাদের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিহারীলাল (আধুনিক সাহিত্য)

বাঁশি যদি সত্যই কাঁদিত বেদনায়,
ফেটে গিয়ে সংগীত নীরব হত তার।
মিথ্যা বলে তাই এত হাসি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিসর্জন—২।৩

অনন্ত আকাশের ফাঁক না পেলে বাঁশি বাজে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মেঘদূত (লিপিকা)

ওর ঐ বাঁশের বাঁশিতে সুর বাজল, কিন্তু আমার সোনার বাঁশি কেবল বয়েই বেড়ালেম, আগলে বেড়ালেম, বাজাতে পারলেম না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সুয়োরানীর সাধ (মেঘদূত)

বঁধূ একি করিলে গো বাঁশীরে জাগায়ে
পথের পথিক, সখা!
মোর পিঞ্জরাহত পরাণ-পাখির
চঞ্চল হল পাখা।

....

সে যে কাননে বাজিছে মর্মর রবে
কল্লোল নদীজলে,

সে যে গগনের তলে গানে কোলাহলে
ধ্বনিছে শতেক ছলে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ বাঁশী (ফুলের বসন)

বাচিক অভিনয়

সার্থক বাচিক অভিনয়ের জন্য চাই—রীতিমত স্বরসাধনা, পরিস্ফুট উচ্চারণ, ছন্দ-লয়-যতি বিশিষ্ট বাগ্‌বিন্যাস, শব্দপ্রক্ষেপণ, স্বর দ্বারা ভাবব্যঞ্জনা ও ব্যক্তিব্যঞ্জনা। বাগভিনয়ে প্রয়োজন বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর যা তিন গ্রামেই সমানভাবে বল রক্ষা করে অবলীলাক্রমে উঠানামা করতে পারে। দ্বিতীয়তঃ চাই—পরিস্ফুট উচ্চারণ, শব্দান্তর্গত স্বর ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচ্ছিন্ন উচ্চারণ। তৃতীয়তঃ চাই—অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য সমর্থ শব্দের অক্ষরের উপরে উপযুক্ত শ্বাসাঘাত দেওয়া। চতুর্থতঃ চাই—সুশ্রাব্য ও স্পষ্টার্থক করার জন্য বাক্যোচ্চারণে ছন্দ, লয়, ও যতি বজায় রাখা। পঞ্চমতঃ চাই—প্রত্যেক শব্দকে দর্শকের কানে পৌঁছে দেবার কৌশল। ষষ্ঠতঃ চাই—ভাবব্যঞ্জনার জন্য উপযুক্ত স্বরের সৃষ্টি এবং সপ্তমতঃ চাই—চরিত্রানুসারে স্বরের পরিবর্তন। অর্থাৎ কণ্ঠস্বর দ্বারা চরিত্র দ্যোতনা। বাচিক অভিনয়ে সাফল্য অর্জন করতে হলে এর কোনটিকেই উপেক্ষা করা চলবে না।

ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য ঃ নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ

বাজে

অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়, কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে।.....ভালোবাসার উৎসবও কেবলমাত্র দুটি লোকের দ্বারা সম্পন্ন হয় না—সুখালাপের মিষ্টান্ন বিতরণের জন্য বাজে লোকের দরকার হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চোখের বালি—১১

বিধাতা......আসল জিনিষ সৃষ্টি করেছেন বাজে জিনিষকে লালন করবার জন্য। তিনি সম্মান দেন ফলের আঁঠিকে, ভালোবাসা দেন ফলের শাঁসকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

যেমন বাজে খরচ, তেমনি বাজে কথা।.......উপদেশের কথা যে রাস্তা দিয়া চলে মনুর আমল হইতে তাহা বাঁধা, কাজের কথা......কেজো সম্প্রদায়ের পায়ে পায়ে তৃণপুষ্পশূন্য চিহ্নিত হইয়া গেছে। বাজে কথা নিজের মতো করিয়াই বলিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাজে কথা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

বাড়ি/বাটী

প্রতিটি মানুষের মনেই বোধ হয় স্বপ্নের রঙে আঁকা থাকে একটি সাধের বাড়ির ব্লুপ্রিন্ট। **অপর্ণা সেন** ঃ সম্পাদকীয় (সানন্দা, ১৫.৬.২০০৩)

তুমি যেন এক পরদায়-ঢাকা-বাড়ি,
আমি অঘ্রাণ-শিশিরে-সিক্ত হাওয়া—
বিনিদ্র তাই দিনরাত ঘুরি ফিরে।

বিষ্ণু দে ঃ ওফেলিয়া (চোরাবালি)

যে বাটীতে রোগীর সেবা ভাল না হয়, সে বাটী ভাল নয়। সে বাটীতে স্নেহমমতা কম, স্বার্থপরতা বেশী, আত্মত্যাগশক্তি ন্যূন, বিলাসিতা অধিক। সে বাটীর স্ত্রী-পুরুষেরা সহজেই ধর্মপথ ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে, কখন কোন উন্নত জীবনের অধিকারী হইতে পারে না।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ প্রবন্ধ

একটি ছোট বাড়ি আমার গন্ধভরা পুষ্প খামার,
আগ-দুয়ারে রৌদ্র ছায়ার কপাট।
হা-ঘর কতক নগর জনা দেখতে কেবল মন্দও না,
যোগসাজসে করতে চায় তা লোপাট।
আমিও পরিবর্তে তার হয়ে গেলুম ঘর থেকে বার
আপন হাতে আগুন দিয়ে চালায়।
পুষ্প গলার মাল্য করে ওরা তখন জিকির ধরে
আগুন পোহায় দারুণ শীতের জ্বালায়।

শামসুল ইসলাম : পরিবর্তে

বাড়ি তো কেবল ইঁট কাঠ নয়। মনের শান্তি, দেহের বিশ্রাম—এসব নিয়ে বাড়ি।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : যাও পাখি

বাণিজ্য

বাণিজ্য বুঝিস? কেমন কারবার সেটা, মানুষ মানুষকে ঠকায়, লাভের হিসাব ছাড়া পিতা পুত্রের সাথে কথা না কয়,.....মনের মধ্যে লাভ আর লোভের বাসনা জ্বলজ্বল করে.....।

মান্নান হীরা : একজন লক্ষিন্দর

এক সময়ে মানুষ বলেছিল, বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ। তখন মানুষ লক্ষ্মীর যে পরিচয় পেয়েছিল সে তো কেবল ঐশ্বর্যে নয়, তাঁর সৌন্দর্যে। তার কারণ, বাণিজ্যের সঙ্গে তখন মনুষ্যত্বের বিচ্ছেদ ঘটেনি।......যখন থেকে কল হল বাণিজ্যের বাহন তখন থেকে বাণিজ্য হল শ্রীহীন। প্রাচীন ভেনিসের সঙ্গে আধুনিক ম্যাঞ্চেস্টরের তুলনা করলেই তফাতটা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাবে।.....কল-বাহন বাণিজ্য যেখানেই গেছে সেখানেই আপনার কালিমায় কদর্যতায় নির্মমতায় একটা লোলুপতার মহামারী সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তীর্ণ করে দিচ্ছে।.....অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী ; তাঁর অন্নপরিবেষণের হাতা আজ হয়েছে রক্ত পান করবার খপর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপান-যাত্রী

যাবই আমি যাবই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
লক্ষ্মীরে হারাবই যদি, অলক্ষ্মীরে পাবই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তাসের দেশ

বাণিজ্যের স্রোত
ধরণী বেষ্টন করে জোয়ার-ভাঁটায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রা (বিচিত্রিতা)

বাণিজ্য এখন আর নিছক বাণিজ্য নহে, সাম্রাজ্যের সঙ্গে একদিন তার গান্ধর্ব বিবাহ ঘটিয়া গিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লড়াইয়ের মূল্য (কালান্তর)

পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।

রামেশ্বর : শিবায়ন

বাতাস

বাতাস করিছে দুরন্তপনা
ঘরেতে ঢুকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অবিনয় (ক্ষণিকা)

নিরাশ্বাস উদাস বাতাসে
নিঃশ্বসিয়া কেঁদে ওঠে বন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : এবার ফিরাও মোরে (চিত্রা)

মন্দ মন্থর বাতাস—
সঙ্গশূন্য সায়াহ্নের বৈরাগ্যনিশ্বাস।
স্বর্গসুখে ক্লান্ত কোন্ দেবতার বাঁশির পূরবী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছবি (পূরবী)

তাম্রবরন তপ্ত আকাশে
বাতাস হুহু করে ওঠে,
সে যে বিদায়ের নিত্যভাঁটায় ভেসে-চলা
মহাকালের দীর্ঘনিশ্বাস,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট—চার

বাতাসটা যেন মুখচোরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—৩০।৯।২৪

বাতাস ছুটিছে বনময় রে,
ফুলের না জানে পরিচয় রে।
তাই বুঝি বারে বারে কুঞ্জের দ্বারে দ্বারে
শুধায়ে ফিরিছে জনে জনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী—১

বাতাস বলে, আমি পথিক, আমার ভাষা বোঝ বা নাই বোঝ,
আমি বুঝি তোমরা কারে খোঁজ—
আমি শুধু যাই চলে আর সেই অজানার আভাস করি দান,
আমার শুধু গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাতাস (পূরবী)

বসন্ত বাতাসে
চঞ্চল বাসনাব্যথা সুগন্ধ নিশ্বাসে—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

পৌর পথের বিরহী তরুর কানে
বাতাস কেন বা বনের বারতা আনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

বসন্ত-বাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা-১৭

বাতাসটি বয় মনের কথা জাগালে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সম্বরণ (ক্ষণিকা)

সুন্দর বাতাস
মুখে চক্ষে বক্ষে আসি লাগিছে মধুর—
অদৃশ্য অঞ্চল যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
উড়িয়া পড়িছে গায়ে ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুখ (চিত্রা)

বাদল

বাদল-দিনের প্রথম কদম ফুল করেছ দান।
আমি দিতে এসেছি শ্রাবণের গান॥
মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে রেখেছি ঢেকে তারে
এই-যে আমার সুরের ক্ষেতের প্রথম সোনার ধান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

বাদলবেলা বাজায়ে দিল তূরী,
প্রহরগুলো ঢাকিয়া মুখ
করিল আলো চুরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছায়াছবি (বীথিকা)

বাদল-মেঘে মাদল বাজে গুরুগুরু গগন-মাঝে॥
তারি গভীর রোলে আমার হৃদয় দোলে,
আপন সুরে আপনি ভোলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা-১

বাদল-বাউল বাজায় রে একতারা—
সারা বেলা ধরে ঝরোঝরো ঝরে ধারা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা—২

বাদল-ধারা হল সারা, বাজে বিদায়-সুর।
গানের পালা শেষ করে দে রে, যাবি অনেক দূর॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা—২

এস তুমি বাদল-বায়ে ঝুলন ঝুলাবে ;
কমল-চোখে কোমল চেয়ে কূজন ভুলাবে।
শীতল হাওয়া-নিতল রসে—
বনের পাখি ঘনিয়ে বসে ;
আজ আমাদের এই দোলাতেই দুজন কুলাবে ;
এস তুমি নূপুর পায়ে ঝুলন ঝুলাবে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ বর্ষা নিমন্ত্রণ (অভ্র-আবীর)

বাধা

এমন এক-একটা ঘটনা জীবনে ঘটে, যখন মানুষের বুদ্ধি বিবেচনা যুক্তিবিচার সমস্ত কিছু গোলমাল হয়ে যায় হঠাৎ। সমস্ত আইন, সমস্ত বিশ্বাস ধূলিসাৎ হয়ে যায় এক নিমেষে। যদি তা না হতো তাহলে মানুষ এমন অনিশ্চিতের দিকেও দৌড়ত না, বাধা পেলে সেই বাধাকেই শাশ্বত বলে স্বীকার করে নিয়ে নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকতো। হয়ত এই বাধা আছে বলেই বাধা থেকে মুক্তি পাবার এত আনন্দ। হতাশা আছে বলেই হয়ত মানুষ আশা করতে এত ভালবাসে, বেদনাই হয়ত আনন্দের পরমায়ু।

বিমল মিত্র ঃ কড়ি দিয়ে কিনলাম (২য় খণ্ড)

বাধা

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরূপরতন

'পদে পদে বাধা তব'.......কহে তারে নর।
কবি কহে,.........'তাই নারী হয়েছে সুন্দর'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কণিকা

বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চার দিকে তার বাধা বলেই এমন সুর; অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপটা করে দিতুম তা হলে......রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিলত না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরে-বাইরে—সন্দীপের আত্মকথা

কোনো বাধা যে নাই, তাহাই সর্বাপেক্ষা বড়ো বাধা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চোখের বালি-৪০

বাধাতেই বাধার উপর টেনে আনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ-৩৯

বাধা পেলেই শক্তি নিজেকে চিনতে পারে—চিনতে পারলেই আর ঠেকান যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রথের রশি (কালের যাত্রা)

ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায়, দামী জিনিষকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা

বান

বান এসেছে মরা গাঙে খুলতে হবে নাও।
তোমরা এখনও ঘুমাও।

মুকুন্দ দাস : গান (বান এসেছে মরা গাঙে)

বানর

বানর দুই শ্রেণীর—এক বনের বানর, দুই মনের বানর।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : ভাল বই কেনো (বইমেলা জুলাই, '৯৬)

চতুষ্পদ মধ্যে বানরদিগের সঙ্গে মনুষ্যগণের বিশেষ সাদৃশ্য। পণ্ডিতেরা বলেন যে, কালক্রমে পশুদিগের অবয়বের উৎকর্ষ জন্মিতে থাকে ; এক অবয়বের পশু ক্রমে অন্য উৎকৃষ্টতর পশুর আকার প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের ভরসা আছে যে, মনুষ্য-পশুও কালপ্রভাবে লাঙ্গুলাদিবিশিষ্ট হইয়া ক্রমে বানর হইয়া উঠিবে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল

বাবু

যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সঙ্গীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্তজ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু।......যিনি রূপে কার্তিকেয়ের কনিষ্ঠ, গুণে নির্গুণ পদার্থ, কর্মে জড়ভরত এবং বাক্যে সরস্বতী, তিনিই বাবু। বিষ্ণুর ন্যায় ইঁহাদিগেরও দশ অবতার—যথা, কেরানী, মাস্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সম্বাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্ম্মা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বাবু (লোকরহস্য)

যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক, কথনে দশ, লিখনে শত এবং কলহে অজস্র, তিনিই বাবু। যাঁহার বল হস্তে একগুণ, মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্য্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তক মধ্যে, যৌবনে বোতল মধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বাবু (লোকরহস্য)

ভাগ্যমান লোকের সন্তানদিগকে বাবু বলিতে হয়।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় : নববাবু বিলাস

বাম

বন্ধু তোমার পথ নয় দক্ষিণে—
বামপথ নিও চিনে।

দিনেশ দাস : বামপন্থী

বামুন

জাতে বামুন—অবশ্য পুরুতবামুন নন, রাঁধুনী বামুনও নন, কনট্র্যাক্টর বামুন, ওরফে টাকার কুমির।

ফাদার দ্যাতিয়েন : ডায়েরির ছেঁড়াপাতা

বারাণসী

এই বারাণসী কোশল দেবীর বিবাহের যৌতুক,—
দেখিতেছি যেন বিম্বিসারের বিস্মিত স্মিতমুখ।
নৃপতি অশোকে দেখিতেছি চোখে বিহারের পইঠায়,
শ্রমণগণের আশীর্বচনে প্রাণ-মন উথলায়।
সমুখে হাজার স্থপতি মিলিয়া গড়িছে বিরাট স্তূপ,
শত ভাস্কর রচে বুদ্ধের শত জনমের রূপ।
চিক্কণ চারু শিলার ললাটে লিখিছে শিল্পজীবী
ধর্মাশোকের মৈত্রীকরুণ অনুশাসনের লিপি!
মহাচীন হতে ভক্ত এসেছে মৃগদাব-সারনাথে,—
স্তূপের গাত্র চিত্র করিছে সূক্ষ্ম সোনার পাতে।
জয়! জয়! জয় কাশী!
তুমি এসিয়ার হৃদয়-কেন্দ্র,—মূর্ত ভকতিরাশি!

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : বারাণসী

বালক

এমন বালক কোন অকিঞ্চনের ঘরেও জন্মগ্রহণ করে নাই, পকেটে রাখিবার মতো স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যাহার কিছুমাত্র নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি

বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়—
এ কি গো বিস্ময়।
অবাক আমি তরুণ গলার গান শুনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী

বাসনা

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি।

বুদ্ধদেব বসু : বন্দীর বন্দনা

মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একটি আষাঢ়ে গল্প (গল্পগুচ্ছ)

বক্ষ হইতে বাহির হইয়া
আপন বাসনা মম

ফিরে মরীচিকাসম।
বাহু মেলি তারে বক্ষে লইতে
বক্ষে ফিরিয়া পাই না।
যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই
যাহা পাই তাহা চাই না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৭

বাসনা যখন বিপুল ধুলায়
অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র,
রুদ্র আলোকে এসো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি -৫৮

আমি বহু বাসনায় প্রাণপণে চাই,
বঞ্চিত করে বাঁচালে মোরে
এ কৃপা কঠোর সঞ্চিত মোর
জীবন ভরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি-২

বাসন্তী

বাসন্তী রং সাড়ি পরো খয়ের রঙের টিপ।
সাঁঝের বেলায় সাজবে যখন জ্বালবে যখন দীপ।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাব্য-গীতি

বাসন্তী, হে ভুবনমোহিনী,
দিকপ্রান্তে, বনবনান্তে,
শ্যাম প্রান্তরে, আম্র ছায়ে,
সরোবর তীরে, নদীনীরে,
নীল আকাশে, মলয় বাতাসে
ব্যাপিল অনন্ত তব মাধুরী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

বাসন্তী-রঙ বসন খানি
নেশার মত চক্ষে ধরে,
তোমার গাঁথা যূথীর মালা
স্তুতির মত বক্ষে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ *সোজাসুজি (ক্ষণিকা)*

বাসা

মানুষের মনই হচ্ছে মানুষের ঠিক বাসা।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ বনমালীর বিষয় (ক্রীড়াভূমি)

বিচার

বিচারের শুদ্ধতা সমাজের স্তম্ভস্বরূপ।

অরবিন্দ ঘোষ ঃ ধর্ম

বিচার নিষ্ঠুর নয়, সে সাংসারিক সুখ-দুঃখের গণ্ডীর উর্ধ্বে,। জাস্টিস ইজ ডিভাইন।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *বিচারক*

যেখানে মাথার উপর প্রভুর আরক্ত চক্ষু চেয়ে আছে, সেখানে আবার বিচার!

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সাজাহান ৪।৬

দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান্ধারীর আবেদন

যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিখিলেশের আত্মকথা (ঘরে বাইরে)

বরঞ্চ আপন জনে আপনার হাতে
দণ্ড দিতে পারে নারি ; পারে না সহিতে পরের বিচার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—১/১

আমি-যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি-যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রশ্ন (পরিশেষ)

বিচারক

মধ্যরাত্রির পৃথিবী ধ্যানমগ্নার মত স্তব্ধ। আকাশে চাঁদ মধ্যগগনে মহাবিরাটের ললাট-জ্যোতির মত দীপ্যমান। কাটা কাটা মেঘের মধ্যে বর্ষণধৌত গাঢ়নীল আকাশখণ্ড নিরপেক্ষ মহাবিচারকের ললাটের মত প্রসন্ন। বিচারক যেন আসন গ্রহণ করে অপেক্ষা করছেন।

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় : বিচারক

মহাকাল সিংহাসনে—
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রান্তিক—১৭

বিজনেস

রাজ্যের মঙ্গল করাটাই আমার আসল বিজনেস।

শংকর : যাবার বেলায়

উনি যখনই বৈরাগ্যের কথা বলেন তখনই একটা নতুন বিজনেস স্টার্ট হয়।

শংকর : যাবার বেলায়

বিজয়া/বিজয়া দশমী

বিজয়া দশমীর.........রাত্রিটি বড় পবিত্র, হরপার্বতীর মিলনের রাত্রি।

কনক মুখোপাধ্যায় : পতিব্রতার বিজয়া দশমী

বিজয়া/বিজয়া-দশমী—ঐ দিন যুদ্ধাদি কার্যে যাত্রা করিলে বিজয় লাভ বলিয়া নাম।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস : বাঙ্গালা ভাষার অভিধান

বিজ্ঞান

বিজ্ঞানকে বলা যেতে পারে, প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ শৃঙ্খলাবদ্ধ জ্ঞান।......বিজ্ঞানের একটা সত্য আর একটা সত্যের সন্ধান দেয়। সব জানা হয়ে গেছে, এমন কথা বিজ্ঞান কখনই বলে না, বরং সর্বদাই তার প্রচেষ্টা হল অস্পষ্টতা থেকে স্পষ্টতায় নিয়ে যাওয়া।

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় : জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান

বিজ্ঞান ছাড়া মানবমুক্তির আর কোন পথই নেই।......তাই বাঁচবার পথ বলতে একটাই। পুঁজিবাদী শ্রেণীর কবল থেকে বিজ্ঞানের তাঁবেদারি হঠিয়ে প্রকৃত মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানকে নিয়োগ করা।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ আবিষ্কারের অভিযান

বিজ্ঞান জগতের যে নূতন রূপ উন্মোচিত করিয়াছে সে সম্বন্ধে কবিরা অনেকেই অজ্ঞ। তাঁহারা শাস্ত্রবাদী, স্বর্গীয় জগতে বিশ্বাসী এবং অর্থনীতিতে মধ্যবিত্ত মনোবৃত্তিসম্পন্ন। আধুনিক বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক দিকটিই কেবল তাঁহারা দেখিতে পান—অর্থাৎ বিষাক্ত গ্যাস, রাসায়নিক যুদ্ধ, প্রাণহীন যন্ত্র প্রভৃতি। আইনস্টাইন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের আভাস দিয়াছেন যেখানে স্থান ও কাল একাত্ম তাহা সম্বন্ধে ইঁহাদের কোনই ধারণা নাই।

মেঘনাদ সাহা ঃ কাব্য ও বিজ্ঞান

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েস।

যাযাবর ঃ দৃষ্টিপাত

বিজ্ঞানী

বিজ্ঞানীরা ধর্মের গোঁড়া অনুশাসন মুক্ত হইয়া প্রকৃতির অন্তরের সত্তার উপাসনায় রত। প্রাণহীন সাঙ্কেতিক মূর্তি অপেক্ষা প্রাণের পূজায় ইঁহারা বিশ্বাসী। যজ্ঞবেদী ছাড়িয়া বিজ্ঞানীরা মন্দির স্থাপন করিয়াছেন তাঁহাদের গবেষণাগারে।

মেঘনাদ সাহা ঃ কাব্য ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞাপন

বিজ্ঞাপন দাতাদের হাতে চলে যাচ্ছে দেশের সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, সঙ্গীত।

আশাপূর্ণা দেবী ঃ সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা (উদ্বোধন ৮৮/৯)

আধুনিক শিল্পসমাজে বিজ্ঞাপনশিল্পই রীতিমতো একটা প্রধান শিল্প হয়ে উঠেছে এবং তাতে যে কত শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতিভা ভাড়া খাটছে তার অন্ত নেই।

বিনয় ঘোষ ঃ মেট্রোপলিটন মন ও বিদ্রোহ

বিজ্ঞাপনই এখন সাহিত্য পত্রিকা এবং বিশেষ করে বাংলা সাহিত্যের জনক। চুলের তেল এবং সাবানের বিজ্ঞাপনই ত এখন বাংলা সাহিত্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বুদ্ধদেব গুহ ঃ মাধুকরী

বিদ্যা

বিদ্যার এখনও এ তেজ আছে যে সে ঐশ্বর্যের মস্তকে পদাঘাত করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সাজাহান ৫/৫

বিদ্যা বাঙ্গালির স্বতঃসিদ্ধ, তজ্জন্য লেখা-পড়া শিখিবার প্রয়োজন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ ইউটিলিটি বা উদর দর্শন (কমলাকান্তের দপ্তর)

বিদ্যা যাকে বলি, তারই
আর একটি নাম সুন্দর।

বুদ্ধদেব বসু ঃ বিদ্যাসুন্দর

বিদ্যা সম্বন্ধে আমার একটুও নড়চড় নেই—ওই যাকে বলে ধ্রুব নক্ষত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অচলায়তন

—শিখিয়াছি ধনুর্বিদ্যা
শুধু শিখি নাই, দেব, তব পুষ্পধনু
কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।
—সুনয়নে, সে বিদ্যা শেখে না কোন নারী।
নয়ন আপনি করে আপনার কাজ,
বুকে যার বাজে সেই বোঝে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা—১

যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যাটা ঢের বেশি দুরূহ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরকুমার সভা ৪/১

বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের স্থূল অহংকার।
বিদ্যারে করেছে অলংকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নাম্নী—নাগরী (মহুয়া)

কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কালচার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১

দয়া ভক্তি বৈরাগ্য বিদ্যার ঐশ্বর্য।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সেই বিদ্যা ; আর সব মিছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

বিদ্যালয়

যে বিদ্যালয় চারিদিকের জীবন ও সৌন্দর্যের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন জেলখানা ও হাসপাতাল-জাতীয় এক নির্মম বিভীষিকা তাহার নিত্য-আবর্তিত ঘানির সঙ্গে কোনোমতেই আপনাকে জুড়িতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রত্যাবর্তন (জীবনস্মৃতি)

বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবলমাত্র হিন্দু শাস্ত্রীয় গ্রন্থ এবং হিন্দু শাস্ত্রীয় কুসংস্কারের কবল থেকেই যে ছাত্রদের উদ্ধার করতে সচেষ্ট ছিলেন তাই নয় ; তিনি ভাববাদী প্রভাবকেও শিক্ষাক্ষেত্রে যতখানি সম্ভব খণ্ডন করার জন্যে সবিশেষ যত্নবান ছিলেন।

বদরুদ্দীন উমর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও
উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ

মধুসূদন (বিদ্যাসাগরকে)—তুমি ঈশ্বর, তুমি চন্দ্র, তুমি বিদ্যা, তুমি সাগর। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর।

বিধায়ক ভট্টাচার্য : মাইকেল মধুসূদন (৩/২)

বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু।

মধুসূদন দত্ত : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর ছিলেন আধুনিক........তিনি আপনার মধ্যে সত্যের তেজ, কর্তব্যের সাহস অনুভব করে ধর্মবুদ্ধিকে জয়ী করবার জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদ্যাসাগর

বিদ্যাসাগর যথার্থ মানুষ ছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয়। তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিদ্যাসাগর-চরিত

বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।......বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিদ্যাসাগর চরিত

বীরসিংহের সিংহ শিশু! বিদ্যাসাগর! বীর!
উদ্বেলিত দয়ার সাগর,—বীর্যে সুগম্ভীর!
সাগরে যে অগ্নি থাকে কল্পনা সে নয়,
তোমায় দেখে অবিশ্বাসীর হয়েছে প্রত্যয়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ সাগর-তর্পণ (কুহু ও কেকা)

বিদ্রূপ

যথার্থ ভালো জিনিষকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে, মনুবংশীয়রা হনুবংশীয়দিগকে বিদ্রূপ করিয়া কখনো তেমন কৃতকার্য হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সম্পাদক (গল্পগুচ্ছ)

প্রভাত-আলোরে বিদ্রূপ করে ও কি
ক্ষুরের ফলার নিষ্ঠুর ঝকমকি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

বিদ্রোহ

যারা নিজেদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী মনে করেন, তাঁরা কখনো বিদ্রোহকে মেনে নিতে পারেন না, সহ্যও করতে পারেন না। এটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনার মতো।

সমরেশ বসু ঃ রাজা

আকাশে আকাশে ধ্রুবতারায়
কারা বিদ্রোহে পথ মাড়ায়
ভরে দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়,
জানে না কেউ।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ কবিতার খসড়া (ঘুম নেই)

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে,
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ অনুভব ১৯৪৬ (ছাড়পত্র)

বিদ্রোহী বিদ্রোহিনী

আমিই প্রথম
বিদ্রোহিনী
তোমার ধরায়
আমিই প্রথম।......
স্বর্গেতর
মানব জীবন
জেনেছিলাম
আমিই প্রথম।

কবিতা সিংহ ঃ ঈশ্বরকে ইভ

মহা বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত,
যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।

কাজী নজরুল ইসলাম : বিদ্রোহী

অতীতের বিদ্রোহীকেই দেখা গেছে বর্তমানের নিয়মতান্ত্রিক পোষাকে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : স্বগত

বিধবা

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে বাজিয়াছে ঢোল॥.....
কেহ বলে এই বিধি কেমনে হইবে।
হিন্দুর ঘরের রাঁড়ী সিঁদুর পরিবে॥
বুকে ছেলে কাঁকে ছেলে ছেলে কোলে কোলে।
তার বিয়ে বিধি নয় উলু উলু বলে॥

ঈশ্বর গুপ্ত : বিধবা বিবাহ

বিধাতা

জীবন-বিধাতা আজি বিদ্রোহীর লহ নমস্কার!
লহো এই প্রীতিহীন প্রণিপাতখানি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : নমস্কার (প্রথমা)

ফুলদল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?

মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য-১

যে বিধাতা আগুন সৃষ্টি করেছেন পতঙ্গও তিনিই জুটিয়ে দেবেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরকুমার সভা ১/১

বিধি

এই দেহ ভেঙে হয় রে মাটি, মাটিতে হয় দেহ,
যে কুমোর গড়ে সেই দেহ—তার খোঁজ নিল না কেহ॥
রাতে রাজা সাজে নাট-মহলে দিনে ভিক্ষা মেগে পথে চলে,
শেষে শ্মশান-ঘাটে গিয়ে দেখে সবই মাটির ঢেলা।
এই ত বিধির খেলা রে ভাই ভব-নদীর খেলা॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (এ কূল ভাঙে)

বিধির মুখ চারিটা কী কারণে।
একটাতে দর্শন
করে বাণী বর্ষণ,
একটা ধ্বনিত হয় বেদ উচ্চারণে।
একটাতে কবিতা
রসে হয় দ্রবিতা,
কাজে লাগে মনটারে উচাটনে মারণে।

নিশ্চিত জেনো তবে,
একটাতে হো হো রবে
পাগলামি বেড়া ভেঙে উঠে উচ্ছ্বাসিয়া।
তাই তারি ধাক্কায়
বাজে কথা পাক খায়,
আওড় পাকাতে থাকে মগজেতে আসিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : খাপছাড়া

নতশিরে
প্রতীক্ষা করিয়া থাকো বিধির বিধিরে
ধৈর্য ধরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান্ধারীর আবেদন

বিপদ

বিপদ-আপদটা যতক্ষণ না আসে ততক্ষণই ভয়, সেটা যখন শিয়রে শমন হিসাবে হাজির হয়ে যায় তখন আর ভয় থাকে না।

আজিজুল হক : কারাগারে ১৮ বছর

বিপদ

বিপদে মোরে রক্ষা করো
এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি-৪

বিপদের ভয় বিপদ ডেকে আনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তপতী-১

অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, সত্যকার বিপদ কাল্পনিক বিপদের চেয়ে ঢের সুসহ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শ্রীকান্ত দ্বিতীয়-৫

বিপ্লব

হাজার মৃত্যুর মাইলস্টোন গুণতে গুণতেই বিপ্লবকে হেঁটে যেতে হয়, বিপ্লব এক রক্তমাখা শিশু.....লেনিনের রাষ্ট্র ও বিপ্লবের সেই কথা—সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া শোষিত শ্রেণীর মুক্তি নেই।

অমল রায় : গেব্রিয়েল পেরী

আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম মূল প্রসঙ্গ হলো বিপ্লব—তা দেশভেদে সাম্যবাদী বা জাতীয়তাবাদী যেই রূপ নিক না কেন।.......ফরাসী ও রুশ বিপ্লব পুষ্ট হয়ে তার ঢেউ আজ সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত করতে চায়।

অমলেশ ত্রিপাঠী : ইতিহাস ও ঐতিহাসিক

বিদ্রোহ শুধু অস্বীকৃতি, বিপ্লব কিন্তু অঙ্গীকার—অঙ্গীকার প্রতিযুগের সৃষ্টির দাবির।

গোপাল হালদার : আর একদিন (ত্রিদিবা)

বিপ্লব মানে চেতনার আমূল রূপান্তর। কী সেই চেতনা? জনগণকে সেবা করার চেতনা, আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হওয়ার চেতনা, জনগণকে ভালবাসার চেতনা। বিপ্লব মানেই এই রূপান্তর—কি সমাজের কি ব্যক্তির।

চারু মজুমদার : প্রকৃত কমিউনিষ্ট হবার তাৎপর্য কী?

বিবর্ণ রক্তের দাগ রেখে গেছে অন্ধকারে ফেলে
মুণ্ডহীন তরুণের উজ্জ্বল বিমূঢ় এক দেহ।
কেন এই নিদারুণ হত্যা? কেন মায়াহীন ক্রোধ?
এই বাল্যকালে ওই আমার সন্তান কী করেছে?
কোন্ অপরাধে এক প্রাণবন্ত জীবন আঁধারে?
ব্যক্তিগত স্বার্থে নয়, ও শুধু বিপ্লব চেয়ে দোষী।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : রক্তের দাগ
(নাম না জানা কোনো এক নকশালপন্থী কিশোরের জন্য)

বিপ্লব শান্তি নয়। হিংসার মধ্যে দিয়েই তাকে চিরদিন পা ফেলে আসতে হয়—এই তার বর, এই তার অভিশাপ।.......মহামানবের মুক্তি সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলে ছুটে যাবে সেই ত আমার স্বপ্ন। এত কালের পর্বতপ্রমাণ পাপ তবে ধুয়ে যাবে কিসে?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পথের দাবী

বিপ্লব। বিপ্লব চাই। বিপ্লব করতে হবে।.......সত্যিকার বিপ্লব করার কথা নেতারা মুখে আনে না। শুধু কথা বলে। বড়ো বেশি কথা বলে। বিপ্লবী পথের হদিস চাইলে রেগে যায়।

শৈবাল মিত্র : অজ্ঞাতবাস

বিপ্লবের পথ একেবারে ঋজুপথ নয়। এ পথে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাফল্য আসে না, এপথ বহু বিঘ্নসঙ্কুল, সুদীর্ঘ এবং সর্পিল।

সুভাষচন্দ্র বসু :

বিপ্লবী

বিপ্লবীর হিংসা মহান হিংসা।

মনোজ মিত্র : নাকছাবিটা

বিবাহ

প্লেটোরই তো বোধ হয় উপদেশ রয়েছে। "সর্বথা বিবাহ করিবে। ভাগ্য ক্রমে ভাল বৌ পাইলে স্বর্গ-সুখ লাভ। না পাইলে মনের জ্বালায় দার্শনিক হইয়া পড়িবে—সে লাভ অধিকতর"।

নিরূপ মিত্র : নগরী নিষ্প্রদীপ

পূর্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষের প্রায়শ্চিত্তবিশেষকে বিবাহ বলে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

সকল মনুষ্যই এক একজন স্ত্রীলোককে আপন প্রভু বলিয়া নিযুক্ত করে। ইহাকেই তাহারা বিবাহ বলে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল

বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে; জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কপালকুণ্ডলা

বিবাহ আত্মায় আত্মায় যোগের প্রতীক—শুধু শারীরিক সম্বন্ধ উহার তাৎপর্য নয়। এইজন্যই বিবাহবন্ধন এত পবিত্র।..........দৈহিক ভালবাসা যেন মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণ—উহাকে যথাযথ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিলে উহা একদিন মানুষকে প্রাঙ্গণ পার হইয়া মূলমন্দির-দ্বারে উপনীত করে।

স্বামী বীরেশ্বরানন্দ : শ্রীশ্রীমা ও নারীজাতির আদর্শ

বিবাহ জিনিষটা মিষ্টান্ন দিয়েই শুরু হয়, কিন্তু সকল সময় মধুরেণ সমাপ্ত হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরকুমার সভা ৫/৪

এদেশকে বলে পুণ্যভূমি.......পুণ্যবিবাহকর্মে আমাদের পুরুষদের ক্লান্তি নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তির উপায়—২

পরস্পর-পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে এইজন্যেই তো বিবাহ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১২

মনের মিলনই সত্যিকারের বিবাহ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দত্তা

বিবি

আদর বিবির চাদর গায়
ভাত পায় না ভাতার চায়।

বাংলা প্রবাদ

বিবেক

বিবেক-বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে হয়। সংসার-সমুদ্রে কামক্রোধাদি কুমির আছে। হলুদ গায়ে মেখে জলে নামলে কুমিরের ভয় থাকে না। বিবেক-বৈরাগ্য হলুদ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সদসৎ বিচারের নাম বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্যবস্তু। আর সব অসৎ, অনিত্য ; দুদিনের জন্য।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

যদি বিবেক না থাকে, শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

কামাদি ছয় কুম্ভীর আছে আহার-লোভে সদাই চলে,
তুমি বিবেক-হলদি গায়ে মেখে নাও, ছোঁবে না তার গন্ধ পেলে।

রামপ্রসাদ সেন : শাক্ত পদাবলী

বিবেকানন্দ

বিবেকানন্দ যুগাচার্য। মানবমাত্রের কল্যাণ পথের তিনি নির্দেশক। নিজের মুক্তি সাধনের চমৎকারিত্ব এবং ব্যক্তিগত মুক্তি প্রাপ্তির উৎকর্ষ প্রমাণ করা তাঁর এক মাত্র কর্তব্য ছিল না।......স্বামীজী ছিলেন যুগনায়ক। যুগবাণী উদ্‌ঘোষিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে। সে বাণী রূপায়িত তাঁর সফল ব্যক্তিত্বে। তাঁর বার্তায়ও জীবনে প্রচারিত ও প্রকটিত হয়েছিল প্রাচীন যুগের ব্যক্তিকেন্দ্রিক মুক্তিপ্রয়াসের সাথে আধুনিক যুগের উদারতার সর্বমুক্তির অপূর্ব মিলন।

স্বামী উমানন্দ : চিকাগো একালের কুরুক্ষেত্র

জয় বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী বীর চীর গৈরিকধারী।
জয় তরুণ যোগী, শ্রীরামকৃষ্ণ-ব্রত-সহায়কারী॥
যজ্ঞাহুতির হোমশিখা সম, তুমি তেজস্বী তাপস পরম
ভারত-অরবিন্দ নমো নমঃ বিশ্বমঠ বিহারী॥

কাজী নজরুল ইসলাম : ভক্তি-গীতি

যুগন্ধর পুরুষসিংহ ছিলেন বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহধন্য মানুষটির হৃদয় কাঁদত জগতের দুঃখ সন্দর্শন করে—ভগবান বৃথা, ধর্মবিশ্বাস বৃথা, যদি জীবের দুঃখ আর

যন্ত্রণা সমাজের অন্যায় অপমান শোষণভিত্তিক চরিত্রের জন্য চিরস্থায়ী হয়ে থাকে। এজন্যেই বিবেকানন্দ কুণ্ঠিত হননি বলতে যে তিনি চান "লক্ষ লক্ষ যুবক-যুবতী"র সমাজকল্যাণ কর্মে একান্তভাবে লিপ্ত থাকার অর্থই হল ধর্মপালন।

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : মুখবন্ধ (রুদ্র আলোকে এসো)

বিমান

পুরাণে পুষ্পকরথের কথা আছে। তাতে চেপে স্বর্গে যাওয়া যেত। আধুনিক বিমানরথের গন্তব্যস্থল মর্তলোক। কিন্তু সারথি নিপুণ না হলে যে-কোনো মুহূর্তে রথীদের স্বর্গপ্রাপ্তি বিচিত্র নয়।

যাযাবর : দৃষ্টিপাত

বিয়ে

বিয়ে যদি করো তুমি তুমিই হবে ভর্তা
কিন্তু তুমি দেখবে তোমার গিন্নী হবেন কর্তা।
কোথায় তোমার স্বাধীনতা কোথায় তোমার ফুর্তি?
বাড়ী ফিরে দেখবে তোমার সতীর অগ্নিমূর্তি।

অন্নদাশঙ্কর রায় : ঘরোয়া (ছড়া সমগ্র)

আমাদের বাড়িতে আজ পর্যন্ত কারও ভাল বিয়ে হয়নি একমাত্র আমার স্ত্রী ছাড়া

তারাপদ রায় : হায় ভীরু প্রেম

বিয়ে। যে বিয়েতে মৃত্যু পর্যন্ত বিচ্ছেদ নেই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে

বিয়ে হলেই পুত্রকন্যা, আসে যেন প্রবল বন্যা।
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্বস্বান্ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : পুনর্জন্ম

ইন্দুভূষণ—পুরুষমানুষগুলো জীবনের মধ্যে একবার খেপে। সে বিয়ে কর্ব্বার আগেই। একটা ক্ষুদ্রবেণীসমন্বিত মাথার নীচে একটা ছোটখাটো গোলগাল মোলায়েম মুখ দেখে বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে সে একটা কাজ করে ফেলে যার জন্য তাকে আজীবন অনুতাপ কর‍্তে হয়।

চপলা—তা বটে, তবে সে ক্ষেপামিটা স্ত্রী থাকলেই যায়, স্ত্রী মলেই আবার হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : বিরহ

মহুয়া— কঠিন তোমার মাতা পিতা কঠিন তোমার হিয়া।
এমন যইবন কালে নাহি দিছে বিয়া॥
নদের চাঁদ—কঠিন আমার মাতা পিতা কঠিন আমার হিয়া।
তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া॥
মহুয়া— লাজ নাইরে নিলাজ ঠাকুর লাজ নাইরে তর।
গলায় কলসী বাইন্দ্যা জলে ডুব্যা মর॥
নদের চাঁদ—কোথায় পাইবাম কলসী কইন্যা কোথায় পাইবাম দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ্গ আমি ডুইবা মরি॥

মৈমনসিংহ গীতিকা : মহুয়া

বিশ্ববিদ্যালয়

কেবলমাত্র বিদ্যা অর্জন ও জ্ঞানের অগ্রগতিতে সহায়তা করা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ হতে পারে না। জাতি, ধর্ম, মতবাদ, ধনী, দরিদ্র এবং সামাজিক ও বংশমর্যাদা

নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষ যে মূলত এক। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রচার করতে হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষই যে পরম সত্য আমাদের সেই জ্ঞান হোক।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : শিক্ষা ও বিজ্ঞান

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচিত চরিত্রবান মানুষ তৈরি করা, যাঁরা তাঁদের জাতির জন্য জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মহত্ত্ব অর্জন করে মহৎ হবেন।

সুভাষচন্দ্র বসু : জরুরি কিছু লেখা

বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন নিছক বাইরের শক্তি নয়, বিশ্বায়ন আমার আপনার চিন্তায়, বোধে, আকাঙক্ষায় স্থান করে নিয়েছে, আমি-আপনি বিশ্বায়নের অংশ হয়ে গেছি, অঙ্গ হয়ে গেছি। বিশ্বায়নই গণতন্ত্র হয়ে গেছে।

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় : আনন্দবাজার পত্রিকা ৬.৮.২০০৩

বিশ্বায়নের প্রধান লক্ষ্য সার্বিক শোষণের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন। এ লক্ষ্য অবশ্যই বিশ্বের ধনী ও উন্নত দেশগুলির। তারা এই বিশ্বায়নের প্রবর্তক, নিয়ন্ত্রকও বটে।

প্রতিরোধের বিশ্বায়ন : গণশক্তি

বিশ্বায়নবাদীদের চাই নিয়ন্ত্রণহীন শ্রমের বাজার। শ্রমিক এখানে যন্ত্র। এঁদের যখন ইচ্ছে নিয়োগ করো। যেমন খুশী ব্যবহার করো, যখন ইচ্ছে ছুঁড়ে ফেলে দাও।

প্রতিরোধের বিশ্বায়ন : গণশক্তি

বিশ্বায়ন শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যাই হোক, শব্দটির গৃহীত অর্থ আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে ভুবন ব্যাপ্ত বাণিজ্য-নীতি এবং লগ্নি-পুঁজির দাপট। এই নীতি বিত্ত-শক্তিতে অগ্রসর দেশগুলি নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে সম্পাদন করে এবং সেই অনুসারে নিজেদের কার্যক্রম নির্ধারিত করে।

সুমিতা চক্রবর্তী : জীবনানন্দ—সমাজ ও সমকাল

বিষ

বল্, আমি সব করতে পারি, নেই নেই বললে সাপের বিষ নেই হয়ে যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী-৭

বিষয়

বিষয় লাগি তোমায় ভজে সেই মূর্খজন।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত

পরমেশ্বর ঠিক প্রত্যক্ষের বিষয় নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কমলাকান্তের জোবানবন্দী

আমি এক্ষণে গঙ্গাস্নান করিব—পুরাণ শুনিব—বিষয়আশয় দেখিব

প্যারীচাঁদ মিত্র : আলালের ঘরের দুলাল

বিষয়-বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানারকম অহঙ্কার এসে পড়ে—পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এইসব।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত (প্রথম ভাগ)

কেবল বিষয়চিন্তা করলে পাটোয়ারি স্বভাব হয়, মানুষ কপট হয়। ঈশ্বরচিন্তা করলে সরল হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

বিষয়ী লোকের টাকা খরচ হলে বিরক্ত হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

বিষাদ

অদ্ভুত বিষাদ মেখে লুটিয়ে রয়েছে একা
জীবনের অতীব পূর্ণতা!

কবিতা সিংহ ঃ অরণ্যে এসেছি আমি

বিসর্জন

আর কারো পানে চাহিব না আর, করিব হে আমি প্রাণপণ—
তুমি যদি বল এখনি করিব বিষয়বাসনা বিসর্জন॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসংগীত

বিস্ময়

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ,
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতমালিকা ১

বালক বীরের বেশে তুমি করলে বিশ্বজয়
একি গো বিস্ময়।
অবাক আমি তরুণ গলার গান শুনে॥.......
তরুণ হাসির আড়ালে কোন আগুন ঢাকা রয়—
একি গো বিস্ময়।
অস্ত্র তোমার গোপন রাখো কোন তূণে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী

আবার জাগিনু আমি। রাত্রি হল ক্ষয়।
পাপড়ি মেলিল বিশ্ব। এই তো বিস্ময়
অন্তহীন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিস্ময় (পরিশোধ)

বড়ো বিস্ময় লাগে হেরি তোমারে।
কোথা হতে এলে তুমি হৃদি মাঝারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শাপমোচন

বীণাপাণি (দ্র. সরস্বতী)

এস মা এস মা বীণাপাণি
এস মাগো এস, হৃদাসনে বস, জগজন-মনোমোহ নিবারিণী॥
যুগ যুগান্ত সঞ্চিত তামস, চরণ পরশে নাশ গো মা নাশ।
হৃদি শতদলে আবার প্রকাশ, শারদে শুভদে মা সিতবরণী॥

স্বামী চণ্ডিকানন্দ ঃ গান

জয় বাণী বীণাপাণি বাগ্‌বাদিনি নারায়ণি
মরালবাহিনি জগত্তারিণি অজ্ঞান বিনাশিনী॥
বিশ্বভারতী পরমা প্রকৃতি, অমল, ধবল মধুর মুরতি।
চতুর্বেদ-করে জননী বিরাজ সত্য সনাতনি।.....
যোগী ঋষি তুমি আরাধ্যা, সত্যগুণরূপিণি বিদ্যা
ত্রিলোকবন্দিতা অমর-বাঞ্ছিতা, নমামি চরণে ব্রহ্মবাদিনী।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ঃ গান

প্রকাশো জননী,
প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানসসরসবাসিনী।
শুক্লবসনা সুভ্রাহাসিনী,
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী
কমলকুঞ্জাসনা।.......
তুমি মানুষের মাঝখানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি,
কুন্দবরণ সুন্দরহাসি
বীণাহাতে বীণাপাণি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পুরস্কার (সোনার তরী)

বীর

বীরের রক্তই জাতিকে উর্বর করে! দুঃখ সেদেশের নয় রাণা যে দেশের বীর মরে; দুঃখ সেই দেশের, যে দেশের বীর মরে না।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ মেবার-পতন

বীরভোগ্যা বসুন্ধরা-বীর্য প্রকাশ কর, সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা-লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্যের নাম দস্যুতা ; যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল

বুড়ো

বুড়ার যুবতী নারী প্রাণ হৈতে বাড়া।

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায় ;
তোমার লগে কেমতে পারুম, হৈয়্যা উঠচে দায়!
বুর‍্যা বুর‍্যা কৈয়্যা ক্যাবল, ক্ষ্যাপাইয়া ক্যান কোরচ পাগল?
যখন বিয়্যা করচ, ফ্যালবা ক্যামতে? কৈয়্যা দাও আমায়।

রজনীকান্ত সেন ঃ বুড়ো বাঙ্গাল, কল্যাণী

অনেক বুড়ো আছে বটে........তাহারা পৃথিবী হইতে যৌবনতাপ লোপ করিতে চায়, তাহাদের নিজ হৃদয়ের শৈত্য সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত হয় এই তাহাদের ইচ্ছা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিঠিপত্র-৯

এত বুড়ো কোনোকালে হব নাকো আমি
হাসি-তামাশারে যবে কব ছ্যাব্‌লামি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রহাসিনী—ভূমিকা

বুড়োমানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো ; তাতে তাদের মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্ছে, বেচারারা জানতে পারে না তাদের রসনা যেখানে চলছে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চলছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সন্দীপের আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

বুদ্ধদেবের কথা অনেক শুনেছি, তিনি দশাবতারের ভিতর একজন অবতার। ব্রহ্ম অচল, অটল, নিষ্ক্রিয়, বোধ-স্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধ স্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয় ; তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

বুদ্ধ কি জানো? বোধ স্বরূপকে চিন্তা করে করে,—তাই হওয়া,—বোধ স্বরূপ হওয়া।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ভগবান বুদ্ধ ভারতবর্ষের ধর্ম এবং দর্শনের ইতিহাসধারাকে বদলাইয়া দিয়াছেন। মানুষের চিরাচরিত চিন্তাপদ্ধতির ভিতরেই তিনি জাগাইয়াছেন একটা বিদ্রোহ।......বেদ-বিধির যে রক্তকলুষ শান-বাঁধান পথে সদম্ভে চলিতেছিল কর্মকাণ্ড-ভরা একটা ধর্মমত, ভারতীয় জনসাধারণের ভিতরে বহুদিন হইতেই তাহার বিরুদ্ধে জাগিতেছিল বিদ্রোহ ; উপনিষদগুলির ভিতরেই আমরা শুনিতে পাই সেই বিদ্রোহের একটা সুর ব্রহ্মবাদের প্রাধান্য ঘোষণায়, সেই বিদ্রোহেরই অপর একটি সুর রক্তমাংসে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল বুদ্ধদেবের ভিতর দিয়া।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত ঃ ইতিহাস ও ব্যক্তিত্ব (সাহিত্যের স্বরূপ)

বুদ্ধি

বুদ্ধির 'টেসট' টাকা রোজগার।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দাদার দুরভিসন্ধি

বুদ্ধি আর বিবেচনা নামক মহার্ঘ মানবিক সম্পদটির মূল্যমানে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। হয়েছে সর্বস্তরে। সব পার্টিতে, পাড়ায়, অফিস-কাছারিতে সর্বত্র। এখন যে যত বেশি শয়তান সে তত বেশি 'বুদ্ধিমান'। যে যত বড় ধূর্ত সে তত বড় 'বিবেচক'। শয়তানি এবং ধূর্তামি এখন বুদ্ধি এবং বিবেচনা নামে বাজারে বিকোয়।

পাঁচু রায় ঃ সম্পাদক সমীপেষু (আনন্দবাজর পত্রিকা ৭.৮.২০০২)

পুরুষের বুদ্ধি খড়্গের মতো, শান বেশি না দিলেও কেবল ভারে অনেক কার্জ করিতে পারে ; মেয়েদের বুদ্ধি কলম-কাটা ছুরির মতো, যতই ধার দাও না কেন, তাহাতে বৃহৎ কাজ চলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৌকাডুবি—১

বাঙালির বুদ্ধি সহজেই অত্যন্ত সূক্ষ্ম। তাহার দ্বারা চুল চেরা যায়, বড়ো বড়ো গ্রন্থি ছেদন করা যায় না। তাহা সুনিপুণ, কিন্তু সবল নহে। আমাদের বুদ্ধি ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো অতিসূক্ষ্ম তর্কের বাহাদুরিতে ছোটে ভালো, কিন্তু কর্মের পথে গাড়ি লইয়া চলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিদ্যাসাগর (চারিত্রপূজা)

মানবের
বুদ্ধি দীপসম, যত আলো করে দান
তত রেখে দেয় সংশয়ের ছায়া—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিসর্জন—১।৪

দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শান পড়িলে ছুরি ক্রমেই সূক্ষ্ম হইয়া অন্তর্ধান করে, একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজর্ষি—২০

বুদ্ধি দীপের আলো জ্বালি,
হাওয়ায় শিখা কাঁপছে খালি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিশুর জীবন (শিশু ভোলানাথ)

স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা

বুদ্ধিজীবীরা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। পৃথিবীর সব দেশেই।.....সমাজে ওরা একা। বুদ্ধিজীবীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিংবা চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে সরকারের কাজকর্মেরও মিল নেই।

দেবাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু

বুদ্ধিমান

আমি সকলের মতের সঙ্গে মত দিয়ে যাই বলেই সবাই আমাকে প্রায় নিজের মতোই বুদ্ধিমান ভাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার-সভা-১।১

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মতো মাথা নাড়িল, অর্থাৎ গতিক ভালো নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনোই গতিক ভালো দেখে না।

গল্পগুচ্ছ ঃ মণিহারা

অতল আঁধার নিশা-পারাবার, তাহারি উপরিতলে।
দিন সে রঙিন বুদ্বুদসম অসীমে ভাসিয়া চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান বলে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা-৭

দিনরাত প্রখর বুদ্ধিমানের সঙ্গে থাকিলে বুদ্ধি লোপ পায়। ছুরিতে অবিশ্রাম শান পড়িলে ছুরি ক্রমেই অন্তর্ধান করে। একটা মোটা বাঁট কেবল অবশিষ্ট থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজর্ষি

বৃক্ষ

আরণ্যক ঋষি শুনতে পেয়েছিলেন গাছের বাণী, ‘বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠতোকঃ’ ; শুনেছিলেন, ‘যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্’। তাঁরা গাছে গাছে চিরযুগের এই প্রশ্নটি পেয়েছিলেন, ‘কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতিযুক্তঃ’—প্রথম প্রাণ তার বেগ নিয়ে কোথা থেকে এসেছে এই বিশ্বে। সেই প্রৈতি সেই বেগ থামতে চায় না, রূপের ঝরনা অহরহ ঝরতে লাগল, তার কত রেখা, কত ভঙ্গী, কত ভাষা, কত বেদনা। সেই প্রথম প্রাণপ্রৈতির নবনবোন্মেষশালিনী সৃষ্টির চিরপ্রবাহকে নিজের মধ্যে গভীরভাবে বিশুদ্ধভাবে অনুভব করার মহামুক্তি আর কোথায় আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বনবাণী। ভূমিকা

অন্ধ ভূমিগর্ভ হতে শুনেছিলে সূর্যের আহ্বান
প্রাণের প্রথম জাগরণে, তুমি বৃক্ষ, আদিপ্রাণ—
ঊর্ধ্বশীর্ষে উচ্চারিলে আলোকের প্রথম বন্দনা
ছন্দোহীন পাষাণের বক্ষ-’পরে ; আনিলে বেদনা
নিঃসাড় নিষ্ঠুর মরুস্থলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৃক্ষবন্দনা (বনবাণী)

নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি, বৃথা বিদ্যা যত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা—১

বৃথা এ ক্রন্দন
বৃথা এ অনল-ভরা দুরন্ত বাসনা।........
হায় রে দুরাশা,
এ রহস্য এ আনন্দ তোর তরে নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিষ্ফল কামনা (মানসী)

জীবন বৃথা গেল। বৃথা যাইতে দাও। অধিকাংশ জীবনই বৃথা যাইবার জন্য হইয়াছে। এই পনেরো-আনা অনাবশ্যক জীবনই বিধাতার ঐশ্বর্য সপ্রমাণ করিতেছে। তাঁহার জীবনভাণ্ডারে যে দৈন্য নাই, ব্যর্থপ্রাণ আমরাই তাহার অগণ্য সাক্ষী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পনেরো-আনা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

সব যার হস্তগত, রাজ্যেশ্বর পদানত,
তাঁরো নাই বাসনার শেষ!
এ কেবল দিনে রাত্রে জল ঢেলে ফুটা পাত্রে
বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মিটাবারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রতিনিধি (কথা)

কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছটফট্ করা বৃথা, আজই হোক কালই হোক, সে টেনে তুলবেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী—সূচনা

বৃদ্ধ

মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : পালামৌ

চকচক করলেই যেমন সোনা হয় না, তেমন চুল পাকলেই, কিংবা দাঁত পড়লেই বৃদ্ধ হয় না,—এমন কি পেনশন নিলেও বৃদ্ধ হয় না।

স্বপ্নময় চক্রবর্তী : নৈশপর্ব

বৃন্দাবন

শাস্ত্র কয় বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত মদনমোহন। বিবর্তবিলাসের কথা। সে হইল নিত্য-বৃন্দাবনের কথা। তিনি লীলা-বৃন্দাবনে আইসা সুবলাদি সখা আর ললিতাদি সখীসহ আদ্যাশক্তি শ্রীমতী রাধিকারে লইয়া লীলা কইরা গেছেন। সেই লীলা-বৃন্দাবনে অখন আর তান্‌রা নাই। আছেন নিত্য-বৃন্দাবনে। সেই নিত্য-বৃন্দাবন আছে এই দেহেরই মধ্যে।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : তিতাস একটি নদীর নাম

নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার!
চলেনা চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার॥
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটেনা বনে কুন্দনীপ
ছুটেনা কলকণ্ঠ সুধা পাপিয়া পিক বন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার॥

কালিদাস রায় : বৃন্দাবন অন্ধকার

আজও আছে বৃন্দাবন মানবের মনে।
শরতের পূর্ণিমায়
শ্রাবণের বরিষায়
উঠে বিরহের গাথা বনে উপবনে।

এখনো যে বাঁশি বাজে যমুনার তীরে।
এখনো প্রেমের খেলা
সারাদিন, সারা বেলা
এখনো কাঁদিছে রাধা হৃদয়কুটিরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একাল ও সেকাল (মানসী)

বৃষ্টি

অন্ধকার মধ্যদিনে বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে॥
বৃষ্টি ঝরে রুক্ষ মাঠে, দিগন্তপিয়াসী মাঠে, স্তব্ধ মাঠে
মরুময় দীর্ঘ তিয়াষার মাঠে, ঝরে বনতলে।
ঘনশ্যামরোমাঞ্চিত মাটির গভীর গূঢ় প্রাণে
শিরায় শিরায় স্নানে, বৃষ্টি ঝরে মনের মাটিতে।

অমিয় চক্রবর্তী : বৃষ্টি

বর্ষাকালে বৃষ্টি, মানুষের অবস্থার মত অস্থির! সর্বদাই হচ্চে যাচ্চে তার ঠিকানা নাই।

কালীপ্রসন্ন সিংহ : হুতোমপ্যাঁচার নক্সা

টিপিটিপি বৃষ্টি
ঘোমটার মত পড়ে আছে
দিনের মুখের উপর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিচ্ছেদ (পুনশ্চ)

বৃষ্টিপাতনের এই অবিরাম শব্দ, এ যেন শব্দের অন্ধকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্রাবণসন্ধ্যা (শান্তিনিকেতন)

বৃষ্টি পড়ে এখানে বারোমাস
এখানে মেঘ গাভীর মতো চরে
পরাঙ্মুখ সবুজ নালিঘাস
দুয়ার চেপে ধরে—।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : অবনী বাড়ি আছো

বেকার

লক্ষ লক্ষ বেকারকে খুন-জখম-লুটপাটের ছাড়পত্র দিতে হবে। 'বিপ্লবে'র তারাই আসল দাবিদার।

আবদুল জব্বার : বদলিওয়ালা (বাংলার চালচিত্র)

বেঙ্গল টাইগার

বেঙ্গল টাইগার হতে না পার বেঙ্গল জ্যাকল হও।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : ছাগলের বোধোদয় (কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই)

বেণী

সই ভালো করে বিনোদ বেণী বাঁধিয়া দে।
মোর বঁধু যেন বাঁধা থাকে বিননী-ফাঁদে॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান

বিনাইয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥

ভারতচন্দ্র রায় : বিদ্যাসুন্দর—অন্নদামঙ্গল

বেতন

ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝবো ক্যামনে?

দীনবন্ধু মিত্র : সধবার একাদশী

হীরের বিচার ঔজ্জ্বল্যে মসলিনের বিচার সূক্ষ্মতায়। সরকারী কর্মচারীর মূল্য নিরূপিত হয় বেতনে।

যাযাবর ঃ দৃষ্টিপাত

যত পায় বেত না পায় বেতন তবু না চেতন মানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পুরাতন ভৃত্য

বেদনা

যার জীবনে বেদনা নেই, তার জীবনে কোন উত্তরণ নেই। সুখ সমতল, বেদনা সোপান। যে উঠতে চায় তাকে দুঃখের সিঁড়ি ভাঙ্গতেই হবে।

নিরূপ মিত্র ঃ নগরী নিষ্প্রদীপ

বড়ো বেদনার মতো বেজেছ তুমি হে আমার প্রাণে,
মন যে কেমন করে মনে মনে তাহা মনই জানে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা, নিয়ো হে নিয়ো।
হৃদয় বিদারি হয়ে গেল ঢালা, পিয়ো হে পিয়ো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

একটি শুধু শোণিত রাঙা
বেদনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রত্যাখ্যান (সোনার তরী)

কিসের বেদনা সে বনের বুকে
কুসুমে ফোটে দিনযামী,
বুঝিনু, যবে দোঁহে ব্যাকুল সুখে
কাঁদিনু, তুমি আর আমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মিলন (পূরবী)

যেদিন প্রিয়ার কালো চক্ষুর সজল করুণায়
রাত্রির প্রহরমাঝে অন্ধকারে নিবিড় ঘনায়
নিঃশব্দ বেদনা, তার দুটি হাতে মোর হাত রাখি
স্তিমিত প্রদীপালোকে মুখে তার স্তব্ধ চেয়ে থাকি,
তখন আঁধারে বসি আকাশের তারকার মাঝে
অপেক্ষা করেন তিনি, শুনিতে কখন বীণা বাজে
যে-সুরে আপনি তিনি উন্মাদিনী অভিসারিণীরে
ডাকিছেন সর্বহারা মিলনের প্রলয় তিমিরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৃষ্টিকর্তা (পূরবী)

বেনে (দ্র. বণিক)

—দাদা, রাগ করো মিছে, সময় হয়েছে বাঁকা। এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরের টংকার। তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

—তা সত্যি। একালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে, পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রথের রশি (কালের যাত্রা)

বেস্ট সেলার

শিল্পে কোনো জোড়াতালি, সমঝোতা হয় না। মনে রাখতে হবে আজ যা বেস্ট সেলার, আগামীকাল তা ঠোঙা। ময়লা মোছা কাগজ।

কিন্নর রায় ঃ সর্বনাশের আশায়

বৈজ্ঞানিক

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাহার ভাবনা, পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়।....সে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে। স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন এবং বলিয়া উঠেন-যেন নহে—এই সেই।

জগদীশচন্দ্র বসু ঃ কবিতা ও বিজ্ঞান (অব্যক্ত)

বৈতরণী

বৈতরণী—প্রেতনদী, যমদ্বারস্থ নদী। শাস্ত্রে কথিত আছে যে, এই নদীর জল সাতিশয় উত্তপ্ত, শোণিত-মাংসাস্থিপূর্ণ, দুর্গন্ধময় এবং নক্রসমাকুল। মৃত্যুর পর জীবগণকে এই নদী পার হইয়া যমালয়ে প্রবেশ করিতে হয়। ইহাকে সুখে উত্তরণ করিবার আশায় হিন্দুগণ মৃত্যুর পূর্বে বা পরে গোদান করিয়া থাকেন।

সুবলচন্দ্র মিত্র ঃ সরল বাঙ্গালা অভিধান

বৈদ্য (দ্র. চিকিৎসক, ডাক্তার)

যমরাজ। বৎসে, কি জন্য আমাকে স্মরণ করেছ?

সাবিত্রী। প্রভু, এই হতভাগ্যকে জীবন দান কর। রাজবৈদ্য একে বাঁচাতে অসমর্থ।

যম। কি গো দূত, তুমি পারলে না?

উপস্থিত সকলে। (সমস্বরে) দূত! ধন্বন্তরি বৈদ্যের যমদূত।

ধন্বন্তরি। মহারাজ, আমাদের সম্বন্ধটা প্রকাশ করে দিলেন? লোকে কি আর আমাকে ডাকবে?

যম। চুরি হলে যদি কোটালকে ডাকে, তবে মানুষ অসুস্থ হলে তোমাকে কেন না ডাকবে?

প্রমথনাথ বিশী ঃ সাবিত্রীর স্বয়ম্বর

বৈদ্যর বড়ি ছুঁলেই কড়ি।

বাংলা প্রবাদ

বৈরাগী

যারা বিষয়ী তারা বিশ্বকে বাদ দিয়ে বিশেষকে খোঁজে। যারা বৈরাগী, তারা পথে চলতে চলতেই বিশ্বের সঙ্গে মিলিয়ে বিশেষকে চিনে নেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—১২.২.২৫

সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলই সরে, কেবলই চলে, সে-ই তো বৈরাগী।

.....পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে-নদী বেরিয়ে পড়েছে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি.....সে

অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে দিতেই আপনাকে পায়। নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্ছে বালির মরুভূমি—তার মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল। তার দেওয়া যেমনি ঘোচে অমনি তার পাওয়া ঘোচে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী—সূচনা

হে বৈরাগী, করো শান্তিপাঠ।
উদার উদাস কণ্ঠ যাক ছুটে দক্ষিণে ও বামে,
যাক নদী পার হয়ে, যাক চলি গ্রাম হতে গ্রামে,
পূর্ণ করি মাঠ।
হে বৈরাগী, করো শান্তি পাঠ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৈশাখ (কল্পনা)

বৈরাগির ব্যবসা ওর নয়, ওর চেহারায় জলুষ নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তির উপায়-৩

মর্কটবৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুজ অনাসক্ত হয়্যা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ চৈতন্যচরিতামৃত

ভস্ম মাখা কৌপীন পরা বৈরাগ্য নহে, স্বার্থ নাশই প্রকৃত বৈরাগ্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ঃ উপদেশাবলী

বৈরাগ্য

মমতা পরিত্যাগই বৈরাগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লিখিত পত্র

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য-৩০

আনন্দময় সুগভীর বৈরাগ্যই হচ্ছে সেই সুন্দরের চরম দান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বনবাণী-ভূমিকা

যে সকল জাতি কর্মিষ্ঠ জাতি তাহারাই যথার্থ বৈরাগ্য জানে।.....আমাদের এই কর্মহীন শ্রীহীন নিশ্চেষ্ট নির্জীব বৈরাগ্য কেবল অধঃপতিত জাতির মূর্চ্ছাবস্থামাত্র—উহা জড়ত্ব, উহা অহংকারের বিষয় নহে।.....যে বৈরাগ্যের সঙ্গে কোনো মহত্তর সচেষ্ট সাধনা সংযুক্ত নাই তাহা অসভ্যতার নামান্তর মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভদ্রতার আদর্শ (পঞ্চভূত)

বৈশাখ

আশ্বিনের কিশোর শীতেও নয়, হেমন্তের ম্লান পীতেও নয়,বাঙলাদেশের বছর শুরু রুদ্রবৈশাখে।

দিলীপ কুমার গুপ্ত ঃ টুকরো কথা

বৈশাখে অনল-সম বসন্তের খরা।
তরুতল নাহি মোর করিতে পসরা॥
পা পোড়ায় খরতর রবির কিরণ।
শিরে দিতে নাহি আঁটে খুঞার বসন॥
বৈশাখ হৈল বিষ গো, বৈশাখ হৈল বিষ।
মাংস নাহি খায়—সর্ব্বলোক নিরামিষ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ঃ চণ্ডীমঙ্গল

এসো, এসো, এসো হে বৈশাখ।
তাপসনিশ্বাসবায়ে মুমূর্ষুরে দাও উড়ায়ে
বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক॥
থাক পুরাতন স্মৃতি যাক ভুলে-যাওয়া গীতি,
অশ্রুবাষ্প সুদূরে মিলাক॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো
তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে।
আমি বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিন
সন্তাপে প্রাণ যায় যে পুড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চণ্ডালিকা—১

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ!
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক
হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৈশাখ

বৈশাখ-শেষের আকাশে তখনও গরম জমে আছে,......গাছের পাতাগুলো যেন একান্ত কান-পাতা মনোযোগের মতে নিস্তব্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ-৫৭

বৈষ্ণব কবি, বৈষ্ণব কাব্য

বৈষ্ণব কবিদিগের অধ্যাত্মভাবের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাঁহাদের আর একটি দিক্ আছে—তাহা কবিত্বের দিক্। বৈষ্ণব কবিতা সমুদ্রগামী নদীর ন্যায়। নদী চলিয়াছে, দুই দিকে তটভূমি, তাহা আনন্দ-কলরবে মুখরিত হইয়া নদী চলিতেছে; দুই ধারে ফল-ফুল সমন্বিত তরুলতা, জন-কোলাহল, পল্লীর অপূর্ব সৌন্দর্য্য, ফুলের বাগান। কিন্তু যখন নদী মোহনায় আসিল, তখন সে-সমস্ত দৃশ্য সে পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে, আর সে বিহগ-কুজিত জন-কোলাহল-মুখরিত, উদ্যান-সঙ্কুল বনভূমি—এ সকলের কিছু নাই—সম্মুখে দুর্ভেদ্য প্রহেলিকার মত অসীমের প্রতীক মহাসমুদ্র। বৈষ্ণব কবিতা নানারূপ পার্থিব সৌন্দর্য্যের পথ বাহিয়া চলিয়াছে—কিন্তু তাহার পরম লক্ষ্য সেই অজ্ঞেয় দুরধিগম্য মহাসত্য। বিদ্যাপতি রাধার মুখে বলিতেছেন—হে কৃষ্ণ! তুমি আমার মাথার ফুল, চোখের কাজল, গলার মুক্তাহার, তাহা হইতেও বেশী, তুমি আমার নিকট পাখির পাখা—তোমাকে ছাড়া আমি একেবারে অচল হই—মাছের পক্ষে জল যাহা, তুমি আমার কাছে তাহাই, জল হইতে তুলিলে সে তখনই মরিয়া যায়—আমি তোমাকে সব দিয়াছি। কিন্তু "মাধব তুহু কৈছে কহবি মোয়"—আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও আমি তোমাকে চিনিতে পারি নাই। তুমি আমার নিকট দুর্জ্ঞেয়—মাধব, বল তুমি কে এবং কেমন!

দীনেশচন্দ্র সেন ও খগেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ ভূমিকা, বৈষ্ণব পদাবলী

কবি বর্ণশিল্পী। এই বর্ণ কোথাও তুলিকামুখে ফলাইয়া তুলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছবি, যাহা দর্শকের ভাবলোকে ঊর্মি তুলিয়া নিবৃত্ত হয়, তরঙ্গ তুলে না; কোথাও আবার লেখনীমুখে স্বল্পরেখায় আভাসিত করে 'খানিক কালো খানিক আলোর-র স্বপ্নচিত্র,

যাহা দর্শকমনে যে আনন্দের সৃষ্টি কর, তাহা ধ্যানানন্দ। বৈষ্ণবকাব্যে দুই লক্ষণেরই প্রচুর নির্দশন রহিয়াছে।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী ঃ ভূমিকা বৈষ্ণব পদাবলী

একজন মর্মজ্ঞ ইংরেজ লেখক বলিয়াছেন, 'Poetry is the speech of Soul to Soul.' কথাটি সুন্দর এবং দুইভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষের মুখের ভাষা স্থূল, ইহার অর্থ বাচ্য ; আত্মার ভাষা সূক্ষ্ম, ইহার অর্থ ব্যঙ্গ। শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকবির ভাষা আত্মার ভাষা। আবার, কবির আত্মা যদি আন্তরিকতার ও তন্ময়তার করোষ্ণস্পর্শে পাঠকের আত্মাকে আনন্দমুগ্ধ করিতে না পারে, কবির সৃষ্টি হয় অকৃতার্থ। এদিকেও বৈষ্ণবকাব্যের কৃতার্থতা। প্রেমধর্ম্মে যাঁহাদের দীক্ষা, তাঁহাদের রচিত পদাবলী প্রিয়তমের পূজাঞ্জলি। বৈষ্ণবকবির প্রেরণা কবিযশঃপ্রার্থনা নহে, নৈবেদ্য-রচনা। কে কত বিচিত্রভাবে পূজার থালী সাজাইতে পারে, কবিদের মধ্যে তাহারই যেন একটা উল্লাসময় প্রতিযোগিতা।

শ্যামাপদ চক্রবর্তী ঃ ভূমিকা, বৈষ্ণব পদাবলী

বোকা

অপরকে যারা কষ্ট দেয়, তাদের মতন বোকা আর হয় না, কারণ তারা অপরকে আনন্দ দেওয়ার বিশুদ্ধ তৃপ্তির স্বাদটাই সারা জীবনে পায় না। তবু কত মানুষ যে এই বোকামি করে।

নীললোহিত (সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) ঃ কৈশোর

বোতল

জীবনটা শুরু কাটালে তুমি বেশ—
দুধের বোতলে শুরু,
মালের বোতলে ডুবে
স্যালাইন-বোতলে হলে শেষ।

পি. সি. সরকার (জুনিয়র) ঃ তিন বোতলের গল্প (জাদু জীবন)

বোন

ঘরে বোন থাকা মানেই.........বনে ঘর থাকা।

শিবরাম চক্রবর্তী ঃ হাসির ব্যাপার নয়

বৌদ্ধধর্ম (দ্র. বুদ্ধ)

বৌদ্ধধর্ম বিষয়াসক্তির ধর্ম নহে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অথচ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়কালে এবং তৎপরবর্তীযুগে সেই বৌদ্ধসভ্যতার প্রভাবে এ দেশে শিল্প বিজ্ঞান বাণিজ্য এবং সাম্রাজ্যশক্তির যেমন বিস্তার হইয়াছিল এমন আর কোনোকালে হয় নাই। তাহার কারণ এই মানুষের আত্মা যখন জড়ত্বের বন্ধন হইতে মুক্ত হয় তখনই আনন্দে তাহার সকল শক্তিই পূর্ণ বিকাশের দিকে উদ্যম লাভ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রার পূর্বপত্র (পথের সঞ্চয়)

ব্যক্তিত্ব

পরিবর্তন বস্তুজগতের স্বাভাবিকতা, ব্যক্তিত্বের ধর্ম পরিণত হওয়া।

আলোক সরকার ঃ সাক্ষাৎকার (শতভিষা)

ব্যথা

আমার ব্যথা যখন আনে আমায় তোমার দ্বারে
তখন আপনি এসে দ্বার খুলে দাও, ডাকো তারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলেখা-১

দুঃখের বেশে এসেছ বলে তোমারে নাহি ডরিব হে।
যেখানে ব্যথা তোমারে সেথা নিবিড় করে ধরিব হে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত

নিভৃত প্রাণের নিবিড় ছায়ায়
নীরব নীড়ের পরে
কথাহীন ব্যথা
একা একা বাস করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ

ব্যবসা (দ্র. বাণিজ্য)

ব্যবসা ব্যাপারটাই তো সত্য থেকে দূরে থাকা। মানুষকে ঠকানো।

আবদুল জব্বার ঃ একজন চামড়া ব্যবসায়ী

ব্যবসার ক্ষেত্রে পাপ-পুণ্যের বিচার কিসের? ওটা নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। এমন কথাই ব্যবসায়ীদের মুখে শুনেছি।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ হিমালয়ের পথে পথে

অধ্যাপনাও ব্যবসাই। যুগটাই ব্যবসায়ীর। সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম পর্যন্ত মার্কেট-নিয়মে চলে।

গোপাল হালদার ঃ আর একদিন (ত্রিদিবা)

টাকা চাই, ব্যবসাকে বড় করা চাই। বড় হওয়ার কি শেষ আছে, কোথাও কি কোনো সীমারেখা টানা আছে তার?

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

আমরা ব্যবসাদার মানুষ, টাকা পয়সা দিয়েই গণ্ডগোল মেটাতে ভালবাসি, খুনখারাপিটা তেমন পছন্দ হয় না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী

পৃথিবীর চারদিকে টাকা ছড়ানো রয়েছে, কোন ফন্দি-ফিকিরে সে-গুলোকে কুড়িয়ে ঘরে তোলার নামই ব্যবসা।

বনফুল ঃ নির্মোক

ব্যবসাটাই যুদ্ধ। খদ্দের হল শত্রুপক্ষ, যে কোনও প্যাঁচে ফেলে তার পকেট থেকে পয়সাগুলো কেড়ে নিতে হবে। মিষ্টি কথা বলে, পিঠে হাত বুলিয়ে, লোভ দেখিয়ে চোখ রাঙিয়ে যেমন করে হোক—।

বনফুল ঃ ঋণশোধ

মানুষকে প্রতারণা করাই আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের সর্বপ্রধান ধর্ম।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ দিনলিপির কয়েকটি পাতা
(নন্দন-মার্চ ২০০৩)

ব্যর্থ

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

বরণীয় তারা, স্মরণীয় তারা, তবুও বাহির দ্বারে
আজি দুর্দিনে ফিরানু তাদের ব্যর্থ নমস্কারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রশ্ন

মরব না আর ব্যর্থ আশায়
বালুমরুর তীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী (কণিকা)

ব্যস্ত

সময়টা বিনা কাজে ন্যস্ত
তা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্র (বীথিকা)

ব্যস্ত সবাই এদিক-ওদিক করছে ঘোরাঘুরি—
বাবু হাঁকেন, "ওরে আমার গোঁফ গিয়েছে চুরি"।

সুকুমার রায় ঃ গোঁফ চুরি

ব্যাকরণ

ব্যাকরণ মনে আছে?
—আছে।
—'কর্তা' কী? তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।
—আজ্ঞে, কর্তা ওপাড়ার জয়মুন্‌শি।
—কেন?
—তিনি ক্রিয়াকর্ম নিয়েই থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছাত্রের পরীক্ষা (হাস্যকৌতুক)

আমার নাম শ্রীব্যাকরণ সিং বি.এ.খাদ্যবিশারদ। আমি খুব চমৎকার ব্যা করতে পারি। তাই আমার নাম ব্যাকরণ, আর শিং তো দেখতেই পাচ্ছ। ইংরাজিতে লিখবার সময় লিখি B.A. অর্থাৎ ব্যা।

সুকুমার রায় ঃ হ য ব র ল

ব্যাকুল

আমার দিন ফুরালো ব্যাকুল বাদলসাঁঝে
গহন মেঘের নিবিড় ধারার মাঝে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

ব্যাকুলতা

কেমন করে আমি বোঝাই আমার ব্যাকুলতা।
বাতি দিয়ে কি হয় বিদ্যুতের ব্যাখ্যা?
সাগরের অর্থ মেনে সরোবরে?

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ ঝড় যেমন করে জানে অরণ্যকে

রাধিকার চিত্ত-দীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৈষ্ণবকবিতা (সোনার তরী)

হেঁয়ালি বরঞ্চ বোঝা যায় কিন্তু যখন ব্যাখ্যা করতে বসেন তখন একেবারেই হাল ছেড়ে দিতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ বর্ষণ

ব্যাঙ

বিগ ব্যাঙ হয়ে গেছে—কোলা ব্যাঙ জানে না
স্টেফানের ব্ল্যাকবডি ব্ল্যাক-হোলে মানে না।

দীপঙ্কর রায় ঃ গাছে ওঠা গরু

বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।

এই ব্যাঙের ডাক নববর্ষার মত্ত ভাবের সঙ্গে নহে, ঘনবর্ষার নিবিড় ভাবের সঙ্গে বড়ো চমৎকার খাপ খাইয়া যায়।....জ্যোতির্হীন, গতিহীন, কর্মহীন, বৈচিত্র্যহীন, কালিমালিপ্ত একাকারের দিনে ব্যাঙের ডাক ঠিক সুরটি লাগাইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কেকাধ্বনি

ব্যালট

এই কথাটা জেনো যার
বুলেট যার ব্যালট তার।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ বুলেট যার ব্যালট তার (ছড়া সমগ্র)

ব্রত

ব্রত হল ধর্মের গার্হস্থ্য রূপ। ব্রতকে যাদুবিদ্যাগত প্রতীকী অভিব্যক্তি-ব্যঞ্জিত অনুষ্ঠানও বলা চলে। ব্রত যে করে তাকে বলে ব্রতী।.......ব্রত কথাটির সাধারণ অর্থ নিয়ম বা ব্রত হল নিয়ম-সংযম সংযমের মধ্যে দিয়ে কামনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান।

শীলা বসাক ঃ বাংলার ব্রতপার্বণ

ব্রহ্ম

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥......
ব্রহ্ম শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান।
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ শাস্ত্রের প্রমাণ॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ঃ চৈতন্যচরিতামৃত

ব্রহ্মের একদিকে ব্যাপ্তি আর-একদিকে সমাপ্তি ; এক দিকে পরিণতি আর একদিকে পরিপূর্ণতা ; একদিকে ভাব, আর একদিকে প্রকাশ—দুই একসঙ্গে গান এবং গান-গাওয়ার মতো অবিচ্ছিন্ন মিলিয়া আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কর্মযোগ (শান্তিনিকেতন—১৩)

ব্রহ্ম যিনি নির্বিশেষ তিনি বিশেষের মধ্যেই ব্যক্ত। কিন্তু তাঁর বিশেষের শেষ নেই। জল তাঁর বিশেষ, স্থল তাঁর বিশেষ, বায়ু তাঁর বিশেষ, অগ্নি তাঁর বিশেষ, প্রাণ তাঁর বিশেষ বুদ্ধি প্রেম সমস্তই তাঁর বিশেষ—গণনা করে কোথাও তাঁর অন্ত পাওয়া যায় না—।.......যিনি অনন্তবিশেষ, তিনিই নির্বিশেষ, যিনি অনন্তরূপ, তিনিই অরূপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা—২০

আমাদের ব্রহ্ম রসো বৈ সঃ। তিনি রসস্বরূপ। আমাদের ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রামমোহন রায় (চারিত্রপূজা)

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ব্রহ্ম আকাশবৎ। ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই। যেমন অগ্নির কোন রংই নাই। তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, এই তিন গুণই শক্তির গুণ। আগুনে যদি সাদা রং ফেলে দাও সাদা দেখাবে, যদি লাল রং ফেলে দাও লাল দেখাবে। যদি কাল রং ফেলে দাও কাল দেখাবে। ব্রহ্ম—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণের অতীত।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ব্রহ্মচর্য

ব্রহ্মচর্যই জীবনের মূল ভিত্তি। ব্রহ্মচর্য পালন দ্বারা চরিত্রবল তৈরি হয়, ব্রহ্মচর্য দ্বারাই শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়, বুদ্ধি নির্মল ও সতেজ হয়। আজকাল ছাত্রসমাজের অধঃপতনের মূল কারণ এই ব্রহ্মচর্যহীনতা। ইহার জন্যই ছাত্রসমাজের মেরুদণ্ড একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। তাহাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য আজ সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ : শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ উপদেশ

ব্রহ্মচর্য পালন শুষ্কতার সাধনা নয়।........যথার্থভাবে রসগ্রহণের অধিকারী হইতে গেলে গোড়ায় কঠিন চাষেরই দরকার। রসের পথেই পথ ভুলাইবার অনেক উপসর্গ আছে। সে পথে সমস্ত বিপদ এড়াইয়া পূর্ণতালাভ করিতে যে চায়, নিয়মসংযম তাহারই বেশি আবশ্যক। রসের জন্যই এই নীরবতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৌন্দর্যবোধ (সাহিত্য)

ব্রহ্মদৈত্য

—ঠাট্টা নয়, তুমি কখনো সত্যকার ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছ?
—সত্যকার নয় এমন অনেক ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছি। ঠিক খাঁটি জিনিসটি সংসারে দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৌকাডুবি—২৭

ব্রাহ্ম

ব্রাহ্ম বটে, কিন্তু তেত্রিশ কোটির সঙ্গে লজ্জাকে বিসর্জন দেয় নি এবং সত্য বলছি শ্রীকেও রক্ষা করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রজাপতির নির্বন্ধ—২

ব্রাহ্মণ

অন্য দেশ, ওয়েলিংটনের মতো সেনাপতি, নিউটনের মতো বৈজ্ঞানিক, রথ্‌চাইল্ডের মতো লক্ষপতি চায়, আমাদের দেশ ব্রাহ্মণকে চায়। ব্রাহ্মণ, যার ভয় নেই, লোভকে যে ঘৃণা করে, দুঃখকে যে জয় করে, অভাবকে যে লক্ষ্য করে না, যে 'পরমে ব্রহ্মণি যোজিতচিত্তঃ'। যে অটল, যে শান্ত, যে মুক্ত সেই ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষ চায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা—১৮

কর্মিদলকে বরাবর ঠিক পথটি দেখাইবার জন্য, কর্ম কোলাহলের মধ্যে বিশুদ্ধ সুরটি বরাবর অবিচলিতভাবে ধরিয়া রাখিবার জন্য, এমন এক দলের আবশ্যক, যাঁহারা যথাসম্ভব কর্ম ও স্বার্থ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবেন। তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মণ (ভারতবর্ষ)

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারততীর্থ (গীতাঞ্জলি)

ব্রাহ্মণ—ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ জানে যে, কিংবা অধ্যয়ন করে, অথবা ব্রহ্মের অর্থাৎ ঈশ্বরের উপাসনা করে যে, ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মন্+ষ্ণ "যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা। বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্।" অর্থাৎ যোগ, তপঃ দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, ঘৃণা, বিদ্যা, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, এই কয়েকটি ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

সুবলচন্দ্র মিত্র : সরল বাঙ্গালা অভিধান

ভক্ত

যে আত্মজয়ী, যাহার চিত্ত সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত সে ভক্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র : ভক্তি

প্রকৃত ভক্ত যে, সে মুক্তি চায় না, ব্রহ্মত্ব চায় না। ভগবানের দাস হয়ে থাকতে চায়, রস আস্বাদ করতে চায়। ভক্তির পথেই সে সমাধিলাভ করে, ব্রহ্মদর্শনও তার হয়।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : দেবযান

যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তার সব জুটিয়ে দেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

ভক্তদের ভিতর থাক থাক আছে উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত, অধম ভক্ত। গীতাতে এ সব আছে।......অধম ভক্ত বলে ঈশ্বর আছেন,—ঐ আকাশের ভিতর অনেক দূরে। মধ্যম ভক্ত বলে, ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতন্যরূপে—প্রাণরূপে আছেন। উত্তম ভক্ত বলে, ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন, যা কিছু দেখি ঈশ্বরের এক একটি রূপ। তিনিই মায়া, জীব জগৎ এই সব হয়েছেন—তিনি ছাড়া আর কিছু নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

ভক্তি

ভক্তিহীন ভজন, লবণহীন ব্যঞ্জন। **বাংলা প্রবাদ**

আমরা ভক্তিপ্রবণ জাতি। ভক্তি করাকেই আমরা ধর্মাচরণ বলিয়া থাকি ; কাহাকে ভক্তি করি তাঁহা বিচার করা আমাদের পক্ষে বাহুল্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অযোগ্য ভক্তি (সমাজ)

পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ভক্তির জোরে সামান্য দই-মাছ পর্যন্ত জোটানো যায় না। পয়সা চাই। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** : নৌকাডুবি—২৭

ভক্তি আসে রিক্তহস্ত প্রসন্নবদন।
অতিভক্তি বলে, "দেখি কি পাইলে ধন।"
ভক্তি কয়, "মনে পাই, না পারি দেখাতে।"
অতিভক্তি কয়, "আমি পাই হাতে হাতে।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভক্তি ও অতিভক্তি (কণিকা)

অনুরাগে চাওয়া-পাওয়ার হিসেব থাকে, ভক্তি তারও বড়ো। তাতে আবেদন নেই, নিবেদন আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ—১৩

কথা যত কম বোঝা যায় অবুঝরা ততই ভক্তি করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা—৫

আমার কি বেদের উপর কম ভক্তি? আমি বেদ পুজো করি, তাই বেদ পাঠ করবার সুবিধে হয়ে ওঠে না। চন্দনে আর সিঁদুরে আমার বেদের একটা অক্ষরও দেখবার জো নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রাণী—১।৮

মাল্যচন্দন দিলে অজায়গায়, হিসেব করে ভক্তি না করলে উন্নতি হবে না যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ল্যাবরেটরি

ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে, জ্ঞান বারবাড়ি পর্যন্ত যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

ভক্তির মানে কি—না কায়-মন-বাক্যে তাঁর ভজনা। কায়—অর্থাৎ হাতের দ্বারা তাঁর পূজা ও সেবা, পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া, কানে তাঁর ভাগবত শোনা, নামগুণ কীর্তন শোনা, চক্ষে তাঁর বিগ্রহ দর্শন। মন—অর্থাৎ সর্বদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর লীলা স্মরণ মনন করা। বাক্য—অর্থাৎ তার স্তব-স্তুতি, তাঁর নাম গুণকীর্তন, এই সব করা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ভক্তিবাদ

ভক্তিবাদে ব্যক্তিগত সুখের জন্যে উৎকণ্ঠা, অহংকার ও অসৎসঙ্গ নিন্দিত ; বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব মূলগত ভাবে কর্মকাণ্ডবিরোধী এবং সম্পূর্ণ অহিংস। গৌড়ীয় ভক্তিবাদী বৈষ্ণবরা ক্রিয়াকাণ্ডকে পুরোপুরি বর্জন না করলেও তার গুরুত্বকে অনেকখানি খর্ব করেছেন ; স্মার্ত প্রায়শ্চিত্ত নয়, ভক্তির জোরেই পাপ স্খালন হয়,—বৈষ্ণবরা এই বিশ্বাসকে দৃঢ় করে তোলেন ; সবচেয়ে বড় কথা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে ভক্তিতত্ত্বে এই প্রথম প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃতি লাভ করেছিল, মানুষের জীবনের মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল ("সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।")। ভক্তিমানের কোনও জাতি তত্ত্বত অস্বীকৃত। "আমার ও আমার সেবকের কোনও জাতি নাই।" ভক্তিমান চণ্ডাল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের সমান। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা পুরোপুরি সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তা ছাড়া, জ্ঞানের মূল্য তাঁরা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন, গুরুর উপদেশই মূল্য, গুরুই ত্রাতা ; ভক্তিবাদী বৈষ্ণবেরা দৃশ্যমান জগৎকে নস্যাৎ করা মায়াবাদকে অস্বীকার করেছেন কিন্তু সংযম, তিতিক্ষা ও কৃচ্ছ্রের চূড়ান্ত সাধনে (যেমন স্বয়ং চৈতন্য জীবনের শেষপর্বে, রঘুনাথ দাস, সনাতন) পার্থিব জীবনকেই অবান্তর করে দিয়েছেন।

অবন্তীকুমার সান্যাল ঃ শ্রীচৈতন্য এবং ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিত

ভগবান

বার বার ডাকিতেছি, কোথা ভগবান।
একবারে তাতে তুমি, নাহি দাও কান॥......
হায় হায় কব কায়, ঘটিল কি জ্বালা।
জগতের পিতা হয়ে তুমি হলে কালা॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঃ নির্গুণ ঈশ্বর

ভগবানের স্বরূপ জানতে ইচ্ছে করে, তাই ঘুরে বেড়াই, তার সৃষ্টির বিচিত্র রূপের মধ্যে তাকে খুঁজতে চেষ্টা করি। ভগবানকে ডাকব তার আবার মার্গ কি? দীক্ষা কি?

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারানাথ তান্ত্রিক

ভগবান তাকেই সাহায্য করেন, যে অকপটে সৎ হবার চেষ্টা করছে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দেবযান

যে ভগবানকে চেনে না, তাঁকে স্বীকার করে না, তার হোল আচ্ছাদিত চেতন। তার চেয়ে যে ভাল, তাকে বলে সঙ্কুচিত চেতন। এই দুই ধরনের লোককে ভগবৎকথা শোনালে উল্টো উৎপত্তি হয়.......আলো জ্বাললে কি হবে? ঢাকনির মধ্যে আলো সেঁধোবে না। এদের ওপরে মুকুলিত চেতন, তাদের মনে ভগবানের জ্ঞান জাগতে সুরু করেছে। তারও ওপরে বিকশিত চেতন, সবার ওপরে পূর্ণ বিকশিত চেতন—যেমন বড় বড় ভক্ত কি সাধকেরা।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দেবযান

ভগবানও কবি। উপনিষদ কি বলেনি তাঁকে, কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু?

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : দেবযান

ভগবানে ভালবাসা এলে নিয়মকানুনের প্রয়োজন নেই। ভক্তিশাস্ত্রে এজন্য দুই প্রকারের সাধনের নির্দেশ দেওয়া আছে, একটি বৈধী আর একটি রাগাত্মিকা। বিধিপূর্বক পূজা-অর্চনা করা হলো বৈধী ভক্তি। এর প্রয়োজন আছে। কিন্তু ক্রমে যখন ভগবানের উপর ভালবাসা জন্মে তখন আর নিয়মকানুনের দরকার হয় না।

স্বামী ভূতেশানন্দ : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রসঙ্গ

বেদনাদূতী গাহিছে, 'ওরে প্রাণ,
তোমার লাগি জাগেন ভগবান।
নিশীথে ঘন অন্ধকারে
ডাকেন তোরে প্রেমাভিসারে,
দুঃখ দিয়ে রাখেন তোর মান।
তোমার লাগি জাগে ভগবান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১৭

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে
দয়াহীন সংসারে,
তারা বলে গেল 'ক্ষমা করো সবে', বলে গেল 'ভালোবাসো—
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'।
.....তাই তো তোমায় শুধাই অশ্রুজলে—
যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু, নিভাইছে তব আলো,
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রশ্ন (পরিশেষ)

ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উঁচুনিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এ রকম মনের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবিবার (তিনসঙ্গী)

চান ভগাবান প্রেম দিয়ে তাঁর
গড়া হবে দেবালয়,
মানুষ আকাশে উঁচু করে তোলে
ইঁট পাথরের জয়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

ভঙ্গি

শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঐকতান (জন্মদিনে)

বাংলা ভাষার প্রধান লক্ষণ, তার ভঙ্গীর প্রাবল্য।......হোকগে করুকগে মরুকগে। এতে ঔদাসীন্যে ও ক্ষোভে জড়িয়ে যে ভাবটা ব্যক্ত করে সেটা অন্য ভাষায় সহজে বলা যায় না।.......'হোকগে' শব্দের ইংরেজি তর্জমা করতে হলে বলতে হয় let it happen, I don't care।......'মরুকগে' শব্দে এই ভাষাভঙ্গী খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই ছোট্ট বাংলা শব্দটির ইংরাজি প্রতিবাক্য ; Hang it, let it go to the dogs। 'কালিকিষ্টি'....একটা ভঙ্গীওয়ালা কথা। শুধু 'কালো' বলে যখন মনে তৃপ্তি হয় না তখন তার সঙ্গে 'কিষ্টি' যোগ করে কালিমাকে আরও অবজ্ঞায় ঘনিয়ে তোলা হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলাভাষা-পরিচয়

ভজন

ভাবের প্রকাশই ভজন।.........ভাবহীন ভজন বিলাতী ফুলের মত। দেখতে খুবই সুন্দর, কিন্তু প্রায়ই গন্ধহীন।.........কীর্তনিয়াদের যদি ভাব না যানে, সেই কীর্তনে দেবতার সাড়া পাওয়া যায় না।

আনন্দময়ী মা ঃ পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা

আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিণামে ‘লুচি’
আমি ভোজনের লাগি করি ভজন।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ হাসির গান

ভক্তিহীন ভজন লবণহীন ব্যঞ্জন।

বাংলা প্রবাদ

ভয়

শাসকদেরও শাসন করছে ভয়। ভয় সাধারণ মানুষের সত্যকার ধারণাকে। মতকে। ভোট দেওয়ার অধিকারকে। তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসবার সাহস নেই। তাই মস্তানের সাহায্য নেওয়া। সাধারণ মানুষের তো বাঁচতে গেলে মস্তানের সাহায্য লাগে না। ভয় পায় বলে, চেয়ার রাখবার জন্য মস্তানের সাহায্য নিতে হয় শুধু নেতাদেরই।

জয় গোস্বামী ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ২৭.৪.২০০৩

যার যা ইচ্ছে করুক।
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।
একটু আধটু রক্ত হয়ত ঝরতে পারে। ঝরুক
ভয় করলেই ভয়, নইলে কিছু না।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ ভয় করলেই ভয়

‘ভয়’ বলতে শ্রীশ্রীমা কী বুঝিয়েছেন? এই ভয় ডাকাতের ভয়, বাঘের ভয়, সাপের ভয়, শত্রুর ভয় বা মরণের ভয় নয়। এই ‘ভয়’ সম্ভ্রমচ্যুতির ভয়, লোকাপবাদের ভয়, লোকলজ্জার ভয়। এই ভয় “পাছে লোকে কিছু বলে”-র ভয়! রাজপুত নারীরা বিধর্মীদের হাতে সম্ভ্রমহানির ভয়ে অবলীলায় দলে দলে জহর ব্রতের মাধ্যমে আগুনে নিজেদের নিক্ষেপ করেছেন। নারীর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত রাখে এই সম্ভ্রমহানির ভয়। এছাড়া লোকাপবাদের ভয়, লোকনিন্দার ভয়ও নারীকে সংযত রাখে। বস্তুতঃ এই ‘ভয়’ যেন নারীর কাছে এক রক্ষাকবচের কাজ করে, নারীকে বিপথগামিতা থেকে রক্ষা করে। ফলে রক্ষা পায় গৃহ, পরিবার, সমাজ। সেজন্যই শ্রীশ্রীমা বললেন ঃ “যার আছে ভয়, তার হয় জয়—বিশেষ করে মেয়েমানুষের।”

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ঃ চিরন্তনী সারদা

ভয় কোরো না, সবচেয়ে গুরুতর পাপ—ভয়!

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী—৫

দেবতা, অপদেবতা, পেঁচো, হাঁচি, বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শ,—ভয় যে কত তার ঠিকানা নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা ১৭

ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিঠি (পূরবী)

পাছে চেয়ে বসে আমার মন
        আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি,
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা
        আমি তাই তো তুলি নে আঁখি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার-সভা ১।১

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে, মঙ্গলময়
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।
দীনপ্রাণ দুর্বলের এ পাষাণভার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য-৪৮

প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়
        বিধবা হইবে পাছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পুরস্কার (সোনার তরী)

না রে না রে, ভয় করব না বিদায়বেদনারে।
        আপন সুধা দিয়ে ভরে দেব তারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্ত

প্রবলের ভয়ে আর দুর্বলের ভয়ে মস্ত একটা তফাত আছে। দুর্বল ভয় পায় সে ব্যথা পাবে, আর প্রবল ভয় পায় সে বাধা পাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র—২ কালান্তর

ভয় হতে তব অভয়মাঝে নূতন জনম দাও হে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রহ্মসঙ্গীত

ভয়টা কাটিয়ে উঠতে পারলেই মুক্তি।
মনের সংস্কারটাও তো একটা ভয়।
কত বছর ধরে আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে রেখেজু

স্বপন দাস ঃ শুধু ভাঙা নয়

ভাই

        সুখ দুখ দুটি ভাই।
সুখের লাগিয়া   যে করে পিরিতি
        দুখ যায় তার ঠাঁই॥

চণ্ডীদাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

পরের দম্ভ স্বর্ণভাণ্ডারের চেয়ে নিজের ভাইয়ের নিঃস্ব হাসিটিও মিষ্টি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ মেবার পতন

প্রভাত-অরুণ ভায়ের মতন
        সাঁপি দিল কর আমার কেশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পতিতা (কাহিনী)

আর সকলেই অতি সহজেই ভাইয়ের মতো ব্যবহার করে, কেবল নিজের ভাই করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজর্ষি-৪৪

ভাওয়াইয়া

নদীর গতিপথ পরিবর্তনের ফলে মরা নদীর নীচু জলকাদাপূর্ণ ভূমিতে গজিয়ে ওঠে মধুয়া, কাশিয়ার (কুশ) জঙ্গল। এ ধরনের জঙ্গলপূর্ণ ভূমিকে বলা হত 'ভাওয়া'। এই ভাওয়া মহিষের উপযুক্ত চারণক্ষেত্র। মাসের পর মাস মহিষ চরানোর সময়ে

মইষালেরা দোতারা বাজিয়ে করত এই গান। 'ভাওয়া' থেকে এ গান ভেসে আসত পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে। তাই এই গানের নাম হয়েছে 'ভাওয়াইয়া'।

সুখবিলাস বর্মা ঃ ভাওয়াইয়া

ভাগবত

ভক্তের একটা লক্ষণও আছে—

'সর্বদেবান্ পরিত্যজ্য
নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ।
রতস্তদীয়সেবায়াং
স ভাগবত উচ্যতে॥"

যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করে ভগবানকে আশ্রয় করেন এবং তাঁর সেবায় রত থাকেন তিনি ভাগবত।

ভাগবত-শব্দ ভগবানকে বোঝাতে পারেন। সেইটি কীভাবে হয় তা চৈতন্যচরিতামৃত বলে দিচ্ছেন—

'দুই ভাগবত দ্বারা দিয়া ভক্তিরস।
তাঁহার হৃদয়ে তাঁর প্রেমে হয় বশ॥'

শাস্ত্র-ভাগবত ও ভক্ত-ভাগবত এই দুই-এর সঙ্গ করলেই ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। এই ভক্তিরসের আশ্রয় হল ভক্ত নিজে আর ভক্তির বিষয় হলেন ভগবান স্বয়ং। সুতরাং ভক্তিরসের আশ্রয় হিসাবে ভক্ত ভাগবত হল। আর ভক্তিরসের বিষয় হিসাবে ভগবান ভাগবত হলেন। প্রথম গ্রন্থ-ভাগবত। এই ভাগবত গ্রন্থের প্রথম থেকে নবম স্কন্ধ পর্যন্ত ভক্ত-ভাগবতের কথা। দশমস্কন্ধ থেকে ভাগবতরূপ ভগবানের কথা। তা হলে শ্রীরামকৃষ্ণ যে বললেন—'ভাগবত ভক্ত ভগবান'—এই তিনই এক। এটি খাঁটি বৈষ্ণবের মন্ত্র।

ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী ঃ শ্রীরামকৃষ্ণ শাস্ত্রমুখে

ভাগ্য

আমার ভাগ্যটা যেন ঘোলা জলের ডোবা,
বড়োরকম ইতিহাস ধরে না তার মধ্যে ;
নিরীহ দিনগুলো ব্যাঙের মতো একঘেয়ে ডাকে,
না সেখানে হাঙর-কুমিরের নিমন্ত্রণ, না রাজহাঁসের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ক্যামেলিয়া (পুনশ্চ)

নিশি দু-পহর, পশিনু ঘর
দু হাত রিক্ত করি,
তুমি আছ একা সজল নয়নে
দাঁড়ায়ে দুয়ার ধরি।
চোখে ঘুম নাই, কথা নাই মুখে,
ভীত পাখি-সম এলে মোর বুকে—
আছে আছে বিধি, এখনো অনেক
রয়েছে বাকি।
আমারো ভাগ্যে ঘটে নি ঘটে নি
সকলি ফাঁকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৃতার্থ (ক্ষণিকা)

সংসারের সমুদ্র মন্থিতে
কারো ভাগ্যে সুধা ওঠে, কারো হলাহল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গতি (সোনার তরী)

ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়—
তুমি আছ, আমি আছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নির্ভয় (মহুয়া)

ভাগ্যের রেল-লাইন এমন কাঁচা করে পাতা যে, ডিরেলের ভয় সর্বত্রই এবং প্রতিমুহূর্তেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ—৫৩

ভাগ্য তো সব সময় দেখা বিন্তি খেলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবিবার

ভাঙনের যিনি দেবতা তিনি সব সময় বড়ো পথ দিয়ে চলাচল করেন না। তাঁর জন্যে যে-সব ছিদ্রপথ থাকে সে কারও চোখে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তধারা

দেবতা নতুন সৃষ্টি করতে পারেন কিন্তু ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিমলার আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

দুর্বলতা. ভাঙা সবলতা ভাঙার চেয়ে অনেক শক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—১২

ভাটিয়ালি

ভাটিয়ালি কথাটি ভাটি বা ভাঁটা শব্দ থেকে এসেছে.....সাধারণত পূর্ব বাংলার ঢাকা, শ্রীহট্ট, মৈমনসিংহ এবং ত্রিপুরার কিছু অংশকে ভাটি অঞ্চল বলা হয়ে থাকে। চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশালের কিছু অংশও এই ভাটি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। ভাটি অঞ্চল বলার অর্থ—এই অঞ্চলগুলি নিম্নভূমি এবং সমগ্র এলাকাটাই বর্ষাকাল থেকে আরম্ভ করে বৎসরের অর্ধেক সময় অবধি জলমগ্ন থাকে। বর্ষাকালে এই দিগন্তবিস্তীর্ণ জলাভূমিকে 'হাওর' বলা হয়। 'হাওর' কথাটি সাগর কথারই অপভ্রংশ।।.....এই অঞ্চলের পরিবেশ থেকেই স্বতোৎসারিত হয়ে রূপ নিয়েছে ভাটিয়ালি সুর।

গৌরী ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

ভাঁড়

আহবমানের ভাঁড় হয়েছে গাধার পিঠে চড়ে।

জীবনানন্দ দাশ : উন্মেষ (সাতটি তারার তিমির)

ভাত

ভাত, ভাতের মতোই তার আত্মাকে
মানুষের কাছে খুলে ধরে।
মানুষ, মানুষের বিবেক
এবং ভালোবাসা দিয়ে সেই আত্মাকে
পরখ করে।
পরখ করে বোঝে
ভাতের দোসর আর কিছুই হতে পারে না।

কমলেশ সেন : একমুঠো ভাতের জন্যে

পৃথিবীতে বিবেক বলতে বোঝায়
মানুষের জন্যে একমুঠো ভাত।
যারা মানুষকে একমুঠো ভাত দিয়ে পারে না
তারা কোন সাহসে বিবেক নিয়ে বড়াই করে?.....
আমরা চিরদিনই
আমাদের বুকের মধ্যে
ভাতের নীরব ভালোবাসা লুকিয়ে রেখেছি।

কমলেশ সেন : একমুঠো ভাতের জন্যে

ভাত দেয় না ভাতারে, ভাত দেয় গতরে।

বাংলা প্রবাদ

হায় তোকে ভাত দিই কী করে যে ভাত দিই হায়
হায় তোকে ভাত দেব কী করে যে ভাত দেব হায়।

শঙ্খ ঘোষ : যমুনাবতী

ভাদু

ভাদ্রমাসে........অনুষ্ঠিত হয় বলে নাম ভাদু উৎসব এবং এই উৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত গানকেই বলা হয় 'ভাদুগান'। ভাদু উৎসবে অংশগ্রহণ করেন সাধারণত নিম্নবর্ণের মানুষ।........

গানই ভাদু পূজার মূল অবলম্বন এবং ভাদু পরবের মূল উদ্দেশ্য হল সুখ-সমৃদ্ধি, শস্যবৃদ্ধি ও সন্তানকামনা।

তুষার চট্টোপাধ্যায় : লোক-উৎসব : ভাদু ও তুষু

ভাব

ভাব পেতে চায় রূপেরি মাঝারে অঙ্গ,
রূপ পেতে চায় ভাবের মাঝারে ছাড়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ—১৭

স্ফটিক যেমন অনেকগুলো কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি "ভাব" কথাটা অনেকগুলা অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে।.....সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পুরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকার মতো ইহাদের অর্থচ্ছটাকে ভিন্ন পর্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া কাজে লাগাই। ভাব বলিতে 'feelings', ভাব বলিতে 'idea,' ভাব বলিতে 'characteristics', ভাব বলিতে 'suggestion'—এমন আরও কত কী আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

রাগ না অনুরাগ, না বিরাগ, তোর ভাব দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই ; কেবল এইটুকু বুঝি, তোর ঈশেন কোণে যেন মেঘ উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শোধবোধ—১

ভাবনা

নাই তোর নাই রে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অনন্ত জীবন (প্রভাতসংগীত)

না, না গো, না
কোরো না ভাবনা—
যদি বা নিশি যায়
যাব না, যাব না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার-সভা—১। ১

রোদপোহানো ভাবনাগুলো
ভেসে ভেসে বেড়ালো মনের দূর গগনে।
বেলা গেল অকাজে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দেখা (পুনশ্চ)

বসন্তে কোকিল ডালপালার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থেকে বনচ্ছায়াকে সকরুণ করে তোলে—আর বর্ষায় বলাকাই বল, হংসশ্রেণীই বল, উধাও হয়ে মুক্ত পথে চলে শূন্যে—কৈলাসশিখর থেকে বেরিয়ে পড়ে অকূল সমুদ্রতটের দিকে। ভাবনার এই দুই জাত আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্রাবণগাথা

ভার

তুমি যত ভার দিয়েছ, সে ভার
করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি
সকলি হয়েছে বোঝা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভার (খেয়া)

গিরি যে তুষার নিজে রাখে, তার
ভার তারে চেপে রহে।
গলায়ে যা দেয় ঝরনাধারায়
চরাচর তারে বহে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

ভারত

বল বল বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে
ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।
ধর্মে মহান হবে কর্মে মহান হবে
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।

অতুলপ্রসাদ ঃ বল বল বল সবে

কতকাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে।
অবসাদ-হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে!

গোবিন্দচন্দ্র রায় ঃ ভারত বিলাপ

না জাগিলে সব ভারত-ললনা,
এ ভারত আর জাগে না জাগে না।
অতএব জাগ, জাগ গো ভগিনি,
হও "বীরজায়া, বীর প্রসবিনী"।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ ভারত-ললনা

চল্ রে চল্ সবে ভারত-সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান।
বীর-দর্পে পৌরুষ-পর্বে
সাধ রে সাধ্ সবে দেশের কল্যাণ।....
দলাদলি সব ভুলি
হিন্দু-মুসলমান ;
এক পথে এক সাথে চল
উড়াইয়ে একতা-নিশান।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'বীণা বাদিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত

ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত—এক দেবপ্রতিম জাতির অলৌকিক উদ্যম, বিচিত্র চেষ্টা, অসীম উৎসাহ, অপ্রতিহত শক্তিসঙ্ঘাত ও সর্বাপেক্ষা অতি গভীর চিন্তাশীলতায় পরিপূর্ণ। ইতিহাস বলিলে সচরাচর রাজা রাজড়ার কথা ও তাঁহাদের কাম ক্রোধ ব্যসনাদির দ্বারা কিয়ৎকাল পরিক্ষুব্ধ, তাঁহাদের সুচেষ্টা কুচেষ্টায় সাময়িক বিচালিত সামাজিক চিত্রকে বুঝায় ; তাহা হয়তো প্রাচীন ভারতের একেবারেই নাই। কিন্তু ক্ষুৎপিপাসা-কাম-ক্রোধাদি-বিতাড়িত, সৌন্দর্যতৃষ্ণাকৃষ্ট ও মহান-অপ্রতিহতবুদ্ধি, নানাভাব পরিচালিত একটি অতি বিস্তীর্ণ জনসঙ্ঘ, সভ্যতার উন্মেষের প্রায় প্রাক্কাল হইতে নানাবিধ পথ অবলম্বন করিয়া যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন—ভারতের ধর্মগ্রন্থরাশি, কাব্যসমুদ্র, দর্শনসমূহ ও বিবিধ বৈজ্ঞানিক তন্ত্রশ্রেণী প্রতি ছত্রে তাহার প্রতিপদ-বিক্ষেপ, রাজাদিপুরুষ বিশেষবর্ণনাকারী পুস্তকনিচয়াপেক্ষা লক্ষগুণ স্ফুটিকৃতভাবে দেখাইয়া দিতেছে। প্রকৃতির সহিত যুগযুগান্তরব্যপী সংগ্রামে তাঁহারা যে রাশীকৃত জয়পতাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আজ জীর্ণ ও বাত্যাহত হইয়াও সেগুলি প্রাচীন ভারতের জয় ঘোষণা করিতেছে।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ উদ্বোধন এর প্রস্তাবনা (১/১)

হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন-ইন্দ্রিয়সুখের নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ে'র জন্য বলিপ্রদত্তর ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্ব, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বর্তমান ভারত

হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে
জাগো রে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের
সাগরতীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—১০৬

হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুটদণ্ড সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়পরাজয় শর সংহরিতে।
.....ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদেরে পুণ্য কর্মে করেছ মঙ্গল,
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্ব দুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—৯৪

হে ভারত, তব শিক্ষা দিয়েছে যে ধন
বাহিরে তাহার অতি অল্প আয়োজন,
দেখিতে দীনের মতো, অন্তরে বিস্তার
তাহার ঐশ্বর্য যত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—৯৫

মিলে সব ভারত সন্তান,
একতান মন-প্রাণ।
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান?

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গাও ভারতের জয়

বাজরে শিঙ্গা, বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভারত-সঙ্গীত

ভারতবর্ষ

যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিল জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরায় প্রভাত হইল গভীর রাত্রি ঃ
বন্দিল সবে "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"....
জননী, তোমার বক্ষে শান্তি, কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি ;
জননি! তোমার সন্তান তরে কত না বেদনা কত না হর্ষ ;
জগৎপালিনি জগত্তারিণি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ॥

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সিংহল বিজয়

বিধাতা যখন ভারতবর্ষ তৈরি করেছিলেন, তখন তার ললাটে এই কথা লিখে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের সর্বনাশ করবে তার নিজের সন্তান।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ মেবার পতন

ভারতবর্ষের আদর্শ ছিল সত্যলাভের জন্য সর্বদুঃখবরণের নির্ভীকতা।

প্রণবরঞ্জন ঘোষ : বাংলা সাহিত্যে বিবেকমন্ত্র

ভারতবর্ষের ধর্ম হিমালয়ের মত অত্যুচ্চ ও গম্ভীর, পাদদেশে উর্বর শস্যশ্যামল হরিৎক্ষেত্র।

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ : প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস

ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি, এদেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এ দেশে আর্যসভ্যতাও যেমন সত্য, দ্রাবিড় সভ্যতাও তেমনি সত্য, এ দেশে হিন্দুও যত বড়ো, মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছাত্রশাসনতন্ত্র

ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নিখিলেশের আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

ভারতবর্ষের নীচের দিকে ক্ষুদ্রতার বন্ধন, তুচ্ছতার কোলাহল, হীনতার বিড়ম্বনা......উপরের দিকে সেখানে বিরাটের আসনবেদী, অপরিসীমের অবারিত আমন্ত্রণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাভাযাত্রীর পত্র—১২

ভারতবর্ষের সত্য আছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তপোবন (শান্তিনিকেতন)

জয় হইবে, ভারতবর্ষেরই জয় হইবে। যে ভারত প্রাচীন, যাহা প্রচ্ছন্ন, যাহা বৃহৎ যাহা উদার, যাহা নির্বাক্‌, তাহারই জয় হইবে ; আমরা-যাহারা ইংরেজি বলিতেছি, অবিশ্বাস করিতেছি, মিথ্যা কহিতেছি, আস্ফালন করিতেছি, আমরা বর্ষে বর্ষে—'মিলি মিলি যাওব সাগরলহরী সমানা।' তাহাতে নিস্তব্ধ সনাতন ভারতের ক্ষতি হইবে না। ভস্মাচ্ছন্ন মৌনী ভারত চতুষ্পথে মৃগচর্ম পাতিয়া বসিয়া আছে ; আমরা যখন আমাদের সমস্ত চটুলতা সমাধা করিয়া পুত্রকন্যাগণকে কোট-ফ্রক পরাইয়া দিয়া বিদায় হইব, তখনো সে শান্তচিত্তে আমাদের পৌত্রদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে। সে প্রতীক্ষা ব্যর্থ হইবে না, তাহারা এই সন্ন্যাসীর সম্মুখে করজোড়ে আসিয়া কহিবে : পিতামহ, আমাদিগকে মন্ত্র দাও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নববর্ষ (ভারতবর্ষ)

ভারতবর্ষ তাহার তপ্তাতাম্র আকাশের নিকট, তাহার শুষ্ক ধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষকৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে, এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নববর্ষ (ভারতবর্ষ)

ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দিই, তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনীমাত্র।

দুরদৃষ্টক্রমে এমন ইতিহাস আমাদের পড়িতে হয় যে,.....মনে হয়, ভারতবর্ষের মধ্যে আমরা যেন কেহই না, আগন্তুকবর্গই যেন সব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতবর্ষ : ভারতবর্ষের ইতিহাস

যদি দৈবক্রমে কোনোদিন ব্রিটানিয়া ভারতবর্ষকে হারায় তাহলে নিশ্বাস ফেলে বলবে, I miss my best servant।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শূদ্রধর্ম (কালান্তর)

বাড়ীর চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৯

পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি-আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো—সেই দিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো—সেইদিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠলো এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-রূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সামঞ্জস্য (শান্তিনিকেতন)

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়সম্বন্ধস্থাপনই চিরকাল ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বদেশী সমাজ (আত্মশক্তি)

ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম......
ভারতবর্ষ মানবতার এক নাম......
ভারতবর্ষ সাম্যের এক নাম।

শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম

মহাদেশ ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনসম্প্রদায় একটি ঐক্যসূত্রে বিধৃত ; সে ঐক্য সংস্কৃতিগত এবং সে সংস্কৃতি ধর্মভিত্তিক।

সতী ঘোষ ঃ ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী

ভারতীয় সভ্যতা ধর্মভিত্তিক।

সতী ঘোষ ঃ ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী

ভারতবর্ষের বাণী হচ্ছে অহিংসার আর ত্যাগের, মৈত্রীর আর করুণার, জিজ্ঞাসার আর পরিপৃচ্ছার, আর শ্রেয়ের অনুসন্ধানের।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস

পৃথিবীর সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে ভারতের অনেক কিছু দেবার আছে।.....পৃথিবীকে ভারতের শেষ উপহার হবে একটি নতুন আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামো এবং রাষ্ট্রীয় সংগঠন, যা থেকে সারা মানব-সমাজ নানা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। পৃথিবীরূপ অট্টালিকার মূল প্রস্তর উপাদান হল ভারতবর্ষ এবং স্বাধীন ভারত পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্যবাদের বিনাশ ঘোষণা করবে।

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ ভারতে সমাজতন্ত্র

আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক ভাষাকে বর্জন করে নয়, তার সম্যক উন্নতি সাধন করে, এবং আমার আরো বিশ্বাস প্রাদেশিক সংস্কৃতি নির্মাণ করলে বৃহত্তর ভারতীয় ঐক্য ক্ষুণ্ণ হবে না।

সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ রাষ্ট্রভাষা

ভারতবাসী

ভারতবাসীরা সাধারণতঃ বিলাসী নহেন, কিন্তু সাধারণতই দানশীল।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ সামাজিক প্রবন্ধ (কর্তব্য নির্ণয়)

ভারতমাতা

ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বাণী বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু ভারতমাতা যে

আমাদের পল্লীতেই পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহাই যথার্থ দেখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (আত্মশক্তি)

ভারতীয়

ভারতীয় হচ্ছে তারা, যারা হিন্দুত্বের চেয়ে, ভাষার চেয়ে, ব্রাহ্মণ জাতের চেয়ে, কোনও একটা রাজ্যের চেয়ে ভারতবর্ষের স্বার্থকে অনেক বড় করে দেখে।

স্বপন দাস ঃ শুধু ভাঙা নয়

ভাল, ভালো

ঘর বাঁধো খাটো, গরু কেনো ছোট।
বউ কর কালো, তাই গেরস্তের ভালো।

বাংলা প্রবাদ

যা ভাল তাকে ভালবাসতে পারলে আনন্দ।

বিমল কর ঃ সুধাময়

কোনো মান তুমি রাখ নি আমার,
  সেই ভালো ওগো সেই ভালো।
হৃদয়ের তলে যে আগুন জ্বলে
  সেই আলো মোর সেই আলো।
    পাথেয় যে-ক'টি ছিল কড়ি
    পথে খসি কবে গেছে পড়ি
শুধু নিজবল আছে সম্বল
    সেই ভালো মোর সেই ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৪১

আমরা যখন কাহারও ভালো করিতে চাহিব সে আমারই নিজের মতে, আমারই নিজের নিয়মে ; যাহার ভালো করিতে চাই তাহাকে তাহার নিজের নিয়মে ভালো হইতে দিতে আমরা সাহস করি না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খেলা ও কাজ (পথের সঞ্চয়)

    ভালো যে সে ভালো,
চোখ তার কটা হোক, হোক বা সে কালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গল্পসল্প—ভূমিকা

ভালো হবার একটা সীমা আছে সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের আঘাত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিমলার আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

ভালোমন্দ দুঃখসুখ অন্ধকার-আলো,
মনে হয়, সব নিয়ে এ ধরণী ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধরাতল (চৈতালি)

মানুষকে লজ্জা দেওয়ার চেয়ে মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া.....ঢের ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নটীর পূজা

    সিকি চাঁদনীর আলো
দেউলে নিশার অমাবস্যার
    চেয়ে যে অনেক ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পঞ্চমী (আকাশ-প্রদীপ)

সাত-ফুটা-ওয়ালা বাঁশি বাদ্যযন্ত্রের হিসাবে ভালো, ফুৎকার মাত্রে বাজিয়া ওঠে, কিন্তু ছিদ্রহীন পাকা বাঁশের লাঠি সংসারপথের পক্ষে ভালো, তাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিচয় (পঞ্চভূত)

প্রত্যেকের সাধ্যমত যে ভালো সেই তাহার সর্বোত্তম ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ য়ুনিভার্সিটি বিল (আত্মশক্তি)

সুখের ছায়ার চেয়ে সুখ ভালো, দুঃখ
সেও ভালো। তৃষ্ণা ভালো মরীচিকা চেয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ও রাণী—৩।২

ভালো যে করিতে পারে ফেরে দ্বারে এসে,
ভালো যে বাসিতে পরে সর্বত্র প্রবেশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

ভালো করিবারে যার বিষম ব্যস্ততা
ভালো হইবারে তার অবসর কোথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

এই দুনিয়ার সকল ভালো,
আসল ভালো নকল ভালো,
শস্তা ভালো দামীও ভালো,
হেথায় গানের ছন্দ ভালো,
হেথায় ফুলের গন্ধ ভালো,

কিন্তু সবার চাইতে ভালো—
পাউরুটি আর ঝোলা গুড়।

সুকুমার রায় ঃ ভাল রে ভাল (আবোল তাবোল)

ভালো কথা

ভালো কথা বলবার লোক অনেক মেলে কিন্তু ভালো কথা যে-মরদ খাড়া দাঁড়িয়ে শুনতে পারে তাকেই সাবাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ফাল্গুনী—২

ভালোছেলে

ভাল ছেলে হওয়া পিতার পুণ্যের চিহ্ন। যদি পুষ্করিণীতে ভাল জল হয়—সেটি পুষ্করিণীর মালিকের পুণ্যের চিহ্ন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

ভালো লাগা

ভালো জিনিস ভালো লাগার একটা সাধনা আছে। বিনা সাধনায় যাহা আমাদিগকে মুগ্ধ করে তাহা অনেক সময়েই মোহ এবং যাহা নিরস্ত করে তাহাই যথার্থ উপাদেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অন্তর বাহির (পথের সঞ্চয়)

(স্বর্গে) কেবল ভালোই লাগে, কিন্তু ভালো লাগবার কোন নিয়ম নেই। আমাদের ঠিক উলটো, ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু নিয়মটা থাকবেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি (ব্যঙ্গকৌতুক)

ভালো-লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে সে মরে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১

ভালবাসা/ভালোবাসা

ভুবন ভরে সে দেখেছে আলো-হাসি
জীবন ভরে যে বলেছে ভালোবাসি॥

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : আলো

সবারে বাস্ রে ভালো,
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে!
আছে তোর যাহা ভালো
        ফুলের মতো দে সবারে।.......
যারে তুই ভাবিস ফণী,
তারো মাথায় আছে মণি ;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি—
        ভবের বনে ভয় বা কারে?

অতুলপ্রসাদ সেন : গীতিগুঞ্জ

আমি আজো ভালবাসি, আজো ভালবাসি ভালবাসা।

অজিত দত্ত : পাখি আর তারা

দশজনকে ভালোবাসাতেই ভালবাসা
দশজনের মধ্যে বেঁচে থাকাই বেঁচে থাকা।

অজিত পান্ডে : ভদ্রজনের প্রতি

ভালবাসার তিনটি গতি আছে। নদীর মতন। একটা নিম্নগতি, একটা মধ্যগতি, একটা উচ্চগতি। নদীর মতন তিনটি গতি ঠিক কথা। কিন্তু তার প্রবাহ উল্টোদিকে। নদী যায় নিচে। ভালবাসা ওঠে ওপরে। সেইদিকেই তার বিস্তার ও গভীরতা।.....দেহের তিনটি ভাগ। নিচের ভাগে থাকে নিম্নগতির ভালবাসা। সেই ভালবাসা নদীর পার্বত্যগতির মত উগ্র। সেক্স থেকেই ভালবাসার উৎপত্তি। কিন্তু সেই উৎপত্তিস্থল থেকে ভালবাসাকে অনেক দূর এই বুক অবধি মধ্যগতির কল্যাণের দিকে পৌছতে হয়। সেখানে নদীর উভয় তীরে মানুষের সভ্যতা, বসবাস, সমাজ। তারই মাঝ দিয়ে বুকের মাটি ভিজিয়ে, পলি ফেলে ফেলে ফসল ফলিয়ে, সমাজ আর সভ্যতাকে উর্বর আর সবুজ আর সুখী করে দিয়ে ভালবাসা এগিয়ে যায়।......এরই নাম মধ্যগতির ভালবাসা। মাঝারি আর সাধারণ মানুষের কল্যাণকর ভালবাসা। সেক্স আছে, কিন্তু সেক্সের সঙ্গে আরো অনেক কিছু আছে।........তারপরেও আরো একটা গতি আছে। সেখান পৌছলে মহাসমুদ্রের ডাক শুনতে পাওয়া যায়। সেটা খুব বিপুল, ব্যাপ্ত, খুবই গভীর।

আবুল বাশার : ফুলবউ

বড় দুঃখ জানি এই ভালবাসা। নীরব প্রান্তরে
শুধু হাঁটা অন্ধ এক পথিকের মতো।

আশিস সান্যাল : একই দুঃখে

ভালবাসলে শুদ্ধ হবো।

আশিস সান্যাল : ভালবাসলে

ভালবাসা মানুষকে হৃদয়বান দায়িত্ববান করে হৃদয়হীন দায়িত্বজ্ঞানহীন করে না। যদি কিছু সেরকম করে তা মিথ্যা মোহ, ভালবাসা নয়।

কাজী নজরুল ইসলাম : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরে

একটু ভালবাসায় কত তিতিক্ষা
নদী হয়ে ধুয়ে দিতে পারে
হিংসার কালো দাগ।

জয়ন্ত সুকুল : স্বপ্নের ডালপালা

আহা—ভালবেসে—এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলেরে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কবি

এই খেদ মনে মনে
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে
হায়! জীবন এত ছোট কেনে!
এ ভুবনে
জীবনে যা মিটল নাকো মিটবে কি হায় তাই মরণে?

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : কবি

ভালবাসা পরশমণি, ওর ছোঁয়া লাগলে লোহা সোনা হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : নিশিপদ্ম

ভালবাসতে পারলে যে আমি-ই বদলে যাই। আমার দৃষ্টি, স্পর্শ, শ্রবণ স-ব মিষ্টি হয়ে যায়। সুন্দর হয়ে যায়। ভালবাসার উজ্জ্বল স্রোতে আমার সব কালো, সব দৈন্য ধুয়ে যায়।

নিরূপ মিত্র : সবুজ রোদে বেলা

ভালোবাসা থাকলে শীতকালে শীত করে না, গ্রীষ্মকালে ঘাম হয় না, পুকুরে চান করলে জ্বর হয় না।.....ভালোবাসা না থাকলে......জ্বর হয়, গেঁটে বাত হয়, বিলেত চলে যায়, মন্ত্রী হয়, কুকুরের ডাক শুনলে ভয় পায়।

নীললোহিত : পাঁচ রকম ভূমিকায়

মর্মমূলে বিঁধে আছে পঞ্চমুখী তীর,
তার নাম ভালবাসা।
কেটেছে গোক্ষুরে যেন, নীল হয়ে গিয়েছে শরীর,
তার নাম ভালবাসা।
ঠাকুমা বলতেন, ওই সূর্যটাকে ছিঁড়ে
এনে যে লণ্ঠন জ্বালে দুঃখীর কুটিরে
তার নাম ভালবাসা।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : বিরহ এবং

ভালবাসা ছাড়া কি দ্বিতীয় কোন উচ্চারণ
মানায় কবির কণ্ঠে?
অস্ত্র নিয়েছিলে হাতে, এই দৃশ্য দেখেছি সবাই।
কিন্তু কে না জানে,
লক্ষ্যের বিচারে সেও শুধু ভালবাসারই সংগ্রাম।
ভালবাসা কবিতারই অন্য নাম।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : নিজ হাতে নিজস্ব ভাষায় (খোলা মুঠি)

ভালোবাসা দুঃখ মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ রাজসিংহ

মেয়েদের ভালবাসা মানে ভাল বাসা।

বিধায়ক ভট্টাচার্য ঃ বিশ বছর আগে—৪

প্রাঙ্গণে উদাস ছায়া
শীতের কুয়াশা,
ভাঙচুরে নষ্ট মায়া
দীন ভালবাসা

বীরেন সাহা ঃ পুতুল সাজানো হলে

ভালোবাসা এসেছিল
এমন সে নিঃশব্দ চরণে
তারে স্বপ্ন হয়েছিল মনে,
দিই নি আসন বসিবার।
বিদায় সে নিল যবে, খুলিতেই দ্বার
শব্দ তার পেয়ে,
ফিরায়ে ডাকিতে গেনু ধেয়ে।
তখন সে স্বপ্ন কায়াহীন,
নিশীথে বিলীন—
দূরপথে তার দীপশিখা
একটি রক্তিম মরীচিকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আসা-যাওয়া (সানাই)

ভালবাসা ব্যথা দেয় যারে ভালবাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান

তবে পরানে ভালোবাসা কেন গো দিলে
রূপ না দিলে যদি বিধি হে!
পূজার তরে হিয়া উঠে যে ব্যাকুলিয়া,
পূজিব তারে গিয়া কী দিয়ে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গুপ্তপ্রেম (মানসী)

স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাটাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এতদূর পর্যন্ত তাকে বাড়িয়ে তুলেছে যে, আজ.......ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেছি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেছে।.......সাজে-সজ্জায়, লজ্জা-শরমে, গানে-গন্ধে, হাসি-কান্নায় যে-ইন্দ্রজাল সে তৈরী করেছে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিখিলেশের আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

সোহাগের সঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্বাদ থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চোখের বালি-১১

সাধারণকেই অসাধারণ করে আবিষ্কার করে ভালোবাসা। শাস্ত্রে বলে, আপনাকে জানো। আনন্দে আপনাকেই জানি, আর-একজন যখন প্রেমে জেনেছে আমার আপনকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চোরাই ধন (গল্পগুচ্ছ)

উদ্‌বেগ নাই, প্রত্যাশা নাই, ব্যথা নাইকো কিছু,
পোষ-মানা সব দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু।
অলস ভালোবাসা
হারিয়েছে তার ভাষাপারের ভাষা।
ঘরের কোণের ভরা পাত্র দুইবেলা তা পাই,
ঝর্‌নাতলার উছল পাত্র নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দূরবর্তিনী (সানাই)

যারে বলে ভালোবাসা, তারে বলে পূজা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পুণ্যের হিসাব (চৈতালি)

ভালবাসা কাঁদে, হাসে, মোছে অশ্রুজল—
চায়, পায় হারায় আবার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিরহীর পত্র (কড়ি ও কোমল)

ভালোবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল, অতি সূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষমানুষের কর্ম!.......পুরুষমানুষের তিলপরিমাণ অনুরাগ বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে।......কারণ, পুরুষের ভালোবাসাই তাহাদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমতো পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মণিহারা (গল্পগুচ্ছ)

রাগের তাপ যদি মাঝে মাঝে দেখা না দেয় তাহলে বুঝব ভালোবাসার নাড়ি ছেড়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মালঞ্চ-৪

জলের ভিতরকার হাল যেমন আকাশের উপরকার পালকে ভালোবাসে—পালে লাগে বাতাসের গান, আর হালে জাগে ঢেউয়ের নাচ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

আমি বাঙালীর মেয়ে নই, ভালোবাসা নিয়ে কেবল চোখের জল ফেলে কান্নাকাটি করি নে। ভালোবাসার জন্যে প্রাণ দিতে পারি, প্রাণ নিতে পারি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ল্যাবরেটরি (তিন সঙ্গী)

ভালোবাসার থার্মোমিটারে তিন মাত্রার উত্তাপ আছে। মানুষ যখন বলে 'ভালোবাসি নে' সেটা হল ৯৫ ডিগ্রি, যাকে বলে 'সাবনর্মাল'। যখন বলে ভালোবাসি সেটা হল নাইন্টিএইট পয়েন্ট ফোর, ডাক্তারেরা তাকে বলে নর্মাল, তাতে একেবারে কোনো বিপদ নেই। কিন্তু প্রেমজ্বর যখন ১০৫ ছাড়িয়ে গেছে তখন রুগি আদর করে বলতে শুরু করেছে 'পোড়ামুখি', তখন চন্দ্রবদনীটা একেবারে সাফ ছেড়ে গিয়েছে। যারা প্রবীণ ডাক্তার তারা বলে এইটেই হল মরণের লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ রক্ষা—১।২

যাকে ভালোবাসা বলে সেটা যে শুদ্ধ একটা স্নায়ুর ব্যামো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ রক্ষা—১।২

—তুমি বলতে চাও, তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, অভাব কেবল টাকার?
—ভালোবাসা আছে বলেই তো বুঝতে পারছি, যথেষ্ট টাকা নেই। পাত্র যে ফুটো, সেটা ধরা পড়ল যখন তাতে সুধা ঢালা গেল।........হাল্‌কা ছিলুম, দারিদ্র্যের উপর

দিয়ে সাঁতার কেটে গেছি, আর-একজনকে কাঁধে নেবামাত্র তার তলার দিকে তলাচ্ছি—যেখানটাতে পাঁক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ রক্ষা—৩।২

মেয়েমানুষের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেন নি। পুরুষ অনেক ঠেকে, অনেক ঘা খেয়ে, তার পরে ভালবাসতে শেখে ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ রক্ষা—৩।৩

ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।......ভালোবাসার ট্রাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি—নিজের ইচ্ছেকে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম,—যেখানে মনে করি, আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করবো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—৮

যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে, অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১৭

এখনও হিংসাব থেকে ভালবাসার শক্তি বহুগুণ বেশি।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় : আনন্দবাজার পত্রিকা (৭.১.২০০৩)

শ্রদ্ধা ছাড়া ভালবাসা দাঁড়াতে পারে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চরিত্রহীন—৪১

ভালবাসা এক, আর রূপের মোহ আর, এক এ দুয়ে বড় গোল বাধে, আর পুরুষেই বেশি গোল বাধায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দেবদাস

এই ভালবাসাটার মত এত বড় শক্তি, এত বড় শিক্ষক সংসারে বুঝি আর নাই। ইহা পারে না এত বড় কাজও বুঝি কিছু নাই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শ্রীকান্ত ২য়

নির্ভর হতে পারার চেয়ে ভালবাসার বড় পাওয়া মেয়েদের আর নেই।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শ্রীকান্ত ৪র্থ

আকাশের খুব কাছে গেলে বোঝা যায়
আকাশ কোথাও নেই—
শুধু মিথ্যে নীল আমন্ত্রণ।
ভালবাসা
আকাশের মতো নীল।

সুজিত সরকার : ভালবাসা

ভালোবাসায় আছে একটা অতি গোপন আলো
কেউ দেখে না সেটা, কিংবা কেউ বা দেখে কালো
ভালোবাসার অন্ধকারেও জ্বলে সবুজ শিখা
কেউ পেয়ে যায় পথের দিশা, কেউ বা মরীচিকা।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : ভালোবাসা

ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।

বিধুমুখে মধুর হাসি দেখিলে সুখেতে ভাসি
সেজন্য দেখিতে আসি দেখা দিতে আসিনে॥

শ্রীধর কথক : কবি গান

ভালবাসা ভেবে আসে না।

সমরেশ মজুমদার : সাতকাহন (২য় পর্ব)

ভালবাসা দেবতার মত পবিত্র। ভালবাসায় কোনও ভুল নেই। আমাদের ভুল হয় অন্য কোথাও। অন্য প্রবৃত্তিগুলো আমাদের ভুল পথে টেনে নিয়ে যায়। আর আমরা ভাবি ভালবেসে ভুল করেছি।

হর্ষ দত্ত : ও শিমুল ও পলাশ

দুজনের দ্বিধাকম্পিত কামনা যখন দুর্লভ নক্ষত্রবিন্দু স্পর্শ করে, তখনই চরাচর জুড়ে জেগে ওঠে একটি মাত্র শব্দ, একটি মাত্র আনন্দধ্বনি, একটি মাত্র রং, একটি মাত্র চিত্রভাষা, একটি মাত্র বেদনা-সুর-তান। সেই এক, সেই এককের নাম ভালবাসা। এই জেগে ওঠার পর্বটা কখনও কখনও পূর্বপ্রস্তুতির ভেতর দিয়ে ক্রমশ রূপ নেয়। যেমন অন্ধকারের উৎস থেকে আলোর উত্তরণ, রাত্রির অনিবার্য অবসানে সূর্যোদয়। আবার কখনও কখনও তার উদয় অকস্মাৎ, একেবারে হঠাৎ। বজ্রের মতো, ঝঞ্ঝার মতো। প্রস্তুতি কোথাও ছিল কিনা, সেটা তখন আর বড় কথা নয়। সেই মুহূর্তে জাগরণের জয়গানে কণ্ঠ মেলায় দুটি নিবিড় হৃদয়। তখন সব প্রশ্ন, সব দ্বিধা, সব প্রতিজ্ঞা অবসিত। ভালবাসার আলোকদেবতার পদতলে আনত হয় মানুষ।

হর্ষ দত্ত : ও শিমুল, ও পলাশ

ভাষা

ভাষা হচ্ছে সমাজে ভাববিনিময়ের ব্যবস্থা (System)। এই ব্যবস্থার কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব চেহারা নেই, কিন্তু ভাববিনিময়ের জন্য যখন সেই ব্যবস্থার ব্যবহার করা হয় তখন তার একটা ব্যবহারিক রূপ প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। অরূপ 'ভাষার' এই ব্যবহারিক প্রত্যক্ষ রূপই হচ্ছে 'উপভাষা'

নির্মল দাশ : কামরূপী বনাম (?) 'কামতাপুরি'
(কোরক সাহিত্য পত্রিকা/শারদীয় ১৪১০)

'কামতাপুরি' বাংলা ভাষার পুরাতাত্ত্বিক ভগ্নপ্রাসাদ নয়, আধুনিক বাংলা ভাষারই বিভিন্ন আলিন্দ-যা সমসাময়িক হয়েও আঞ্চলিক বিশিষ্টতার দাবি রাখে। উত্তরবঙ্গের ঢেঁকি শাক, লাফা শাক, বোরেলি মাছ বা কুর্শা মাছ যেমন জীববিজ্ঞানের কাছে (সাধারণ মানুষের কাছেতো বটেই) আঞ্চলিক জীববৈচিত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, উত্তরবঙ্গের 'কামতাপুরি' ওরফে কামরূপীও তেমনি ভাষাবিজ্ঞানীর কাছে বাংলা ভাষার উত্তরবঙ্গীয় বাক্‌বৈচিত্রের আদরণীয় নিদর্শন।

নির্মল দাশ : কামরূপী বনাম (?) 'কামতাপুরি'
(কোরক সাহিত্য পত্রিকা/শারদীয় ১৪১০)

ভাষা একটি বাহন বা 'মিডিয়ম' শুধু তাই নয়, মানুষের নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাহন। লেনিন বলেছেন—Language is the most important means of human intercourse (Lenin on Language). কিন্তু ভাষা সেই সঙ্গে একটি অস্ত্রও বটে—সংগ্রামের অস্ত্র, সমাজকে উন্নতির পথে এগিয়ে দেওয়ার অস্ত্র। স্তালিন এই কথাটি বিশেষ স্পষ্ট করে বলেছেন। অর্থাৎ ভাষা শুধু বার্তা বিনিময়ের বাহন নয়, ভাষা উদবোধন এবং উদ্দীপনেরও সহায়ক।

পবিত্র সরকার : ভাষাবিজ্ঞান ও মার্কসবাদ

বিঘ্নভাঙা যৌবনের ভাষা,
অসীম তার আশা,
বিপুল তার বল—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অপরাজিতা (মহুয়া)

অকৃত্রিম ভাষা জলকল্লোলের, অকৃত্রিম ভাষা পল্লবমর্মরের, কিন্তু মন যেখানে আছে সেখানে বহুযত্নরচিত কৃত্রিম ভাষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গদ্য ও পদ্য (পঞ্চভূত)

কাব্য ভাষার একটা ওজন আছে, সংযম আছে, তাকেই বলে ছন্দ। গদ্যের বাছবিচার নেই, সে চলে বুক ফুলিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গদ্যকাব্য (ছন্দ)

ভাষা নিয়ে মানুষের প্রতীকের কারবার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়—

জ্ঞানের ভাষায় চাই স্পষ্ট অর্থ ; ভাবের ভাষায় চাই ইশারা, হয় তো অর্থ বাঁকা ক'রে দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়—৪

একদিকে ভাষা স্পষ্ট কথার বাহন, আব-এক দিকে অস্পষ্ট কথারও। একদিকে বিজ্ঞান চলেছে ভাষার সিঁড়ি বেয়ে ভাষাসীমার প্রত্যন্তে, ঠেকেছে গিয়ে ভাষাতীত সংকেত চিহ্নে ; আর-এক দিকে কাব্যও ভাষার ধাপে ধাপে ভাবনার দূর প্রান্তে পৌঁছিয়ে অবশেষে আপন বাঁধা অর্থের অন্যথা করেই ভাবের ইশারা তৈরী করতে বসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়—৪

হৃদয়াবেগে যার সীমা পাওয়া যায় না তাকে প্রকাশ করতে গেলে সীমাবদ্ধ ভাষার বেড়া ভেঙে দিতে হয়। কবিত্বে আছে সেই বেড়া ভাঙার কাজ। এই জন্যেই মা তার সন্তানকে যা নয় তাই বলে এককে আর করে জানায়। বলে চাঁদ, বলে মানিক, বলে সোনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়-৪

ভাষার কাজে মানুষের দুটো বিভাগ আছে—একটা তার গরজের ; আর-একটা তার খুশির, তার খেয়ালের।.......এই খুশির এলাকায় মানুষের যত সম্পদ সযত্নে সঞ্চিত এমন আর কোনো অংশে নয়। এইখানে মানুষ সৃষ্টিকর্তার গৌরব অনুভব করেছে, সে পেয়েছে দেবতার আসন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়—৫

মানুষ জানে, জানায় ; মানুষ বোধ করো বোধ জাগায়। মানুষের মন কল্পজগতে সঞ্চরণ করে, সৃষ্টি করে কল্পরূপ ; এই কাজে ভাষা তার যত সহায়তা করে ততই উত্তরোত্তর তেজস্বী হয়ে উঠতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়—৫

আমরা যাকে দেশ বলি, বাইরে থেকে দেখতে সে ভূগোলের এক অংশ। কিন্তু ত নয়। পৃথিবীর উপরিভাগে যেমন আছে তার বায়ুমণ্ডল ;.........তেমনি একটা মনোমণ্ডল স্তরে স্তরে এই ভূভাগকে অদৃশ্য আবেষ্টনে ঘিরে ফেলেছে—সমস্ত দেশকে সেই দেয় অন্তরের ঐক্য।.......এই সীমার মধ্যে অনেক যুগের মা তাব ছেলেমেয়েদের ঘু পাড়িয়েছে একই ভাষায় গান গেয়ে, সন্ধ্যেবেলায় তাদের কোলে টেনে এনে বলেছে

রূপকথা একই ভাষায়। পূজা করেছে এরা এক ভাষার মন্ত্রে, স্ত্রীপুরুষ একই ভাষায় পরস্পর ভালোবাসার আলাপ করেছে ; তার ভাষা অভিষিক্ত হয়ে গেছে প্রাণের রসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়—৭

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়—৮

ডুগুম্মানিত ভাষা, তার পরিচয়টা চাই।.....“স্ম্মম্মরাট সমুদ্রগুপ্তের ক্রেঙ্কটাকৃষ্ট ত্বরিৎত্রম্যন্ত পর্যুগাসন উখ্রংসিত নিরংকরালের সহিত.......।”.......বুগবুলি ভাষার ইংরেজি তর্জমা......‘দি হাব্বারফ্লুয়াস্ ইন্‌ফ্যাচুফুয়েশন অব আকবর ডর্বেগুিক্যালি ল্যাসেরটাইজট্ দি গর্ব্যাগুিজম্ অফ হুমায়ুন।’—শুনে ছোটোলাট একেবারে টরেটম্ বনে গিয়েছিলে ; মুখ হয়েছিল চাপা হাসিতে ফুসকায়িত। হেড পেডেগুোর টিকির চারধারে ভেরেগুম্ লেগে গেল,......।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাচস্পতি (গল্পসল্প)

মানুষের ভাষাটুকু অর্থ দিয়ে বদ্ধ চারিধারে,
ঘুরে মানুষের চতুর্দিকে। অবিরত রাত্রিদিন
মানবের প্রয়োজনে প্রাণ তার হয়ে আসে ক্ষীণ।
পরিস্ফুট তত্ত্ব তার সীমা দেয় ভাবের চরণে ;
ধূলি ছাড়ি একেবারে ঊর্ধ্বমুখে অনন্ত গগনে
উড়িতে সে নাহি পারে সংগীতের মতন স্বাধীন
মেলি দিয়া সপ্তসুর সপ্তপক্ষ অর্থভারহীন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভাষা ও ছন্দ

ভাষার ইঙ্গিত অনেকখানি কথা কয়। সেটা যখন বাদ পড়ে তখন কথার অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা মারা পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত

মানুষের ভাষা যে আলোর মতো। এই ভাষা যত দূর ছড়ায় তত দূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লন্ডনে (পথের সঞ্চয়)

মিলননিশীথে ধরণী ভাবিছে
চাঁদের কেমন ভাষা,
কোনো কথা নেই, শুধু মুখ চেয়ে হাসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

আমাদের দেশে দুটো ভাষা—একটা সাধু, আর একটা চলিত। কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল—সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা।.....পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৬

মাটি আজ সবুজ ভাষায় ছড়া কাটে ঘাসে ঘাসে
আকাশের বাদল-ভাষার জবাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্যামলী—শ্যামলী

ভাষা হচ্ছে মানুষের চিন্তার ধ্বনিমাধ্যম প্রকাশ।

রামেশ্বর শ' : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

ভাষা কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়, আমাদের জীবন, মনন, সমাজ, সংস্কৃতির প্রতিটি দিকে তার শিকড় প্রসারিত, সবদিক থেকে রস সংগ্রহ করে ভাষা জীবন্ত বৃক্ষের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের প্রয়োজনে তার সৃষ্টি, আবার মানুষকেই তা জীবনীশক্তি দান করে ; ভাষার শাখায় বিকশিত পত্রপুষ্প হল তার শৈল্পিক সৌন্দর্য, তা মানুষকে নান্দনিক তৃপ্তি (aesthetic satisfaction) দান করে।

রামেশ্বর শ' : সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

ভাষা অর্থ দিয়ে গড়া। মানুষের ব্যবহারে অর্থের নানা রকমফের হয়ে যায়। কাজের কথা ব্যবহৃত হয় সাদা অর্থে তাকে বলি অভিধা, আলঙ্কারিক প্রয়োগে অর্থ বেঁকে গেলে তাকে বলি লক্ষণা, অর্থ যখন অভিধানকে এড়িয়ে সঙ্কেতের পথ ধরে তখন তাকে বলি ব্যঞ্জনা। কল্পনা উদ্দীপিত হলে এই অর্থ কবিতা হয়ে ওঠে।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় : বাংলা গান ও গীতবিতানের কবি

মানুষের উচ্চারিত, অর্থবহ, বহুজনবোধ্য ধ্বনি সমষ্টিই ভাষা।.......ধ্বন্যারূঢ় প্রতীকদ্যোতনাই ভাষার স্বরূপ লক্ষণ।

সুকুমার সেন : ভাষার ইতিবৃত্ত

মনের ভাব-প্রকাশের জন্য, বাগ্‌-যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনও বিশেষ জন-সমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্র-ভাবে অবস্থিত, তথা বাক্যে প্রযুক্ত, শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ

ভাষা বহতা নদীর মতন। যদি তার স্বাস্থ্য ভালো থাকে, তাহলে যেখান থেকে যাই সংগ্রহ করুক, কিছুতেই তার অঙ্গে মলিনতার স্পর্শ লাগে না।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় : ভূমিকা (মুজতবা রচনাবলী—৩)

ভাষার বিকার

সংস্কৃত ভাষায় অনুভব বলতে যা বুঝি তার খাঁটি বাংলা প্রতিশব্দ একদিন ছিল। এতবড়ো একটা চলতি ব্যবহারের কথা হারালো কোন ভাগ্যদোষে বলতে পারি নে। এমন দিন ছিল যখন লাজবাসা, ভয়বাসা বলতে বোঝাত লজ্জা অনুভব করা, ভয় অনুভব করা। এখন বলি, লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়া। কিল খাওয়া, গাল খাওয়া, যেমন ভাষার বিকার—লজ্জা পাওয়া, ভয় পাওয়াও তেমনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাত্রী—১৩।২।২৫

ভিক্ষা

নিত্য ভিক্ষা তনু রক্ষা ক্লেশে দিন যায়।

আলাওল : পদ্মাবতী

ভিক্ষা প্রদান করিলে হৃদয় অতি পবিত্র হয় ; এবং সেই হৃদয়ে সদিচ্ছা স্বতই ক্রমশ বিকশিত হইতে থাকে ; মন প্রফুল্ল হইতে থাকে, মুখশ্রী বর্ধিত হইতে থাকে, এবং তাঁহাকে দেখিলে সকলে শান্তিলাভ করেন। সাধুগণ ভিক্ষালব্ধ অন্নকে এত পবিত্র মনে করেন কেন? তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, সদিচ্ছাবান পুরুষ ব্যতীত ভিক্ষা প্রদান করিতে কেহ সক্ষম হন না।.......

ভিক্ষা নিজে পবিত্র, এবং যিনি ভিক্ষা দেন, তিনিই যে কেবল পবিত্র তাহাই নহে ; যাঁহাকে ভিক্ষা দেওয়া হয়, তাঁহাকে তো নারায়ণস্বরূপে জ্ঞান করিতেই হয়, তাহা

ছাড়া যেখানে ভিক্ষা দেওয়া হয় সেস্থান পর্যন্তও পবিত্র হয়। সেইজন্যই, অন্নসত্র, সদাব্রত, প্রভৃতি স্থান এত দেবালয়তুল্য পবিত্র।

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ : আড্ডা (উদ্বোধন ২/১১)

নিত্য ভিক্ষে তনু রক্ষে তারেই বলে দুঃখী।

দাশরথি রায় : পাঁচালী

ভিক্ষা চাইবে?
দেবার মানুষ নেই।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : প্রবাহিত জীবন

আমি যখন তাঁর দুয়ারে ভিক্ষা নিতে যাই তখন যাহা পাই
সে যে আমি হারাই বারে বারে।।
তিনি যখন ভিক্ষা নিতে আসেন আমার দ্বারে
বন্ধ তালা ভেঙে দেখি আপন-মাঝে গোপন রতনভার,
হারায় না সে আর।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতিবীথিকা)

ভাগ্যের পায়ে দুর্বলপ্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নির্ভয় (মহুয়া)

কাঙাল যে জন পায় না সে ধন,
পায় সে কেবল ভিক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভিক্ষু (পরিশেষ)

কৃপাভিক্ষা
সহ্য হয়, ভালোবাসা ভিক্ষা করে
যে অভাগ্য, ভিক্ষুকের অধম ভিক্ষুক
সে যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিসর্জন—৪।২

জগতে ভিক্ষুকের স্থান নাই।

জগদীশচন্দ্র বসু : প্রবন্ধ

ভিক্ষুকের আশা অপরিমিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : কপালকুণ্ডলা ২।৪

নির্জন রাস্তায় এক হেঁটে যায় শীতের ভিক্ষুক
সম্পূর্ণ উলঙ্গ। তার অর্ধেক শরীর শুধু হাড় ; বাকী আধখানা
ঈশ্বরের নৈবেদ্য।
মানুষ খায় না মানুষ.......
তাই সে এখনো হাঁটে কুয়াশার মতো গীর্জা পিছে ফেলে
কখন ঈশ্বর তাঁর কঙ্কালেও বসাবেন হীরায়-বাঁধানো শুভ্র দাঁত?

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শীতের ভিক্ষুক

ভিক্ষুক........প্রাসাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজভাণ্ডারের রুদ্ধ সিন্দুকগুলোর মধ্যে অসম্ভব রত্নমানিক কল্পনা করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘর ও বাহির (জীবনস্মৃতি)

ভিড়

ভিড়ে আইডেন্টিটি হারিয়ে যায়। **শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়** : চক্র

ভীরু

আমি জানি, ভীরু! কিসের এ বিস্ময়।
জানিতে না কভু নিজেরে হেরিয়া নিজেরি করে যে ভয়!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভীরু (জিঞ্জির)

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলেখা—৩

ভুবন

ছড়িয়ে রেখেছ তোমার ভুবন জলে স্থলে আকাশে
ছড়িয়ে রেখেছ এক বিপুল পদ্মপাতা
আর তার ওপর এক ফোঁটা জলের মতো আমাকেও।

বাসুদেব দেব ঃ আমাদের ঘুড়ি (হেমন্ত সন্ধ্যার গান)

ভুবনজোড়া আসনখানি
আমার হৃদয়-মাঝে বিছাও আনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতপঞ্চাশিকা

ভুরু/ভ্রূ

আকাশপানে হানি যুগল ভুরু শুনলে বারেক মেঘের গুরুগুরু।
কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

উড়ো পাখির ডানার মতো যুগল কালো ভুরু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নূতন শ্রোতা-২ (পরিশেষ)

সেদিন মেঘের ভারে
নদীর পশ্চিম প্বারে
ঘন হল দিগন্তের ভুরু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বীণাহারা (পূরবী)

ভ্রূবিলাস শেখে নাই কারা সেই নারী
জনপদবধূজন, গগনে নেহারি
ঘনঘটা, উর্ধ্বনেত্রে চাহে মেঘপানে,
ঘননীল ছায়া পড়ে সুনীল নয়নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মেঘদূত (মানসী)

ভুল

ভুল করে যদি ভালবেসে থাকি ক্ষমিও সে অপরাধ।
অসহায় মনে কেন জেগেছিল ভালবাসিবার সাধ।
কতজন আসে তব ফুলবন
মলয়, ভ্রমর, চাঁদের কিরণ।
আমি এসেছিনু শুধু অকারণ অপরূপ উন্মাদ॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাব্য গীতি

ভুল করুক, ক্ষতি নাই; সকল কার্যেই ভ্রমপ্রমাদ আমাদের একমাত্র শিক্ষক। যে ভ্রমে পতিত হয়, ঋতপথ তাহারই প্রাপ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বর্তমান ভারত

বাহিরে ভুল হানবে যখন অন্তরে ভুল ভাঙবে কি?
বিষাদ বিষে জ্বলে শেষে তোমার প্রসাদ মাগুবে কি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন

মাঝে মাঝে বিধাতার ঘটে এ কী ভুল,
ধান পাকাবার মাসে ফোটে বেলফুল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : খাপছাড়া—সংযোজন ১৮

—আমাদের সঙ্গ পেয়েছ, ছেড়ো না।
—আমরা একবার মলে বিধাতা দ্বিতীয়বার আর এমন ভুল করবেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী ২য় দৃশ্য

দেখো,.......ভুল করে ভালোবেসো না!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা ৬

ভুল বুঝতে পারা, আর ভুল ছাড়তে পারা কি একই?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ ৫১

ভূত

কিন্তু বাংলার লোকসমাজে ভূতপেত্নী-ভীতি এখনো অব্যাহত। ভূত-ভীতি অবশ্য পৃথিবীর সবদেশের লোকসমাজেই দেখা যায়। মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কৌতূহল ও মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে ভীতিবোধ থেকেই সম্ভবতঃ ভূতভীতির উদ্ভব।
আর এর মূলে আছে দেহবিমুক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। মানুষের মৃত্যু ঘটলে আত্মা বিদেহীরূপে অবস্থান করে। জীবিত মানুষের আশেপাশে ঐ সমস্ত বিদেহী আত্মা বিচরণ ক'রে থাকে। এই আত্মাই 'ভূত'। 'ভূত' শব্দের একটি অর্থ 'অতীত', অর্থাৎ পূর্বে যা ছিল। পূর্বে যে মানুষ ছিল, তার মৃত্যু ঘটায় এখন তার আত্মা 'ভূত'-রূপ প্রাপ্ত। আদিম সমাজে মানুষের ধারণা ছিল, বিদেহী হ'লেও এই আত্মা (বা 'ভূত') মানুষের মতোই অভাবপীড়িত, স্বার্থপ্রবণ ও রিপুতাড়িত। সমাজতাত্ত্বিকের মতে—"তাহারা কখনো কখনো মানুষের দেহে অনুপ্রবেশ করিয়া সেই দেহকে পীড়িত, ক্ষুব্ধ বা বিকল করে, তাহার নিজস্ব আত্মার সহিত অনুপ্রবিষ্ট আত্মার বিরোধ লাগিলে উক্ত মানুষের মানসিক বিকৃতি হয়, অনেক সময় মনে হয় তাহার মধ্যে দুইটি মানুষ একত্রে সহাবস্থান করিতেছে—যাহাকে আধুনিক মনোবিজ্ঞানী চিত্তভ্রংশী বাতুলতা (schizophrenia বা dementia praecox) আখ্যা দিয়াছেন।

মানস মজুমদার : লোকঐতিহ্যের দর্পণে

আমরা মধ্যাহ্নকালের আলোতেও বুদ্ধির চোখ বুজিয়ে দিয়ে অবুদ্ধির ভূতকে ডেকে এনেছি।.......তাই ঠিক দুপপ'র বেলায় যখন জাগ্রত বিশ্বসংসার চিন্তা করছে, কাজ করছে, তখন পিছন দিক থেকে কেবল আমাদেরই পিঠের উপর—

ঠিক দুপপ'র বেলা
ভূতে মারে ঢেলা।

আমাদের লড়াই ভূতের সঙ্গে, আমাদের লড়াই অবুদ্ধির সঙ্গে, আমাদের লড়াই অসম্ভবের সঙ্গে।........জগতে ঢেলা অসংখ্য,........একটা ফুরোলে হাজারটা আসে—কিন্তু ভূত একটা। সেই ভূতটাকে ঝেড়ে ফেলতে পারলে ঢেলাগুলো পায়ে পড়ে থাকে, গায়ে পড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সমস্যা (কালান্তর)

ভূতের ভয়টা একলা-মানুষের নিজের দুর্বলতাকেই ভয়। আমাদের বারো আনা ভয়ই এই ভূতের ভয়। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** : সমবায় ১

ভূত যদি পৃথিবীতে কারুর পরোয়া করে তবে পুলিসের।

শিবরাম চক্রবর্তী : আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয়

ভূত বলে কিছু নেই। ভূত আছে মানুষের মনে। আর কোনও কোনও মানুষ আছে ভূতের মতো, তাদের বলে অদ্ভুত।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : আবিষ্কার

ভৈরব

সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ—
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহো॥
দূর করো মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র—
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তপতী

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৈশাখ

ভৈরবের নৃত্য যখন সবে আরম্ভ হয়, তখন চোখে পড়ে না। যখন শেষ হবার পালা আসে তখন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তধারা

ভোট

শুনহ ভোটার ভাই,
সবার উপরে আমিই সত্য
আমার উপরে নাই।
আমাকেই যদি ভোট দাও আর
আমি যদি হই রাজা
তোমার ভাগ্যে নিত্য ভোগ্য
মৎস্য মাংস খাজা।

অন্নদাশঙ্কর রায় : শুনহ ভোটার ভাই

তোদের দরদ বুইঝ্যা গেছি
চোর খুনীদের ছা—
ভোট দিব না
ভোট দিব না যা।

জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় : চার প্রহরের কবিতা

আইসছে যাছে মানুষ গিলা
ভটের বাজার লোটের খেলা।

ভবতোষ শতপথী : ঝুমুর গান

ভোটের বেলা কাকা জেঠা, ভোট ফ্‌রালে দূর হ বেটা,
তবু এই সব বুঝতে লেঠা দেশের মানুষ কি হইল।

রমেশ শীল : গরিবের দুঃখের কথা কার কাছে জানাব বল

ভোট দিয়ে যা—
আয় ভোটার আয়।
মাছ কাটলে মুড়ো দিব।
গাই বিয়োলে দুধ দিব,

দুধ খেতে বাটি দিব,
সুদ দিলে টাকা দিব,
ফি দিলে উকিল হব,
চাল দিলে ভাত দিব,
মিটিং-এ যাব না, অবসর পাব না,
কোনো কাজে লাগবো না,
যাদুর কপালে আমার ভোট দিয়ে যা।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত : জঙ্গিপুর সংবাদ

আমি ভোটের লাগিয়া ভিখারী সাজিনু
ফিরিনু গো দ্বারে দ্বারে।
(আমি ভিখারী, না শিকারী গো)
মোরে হাঁ ছাড়া কেউ না বলিল না
ক্যানভাস করিনু যারে।।
তাদের মুখের ভাষায় ফুলিনু আশায়
জানিনা বুকের ভাষা।.....
আমি এইরূপে গত বারে ফিরেছিনু দ্বারে দ্বারে,
পেয়েছিনু এইরূপই হোপ গো।
মোরে ভুলাইয়া প্রলোভনে ভোট দিল অন্যজনে
মোর ডিপোজিট মানি হলো লোপ গো!

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত : ভোটামৃত

প্রেতযোনি হবো মরে শুনহ ভোটার!
যে ভোট দিবে না তার মটকাবো ঘাড়।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত : ভোটামৃত

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে রিগিংটা রুখি,
ভোট বলে আমি তবে কোন পথে ঢুকি?

সুকুমার রায়চৌধুরী : কণিকার প্যারডি

এনেছিলে সাথে করে একটি মোটে প্রাণ।
ভোটকালে তারে ধরি সবে দেয় টান।।

সুকুমার রায় চৌধুরী : রবীন্দ্রকবিতার প্যারডি

ভোটারের দ্বারে আসি নেতা কয় ধীরে।
আমরা কুটুম্ব দোঁহে ভুলে গেলি কি রে?
ভোটার কহিল তাহা তুমিও ভুলিতে,
মোদের দুর্দশা গেলে তোমার ঝুলিতে।

সুকুমার রায়চৌধুরী : কণিকার প্যারডি

ভ্রমণ

অগ্নি আর পাটকাঠি সাদা খই একটু চন্দন
তারো জন্য আগাম প্রস্তুত থাকা ভালো......
এ ভ্রমণে সঙ্গী নেই
স্থির থেকে স্থিরতর একা এই প্রিয় পর্যটন......।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত : ভ্রমণ

বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
মন মোর জুড়ে থাকে অতিক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঐকতান (জন্মদিনে)

ভ্রমণ করা এক, তাহা প্রকাশ করা আর। যাহার পা-দুটা আছে, সেই ভ্রমণ করিতে পারে ; কিন্তু হাত দুটা থাকিলেই ত আর লেখা যায় না। সে যে ভারি শক্ত।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ শ্রীকান্ত

ভ্রমর

ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তাসের দেশ

মগজ

মগজ বিক্রী করে পেট চালাই
ইনটেলেকটের ধাপ্পা দিয়ে গুছাই আখের
য়ুরোপের এঁটোকাটা, আস্তাকুঁড় ঘেঁটে
মগজের খাদ্য জোটে ঢের।

কৃষ্ণ ধর ঃ কালের নিসর্গ দৃশ্য

মঙ্গল

তুমি নির্মল কর, মঙ্গল-করে মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।

রজনীকান্ত সেন ঃ গান

আমাদের শিব শ্মশানবাসী—আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গলের আদর্শ মৃত্যু-নিকেতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অপূর্ব রামায়ণ (পঞ্চভূত)

অপরাধের অভিঘাত ব্যতীত মঙ্গল তাহার শাশ্বত দীপ্তি ও শক্তি লাভ করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শকুন্তলা (প্রাচীন সাহিত্য)

সৌন্দর্য মূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৌন্দর্যবোধ

একদিকে স্বার্থ, আর-এক দিকে প্রেম ; একদিকে প্রবৃত্তি, আর-এক দিকে নিবৃত্তি। সেই দোলায়মান অবস্থায় এই দ্বন্দ্বের মাঝখানেই যাহা সৌন্দর্যকে ফুটাইয়া তোলে, যাহা ঐক্যের আদর্শ রক্ষা করে, তাহাকেই বলি মঙ্গল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম (ধর্ম)

মঙ্গলগ্রহ

—এই তো সেদিন কে যেন বুলছিল কথাঠো, শুনছিলাম কানে, মঙ্গলগ্রহটায় নাকি জমি ইজারা মিলবে,—ভাবিবার পার?
—কথা একটা শুনছিলাম বটে। ত্মা নিব ইজারা। কথা বুল কেনে?
—যাউক মর্ত্যধাম ছাড়ি একন স্বর্গটা ইজারা নিবে তুমি?

বিজন ভট্টাচার্য ঃ দেবী গর্জন

মদ

মদে দুটো ভাল কাজ করে। এক হচ্ছে ভুলিয়ে রাখে, দুই—আয়ু কমিয়ে দেয়।

বিধায়ক ভট্টাচার্য ঃ রক্তের ডাক

মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ করতে হবে!—পীড়া হয় প্রতিকার কর্, মেডিকল সায়ান্স হয়েচে কি জন্যে? পীড়া আরাম করে আবার খা, বিচ্ছেদ মিলনের সুখ পাবি।

দীনবন্ধু মিত্র : সধবার একাদশী

এক ব্যাটা বড় মানসের ছেলে মদ ধল্লে দ্বাদশটি মাতাল প্রতিপালন হয়।

দীনবন্ধু মিত্র : সধবার একাদশী

মধুমাস

মধুমাসে মলয় মারুত মন্দ মন্দ।
মালতীর মধুকর পিয়ে মকরন্দ॥

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল

আমারে চেনে না তব শ্মশানের বৈরাগ্যবিলাসী,
দারিদ্র্যের উগ্র দর্পে খলখল ওঠে অট্টহাসি
দেখে মোর সাজ।
হেনকালে মধুমাসে
মিলনের লগ্ন আসে,
উমার কপোলে লাগে স্মিতহাস্য-বিকশিত লাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তপোভঙ্গ (পূরবী)

কাল মধুমাস!

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কাল মধুমাস

মধুর

মধুর, তোমার শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ—
ভুবন জুড়ে রইল লেগে আনন্দ-আবেশ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

মধুর মধুর ধ্বনি বাজে
হৃদয়কমলবনমাঝে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিমাল্য

মধুর বসন্ত এসেছে মধুর মিলন ঘটাতে
মধুর মলয়সমীরে মধুর মিলন রটাতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা

মধ্যবিত্ত

মধ্যবিত্তের গর্ব ও গৌরব বিত্তে নয়, তাহার চিত্তপ্রকর্ষে ও চারিত্র্য-শক্তিতে।

জগদীশচন্দ্র ঘোষ : বাংলার মধ্যবিত্ত

—বিশ্বায়ন স্পৃহা মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তকে প্রলুব্ধ করেছে। অবশ্য এই বিশ্বায়নে কোন বিশ্বচেতনার প্রকাশ নেই। আছে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার-আকাঙ্ক্ষা।......বহুজাতিক সংস্থা আর বিশ্বায়নের স্লোগান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে একপ্রকার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত করেছে। হঠাৎ স্ফীতকায় মধ্যবিত্ত তার শক্তি ও সামর্থ্যের সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেছে বিদেশী গাড়ি, টিভি, সাউন্ড সিস্টেম, ওয়াশিং মেশিনের এক কাল্পনিক জগতে।

হোসেনুর রহমান : ৫০ : মধ্যবিত্ত কোন পথে (উদ্বোধন ৯৯।৯)

মধ্যবিত্ত মানুষ মন বিভ্রান্তির যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত। হালকা, সস্তা, নকল সোনার আলোকে সূর্যের আলোর চেয়ে দামী মনে করছে। মনে করছে বিভূতিভূষণ (দু-জনই), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সব বোকা মানুষ ছিলেন। শরৎচন্দ্র তো ছিলেনই। কারণ, এঁরা জীবনকে সোনার চেয়ে দামী জানতেন।

হোসেনুর রহমান : ৫০ মধ্যবিত্ত কোন পথে

শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক, মধ্যবিত্ত সমাজের সবচেয়ে বড় মূলধন। একদিন বাঙালী এই মূলধনের জোরেই ভারতবর্ষে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার অর্জন করেছিল।.....আর আজ? কেবলমাত্র অর্থের মহিমাই মধ্যবিত্ত জীবনের পরম ঐশ্বর্য হয়ে উঠেছে। শিক্ষক, ডাক্তার, লেখক—সবাই কত ধনী, কত বাড়ি-গাড়ি, রাষ্ট্রীয় খেতাবের স্মারকচিহ্ন হয়ে উঠেছে। অন্তঃসারশূন্য মানুষ বড় গাড়ি চেপে, ইংরেজী বলে, ক্লাবচর্চা করে আর যাই করুন আপন স্বকীয়তায় অগ্নিবাণী হয়ে উঠতে পারেন না।

হোসেনুর রহমান ঃ ৫০ ঃ মধ্যবিত্ত কোন পথে (উদ্বোধন ৯৯। ৯)

মধ্যবিত্ত আহ্লাদিপনা।

সুচিত্রা ভট্টাচার্য ঃ আলোয় ছায়ায়

মন

মনের মধ্যে কী যে আছে
মনও নাহি জানে

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ দৃষ্টি ৪

মানুষের মন হচ্ছে সব থেকে বেশি প্রতারক। সে ঢেউয়ের মত চঞ্চল গতিশীল।

কণা বসু মিশ্র ঃ সুখ লকেট (বন্ধ দরজা)

মনে পড়ে আজ সে কোন জনমে বিদায় সন্ধ্যাবেলা
আমি দাঁড়ায়ে রহিনু এপারে তুমি ওপারে ভাসালে ভেলা॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান

সফলতা অসফলতার মধ্যেই ঝরে পড়ছে
শিশির বিন্দুর মত মনখারাপ।

ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় ঃ মল্লভূমি ছুঁয়ে (১০)

কাউকে ভাল লাগাটা সব সময তো ঠিক অঙ্ক কষে, হিসেব করে হয় না। মন একটা আশ্চর্য মিষ্টিরিয়াস ব্যাপার।

প্রফুল্ল রায় ঃ রণসজ্জা

মনের মানুষ মেলে না সংসারে, মানুষের মন তাই সঙ্গীহীন। আসলে আমরা সবাই একা। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয় বাইরের প্রয়োজনে—বন্ধুত্বের প্রয়োজন, সৃষ্টির প্রয়োজন, স্বার্থের প্রয়োজন।

প্রবোধকুমার সান্যাল ঃ মহাপ্রস্থানের পথে

মন নিয়ে কেউ বাঁচে নাকো,
  মন বলে যা পায় রে
কোনো জন্মে মন সেটা নয়
  জানে না কেউ হায় রে।.....
চলেন তিনি গোপন চালে
  স্বাধীন তাঁহার ইচ্ছে—
কেই বা তাঁরে দিচ্ছে এবং
  কেই বা তাঁরে নিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অচেনা (ক্ষণিকা)

মন-দেয়া-নেয়া অনেক করেছি
    মরেছি হাজার মরণে—
নূপুরের মত বেজেছি চরণে চরণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উদাসীন (ক্ষণিকা)

এই যে অবুঝ এই যে বোবা মন
প্রাণের 'পরে ঢেউ জাগিয়ে কৌতুকে যে অধীর অনুক্ষণ,
সর্ব দিকেই সর্বদা উন্মুখ,
আপনারি চাঞ্চল্য নিয়ে আপনি সমুৎসুক,—
নয় বিধাতার নবীন রচনা এ,
ইহার যাত্রা আদিম যুগের নায়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অবুঝ মন (পরিশেষ)

লোকের মনে সিংহাসনে
নাইকো দাবি—
তোমার মনো-গৃহের কোনো
দাও তো চাবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ক্ষতিপূরণ (ক্ষণিকা)

আমার মন কেমন করে—
কে জানে, কে জানে, কে জানে কাহার তরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

আমার মন মানে না—দিনরজনী।
আমি কী কথা স্মরিয়া এ তনু ভরিয়া পুলক রাখিতে নারি।
ওগো কী ভাবিয়া মনে এ দুটি নয়নে উথলে নয়নবারি—
ওগো সজনি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

মনরে ওরে মন, তুমি কোন সাধনার ধন!
পাই নে তোমায় পাই নে। শুধু খুঁজি সারাক্ষণ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ (গীতবিতান)

আমার মন বলে 'চাই, চাই, চাই গো—যারে নাহি পাই গো'।
সকল পাওয়ার মাঝে আমার মনে বেদন বাজে—
'নাই, নাই নাই গো'॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (তাসের দেশ)

মনোবিজ্ঞানকে ফাঁকি দিবার জন্যই মনের সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ

সভ্যতার খাতিরে মানুষ মন-নামক আপনার এক অংশকে অপরিমিত প্রশ্রয় দিয়া অত্যন্ত বাড়াইয়া তুলিয়াছে—এখন তুমি যদি তাহাকে ছাড়িতে চাও, সে তোমাকে ছাড়ে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মন (পঞ্চভূত)

আমাদের ভিতরকার সমস্ত সামঞ্জস্য নষ্ট করিয়া আমাদের মনটা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে কোথাও আর কুলাইয়া উঠিতেছে না। খাইবার, পরিবার, জীবনধারণ করিবার, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার পক্ষে যতখানি আবশ্যক মনটা তাহার অপেক্ষা ঢের বেশি বড়ো হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিয়াও চতুর্দিকে অনেকখানি মন বাকি থাকে। কাজেই সে বসিয়া ডায়ারি লেখে, তর্ক করে, সংবাদপত্রের সংবাদদাতা হয়, যাহাকে সহজে বোঝা যায় তাহাকে কঠিন করিয়া তুলে,.....এমন কি এ সকল অপেক্ষাও অনেক গুরুতর গর্হিত কার্য করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মন (পঞ্চভূত)

তোমার মাপে হয় নি সবাই
তুমি হও নি সবার মাপে,
তুমি মর কারো ঠেলায়
কেউ বা মরে তোমার চাপে—
তবু ভেবে দেখতে গেলে
এমনি কিসের টানাটানি?
তেমন করে হাত বাড়ালে
সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি।
আকাশ তবু সুনীল থাকে,
মধুর ঠেকে ভোরের আলো,
মরণ এলে হঠাৎ দেখি
মরার চেয়ে বাঁচাই ভালো।
যাহার লাগি চক্ষু বুজে
বহিয়ে দিলাম অশ্রুসাগর
তাহারে বাদ দিয়েও দেখি
বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।
মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বোঝাপড়া (ক্ষণিকা)

মন এমন এক প্রকার দাহ্য পদার্থ যে, ঠিক যেখানে প্রশ্নস্ফুলিঙ্গ পড়িল সেখানে কিছু না হইয়া হয়তো দশ হাত দূরে আর এক জায়গায় দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মনুষ্য (পঞ্চভূত)

মনের মতো কারে খুঁজে মর—
সে কি আছে ভুবনে,
সে তো রয়েছে মনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা

আপন মন নিয়ে কাঁদিয়ে মরি,
পরের মন নিয়ে কী হবে।
আপন মন যদি বুঝিতে পারি
পরের মন বুঝে কে কবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা

মন দিয়ে মন পেতে চাহি।
ওগো, কেন—
ওগো, কেন মিছে এ দুরাশা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা

মন দিয়ে
মন বোঝা যায়, গভীর বিশ্বাস শুধু
নীরব প্রাণের কথা টেনে নিয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে, তারে বলি বলি
আর বলা হল না।
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

রাম বসু : কবি গান

মনুষ্য

মনুষ্যদিগকে এক প্রকার চতুষ্পদ বলা যায়। প্রভেদ এই যে, চতুষ্পদের যেরূপ গঠনের পারিপাট্য, মনুষ্যের তাদৃশ নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল

সস্তা খরিদের অবিরত চেষ্টাকে মনুষ্যজীবন বলে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জ্ঞান—বিবিধ প্রবন্ধ

মনুষ্যত্ব

যে গুণ বা গুণের সমষ্টি থাকলে মানুষকে মানুষ বলা চলে, বলা উচিত......সেটার নাম মনুষ্যত্ব।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী : মানবধর্ম

মনুষ্যত্বের পাঁচটি লক্ষণ হল—চুরি না করা, শুচি থাকা, হিংসা না করা, সংযমী হওয়া এবং সত্যাশ্রয়ী হওয়া।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী : মানবধর্ম

মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সভ্যতার সঙ্কট

মানুষের মরণ আমাকে বড় আঘাত করে না, করে মনুষ্যত্বের মরণ দেখিলে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শ্রীকান্ত

মনুষ্যত্বের অপমান যখন দেখি, মনে হয় আগুন হয়ে ছড়িয়ে পড়ে খাক করে দিই এই হতভাগা দেশের পচা আবর্জনাগুলোকে।

সলিল চৌধুরী : ড্রেসিং টেবিল

মনুষ্যত্ব জয়ী হবেই—এই আশাতেই বুক বাঁধতে হবে।

সলিল চৌধুরী : ড্রেসিং টেবিল

মন্ত্র

কি মন্ত্র কহিলে তুমি অভাগার কানে
চলিল অভাগা পুন ভিক্ষার সন্ধানে।

নবীনচন্দ্র সেন : পলাশীর যুদ্ধ

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। **বাংলা প্রবাদ**

মন্ত্র পড়ি স্বামীরে হানিবে পঞ্চবাণ।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল

পূর্ণিমার চাঁদ সাগরকে উতলা করে যে মন্ত্রে, সেই মন্ত্রেই পৃথিবীকে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন—২

যেগুলি মানুষের অমৃতবাণী সেইগুলিই হল তার মন্ত্র। যতই সেগুলি ব্যবহার করা যায় ততই তাদের প্রয়োজন আরও বেড়ে চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একটি মন্ত্র (শান্তিনিকেতন)

শুদ্ধমাত্র মন্ত্রপাঠের দ্বারা এক পাল ভেড়া মারা যায় কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে ভলটেয়ার বলিয়াছেন, যায়, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে আর্সেনিক বিষও থাকা চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রাম্যসাহিত্য

এত যে মন্ত্র পড়িল ভ্রমর নবমালতীর কানে
বড়ো বড়ো যত পণ্ডিতজনা বুঝিল না তার মানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রকাশ (কল্পনা)

ঠোঁট লাল করে তোমাদের পানওয়ালী যে মন্তর ছড়ায় ঐ আশ্চর্য মেয়েও ভাষা বদলিয়ে সেই মন্তরই ছড়াচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাঁশরি—১।২

মন্ত্র জিনিষটি একটি বাঁধবার উপায়। মন্ত্রকে অবলম্বন করে আমরা মননের বিষয়কে মনের সঙ্গে বেঁধে রাখি। এ যেন বীণার কানের মতো। তারকে এঁটে রাখে, খুলে পড়তে দেয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মন্ত্রের বাঁধন (শান্তিনিকেতন)

মন্ত্রী

এসেছেন নেতা
উনি অর্ধেক দেবতা.....
আমি ভালবাসি
কচি কচি মন্ত্রীদের গালভরা হাসি।

উৎপলকুমার বসু : রাজনীতি ২

মঞ্চের ওপর পাশাপাশি বসা তিন মন্ত্রী
যেন ধুতি পাঞ্জাবী পরা তিন ডাকাত,
আর তাদের পাশে পৃথক চেয়ারে
আমাদের পরিচিত কবি
পুরস্কার নিতে এসেছেন।
ভয়ে আমার বুক টিপটিপ করছিল।......
ভাবছি, এই বুঝি কবির গলা টিপে ধরে ওদের কেউ ;
এই বুঝি পুরস্কারের টাকাটা ছিনিয়ে নেয়।....
কবি যখন তাঁর ভাষণে সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার
কথা স্বীকার করলেন, মনে হলো, ওরা সন্তুষ্ট হয়েছে,
আর কোনো ভয় নেই।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় : অকারণ (নাম লেখালাম তোমার খাতায়, সৃষ্টি)

মন্ত্রী বলে কি মানুষ নন। মানুষের কাজই তো গুছনো। আখের চাষের মতই, আখেরের চাষ।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : স্পেশাল অফিসার
(হালকা হাসি চোখের জল)

স্ত্রীকে এবং মন্ত্রীকে জীবন দিয়েও সন্তুষ্ট রাখবে। আর প্রমিস? প্রমিস ইজ এ থিং হুইচ ইউ আর নেভার এক্সপেক্টেড টু ফুলফিল। মন্ত্রীদের কেরিয়ার তো অঙ্গীকারের শত শত মৃত স্তূপের ওপরেই হাসছে, খেলছে, ভাঙছে, জুড়ছে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : স্পেশাল অফিসার

মন্ত্রী....জনতার সেবক হলেও জনতা মন্ত্রীর সেবক না-ও হতে পারেন। হাতের কাছে হ্যান্ডি কিছু পেয়ে ছুঁড়ে মেরে দিতেও পারে। তখন? ক্ষতি তো দেশেরই হবে। মন্ত্রীর আর কি? তিনি মরে ভূত হবেন। কে বলে মন্ত্রীর উপদ্রবের চেয়ে ভূতের উপদ্রব ভাল। তাদের কোনও ধারণা নেই।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : স্পেশাল অফিসার

ও মন্ত্রীমশাই ষড়যন্ত্রীমশাই থেমে থাক।
যত চালাকি তোমার জানতে নাই কো বাকি আর
যত কেরদানি শয়তানি সব ফাঁক।

সত্যজিৎ রায় : গান (গুপী গাইন বাঘা বাইন)

মন্ত্রী মশাই, করেন কী?
পরের ধরে পোদ্দারি।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : দেয়ালের লিখন

মন্দির

পুলিসও রামভক্ত, সামরিক বাহিনীও রামভক্ত, রামের মন্দির গড়ার নাম করে বাবরের মসজিদ ভাঙতে গেলে কেউ বাধা দেবে না, মসজিদ লোপাট হবে। তারপর ঘটবে তার প্রতিক্রিয়া পাকিস্তানে, বাংলাদেশে, মালয়েশিয়ায়, ইন্দোনেশিয়ায় ও অন্যত্র মন্দির ভঙ্গ, হিন্দুরা হারাবে তাদের আরো প্রাচীন উত্তরাধিকার।

অন্নদাশঙ্কর রায় : নব্বই পেরিয়ে

মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।

কাজী নজরুল ইসলাম : সাম্যবাদী

এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো আর মন্দির-কাবা নাই।

কাজী নজরুল ইসলাম : সাম্যবাদী

মন্দির দেখলে তাঁকেই [ঈশ্বরকে] মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেখানে তাঁর কথা হয় সেইখানে তাঁর আবির্ভাব হয়,—আর সকল তীর্থ উপস্থিত হয়। এ-সব জায়গা দেখলে ভগবানকেই মনে পড়ে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

মরণ

মরণকে যত ভয় করবি তত কাঁদতে হবে। ভয় করিস নে, দেখবি মরণই তোর সত্যিকারের সুখ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য-নিকেতন

হতাশা-ব্যর্থতা মুক্ত জীবন
বিষপুষ্প নিয়ে
বাসর সাজায়
লীন হতে
স্বৈরতন্ত্রী মরণের সাথে

নীলাচার্য : হাড়ের ভেতর আলো

অত চুপি চুপি কেন কথা কও
ওগো মরণ, হে মোর মরণ!
অতি ধীরে এসে কেন চেয়ে রও,
ওগো একি প্রণয়েরি ধরন!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ ৪৫

জীবন আমাদের কীই বা যে মরণকে ভয় করতে হবে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ত্রীর পত্র

ঐ মরণের সাগরপারে চুপে চুপে
এলে তুমি ভুবনমোহন স্বপনরূপে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান

মরণের মুখে রেখে দূরে যাও দূরে যাও চলে
আবার ব্যথার টানে নিকটে ফিরাবে বলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান

মরণ যেদিন দিনের শেষে
আসবে তোমার দুয়ারে
সেদিন তুমি কী ধন দেবে উহারে।
ভরা আমার পরাণখানি
সম্মুখে তার দিব আনি।
শূন্য বিদায় করব না তো উহারে—
মরণ যেদিন আসবে আমার দুয়ারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি

ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি

তোর প্রাণের রস তো শুকিয়ে গেল ওরে।
তবে মরণরসে নে পেয়ালা ভরে॥
সে যে চিতার আগুন গালিয়ে ঢালা, সব জ্বলনের মেটায় জ্বালা—
সব শূন্যকে অট্ট হেসে দেয় যে রঙিন করে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান

যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ মরে গেছি,
মরিতেছি তত পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোর মরণের ঘরে থাকি
জানিনে মরণ কারে বলে।....
জয় হোক জয় হোক মরণের জয় হোক—
মরণের হবে না মরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অনন্ত মরণ (প্রভাতসংগীত)

মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান।
মেঘবরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট,
রক্তকমল কর, রক্ত-অধরপুট,
তাপবিমোচন করুণ কোর তব
মৃত্যু-অমৃত করে দান॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী

নাই তোর নাইরে ভাবনা
এ-জগতে কিছুই মরে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অনন্ত জীবন (প্রভাত সংগীত)

মরিতে না হইলে বাঁচিয়া থাকিবার কোন মর্যাদাই থাকিত না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অপূর্ব রামায়ণ (পঞ্চভূত)

যারা শুধু মরে, কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ,
কেহ কভু তাহাদের করে নি সম্মান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অভিমান (চৈতালি)

মরতে মরতে মরণটারে শেষ করে দে একেবারে,
তারপরে সেই জীবন এসে আপন আসন আপনি লবে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরূপরতন (দুঃখ যদি না পাবে তো)

হায় হায়—মরবার বয়স গেছে। যৌবন কালে ঘড়ি ঘড়ি মরতুম। বুড়ো বয়সে রোগ না হলে আর মরণ হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রায়শ্চিত্ত ২।৩

মরার বাড়াও গালি আছে—বাঁচিয়া মরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিবেচনা ও অবিবেচনা (কালান্তর)

বাঁচবার চেষ্টাতেও মানুষ অনেক সময় মরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানুষের ধর্ম-১

মরু, মরুভূমি

মরুবিজয়ের কেতন উড়াও শূন্যে হে প্রবল প্রাণ।
ধূলিরে ধন্য করো করুণার পুণ্যে হে কোমল প্রাণ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতমালিকা ২)

ইহার চেয়ে হতেম যদি
আরব বেদুয়িন।
চরণতলে বিশাল মরু
দিগন্তে বিলীন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুরন্ত আশা (মানসী)

আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি—তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ওই একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে-প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

প্রকৃতির প্রাণশক্তি যত প্রবল হোক, মানুষের লোভের কাছে তা হার মানতে চলেছে, ফলে মরুবিজয়ের কেতন না উড়ে মরুভূমির জয়পতাকা উড্ডীন হচ্ছে মরুভূমির সীমা ছাড়িয়ে। পৃথিবীর জনসংখ্যা যত বাড়ছে মানুষের দাবি তত বাড়ছে, নানা প্রয়োজনে গাছ কাটা হচ্ছে নির্বিচারে, নিষ্ঠুরভাবে চলছে বনচ্ছেদন। গাছ কাটতে কাটতে বনকে হটিয়ে দিয়ে হরণ করা হচ্ছে পৃথিবীর ছায়াবস্ত্র—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের চেয়েও তা লজ্জাকর। গাছপালার আবরণ অপসৃত হতে মাটির আবরণ আলগা হয়ে যাচ্ছে—ভূমির ক্রমিক ক্ষয়ে অনাবৃত হচ্ছে পৃথিবীর পাথুরে হাড় পাঁজরের কঙ্কাল। অরণ্যের আশ্রয়হারা মাটি ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে তার উর্বরতা। এর অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, যেখানে মরুভূমি নেই সেখানেও মরুভূমির আত্মপ্রকাশ।

সঙ্কর্ষণ রায় ঃ **সমস্ত পৃথিবী কী মরুভূমিতে পরিণত হবে? (মরুভূমি)**

মরুভূমি বলে কিছু থাকবে না, মরুভূমিকে সম্পূর্ণ জয় করবে মানুষ তা যে কষ্টকল্পনা প্রবণ মনের ফসল নয় তা আধুনিক পরিবেশ বিজ্ঞানীদের (Environmental Scientists) গবেষণার ফলাফল থেকে আমরা বুঝতে পারব।
মরুভূমিকে জয় করার সর্বপ্রথম চেষ্টা করেছে মরুচারী মানুষরা। সাহারা ও আরবের মরুক্ষেত্র অনেক জায়গায় খুব গভীর পরিখা খনন করে মরুভূমির অধিবাসীরা ভূগর্ভের জলভাণ্ডারকে অনাবৃত করেছে গভীর পরিখার মধ্যে প্রকাশ পাওয়া ভূ-জলের ধারাকে স্থানীয় ভাষায় বলে 'ফগারা' বা 'কানাৎ' (foggara or qanat)। ফগারার খনন করতে হলে প্রথমে কুড়ি বা পঞ্চাশ ফুট অন্তর অন্তর গভীর কুয়া খোঁড়া হয় যা জলের স্তরকে স্পর্শ করে। তারপর এইসব জলের স্তরে উপনীত হওয়া কুয়াগুলোকে যুক্ত করা হয় পরিখা কেটে। সাধারণ ফগারা খনন শুরু করা হয় মরূদ্যান থেকে। তাকে মরুভূমির মধ্যে প্রসারিত করা হলে পর তা মরূদ্যানকে টেনে নিয়ে আসে মরুভূমির মধ্যে।

মরুভূমিকে জয় করতে হলে সর্বপ্রথম প্রয়োজন জল। জল মরুভূমির নির্জীব মাটিকে জীবন দান করে—জলই সেই পরশমণি যা মরুভূমিকে তৃণভূমিতে পরিণত করে ফল ফসলে ভরে দিতে পারে। ইরাকের মরুঅঞ্চলে যে প্রাচীন সভ্যতা বিকশিত হয়ে উঠেছিল, তার মূলে রয়েছে মরুভূমির গুপ্ত জলভাণ্ডারকে আয়ত্ত করা এবং জলসেচনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা। বিরল বৃষ্টিপাতকে বাঁধ বেঁধে ধরে রাখতেন স্থানীয় অধিবাসীরা—খাল খনন করে সেই জল দিয়ে শুকনো মরুভূমিকে করে তুলতেন শস্যশ্যামলা। প্রাচীনকালের সেই জলসেচের চিহ্ন আজকের মানুষদের চমৎকৃত করে। মজার ব্যাপার এই যে পরবর্তী কালে তাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মরুভূমিকে নিয়ন্ত্রিত করার প্রয়াস দেখা যায়নি।

প্রাচীন মানুষদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মরুভূমিকে রূপান্তরিত বা জয় করার ঝোঁক আধুনিক মানুষদের মধ্যে দেখা দিয়েছে। আধুনিক মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছে এই ব্যাপারে।

সঙ্কর্ষণ রায় : মরুবিজয় (মরুভূমি)

মশা

দেশান্তরী করল আমায় কেশনগরের মশায়।

অন্নদাশঙ্কর রায় ।

মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালবাসে।

জীবনানন্দ দাশ : আট বছর আগের একদিন

খেঁটুরাম—বলি আজকাল মশাটা কেমন বল দেখি?
রামকানাই—বরাবর যেমন থাকে, ছোট-ছোট কালোমতন, উড়ে বেড়ায়—
খেঁটুরাম—আহা, বলি লাগে কেমন?
রামকানাই—তা কি করে বলব? কখনো ভাজাও করিনি, চচ্চড়িও খাইনি।

সুকুমার রায় : ঝালাপালা

মহত্ত্ব

মহত্ত্বকে পদে পদে নিন্দার কাঁটা মাড়াইয়া চলিতে হয়। ইহাতে যে হার মানে, বীরের সদ্‌গতি সে লাভ করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরনিন্দা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

মহাকাব্য/মহাকবি

আমি নাবব মহাকাব্য
 সংরচনে
 ছিল মনে—
ঠেকল কখন তোমার কাঁকন
 কিংকিনীতে,
কল্পনাটি গেল ফাটি
 হাজার গীতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ক্ষতিপূরণ (ক্ষণিকা)

মোটামুটি কাব্যকে দুই ভাগ করা যাক্। কোনো কাব্য বা একলা কবির কথা, কোনো কাব্য বা বৃহৎসম্প্রদায়ের কথা।

একলা কবির কথা বলিতে এমন বুঝায় না যে তাহা আর কোনো লোকের অধিগম্য নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি বলা যাইত। তাহার অর্থ এই যে, কবির মধ্যে সেই ক্ষমতাটি আছে, যাহাতে তাহার নিজের সুখদুঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের চিরন্তন হৃদয়াবেগ ও জীবনের মর্মকথা আপনি বাজিয়া উঠে।

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল, তেমনি আর এক শ্রেণীর কবি আছে, যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।

এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের সমগ্র জাতির সরস্বতী ইঁহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন—ইঁহারা যাহা রচনা করেন তাহাকে কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলিয়া মনে হয় না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ বনস্পতির মত দেশের ভূতল-জঠর হইতে উদ্ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই—কিন্তু রামায়ণ মহাভারতকে মনে হয় যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস বাল্মীকি উপলক্ষ মাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভূমিকা-দীনেশচন্দ্রসেন রচিত 'রামায়ণী কথা'

মহাকাল

হে মহাকাল, তোমার অনন্ত পারাবারে
আমরা ক্ষণিকের বুদ্‌বুদ্,
তবু সেই সূর্য-শিখা যে আমাদের মাঝে
প্রতিফলিত হয়,
এই আমাদের গৌরব।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ সূর্য-বীজ (সাগর থেকে ফেরা)

যদি মাতে মহাকাল,
 উদ্দাম জটাজাল
ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উঠে উত্তাল,
 হোয়ো নাকো কুণ্ঠিত,
 তালে তার দিয়ো তাল
 জয়-জয় জয় গান গাইয়ো

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তাসের দেশ

যে মহাকাল দিন ফুরালে
আমার কুসুম ঝরাল,
সেই তোমারি তরুণ ভালে
ফুলের মালা পরাল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নূতন (পরিশেষ—সংযোজন)

যার পরিচয় কারো মনে নাই।
যার নাম কভু কেহ শোনে নাই,
না জেনে নিখিল পড়ে আছে পথে
যার দরশন মাগি—
....যুগ যুগ ধরি তাহার আশায়
মহাকাল আছে জাগি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রতীক্ষা সেঁজুতি

মহাকাল, সন্ন্যাসী তুমি।
তোমার অতলস্পর্শ ধ্যানের তরঙ্গ শিখরে
উচ্ছৃত হয়েছে সৃষ্টি
আবার নেমে যাচ্ছে ধ্যানের তরঙ্গতলে।
প্রচণ্ড বেগে চলেছে ব্যক্ত অব্যক্তের চক্রনৃত্য,
তারি নিস্তব্ধ কেন্দ্রস্থলে
তুমি আছ অবিচলিত আনন্দে।
হে নির্ম্মম দাও আমাকে তোমার ঐ সন্ন্যাসের দীক্ষা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষসপ্তক-৭

মহাকাল-মন্দিরের মাঝে
তখন গম্ভীর মন্ত্রে সন্ধ্যারতি বাজে।
জনশূন্য পণ্যবীথি, ঊর্ধ্বে যায় দেখা
অন্ধকার হর্ম্যপরে সন্ধ্যারশ্মিরেখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বপ্ন (কল্পনা)

মহাজন

জনগণে যারা জোঁকসম শোষে তারে মহাজন কয়,
সন্তান-সম পালে যারা জমি, তারা জমিদার নয়।
মাটিতে যাদের ঠেকে না চরণ,
মাটির মালিক তাহারাই হন—
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ সেই তত বলবান।
নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান!
ভগবান! ভগবান!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ফরিয়াদ

মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়,
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি-ধ্বজা ধরে
আমরাও হবো বরণীয়॥

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ জীবন-সঙ্গীত

মহাত্মা

তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরীবদের জন্য রক্তমোক্ষণ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা (৭।৫৭)

মহাপুরুষ

প্রকৃত মহাপুরুষ কে? শরীর যার শ্মশানে আর মন যার ভগবানে। শরীর মরি মরি বলুক তাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু মন হরি হরি বলুক।

আচার্য নগেন্দ্রনাথ ঃ উপদেশ শতক

বড় বড় চাকরি পেলেই আর মহাপুরুষ হয়ে যায় না কেউ। তা হলে প্রত্যেকটি মিনিষ্টার মহাপুরুষ হয়ে যেত।

বিমল মিত্র ঃ আত্মহত্যার আগের ঘটনা

বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন তিনিই টেনে নেবেন—হাজার দোষ থাকুক।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

মহাভারত

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কাশীরাম দাস ঃ মহাভারত

মহাভারতের কথা অমৃত সমান,
হে কাশী! কবীশ-দলে তুমি পুণ্যবান।

মধুসূদন দত্ত ঃ চতুর্দশপদী কবিতাবলী

মহাভারতের মহৎ সমুজ্জ্বল রূপ যাঁরা ধ্যানে দেখেছিলেন 'মহাভারত' নামকরণ তাঁদেরই কৃত। সেই রূপটি একই কালে ভৌমগুলিক রূপ এবং মানস রূপ।....সেই বিশ্বদৃষ্টির প্রবল আনন্দে তাঁরা ভারতবর্ষে চিরকালের শিক্ষার প্রশস্ত ভূমি পত্তন করে ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ

আর্যসমাজে যত কিছু জনশ্রুতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহাদিগকে তিনি (ব্যাস) এক করিলেন। জনশ্রুতি নহে, আর্যসমাজে প্রচলিত সমস্ত বিশ্বাস, তর্কবিতর্ক ও চারিত্রনীতিকেও তিনি এই সঙ্গে এক করিয়া একটি জাতির সমগ্রতার এক বিরাট মূর্তি এক জায়গায় খাড়া করিলেন। ইহার নাম দিলেন মহাভারত।......ইহা কোনও ব্যক্তি-বিশেষের রচিত ইতিহাস নহে, ইহা একটি জাতির স্বরচিত স্বাভাবিক ইতিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

মহাভারতের বর্ণিত ইতিহাস মানবসমাজের বিপ্লবের ইতিহাস।.....হয়তো কোনও ক্ষুদ্র প্রাদেশিক ঘটনার স্মৃতিমাত্র অবলম্বন করিয়া মহাকবি আপনার চিত্তবৃত্তির সমাধিকালে মানবসমাজের মহাবিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন ; এবং সেই স্বপ্নদৃষ্ট ধ্যানলব্ধ মহাবিপ্লবের,—ধর্মের সহিত অধর্মের মহাসমরের চিত্র ভবিষ্যৎ যুগের লোকশিক্ষার জন্য অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ মহাকাব্যের লক্ষণ

মহামানব

হে আকাশ! তুমি কি বলতে পার সেই যুগসন্ধিক্ষণের মহামানব কোথায়—যার রথচক্র ঘর্ঘরে আমরা উচ্চকিত হব—যার অগ্নিপ্রভ পৌরুষ বিদ্যুৎকশায় আমাদের চেতনাকে জাগ্রত করবে।

গিরিশংকর ঃ সাইরেন

ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

হে মহামানব, একবার এসো ফিরে
শুধু একবার চোখ মেলো এই গ্রাম নগরের ভিড়ে।
এখানে মৃত্যু হানা দেয় বারবার ;

এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল,
ভাঙা ঘর, ফাঁকা ভিটেতে জমেছে নির্জনতার কালো,
হে মহামানব, এখানে শুকনো পাতায় আগুন জ্বালো।

সুকান্ত ভট্টাচার্য : বোধন

মহুয়া

অনেক, অনেক দূরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ,
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দু'ধারে ছায়া ফেলে
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য
আর দূর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস
রাত্রে নির্জন নিঃসঙ্গতাকে আলোড়িত করে।
আমার ক্লান্তির উপরে ঝরুক মহুয়া ফুল,
নামুক মহুয়ার গন্ধ।

সমর সেন : মহুয়ার দেশ

মা

ভূর্ভুবঃস্বঃ তিন লোকে মায়ের সমান গুরু নাই।

অন্নদাঠাকুর : স্বপ্নজীবন

মা হয়তো বেঁচে নেই, আছে তাঁর তৈলচিত্র বা আলোকচিত্র। ঘর থেকে বাইরের কাজের দুনিয়ায় পা দেওয়ার আগে আজও বহু বাঙালি নিজের মায়ের ঐ ছবিটিকে প্রায় দেবীজ্ঞানে দু হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করেন।......
যুক্তির যেখানে শেষ, সঙ্কটের বিপন্নতার শুরু, সেই খড়ির গণ্ডির পর—সেইখানেই মায়ের অধিষ্ঠান।

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় : নামমাহাত্ম্য (আনন্দবাজর পত্রিকা ১২.১১.৯৫)

মা গুরুজন ব্রহ্মময়ীস্বরূপা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

মায়ের মূর্তি গড়াতে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে অসি মুণ্ডমালা সে মা-টি কি মাটির বালা।
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে॥

রামপ্রসাদ সেন : শাক্তপদাবলী

মা যেন ভগবান। ভগবানের মতো সব দেখতে পান।

সমরেশ বসু : অবাধ্য

'মা' শব্দটার কী সাংঘাতিক শক্তি! এমন অপার, নিঃস্বার্থ স্নেহ আর সেবা যে কোনও নারীর 'মা' নামক জন্মান্তরেই হয়তো একমাত্র সম্ভব।

হর্ষ দত্ত : ও শিমুল, ও পলাশ

মা বাপ

এটাও দেখতে পাবেন হেথা বিরল নয়ক সেটা,
পাপ এড়াতে মা বাপকে কাশী পাঠিয়ে বেটা—
দুচার মাস দিয়েই কিছু, তার পরেতেই চুপ,
দেশে কিন্তু ফুলকপি আর ফজলী চলে খুব।
এখানেতে বুড়োবুড়ী ভিক্ষে করে খায়।
সকাল সন্ধ্যা ছেলের তবু—মঙ্গলটা চায়।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : কাশীর কিঞ্চিৎ

মাগ

একবরে ভাতারের মাগ
        চিংড়িমাছের খোসা,
দোজবরে ভাতারের মাগ
        নিত্যি করেন গোঁসা,
তেজবরে ভাতারের মাগ
        সঙ্গে বসে খায়,
চারবরে ভাতারের মাগ
        কাঁধে চড়ে যায়।

বাংলা প্রবাদ

মাগী

মাগী যেন ষাঁড় ডাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিষবৃক্ষ

মাতাল

আমরা দুর আকাশের নেশায় মাতাল ঘরভোলা সব যত—
বকুলবনের গন্ধে আকুল মউমাছিদের মতো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান

        নাহি মানে হাল,
ঘুরে টলমল তরী অশান্ত মাতাল
মূঢ় সম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দেবতার গ্রাস

ফাগুন মাসে দখিন হতে হাওয়া
        বকুলবনে মাতাল হয়ে এল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হোরিখেলা (কথা)

মন মাতালে মাতাল করে   মদ মাতালে মাতাল বলে॥

রামপ্রসাদ সেন : শাক্তপদাবলী

মাতাল তার মাতাল বন্ধুকে যত ভালই বাসুক না কেন, নির্ভর করবার বেলায় করে শুধু তাকে যে মদ খায় না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : স্বামী ১

মাতৃত্ব/মাতৃরূপ

নারী যখন জননী হন, তখন পত্নী অবস্থা অপেক্ষা তাঁহার ভাব, আবেগরাশি ও ভালবাসা অধিকতর বিশুদ্ধি লাভ করে, দেহচেতনা হইতে বহুল পরিমাণে মুক্ত হয়।......এইজন্যই মাতৃত্ব এত পবিত্র।

স্বামী বীরেশ্বরনান্দ ঃ শ্রীশ্রীমা ও নারীজাতির আদর্শ

প্রেম-বিহ্বল, করুণা ছলছল,
        শিয়রে জাগে কার আঁখি রে!
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগি রে।

আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি,
        শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহরাশি,
বক্ষে ধরি চির-পীযূষ নির্ঝর,
        নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
নমো নমো নমঃ, জননি দেবি মম!
        অবলা মতি পদে মাগি রে!

রজনীকান্ত সেন ঃ মা (বাণী)

মাতৃভাষা

মাতৃসম মাতৃভাষা।

ঈশ্বর গুপ্ত ঃ মাতৃভাষা

মাতৃভূমি ও মাতৃভাষাকে যে সম্মান দিতে শেখেনি এবং মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি যার হৃদয়ে স্নেহ মমতা নেই সে শিক্ষিত হলেও অশিক্ষিত, জ্ঞানী হলেও অজ্ঞান, সম্মানের অধিকারী মনে হলেও ঘৃণার পাত্র। যে ভাষায় কথা বলতে শিখেছি, স্বপ্ন। দেখেছি, মনের ভাব প্রকাশ করেছি, সেই ভাষাকে কি উপেক্ষা করতে পারি?

কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞা ঃ বিরল দৃষ্টান্ত (অতন্দ্রপথ ১৯৯৮)

মাধব

অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে
        সুন্দরী ভেল মাধাই।

বিদ্যাপতি ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

কি কহব রে সখি আনন্দ-ওর
চিরদিন মাধব মন্দিরে মোর।

বিদ্যাপতি ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

        মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল   এ দেহ সমপিলু
        দয়া জনু ছোড়বি মোয়॥

বিদ্যাপতি ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

মান

আমার মান গেল 'মানি'ও গেল।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) ঃ ভোটামৃত

অন্যের মান হরণ করলে মানী ব্যক্তির মান আরও বেড়ে যায়।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় ঃ কলকাতায় চিত্রগুপ্ত (কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই)

মানহানির মোকদ্দমা। প্রথমেই বুঝতে হবে মান কাকে বলে। মান মানে কচু। কচু অতি উপাদেয় জিনিষ।

সুকুমার রায় ঃ হ য ব র ল

মানবজন্ম

হায়রে সমাজ-দাঁড়ের পাখি.....তোর পাখা দুটা আজ বদ্ধ, তবু তোর পায়ে আজ কর্মের শিকল ঝন্‌ঝন্‌ করিয়া বাজিতেছে—এই কি মানবজন্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্তযাপন (বিচিত্র প্রবন্ধ)

মনরে কৃষি কাজ জানা না।
এমন মানবজনম রইল পতিত আবাদ করলে ফলত সোনা।

রামপ্রসাদ সেন ঃ শাক্ত পদাবলী

মাটির জমি আবাদের চেয়ে মানব জমি আবাদ কম দরকারী নয়।

রাজশেখর বসু ঃ জীবনযাত্রা (বিচিন্তা)

মানবিক

আণবিক নয়, চাই শুধু মোরা মানবিক অধিকার।

সুনির্মল বসু ঃ আমাদের দাবী

মানী

মানীর মান করিব হানি,
মানীরে শোভে হেন কাজ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানী (কথা)

উচ্চপ্রাচীরে রুদ্ধ তোমার
ক্ষুদ্র ভুবনখানি,
হে মানী, হে অভিমানী।
মন্দিরবাসী দেবতার মতো
সম্মানশৃঙ্খলে
বন্দী রয়েছ পূজার আসনতলে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানী (পরিশেষ)

মানুষ

সব মানুষই কখনো কখনো নিজেকে আবিষ্কার করতে চায়। কখনো কখনো এই আবিষ্কার নিজেকে আগুনে সমর্পণের চেয়েও মর্মান্তিক হলেও তার পিছিয়ে আসার উপায় থাকে না।

অমরেন্দ্র নাথ সান্যাল ঃ জনৈকা পাণিপ্রার্থিনী

কেবল পরের হিতে প্রেম লাভ যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?.....
সকলে সমান মিত্র শত্রু নাই যার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?.....
অমৃত নিঃসৃত হয় প্রতি বাক্যে যার
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?.....
সতত গলায় পরে করুণার হার।
মানুষ তারেই বলি মানুষ কে আর?

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ঃ মানুষ কে

আর কবে ভাই মানুষ হবে?
মানুষ হবে, মানুষ হবে,
আর কবে ভাই মানুষ হবে?
দেখে তোর আকার প্রকার, আচার বিচার,
মানুষ কবে মানুষ কবে?
হতে চাও মানুষ যদি, ভ্রান্তি-নদী
এই বেলা পার হওরে তবে।
মনেরে বলে কয়ে, শুদ্ধ হয়ে
ডুব দিয়ে আয় শান্তি শবে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : সঙ্গীত

মানুষ জাত। মানুষ যদি মানুষ হতে না পারে তাহলে সে, যে কোন সম্প্রদায়ের হোক না কেন মানুষ হয়ে তার জন্মটাই বৃথা।

এ. মান্নাফ : শিরীষের জাত নেই

পৃথিবীর ইতিহাস বারবার
বদলে গেছে
তবুও মানুষ সব সময় বেঁচেছে।

ঋত্বিক ঘটক : আমাদের ফেলো না।

গাহি সাম্যের গান
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।

কাজী নজরুল ইসলাম : সাম্যবাদী (মানুষ)

দেব নয়, মানুষই অমর।
মানুষই দেবতা গড়ে তাহারই কৃপার 'পরে
করে দেব-মহিমা নির্ভর।

কালিদাস রায় : চাঁদ সদাগর

শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

চণ্ডীদাস : পদাবলী

পৃথিবীতে মানুষের জন্ম কতো যে সুখের!

দিব্যেন্দু পালিত : খেলা (ক্রীড়াভূমি)

মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা সত্যি খুব সুন্দর।

নীললোহিত : তোমার তুলনা তুমি (নীললোহিত সমগ্র)

টাকা-ফাকা সব আপনা-আপনি আসবে। মানুষ চাই, টাকা চাই না। মানুষ সব করে, টাকায় কি করতে পারে?

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী-৭

জগতের সমস্ত ধনসম্পদের চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশী মূল্যবান।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী-৫

মানুষের মানে চাই—
—গোটা মানুষের মানে!........
মানুষ সব কিছুর মানে খুঁজে হয়রান হল—
এবার চাই মানুষের মানে—নইলে যে সৃষ্টির ব্যাখ্যা হয় না।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : মানে

ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে আলাদা করে দেখলে, মানুষের মধ্যে, অন্তত কোনো কোনো মানুষের মধ্যে—আমরা দেখতে চাই বুদ্ধির দীপ্তি, শরীরের রেখায় সামঞ্জস্যের আভাস, তার সংস্পর্শে পাই প্রাণের উজ্জীবন। কিন্তু যেখানে ভিড়, যেখানে একই উদ্দেশ্যে......কি একই উদ্দেশ্যহীনতায়—অনেকে জড়ো হয়েছে, সেখানে ব্যক্তির সেই স্বাতন্ত্র্য যায় হারিয়ে ; সব মিলে শুধু একটা মানবতার পিণ্ড যে-কোনো যান্ত্রিক কৌশলে নড়াচড়া করছে। সেই দৃশ্য দেখে শুধু ভয় হয়, শুধু ক্লান্তি আসে।

বুদ্ধদেব বসু : ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ

ওরা ভালবাসে ফুল, শুধু ফুল,
ফুলের স্নিগ্ধ হাসি
আমি মানুষের জয়গান গাই, মানুষকে ভালবাসি।

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার : জীবনযোদ্ধা জানাই শ্রদ্ধা

শুনহ মানুষ ভাই!
সবার উপরে মানুষ শ্রেষ্ঠ, স্রষ্টা আছে বা নাই।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : দুখবাদী

হীরার টুকরা যেমন আকাশের আলোককে প্রকাশ করার দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে তেমনি মানুষের হৃদয় কেবলমাত্র নিজের ব্যক্তিগত সত্তায় প্রকাশই পায় না, সেখানে সে অন্ধকার। যখনই সে আপনাকে দিয়া আপনার চেয়ে বড়োকে প্রতিফলিত করিতে পারে তখনই সে আলোকে সে প্রকাশ পায়......সেই আলোককে সে প্রকাশ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবি য়েট্‌স (পথের সঞ্চয়)

মানুষ কি চোখ চাইলেই দেখা যায়। দৈবাৎ হাতে ঠেকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোড়ায় গলদ ১।১

যে মানুষ তার সমস্ত মন প্রাণ হৃদয় লইয়া মানুষ সে নয়, যে মানুষ কেবলমাত্র বিশেষ প্রয়োজনের মাপে মানুষ, সেই তো কৃত্রিম মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছোটো ও বড়ো (কালান্তর)

মানুষ আর মানুষের কীর্তির মধ্যে সামঞ্জস্য ভেঙে গিয়েছে বলেই আজ মানুষ খুব সমারোহ করে আপন গোরস্থান তৈরি করতে বসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—২৫।৯।২৪

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বঙ্গমাতা (চৈতালি)

আমরা মানুষ বলি সেই পদার্থকে যেটা আমাদের ভিতরকার সব জীবজন্তুকে মিলিয়ে এক করে নিয়েছে—আমাদের বাঘ-গোরুকে এক খোঁয়াড়ে দিয়েছে পুরে, অহি-নকুলকে এক খাঁচায় ধরে রেখেছে। যেমন রাগিণী বলি তাকেই যা আপনার ভিতরকার সমুদয় সা-রে-গা-মা-গুলোকে সংগীত করে তোলে, তার পর থেকে তাদের আর গোলমাল করবার সাধ্য থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গল্পগুচ্ছ—বলাই

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে

মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—৩০

বিশ্বের সহিত স্বতন্ত্র বলিয়াই যে মানুষের গৌরব তাহা নহে। মানুষের মধ্যে বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই আছে বলিয়া মানুষ বড়ো। মানুষ জড়ের সহিত জড়, তরুলতার সঙ্গে তরুলতা, মৃগপক্ষীর সঙ্গে মৃগপক্ষী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিচিত্র প্রবন্ধ। বসন্তযাপন

মানুষ আসবার পূর্বেই জীবসৃষ্টিযজ্ঞে ভূরিব্যয়ের পালা শেষ হয়ে এসেছে। বিপুল মাংস, কঠিন বর্ম, প্রকাণ্ড লেজ নিয়ে জলে স্থলে পৃথুল দেহের যে অমিতাচার প্রবল হয়ে উঠেছিল তাতে ধরিত্রীকে দিলে ক্লান্ত করে। প্রমাণ হল আতিশয্যের পরাভব অনিবার্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা—পরিচয়—১

মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে।......বুদ্ধির পরিচয় দেয় জ্ঞানের বিষয়ে, যোগ্যতার পরিচয় দেয় কৃতিত্বে, আপনারই পরিচয় দেয় সৃষ্টিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলভাষা পরিচয়—৫

মানুষের প্রধান লক্ষণ এই যে, মানুষ একলা নয়। প্রত্যেক মানুষ বহু মানুষের সঙ্গে যুক্ত, বহু মানুষের হাতে তৈরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরি

অথর্ববেদ বলেছেন—
ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীবলং বলে।
ঋত সত্য তপস্যা রাষ্ট্র শ্রম ধর্ম কর্ম ভূত ভবিষ্যৎ বীর্য
সম্পদ বল—সমস্তই উচ্ছিষ্টে অর্থাৎ উদ্‌বৃত্তে আছে।

অর্থাৎ মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। জীবজগতে মানুষ বাড়তির ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোলো না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানুষের ধর্ম—২

বাঘকে খেয়ে বাঘ বড়ো হয় না, কেবল মানুষই মানুষকে খেয়ে ফুলে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

মানুষ অনেকখানি ছেলেমানুষ, তাকে রূপকথা দিয়ে ভোলাতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজরানী (গল্পসল্প)

ধর্মরাজ দিল যবে ধ্বংসের আদেশ
আপন হত্যার ভার আপনিই নিল মানুষেরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রোগশয্যায়—৩৮

অনুভু হয়েই মানুষ বড়ো হয়ে উঠছে প্রভু হয়ে নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন (বিশ্ববোধ)

মানুষ এক দিকে প্রকৃতি আর-এক দিকে আত্মা—এক দিকে রাজার খাজনা জোগায়, আর-এক দিকে বন্ধুর ডালি সাজায়। এক দিকে সত্যের সাহায্যে তাকে মঙ্গল পেতে হয়, আর-এক দিকে মঙ্গলের ভিতর দিয়ে তাকে সুন্দর হয়ে উঠতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন (বিধান)

মানুষের আত্মা মুক্তিলোকে আনন্দলোকে জন্মগ্রহণ করবে বলে বিশ্বের সূতিকাগৃহে অনেক দিন ধরে চন্দ্র সূর্য তারার মঙ্গলদীপ জ্বালানো রয়েছে। যেমনি নবজাত মুক্ত আত্মার প্রাণচেষ্টার ক্রন্দনধ্বনি সমস্ত ক্রন্দসীকে পরিপূর্ণ করে উচ্ছ্বসিত হবে অমনি লোকে লোকান্তরে আনন্দশঙ্খ বেজে উঠবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সেই প্রত্যাশাকে পূরণ করবার জন্যই মানুষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সত্য হওয়া (শান্তিনিকেতন)

বিধাতা লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টি করে চলেছেন তবু মানুষের আশা মেটে না, বলে আমরা নিজে মানুষ তৈরি করবো। তাই দেবতার সজীব পুতুল খেলার পাশাপাশি নিজের খেলা সুরু হল পুতুল নিয়ে, সেগুলো মানুষের আপন-গড়া মানুষ।.....ছেলেরা বলে, গল্প বলো তার মানে, ভাষায়-গড়া মানুষ বানাও। বুড়োরাও.....বলে, মানুষ বানাও ; হল আঠারো-পর্ব মহাভারত প্রস্তুত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে

এমন মানুষ আছে
পায়ের ধুলো নিতে এলে
রাখিতে হয় দৃষ্টি মেলে
জুতো সরায় পাছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ফুলিঙ্গ—৪২

মানুষের মুখগুলো এখনো হল না মানুষের মুখের মতন
স্বার্থ আর ক্ষমতার পূজায় পশুটাকে মানুষ বলেই চালাই
কিছু কিছু আরামের বিনিময়ে আত্মাকে নীলামে চড়াই
বুকের ভিতরে তাকিয়ে একবারও বুঝিনি
আমরা জুডাস
পৃথিবীর কেন্দ্রে দাঁড়িয়েছি বলে কত না অহংকার।

রাম বসু : ভাবনা—সাত

জগৎ জুড়িয়া আছে এক জাতি সে জাতির নাম মানুষ জাতি,
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত একই রবি শশী মোদের সাথি।.....
মানুষে মানুষে নাহিক তফাৎ, সকল জগৎ ব্রহ্মময়।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : জাতির পাঁতি

মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা সত্যি খুব সুন্দর।

নীললোহিত : তোমার তুলনা তুমি

মানুষ যেন এক অদৃশ্য হাতের পুতুল! তার নিজের ইচ্ছের কোনো মূল্য নেই।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : অলীক মানুষ

কী বিশাল ওই আকাশ, কত জ্যোতির্ময়তা! তার কাছে কতটুকু এই মানুষের ভাবনা!

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : অলীক মানুষ

আমরা ইতিমধ্যে অনেক মূল্য দিয়ে বুঝেছি। আমাদের এক নতুন পৃথিবী চাই একবিংশ শতাব্দীতে। চাই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। ইতিহাস থেমে যায়নি, শেষ তো হয়ে যেতেই পারে না। মানুষ যে অশেষ, অশেষ তার ক্ষমতা, সীমাহীন তার স্পর্ধা, কোন সীমাবদ্ধতা তাকে শান্তি দিতে পারে না। জগতের আনন্দযজ্ঞে তার নিমন্ত্রণ যে প্রতিমুহূর্তের। আর আদর্শ? মানুষ জন্মেছে যেদিন সেদিনই তার কপালে সূর্য আগুনের মুকুট পরিয়ে দিয়েছে। সেই হল তার এই নরলোকে দ্বিতীয় জন্ম। দ্বিতীয় চেতনা

সিদ্ধ মানুষ কেবলই অনুসন্ধানপ্রিয়, কেবলই যন্ত্রণাদগ্ধ, কেবলই নতুন নতুন উদ্বোধনের আনন্দে উল্লসিত। সুখ তার কপালে সহ্য হবার নয়। শান্তি? তাও নয়। ক্ষণকালের এই জীবনে চাই অনবদ্য আনন্দধারা। চাই ক্ষণিকের হলেও মানুষের প্রাণের তপ্ত ভালবাসা। চাই মুক্ত এক পৃথিবীতে সব মানুষের সঙ্গলাভে এজীবন ধন্য করতে পারা। এই আদর্শ কি অপরাজিত মানুষ কোনদিন বিস্মৃত হতে পারে?

হোসেনুর রহমান ঃ ইতিহাসের শেষ কোথায় (বইমেলা, সেপ্টেম্বর '৯৬)

মামলা

এখন মোকদ্দমা মামলায় বাদী প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই ধন এবং ধর্মের ক্ষতি হইতেছে।.....দেশীয় বুদ্ধিমান্ বিদ্বান্ এবং চরিত্রবান্ লোকদিগকে মধ্যস্থ স্বরূপে গ্রহণ করিয়া আপনাদিগের বিবাদ আপনারাই ঘরে ঘরে নিষ্পত্তি করিয়া লইতে আরম্ভ করিতে হইবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ সামাজিক প্রবন্ধ (কর্তব্য নির্ণয়)

মামা

সেকালের রীতি ছিল ধামা ধরা
একালের রীতি হল মামা ধরা।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ শ্যালক (ছড়া সমগ্র)

মায়া

রূপের রেখায় মিলবে রসের রেখা,
মায়ার চিত্রলেখা,—
বস্তু হতে সেই মায়া তো
সত্যতর,
তুমি আমায় আপনি রচে
আপন কর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মায়া (মহুয়া)

দিবস ফুরায়, কোথা চলে যায়
মর্ত্যকায়া,
বাঁধা পড়ে থাকে ছবির রেখায়
ছায়ার ছায়া।
নিত্য ভাবিয়া করি যার সেবা
দেখিতে দেখিতে কোথা যায় কেবা
স্বপ্নে আসিয়া রচি দেয় তার
রূপের মায়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মায়া (সেঁজুতি)

জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি,
মর্ত্যে যেন না ভেঙে যায়
মিথ্যে মায়াগুলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ (ক্ষণিকা)

আমাদের দেশে মায়াবাদে সমস্ত সীমাকে মায়া বলিয়াছে। কিন্তু আসল কথা এই, অসীম হইতে বিযুক্ত সীমাই মায়া। তেমনি ইহাও সত্য, সীমা হইতে বিযুক্ত অসীমও মায়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সীমা ও অসীমতা (পথের সঞ্চয়)

জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে।.....এই মায়া বা অহং যেন মেঘের স্বরূপ। সামান্য মেঘের জন্য সূর্যকে দেখা যায় না—মেঘ সরে গেলেই সূর্যকে দেখা যায়। **রামকৃষ্ণ পরমহংস :** রামকৃষ্ণকথামৃত

দয়া আর মায়া এ দুটি আলাদা জিনিষ। মায়া মানে আত্মীয়ে মমতা ; যেমন বাপ-মা, ভাই-ভগ্নী, স্ত্রী-পুত্র, এদের উপর ভালবাসা। দয়া সর্বভূতে ভালবাসা ; সমদৃষ্টি। কারু ভিতর যদি দয়া দেখ যেমন বিদ্যাসাগরের, সে জানবে ঈশ্বরের দয়া। দয়া থেকে সর্বভূতের সেবা হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

তাঁর মহামায়াতে এই জগৎসংসার। এই মায়ার ভিতর বিদ্যা-মায়া অবিদ্যা-মায়া দুই-ই আছে। বিদ্যা-মায়া আশ্রয় করলে সাধু সঙ্গ, জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, বৈরাগ্য—এই সব হয়। অবিদ্যা-মায়া—পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয়—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ; যত ইন্দ্রিয়ের ভোগের জিনিষ ; এরা ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সংস্কার-দোষে মায়া যায় না, অনেক জন্মে এই মায়ার সংসারে থেকে থেকে মায়াকে সত্য বলে বোধ হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

অবিদ্যাজনিত মায়াকে সোঽহং রূপ খড়্গ দ্বারা বারবার আঘাত করিবে—মোক্ষদ্বার উদঘাটন হইবে।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী : বাণী

সংসারের ধর্মই এই—বড়ো যে সে মারে, ছোটো যে সে মার খায়। ইহার বিপরীত কথাটা, অর্থাৎ ছোটো-যে সেই মারে, বড়ো যে সেই মার খায়—শিখিতে বিস্তর বিলম্ব হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি—ভৃত্যরাজক তন্ত্র

অস্তর দিয়ে মারে প্রাণটাকে, আর শাস্তর দিয়ে মারে মনটাকে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তধারা

যারা মারে তারা ভোলে, যারা মার খায় তারা সহজে ভুলতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ—২

মার্কসবাদ

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিতে ইতিহাসকে বিচার করাই মার্কসবাদ।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : মুখবন্ধ—নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা

এমন ত হয়েই থাকে....।
মার্কস নিজেও তেমন মার্কসিস্ট নন।

শৈলেন্দ্রনাথ বসু : কবে কোন জামদগ্নি ঋষি-১২

মালা

ওই দেহখানি বুকে তুলে নেব, বালা,
পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তনু (কড়ি ও কোমল)

মালা যদি থাকে তো গলাও ঢের আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রকৃতির প্রতিশোধ—২

মালাটাই যে ঘোর সেকেলে,.....
আর কি ওটা চলে।

রিয়ালিস্‌টিক্ প্রসাধন যা নব্যশাস্ত্র পড়ি—
সেটা গলায় দড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালাতত্ত্ব (প্রহাসিনী)

শিশিরের মালা গাঁথা শরতের তৃণাগ্র-সূচিতে
নিমিষে মিলায়, তবু নিখিলের মাধুর্য-রুচিতে
স্থান তার চিরস্থির ; মণিমালা রাজেন্দ্রের গলে
আছে, তবু নাই সে যে, নিত্য নষ্ট প্রতি পলে পলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

মাস্টার

বড়মানুষের ঘরে মাস্টারের পদবীটা কী। গোয়ালঘরের ছেলেকে দুধ জোগাইবার যেমন গোরু আছে তেমনি তাহাকে বিদ্যা জোগাইবার একটা মাস্টারও রাখা হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মাস্টারমশায়

মিছা

মিছা কথা সিঁচা জল কতক্ষণ রয়॥ **ভারতচন্দ্র রায়** : অন্নদামঙ্গল

সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর। **ভারতচন্দ্র রায়** : অন্নদামঙ্গল

মিছিল

মিছিলের মাঝে তোমাকে দেখেছি
হৃদয়ে তুলেছো সিন্ধু।

অজিত পান্‌ডে : মিছিলের মাঝে তোমাকে

যখন যে দল পাওয়ারে আসে তারাই অফিস ছুটির পর রোজ একটা করে মিছিল বের করে। প্রতিটি ক্ষমতাসীন দলেরই ধারণা, বিদায়ী দল সংবাদপত্র ব্যবসাদার মিলে, ঘোরতর একটা চক্রান্ত করে ন্যাজেগোবরে করার তালে আছে।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : কলকাতায় চিত্রগুপ্ত (কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই)

সামনে মৃত্যুকবলিত দ্বার,
থাক অরণ্য, থাক না পাহাড়,
ব্যর্থ নোঙর, নদী হব পার, খুঁটি শিথিল।
আমরা এসেছি মিছিলে, গর্জে ওঠে মিছিল॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য : আমরা এসেছি (ঘুম নেই)

মিথ

সব বিশ্বাসই মিথে পরিণত হয় না, পরিণত হয় না মৌল প্রতিমাতে। ব্যক্তির বিশ্বাস ছাড়িয়ে যখন তা গোষ্ঠী মানুষের সামগ্রিক বিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়, আমাদের অবচেতনে তা রূপ পরিগ্রহ করে ; এক একটা নির্দিষ্ট রূপ যা আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব মনে হলেও, ঐ রূপান্তরিত রূপকে আমাদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না। কোথায় যেন আমাদের মনে ছায়া ফেলে, তার ভিতর নিজস্ব মুখের প্রতিবিম্ব দেখে আমরা বিস্মিত হই। আমরা নিজস্ব ধ্যান ধারণার অভিপ্রেত বলে স্বীকার করে নিই। যেমন স্বীকার করে নিই আদিম মানুষের রীতিনীতিকে, ট্যাবু ও টোটেমকে, প্রথা ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে, পুরাণ, কিংবদন্তী, অথবা লোকগাথা উপকথাকে।

অসীম রেজ : সাহিত্য মিথ ও ঐতিহ্যবিষয়ক

প্রাকৃত জগৎ যখন মানবিক জগতের মতো ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, প্রকৃতির কোনো বিষয় ও ব্যাপারকে যখন মানুষ বলে কল্পনা করে তাতে মানুষের কাজ আরোপিত হয় তাকেই myth-making বলা হয়েছে। রোমান্টিক কবিদের কল্পনাই 'মিথ' তৈরী করে।

Mythological কথাটার বাংলা করা হয় পৌরাণিক, সাধারণ মানুষ তাই Myth-কে পুরাণ বলেই গ্রহণ করেন। লৌকিক পুরাণ বা পুরা কাহিনী বলে সাহিত্যে যে জিনিষ কথিত হয় তাকেই ইংরাজিতে Myth বলা হয়।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ঃ বাংলা সাহিত্যের নানারূপ

মিথ্যা

মিথ্যা, আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ এবার ফিরাও মোরে (চিত্রা)

রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মতো উলঙ্গ, সত্যের মতো সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মতো স্বচ্ছ ; আর এখনকার দিনের সুচতুর মিথ্যা মুখোশ-পরা মিথ্যা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অসম্ভব কথা (গল্পগুচ্ছ)

এ তো বড়ো রঙ্গ জাদু, এ তো বড়ো রঙ্গ—
চার মিথ্যে দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ।
মিথ্যে ভেলকি, ভূতের হাঁচি, মিথ্যে কাচের পান্না—
তাহার অধিক মিথ্যে তোমার নাকি সুরের কান্না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রঙ্গ (প্রহাসিনী)

মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মিথ্যা ভেক ভাল নয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

মন ধোপা ঘরের কাপড়, যে- রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়। মিথ্যাতে অনেকক্ষণ ফেলে রাখলে মিথ্যার রঙ ধরে যাবে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

মিনতি

মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল এ দেহ সমপিলু
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।।

বিদ্যাপতি ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাধ
ঘটে যদি পরমাদ
মধুহীন করো না গো তব মনঃ কোকনদে।

মধুসূদন দত্ত ঃ বঙ্গভূমির প্রতি

মিনতি মম শুন হে সুন্দরী
আরেক বার সমুখে এসো প্রদীপ খানি ধরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাগরিকা (মহুয়া)

মিলন

উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধমে উত্তমে॥

ভারতচন্দ্র রায় : অন্নদামঙ্গল

কার মিলন চাও বিরহী—
তাঁহারে কোথা খুঁজিছ ভব-অরণ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিলিপি ১

তোমায় আমায় মিলন হবে বলে আলোয় আকাশ ভরা।
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে ফুল্ল শ্যামল ধরা॥
তোমায় আমায় মিলন হবে বলে
রাত্রি জাগে জগৎ লয়ে কোলে
উষা এসে পূর্বদুয়ার খোলে কলকণ্ঠস্বরা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতলেখা

প্রতি অঙ্গ কাঁদে তব প্রতি অঙ্গ তরে।
প্রাণের মিলন মাগে দেহের মিলন
হৃদয়ে আচ্ছন্ন দেহ হৃদয়ের ভরে
মুরছি পড়িতে চায় তব দেহ-পরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : দেহের মিলন (কড়ি ও কোমল)

শুভখন আসে সহসা আলোক জ্বেলে
মিলনের সুধা পরম ভাগ্যে মেলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিণয় (মহুয়া)

নিশিদিন কাঁদি, সখি, মিলনের তরে—
যে মিলন ক্ষুধাতুর মৃত্যুর মতন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পূর্ণ মিলন (কড়ি ও কোমল)

এ মিলন ঝড়ের মিলন,
কাছে এনে দূরে দিল ঠেলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্যর্থ মিলন (বীথিকা)

দুখের মিলন টুটিবার নয়—
নাহি আর ভয়, নাহি সংশয়।
নয়নসলিলে যে হাসি ফুটে গো
রয় তাহা রয়.....চিরদিন রয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা—৭

মধুরের সঙ্গে কঠোরের মিলন হলে তবেই হয় হর-পার্বতীর মিলন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ বর্ষণ

অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্য তারপর থেকে মিলনটাকে এতো অবহেলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা - ১১

পেটভরা মিলনে সুর চাপা পড়ে, একটু ক্ষুধা বাকি রাখা চাই, কবিরাজরা এমন কথা বলে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্রাবণগাথা

আপনাকে না ভুললে মিলন হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্যের তাৎপর্য (সাহিত্যের পথে)

মিষ্ট

যাহা সহজেই মিষ্ট তাহাতে অতি শীঘ্র মনের আলস্য আনে, বেশিক্ষণ মনোযোগ থাকে না। অবিলম্বেই তাহার সীমায় উত্তীর্ণ হইয়া মন বলে, আর কেন, ঢের হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কেকাধ্বনি (বিচিত্র প্রবন্ধ)

মনে ঠিক জেনো, আসল মিষ্টি,
কথার সঙ্গে রুপোর বৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লক্ষ্মীর পরীক্ষা (কাহিনী)

মুক্ত

এসো মুক্ত কর, মুক্ত কর অন্ধকারের এই দ্বার,
ছিন্ন কর, ছিন্ন কর বন্ধনের এ অন্ধকার॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ঃ এসো মুক্ত কর

মুক্তি

অখণ্ড সচ্চিদানন্দের অনুভূতি ভিন্ন মুক্তি নেই।....মুক্তি মানে.....ভগবানের সঙ্গে একাত্মবোধ। যোগসাধনা ভিন্ন তা সম্ভব নয়। উপনিষদে দুটি পাখির রূপক বর্ণনা আছে। একটি গাছের দুটি ডালে ওপরে নীচে দুটি পাখি বসে রয়েছে। নীচের পাখিটা মিষ্ট ফল খাচ্ছে, কটু ফল খাচ্ছে,—ওপরের পাখি নির্বিকার অবস্থায় বসে আছে, সুখ-দুঃখে উদাসীন, নিজ মহিমায় মগ্ন। একটি পরমাত্মা, অপরটি ইন্দ্রিয়সুখমগ্ন জীবাত্মা। নীচের পাখিটি যখন ওপরে উঠে ওপরের পাখিটির সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে—তখনই তার মুক্তি।

তদা বিদ্বান পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ দেবযান

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হল বলিদান,
লেখা আছে অশ্রুজলে।
কত বিপ্লবী বন্ধুর রক্তে রাঙা
বন্দিশালার ঐ শিকল ভাঙা ;
তারা কি ফিরিবে আর সুপ্রভাতে
কত তরুণ অরুণ গেছে অস্তাচলে।

মোহিনী চৌধুরী ঃ গান

বদ্ধ ফিরিছে খুঁজিয়া আপন মুক্তি,
মুক্তি মাগিছে বাঁধনের মাঝে বাসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—১৭

মুক্তি? ওরে মুক্তি কোথায় পাবি,
মুক্তি কোথায় আছে।
আপনি প্রভু সৃষ্টিবাঁধন প'রে
বাঁধা সবার কাছে।
রাখো রে ধ্যান থাক্ রে ফুলের ডালি,

ছিঁড়ুক বস্ত্র, লাগুক ধুলাবালি,
কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
ঘর্ম পড়ুক ঝরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—১১৯

রাত্রে একলা বসে কখনও মৃত্যুর স্নিগ্ধ সুগভীর মুক্তি অনুভব করেছ, যার মধ্যে চিরকালের ক্ষমা?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চার অধ্যায়—৪

বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—৩০

বাহিরে মুক্তিরে ব্যর্থ খুঁজি,
অন্তরে বন্ধন করি পুঁজি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রতীক্ষা (মহুয়া)

মুক্তি এই—সহজে ফিরিয়া আসা সহজের মাঝে,
নহে কৃচ্ছ্রসাধনায় ক্লিষ্ট কৃশ বঞ্চিত প্রাণের
আত্ম-অস্বীকারে। রিক্ততায় নিঃস্বতায় পূর্ণতার
প্রেতচ্ছবি ধ্যান করা, অসম্মান জগৎলক্ষ্মীর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রান্তিক—৬

মুক্তি নানা মূর্তি ধরি দেখা দিতে আসে নানা জনে—
এক পন্থা নহে।
পরিপূর্ণতার সুধা নানা স্বাদে ভুবনে ভুবনে
নানা স্রোতে বহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তি (পূরবী)

মর জনমের পুরা দাম দিব যেই,
তখনই মুক্তি পাওয়া যাবে সহজেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

কর্মকে পরিত্যাগ করাই মুক্তি নয়, কর্মকে আনন্দোদ্ভব কর্ম করাই মুক্তি।.....মুক্তি বৈরাগ্যের মুক্তি নয়,.....মুক্তি প্রেমের মুক্তি। ত্যাগের মুক্তি নয়, যোগের মুক্তি। লয়ের মুক্তি নয়, প্রকাশের মুক্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মুক্তি (শান্তিনিকেতন)

রিক্তবৃষ্টি জ্যোতিঃশুভ্র মেঘে মেঘে মুক্তির লিখন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্রাবণ-বিদায় (নটরাজ)

মুক্তি যেখানে বন্ধনকে অস্বীকার করে সেখানে তাহা উন্মত্ততা, বন্ধন যেখানে মুক্তিকে মানে না সেখানে তাহা উৎপীড়ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সীমা ও অসীমতা (পথের সঞ্চয়)

আমরা সবাই নিজেদের মনের মধ্যে একটা মুক্তির জায়গা তৈরি করে রাখি। সেখানে হয়তো কোনওদিন পৌঁছোনো যায় না। তবু ওটা আমার নিজস্ব জায়গা। ওখানেই আমার জীবনযাপনের স্বপ্নমাধুর্য ভেসে বেড়ায় পাখির মতো। কল্পনার ডানাদুটোকে যতটা সম্ভব টানটান করে ভাসতে থাকে একটি, দুটি, তিনটি পাখি। সংখ্যা দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের গোনা যায় না।

হর্ষ দত্ত : ও শিমুল, ও পলাশ

মুক্তিযুদ্ধ/মুক্তিসংগ্রাম

অসীম সমুদ্রে ভাসমান দূরগামী জাহাজের নাবিকের কাছে বাতিঘরের আলোক-স্তম্ভের মতো, মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রামী জাতিসত্তাকে নতুন আশা আর আকাঙ্ক্ষার বাণী শোনায় প্রতিনিয়ত। মুক্তিযুদ্ধের বৃহত্তম প্রেক্ষাপট নির্মাণে একটি দেশের জাতীয় সংস্কৃতি পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ ঃ বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের নাট্য সাহিত্যের ধারা
(থিয়েটার, ঢাকা, সেপ্টেম্বর '৯৭)

মুখ

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে পড়ে তার আছে কতগুলা॥

ভারতচন্দ্র রায় ঃ অন্নদামঙ্গল

মুখ তার আবছায়া অশ্রুর কুয়াশা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ রোদের প্রার্থনা—সাগর থেকে ফেরা

একটুখানি সোনার বিন্দু, একটুখানি মুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আদরিণী (ছবি ও গান)

মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয় মনে—
ফিরেছ কি ফের নাই বুঝিব কেমনে॥
আসন দিয়েছি পাতি, মালিক রেখেছি গাঁথি,
বিফল হল কি তাহা ভাবি খনে খনে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (স্বরবিতান ২)

মুখখানি কর মলিন বিধুর যাবার বেলা—
জানি আমি জানি, সে তব মধুর ছলের খেলা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (স্বরবিতান ৫৩)

সদ্য বিকশিত সুগন্ধি পুষ্পমঞ্জরীতুল্য একখানি চুম্বনোন্মুখ মুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চোখের বালি—৩৬

সেই শুভ্র সুকোমল কমল-উন্মীল
অপরূপ মুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিশোধ (কথা)

দেবী নেমে আসে
মানবী হইয়া, যারে ভালোবাসে
তার মুখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিসর্জন—১।৩

নবস্ফুট পুষ্পসম
হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃন্ত নিরুপম
মুখখানি তুলে ধোরো ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

বিকচ কুসুম-সম ফুল্লমুখখানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

কুন্তল-আকুল মুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

মনোহরণের প্রধান সিঁধ—মুখটিতে কোনো প্রকার মরচে না পড়লেই হল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র—৮

মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১৪

মুখখানি তার
নতবৃন্ত পদ্মসম এ বক্ষে আমার
নমিয়া পড়িল ধীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বপ্ন (কল্পনা)

দোলনচাঁপার মতো চিকনগৌর মুখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হঠাৎ দেখা (শ্যামলী)

মুখোশ

দুঃখের মুখস পরা সংসারের সুখ॥

দেবেন্দ্রনাথ সেন ঃ অশোকগুচ্ছ

শ্রী, মিশ্র, অশ্রু ঃ তালব্য শ'এর মুখোশ পরেছে কিন্তু আওয়াজ দিচ্ছে দন্ত স'এর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়

মুনাফা

মুনাফার দাস আজও বিজ্ঞান।—চাই এই মুনাফার দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি।

গোপাল হালদার ঃ আর একদিন (ত্রিদিবা)

বড়লোকের বাড়ীর বেড়ালটা পর্যন্ত মুরুব্বী।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ স্বর্ণলতা

মুসলিম/মুসলমান

কিছু ছাত্রী নিবাসের মুসলিম মেয়েদের .....অদ্ভুত একটা ক্ষোভ দেখেছিলাম। ওরা বলল, আমরা গোঁড়া সবাই জানে। এমনকি নিজেরাও প্রকাশ্যে সমালোচনা করি। কিন্তু ওরা (অর্থাৎ হিন্দু মেয়েরা) যে গোঁড়া সেটা জানে না, মানেও না।.....ঈশ্বর মানাটা যদি গোঁড়ামী হয়, তবে ওরা আমাদের চেয়েও গোঁড়া। কারণ হোস্টেলে প্রায় বন্ধুদের টেবিলেই ঠাকুরের ছবি থাকে। সকাল সন্ধে প্রণাম করে। কখনো কখনো উপোস করতেও দেখি। মাঝে মধ্যে মন্দিরে তো যায়ই। অথচ মুসলমান মেয়েরা হোস্টেলে কেউ রোজা, নামাজ পড়ে না। কিন্তু এগুলি বাড়িতে পালন করি শুনলেই গোঁড়া ধরে নেয়।

আফরোজা খাতুন ঃ মুসলমান মেয়ে হওয়ার সমস্যা
(প্রতিক্ষণ, মার্চ ৮৯)

মুসলিম

পু॥ (আমি) মুসলিম যুবা, মোর হাতে বাঁধা আলির জুলফিকার।
স্ত্রী॥ (আমি) মুসলিম নারী জ্বালিয়া চেরাগ ঘুচাই অন্ধকার॥......
পু॥ (আমি) জিনিব পৃথিবী আছে মোর আশা,
স্ত্রী॥ (আমি) প্রাণে দিব তেজ, বুকে ভালোবাসা।
উভয়ে॥ মুসলমি নর মুসলিম নারী দুধারী তলোয়ার॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ বনগীতি

মোরা একই বৃন্তে দুটী কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥
এক সে আকাশ মায়ের কোলে/যেন রবি-শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক যে নাড়ীর টান॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ সুরসাকী

মুসলমানের জাত, নেমকহারামের জাত নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সাজাহান ১/৬

বিশ শতকের গোড়া থেকেই এই মুসলমান মধ্যশ্রেণী চাকরী, ব্যবসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ছিল দুর্বলপক্ষ। সেই হিসেবে ইংরেজের ওপর রাজনৈতিক দিক দিয়ে তারা তুলনায় অনেক বেশি নির্ভরশীল ছিল। অন্যদিকে এই প্রতিযোগিতার মুখে তাদের মধ্যে যে জাত্যভিমান সৃষ্টি হয় সেই জাত্যভিমানের বশবর্তী হয়ে তারা ভারত ও বাংলাদেশকে বিদেশ জ্ঞান করে আরব, ইরান, তুর্কীর সঙ্গে অধিকতর সাংস্কৃতিক যোগ কল্পনা করে এক উদ্ভট সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাত্ব নিজেদের সমাজে সৃষ্টি করে। এই সংস্কৃতিকে তারা 'মুসলিম সংস্কৃতি' নাম দিয়ে বিশ শতকের চারের দশকে তার যে রাজনৈতিক সংস্করণ খাড়া করে সেই রাজনৈতিক সংস্করণের নামই হলো পাকিস্তান।

বদরুদ্দীন উমর ঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও
উনিশ শতকের বাঙালী সমাজ

মুসলমান

অন্যান্য জাতির থেকে মুসলমানরা মহান; তারা ধর্ম, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে কেমন পূর্ণ সাম্য ও সাম্যবোধের পরিচয় দেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুগণ

সাম্যবাদের একটি অতি মনোহর শক্তি আছে। মুসলমান ধর্ম সেই সাম্যবাদ বলে বলীয়ান এবং পৃথিবীর মধ্যে মুসলমানই প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্যধর্মী। ফলত মুসলমান সমাজের মূল প্রকৃতি সমতা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ সামাজিক প্রকৃতি—হিন্দু এবং অপরাপর সমাজ

আমি যখন প্রথম আমার জমিদারি কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য-আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিন্দুমুসলমান (কালান্তর)

ভারতবর্ষের অধিবাসীদের দুই মোটা ভাগ, হিন্দু ও মুসলমান। যদি ভাবি মুসলমানদের অস্বীকার করে এক পাশে সরিয়ে দিলেই দেশের সকল মঙ্গলপ্রচেষ্টা সফল হবে, তা হলে বড়োই ভুল করব।......আমাদের সবচেয়ে বড়ো অমঙ্গল বড়ো দুর্গতি ঘটে যখন মানুষ মানুষের পাশে রয়েছে, অথচ পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ নেই। অথবা সে সম্বন্ধ বিকৃত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বামী শ্রদ্ধানন্দ (কালান্তর)

খবরদার....., বেইমান কয়ো না, মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি—ও পারি না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পল্লীসমাজ

মুসলিম নারী

স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠনের দায়িত্ব কেবল পুরুষের নয়, নারীরও। সুতরাং নারীসমাজকেও সে দায়িত্ব নিতে হবে।.....মুসলিম সমাজের নারীমহলের মধ্যেও শিক্ষার আলোক বিস্তার করতে হবে। তাঁরা ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের সঙ্গে মুসলিম নারীসমাজের শিক্ষা ও উন্নতির প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

রেজাউল করিম : শিক্ষা মুসলিম নারী

মূকাভিনয়/মূকাভিনেতা

শিল্পক্ষেত্রে মূকাভিনয়টা হচ্ছে visual language যা সব থেকে বেশি universal তথা সব থেকে বেশি communicative. কথার যে medium তা দিয়ে দেশে-বিদেশে যারা সেই ভাষা বোঝে না তারা সেই modulation ও ভাব ভঙ্গিতে তার একটা আন্দাজ করতে পারে মাত্র কিন্তু দেখার ব্যাপারটা সকলের কাছেই এক। এই দেখার ব্যাপারে যে চিত্র বা ছবি যেটাই তৈরী হোক না কেন—যেমন, একজন রাগী লোকের চেহারা, একজন লোকের খুশী মন বা তার দুঃখ অথবা একটা চোর চুরি করতে যাচ্ছে বা আর একজন হতাশ হয়ে যাচ্ছে বা একজনের বিষণ্ণভাব এইগুলির যে universal appeal সেটা একজন মূকাভিনেতা কোন সাহায্য ছাড়াই সার্থকভাবে করতে পারেন তাঁর গভীর অনুশীলন ও চর্চার দ্বারা এবং তাঁকে সার্থকভাবে এগিয়ে দিতে আলোই হল তার অন্যতম বাহন যা এই communication টাকে সার্থক করে তুলতে পারে অন্য সব কিছুর থেকে বেশি। **তাপস সেন : মূকাভিনয়ম (যোগেশ দত্ত)**

মনের ভাব, মুখের অভিব্যক্তি, শরীরী ভাষা এই তিনের মিলনে হয় মূকাভিনয়।

নিরঞ্জন গোস্বামী :

মূকাভিনয় শিল্পকলারই একটি অঙ্গ ; সৃজনীমূলক অভিনয় যদি সত্যি আমাদের আবেগ প্রকাশ করে এবং অপরকে সেই বোধগম্যতায় সাহায্য করে, তাহলে একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, মূকাভিনয় বাস্তবিকই শিল্পকলারই একটি অঙ্গ। কারণ অভিনয়ের বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত ও ভাব প্রকাশের জন্য মূকাভিনয় একান্ত অপরিহার্য, কখনো কখনো বা একমাত্র উপজীব্য। এও দেখা যায় যে, বিশেষ বিশেষ ভাব বা রসের শৈল্পিক রূপায়ণে মূকাভিনয়ই একমাত্র বা অমর মাধ্যম হয়ে ওঠে।

যোগেশ দত্ত : লেখকের কথা—মূকাভিনয়

মৌন অভিব্যক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের আবেগ ও উৎকণ্ঠা, সুখ, দুঃখ, উল্লাস ও আতঙ্ককে জীবন্ত করে তোলার এবং শুধুমাত্র অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিঃশব্দ সঞ্চালনের দ্বারা গতিশীল জীবনের কোনো রূপ ও আকার ফুটিয়ে তোলার যে শিল্পকৌশল তাকেই বলে mime বা মূকাভিনয়।

যোগেশ দত্ত : লেখকের কথা—মূকাভিনয়ম্

মূকাভিনেতার তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি ,অনুভব প্রবণতা, কূটবুদ্ধি, দ্রুত ধারণা গঠনের শক্তি, বিষয়বস্তু নির্বাচন শক্তি এবং বিচার ক্ষমতা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন। একটি নিখুঁত মূকাভিনয়ের জন্য সর্বাঙ্গের নিখুঁত পরিমাপযুক্ত দেহ থাকা প্রয়োজন। তাহাদের দেহের স্বাভাবিক গতিভঙ্গি অতি সহজ ও অনায়াস হইতে হইবে এবং দেহ দ্রুত নমনীয় ও দৃঢ় হওয়া চাই, যাহাতে আবশ্যক মত সে যাবতীয় প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে। সুগঠিত দেহের সঙ্গে সঙ্গে মূকাভিনয়ের মানসিক প্রস্তুতি, শিক্ষা ও সম্পূর্ণতা আয়ত্ত করিতে হয়।

শ্যামমোহন চক্রবর্তী : প্যান্টোমাইম

যথার্থ শিল্পী মূকাভিনয়কেও করে তুলতে পারেন বাঙ্ময়।

সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় : আনন্দবাজার পত্রিকা (১৪.৯.৯১)

মূর্খ

যে আপন মুখে আপনার বড়াই করে, সে অতিবড় মূর্খ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : অতি অল্প হইল

যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যাহার বিদ্যাপ্রকাশ পায়, সেই মূর্খ। যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : দেবী চৌধুরাণী

যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্খ বলিও না। আর যে লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহাকেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠে ভিন্ন অন্য প্রকারে উপার্জিত হইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ধর্মতত্ত্ব

মূর্খ ধমকায় পণ্ডিতেরে যদি কড়ি থাকে।
নির্ধনের সত্য কথা মিথ্যা হেন লাগে॥

বাংলা প্রবাদ

মূর্খ যে, বিদ্যার মূল্য কভু কি সে জানে?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত : কুক্কুট ও মণি

মূল্য

যে মূল্যে মুগ্ধতা কিনেছি
তা দিয়ে কি যন্ত্রণাও কিনে নেয়া যায়!

গোবিন্দ ভট্টাচার্য : বিমূঢ় নিজেকে (অসমাপ্ত পুতুল খেলা)

মানুষ বস্তুর চেয়ে অবস্তুকে বেশি মূল্যবান জ্ঞান করে, সোনার চেয়ে বানী, প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড়ো মনে করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গল্পগুচ্ছ—গিন্নি

সংসারের মূল্যে ধর্মের মূল্য নয়। সোনার দাম আর আলোর দাম কি এক?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটীর পূজা

দারিদ্র্যের মূল্য বেশি লুপ্তমূল্য ঐশ্বর্যের চেয়ে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (নবজাতক) রাজপুতানা

পৃথিবীতে মূল্য না দিয়া.......কিছুই পাওয়া যায় না, এবং সে মূল্য......দুঃখের মূল্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গল্পগুচ্ছ—রাসমণির ছেলে

দিনে দিনে মোর কর্ম আপন দিনের মজুরী পায়।
প্রেম সে আমার চিরদিবসের চরম মূল্য চায়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

মধু তার নিজ মূল্য নাহি জানে,
মধুকর তারে না বাখানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্যামলী (মহুয়া)

মৃৎশিল্প

মৃৎশিল্প প্রাকৃতস্তরের শিল্প ; প্রাচীন ভারতীয় ধারণায় এই শিল্প অপভ্রংশ পংক্তির শিল্প ; অভিজাত সংস্কৃত স্তরের শিল্পের সঙ্গে একাসনে ইহার স্থান কোথাও নাই—শিল্পশাস্ত্রেও না।....জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সৃজনক্রিয়ার এইসব নিদর্শন উচ্চকোটি ও সংস্কৃত শিল্পসাধনার নিপুণতর নিদর্শনের পাশে কোথাও দাঁড়াইবার সুযোগ পায়-নাই, সে স্পর্ধাও ছিল না।

নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালির ইতিহাস

মৃত্যুকে যারা ভয় পায় না, মৃত্যুর মুখে পা রেখে যারা ঘোষণা করে জীবন অবিনশ্বর—আঁধারপুরীর দৈত্যদানবেরা চিরকাল তো তাদের ভয়েই কেঁপে মরে।

অমল রায় ঃ বন্দীশালার ডাক

মানুষের চেতনার মৃত্তিকাকে মৃত্যু নিয়ত উর্বরা করে চলেছে। মৃত্যুই পারে মানুষকে দিতে মৃত্যুঞ্জয়ী সাহস।

অম্লান দত্ত ঃ প্রবন্ধ সংগ্রহ

আমি তো মৃত্যুর কাছে, গভীর কালো
ঘুম আমাকে তার তীব্র গ্রাসে
মুহূর্তে করে দেবে নিঃশেষ আমাকে,
আমি কোনও সমুদ্রের তলদেশে
ভাঙা জাহাজের ভিতর বসে লিখব
তোমার জীবনী।

অমিতেশ মাইতি ঃ মৃত্যুর উচ্ছ্বাস

পুনর্জন্ম, মৃত্যু মানে আলো আরও আলো
মৃত্যু মানে দুঃখের সমুদ্র সাঁতরে
সঙ্গোপনে রাত্রি পোহানো।

অমিতেশ মাইতি ঃ মৃত্যুর উচ্ছ্বাস

সুন্দর বেশে মৃত্যু আমার আসিলে কি এতদিনে?
বাজালে দুপুরে বিদায় পূরবী আমার জীবন-বীণে!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান—বন-গীতি

মহাকাল বা মৃত্যুর কাছে ধন-জন-যৌবনের গর্ব অকিঞ্চিৎকর। পৃথিবীতে যত অপরূপ, একদিন সবই মৃত্যুর মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।.....মৃত্যুর কাছে কোনও প্রশ্ন নয়, কোনও জ্ঞানের প্রকাশ নয়, এখানে কেবলই আত্মসমর্পণ।

চিত্তরঞ্জন মাইতি ঃ সত্যবতীর শাখা প্রশাখা

হে মৃত্যু,
তুমি আমাকে ছেড়ে চলছো বলে আমি খুব গভীর খুশি?
কিন্তু আরো-খানিকটা চেয়েছিলাম ;
চারিদিকে তুমি হাড়ের পাহাড় বানিয়ে রেখেছো ;—
যে ঘোড়ায় চড়ে আমি
অতীত-ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাবো
এইখানে মৃতবৎসা, মাতাল, ভিখারি ও কুকুরদের ভিড়ে
কোথায় তাকে রেখে দিলে তুমি?

জীবনানন্দ দাশ ঃ মুহূর্ত (মহাপৃথিবী)

মৃত্যুরে বন্ধুর মত ডেকেছি তো,—প্রিয়ার মতন।—
চকিত শিশুর মত তার কোলে লুকায়েছি মুখ।

জীবনানন্দ দাশ ঃ জীবন—২৫ (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

......সাম্রাজ্য—রাজ্য—সিংহাসন—জয়—
মৃত্যুর মতন নয়,—মৃত্যুর শান্তির মত নয়!......
মানুষের মত হয়ে মানুষের মত চোখ মেলে
মানুষের মত পায়ে চলিতেছি যতদিন,—তাই,
ক্লান্তির পরে ঘুম,—মৃত্যুর মতন শান্তি চাই!

জীবনানন্দ দাশ ঃ প্রেম (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

সব রাঙা কামনার শিয়রে সে দেয়ালের মত এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ।

জীবনানন্দ দাশ : মৃত্যুর আগে (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এই সব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে ;
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা,
কিংবা প্যাঁচার গান ; সেও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো!

জীবনানন্দ দাশ : শীতরাত (মহাপৃথিবী)

মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারের অচল অভ্যাসের ভিতর।

জীবনানন্দ দাশ : হঠাৎ মৃত (মহাপৃথিবী—আমিরশাহী তরবার)

পিঙ্গলকেশা, পিঙ্গলনেত্রা, পিঙ্গলবর্ণা ; গলদেশে ও মণিবন্ধে পদ্মবীজের ভূষণ, অঙ্গে গৈরিক কাষায়। ভগবান প্রজাপতি বললেন—তুমি আমার কন্যা। তুমি মৃত্যু।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য-নিকেতন

অবগুণ্ঠনময়ী, দূর থেকে তাকে চেনা যায় না। তাকে দেখে ভয় হয়, কারণ সে আসে জ্বালাযন্ত্রণাময়ী ব্যাধির পশ্চাদনুসরণ করে—কালবৈশাখীর ঝড়ের অনুসারিণী বর্ষণধারার মতো। প্রচণ্ড বিক্ষোভে ব্যাধির জ্বালায়, যন্ত্রণায় জীবনের উপর তোলে বিক্ষোভ, মৃত্যু আসে বর্ষাধারার মতো সকল জ্বালা-যন্ত্রণার বিক্ষোভ জুড়িয়ে দিয়ে, প্রশান্ত স্নিগ্ধ করে দেয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আরোগ্য নিকেতন

মাঝে মাঝে অভিমানী রাগ হয়   মৃত্যুর ওপর।
আসছি এখনি বলে চলে গেছে সে ঘুর পথে।

তুষার রায় : হাসপাতালের কবিতা-৭

মৃত্যুকে ভয় করলে জীবনকে ভালবাসা যায় না।

দুলেন্দ্র ভৌমিক : আততায়ী

মৃত্যুদ্বারে নারে কেহ দিবারে কপাট।

দৌলত কাজী : সতী ময়না।

মৃত্যু কি কঠিন সত্য! জীবন কি আশ্চর্য বিস্ময়!

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত : বাইশে শ্রাবণ

মৃত্যু কি সকলই নেয়? মৃত্যু কি সকলই নিতে পারে?
তাহলে কী নিয়ে থাকে, যাদের নেয়নি মৃত্যু, তারা?
আসলে সে যায়, সেও সমগ্রত যায় না ও-ধারে,
লুকিয়ে থেকেও তবু বন্ধুদের দিয়ে যায় সাড়া।
তখনও সে ভালবাসে ; মনে রাখে, কাছে ছিল কারা ;
নির্জন মুহূর্তে এসে চিত্তের দুয়ারে কড়া নাড়ে।
সহসা শ্রবণে ঝরে তারই অমলিন হাস্যধারা।
অর্থাৎ স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থেকে মৃত্যুকে সে মারে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : অর্থাৎ স্মৃতির মধ্যে

এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন সম্বন্ধে আমরা নিরন্তর সন্ত্রস্ত, কেবলই আমাদের সতর্কতা ; অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর দিকে আমরা ক্ষণে ক্ষণে তাকাই, প্রতিদিন প্রভাত থেকে রাত্রি পর্যন্ত মৃত্যুর কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে সবাই আমরা ক্লান্ত হয়ে উঠি। অথচ জানি একদিন আর পালাতে পারবো না, ধরা একদিন দিতেই হবে। এত সাজসজ্জা, এত বিলাস, এত ভোগ ও তিতিক্ষা, এত দুঃখ ও প্রেম—সমস্ত আয়োজন

মৃত্যুর দিকেই, সকল উপকরণ দিয়ে একদিন আত্মবলি দিতেই হবে মৃত্যুর পদতলে। অজ্ঞান মানুষের স্থায়িত্বের প্রতি তাই এত প্রলোভন। কেউ গড়ে তাজমহল, কেউ পিরামিড্, কেউ বা মহাপ্রাচীর। মৃত্যুর কোনো সান্ত্বনা নেই, সে অকরুণ, তার ষোলো আনা প্রাপ্য এক সময়, চুকিয়ে নেবেই। আশী লক্ষ জীবের সঙ্গে মানুষও তার চোখে সমান। মানুষ বলে কোনো বিশেষ সম্মান অথবা পক্ষপাতিত্ব তার কাছে নেই, তার ধ্বংসের সম্মার্জনী ঝেঁটিয়ে সবাইকে এক-একবার সাফ করে দিচ্ছে। আজ যারা নবীন, যাদের চোখে নতুন আলো, নব উদ্যম ও অনুপ্রেরণা, কাল তারা পককেশ ও প্রবীণ, সংসার থেকে তাদের প্রয়োজন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল, তারা আবার ছুটলো মৃত্যুর গর্ভে। দুরন্ত উল্লাসে বারে বারে তারা ছুটে আসে, দুর্দান্ত তাড়নায় বারে বারে তারা ছুটে পালায়। এর নাম জীবন।

প্রবোধকুমার সান্যাল ঃ মহাপ্রস্থানের পথে

মৃত্যু যাকে
ভালোবাসে, তার কীর্তি গৌরব কাহিনী রাজ্যপাট
সমস্ত নিয়েও বুঝি তৃপ্তি নেই ! ব্যথিত আত্মার
অবশিষ্ট আলো এসে ঢেকে দেবে দস্যু অন্ধকার।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় ঃ কালক্রমে সব কিছু ভুলে যাবো
(দর্পণে অনেক মুখ)

সমস্তজীবন ধরে মৃত্যুদণ্ড প্রার্থনা আমার।

পরেশ মণ্ডল ঃ মুক্তি

মৃত্যুরে কে মনে রাখে?
—মৃত্যু সেতো মুছে যায়।
যে-তারা জাগিয়া থাকে তারে লয়ে জীবনের খেলা,
ভুবনের মেলা।
যে-তারা হারালো দ্যুতি, যে-পাখি ভুলিয়া গেল গান,
যে-শাখে শুখালো পাতা
এ-ভুবনে কোথা তার স্থান?

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ মৃত্যুরে কে মনে রাখে

মৃত্যুর কাছাকাছি গেলে ভগবানের কথা মনে আসবেই। তুমি যত বড় নাস্তিকই হও।

বাণী বসু ঃ একুশে পা

ওপাশে মৃত্যুর ঘর, এপাশে জীবনের
পর্দাফেলা মাঝে।
মাঝে মাঝে পর্দা তুলে উঁকি দিয়ে দেখি
আমার মিহিন জামা বসে বসে মৃত্যু একা
বুনেই চলেছে।

ব্রত চক্রবর্তী ঃ কয়েক টুকরো—নয় (ঘুরেছি, খুঁজেছি)

তোমরা আমাকে যারা ভুল বুঝে দূরে সরে আছো
আমার মৃত্যুর পর কাছে এসো।

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ঃ হাওয়া চিঠি

মৃত্যুর সামনে মানুষ যেমন অসহায় বোধ করে, তেমনি আবার বেপরোয়াও হয়ে যায় বোধ হয়। মৃত্যু যেমন বৈরাগ্য আসে, আবার সাহসও বাড়ায়।

বিমল মিত্র ঃ ইণ্ডিয়া

যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা তাহা চিরকাল সেইখানেই যদি অবিকৃত ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা একটা চিরস্থায়ী সমাধি মন্দিরের মতো অত্যন্ত সংকীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত।......মৃত্যুর অভাবে কোনো বিষয়ে কোথাও দাঁড়ি দিবার জো থাকিত না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অপূর্ব রামায়ণ (পঞ্চভূত)

মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তারাই জানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিঠি (পূরবী)

আস্ফালিছে লক্ষ লোল যেন জিহ্বা নিষ্ঠুর নীলিমা—
তরঙ্গতাগুবী মৃত্যু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জয়ী (বীথিকা)

জীবন আমার
এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়—
মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়,
স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে,
মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্থানান্তরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য-৯০

মৃত্যু বাঁধন ছিন্ন করে দেবে, এইটেই কুৎসিত। আপনি বাঁধন আলগা করে দিয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে তার হাত ধরব, এইটেই সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—১৪.২.২৫

মৃত্যু একটা একান্ত কালো কঠিন কষ্টিপাথরের মতো। ইহারই গায়ে কষিয়া সংসারের সমস্ত খাঁটি সোনার পরীক্ষা হইয়া থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মা ভৈঃ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

সংসার যে এতই মিথ্যা, তা যে কেবল স্বপ্ন, কেবল মরীচিকা, নিশ্চিত মৃত্যুকে স্মরণ করে শাস্ত্র সেই কথা চিন্তা করবার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। নতুবা আমরা কিছুই ত্যাগ করতে পারিনে, এবং ভোগের বন্ধনে জড়িত থেকে আত্মা নিজের বিশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মৃত্যু ও অমৃত (শান্তিনিকেতন)

মৃত্যু তোর হোক দূরে নিশীথে নির্জনে
হোক সেই পথে যেথা সমুদ্রের তরঙ্গগর্জনে
        গৃহহীন পথিকেরি
নৃত্যছন্দে নিত্যকাল বাজিতেছি ভেরী।......
        মৃত্যু সে যে পথিকেরে ডাক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মৃত্যুর আহ্বান (পূরবী)

মৃত্যুর ধর্মই এক প্রাণধর্ম নানা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

প্রাণেরে মৃত্যুর ছাপ মূল্য করে দান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

মৃত্যু যেদিন বলবে, 'জাগো,
        প্রভাত হল তোমার রাতি'

নিবিয়ে যাব আমার ঘরের
চন্দ্র সূর্য দুটো বাতি।......
বন্ধুভাবে কণ্ঠে সে মোর
জড়িয়ে দেবে বাহুপাশ
বিদায় কালে অদৃষ্টেরে
করে যাব পরিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হতভাগ্যের গান (কল্পনা)

বেঁচে থাকা অর্থহীন জেনেও কেন যে মৃত্যুর এত ভয়?

সুচিত্রা ভট্টাচার্য ঃ আলোয় ছায়ায়

মৃত্যুটা যত বড়ই হোক না—
জীবনের চেয়ে এমন কিছু সে
ঢ্যাঙা নয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ কমরেড স্তালিন

মেঘ

মেঘ-বিহীন খর বৈশাখে
তৃষ্ণায় কাতর চাতকী ডাকে।
সমাধি-মগ্না উমা তপতী
রৌদ্র যেন তাঁর তেজ জ্যোতিঃ
ছায়া মাগে ভীতা ক্লান্ত কপোতী
কপোত-পাখায় শুষ্ক শাখে॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান—রাগপ্রধান

মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি?
ফুল ছড়ায়ে কাঁদে বনভূমি।
ঝরে বারিধারা ফিরে এস পথহারা,
কাঁদে নদী তট চুমি।।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান—রাগপ্রধান

মেঘে মেঘে অন্ধ অসীম আকাশ আমারি মতন কাঁদে দিশাহারা।
নয়ন পুতলি চাঁদে হারায়ে, হারায়ে তাহার নয়ন-তারা।।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান—রাগপ্রধান

মেঘলা নিশি-ভোরে/মন যে কেমন করে/তারি তরে গো, মেঘবরণ যার কেশ।
বুঝি তাহারি লাগি/হয়েছে বৈরাগী/গেরুয়া-রাঙা গিরিমাটির দেশ।।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ গান—লোকগীতি

কৌতুকে করিয়া কোলাকুলি
আসিবে মেঘের শিশুগুলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গানআরম্ভ (সন্ধ্যাসংগীত)

মেঘের পরে মেঘ জমেছে, আঁধার করে আসে।
আমায় কেন বসিয়ে রাখ একা দ্বারের পাশে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেটে টুটি। আহা, হাহা, হা।
আজ আমাদের ছুটি ও ভাই, আজ আমাদের ছুটি। আহা, হাহা, হা॥

কী করি আজ ভেবে না পাই, পথ হারিয়ে কোন্ বনে যাই
কোন মাঠে যে ছুটে বেড়াই সকল ছেলে জুটি। আহা, হাহা, হা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিচর্চ্চা ১

মেঘগুলো নানা ভঙ্গিতে আকাশে উঠে চলেছে, যেন সৃষ্টি-কর্তার আঙিনার আকার-ফোয়ারার মুখ খুলে গেছে। বস্তু প্রায় কিছুই নেই, কেবল আকৃতি, কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপানযাত্রী—৬

মেঘের কোলে কোলে যায় রে চলে বকের পাতি।
ওরা ঘর-ছাড়া মোর মনের কথা যায় বুঝি ওই গাঁথি গাঁথি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা ১

পূর্ব দিগন্ত স্নিগ্ধ অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া কোথা হইতে সেই শত শতাব্দী পূর্বেকার কালিদাসের মেঘ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে আমার নহে, আমার পৃথিবীটুকুর নহে; সে আমাকে কোন্ অলকাপুরীতে, কোন্ চিরযৌবনের রাজ্যে, চিরবিচ্ছেদের বেদনায়, চিরমিলনের আশ্বাসে, চিরসৌন্দর্যের কৈলাসপুরীর পথচিহ্নহীন তীর্থাভিমুখে আকর্ষণ করিতে থাকে। তখন, পৃথিবীর যেটুকু জানি সেটুকু তুচ্ছ হইয়া যায়, যাহা জানিতে পারি নাই তাহাই বড়ো হইয়া উঠে, যাহা পাইলাম না তাহাকেই লব্ধ জিনিসের চেয়ে বেশি সত্য মনে হইতে থাকে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ নববর্ষা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

কালিদাস উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখর হইতে যে আষাঢ়ের মেঘ দেখিয়াছিলেন আমরাও সেই মেঘ দেখিতেছি। ইতিমধ্যে পরিবর্তমান মানুষের ইতিহাস তাহাকে স্পর্শ করে নাই। কিন্তু সে অবন্তী সে বিদিশা কোথায়? মেঘদূতের মেঘ প্রতিবৎসর চিরনূতন চিরপুরাতন হইয়া দেখা দেয়; বিক্রমাদিত্যের যে উজ্জয়িনী মেঘের চেয়ে দৃঢ় ছিল, বিনষ্ট স্বপ্নের মতো তাহাকে আর ইচ্ছা করিলে গড়িবার জো নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নববর্ষা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

শরৎ-বেলার বিত্তবিহীন মেঘ
হারায়েছে তার ধারাবর্ষণবেগ ;
ক্লান্তি-আলসে যাত্রার পথে দিগন্ত আছে চুমি,
.....সময় এসেছে, নির্জনগিরিশিরে—
কালিমা ঘুচায়ে শুভ্র তুষারে মিশে যাবে ধীরে ধীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিঃশেষ (সেঁজুতি)

পাতলা সাদা মেঘের টুকরো
স্থির হয়ে ভাসছে কার্তিকের রোদ্দুরে—
দেবশিশুদের কাগজের নৌকো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্রপুট— সাত

মোটা মোটা কালো মেঘ
ক্লান্ত পালোয়ানের দল যেন,
সমস্ত রাত বর্ষণের পর
আকাশের এক পাশে এসে জমল
ঘেঁষাঘেঁষি করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দেখা (পুনশ্চ)

মেঘেরা চলে চলে যায়,
চাঁদেরে ডাকে 'আয় আয়'
ঘুমঘোরে বলে চাঁদ,
'কোথায়—কোথায়!'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রকৃতির প্রতিশোধ-

দৈত্যসম পুঞ্জ মেঘভার
ছায়ার প্রহরীব্যূহে ঘিরে ছিল সূর্যের দুয়ার ;
অভিভূত আলোকের মূর্ছাতুর ম্লান অসম্মানে
দিগন্ত আছিল বাষ্পাকুল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—১৫

খণ্ড মেঘগণ
মাতৃস্তনপানরত শিশুর মতন
পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসুন্ধরা (সোনার তরী)

মেঘখণ্ড থরে থরে
উদাস বাতাস ভরে
নানা ঠাঁই ঘুরে মরে
হতাশ সমান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভরা ভাদরে (সোনার তরী)

আদি অনন্ত হারিয়ে ফেলে
সাদা কালো আসন মেলে
পড়ে আছে আকাশটা খোশখেয়ালি,
আমরা যে সব রাশি রাশি
মেঘের পুঞ্জ ভেসে আসি,
আমরা তারি খেয়াল, তারি হেঁয়ালি'
মোদের কিছু ঠিকঠিকানা নাই,
আমরা আসি, আমরা চলে যাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মেঘ (খেয়া)

শুভ্র খণ্ডমেঘ
মাতৃদুগ্ধপরিতৃপ্ত সুখনিদ্রারত
সদ্যোজাত সুকুমার গোবৎসের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যেতে নাহি দিব (সোনার তরী)

গিরির দুরাশা উড়িবারে
ঘুরে মরে মেঘের আকারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

ঘন হয়ে উঠল.......জামের বন পাতার মেঘে,
বলছে তারা উড়ে-চলা মেঘগুলোকে হাত তুলে,
"থামো, থামো,—
থামো তোমরা পুব-বাতাসের সওয়ারি।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্যামলী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সোনার তরী

দিগন্তে পথিক মেঘ
চ'লে যেতে যেতে
ছায়া দিয়ে নামটুকু
লেখে আকাশেতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—১১১

বর্ষণগৌরব তার
গিয়েছে চুকি,
রিক্তমেঘ দিক্‌প্রান্তে
ভয়ে দেয় উঁকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—১৫৬

আজি বর্ষা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম
মেঘ নামিয়াছে মম দুইটি তীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হৃদয়যমুনা (সোনার তরী)

মেঘদূত

মেঘদূত উড়ে চলে যাওয়ার বিরহ,
দুঃখের ভার পড়ল না তার 'পরে।
সেই বিরহে ব্যথার উপর মুক্তি হয়েছে জয়ী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিচ্ছেদ (পুনশ্চ)

মেয়ে

মেয়েদের দুই হাতে অজস্র সেবা, অকৃপণ তিতিক্ষা, অপূর্ব আত্মনিবেদন। দুঃখ-দুর্দিনে মেয়েরা সান্ত্বনার দীপশিখা।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ বিবাহের চেয়ে বড়ো

এটা এমন প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, মেয়েরাই বেশি সৎ, কর্মনিষ্ঠও পরিশ্রমী।

অভিজিত তরফদার ঃ ফাউ

মেয়েরা বিদ্যায় কর্মে, পদমর্যাদায় বা 'পদে'র জটিলতায় যেখানেই পৌঁছুক, তার একেবারে অন্তরের অন্তরলোকের একান্ত বাসনাটি থাকে মনের মতো একটি 'ঘর'। সেখানে সুন্দর করে সংসার করা।

আশাপূর্ণা দেবী ঃ ক্যাকটাস

মেয়েমানুষ যতই মুখ্যু হোক, তাকে ঠকানো বড়ো শক্ত।.....সে সব জেনে বুঝেও চুপ করে থাকে.......। পাছে তার পাখির বাসাটুকু ভেঙে যায়।

আশাপূর্ণা দেবী ঃ পাখির বাসা

আজকের মেয়েরা জ্ঞানে বিজ্ঞানে বিদ্যায় পাণ্ডিত্যে উচ্চপদ-অধিকারে অনেক উঁচুতে উঠে গেলেও, সেই চিরকালের সংস্কারের কাছে আজও বন্ধনগ্রস্ত। আজও তার সমস্ত শক্তির সম্বলের থেকে বেশি ভরসা রাখে তার রূপকে। মনোহারিণীত্বকে।
কিন্তু শিক্ষায় দীক্ষায় উন্নত অগ্রসর নারী সমাজের মধ্যে এই রূপসী রূপময়ী হবার চিন্তা চেষ্টাটি বড় শোচনীয়ভাবেই প্রকটিত। যেটা দুঃখের, লজ্জার।
দেখলে লজ্জা করে, কিন্তু বিজ্ঞাপনদাতাদের নির্লজ্জ প্রচারে দেখতেও হচ্ছে অহরহ, সর্বত্র। পথে, ঘাটে, ছবিতে টি.ভি.-তে, কাগজে, পত্তরে, এককথায় যত্রতত্র প্রচার কার্য চলেছে—

'হে নারী, দেখো তোমায় রূপসী আর মনোহারিণী করে তোলবার জন্যে আমাদের কত আয়োজন। তিল তিল করে তোমায় তিলোত্তমা করে তুলতে পারি আমরা। ....তোমার লাবণ্য লালিত্য কোমলতা কমনীয়তা, সবই আমার ভাঁড়ারে মজুত। ......তোমার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত। কটাক্ষ থেকে ভ্রূভঙ্গি পর্যন্ত সবকিছুর দায়িত্ব আমার হাতে তুলে দাও। দেখো তোমায় কী অপরূপ করে তুলতে পারি।'

এ প্রচার তো বেড়েই চলেছে। দেখে লজ্জায় দুঃখে মাথা কাটা যায় না কি? কিন্তু সেই প্রতিবাদ কোথায়? উচ্চমানের পত্রপত্রিকাগুলি পর্যন্ত তাদের দামী কাগজের অর্ধেকটা ধরে দিচ্ছে এই বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে।

আশাপূর্ণা দেবী : সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা (উদ্বোধন ৮৮/৯)

সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা নিজেকে গৌণ রাখা, নিজস্ব সত্তার বিলোপ সাধন। তাতেই 'সমাজ' নামক বস্তুটির শান্তি, স্বস্তি, স্থিতি, শৃঙ্খলা। নারী এইটি মেনে নিয়েছে বলেই সমাজের অস্তিত্ব বজায় আছে। ব্যতিক্রম ঘটলে সে অস্তিত্বটি আর থাকবে না।

ছন্নছাড়া স্ত্রীপুরুষের দল, নিতান্তই প্রাণিজগতের মতো পৃথিবীর হাটে ঘুরে বেড়াবে, আর হয়তো ধীরে ধীরে আবার সেই সমাজবন্ধনহীন গুহাজীবনের দিকেই ফিরতে থাকবে।

কারণ নারীকে ঘিরেই সমাজগঠনের পরিকল্পনা। আর নারীর আত্মবিলোপকারী সহনশীলতার ওপর ভিত গেড়েই সেই সমাজকে টিকিয়ে রাখা।

আশাপূর্ণা দেবী : সমাজগঠনে নারীর ভূমিকা (উদ্বোধন ৮৮/১)

একটা মেয়ের একা থাকার অপরাধটা সমাজ কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। যতই পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে মেয়েদের অভিযোগ থাক না কেন, হয় মাথার ওপরে নয় তো লেজে একটি পুরুষকে বেঁধে রাখতে না পারলে জীবনযুদ্ধে লড়াই সম্ভব নয়। মেয়েরা যতই দাঁড়াক, প্রতিষ্ঠিত হোক পাশে একজন দরওয়ান চাই। পুরুষেরা মেয়েদের সেই দরওয়ান।

কণা বসুমিশ্র : ছন্দপতন

মেয়েরা হল মায়ের জাত। তাদের সম্মান দিতে হয়। যে সংসারে মেয়েদের চোখে জল, সে সংসারে কোনওদিন শান্তি নেই। কণা বসুমিশ্র : ছন্দপতন

সময় নেই, সময় নেই.....কাজ—কাজ। আসলে মন কই? এরা পুরুষ, এ যুগের যন্ত্রদানবের সঙ্গী। দুই হাতে এক-টা-না জগন্নাথের র-থ টেনে যাবে ওরা। মেয়েদের মনের অতলে কি সম্পদ আছে তা কি কোনদিন জানবে? উঃ শত হলেও পুরুষ। কতদিনে ওরা বুঝবে নারীর হৃদয়ের ভাষা!

কনক মুখোপাধ্যায় : দেবা ন জানন্তি

ভ্রূণহত্যার দেশে এসেছি হঠাৎ
শিশুকন্যা ভ্রূণগুলি খুন হয় নিখুঁত আঙুলে!
না গো, এই সকরুণ উপমহাদেশে
নারী হয়ে, মেয়ে হয়ে জন্মাবো না আর
মৃত্যুর চিকন ফাঁস পরে নিতে তোমাদের হাতে।
শুধু এক প্রার্থনা রেখে যাই মহাকালের নিকট
'—নারীহীন, মাতৃহীন, কন্যাহীন যোষিত সংসর্গহীন
বান্ধবীবিহীন হয়ে বেঁচে থাক, আগামী প্রজাতি'।

কৃষ্ণা বসু : কন্যাভ্রূণ

যে কন্যাকে জন্মানোর দশদিন পর
কাঁচা ধান মুখে দিয়ে মেরে ফেলা হয়,
তার কচি নুন রক্তে এদেশের রক্তধারা নেই,
আমাদের কেউ নয় সেই সব ঝরা মরা মেয়ে, মেয়েগুলি?

হে সুপ্রাচীন অন্ধকার প্রতারক দেশ
জ্বলো, জ্বলে ওঠো, জ্বলে উঠে আমাকে জ্বালাও!

কৃষ্ণা বসু ঃ জাহানাবাদের দেশ, আমাদের স্বদেশ

মেয়ে মানুষ গতর খাটাই, ভাত কাপড়ের ঝি।
কাপড় এবং ভাতের জন্য ভাতার চেয়েছি।

কৃষ্ণা বসু ঃ ভাত-কাপড়ের ঝি (কফি হাউস গ্রীষ্ম ১৪০৬)

সংসারে মেয়েদেরই সব ছাড়তে হয় কেন? বিয়ের পর পদবি ছাড়তে হয়, গোত্র ছাড়তে হয়, বাবা-মার আশ্রয় ছাড়তে হয়, এমন কি ভাল কেরিয়ারও ছাড়তে হয়। সংস্কার অথবা কুসংস্কার, খানদান, ট্র্যাডিশন এগুলো কি মেয়েদেরই রক্ষা করতে হবে? ছেলেদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই।

দুলেন্দ্র ভৌমিক ঃ বৃত্তের ভিতর

মেয়েরাই কিন্তু জগতে বেশি ফেইথফুল, দায়িত্বশীল, নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাণী বসু ঃ একুশে পা

সব মেয়েরই উমার অংশে জন্মে—উদাসীনের জন্যেই তাদের তপস্যা।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ নীলাঙ্গুরীয়

মেয়ে হলেই নিত্য বিদায়ের চিন্তা—বাড়ি থেকে, কাউকে সমাজ থেকে, কাউকে একেবারে ধর্ম থেকে। কোথাও না হয় সুখের বিদায় মালাচন্দনের, কোথাও আবার ললাটে গ্লানির প্রলেপ। বিদায়ের অশ্রু নিয়েই ওদের জন্ম।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ঃ নীলাঙ্গুরীয়

মেয়েদের কৃত নিবেদনে কোন পরিমিতি হয় না।
যেমন হয় না দুঃখের, কষ্টের, কান্নার......।

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ ঃ স্থিরচিত্র

বিয়ে করলেই মেয়েগুলো দু-দিনেই বহুকেলে পড়া-পুঁথির মতো হয়ে আসে ; মলাটটা আধখানা ছিঁড়ে ঢলঢল করছে, পাতাগুলো দাগি হয়ে খুলে আসছে—কোথায় সে আঁটসাঁট বাঁধুনি, কোথায় সে সোনার জলের ছাপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোড়ায় গলদ—১।১

আইডিয়া-বিহারী সূক্ষ্ম প্রাণীদের জন্যে মেয়েদের সৃষ্টি হয় নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে-বাইরে—সন্দীপের আত্মকথা

যেখানে মেয়েরা দুঃখ পাইবে সেইখানেই তারা হৃদয় দিতে প্রস্তুত। এমন পশুর জন্য তারা আপনার বরণমালা গাঁথে যে লোক সেই মালা কামনার পাঁকে দলিয়া বীভৎস করিতে পারে ; আর তা যদি না হইল তবে এমন কারও দিকে তারা লক্ষ্য করে যার কণ্ঠে তাদের মালা পৌঁছায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ। দামিনী—২

সবাই দেবী তোমরা! নকল দেবীর কৃত্রিম সাজ, মেয়েদের অন্য সাজেরই মতো, পুরুষ-দর্জির দোকানে বানানো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায়—৩

এখনকার মেয়ে এখনকার মেয়ের মতোই হইব; তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চোখের বালি-৪

মেয়েরা দুই জাতের,........একজাত প্রধানত মা, আর-এক জাত প্রিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুই বোন-শর্মিলা

মাথায় কাপড়, হাতে কাঁকন, আঙিনায় বেড়া। মেয়েরা হল সীমাস্বর্গের ইন্দ্রাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাণী (লিপিকা)

মেয়েরা অভিসারিকার জাত। এগিয়ে গিয়ে যাকে চাইতে হয় তার দিকেই ওদের পুরো ভালোবাসা। ওদের উপেক্ষা তারই 'পরে দুর্বৃত্ত হবার মতো জোর নেই যার কিংবা দুর্লভ হবার মতো তপস্যা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাঁশরি—১৩

গেরুয়া রঙের নেশা মেয়েরা সামলাতে পার না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যুক্তির উপায়—১

মেয়ের সম্মান মেয়েদের কাছেই সবচেয়ে কম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যোগাযোগ—৫১

কর্তব্যবোধকে যারা অত্যন্ত সামলে চলে মেয়েরা তাদের পায়ের ধুলো নেয়। আর যে-সব দুর্দাম দুরন্তের কোনো বালাই নেই ন্যায়-অন্যায়ের, মেয়েরা তাদের বাহুবন্ধনে বাঁধে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রবিবার (তিন সঙ্গী)

মেয়েমানুষ যদিও, তবুও আশা করি ঠাট্টা বুঝতে পার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ল্যাবরেটরি-৯ (তিন সঙ্গী)

চতুর্মুখ তাঁর চার জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরেট নির্বোধ ক'রে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১৪

যে চাঁদ ঘরের মাঝে হেসে দেয় উঁকি
সে যেন ঘরেরি মেয়ে শিশু-সুধামুখী। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ হৃদয়ধর্ম (চৈতালি)

মেয়েরা আমার মার এক-একটি রূপ কিনা ; [স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু। শ্রীদেবীমাহাত্ম্যম, চণ্ডী ১১/৬] তাই তাদের কষ্ট আমি দেখতে পারি না ; জগন্মাতার এক-একটি রূপ।......আমি মেয়েদের উপবাসী দেখতে পারি না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

আগামী দিনে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা কাজ করবে বেশি। রাজনীতি বা সংস্কৃতি যে কোনও ক্ষেত্রেই মেয়েরা এগিয়ে যাবে বেশি। ছেলেরা বোধ হয় এবার পিছোতে শুরু করেছে। এতদিন পর্যন্ত তো ছেলেরাই ডমিনেট করে এসেছে, আমার মনে হচ্ছে এবার এটা উলটে যাবে।

লোপামুদ্রা মিত্র ঃ প্রতিদিন ২৯.৬.২০০২

মেয়েদের কাছে মার্জনা নেই ; কখনই না, কোনও ক্ষেত্রেই নয়। আছে সম্মার্জনা, সর্বদা এবং সর্বত্র।

শিবরাম চক্রবর্তী ঃ স্বামী মানেই আসামী

কত প্রেমের গল্প লেখা হয়, একটা মেয়েকে নিয়ে কত টানাপোড়েন, কত দ্বন্দ্ব, কত আশা নিরাশা, ব্যর্থতা ও মিলন ; হায়, নারী প্রেম তবু জীবনের কতটুকু মাত্র জুড়ে আছে। মেয়েদের সাধ্য কি স্পর্শ করে ধীমান পুরুষের গভীর নিঃসঙ্গতা।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ঃ যাও পাখি

মেয়েরা লক্ষ্মী-স্বরূপা। মেয়েরা রাখলে রাখতে পারে। নষ্ট করলে নষ্ট করতে পারে।

সুচিত্রা মিত্র : মনে রেখো

দেশকে জাগাতে হলে দেশের মেয়েদের জাগাতে হবে আগে।

সুদিন চট্টোপাধ্যায় : বিচিত্র ভাবনা

মেয়েমন

অসহায় একক পুরুষের উপর মমতা মেয়েমনের চিরন্তন প্রকৃতি, তা সে যে বয়সেরই হোক।

আশাপূর্ণা দেবী : ক্যাকটাস

মোকদ্দমা

শেয়াল জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মোকদ্দমার কিছু জান'? হিজিবিজবিজ বলল, 'তা আর জানি নে? একজন নালিশ করে, তার একজন উকিল থাকে, আর একজনকে আসাম থেকে নিয়ে আসে, তাকে বলে আসামী, তারও একজন উকিল থাকে। এক-একদিকে দশজন করে সাক্ষী থাকে। আর একজন জজ থাকে, সে বসে বসে ঘুমোয়'।

সুকুমার রায় : হ য ব র ল

মোটর

তাঁহার ভাঙ্গা ফোর্ড মোটরের হেডলাইট সাইডলাইট কিছুই না থাকায় দুইদিকে দুইটা হ্যারিকেন বাঁধিয়া রাত্রে রাস্তায় বাহির হন।

আবুল মনসুর আহমদ : আত্মকথা

বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে?

গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?

সুকান্ত ভট্টাচার্য :

মোবাইল

মহাজনের মোবাইল বেজে উঠল। দেববাণী।

অমর মিত্র : ধুলো মেঘ হয়

মৌলবাদ

যা কিছু আমার মনঃপুত নয় তাকে কিছুতেই চলতে দেবনা গায়ের জোরে ধ্বংস করবো, যে মত আমার নয় তার কণ্ঠরোধ করব, সেখানে শিল্পীর সৃষ্টিশীলতার (creative) স্বাধীনতার কোনো মুল্য নেই—এখানেই তো মৌলবাদের জিঘাংসা।

নন্দগোপাল ভট্টাচার্য : মৌলবাদের ক্ষমা নেই

মৌলবাদী

মৌলবাদীদের ধারণা হেসে উড়িয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু পারছিনে। তার কারণ বাংলাদেশে মুক্তি যোদ্ধাদের চেয়ে মৌলবাদীদের দাপট বেশি। যতদিন না মৌলবাদীদের চেয়ে বুদ্ধিজীবীদের দাপট বেশি হচ্ছে ততদিন বাংলাদেশে হিন্দুরা ভয়ে ভয়েই থাকবে ও থাকতে না পারলে সীমান্ত পার হবে। এটা একটা অসমাপ্ত অধ্যায়। আমরা কেউ জোর করে বলতে পারছিনে যে দুহাজার খ্রিস্টাব্দের পর আর একজনও হিন্দু বাংলা দেশ ছাড়বে না।

অন্নদাশঙ্কর রায় : নব্বই পেরিয়ে

মোসাহেব

অভাবের চোটে
চক্ষু ছানাবড়া
        মাথাটি হইল হেঁট,

মোসাহেব নাম
কিনিলাম শুধু
ভরিল না পোড়া পেট।

শরৎচন্দ্র পণ্ডিত ঃ খোসামোদির পরিণাম [জঙ্গীপুর সংবাদ]

আগেকার চেয়ে ঢের মশামাছি মোসাহেব বেড়েছে এখন। নদী কি বেড়েছে একটিও ? অথবা পাহাড়।

পূর্ণেন্দু পত্রী ঃ সাম্প্রতিক দিনকালগুলি (প্রিয় পাঠক-পাঠিকা)

মৌমাছি

মৌমাছির মতো আমি চাহি না ভাণ্ডার ভরিবারে
বসন্তেরে ব্যর্থ করিবারে।
সে তো কভু পায় না সন্ধান
কোথা আছে প্রভাতের পরিপূর্ণ দান।
তাহার শ্রবণ ভরে
আপন গুঞ্জনস্বরে
হারায় সে নিখিলের গান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মধু (পূরবী)

ম্যাডোনা

বধূ ও জননী পিপাসা মিটায়
দ্বিধাহারা—
রাধা ও ম্যাডোনা একাকারা!

মোহিতলাল মজুমদার ঃ বাঁধন

ম্যাজিক

ম্যাজিক তো নাটকীয় ব্যাপার। পুরোপুরি সাহিত্য। নাটকের মত নভেলের মঞ্চরূপ না হয়ে, সে রূপকথার মঞ্চরূপ।

পি সি. সরকার (জুনিয়র) ঃ জাদু জীবন

যেটা যা হয়েই থাকে সেটা তো হবেই—
হয় না যা তাই হলে ম্যাজিক তবেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ম্যাজিসিয়ান—(গল্পসল্প)

ম্যানেজার

সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ ;—ঘোড়া-বেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা-মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেমন দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রতিহিংসা—৩ (গল্পগুচ্ছ)

ম্যাপ

পড়ার ঘরের দেয়ালে চারপাশে
ম্যাপগুলো এই পৃথিবীকে ব্যঙ্গ করত নীরব পরিহাসে ;
পাহাড়গুলো মরে-যাওয়া শুঁয়ো পোকার মতো,
নদীগুলো যত
অচল রেখার মিথ্যা কথায় অবাক্ হয়ে রইত থতমত;
সাগরগুলো ফাঁকা,
দেশগুলো সব জীবনশূন্য কালো-আখর-আঁকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আসল (পলাতক)

যত্ন

যত্ন জিনিসটা কেবল হৃদয়ের জিনিস নয়, শক্তির জিনিস। অনুরাগের আগুনকে জ্বালিয়ে রাখতে শক্তির প্রাচুর্য চাই। শক্তিসঞ্চয় যেখানে অল্প সেখানে আপনিই বৈরাগ্য এসে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাভা-যাত্রীর পত্র—৯

......ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবলবেগেই করিতাম ; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হিমালয় যাত্রা (জীবনস্মৃতি)

যন্ত্র

যন্ত্রের চক্রান্ত ভাঙি,
ভেদ করি ষড়যন্ত্র লৌহে আর লোভে
আসুক প্রভাতখানি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : নগর-প্রার্থনা (প্রথমা)

নমো যন্ত্র, নমো—যন্ত্র, নমো—যন্ত্র, নমো—যন্ত্র!
তুমি চক্রমুখর মন্দ্রিত, তুমি বজ্রবহ্নিবন্দিত,
তব বস্তুবিশ্ববক্ষোদংশ ধ্বংসবিকট দন্ত॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

যন্ত্রকে প্রাণের উপরে প্রতিষ্ঠিত করবার মতো দৌরাত্ম্য আর কিছুই হতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পল্লীপ্রকৃতি

যন্ত্রণা

মানুষের ক্ষুদ্র দেহ
যন্ত্রণার শক্তি তার কী দুঃসীম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রোগশয্যায়-৫

যম

....দেখবার কেউ ছিল না। শিয়রে কেবল একজন দয়াময় দেবতা জেগে ছিলেন। তিনি যম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজপুত্তুর (লিপিকা)

জানো, যমের সহোদর উকিল ডাক্তারদের পয়সা কমে গেলে তাদের অবস্থা কি হয়?

সৈয়দ মুজতবা আলী : দু-হারা

যমুনা

যমুনা কোথায়?
যমুনা হৃদয়ের নদী।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত : পত্রগুচ্ছ (বাসন্তী)

যাত্রা

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের সকল স্থানেই প্রকাশ্য রঙ্গভূমে বেশভূষায় ভূষিত ও নানা সাজে সুসজ্জিত নরনারী লইয়া গীতবাদ্যাদি সহকারে কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ অভিনয় করিবার রীতি প্রচলিত। পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে বর্ণিত ভগবদবতারের লীলা ও চরিত্র ব্যাখ্যান করা এই অভিনয়ের উদ্দেশ্য।.......গীতবাদ্যযোগে এই সকল লীলোৎসব প্রসঙ্গে যে অভিনয়ক্রম প্রদর্শিত হইয়া থাকে তাহাই প্রকৃত 'যাত্রা' বলিয়া অভিহিত।

নগেন্দ্রনাথ বসু : বিশ্বকোষ

যাত্রার অভিনয়ে দর্শক ও অভিনেতার মধ্যে একটা গুরুতর ব্যবধান নাই। পরস্পরের বিশ্বাস ও আনুকূল্যের প্রতি নির্ভর করিয়া কাজটা বেশ সহৃদয়তার সহিত সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কাব্যরস, যেটা আসল জিনিষ, সেইটেই অভিনয়ের সাহায্যে ফোয়ারার মতো চারিদিকে দর্শকদের পুলকিত চিত্তের উপর ছড়াইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রঙ্গমঞ্চ

যেতে চাওয়া

যেতে চাই
অনেকটা পাখিদের মতো চলে যেতে চাই
বিষণ্ণতম ছড়িয়ে-ছিটিয়ে চলে যেতে চাই
অসংখ্য হৃদয় ছুঁয়ে চলে যেতে চাই........
যাবো বলে কখনো কিছুকে কোনো আপন করি না
কোনোদিন।

সৌমিত বসু ঃ সহবাস (আরশি মাছের চোখ)

যাযাবর

ঘর বাঁধা মানুষের ধর্ম, ঠিক তেমনি আবার যাযাবর জীবনেরও একটা প্রবল আকর্ষণ আছে—মানুষের সেটাও আদিম ধর্ম।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ হিমালয়ের পথে পথে

যুক্তিবাদ

যুক্তিবাদের ধারা নানা ধরনের আধিদৈবিক বালির চরের রিমদ্ধতায় ক্ষীণস্রোত হয়ে পড়লেও এ ধারা কখনও লুপ্ত হয়নি ভারতবর্ষে। আচারবদ্ধতা ও রীতি-সর্বস্বতার বিরুদ্ধে ব্রাত্যদের বিদ্রোহ যুগে যগে যুক্তিবাদের অস্তিত্বের জ্বলন্ত প্রমাণ দেয়।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যুক্তিবাদ ও আধুনিকতা

যুদ্ধ

যুদ্ধ একটা উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য হচ্ছে ক্ষমতার পরীক্ষা।

অন্নদাশঙ্কর রায় ঃ পথে-প্রবাসে

নিতান্তই যাবে যদি হৃদয়-বল্লভ,
নিতান্তই দাসীর কথা না রাখিবে যদি,
(ফুকারি কান্দিয়া এবে উঠিলা বিপিন)
আলুভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ভারত-উদ্ধার

ঘুম ভাঙতেই লোকটা বলল—যুদ্ধ করো।......
অন্ধকারে ঘুমোলে সবাই
পাম গাছ আর
শিউলি বনের চারপাশটায় আগুন জ্বালিয়ে
তার চিৎকার যুদ্ধ করো।

মৃণাল বসুচৌধুরী ঃ যুদ্ধ

যুরোপের দেশে দেশে রাষ্ট্রনীতির যুদ্ধনীতির বাণিজ্যনীতির তুমুল যৌড়দোড় চলেছে জলে স্থলে আকাশে।.....পূর্বকালে যুদ্ধবিগ্রহের পদ্ধতিতে ধর্মবুদ্ধি যেখানে মাঝে মাঝে বাধা খাড়া করে রেখেছিল, ডিপ্লমাসি সেখানে আজ লাফ-মারা হার্ডল রেস

খেলে চলেছে।.....গত যুদ্ধের সময় শত্রু সম্বন্ধে নানা উপায়ে সজ্ঞানে সচেষ্টভাবে সত্যগোপন ও মিথ্যাপ্রচারের শয়তানি অস্ত্র-ব্যবহার প্রচণ্ডভাবে চলল। যুদ্ধ থেমেছে কিন্তু সেই শয়তানি আজও থামেনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৭.২.১৯২৫

ওরে হাল্লারাজার সেনা
তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল।
মিথ্যে অস্ত্র শস্ত্র ধরে
প্রাণটা কেন যায় বেঘোরে,
রাজ্যে রাজ্যে পরস্পরে দ্বন্দ্বে অমঙ্গল।
তোরা যুদ্ধ করে করবি কি তা বল।

সত্যজিৎ রায় ঃ গান (গুপী গাইন বাঘা বাইন)

যুব

যুব আন্দোলনের উদ্দেশ্য—নূতনের সন্ধান আনা ; নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র, নূতন অর্থনীতির প্রবর্তন করা ; মানুষের মধ্যে নূতন ও উচ্চতর আদর্শ উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাকে মনুষ্যত্বের উচ্চতর সোপানে লইয়া যাওয়া।

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ নেতাজীর বাণী (লোকমত)

যুবক

মানুষ চাই, মানুষ চাই ; আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা, খণ্ড ৫

যোগ

আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অবিচ্ছিন্ন মিলনকে 'যোগ' বলে। ধর্মলাভের যে-সমস্ত সাধন-পথ আছে তাকেও 'যোগ' বলে ঃ এক এক রকম রুচির সাধকের জন্য এক এক রকম যোগের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ।

কোনও রকম বাসনা না রেখে ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কাজ করা ও সেই কর্মফল তাঁকে দান করাই কর্মযোগ।

ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় মন দিয়ে ভালবাসা ও সর্বদা তাঁর চিন্তা স্মরণ মনন ভাবনা করাই ভক্তিযোগ। ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ অহেতুক প্রেমের সম্বন্ধ।

মনকে সমস্ত ভোগের বিষয় থেকে ফিরিয়ে এনে ঈশ্বরের চিন্তায় একাগ্রভাবে স্থির করার যে পদ্ধতি তার নাম 'রাজযোগ'। রাজযোগের আটটি সাধনাঙ্গ ঃ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন অভ্যাসের ফলে ব্রহ্মের সঙ্গে নিজের স্বরূপগত ঐক্য ও অভিন্নতা উপলব্ধিই 'জ্ঞানযোগ'। জ্ঞানযোগে সিদ্ধ হ'লে সাধক উপলব্ধি করে, 'আমিই সর্বব্যাপী অবিনাশী অব্যয় আত্মা। আমি জন্মহীন মৃত্যুহীন—আমার স্বরূপ সমস্ত বিকার ও প্রপঞ্চের অতীত'। নিজের ইষ্টদেবতার প্রতি চিন্তাধারা যখন তৈলধারার মতো অবিশ্রান্তভাবে প্রবাহিত হয় তখন তাকে 'ধ্যান' বলে। মন যখন ইষ্টদেবতায় একেবারে লীন হয়ে যায় তখনই তাঁর দর্শন হয়। সমস্ত ভোগ-বাসনা ও জাগতিক সংস্কার থেকে একেবারে মুক্ত না করতে পারলে মনকে ধ্যানে স্থির করা যায় না।

স্বামী অভেদানন্দ ঃ উপদেশমালা

ঠিক ভাবে যোগ অভ্যাস করলে দেহের ও মনের সমূহ শক্তি স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয়। যোগী মানুষ অতি সহজে পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর সঙ্গে নিজেকে প্রয়োজনমত মানিয়ে নিতে পারে।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ হিমালয়ের পথে পথে

এই বিশ্বের অনন্ত আত্মার সঙ্গে আমাদের আত্মার যোগই মানবজীবনের লক্ষ্য। সে কি রকম? মানুষ সাধারণত ছোট হয়ে থাকে—হিংসাদ্বেষ, অর্থচিন্তা তার কারণ। অনন্ত অধিকারের বাণী সে শোনেনি বলেই সে নিজেকে মনে করে ছোট—বাইরের আলো পায় না বলেই এই দুর্দশা। এই ভূপতিত, ধূলি-লুণ্ঠিত আত্মাকে উঁচুতে ওঠাতে পারে তার মন।......বাইরের অনন্ত নক্ষত্র জগতের দিকে প্রশান্ত জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে থাকুক—কান পেতে নদীর মর্মর, পাখির সুর, রন্ধ্র থেকে উপচীয়মান সঙ্গীত শুনুক—এই হল যোগ। সঙ্গে সঙ্গে মনকে প্রসারিত করে দিক অনন্তের দিকে—এই হল যোগ! আর সে ছোট থাকবে না—বড় হয়ে যাবে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্মৃতির রেখা

যোগ শব্দটির অর্থ বিশ্লেষণযোগ্য। পাতঞ্জল মানবকল্যাণনিমিত্ত তাকে সংবিধানমতে ৮টি ধাপে বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছেন। যোগের এই ৮টি ধাপ হল—(১) যম (Universal moral commandments), (২) নিয়ম (Self Purification by discipline), (৩) আসন (Posture), (৪) প্রাণায়াম (Rhythmic control of the breath), (৫) প্রত্যাহার (Withdrawal and emancipation of the mind from the domination of the sense and exterior objects), (৬) ধারণা (Concentration), (৭) ধ্যান (Meditation), (৮) সমাধি (A State of super conciousness brought about by profound meditation, in which the individual aspirant becomes one with the object of his/her meditation–Paramatma or the Universal spirit). .....

—যোগাভ্যাসকালে আমাতে এবং পরমাত্মাতে মিলিত হয়ে ফলাফল যতক্ষণ না নিবিড়ভাবে এক হয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত যোগাভ্যাস অসম্পূর্ণ।......

"Yoga is not for him who gorges too much, not for him who starves himself. It is not for him who sleeps too much, not for him who stays awake. By moderation in eating and in resting, by regulation in working and by concordance in sleeping and waking, Yoga destroys all pain and sorrow."

মনোতোষ রায় ঃ যোগ ও জীবন

যোগে রোগ বিয়োগ হয়....

শুধু ভারতবর্ষে নয়, সুদূর পশ্চিম সাম্রাজ্যেও এই যোগের মাহাত্ম্য বর্তমানে সুবিদিত। 'যোগ' শব্দটি আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন। 'যোগব্যায়াম' শব্দটি শারীরতাত্ত্বিক এবং সুন্দর ও সুষমাময় দেহগঠনের সহায়ক এবং যোগাসন হঠযোগের পথপ্রদর্শক।

কেউ কারোর চাইতে কম শক্তিমান নয়। এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের মধ্যেই রয়েছে অমৃতের সন্ধান। শারীরতত্ত্বের এবং মনস্তত্ত্বের মিতালি ছাড়া 'যোগ' 'যোগব্যায়াম' এবং 'যোগাসন'-এ কেউ পরিপূর্ণ সার্থকতায় পৌঁছতে পারে না।

মনোতোষ রায় ঃ যোগ ও জীবন

বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি

চাঁদের সহিত বিরহ, বাত, পয়ার এবং জোয়ার-ভাঁটার একটা যোগ আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মীমাংসা (ব্যঙ্গকৌতুক)

যোগসাধনা কোনো উৎকট শারীরিক মানসিক ব্যায়ামচর্চা নয়। যোগসাধনা মানে সমস্ত জীবনকে এমনভাবে চালনা করা যাতে স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা বিক্রমশালী হয়ে ওঠাই আমাদের লক্ষ্য না হয়, মিলনের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠাকেই আমরা চরম পরিণাম বলে মানি। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** : শান্তিনিকেতন—তপোবন

রিপু জয় ইন্দ্রিয় দমন, চিত্তবৃত্তি নিরোধের ফলে যোগের সৃষ্টি হয়। যোগ ভিন্ন ব্রহ্মদর্শন হয় না।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী : বাণী

একমাত্র যোগের মাধ্যমে আত্মাকে জানা সম্ভব। পুঁথিগত মুখস্থ বিদ্যায় বা বাহ্যিক আড়ম্বরে আত্মাকে জানা যায় না।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী : বাণী

যোগিনী

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়ান তারা।
বিরতি আহারে রাঙ্গাবাস 'পরে
যেমত যোগিনী পারা।

চণ্ডীদাস : বৈষ্ণব পদাবলী

রণে অলক্ষিত হয়ে, চৌষট্টি যোগিনী লয়ে
উরিলেন শ্রীসর্বমঙ্গলা।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল

ডাকিনী যোগিনী দুটা তরকারী বানায়ে খাব।

রামপ্রসাদ : শাক্ত পদাবলী

যোগী

অরুণকান্তি কে গো যোগী ভিখারী।
নীরবে হেসে দাঁড়াইলে এসে
প্রখর তেজ তব নেহারিতে নারি।

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (রাগ-প্রধান)

যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে, সর্বদাই আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যালফ্যালে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখি ডিমে তা দিচ্ছে—সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে আছে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

মন যোগীর বশ, যোগী মনের বশ নয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

যোগীর পথ কিন্তু আলাদা। সে পরমাত্মাতে পৌঁছে আর ফেরে না। সেই পরমাত্মার সঙ্গে যোগ হয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

যৌগিক

যৌগিক আসন অভ্যাসে শক্তিক্ষয় কম হয় ও শক্তি বৃদ্ধি পায়, দেহ রোগমুক্ত হয়, যৌবন ও সৌন্দর্য দীর্ঘস্থায়ী হয়, স্বাস্থ্য বীর্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হয়। এ ছাড়া মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে ও একাগ্রতা আনতে যোগব্যায়াম অদ্বিতীয়।

নীলমণি দাশ : সচিত্র যোগ-ব্যায়াম

যৌবন

উপচে-পড়া যৌবনকে বার বার
বিষ দিয়েছিস তুই
দেবী নোস রাক্ষুসী এক আজীবন গরলপ্রতিমা।

অনীশ ঘোষ : গরলপ্রতিমা

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ-উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি।

বুদ্ধদেব বসু : বন্দীর বন্দনা

বিঘ্নভাঙা যৌবনের ভাষা,
অসীম তার আশা
বিপুল তার বল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অপরাজিত (মহুয়া)

যৌবন সরসীনীরে মিলনশতদল
কোন্ চঞ্চল বন্যায় টলোমল টলোমল॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়।
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছে তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তোমরা ও আমরা (সোনার তরী)

যৌবনের কাছে
মেনেছ, হার মেনেছ?
মেনেছি।
আপন মাঝে নূতনকে আজ জেনেছ?
জেনেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী

চলার মধ্যে যদি কেবলই তেজ থাকত তাহলে যৌবন শুকিয়ে যেত। তার মধ্যে কান্না আছে তাই যৌবনকে সবুজ দেখি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ফাল্গুনী-৪

মায়ামৃগীর শিকারে বনে-বাদাড়ে ছুটে বেড়ানো যৌবনেই সাজে।
কেননা, সে বয়সে মৃগ যদি বা নাও মেলে, মৃগয়াটাই যথেষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রচনাবলী (বিশ্বভারতী)-১, অবতরণিকা

যৌবনের শেষ দশাই সব চেয়ে বিপদের দশা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ল্যাবরেটরি-৫

যৌবনকে না ছাড়ালে
যৌবনকে যায় না পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক-৪৫

রঙ

রঙ যেখানে রূপও সেখানে, আর রূপ যেখানে রঙও সেখানে। গাছপালায়, আকাশে বাতাসে, সর্বত্রই তো একই নিয়ম।

পরিতোষ সেন : ছন্দপাগল

আমাদের মন ইন্দ্রিয়ের এত অধীন যে, একটু রঙের বদলে আমাদের কাছে বিশ্বের মানে বদলে যায়। **প্রমথ চৌধুরী** : চার ইয়ারি কথা

আজ সবার রঙে রঙ মিশাতে হবে।
ওগো আমার প্রিয়, তোমার রঙিন উত্তরীয়
পরো পরো পরো তবে॥
মেঘ রঙে রঙে বোনা, আজ রবির রঙে সোনা,
আজ আলোর রঙ যে বাজল পাখির রবে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কাব্যগীতি

ঝরো-ঝরো ঝরো-ঝরো ঝরে রঙের ঝরনা।
আয় আয় আয় আয় সে রসের সুধায় হৃদয় ভর্-না॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবগীতিকা

বাংলাদেশের মেয়েরা পশ্চিমের মেয়েদের মতো পরবার শাড়িতে রঙের সাধনা করে না, চারিদিকেই রঙ এত সুলভ। বাংলার দোলাই-কাঁথায় রঙ ফলে ওঠেনি, লতাপাতার রঙিন ছাপওয়ালা ছিট পশ্চিমে। বাড়ির দেয়ালে রঙ লাগায় মারোয়াড়ি, বাঙালি লাগায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পারস্যে-৬

ভালবাসার রঙ রাঙা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রক্তকরবী

প্রাণের একটি রং আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হলদে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রং নয়, তা কোমলতার রং। সেই রং দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শরৎ (পরিচয়)

রাঙিয়ে দিয়ে যাও গো এবার যাবার আগে।
আপন রাগে, গোপন রাগে,
তরুণ হাসির অরুণ রাগে
অশ্রুজলের করুণ রাগে।
রঙ যেন মোর মর্মে লাগে—আমার সকল কর্মে লাগে—
সন্ধ্যাদীপের আগায় লাগে—
গভীর রাতের জাগায় লাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শাপমোচন

মনকে যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যায়, মন ধোপাঘরের কাপড়।......আগে চিত্তশুদ্ধি; তারপর মনকে যদি ঈশ্বরচিন্তাতে ফেলে রাখ তবে সেই রঙই হবে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

রঙকে যদি চিত্রভাষার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যায় তবেই সেটা রঙের সার্থক প্রয়োগ হয়।

সত্যজিৎ রায় ঃ রঙীন ছবি

রঙের প্রধান কাজও হল কথা বলা।..........ধ্বনির মতো রঙও তো বাস্তব জীবনের একটা অঙ্গ।

সত্যজিৎ রায় ঃ রঙীন ছবি

রক্ত/রক্ত দান

একজনের রক্তদান করার অর্থ হল আর একজনের প্রাণ ফিরিয়ে আনা।

অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী ঃ রক্তদিন ঃ একটি প্রাণ বাঁচান (বিচিত্রা)

ক্ষুধার্তকে অন্নদান, তৃষ্ণার্তকে জলদান—আমরা ধর্ম বলে বিশ্বাস করি। মুমূর্ষুকে প্রাণদান করাও তা হলে আরও অনেক বড় ধর্ম। তা ছাড়া, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বিচার করলে বোঝা যায়—যিনি আজ রক্তদান করছেন, ভবিষ্যতে তাকেই হয়তো অপরের রক্ত নিতে হবে। এই অনন্যসাধারণ দানব্রত যে আজ বহু অকালমৃত্যুকে রোধ করেছে, বহু মৃত্যু পথযাত্রীকে নবপ্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী ঃ রক্তদিন ঃ একটি প্রাণ বাঁচান (বিচিত্রা)

সে আমার রক্তে ধোয়া দিন
চেতনায় হানছে আঘাত.....
জাগ জনতা দুরন্ত সঙ্গীন
কারা মোর ঘর ভেঙেছে স্মরণ আছে।

অলক সান্যাল ঃ সে আমার রক্তে ধোয়া দিন

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড় বিষজ্বালা এই বুকে,
....দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
        রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা,
        তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা
বড় কথা বড় ভাব আসেনাক মাথায় বন্ধু, বড় দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ আমার কৈফিয়ৎ

প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত-লেখায় তাদের সর্বনাশ!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ আমার কৈফিয়ৎ

আমার মধুর অধর, বধূর
        নবলাজসম রক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রণয়প্রশ্ন (কল্পনা)

রক্তে আলোর মদে মাতাল ভোরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সবুজের অভিযান (বলাকা)

হে রুদ্র আমার,
মার্জনা তোমার
গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,
সূর্যাস্তের প্রলয়লিখায়
রক্তের বর্ষণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা ১১

দূর হতে কি শুনিস মৃত্যুর গর্জন, ওরে দীন,
ওরে উদাসীন,
ওই ক্রন্দনের কলরোল,
লক্ষ বক্ষ হতে মুক্ত রক্তের কল্লোল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা ৩৭

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধূলায় হবে হারা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা ৩৭

প্রয়োজন হলে দেবো এক নদী রক্ত
হোক না পথের বাধা প্রস্তর শক্ত।

সিকান্দার আবু জাফর ঃ জনতার সংগ্রাম চলবেই

দিন এসে গেছে, ভাইরে—
রক্তের দামে রক্তের ধার
শুধবার।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ অগ্নিকোণ

রঙ্গমঞ্চ, মঞ্চ

রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে সব কালেই শাসকরা ভীত ও উদ্বিগ্ন।.....সাহিত্য যতক্ষণ Art for Art's sake নীতির জয়গান গায় ততক্ষণ শাসক থাকে সন্তুষ্ট, কিন্তু যখনি সে গড়ে তোলা আইনি লোহার খাঁচার দ্বারে এসে আঘাত শুরু করে—বেরোতে চায় কারাগার থেকে—তুলে ধরতে চায় কারাগার তৈরি করেছে যে নিষ্ঠুর তার স্বরূপকে, তখনই ঝলসে ওঠে নিয়ন্ত্রণের খড়্গ।

অশোক কুমার মিশ্র ঃ মুখবন্ধ (বাংলা রঙ্গমঞ্চের রূপরেখা)

সিনেমা ইজ ডেড—ও মৃত। প্রাণহীন পুতুল নিয়ে কোন সৃষ্টিধর্মীর মন তৃপ্ত হতে পারে না। মঞ্চ ঠিক তার বিপরীত। মঞ্চ সজীব। প্রাণ-সত্তায় জীবন্ত। ওর প্রাণের স্পন্দন অভিনেতাকে স্পন্দিত করে তোলে। সৃষ্টির উন্মাদনায় মাতিয়ে দেয়। আমার সৃষ্টিধর্মী মন নবনব সৃষ্টির আনন্দে বিভোর হয়ে ওঠে।....
মডার্ন স্টেজ স্যুড বি দি মিডিয়ম অফ এডুকেশন অফ দি নেশন। মঞ্চকে জ্ঞানের আলোকশিখা জ্বালাতে হবে জাতির মনে। জাতিকে নতুন করে গড়ে তুলবার দায়িত্ব নিতে হবে মঞ্চকে।......জাতীয় মঞ্চকে এমনি ভাবে আমি গড়ে তুলতে চাই—যেদিন তার রূপ দেখে তার সামনে—বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই সকলের মাথা নুইয়ে আসবে।

ছবি বিশ্বাস ঃ শারদীয়া রূপমঞ্চ—কালীশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, ১৯৬২

বাংলা দেশটাই রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু এদেশে রঙ্গমঞ্চ নাই। সাহিত্য ও রঙ্গমঞ্চ এদেশে জরাসন্ধের মত পৃথক হইয়া আছে; বাংলাদেশে নাটক অপাঠ্য আর যাহা পাঠ্য তাহা অভিনীত হইবার যোগ্য নয়।

প্রমথনাথ বিশী ঃ ঘৃতং পিবেৎ (ভূমিকা)

ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে , সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানেই জাদুকরের হাতে দৃশ্যপট আপনি রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল ; কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রঙ্গমঞ্চ

রজনীগন্ধা

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধা-বনে।
বৈশাখী মেঘ মেদুর হয়েছে সুদূর গগন কোণে।
কুরুক্ষেত্রে উড়েছে হাজার রথচক্রের ধূলি।
স্বপ্ন-গোধূলি ডুবে গেলো খর-রক্তের কোলাহলে।

বিষ্ণু দে ঃ ক্রেসিডা (চোরাবালি)

রজনীগন্ধা দিয়েছিলে সেই রাতে,
আজো তো সে ফোটে দেখি—
মদির অধীর রাতের তন্বী ফুল—
রজনীগন্ধা, বিরাগ জানে না সে কি?

বিষ্ণু দে ঃ ক্রেসিডা (চোরাবালি)

চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে, উছলে পড়ে আলো।
ও রজনীগন্ধা, তোমার গন্ধসুধা ঢালো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

রজনীগন্ধার আড়ালে কী যেন কাঁপে,
কী যেন কাঁপে
পাহাড়ের স্তব্ধ গভীরতায়।

সমর সেন ঃ বিরহ

রণ

এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা
সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।

জীবনানন্দ দাশ ঃ (বনলতা সেন)

মোগল শিখের রণে
মরণ-আলিঙ্গনে
কণ্ঠ পাকড়ি ধরিল আঁকড়ি দুই জনা দুই জনে।
দংশনক্ষত শ্যেনবিহঙ্গ যুঝে ভুজঙ্গ সনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বন্দী বীর (কথা)

রথ

কে মা রথ এলি?
সর্বাঙ্গে পেরেক-মারা চাকা ঘুর-ঘুর ঘুরালি।
মা তোর সামনে দুটো ক্যেটো ঘোড়া,
চুড়োর ওপর মুখ পোড়া
চাঁদ চামুরে ঘণ্টা নাড়া,
মধ্যে বনমালী।
মা তোর চৌদিকে দেবতা আঁকা
লোকের টানে চলছে চাকা,
আগে পাছে ছাতা পাকা, বেহদ্দ ছেনালী।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ঃ হুতোম প্যাঁচার নকশা

মহামিলনের শ্রীক্ষেত্র রথের মেলায় সর্বশ্রেণীর অবাধ অধিকার। স্পৃশ্যাস্পৃশ্যতার সঙ্কীর্ণ বুদ্ধির প্রশ্রয় নেই বলেই এই সমারোহের মধ্যে পাই সামাজিক সাম্যের ইঙ্গিত। সমস্ত শ্রেণীর মানুষের রথরজ্জু স্পর্শন, দেবতা দর্শন ও সেবাপূজার অবাধ অধিকারের মধ্যে দিয়ে ধর্মীয় উদারতা ও সমন্বয়ধর্মিতারই সাক্ষ্য বহন করে চলেছে অনন্তকাল ধরে। ভারতীয়তার মিলন উৎসব রথযাত্রা তাই ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উজ্জীবনের সহায়ক এরূপ অনুমান অলীক বা অসঙ্গত বলে মনে হয় না।

চৈতন্যময় নন্দ ঃ বর্তমান (১২.৭.০২)

শ্রীচৈতন্যের দৃষ্টিতে রথযাত্রা হচ্ছে দ্বারকা থেকে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজে আগমন। ঐশ্বর্যের ধাম হতে মাধুর্যের আলয়ে। 'কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই এ ভাব অন্তর'।

চৈতন্যময় নন্দ ঃ বর্তমান (১২.৭.০২)

ব্রহ্মবিদ্যা-প্রবর্তক ভগবান বৈবস্বত আত্মতত্ত্ব বোঝাতে গিয়ে নচিকেতাকে বলছেন ঃ "শরীরং রথমেব তু।" মানুষের শরীরটাই যেন একটা রথ। আমরা দেখি, কঠোপনিষদে সেই রথের এক অপূর্ব বর্ণনা। আমাদের শরীর-রূপ রথখানি বিষয়পথে অবিরাম ছুটে চলেছে। মানব দেহের ইন্দ্রিয়গুলি হচ্ছে এই রথের ধাবমান ঘোড়া। আমাদের বুদ্ধিরূপ সারথি মন-রূপ লাগাম জুড়ে দিয়ে ইন্দ্রিয়-রূপ ধাবমান ঘোড়াগুলির গতিকে সবলে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে। আর সেই রথের অধিপতি হচ্ছে আত্মা—যা কিনা অচঞ্চল শান্ত মূর্তিতে রথের ওপর বিরাজিত। রথের গতিবেগ তাকে আদৌ স্পর্শ করছে না।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, শ্রীশ্রীজগন্নাথকে নিয়ে এই রথযাত্রা উৎসব ওই চিরন্তন আধ্যাত্মিক আদর্শকেই সর্বজনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার এক লৌকিক আয়োজন। জনসমষ্টি নিয়েই জগৎ এবং সেই জনগণের অধিনায়ক হচ্ছেন প্রভু জগন্নাথ। জগন্নাথ স্বামী "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষঃ"-রূপে সকলের মধ্যে রয়েছেন। অনন্তকালের এই বিশ্বাস পোষণ করেই ভক্তরা মনে করেন, তাঁকে জানলে ও বুঝলে আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই বলা হয়, "রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।' লৌকিক দৃষ্টিতে রথস্বামী ক্ষুদ্রমূর্তিতে রথোপরি বিরাজমান।

প্রণবেশ চক্রবর্তী ঃ বর্তমান ১.৭.২০০৩

ফিরিঙ্গি স্কুলে ইংরেজি শেখা এক বঙ্গনন্দনকে একবার এক সাহেব আমাদের রথযাত্রার রথ জিনিসটা কি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 'উডেন চর্চ স্যার।' অর্থাৎ রথটা অনেকটা গীর্জার মতন দেখতে বলে এই কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু সাহেব কিছু বুঝতে পারেননি। তাই তাঁকে আরও ব্যাখ্যা করে ইংরেজি শিক্ষিত বঙ্গনন্দন বললেন ঃ

থ্রি স্টারিস হাই (তিনতলার মতন উঁচু),
গাড আলমাইটি সিট্ আপন (উপরে জগন্নাথদেব বসে থাকেন),
লাং লাং রোপ (লম্বা দড়ি সামনে),
থৌজন্ড ম্যান ক্যাচ (হাজার লোক ধরে),
পুল পুল পুল (খুব জোরে টানে),
রানাওয়ে রানাওয়ে,
হরি হরি বোল, হরি হরি বোল।

বিনয় ঘোষ ঃ কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত

চক্রনেমির ঘর্ঘররবে নির্ঘোষি রাজপথ,
বিশ্ব কাঁপায়ে চলেছে রে আজ বিশ্বরাজার রথ।

ধনী গৃহস্থ শিশু বয়স্থ—আয় সবে ছুটে আয়—
জগৎনাথের রথের যাত্রা তোরি দ্বার দিয়ে যায়।
আজি এ রথের পুরোহিত নাই—ধর্ম নিজেরে ধরে,
নাহিকো মন্ত্র—পূজার তন্ত্র মিলিত কণ্ঠস্বরে ;
ধূলি-কলঙ্ক তিলকপঙ্ক, চন্দন স্বেদনীর—
অযুত আর্তকণ্ঠে উঠিছে কীর্তন সুগভীর।

ঘর্ঘরি ঘুরে কর্মচক্র নির্ঘোষি ধরাপথ,
বিশ্বেরই মাঝে ছুটিয়া চলেছে বিশ্বরাজের রথ ;
সেবানুরক্ত অযুত ভক্ত দেশে-দেশে দিশে-দিশে,
সকল বিভেদ ভুলিয়া আজিকে এক সাথে গেছে মিশে।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী : রথযাত্রা

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে
ওই-যে তিনি , ওই-যে বাহির পথে॥
আয় রে ছুটে, টানতে হবে রশি—
ঘরের কোণে রইলি কোথায় বসি!
ভিড়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে গিয়ে
ঠাঁই করে তুই নে রে কোনো মতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি

"আমাকে নইলে চলে না এই কথা মনে করে এত দিন ভারি ব্যস্ত হয়ে কাজ করা গেছে, চোখের পলক ফেলতে সাহস হয় নি। ডাক্তার বলছে, 'এইখানে বাস করো, একটু থামো।' আমি বলেছি, 'আমি থামলে চলে কই?' ঠিক এমন সময় চাকা ভেঙে আমার রথ এই জানলাটার সামনে এসে থামল। এখানে দাঁড়িয়ে অনেক দিন পরে ঐ মহাকাশের দিকে তাকালুম। সেখানে দেখি মহাকালের রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ অগ্নিচক্র ঘুরতে ঘুরতে চলেছে : না উড়ছে ধুলো, না উঠছে শব্দ, না পথের গায়ে একটুও চিহ্ন পড়ছে। ঐ রথের চলার সঙ্গে বাঁধা হয়ে বিশ্বের সমস্ত চলা অহরহ চলেছে। এক মুহূর্তে আমার যেন চটক ভেঙে গেল। মনে স্পষ্ট দেখতে পেলুম, আমাকে না হলেও চলে। কালের ঐ নিঃশব্দ রথচক্র কারো অভাবে, কারো শৈথিল্যে, কোথাও এক তিল বা এক পল বেধে যাবে এমন লক্ষণ তো দেখি নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাতায়নিকের পত্র (কালান্তর)

কি জানি......ছোট জাতের জন্য স্বর্গে রথের ব্যবস্থা আছে কি না, কিংবা অন্ধকারে পায়ে হাঁটিয়াই তাহাদের রওনা হইতে হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : অভাগীর স্বর্গ

রন্ধন

বলি রন্ধনকার্য্যটা ত মন্দ নয়। দ্রৌপদী যে দ্রৌপদী, তিনি স্বয়ং রাঁধতেন। নল রাজা ইচ্ছে কল্লে একজন প্রসিদ্ধ বাবুর্চি হতে পার্ত্তেন। সীতা রাঁধতে জান্তেন না, কাজেই রাম তাঁরে নিয়ে কি কর্ব্বেন ভেবে চিন্তে না পেয়ে, তাঁরে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। আমি ত মেয়েদের চিত্রবিদ্যা, সঙ্গীতনৈপুণ্য ইত্যাদির চেয়ে রন্ধনপটুতা ভালবাসি। এমন রসনা পরিতৃপ্তকর, উদরস্নিগ্ধকারী, চিত্তরঞ্জক কার্য্য আর আছে?

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : বিরহ

'পাক-প্রণালী'র মতে কোরো তুমি রন্ধন,
জেনো ইহা প্রণয়ের সব-সেরা বন্ধন।
চামড়ার মতো যেন না দেখায় লুচিটা,
স্বরচিত বলে দাবি নাহি করে মুচিটা ;
পাতে বসে পতি যেন নাহি করে ক্রন্দন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিণয়মঙ্গল (প্রহাসিনী)

রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের বিকল্প হতে পারেন শুধু এক উন্নততর রবীন্দ্রনাথ

চন্দ্রিল ভট্টাচার্য ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ৪.৫.২০০৩

রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমান জগতের চিন্তাবীর ও জ্ঞানীশ্রেষ্ঠদের অন্যতম। বিশ্বমানবের সুদীর্ঘ যাত্রাপথের যাঁহারা অগ্রণী তাঁহাদের তিনি অন্যতম।

সর্ব্বোপরি রবীন্দ্রনাথ কবি, কারণ কবি যিনি বিশ্বচিত্তের তিনি দূত, বিশ্বরূপ রচনা করিতে করিতে তিনি চলেন সূর্য্যের উদয়াচল হইতে অস্তাচল পর্যন্ত। কবিই একমাত্র বোদ্ধা, একমাত্র জ্ঞাতা। বিশ্বভুবনের বিচিত্র সৌন্দর্য্য ও আপনাকে একমাত্র কবিই আমাদের কাছে প্রকাশ করেন, 'নবো নবো ভবসি জায়মানোহ্নাংকেতুরুষ সামেষ্যগ্রম্"—নব নব দিনে নিত্য নবীন হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করেন, উষাকে তিনিই আবাহন করিয়া দিনের সূচনা করেন, একটি মাত্র লোকে বাস করিয়া সর্ব্বলোকের রহস্য তিনি জানেন, দেখিতে পান। যে রস ও সৌন্দর্য্যের দৃষ্টি দিয়া। এই বিশ্বজীবনকে আমরা পাই, ভোগ করি সে দৃষ্টি কবিই আমাদের দিয়াছেন। 'ন ত্বদন্যঃ কবিতরো ন মেধয়া ধীরতরো স্বধাবন, ত্বং তা বিশ্বা ভুবনানি, বেত্থ। সখা নো অসি পরমং চ বন্ধু। না কবি অপেক্ষা ধ্যানবলে বলীয়ান কেহ নাই, কবি অপেক্ষা জ্ঞানবলে বলীয়ান কেহ নাই। বিশ্বভুবন সবই তিনি জানেন। তিনি আমাদের সখা, তিনিই আমাদের পরম বন্ধু।
—রবীন্দ্রনাথ সেই কবি।

নীহাররঞ্জন রায় ঃ কবি রবীন্দ্রনাথ (জয়ন্তী উৎসর্গ)

রবিঠাকুরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো নালিশ, এই যে, বুড়ো ওঅর্ডসওয়ার্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে আমাদের কর্তব্য ওর সভা থেকে দল বেঁধে উঠে আসা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা-১

রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা-১

এবারে নতুন রূপে দেখা দিক রবীন্দ্রঠাকুর
বিপ্লবের স্বপ্ন চোখে, কণ্ঠে গণ-সংগীতের সুর ;
জনতার পাশে পাশে উজ্জ্বল পতাকা নিয়ে হাতে
চলুক নিন্দাকে ঠেলে, গ্লানি মুছে আঘাতে আঘাতে।
যদিও সে অনাগত, তবু যেন শুনি তার ডাক
আমাদেরই মাঝে তাকে জন্ম দাও পঁচিশে বৈশাখ॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ পঁচিশে বৈশাখের উদ্দেশে (ঘুম নেই)

রবীন্দ্রনাথ জীবনের সর্বভূমির কবি, ঋগবেদের ভাষায় তিনি 'কবীনাং কবিতমঃ'। রবীন্দ্রনাথের মতো মনে-প্রাণে চিন্তায়-কর্মে দুঃখে-সুখে জীবনে-মরণে সমদৃষ্টি মান জীবনভাবক কবি মানুষের ইতিহাসে আর দেখা যায় নাই। শিল্পনৈপুণ্যে, সৃষ্টি উৎকর্ষে এবং কর্ম-চিন্তা-আনন্দ-নেতৃত্বে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কাহারও নাম মনে করিতে পারি না।

সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

রমণী

বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষবর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি।

বুদ্ধদেব বসু ঃ বন্দীর বন্দনা

তাই আমি রমণীর জায়া-রূপ করি উপাসনা।

মোহিতলাল মজুমদার ঃ পান্থ

রমণীরে কে বা জানে—
মন তার কোন্ খানে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—১০

রমণীর মধ্যে যেখানে আমরা লক্ষ্মীর প্রকাশ দেখিতে পাই, সেখানে আমরা এক দিকে দেখি সাজসজ্জা লীলামাধুর্য, আর এক দিকে দেখি অক্লান্ত কর্মপরতা ও সেবানৈপুণ্য। এই উভয়ের বিচ্ছেদই কুশ্রী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খেলা ও কাজ (পথের সঞ্চয়)

জান না কি, হে রমণী, দর্পণে যা দেখিছ তা ছায়া,
পার না রচিতে কভু তাই দিয়ে চিরস্থায়ী মায়া।
তিলোত্তমা অনুপমা সুরেন্দ্রের প্রমোদপ্রাঙ্গণে
কঙ্কণঝংকারে আর নৃত্যলোল নূপুরনিক্বণে
নাচিয়া বাহিরে চলে যায়। লয়ে আত্মনিবেদন
গৌরবে জিনিলা শচী ইন্দ্রলোকে নন্দন-আসন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দর্পণ (মহুয়া)

আমি শুধু নহি সেবার রমণী
মিটাতে তোমার লালসাক্ষুধা।
তুমি যদি দিতে পূজার অর্ঘ্য
আমি সঁপিতাম স্বর্গসুধা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পতিতা (কাহিনী)

রমণীর মন
সহস্র বর্ষেরি সখা সাধনার ধন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিদায়-অভিশাপ

না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভাব পেষল জানি॥

রায় রামানন্দ ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

রস

শুধু বীজে ও মাটিতে ফসল ভালো হয় না, জমিতে সর্বদা রস থাকা চাই ; মানুষের প্রতি মানুষের টানই সেই চিরন্তন রস যাহাতে করিয়া মনের সকল রকম ফসল একেবারে অপর্যাপ্ত হইয়া ফলিয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ইংলন্ডের ভাবুকসমাজ (পথের সঞ্চয়)

গাছের ত্যাগ ফল দিয়ে।
ফল ফলে না রস না হলে।
প্রাণের ধনই হল আনন্দ, যাকে বলি রস।
যেখানে রসের দৈন্য, ভরে না সেখানে প্রাণের কমণ্ডলু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কালের যাত্রা—কবির দীক্ষা

যেখানে সব তুচ্ছ কিন্তু সব সত্য, সব মধুরে তীব্রে, স্থূলে সূক্ষ্মে মাখামাখি—সেইখানেই রসের স্বর্গ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চতুরঙ্গ-শচীশ-৬

রূপের মহলে রসের সত্যকে প্রকাশ করতে গেলে তথ্যের দাসখত থেকে মুক্তি নিতে হয়।.....

খোকা এল নায়ে
লাল জুতুয়া পায়ে।

জুতা জিনিসটা তথ্যের কোঠায় পড়ে—এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না।.....কিন্তু জুতুয়া?......জুতুয়ার খবর রাখে মা, আর রাখে খোকা। এইজন্যেই এই সত্যটিকে প্রকাশ করতে হবে বলে জুতা শব্দের ভদ্রতা নষ্ট করতে হল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তথ্য ও সত্য (সাহিত্যের পথে)

নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তথ্য ও সত্য (সাহিত্যের পথে)

রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাস্তব

জিহ্বায় রস খুব জমে,
অথচ তাহার সংস্রবে
দেহখানা যবে
আগাগোড়া উঠে জ্বলি
রস নয়, বিষ তারে বলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রেলেটিভিটি (প্রহাসিনী)

রস জোগান দিলেই যে রস ভোগ করা যায় তা নয়, নিজের অন্তরে রসরাজের দয়া থাকা চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শ্রাবণগাথা

রসের ওজন আয়তনে নয়। সমস্ত গাছ একদিকে, একটি ফুল একদিকে, তবু ওজন ঠিক থাকে। অসীম অন্ধকার একদিকে, একটি তারা একদিকে, তাতেও ওজনের ভুল হয় না।.....বিরহের সরোবর চারিদিকে ছলছল করছে, মিলনপদ্মটি তারই বুকের একটি দুর্লভ ধন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ বর্ষণ

রস জিনিসটা কী? না, যাহা হৃদয়ের কাছে কোনো-না কোনো ভাবে প্রকাশ পায় তাহাই রস, শুদ্ধ জ্ঞানের কাছে যাহা প্রকাশ পায় তাহা রস নহে। কিন্তু সকল রসই কি সাহিত্যের বিষয়?.....যে রস উদ্‌বৃত্ত থাকে না যে আপনাকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যাকুল হয় না। যেটুকু বৃষ্টি মাটির মধ্যেই শুষিয়া যায়, তাহা তো আর স্রোতের আকারে বহিয়া যাইতে পারে না। এই কারণেই রসের সচ্ছলতায় সাহিত্য হয় না, রসের উচ্ছলতায় সাহিত্যের সৃষ্টি।........যে রস মানবের সর্বপ্রকার প্রয়োজনমাত্রকে অতিক্রম করিয়া বাহিরের দিকে ধাবিত হয় তাহাই সাহিত্যরস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যসম্মিলন

কবির বাসনা-লোকে বিধৃত বিশ্বজীবনের অনুরণনলোকোত্তর চমৎকৃতির ভিতর দিয়া নিরন্তর জীবনের সকল সুখ-দুঃখ, প্রেম-ঘৃণা, বীরত্ব-ভয়কে অপূর্ব আস্বাদ্য করিয়া তুলিতেছে ; বিশ্বজীবনের সেই আস্বাদ্যমানতার নামই 'রস'।
সাহিত্যের এই রস আমাদের চিত্তের বন্ধন মোচন করে।

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : সাহিত্যের স্বরূপ

রসিক

বিষয়ী লোক শতদলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে একটি একটি করে জমা করে আর বলে, 'পেয়েছি!' তার সঞ্চয় মিথ্যে। সংশয়ী লোক শতদলের পাপড়ি একটি একটি করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাকে কেটে কুটে নিংড়ে মুচড়ে বলে, 'পাইনি!' অর্থাৎ, সে উলটো দিকে চেয়ে বলে 'নেই'। রসিক লোক সেই শতদলের দিকে 'আশ্চর্যবৎ পশ্যতি'। এই আশ্চর্যের মানে হল পেয়েছি পাইনি দুই-ই সত্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়রি। ৯.২.১৯২৫

ঈশ্বর রসস্বরূপ—ভক্ত রসিক।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

রসিকতা

'রসিকতাকে যে সত্য মনে করে, রসজ্ঞান তার নেই'।
'সত্য কথাকে যে রসিকতা মনে করে, সত্যজ্ঞান তারও নেই'।

প্রমথ চৌধুরী : ছোটো গল্প

রসিকতা জিনিষটা বড়ো বিপদের জিনিষ—ও যদি প্রসন্ন সহাস্য মুখে আপনি ধরা দিলে তো অতি উত্তম, আর ওকে নিয়ে যদি টানাটানি করা যায় তবে বড়োই 'ব্যাভ্রম' হবার সম্ভাবনা। হাস্যরস প্রাচীন কালের ব্রহ্মাস্ত্রের মতো, যে ওর প্রয়োগ জানে সে ওকে নিয়ে একেবারে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে—আর যে হতভাগ্য ছুঁড়তে জানে না অথচ নাড়তে যায়, তার বেলায় 'বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্র আসি অস্ত্রীকেই বধে'। হাস্যরস তাকেই হাস্যজনক করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছিন্নপত্র

রহস্য

রহস্য বিশ্বের প্রাণ
রহস্যই স্ফূর্তিমান
রহস্যে বিরাজমান ভব।

বিহারীলাল চক্রবর্তী : সাধের আসন

সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য—ভালোবাসার অমৃত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পত্রপুট-১৫

নগ্নবক্ষে বক্ষ দিয়া
অন্তররহস্য তব শুনে নিই প্রিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

যে ভাবে রমণীরূপে আপন মাধুরী
আপনি বিশ্বের নাথ করিছেন চুরি।......
হে রমণী, ক্ষণকাল আসি মোর পাশে
চিত্ত ভরি দিলে সেই রহস্য-আভাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রমণী (স্মরণ)

রাগ

স্ত্রীর রাগ যতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, অর্থাৎ বাপের বাড়ি পর্যন্ত, তাহা গেল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গ্রাম্য সাহিত্য (লোকসাহিত্য)

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ্যা ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
(প্রথম দৃষ্টিতে প্রেম জাত হয়েছিল। তা দিনে দিনে বাড়ল, তার অবধি পেলুম না)

রায় রামানন্দ : বৈষ্ণব পদাবলী

যে হারে, সেই রাগে।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পালামৌ

রাগ/রাগিণী

বর্ষাকালে মল্লারাদি রাগিণী ভাল লাগে, বসন্তে বাহার বসন্ত ইত্যাদি.....। জলবায়ুর নৈসর্গিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাবের পরিবর্তন হয় এবং মনের ভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সুর ভাল লাগে। তদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হয় যে ঐ প্রকার রাগরাগিণী বিভাগ অতি প্রকৃতিসঙ্গত ও স্বাভাবিক। আধুনিক সকল গানে.......ঐ সকল ভাব উপস্থিত করাইতে পারে না।

স্বামী বিবেকানন্দ : সঙ্গীতকল্পতরু

কেন বিশেষ বিশেষ এক এক রাগিণীতে বিশেষ বিশেষ এক একটা ভাবের উৎপত্তি হয়.....পূরবীতেই বা কেন সন্ধ্যাকাল মনে আসে আর ভৈরোতেই বা কেন প্রভাত মনে আসে? তাহা কি কেবল প্রাচীন সংস্কার হইতে হয়?.....তাহার গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে।

আমাদের দেশে......বিভিন্ন ঋতু ও বিভিন্ন সময়ের ভাবের সহিত মিলাইয়া, বিভিন্ন রাগরাগিণী রচনা করা হইত।......রাগরাগিণী ভাবের সেবাতেই নিযুক্ত ছিল। সে দিন গিয়াছে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :** সংগীত ও ভাব

রাঙা

তাদের চক্ষু রাঙা, তাদের পাইকগুলোর পাগড়ি রাঙা, তার উপরে খোলা তলোয়ারের যে রকম ভঙ্গি দেখলুম একটু কাছে ঘেঁষলেই একেবারে চরম রাঙা রাঙিয়ে দিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন—৩

প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্রমাস
তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চার অধ্যায়-২

রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে,
রাঙা নেশা মেঘে মেশা প্রভাত-আকাশে,
নবীন পাতায় লাগে রাঙা হিল্লোল। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :** নবীন

কচি পাতা শিশুর ঘুম ভাঙা চোখের মত রাঙা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মালঞ্চ-৫

লাল রঙের শাড়িতে
দালিম ফুলের মতো রাঙা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হঠাৎ দেখা (শ্যামলী)

রাজকার্য

রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ : সিরাজদ্দৌলা

রাজনীতি (দ্র. পলিটিক্স)

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন এখন সারা ভারতের একটা জ্বলন্ত সমস্যা।

কুমারেশ চক্রবর্তী : প্রধানমন্ত্রী বনাম রাষ্ট্রপতি

বাঁচার রাজনীতি দিয়ে নোংরা রাজনীতি ঠেকাতে হয়।

চন্দন সেন : অরাজনৈতিক

আমিই রাজা, আমারই নীতি—ইহাই রাজনীতি।

বিজন ভট্টাচার্য : দেবী গর্জন

আমি কোন রকম রাজনীতিতে (Politics) বিশ্বাসী নই। ঈশ্বরও সত্যই জগতে একমাত্র রাজনীতি, আর সব বাজে।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী-৫

রূপসী তুই রাজনীতি, দিস
ছেলে-ছোকরার মাথা ঘুরিয়ে ;
কিন্তু বুড়ো শয়তানদের
সঙ্গে থাকিস রাত্রে শুয়ে।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : রূপসী রাজনীতি

বুদ্ধি থাকলে হ্যালে রাজনীতি, ব্যবসার চেয়ে কম দেয় না।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় : স্বদেশী নকশা

কাজের চেয়ে প্রতিশ্রুতি বড়। সবসে বড়া রাজনীতি। নীতি মানে নিয়ম বা নিষ্ঠা নয়, ক্ষমতা অধিকারের শক্তি। সেই শক্তি হল বক্তৃতা। বক্তৃতা হল শব্দের সমষ্টি। শব্দই ব্রহ্ম।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : কলিকাতা আছে কলিকাতাতেই

রাজনীতি কথাটা ঠিক ড্রয়িংরুমে বসে আরও পাঁচটা বিষয়ের মত জোলো আলোচনাচক্রের মত নয়। এ একটা হোম-টাইম ডেডিকেশন।

সুচিত্রা মিত্র : মনে রেখো

রাজনীতি করবেন না। মিডিওকার লোকেরা রাজনীতি করে।

সুবোধ সরকার : উপদেশ যা কিনা গির্জার দেয়ালে লেখা থাকে না।

রাজনৈতিক নাটক/রাজনীতিক থিয়েটার

সত্য সর্ব সময়ে শ্রেণীসত্য—ক্লাস ট্রুথ। হয় আপনি এ শ্রেণীর সত্য বলবেন, না হয় ও শ্রেণীর। হয় আমরা কৃষকের পক্ষে কথা কইব, নইলে জোতদারের। হয় শ্রমিকের সত্য উচ্চারণ করব, নইলে মালিকের। মাঝামাঝির দালালি তো সত্যের ক্ষেত্রে খাটে না। রাজনৈতিক নাটকের অবলম্বনই শ্রেণীসত্য।

উৎপল দত্ত : রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ

রাজনৈতিক নাটককে নেতিবাদ থেকে রক্ষা করার একমাত্র পথ হচ্ছে মার্কসবাদের দীক্ষা। পার্টির নিকটে থাকা, প্রতি মুহূর্তে শ্রেণীসংগ্রামের বর্তমান স্তর ও শক্তিবিন্যাস অধ্যয়ন করা, কোন রাজনীতিটা এই মুহূর্তে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন সেটা বোঝা। সেটা কোনো নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন, এলিয়েনেটড নাট্যকারের পক্ষে সম্ভবই না, যদি না সে পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়।

উৎপল দত্ত ঃ রাজনৈতিক নাটক, একটি কলহ

থিয়েটারকে আমি সমাজ বিজ্ঞানের একটা শাখা বলে মনে করি।.....থিয়েটার রাজনীতি ও সমাজবিচ্ছিন্ন হতে পারে না—কোনও বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করলেন কি করলেন না সেটা বড় কথা নয়— সমগ্র পৃথিবী যদি নাও ধরি, শুধু যদি আমার নিজের দেশ ও সমাজের কথাই ধরি, সেখানেও আপাতশান্তির নামে অন্ধকার জগতের নিয়ন্ত্রণ ক্রমশই অদৃশ্য থাবা বাড়িয়ে আমাকে গ্রাস করতে চাইছে। তার বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র হলেও একমাত্র প্রতিবাদ হতে পারে থিয়েটার এবং সে থিয়েটার নিঃসন্দেহেই আপন ঐতিহ্য অনুসরণকারী রাজনৈতিক থিয়েটার।

কুন্তল মুখোপাধ্যায় ঃ থিয়েটার—প্রতিবাদের মাধ্যম

রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকলে ভালো থিয়েটার হয় না।

নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত ঃ সাক্ষাৎকার (শারদ সংলাপ)

রাজনৈতিক নাটক সকল দেশেই অত্যন্ত জরুরী। এবং ভারতবর্ষে তো বটেই। আমি বিশ্বাস করি অসির চেয়ে মসীর শক্তি বেশী। নাট্যকাররা সেই মস্যাধার ব্যবহার না করলে সেটা হবে কাপুরুষতা।

মন্মথ রায় ঃ সাক্ষাৎকার (প্রয়াগ পত্রিকা, ১৯৭৮)

জীবনের গভীরতর মানবিক দিনগুলোর উন্মোচন ও বিশ্লেষণ কি অরাজনৈতিক ঘটনা? রাজনৈতিক ঘটনাবলী দেখালে সেটাই শুধুমাত্র রাজনৈতিক থিয়েটার? আমাদের থিয়েটারের ঐতিহ্য কিন্তু অন্য। সরাসরি রাজনৈতিক থিয়েটারের পাশাপাশি মানবিক সম্পর্কের বৈজ্ঞানিক এবং দ্বন্দ্বমূলক বিশ্লেষণও সমানভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন করে এসেছে এতাবৎকাল। সাম্প্রতিককালে আমাদের প্রধান সংকট সামাজিক এবং মানবিক মূল্যবোধের। পুঁজিবাদী শোষণের ধরনধারণ গত বিশ বছরে অনেক পাল্টেছে। পুঁজিবাদী শোষণের কাল থাবা পৌঁছে গেছে এমনকি প্রগতি শিবিরেও, পচন ধরাচ্ছে নৈতিকতায়। মধ্যবিত্ত সুলভ সুবিধাবাদ ঘিরে ধরেছে আষ্টেপৃষ্ঠে। আজকের প্রধান দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক আদর্শ এবং জীবনচর্চার পার্থক্য। তাই মানবিক মূল্যবোধ এবং মানবিক সম্পর্ক নতুন করে বিশ্লেষণ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে।

দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সাক্ষাৎকার (শারদ সংলাপ)

মানুষের জীবন, সুখ-দুঃখ যন্ত্রণা, নৈরাশ্য ও মুক্তি—একজন নাট্যকারকে এসব কথা ভাবতেই হবে। দায়বদ্ধতা কি অনিবার্য নয়? রাজনীতি করা আর নাটক লেখা এক কাজ নয়। রাজনীতিকরা একভাবে মানুষের কথা মানুষের সমস্যার কথা বলবেন। নাট্যকারকে সেই কথাটাই বলতে হবে শিল্পসম্মতভাবে। নাটককে নাটক হতে হবে। পৌঁছুতে হবে যুক্তি তর্কে গল্পে আনন্দে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য* ঃ *আজকের নাট্যভাবনা [নাট্য আকাদেমি পত্রিকা '৯৯]

নন্দনতত্ত্ব রাজনীতির মত ক্ষণস্থায়ী নয়। সাংস্কৃতিক আদর্শের সঙ্গে রাজনীতিক আদর্শের দ্বন্দ্ব ও নানা টানাপোড়েন বঙ্গীয় রঙ্গমঞ্চে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।.....

থিয়েটারকে সংগ্রামের হাতিয়ার করতে গিয়ে রাজনৈতিক আদর্শের কাছে থিয়েটারের আদর্শকে অনেকটাই বলি দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক বক্তব্য কিছুদিনের মধ্যেই পরিণত হয় নিছক পরিভাষায়। **রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় : মৃতের পুনরুজ্জীবন**

আমি রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যেই নাটক লিখি। আমি মনে করি যে শিল্প প্রচার হবে, সঠিক রাজনীতির প্রচার করবে—তবে প্রচার সর্বস্ব নয়। চাই শিল্পসম্মত প্রচার আর লোকাঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নাটক যদি বিমূর্ততার স্তরে গিয়ে পৌঁছায় কি প্রয়োজন নাটক করার।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য : সাক্ষাৎকার [প্রয়াস পত্রিকা-১৯৮৭]

রাজনীতি তো আমাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সর্বত্রই রাজনীতি। রাজনীতির বাইরে তো আমরা বেরিয়ে আসতে পারি না।......নাটকে রাজনীতির সমস্ত কথাই আমি বলব। সমাজ সচেতনতার কথা বলব। সাম্প্রদায়িকতার নয়, সম্প্রীতির কথা বলব। সাম্প্রদায়িকতার বিপক্ষে বলব। প্রাদেশিকতার কথা নয়, মিলনের কথা বলব। **স্বপন দাস :** অন্তরঙ্গ আলাপন (অঙ্কুর)

রাজসম্মান/রাজানুগ্রহ

কংস। .... তোমার প্রাপ্য—আমার প্রীতি আমার স্নেহ। তোমার প্রাপ্য রাজসম্মান, রাজানুগ্রহ—

কঙ্কণ। অর্থাৎ দাসত্বের স্বর্ণশৃঙ্খল?

কংস। কুলোকে তাকে ঐ আখ্যা দেয় বটে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

কঙ্কণ। তা আরো ভয়ঙ্কর।.....প্রথমে আসে ভীরুতা, তারপর আসে কাপুরুষতা। তারপর বিক্রয় হয় বিবেক, তারপর বিসর্জন হয় মনুষ্যত্ব। তখন পদাঘাতকে পুরস্কার মনে হয়, পাদুকালেহনে মোক্ষলাভ হয়।

মন্মথ রায় : কারাগার (৪। ২)

রাজহংস

স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজকাননে ;
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী
কবে, বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? **মধুসূদন দত্ত :** মেঘনাদবধ কাব্য

রাজা

মনোরাজ্যের রাজা হতে পারলে, বিশ্বের রাজত্ব আপনা হতেই হাতে আসবে।

আনন্দময়ী মা : পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা (গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী)

দুর্বলের উপর পীড়ন করা বলবানের স্বভাব। সেই পীড়ন নিবারণ জন্যই রাজত্ব। রাজা বলবান হইতে দুর্বলকে রক্ষা করেন, ইহারই জন্য মনুষ্যের রাজশাসনশৃঙ্খলে বদ্ধ হইবার আবশ্যকতা। যদি কোন রাজ্যে দুর্বলকে বলবান পীড়ন করে, তবে তাহা রাজারই দোষ। সে রাজ্যে রাজা আপন কর্তব্যসাধনে হয় অক্ষম, নয় পরাঙ্মুখ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বঙ্গদেশের কৃষক

রাজা সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজপুরুষেরা সমাজের ভৃত্য—একথা কাহারও বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। **বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ধর্মতত্ত্ব**

রাজা আসে যায় রাজা বদলায়
নীল জামা গায় লাল জামা গায়
এই রাজা আসে ওই রাজা যায়
জামা কাপড়ের রং বদলায়
দিন বদলায় না!.......
রাজা আসে যায় আসে আর যায়
শুধু পোষাকের রং বদলায়
শুধু মুখোশের ঢং বদলায়.......। **বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** ঃ রাজা আসে যায়

রাজা মারে ছলে বলে,
প্রজা ভাসে চোখের জলে। **মোহিত চট্টোপাধ্যায়** ঃ কানামাছি খেলা

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে—
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কি স্বত্বে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরূপরতন

আমি গিয়েছি সবার মাঝারে, সেথায় দেখেছি আলোক আসনে—
দেখেছি আমার হৃদয়রাজারে।
আমি দুয়েকটি কথা কয়েছি তা সনে সে নীরব সভা-মাঝারে—
দেখেছি চিরজনমের রাজারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (আমি কেমন করিয়া)

—রাজা তোমাদের মুখ থেকে শুনতে চান রাজ্যে সমস্তই ভালো চলছে—সত্যযুগ, রামরাজত্ব।

—সমস্তই যদি ভালো না চলে?

—তাহলে সেটা গোপন না করলে আরও মন্দ চলবে। রাজাকে অপ্রিয় কথা শোনানো রাজদ্রোহিতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তপতী-১

রাজা হলেই রাজাসনে বসে ; রাজাসনে বসলেই রাজা হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তধারা

রাজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধেই রাজাকে ঠকাতে হয়, রাজাকে ঠেকাতেও হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

পৃথিবীর দুঃখ হরণ যে করে, সেই পৃথিবীর রাজা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা

রাজা হতে গেলে সন্ন্যাসী হওয়া চাই। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ শারদোৎসব

রাত্রি

হে রাত্রি! তোমার ভয়ঙ্কর মুখবিবরে
গোধূলির সোনালী মেঘ অবলুপ্ত ঃ
তুমি ভীষণা কালরাত্রি, মহারাত্রি, মোহরাত্রি
তবু তুমি অতি সৌম্যা—পরমা সুন্দরী!
তোমার বজ্র আমার কাছে বাঁশী
তোমার ভীতি আমার বুকে সংগীতি।

দিনেশ দাস ঃ রাত্রিদেবতা (রাম গেছে বনবাসে)

দিনে প্রখর আলো, স্থূল বাস্তবিকতা, মানুষের দৈন্য ও স্বার্থের অতি স্থূল ঘাত-প্রতিঘাত ; কিন্তু কি আশ্চর্য, রাত্রে সব বদলায়, এই বিশ্বপ্রকৃতিকে প্রসাধন পারিপাট্যে অলঙ্কৃত করে কে যেন মনোহর করে তোলে, রাত্রির স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় দিনের আলোকে যেন আর মনে পড়ে না।

প্রবোধকুমার সান্যাল : মহাপ্রস্থানের পথে

রাত্রি, প্রেয়সী আমার, প্রসন্ন হও, নিদ্রা, দিয়ো না।
তোমার মনে আছে রাত্রি, আমাদের মিলনের অনুষ্ঠান?
সেই নগ্নতার শপথ, স্তব্ধতার শপথ, যৌতুকের বিনিময়?

তুমি আমাকে দিয়েছিলে তোমার চাঁদ, অনেক চাঁদ। আরো অনেক তারা, তারা-ভরা আকাশ, জ্বলন্ত আগুনের নিঃশ্বাস-ফেলা অন্ধকার। আর বিশাল দেশ, মহাদেশ জনতাময় নির্জনতা, আর অনিদ্রার তীব্র মধুর উন্মাদনা।

আর আমি তোমাকে দিয়েছিলাম আমার প্রেম, আমার প্রাণ, আমার আত্মার নির্যাস, সত্তার সৌরভ।

বুদ্ধদেব বসু : রাত্রি

রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড়পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি জাতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ এই প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিতচক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব চরাচর মুখ বুজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ-আঁধারের রূপ নাই? এই যে আকাশ-বাতাস স্বর্গ মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শ্রীকান্ত

রাত্রিকে কোনোদিন মনে হতো সমুদ্রের মতো।
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনো কারো হৃদয়ের কাছে আছে সে রাত্রির মানে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য : রাত্রিকে

রাধা/রাধিকা

কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।
যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণ সফুরে॥
কিংবা প্রেম রসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্তিরূপ করে আরাধনে।
অতএব রাধিকা নাম পুরাণে বাখানে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

হ্লাদিনীর সার প্রেম প্রেম সার ভাব।
ভাবের পরমকাষ্ঠা নাম মহাভাব॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
সর্বগুণখনি কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

চণ্ডীদাস ঃ বৈষ্ণব পদাবলী

মনে পড়ছে ঐ পদটা—
'রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেয়া-গরজন....
স্বপন দেখিনু হেনকালে'।
সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে
কবির চোখের কাছে
কোন্ একটি মেয়ে ছিল,
ভালবাসার কুঁড়ি-ধরা তার মন।
মুখচোরা সেই মেয়ে,
চোখে কাজল পরা,
ঘাটের থেকে নীলশাড়ি
'নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্বপ্ন (শ্যামলী)

রাম

শমন দমন রাবণ রাজা
রাবণ দমন রাম।
শমন ভবন না হয় গমন
যে লয় রামের নাম॥

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

তোমার চরণে এই নিবেদন রাম।
ধনপুত্র বিদ্যা দিয়া পুর মনস্কাম॥
রাম রাম প্রভু রাম কমল-লোচন।
কৃপা কর রামচন্দ্র লইলাম শরণ॥
তোমা বিনা অধমের কেহ নাহি আর।
অন্তিমে শ্রীপদে মতি রাখিবে আমার॥
এই নিবেদন মোর শুন নারায়ণ।
রাম রাম বলি যায় যেন এ জীবন॥

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ (সুন্দরাকাণ্ড)

"কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,—
কহ মোরে সর্বদর্শী হে দেবর্ষি তাঁর পুণ্য নাম।"
নারদ কহিলা ধীরে, "অযোধ্যার রঘুপতি রাম"। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভাষা ও ছন্দ**

রামের চরিত্র কিছু জটিল। ভরত, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি অপরাপর সকল চরিত্রই তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল, একমাত্র রামের সম্পর্কেই ইঁহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। ভরত ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃত্বে, সীতা সতীত্বে এবং দশরথ ও কৌশল্যা পিতৃমাতৃত্বে বিকাশ পাইয়াছেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত হইয়া নদীগুলি এক সমুদ্রে পড়িয়া যেরূপ আপনাদের সত্তা হারাইয়া ফেলে, রামায়ণের বিচিত্র চরিত্রাবলীও সেই প্রকার নানা দিক হইতে রামমুখী হইয়াছে—রামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ ততখানিতেই তাঁহাদের সত্তা ও বিকাশ—এজন্য রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর চরিত্র ন্যূনাধিক সরল। কিন্তু রাম চরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত ;—তিনি রামায়ণে পুত্ররূপে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিলেন,—ভ্রাতারূপে, বন্ধুরূপে, স্বামী ও প্রভু রূপে—সকল রূপেই তিনি অগ্রগণ্য ; বহু দিক হইতে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে এবং বহু বিভাগ হইতে তাঁহার চরিত্র দর্শনীয়। আবার তাঁহার চরিত্রের কতকগুলি আপাত বৈষম্যের সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইবে ; কতকগুলি জটিল রহস্যের মীমাংসা না করিলে তিনি ভালরূপে বোধগম্য হইবেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভূমিকা—দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'রামায়ণী কথা'

রামায়ণ

রামায়ণ ভারতীয় জীবনাদর্শের এক ঐতিহ্যবাহী প্রতীক। এর চরিত্রগুলি আমাদের মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে এক নতুন সত্য উদঘাটিত করতে সাহায্য করে। রামায়ণ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনকে বেঁধে রেখেছে এক পবিত্র প্রীতির বন্ধনে যা অন্য কোন মহাকাব্য আজও দিতে পারেনি।

জীবনের দুটি দিক অন্তর্লোক ও বহির্লোক। এই অন্তর্লোককে চিরকাল ধরে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ'। রামায়ণের রাম চরিত্রকে নিয়ে মহাকাব্য রচনা করা হয়েছে—তাই এই মহাকাব্যের চরিত্রগুলি আদর্শ ও ত্যাগের কল্যাণময় রূপ। তাই রামকে ভারতবাসী তাঁদের অন্তরে গ্রহণ করেছেন অবতাররূপে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ঃ সম্পাদকীয় (কৃত্তিবাসী রামায়ণ)

মানুষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্য ভারতের কবি মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। এবং সে দিন হইতে আজ পর্যন্ত মানুষের এই আদর্শ চরিত্র-বর্ণনা ভারতের পাঠকমণ্ডলী পরমাগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আসিতেছে।

রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে। দেশজয়, শত্রুবিনাশ, দুই প্রবল বিরোধী পক্ষের প্রচণ্ড আঘাত সংঘাত, এই সমস্ত ব্যাপারই সাধারণত মহাকাব্যের মধ্যে আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণের মহিমা রাম-রাবণের যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া নাই—সে যুদ্ধ-ঘটনা রাম ও সীতার দাম্পত্য প্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রতি পুত্রের বশ্যতা, ভ্রাতার জন্য ভ্রাতার কর্তব্য কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে রামায়ণ তাহাই দেখাইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিবিশেষের প্রধানত ঘরের সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাব্যে এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া গণ্য হয় নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভূমিকা—দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'রামায়ণী কথা'

পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে। ইহাকে সে বাস্তব সত্যের অতীত বলিয়া অবজ্ঞা করে নাই, অবিশ্বাস করে নাই। ইহাকেই সে যথার্থ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্ত-হৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।

যে জাতি খণ্ড-সত্যকে প্রাধান্য দেন, যাঁহারা বাস্তব-সত্যের অনুসরণে ক্লান্তি বোধ করেন না, কাব্যকে যাঁহারা প্রকৃতির দর্পণমাত্র বলেন, তাঁহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন—তাঁহারা বিশেষভাবে ধন্য হইয়াছেন—মানব-জাতি তাঁহাদের কাছে ঋণী। অন্যদিকে, যাঁহারা বলিয়াছেন, 'ভূমৈব সুখং। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ', যাঁহারা পরিপূর্ণ পরিণামের মধ্যে সমস্ত খণ্ডতার সুষমা, সমস্ত বিরোধের শান্তি উপলব্ধি করিবার জন্য সাধনা করিয়াছেন, তাঁহাদেরও ঋণ কোনো কালে পরিশোধ হইবার নহে। তাঁহাদের পরিচয় বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের উপদেশ বিস্মৃত হইলে মানবসভ্যতা আপন ধূলি ধূম্রসমাকীর্ণ কারখানাঘরের জনতামধ্যে নিঃশ্বাসকলুষিত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কৃশ হইয়া মরিতে থাকিবে। রামায়ণ সেই অখণ্ড অমৃত পিপাসুদেরই চিরপরিচয় বহন করিতেছে। ইহাতে যে সৌভ্রাত্র, যে সত্যপরতা, যে পাতিব্রত্য, যে প্রভুভক্তি বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি যদি সরল শ্রদ্ধা ও অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পারি, তবে আমাদের কারখানা-ঘরের বাতায়ন মধ্যে মহাসমুদ্রের নির্মলবায়ু প্রবেশের পথ পাইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভূমিকা—দীনেশচন্দ্র সেন রচিত 'রামায়ণী কথা'

রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণ ও মহাভারত.....এই দুটি গ্রন্থ যেমন ভারতবর্ষের অন্তঃকরণের ইতিহাস, তার ধর্মবোধ কর্মনীতি ও চারিত্রিক আদর্শকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে—তেমনিই আবার এ দুটি গ্রন্থ এদেশের চরিত্রনীতি, কর্মাদর্শ ও ধর্মবোধকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। রামায়ণ-মহাভারত ভারতীয় জীবনের জীবন্ত প্রেরণা।

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী ঃ বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব

শ্রীঅরবিন্দ..... বলেন, রামায়ণ হল Oceanic Poetry, মহাভারত Olympian। রামায়ণে যে কাব্যগুণ আছে তা কবির কল্পনা ও হৃদয়ের স্পর্শে অভিনব। রামায়ণে আছে নারীসুলভ কোমলতা, মাধুর্য ও সৌন্দর্য। কিন্তু মহাভারত হল পৌরুষদীপ্ত রচনা। শ্রীঅরবিন্দের মতে Vyasa is the most masculine of writers ; মহাভারতের কাব্যগুণ প্রজ্ঞার দীপ্তিতে, মননের গভীরতায় ও প্রকাশের সংযমে।

জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী ঃ বাংলা সাহিত্যে রামায়ণ-মহাভারতের প্রভাব

অর্থ, নারী ও যশ উপেক্ষা করিয়া আমি যেন আমার শ্রীগুরুর মত প্রকৃত সন্ন্যাসীর মৃত্যু বরণ করিতে পারি। ...... আমি নিজে যাহা কিছু হইয়াছি, ভবিষ্যতে পৃথিবী যাহা হইবে, তাহার সব কিছুরই মূলে আছেন—আমার গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ।......শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী-১০

রামকৃষ্ণ পরমহংস

যখন চোখের জলে ভিতরে ভিতরে বুক ভেসে যায় তখন ওই পরমহংসদেবের ছবির দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ওঁর বাণী তো হৃদয়ে পৌঁছয় না। আমার মন বিশ্রী ছোটো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মালঞ্চ—নীরজার উক্তি

পরমহংসদেবকে আমি ভক্তি করি। ধর্মনৈতিক ধ্বংসবাদের যুগে তিনি আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদ উপলব্ধি করিয়া উহার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রশস্ত মন আপাত পরস্পরবিরোধী প্রতীয়মান বিভিন্ন সাধনপদ্ধতির সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিল এবং তাঁহার আত্মার সারল্যে পণ্ডিত ও ধর্মবেত্তাদের আড়ম্বর ও পাণ্ডিত্যাভিমান চিরধিকৃত (হয়েছে)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে ভাষণ, আনন্দবাজার পত্রিকা ৪.৩.১৯৩৭
(Parliament of Religions-এ কবির ভাষণের অনুবাদ)

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন বিরাট এক জগৎ। এই জগৎকে চেনা ও জানা দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু জানতে পারলে নিজেকে জানা হয়ে যায়। অর্থাৎ নিজে নিজের কাছে বিস্ময়। আমি নিজেকে কি জানি? জানি না। শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে নিজেকে জানতে পারলে তবে আমার স্বরূপকে আমার জানা হবে।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ ঃ ভূমিকা-শতবর্ষের আলোকে রামকৃষ্ণ মিশন

রাষ্ট্র

রাষ্ট্র একটি হৃদয়হীন যন্ত্র। যখন এই যন্ত্রের কাছ থেকে কিছু সহায়তা লাভের সম্ভাবনা থাকে তখনও সে যন্ত্রই। এই উপলব্ধি ছিল গান্ধীরও। তিনি বলেছিলেন The individual has a soul but the state is a soulless machine, ব্যক্তির হৃদয় আছে, আত্মা আছে, রাষ্ট্রের আত্মা নেই। নগরে যোগ হয়েছে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে বণিকশক্তির, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, নগরগুলি দেশের শক্তির ক্ষেত্র, গ্রামগুলি প্রাণের ক্ষেত্র।”

অম্লান দত্ত ঃ গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ

নিছক স্থায়িত্ব নয়, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতি একটা রাষ্ট্রের উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার।

কুমারেশ চক্রবর্তী ঃ প্রধানমন্ত্রী বনাম রাষ্ট্রপতি (প্রতিদিন ৩.৩.২০০১)

যদি এমন একটা রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের কৃষ্টি, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—এইসবগুলোই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলো থাকবে না, তাহলে তা একটা আদর্শ রাষ্ট্র হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী (৬)

‘মারের বদলে মার’ দিয়ে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা করলে সন্ত্রাস হবেই। আর ক্ষমতাসীন দল বিরোধীদের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসার চেষ্টা যদি মার দিয়ে বন্ধ করতে চায় তাহলে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস অনিবার্য হবেই। অথচ মারামারি করে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা বন্ধ করতেই গণতন্ত্র। গণতন্ত্র ও সন্ত্রাস পরস্পরবিরোধী। সহজবোধ্য কারণে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসই সবচেয়ে বিপজ্জনক। কেননা, রাষ্ট্রের চেয়ে বড় সংগঠিত শক্তি আর নেই, তার হাতে পুলিসবাহিনী, সংবিধানসম্মত শক্তি প্রয়োগের অধিকার তার এবং তদুপরি একদিকে আইন ও শৃঙ্খলা আর একদিকে সাধারণ নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রধান দায়িত্বও তারই। তাই রাষ্ট্র নিজেই অগণতান্ত্রিক হয়ে বেপরোয়া শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলে সাধারণ জনজীবন দিশাহারা হয়ে পড়ে। তখন সাধারণ নাগরিকের একাংশ.....সাতে, পাঁচে নেই ভদ্রলোক হয়ে প্রাণ বাঁচাতে চেষ্টা করে, কিন্তু তার অপেক্ষাকৃত ছোট একটা অংশ মারের বদলে মার দেওয়ার জন্য সংগঠিত হতে থাকে।

সুনন্দ সান্যাল ঃ বর্তমান ২.৮.২০০২

রাষ্ট্র একটা যন্ত্র হলেও তার অন্তর্গত প্রজাসমূহ যন্ত্র নয়—তারা মানুষ—পাঠ্য বইয়ের কাল্পনিক 'economic man' বা 'political man' নয়—রক্তমাংস হৃদয়-মন-সম্পন্ন জীবন্ত ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ—তারা শুধু খেয়ে পরে বাঁচতে চায় না, শুধু কম দামে মাল কিনে বেশি দামে বেচতে চায় না, চায় প্রকাশিত হতে, আনন্দিত হতে, দুঃখ পেতে, ত্যাগ করতে। তাদের যে শুধু খিদে পায় আর খিদে মিটলেই ঘুম পায় তা নয়, তারা চিন্তা করে, অনুভব করে, সংগ্রাম করে ; আদর্শ আছে তাদের সেই আন্তরিক জীবনে বিঘ্ন ঘটলে তার ক্ষতিপূরণ অন্য কিছুতেই হতে পারে না।

বুদ্ধদেব বসু : ভাষা ও রাষ্ট্র

রাস্তা

আজ এই রাস্তার গান গাইব,—এই নগরের শিরা-উপশিরার!
এই রাস্তার ধুলির গান!
—তার কাঁকর, তার খোয়া, তার পাথরের—
আজ কিছু তুচ্ছ নয়।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : পথ (প্রথমা)

রুটি

বে-আক্কেলে, কেন ওদের রুটির বায়না
রুটি নেই তো কেন ওরা কেক খায় না।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য : গিলোটিনের পাঁচালী (অসমাপ্ত পুতুলেরা)

মানুষ অনেক উঁচুতে উঠবে
একদিন আকাশের উলটো দিকে
মহাকাশের মঞ্চ থেকে পৃথিবী শাসিত হবে ঃ

এতে কি দূর হবে পৃথিবীর দুঃখ
মানুষের ভাত-রুটির কান্না!

দিনেশ দাস : মহাকাশ, মানুষ রুচি (অসংগতি)

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য : হে মহাজীবন (ছাড়পত্র)

রুদ্র

রুদ্রের কৃপাণ
নির্দয় প্রহারে যেন হানে অকল্যাণ॥

মনীশ ঘটক : রুদ্রপ্রসাদ

বাসনা যখন বিপুল ধুলায় অন্ধ করিয়া অবোধে ভুলায়।
ওহে পবিত্র, ওহে অনিদ্র, রুদ্র আলোকে এসো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি

হে রুদ্রবীণা, বাজো বাজো বাজো ঘৃণা করি দূরে আছে যারা আজও
বন্ধ নাশিবে—তারাও আসিবে দাঁড়াবে ঘিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারততীর্থ (গীতাঞ্জলি)

ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ন্যায়দণ্ড (নৈবেদ্য)

রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি
এসেছে দুয়ার ভেদিয়া ;
বক্ষে বেজেছে বিদ্যুৎবাণ
স্বপ্নের জাল ছেদিয়া॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুপ্রভাত

রূপ

চলেছি রূপের পথে, যে যাত্রার সূচনা হলে আর ফেরার কথা ভাবা যায় না
আনন্দ আমার পথের পাশে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে, বেদনা যেন কুয়াশার মতো ছড়িয়ে পড়ে।
কখনো প্রিয় গানের সুরে কেঁপে ওঠে গাঢ়রাত্রি, হীরের মত জ্বলে ওঠে দিন
রূপের পথ গিয়েছে উদাসীন স্পর্শ করে, কখনো অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে
অগ্রসর হয়েছে পথ, কখনো উষ্ণপ্রদেশের সবুজ অঘ্রানের মাঠ অতিক্রম করে
হিংস্র চিতার উপত্যকা—মৃগশিশুর ঝর্ণা— তাতার রমণীর সংসারের দুয়ারের কাছে এই পথ
বিশাল ঈশ্বরের মতো পড়ে আছে—আমার সমস্ত জীবনের বিস্ময় এই রূপের পথ।

অমিতাভ গুপ্ত : রূপের পথ

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মনভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মেরে কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥

জ্ঞানদাস : বৈষ্ণব পদাবলী

রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘর যাইতে পথ মোর হৈল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া কি জানি করে প্রাণ॥

জ্ঞানদাস : বৈষ্ণব পদাবলী

চিরদিন চিরদিন রূপের পূজারি আমি,
রূপের পূজারি।
সারা সন্ধ্যা, সারা নিশি রূপ বৃন্দাবনে বসি,
হিন্দোলায় দোলে নারী, আনন্দে নেহারী।

দেবেন্দ্রনাথ সেন : প্রকৃতি

নারীর রূপ সে তো চিরন্তনী প্রকৃতির মতো। প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সে তার রূপ রস গন্ধ বর্ণের ডালা সাজিয়ে নিয়ে প্রতীক্ষারতা—যৌবন নিকুঞ্জে অনন্ত পথিকের পদধ্বনির আশায়।

বিধায়ক ভট্টাচার্য : খবর বলছি ২/১

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো, গান দিয়ে দ্বার খোলাব॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন

রূপসাগরে ডুব দিয়েছি অরূপরতন আশা করি
ঘাটে ঘাটে ঘুরব না আর ভাসিয়ে আমার জীর্ণ তরী॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি

জগতের রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয়, সংযম দেখি। সীমাটা অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাত করিয়া, আর সংযমটা অন্য সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ একদিকে আপনাকে মানিতেছে, আর একদিকে অন্য সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টিকিতেছে।....রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারিদিকের মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানে না যে রূপ সেই কুরূপ, তাহা সমগ্রের বিরোধী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

বাস্তব মোরে বঞ্চনা করে
পালায় চকিত নৃত্যে—
তারি ছায়া যবে রূপ ধরি আসে
বাঁধা পড়ি যায় চিত্তে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসী (সানাই)

স্খলিত বসন তব শুভ্র রূপখানি
নগ্ন বিদ্যুতের আলো নয়নেতে হানি
চকিতে চমকি চলি যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

বেশের আদর করতে গিয়ে ওরা
রূপের আদর ভোলে—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তপথে (সানাই)

আমি রূপে তোমায় ভোলাব না,
ভালবাসায় ভোলাব।
আমি হাত দিয়ে দ্বার খুলব না গো
গান দিয়ে দ্বার খোলাব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজা ৮

রূপ জিনিষটা কোনো কালে বলিতে পারিবে না যে, আমি এখানেই থামিয়া দাঁড়াইলাম, আমিই শেষ—সে যদি চলিতে না পারে তবে তাকে বিকৃত হইয়া মরিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রূপ ও অরূপ (সঞ্চয়)

আদি যুগে রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সংকেত এল,
"খোলো আবরণ"।
বাষ্পের যবনিকা গেল উঠে।
রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে ;
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন।
তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।
তাঁর দেখার মহোৎসব দেশে দেশে কালে কালে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ সপ্তক পনেরো ২

কাছে গেলে রূপ কোথা করে পলায়ন,
দেহ শুধু হাতে আসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হৃদয়ের ধন (মানসী)

বৃক্ষ, পল্লব, নদ ও নদী প্রভৃতি সকলেই রূপ আশ্রয় করে। যুবতীতে যে রূপ, লতায় সেই রূপ, নদীতেও সেই রূপ, পক্ষীতেও সেই রূপ, ছাগেও সেইরূপ ; সুতরাং রূপ এক, তবে পাত্রভেদ। আমি গাত্র দেখিয়া ভুলি না ; দেহ দেখিয়া ভুলি না, ভুলি কেবল রূপে। সে রূপ, লতায় থাক অথবা যুবতীতে থাক, আমার মনের চক্ষে তাহার কোন প্রভেদ দেখি না।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পালামৌ

রূপক

রূপক-রচনার উদ্দেশ্য কোনো নীতিকথা, ভাব বা তত্ত্বকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া প্রকাশ করা। রূপকে দৃশ্যত একটি আখ্যানভাগ থাকে, কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে আর একটি প্রকৃত তাৎপর্যপূর্ণ আখ্যানভাগ বর্তমান থাকে। প্রথমটির ছদ্ম আবরণে দ্বিতীয়টি গুপ্ত থাকে।......রূপকের আবেদন বুদ্ধির কাছে। বাচ্যার্থ কোন্ মর্মার্থকে নির্দেশ করিতেছে, এইটুকু বুঝাইতে পারিলেই রূপকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। ইহার কার্য জ্ঞানের ক্ষেত্রে।

উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ রবীন্দ্র-নাট্য-পরিক্রমা

প্রত্যেক জাতির আত্মপ্রকাশের তো এক একটা ধরন থাকে, বাঙালী জানে রূপক ব্যবহারের কৌশল, এমনকি অতিরেক তেমনই এক বিশেষ ধরন। রামপ্রসাদ যে অত সহজে 'মানব জমিন' বা 'কালীপদ-নীলাকাশ' ভাবতে পেরেছিলেন কিংবা ভাটিয়ালি গানে 'মন-মাঝি তুই বৈঠা নে-রে', ফিকিরচাঁদি গানে হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো' এই পারাপারের রূপকল্প অনায়াসে গড়ে তুলেছিলেন তার কারণ বাঙালী শ্রোতা সহজেই রূপক বোঝেন। অর্থাৎ রূপকের মধ্যকার অন্তঃসার সহজে ধরতে পারেন। এর কারণ বস্তুজগৎ আর ভাবজগৎকে মিলিয়ে দেখার প্রবণতা বাঙালীর নিজস্ব স্বভাব।

সুধীর চক্রবর্তী ঃ বাংলা দেহতত্ত্বের গান

রূপক ও সাঙ্কেতিক

সাঙ্কেতিক ও রূপকের পার্থক্য কি?........ইয়েটসের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করা যাক—'A symbol is indeed the possible expression of some invisible essence, a transparent lamp about a spiritual flame ; while allegory is one of many possible representations of an embodied thing, or familiar principle and belongs to fancy and not to imagination ; the one is a revelation, the other an amusement' (Ideas of Good and Evil, p-123) ....অরূপকে রূপের মধ্যে ধরিবার চেষ্টা সাঙ্কেতিক রচনায়, কিন্তু রূপকে রূপান্তরে দেখাইবার ইচ্ছা রূপক রচনায়।

অজিতকুমার ঘোষ ঃ বাংলা নাটকের ইতিহাস

রূপকথা

সারা জীবনের মধ্যে দিয়ে রূপকথারা বয়ে চলেছে। যখন খুশি শুরু হয় তারা, যখন খুশি থেমে পড়ে তারা।

জয় গোস্বামী ঃ সাঁঝবাতির রূপকথারা

আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙালী-বালকের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্ত্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা

হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভূমিকা (ঠাকুরমার ঝুলি)

বাঙালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে—সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভূমিকা (ঠাকুরমার ঝুলি)

আমিই আমার রূপকথার গল্প।

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আমার গল্প (স্বপ্নে উপকূলে)

রেনেসাঁস

'রেনেসাঁস' শব্দটির মৌলিক অর্থ 'পুনর্জন্মলাভ', কিন্তু প্রচলিত অর্থে জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে নবজাগরণ। তাই 'জাগরণ', 'নবজাগৃতি', 'নবজাগরণ' প্রভৃতি শব্দ বর্তমানে 'রেনেসাঁস' অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। শব্দটি যেভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন, রেনেসাঁস বলতে বোঝায় মধ্যযুগীয় বন্ধন থেকে মানবমনের মুক্তি, জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অন্তহীন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল, শঙ্কাহীন সৌন্দর্য সম্ভোগ ও মানুষের আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস।

খোন্দকার সিরাজুল হক ঃ বাংলার রেনেসাঁস ও কাজী আবদুল ওদুদ

রেডিও

বেজে চলে রেডিও
সর্বদা গোলমাল করতেই
রেডি ও॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ দেয়ালিকা-চার

রেলগাড়ি

মাঠের অদৃশ্য পারে চলে রেলগাড়ি
ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর
ধ্বনিরেখা টেনে দিয়ে বাতাসের বুকে,
পশ্চাতে ধোঁয়ায় মেলি
দূরত্বজয়ের দীর্ঘ বিজয়পতাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘণ্টা বাজে দূরে (আরোগ্য)

তখনকার সম্রাটেরও রথ যত বড়ো জমকালো হোক, এখনকার রেলগাড়ির মতো তাতে বহু গাড়ির এমন দ্বন্দ্ব সমাস ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রচনাবলী (বিশ্বভারতী) অবতরণিকা

এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম,
রজনী নিঝুম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাতের গাড়ি (নবজাতক)

রোগ

রোগের যখন বেদনাবোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রজাপতির নির্বন্ধ

রুগী/রোগী

ভদ্রা। রুগীর মৃত্যুতে তোমাদের দুঃখ হয় না?
ধন্বন্তরি। যতক্ষণ রুগীর অভিভাবক বেঁচে আছে, দুঃখ কিসের?
ভদ্রা। কেন?
ধন্বন্তরি। পারিশ্রমিক তো সেই দেবে।

প্রমথনাথ বিশী ঃ মৌচাকে ঢিল

রোগী বাঁচে, রোগী মরে, টাকা রোজগার করি।

বনফুল ঃ তৃণখণ্ড

রোগী আসে, রোগী যায়। কেউ বাঁচে কেউ মরে। কিন্তু মনের উপর কেউ তো দাগ রেখে যায় না। আমার ব্যাঙ্ক ব্যালান্স কিছু বাড়ে শুধু।

বনফুল ঃ হাটে বাজারে

রোগী যথা নিম খায় মুদিয়া নয়ন।

ভারতচন্দ্র রায় ঃ অন্নদামঙ্গল

রোদন

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মনুষ্যমধ্যে অধম। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করিও না। নিশ্চিত জানিও, সে পৃথিবীর সুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরের সুখ কখনও তাহার সহ্য হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ মৃণালিনী

রোদনভরা এ বসন্ত সখী, কখনো আসে নি বুঝি আগে।
মোর বিরহবেদনা রাঙালো কিংশুকরক্তিম রাগে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা

সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিরুদ্দেশ যাত্রা (সোনার তরী)

রোদ্দুর/রৌদ্র

রোদ্দুর.........
নগ্ন ও সাহসী একখানা তলোয়ারের মত
ঝলমল করে ওঠে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ ঘুরে দাঁড়ালেই (কবিতার বদলে কবিতা)

বেলা বেড়ে যায়; ব্যস্ত গৃহিণীর আঁচলটার মতো বাড়িগুলোর কাঁধের উপর থেকে রোদ্দুরখানা গলির ধারে খসে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গলি (লিপিকা)

উজ্জ্বল রৌদ্র গাছের শাখার ভিতর দিয়া যেন অনেকগুলো ঝকঝকে সঙিনের মতো বিঁধিয়া বাহির হইয়া আসিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা-২১

সকালের রৌদ্রটি পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, নীল আকাশের ভালবাসার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঘরে-বাইরে—নিখিলেশের আত্মকথা

মন-কেমন-করা শরতের রোদ্দুর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছেলেবেলা

পড়ন্ত রোদ্দুরে এই পৃথিবী প্রেমের ব্যথায় ভরা হয়ে দেখা দিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রথম চিঠি (লিপিকা)

শীতের রোদ্দুর।
সোনা-মেশা সবুজের ঢেউ
স্তম্ভিত হয়ে আছে সেগুনবনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক—৩৬

রোমাণ্টিকতা

অন্তর্দৃষ্টি—প্রেরণায় বিশ্বাস,—অভ্যস্ত কাব্যরূপ কিংবা গতানুগতিক শব্দ-ছন্দ-অলংকারের অনুসৃতির চেয়ে মনের স্বাধীন আনন্দে স্বাধীনভাবে নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার করবার ঝোঁক,—প্রকৃতি এবং প্রেমের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে বিশ্বের পরমাশ্চর্য ঐক্য উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাওয়া—এই ছিল রোমাণ্টিক আদর্শের মূল বিশেষত্ব। অতীন্দ্রিয়তা (Supernaturalism) এবং মরমীয়তা (Mysticism) এসেছে এদেরই ক্রম-প্রসারণ হিসেবে।

হরপ্রসাদ মিত্র : ক্লাসিক ও রোমান্টিক (সাহিত্যের নানাকথা)

রোমান্স

মনের নিভৃতে রোমান্স লুকিয়ে থাকে। বৃদ্ধ শতাব্দী সেই মনের পৃথিবীকে কখনও চিনতে পারে না।

আবুল বাশার : ফুলবউ

লক্ষ্মী

লক্ষ্মী মাগো এস ঘরে সোনার ঝাঁপি লয়ে করে।
কমল-বনের কমলা গো বিহর হৃদি-কমল 'পরে॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান—লক্ষ্মী-বন্দনা

লক্ষ্মী মা তুই আয় গো উঠে সাগর জলে সিনান করি।
হাতে লয়ে সোনার ঝাঁপি ; সুধার পাত্রে সুধা ভরি॥

ব্যথার সিন্ধু মন্থন শেষ, ভরল যে দেশ হলাহলে,
অমৃত এনে সন্তান বাঁচা, মা তোর পায়ে ধরি॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (দেশাত্মবোধক)

শঙ্খ-ধবল আকাশ-গাঙে স্বচ্ছ মেঘের পালটি মেলে
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে তুমি ধরার ঘাটে কে আজ এলে?
তুমি কি মা লক্ষ্মী আমার দাঁড়ালে মোর কুটির-দ্বারে,
জ্যোৎস্না-তরী বেয়ে এসে মুক্তা-ধবল ধরার পারে?
কে বলে রূপ নাই দেবতার—কে বলে তার মূর্তি নাহি?
যে বলে সে নয়ন মেলে আজকে রাতে দেখুক চাহি।
দেখুক এসে অবিশ্বাসী আমার মায়ের রূপটি কিবা,
চরণে তাঁর লুটায় কিনা লক্ষ চাঁদের রৌপ্য-বিভা।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী : কোজাগর লক্ষ্মী

লক্ষ্মী যখন আসবে তখন কোথায় তারে দিবি রে ঠাঁই?
দেখ রে চেয়ে আপন পানে, পদ্মটি নাই, পদ্মটি নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (স্বরবিতান ৪৪)

লক্ষ্মী খোঁজে শুধু বলীর বাহু
চাহে না ধর্মের পানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মস্তক বিক্রয় (কথা)

লক্ষ্মী, তুমি শ্রী, তুমি সৌন্দর্য, আইস তুমি আমাদের হৃদয়-কমলাসনে অধিষ্ঠান কর। তুমি যাহার হৃদয়ে বিরাজ কর, তাহার আর দারিদ্র্যভয় নাই ; জগতের সর্বত্রই তাহার ঐশ্বর্য। যাহারা লক্ষ্মীছাড়া, তাহারা হৃদয়ের মধ্যে দুর্ভিক্ষ পোষণ করিয়া টাকার থলি ও স্থূল উদর বহন করিয়া বেড়ায়। তাহারা অতিশয় দরিদ্র, তাহারা মরুভূমিতে বাস করে ; তাহাদের বাসস্থানে ঘাস জন্মায় না, তরুলতা নাই, বসন্ত আসে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লক্ষ্মী

জগতের মুখপানে চেয়ে
লক্ষ্মী যবে হাসিলেন হাসি
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুলরাশি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়

লক্ষ্মী কেবল সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্যের দেবী নহেন, তিনি মঙ্গলের দেবী। সৌন্দর্যমূর্তিই মঙ্গলের পূর্ণমূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণস্বরূপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৌন্দর্যবোধ (সাহিত্য)

লক্ষ্মী হলেন এক, আর কুবের হল আর—অনেক তফাৎ। লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রীলাভ করে। কুবেরের অন্তরের কথাটি হচ্ছে সংগ্রহ, সেই সংগ্রহের দ্বারা ধন বহুলত্ব লাভ করে। বহুলত্বের কোন চরম অর্থ নেই।.....আরো চাই, আরো চাই, আরো চাই— এ বাণীতে তো সৃষ্টির সুর লাগে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিক্ষার মিলন

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি প্রতি ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাতে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পথ ইহা জানিবে সকলে।
দুঃসময়ে সুখী হবে তুমি এর ফলে॥

লক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা ও পাঁচালী

লক্ষ্মীছাড়া

ওমা তুই আমারে ছেড়ে আছিস আমি তাই হয়েছি লক্ষ্মীছাড়া।
তোর কৃপা বিনা শক্তিময়ী শুকিয়ে গেল ভক্তি ধারা॥

কাজী নজরুল ইসলাম : ভক্তি-গীতি

লক্ষ্য

আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে হবে, এখনও দীর্ঘ পথ চলতে হবে, মরুভূমি এখনও অতিক্রম করা হয়নি। বহু দীর্ঘকালধরে দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে আমাদের এগোতে হবে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : জাতিগঠনের পথে

লণ্ডমার্চ

চেয়ারের সে তো কত নাম
কেদারা কুর্শি.......তবু

চেয়ারে বসলেই কেউ তো
        'চেয়ারম্যান' হতে পারে না......
যাত্রা সে তো কতই ঘটছে
পদযাত্রা রথযাত্রা রামযাত্রা
তবু কোন যাত্রাই তো
        'লঙমার্চ' হতে পারে না.....।

অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় : সম্ভব নয়

লজ্জা

আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে, কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেইজন্যেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিরকুমার সভা

কেবলমাত্র লজ্জার খাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্যায় পরাভব মানিয়া লইতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চোখের বালি—৫

ছাদে আলসের 'পরে গামলায় একটা রোগা পাতাবাহারের গাছ হঠাৎ দেখা দিয়ে আকাশের কাছে লজ্জা পেলে। তার পাশেই ভিত ভেদ করে অশথ গাছটি সিধে দাঁড়িয়ে; তার পাতাগুলো এদের দেখে যেন পিল্‌পিল্ করে হাসতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পুরোনো বাড়ি—৫ (লিপিকা)

অরুণের লজ্জায় উষা রক্তিম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রজাপতির নির্বন্ধ—২০

        একাকীর কোনো লজ্জা নাই,
লজ্জা শুধু যেথা-সেথা যার-তার চক্ষুর ইঙ্গিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রান্তিক—৩

গোড়ায় যেখানে বেশি লজ্জা দেখা যাচ্ছে.........ভালোবাসার দৌড়টাও সেখানে বড্ড বেশি হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বৈকুণ্ঠের খাতা—২

নয়নপল্লবে লজ্জা, ফুলদল প্রান্তে
শিশিরবিন্দুর মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—১।৫

কালো মেঘের লজ্জাকে সান্ত্বনা দিতেই সুর্যরশ্মি তার ললাটে পরায় ইন্দ্রধনু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শাপমোচন (পুনশ্চ)

কুয়াশায় শুকতারার মতো লজ্জায় সে আচ্ছন্ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শাপমোচন (পুনশ্চ)

চমকি মুখ দু' হাতে ঢাকে,
        শরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
        নিভেনি সেই ক্ষণ !

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুপ্তোত্থিতা (সোনার তরী)

সামান্য একটা লেজ, তাও নেই মানুষের দেহে। পিঠের মাছি তাড়াবার জন্যেই ওদের বিয়ে করতে হয়। .... বিশ্বকর্মার মালমশলা যখন সমস্তই কাবার হয়ে গেল,

তখনই মানুষ গড়তে তাঁর হঠাৎ শখ হল। তাই বেচারাদের পায়ের তলার জন্যে থাবা দূরে থাক, কয়েক-টুকরো খুরের জোগাড় করতে পারলেন না, জুতো প'রে তবে ওরা পায়ের লজ্জা নিবারণ করতে পারে—আর, গায়ের লজ্জা ঢাকে ওরা কাপড়ে জড়িয়ে। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ওরাই হল লজ্জিত জীব। এত লজ্জা জীবলোকে আর কোথাও নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—৬

আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর ; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বদেশী সমাজ (আত্মশক্তি)

লড়াই

যতবেশী অত্যাচার ততবেশী লড়াই।

অমল রায় : বন্দীশালার ডাক

মানুষের লড়াই করার একটা লিমিট থাকে। হোল লাইফ হাতে বন্দুক নিয়ে কাটানো যায় না।

প্রফুল্ল রায় : রণসজ্জা

মানুষের সমুদ্রের, ঝড়ের উত্তাল সমুদ্রের সঙ্গে লড়া যায় না।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : হারানের নাতজামাই

বাধা দিলে বাধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন

ছল করার কম কৌশল লাগে না, লড়াইয়ের তাগবাগের সমানই সে, তবে কিনা তাতে মধুও কিছু খরচ করতে হয়। এ হল নারীর স্বভাবদত্ত লড়াইয়ের রীতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ল্যাবরেটরি—৩ (তিন সঙ্গী)

সমস্তদিন সমস্ত রাত বুকের মধ্যে তৈরী করো ;
স্বাধীনতার জন্যে, নচেৎ কিসের লড়াই!

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : স্বাধীনতার জন্যে (ঈশ্বর থাকেন জলে)

সাম্প্রদায়িকতা, বর্ণবৈষম্য ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি লড়াই করে যাব।

সুভাষচন্দ্র বসু : রচনাবলী

লাইব্রেরি (দ্র. গ্রন্থাগার)

হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত শত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানব হৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লাইব্রেরি (বিচিত্র প্রবন্ধ)

লাইব্রেরির নিজের একটা দায় আছে। সে দায় হচ্ছে তার সম্পদের দায়। যেহেতু তার বই আছে সেইহেতু সেই বইগুলি পড়িয়ে দিতে পারলেই তবে সে ধন্য হয়। সে অক্রিয়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে না। সক্রিয়ভাবে যেন সে ডাক দিতে পারে। কেননা, তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য

সাধারণতঃ লাইব্রেরি বলে থাকে, আমার গ্রন্থতালিকা আছে, স্বয়ং দেখে নেও, বেছে নেও। কিন্তু তালিকার মধ্যে আহ্বান নেই, পরিচয় নেই, তার তরফে কোনো আগ্রহ

নেই। যে লাইব্রেরির মধ্যে তার নিজের আগ্রহের পরিচয় পাই, যে নিজে এগিয়ে গিয়ে পাঠককে অভ্যর্থনা করে আনে, তাকেই বলি বদান্য—সেই হলো বড়ো লাইব্রেরি—আকৃতিতে নয় প্রকৃতিতে। শুধু পাঠক লাইব্রেরিকে তৈরি করে তা নয়, লাইব্রেরি পাঠককে তৈরি করে তোলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লাইব্রেরির মুখ্য কর্তব্য

লাজ

যামিনী না যেতে জাগালে না কেন—
 বেলা হল, মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে
 চলিব পথের মাঝে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লজ্জিতা (কল্পনা)

লাজুক

লাজুক ছায়া বনের তলে
 আলোরে ভালোবাসে।
পাতা সে কথা ফুলেরে বলে,
 ফুল তা শুনে হাসে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

লাবণ্য

লাবণ্যের ঠিক প্রতিশব্দ ইংরাজি ভাষায় নেই, Grace বললে সবটা বুঝায় না, Beauty তাও বলা গেল না। লাবণ্য স্বাদ পৌঁছে দেয় সেইজন্য তাঁকে বলতে পারি Taste। লাবণ্য চমৎকার সামঞ্জস্য দেয় ভাবে ভঙ্গীতে মানে পরিমাণে ও রূপের বিভিন্ন অংশে, সেজন্য তাকে বলা চলে Unity, এইভাবে quality এবং balance তাও পড়ে লাবণ্যের কোঠায়। বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী বলেছে, 'It is the human soul's smile on the house and its belongings'। লাবণ্য যোজন ছাড়া এ আর কি বোঝাচ্ছে? অন্তরের লাবণ্যচ্ছটা বাহিরকে লাবণ্য দিচ্ছে'। 'যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ'।.......এইভাবে লাবণ্য বলতে অনেকগুলো হিসেবে বোঝায় দেখতে পাচ্ছি।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লাবণ্য (বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলী)

এ কী লাবণ্যে পূর্ণ প্রাণ, প্রাণেশ হে
 আনন্দবসন্ত সমাগমে॥
বিকশিত প্রীতিকুসুম হে
 পুলকিত চিতকাননে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (স্বরবিতান-৪৫)

উষার কনক মেঘ দেখিতে দেখিতে
যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের
শুভ্র শিরে অকলঙ্ক নগ্ন শোভাখানি
করি বিকশিত, তেমনি বসন তার
মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে
সুখাবেশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা—২

লাভ

মূর্খেরা লাভ করে উন্নতি, যোগ্য ব্যক্তিরা লাভ করে গৌরব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুই বোন। নীরদ

বিশেষ প্রয়োজনের সংকীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শান্তিনিকেতন-হওয়া

লালঝাণ্ডা

ভীরুতার মুখে লাথি মেরে লালঝাণ্ডা ওড়াই।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ দীক্ষিতের গান

লালফিতা

লালফিতার একটা নিজস্ব ধর্ম আছে। পৃথিবীতে যত ism আবিষ্কৃত হয়েছে, Buddhism থেকে শুরু করে Rheumatism পর্যন্ত—Red-Tapism তাদের কারুর থেকেই কম যায় না। আমার মতে লালফিতার ধর্মই সবচেয়ে বেশি পরাক্রান্ত, কেননা পরকে আক্রমণ করতে আর কাবু করতে এর জুড়ি নেই।

শিবরাম চক্রবর্তী ঃ কালান্তক লালফিতা

লিটল ম্যাগাজিন

লিটল ম্যাগাজিনের জন্যে আমাদের
সমস্ত অহংকারকে
চন্দন আর নম্রতা দিয়ে
আর সারাজীবনের দুঃখকষ্ট দিয়ে
সাজাতে সাজাতে মনে হয়
ওরা যখন বিদ্রূপ করে আমাদের
মহাপত্রিকার মতো ওরা যখন ছুঁড়ে দেয়
অফসেটের মতো ঝকঝকে টাকা পয়সা
তার বিরুদ্ধে, কী আমাদের বিদ্রূপ
কয়েকটি সম্পূর্ণ কবিতা লিখে যাওয়া।

অমিতাভ গুপ্ত ঃ বিদ্রূপের বিরুদ্ধে

দীর্ঘকাল নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই লিটল ম্যাগাজিনের আত্মপ্রতিষ্ঠা।.......তার সংগ্রামী আপসহীন চেতনার গভীরে আছে দুর্নিবার গতি। নিত্যনতুন আঙ্গিক প্রকরণে জীবনের বহুমুখী দিক উন্মোচনের নিরন্তর অন্বেষা তার প্রাণধর্ম।

নবকুমার শীল ঃ লিটল ম্যাগাজিন সংবাদ ৬.২.২০০৩

লিটল ম্যাগাজিন উন্নত চেতনার প্রতীক
লিটল ম্যাগাজিন চিরকাল প্রতিবাদের অনিবার্য হাতিয়ার
লিটল ম্যাগাজিন জীবনের কথা কয় আগুয়ান নিঃসংশয়।

বরুণ চক্রবর্তী ঃ অতন্দ্রপথ (২০০৩)

লিটল কেন? আকারে ছোটো বলে? প্রচারে ক্ষুদ্র বলে? নাকি বেশি দিন বাঁচে না বলে? সব কটাই সত্য, কিন্তু এগুলোই সব কথা নয় ; ওই 'ছোটো' বিশেষণটাতে আরো অনেকখানি অর্থ পোরা আছে। প্রথমত, কথাটা একটা প্রতিবাদ ; এক জোড়া মলাটের মধ্যে সবকিছুর আমদানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বহুলতম প্রচারের ব্যাপকতম মাধ্যমিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। লিটল ম্যাগাজিন ঃ বলেই বোঝা গেল যে জনপ্রিয়তার কলঙ্ক একে কখনও ছোঁবে না, নগদ মূল্যে বড়োবাজারে বিকোবে না, কিন্তু—হয়তো—কোন একদিন এর একটি পুরোনো সংখ্যার জন্য গুণিসমাজের উৎসুকতা

জেগে উঠবে, সেটা সম্ভব হবে এইজন্যেই যে, এটি কখনও মন যোগাতে চায়নি মনকে জাগাতে চেয়েছিল। চেয়েছিল নতুন সুরে কথা বলতে ; কোনো এক সন্ধিক্ষণে যখন গতানুগতিকতা থেকে অব্যাহতির পথ দেখা যাচ্ছে না, তখন সাহিত্যের ক্লান্ত শিরায় তরুণ রক্ত বইয়ে দিয়েছিল—নিন্দা নির্যাতন বা ধনক্ষয়ে প্রতিহত হয়নি। এই সাহস, নিষ্ঠা, গতির একমুখিতা, সময়ের সেবা না করে সময়কে সৃষ্টি করার চেষ্টা—এইটেই লিটল ম্যাগাজিনের কুলধর্ম।

বুদ্ধদেব বসু ঃ সাহিত্য পত্র

লিবিডো

—আমার ফাঁকা লিবিডোকে এখন চালাব
কোন্ বুর্জোয়া খেয়ালের বাঁকা খালে?
কোন্ ধ্রুপদী অবদমনের নিদ্রাহীনতায়।

বিষ্ণু দে ঃ টপ্পা-ঠুংরি (চোরাবালি)

লীলা

তোমারে পাছে সহজে বুঝি
তাই কি এত লীলার ছল,
বাহিরে যবে হাসির ছটা
ভিতরে থাকে আঁখির জল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ—৪

চিরকাল একি লীলা গো—
        অনন্ত কলরোল।
অশ্রুত কোন্ গানের ছন্দে
        অদ্ভুত এই দোল।.....
চিরকাল একই লীলা গো
        অনন্ত কলরোল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উৎসর্গ— ৩৮

আঁধারের লীলা আকাশে আলোক লেখায়-লেখায়,
        ছন্দের লীলা অচলকঠিনমৃদঙ্গে।
অরূপের লীলা অগোনা রূপের রেখায় রেখায়,
        স্তব্ধ অতল খেলায় তরলতরঙ্গে।
আপনারে পাওয়া আপনা-ত্যাগের গভীর লীলায়,
মূর্তির লীলা মূর্তিবিহীন কঠোর শিলায়।
শান্ত শিবের লীলা যে প্রলয়রুদ্রভঙ্গে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আঁধারের লীলা আকাশে (গীতবিতান)

তিনি মুক্ত, তাই তাঁর লীলা বন্ধনে ; আমরা বদ্ধ সেইজন্য আমাদের আনন্দ মুক্তিতে।..... গান যে করে সে আনন্দের দিক হইতে রাগিণীর দিকে যায়, গান যে শোনে সে রাগিণীর দিক হইতে আনন্দের দিকে যায়। একজন আসে মুক্তি হইতে বন্ধনে, আর-একজন যায় বন্ধন হইতে মুক্তিতে,.............তিনি যে গাহিতেছেন, আর আমরা যে শুনিতেছি। তিনি বাঁধিতে বাঁধিতে শোনান, আমরা খুলিতে খুলিতে শুনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ। শ্রীবিলাস—৩

আঁধারে আলোয়
প্রত্যহের প্রাণলীলা সাদায় কালোয়
ছায়ানাট্যে ক্ষণিকের নৃত্যচ্ছবি যায় লিখে লিখে,
লুপ্ত হয় নিমিখে নিমিখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বোরোবুদুর (পরিশেষ)

'তারপরে' প্রশ্নের উত্তর নেই সব চুপ। এই তো সৃষ্টির লীলা এ তো কৃপণের পুঁজি নয়। এ যে আনন্দের অমিতব্যয়। মুকুল ধরেও যেমন ঝরেও তেমনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ বর্ষণ

লুকোচুরি

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায় লুকোচুরি খেলা রে ভাই, লুকোচুরি খেলা—
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা রে ভাই—লুকোচুরি খেলা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেফালি

পৃথিবীর রসই তো হল এই লুকোচুরিতে। ঐশ্বর্য সেখানে দরিদ্রবেশে দেখা দেয়, শক্তি..........অক্ষমের কোলে মানুষ হয়, বীর্য..................পরাভবের মাটির তলায় আপন জয়স্তম্ভের ভিত্তি খনন করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্বর্গ-মর্ত্য (লিপিকা)

লুণ্ঠিত

লুণ্ঠিতের আবার জাত কী?

উৎপল দত্ত : তীর

লেকচার

কলকাতার লোকের ওই এক! কেবল লেকচার দেওয়া, আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নাই! তুমি বুঝাবার কে?

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

লেখক

লেখক হিসেবে আমি ভালো-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত সব দেখি আর শুনি, শেষে তাই থেকেই জীবন-সোনা ঝালিয়ে তুলি।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় : উত্থান

একজন সৃষ্টিশীল, সৎ লেখক কখনোই কারো 'ইয়েসম্যান' হতে পারে না। তাই তাঁর ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না প্রতিষ্ঠান, প্রাতিষ্ঠানিক লোকজন।

কিন্নর রায় : সর্বনাশের আশায়

জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে—বিপুল অভিজ্ঞতার সঙ্গে, লিখতে পারা কল্পনা, লেখাকে শিল্প করে তোলার সাহস—সব কিছু মিশে গেলে লেখা হয়। একটি লেখা সত্যি সত্যি হয়ে ওঠে।'

কিন্নর রায় : সর্বনাশের আশায়

লেখক হতে গেলে যথেষ্ট পরিমাণে পড়াশুনা করতে হয়।

নারায়ণ চৌধুরী : লিখিয়ে ও পড়িয়ে (সাহিত্য ভাবনা)

বড় বড় লেখকেরা ভাবেন বেশী, পড়েন বেশী, লেখেন কম।

নারায়ণ চৌধুরী : লিখিয়ে ও পড়িয়ে (সাহিত্য ভাবনা)

বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সঙ্গত।

প্রমথ চৌধুরী : সাহিত্যে খেলা

লেখক হিসাবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসাবে, একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখনোই ক্ষমা করে না।

মহাশ্বেতা দেবী ঃ অরণ্যের অধিকার (ভূমিকা)

লেখা

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখা (পরিশেষ)

লেখা হবে সারবান
অতিশয় ধারবান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শীতে ও বসন্তে (চিত্রা)

যা সত্যই জানো না, তা কখনো লিখো না। যাকে উপলব্ধি করোনি সত্যানুভূতিতে যাকে আপন করে পাওনি, তাকে ঘটা করে ভাষার আড়ম্বরে ঢেকে পাঠক ঠকিয়ে বড়ো হতে চেয়ো না।.....আপন সীমানা লঙ্ঘন করাই আপন মর্যাদা লঙ্ঘন করা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্মদিনের ভাষণাবলী (৫৭তম জন্মদিনে)

বউ বলে হ্যাঁগো শোনো
বলে রাখি পষ্ট
হিজিবিজি লেখা মানে
সময়টা নষ্ট
তার চেয়ে ঘাস কাটো
পাবে কিছু টাকা
মাথার উপরে হবে
ছাদটুকু পাকা।

সনৎকুমার মিত্র ঃ ঘাস কাটো (কফি হাউস ঃ গ্রীষ্ম ১৪০৬)

লেখাপড়া

গরীব মানুষের লড়াইয়ে লেখাপড়াটা একটা হাতিয়ার। অ আ ই অক্ষরগুলো এক-একটা বুলেটের চেয়েও ত্যাজী।

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ ঃ স্বরবর্ণ

আমার বাপের অতুল বিষয়—আমার লেখাপড়ায় কাজ কি? কেবল নাম সহি করিতে পারিলেই হইল।...........আমোদ করিবার এই সময়,—এখন কি লেখাপড়ার যন্ত্রণা ভাল লাগে?

প্যারীচাঁদ মিত্র ঃ আলালের ঘরের দুলাল

লেজ

লেজই বলো কবিত্বই বলো, ভিতরে না থাকলে জোর করে টেনে বের করবার জো নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিরকুমার সভা

লেজের সঙ্গে মনের প্রভেদ এই যে, মনটা আগে আগে চলে এবং লেজটা পশ্চাতে পড়িয়া থাকে—এইজন্যই জগতে লেজের এত লাঞ্ছনা এবং মনের এত মাহাত্ম্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাঞ্জলতা (পঞ্চভূত)

লেনিন

লেনিন ভেঙেছে বিশ্বে জনস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ,
অন্যায়ের মুখোমুখী লেনিন জানায় প্রতিবাদ।
মৃত্যুর সমুদ্র শেষ ; পালে লাগে উদ্দাম বাতাস
মুক্তির শ্যামল তীর চোখে পড়ে, আন্দোলিত ঘাস।
লেনিন ভূমিষ্ঠ রক্তে, ক্লীবতার কাছে নেই ঋণ,
বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ লেনিন (ছাড়পত্র)

লাল নিশান নিয়ে একদল মজুরের এক বিশাল মিছিল আসছে।
আমার মনে হল, লেনিন যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন ঃ
'শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে—
একটু পা চালিয়ে, ভাই, একটু পা চালিয়ে'॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ একটু পা চালিয়ে, ভাই

লোকনাট্য

লোকশিক্ষার উদ্দেশ্যে মূলতঃ লোকনাট্য রচিত হয়। বিভিন্ন লৌকিক ধারণা যেমন, ধর্মাধর্ম, সৎ-অসৎ, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি অবলম্বনে এর কাহিনী গড়ে ওঠে ; চরিত্রের প্রকৃতিও সেই ভাব অনুসারে সৃষ্ট হয়।.....লোকনাট্যের সঙ্গে মেলোড্রামার সম্পর্ক গভীর।

বাসন্তী চাকী ঃ বঙ্গরঙ্গমঞ্চে নাট্যকার বিধায়ক

লোকনাট্য লোক ঐতিহ্যেরই একটি দিক। মুখ্যতঃ বাক্‌কেন্দ্রিক ও অঙ্গভঙ্গিকেন্দ্রিক অনুকৃতিমূলক শিল্প। মূল লক্ষ্য নাট্যরস পরিবেশন। লোকনাট্যে পাই একাধিক চরিত্রসহায়তার ঘটনা-বিশেষের দ্বন্দ্বময় উপস্থাপনা। সমগ্র লোকসমাজ এর স্রষ্টা। এ সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত। ব্যক্তি স্রষ্টা যদি কোথাও থাকে তো সে উপলক্ষ মাত্র। অর্থাৎ, সে সমগ্র লোকসমাজেরই প্রতিনিধি। ব্যক্তির সৃষ্টিকে ইচ্ছেমতো বদলে নিতে লোকসমাজের বাধে না। যতক্ষণ না লোকসমাজের মনোমত অর্থাৎ রুচি-ধ্যান-ধারণা, বিশ্বাস-সংস্কার ও নীতিবোধের অনুকূল হয়, ততক্ষণ চলে এই ভাঙা-গড়ার পালা। লোকনাট্যের অভিনেতা ও দর্শকগণও ঐ একই সমাজের সদস্য।

মানস মজুমদার ঃ লোক ঐহিত্যের দর্পণে

নিছক লোকমনোরঞ্জন লোকনাট্যের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়।.....নানা ধরনের অন্যায়-অবিচার, শোষণ-পীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও লোকনাট্যে ধ্বনিত হয়।

মানস মজুমদার ঃ লোক ঐতিহ্যের দর্পণে

লোকসংস্কৃতি

লোকসংস্কৃতি উচ্চ বা মার্জিত সংস্কৃতির বিপরীত কোটীর সাধারণ মানুষের সংস্কৃতিরই নির্দেশক হয়ে ওঠে। 'লোকায়ত সংহত সমাজের মূলত সমষ্টিগত জীবনচর্যার ও মানসচর্চার স্বতঃস্ফূর্ত নামাঙ্কহীন সামগ্রিক কৃতি-ই লোককৃতি বা লোকসংস্কৃতি'। .....আধুনিক লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞানীর কাছে লোকসংস্কৃতি পুরাতনী চর্চার বিষয় বা অতীতের ফসলমাত্র নয়। তা চলমান কালের প্রবাহে সজীব ও ক্রম সম্প্রসারিত বিষয়। ঐতিহ্যবোধ সঞ্চার, স্বদেশানুরাগ সৃষ্টি, জাতীয়তাবোধ জাগরণ, সংহতি সাধন, সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিরোধ সৃষ্টি, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রূপায়ণ, সংযোগমাধ্যম সৃষ্টি প্রভৃতি ক্ষেত্রে লোকসংস্কৃতির ব্যবহারিক প্রয়োগগত ফলিত মূল্য (Functional Applied Aspect of Folklore) অপরিসীম।

তুষার চট্টোপাধ্যায় ঃ লোকসংস্কৃতি পাঠের ভূমিকা [বিষয় প্রবন্ধ]

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য লোকসমাজেরই সৃষ্টি। লোকের মুখে মুখে রচিত, মুখে মুখে প্রচারিত।.......গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন এ সাহিত্যে।.......... লোকসাহিত্য হলো লোকসমাজের দর্পণ।

মানস মজুমদার ঃ লোকসাহিত্য পাঠ

লোকায়ত

লোকায়ত মানে বস্তুবাদী দর্শন। লোকায়ত মানে জনগণের দর্শনও।
‘লোকেষু আয়তো লোকায়তঃ’। জনসাধারণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই নাম লোকায়ত। ব্যাখ্যা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, ‘লোকায়ত মত লোকে আয়ত অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই ওই নাম পাইয়াছে।’ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন, নামটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো ঃ জনসাধারণের মধ্যে যার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি বৌদ্ধগ্রন্থ ‘দিব্যাবদান’এর নজির দেখিয়েছেন ; গ্রন্থটিতে লোকায়ত শব্দ এই ব্যুৎপত্তিগত অর্থেই ব্যবহৃত।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ঃ ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে

লোভ

যেটুকু প্রয়োজন, তার বেশি লোভ কোরো না। তাতে লাভ তো হবেই না, বরঞ্চ ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় ঃ ইমনের অন্তরালে (ভাঙা সময়ের কথকতা)

লোভই সকল পাপের আশ্রয়। লুব্ধ ব্যক্তিই পাপে আসক্ত হয়। আদিত্য উদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয় তেমনি কল্যাণকর কর্মে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।

চিত্তরঞ্জন মাইতি ঃ সত্যবতীর শাখা-প্রশাখা

মস্ত-বড়োর লোভের শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে
ব্যস্ত-আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান (সাধন কি মোর)

তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেওয়াল গাঁথ আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁধ কাটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সন্দীপের আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

মনে লোভ থাকিলেই মারের মুখে থাকিতে হয়। তখন নিজেকে মারিবার বিষ নিজের মনই জোগায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বোষ্টমী (গল্পগুচ্ছ)

দিনের আলো নিবে এল
  সুয্যি ডোবে-ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
  চাঁদের লোভে লোভে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ‘বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর’ (শিশু)

নিজের প্রকৃতিকে লঙ্ঘন করিলে দুর্বল হইতে হয়। ব্যাঘ্রের আহার্য পদার্থ বলকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু হস্তী তাহার প্রতি লোভ করিলে......মরিবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দেশীয় রাজ্য (আত্মশক্তি)

কাজল-আঁকা   সিঁদুর-মাখা
  চুলের গন্ধে-ভরা

শয্যাপ্রান্তে ছিন্নবেশে
চাস কি যেতে ত্বরা।
বুকের 'পরে নিশ্বসিয়া
স্তব্ধ রহে গান—
লোভে কম্পমান॥ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ যথাস্থান (ক্ষণিকা)

লোভী

যারা লোভী, তারা অন্যদেরও লালসাপরায়ণ মনে করে।

দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু

মিষ্টি তুমি ভালোবাস,
তাই কি ঘরে 'পরে
লোভী ব'লে তোমার নিন্দে করে!
ছি ছি, হবে কী।
তোমায় যারা ভালোবাসে
তারা তবে কী॥ **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ অপযশ (শিশু)

লৌকিক ধর্ম

বৈদিক ধর্ম নয়, লৌকিক ধর্মই ভারতবর্ষকে পুণ্যভূমি করে তুলেছে। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের ধর্ম হচ্ছে লৌকিক ধর্ম, বিদেশী বিজেতা আর্যদের ধর্ম হচ্ছে বৈদিক ধর্ম। ভারতবর্ষের মাটি ও ভারতবর্ষের জলই হচ্ছে লৌকিক ধর্মের প্রধান উপাদান। সে ধর্ম আকাশ থেকে পড়েনি, মাটি থেকে উঠেছে। ভারতবর্ষের জনগণ চিরদিন কৃষিজীবী। যে ত্রিকোণ পৃথিবী তাদের চিরদিন অন্নদান করে সেই হচ্ছে অন্নদা এবং যে জল তাদের শস্যক্ষেত্রে রসসঞ্চার করে সেই হচ্ছে প্রাণদা। তাই ভারতবর্ষের অসংখ্য লৌকিক দেবতা সেই অন্নদার বিকাশ।

প্রমথ চৌধুরী ঃ ভারতবর্ষের ঐক্য

শকুনি

দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—১৭

শক্ত

পোকা যখন গুটি বাঁধে তখন তত বেশি ভয় নয় ; কিন্তু যখন কাটিয়া উড়িয়া যায় তখন ফেরানো শক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চোখের বালি—৫

বড়ো শক্ত বুঝা।
যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ চৈতালি

সমস্ত সহজ করিতে হইবে, এই চেষ্টায় মানুষের জানা-শোনা খাওয়া-দাওয়া আমোদ-প্রমোদ সমস্তই অসম্ভব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাঞ্জলতা—(পঞ্চভূত)

পেট ভ'রে গেলে যা থাকে বাকি
সেটা দিয়ে দিতে শক্তটা কী। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ লক্ষ্মীর পরীক্ষা (কাহিনী)

সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় ক'ষে আঁটতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১১

আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয় ; কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ওইটেতেই সে আকার পায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১১

সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয়, তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাওয়া শক্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সফলতার সদুপায় (আত্মশক্তি)

শক্তি

শাক্ত দর্শনের শক্তি চৈতন্যরূপিণী। তিনিই ইচ্ছা ক্রিয়া জ্ঞান। স্বরূপত তিনিই স্ত্রীরূপিণী ব্রহ্ম বা ব্রহ্মময়ী। তাঁর ইচ্ছাতেই পুরুষ শক্তিমান হয়ে ওঠেন। শক্তির স্পন্দনেই পুরুষের জাগরণ ঘটে, পুরুষের ভিতর 'অহন্তা', 'ইদন্তা'-বোধ জাগে। নচেৎ পুরুষ শব। মহাশক্তিরূপিণী মায়ের পদতলে শবরূপী শিবের কল্পনা—এই তত্ত্ব থেকেই কল্পিত হয়েছে।

......এই শক্তি একাধারে অরূপ ব্রহ্ম ও রূপময়ী ঈশ্বরী, তিনি নির্গুণা হয়েও সগুণা। শাক্ত দর্শনও এক অদ্বয়তত্ত্বেই বিশ্বাসী। কিন্তু সে তত্ত্ব 'শক্তিবিশিষ্টাদ্বৈত তত্ত্ব'। প্রপঞ্চ সৃষ্টিতে তিনি সাংখ্যের প্রকৃতির মতই অবতীর্ণা হন, কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির মত তিনি জড় বা অচিৎ নন। শক্তি চৈতন্যরূপিণী। অদ্বৈত বেদান্তের ব্রহ্ম পুরুষের মত তিনি ব্রহ্মময়ী।

জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী : শক্তিতত্ত্ব ও শক্তি সাধনা (বিষয় : প্রবন্ধ)

শক্তি.......নিয়মকে মানে........কেবল নিয়মকে মানিবার জন্য নহে, আপনাকেই মানিবার জন্য। আর শক্তিহীনতা যখন নিয়মকে মানে তখন সে নিয়মকেই মানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : খেলা ও কাজ (পথের সঞ্চয়)

শক্তির দুটো অংশ আছে—এক অংশ ব্যক্ত, আর-এক অংশ অব্যক্ত, ...এক অংশ প্রয়োগ, আর-এক অংশ সম্বরণ ; শক্তির এই সামঞ্জস্য যদি নষ্ট কর তাহলে সে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, কিন্তু সে ক্ষোভ মঙ্গলকর নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গোরা—১৭

স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে শিক্ষার যে প্রভেদ, উত্তেজনার সঙ্গে শক্তির সেই প্রভেদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পথ ও পাথেয় (রাজা প্রজা)

শক্তির ক্ষেত্রে......ঈশ্বরের দুই মূর্তি......এক হচ্ছে অন্নপূর্ণা...... ; আর-এক হচ্ছে করালী কালী.....।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রকৃতি (শান্তিনিকেতন)

শক্তিকে মাপা যায় ; তার সংখ্যা, তার ওজন, তার বেগ সমস্তেরই আয়তন গণিতের অঙ্কের মধ্যে ধরা পড়ে। তাই যারা শক্তিকেই চরম বলে জানে তারা আয়তনে বড়ো হতে চায়। টাকার সংখ্যা, লোকের সংখ্যা, উপকরণের সংখ্যা, সমস্তকেই তারা কেবল বহুগুণিত করতে থাকে।

এইজন্যেই সিদ্ধিলাভের কামনায় এরা অন্যের অর্থ, অন্যের প্রাণ, অন্যের অধিকারকে বলি দেয়। শক্তিপূজার প্রধান অঙ্গ বলিদান। সেই বলির রক্তে পৃথিবী ভেসে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাতায়নিকের পত্র (কালান্তর)

এই বড়ো দুঃসময়ে কামনা করি, শক্তির বীভৎসতাকে কিছুতে আমরা ভয়ও করব না, ভক্তিও করব না, তাকে উপেক্ষা করব, অবজ্ঞা করব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র (কালান্তর)

শক্তির একাগ্র সোজা রেখায় সৃষ্টি হয় না—...............তাহা প্রলয়েরই রেখা ; রুদ্রের প্রলয়পিনাকের মতো তাহাতে কেবল একই সুর, তাহাতে সংগীত নাই ;........শক্তি একক হইয়া উঠিলেই তাহা বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। দুই শক্তির যোগেই বিশ্বের যত কিছু ছন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা

বাধা পেলে শক্তি নিজেকে চিনতে পারে—চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রথের রশি (কালের যাত্রা)

আকর্ষণ গুণে প্রেম এক ক'রে তোলে।
শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

শক্তিই জগতের মূলাধার। সেই আদ্যাশক্তির ভিতরে বিদ্যা ও অবিদ্যা দুই আছে। অবিদ্যা—মুগ্ধ করে। অবিদ্যা—যা থেকে কামিনী কাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিদ্যা—যা থেকে ভক্তি, দয়া, জ্ঞান, প্রেম ঈশ্বরের পথে লয়ে যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

শক্তিমান

শক্তিমান পুরুষেরা যে দিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল। তবে ভারতবর্ষে শক্তিমান পুরুষ কে? না-ধর্মবীর। তাঁরা আমাদের সমাজকে চালান। তারাই সমাজের রীতি-নীতি বদলাবার দরকার হ'লে বদলে দেন। আমরা চুপ করে শুনি আর করি।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

শঙ্কর

মোর সংসারে তাণ্ডব তব কম্পিত জটাজালে।
লোকে লোকে ঘুরে এসেছি তোমার নাচের ঘূর্ণিতালে।
ওগো সন্ন্যাসী, ওগো সুন্দর, ওগো শঙ্কর, হে ভয়ঙ্কর,
যুগে যুগে কালে কালে সুরে সুরে তালে তালে।
জীবন-মরণ-নাচের ডমরু বাজাও জলদমন্দ্র হে॥
নমো নমো নমো—
তোমার নৃত্য অমিত বিত্ত ভরুক চিত্ত মম॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৃত্যের তালে তালে (গীতবিতান)

শঙ্কা

তখন বর্ষণহীন অপরাহ্ণমেঘে
শঙ্কা ছিল জেগে ;
ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনায়
বায়ু হেঁকে যায় —
শূন্যে যেন মেঘচ্ছিন্ন রৌদ্ররাগে পিঙ্গলজটায়
দুর্বাসা হানিছে ক্রোধ রক্তচক্ষুকটাক্ষচ্ছটায়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিচয় (মহুয়া)

ঘরের কোণের দীপশিখাটি নববধূর মতো শঙ্কিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্ত

শঙ্খ

ওরে তুই ওঠ আজি।
আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ এবার ফিরাও মোরে (চিত্রা)

তব বাম বাহু বেড়ি শঙ্খবলয়
তরুণ ইন্দুলেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাত্রে ও প্রভাতে (চিত্রা)

তোমার শঙ্খ ধুলায় পড়ে,
কেমন করে সইব।
বাতাস আলো গেল মরে
এ কী রে দুর্দৈব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা-৪

বক্ষে আমার দুঃখে তব
বাজবে জয়ডঙ্ক।
দেব সকল শক্তি, লব
অভয় তব শঙ্খ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা-৪

(আজি) শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও জননী এসেছে দ্বারে।
সপ্তসিন্ধু কল্লোল রোল বেজেছে সপ্ত তারে।।

হীরেন বসু ঃ গান

শঠ

শঠের সমাপ্তি আত্মঘাতে। শঠ যে সে
আপনারে আপনি ঠকায়।

মনীশ ঘটক ঃ রুদ্রপ্রসাদ

শতদল

যৌবনসরসীনীরে
মিলনশতদল
কোন্‌-চঞ্চল বন্যায় টলোমল টলোমল।
শরমরক্তরাগে তার গোপন স্বপ্ন জাগে,
তারি গন্ধকেশর-মাঝে
এক বিন্দু নয়নজল।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যৌবন সরসনীরে (গীতবিতান)

আকাশতলে উঠল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়ালো দিক্‌-দিগন্তরে,
ঢেকে গেল অন্ধকারের.......
নিবিড় কালো জল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি—৪৮

শতাব্দী

লাল নিশান নিয়ে একদল মজুরের এক বিশাল মিছিল আসছে।
আমার মনে হল লেনিন যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন :
'শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে—
একটু পা চালিয়ে, ভাই একটু পা চালিয়ে'॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায় : একটু পা চালিয়ে, ভাই

শত্রু

যে প্রাণী কাউকে মারে না, বা কাউকে আঘাত করে না, নিজে বা কারও দ্বারা পরের জিনিষ নেয় না, সমস্ত জীবজন্তুতে বন্ধুভাব পালন করে, তার কখনও কেউ শত্রু হতে পারে না।

প্রণব রায় : বৃথা উপদেশ (জাতক-কথা)

শপথ

সখী, প্রতিদিন হায় এসে ফিরে যায় কে।
তারে আমার মাথার একটি কুসুম দে॥
যদি শুধায় কে দিল কোন্ ফুলকাননে,
মোর শপথ, আমার নামটি বলিস নে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : 'সখী, প্রতিদিন' গীতবিতান

শবে বরাত

শবে বরাতের রাত্রিতে আজি চাহি নাকো শুধু ধন ও মান,
সবার ভাগ্যে দিও যাহা খুশি জাতিতে দিওগো মুক্তি দান।
জাগরণ লিখো নসিবে তার,
দিও সাধ প্রাণে বড় হবার,
নব গৌরবে বিশ্বে আবার দাঁড়ায় যেন এ মুসলমান।

গোলাম মোস্তাফা : শবে বরাত (খোশ রোজ)

শব্দ

শব্দকে আজ শুধু ব্রহ্ম নও, ব্রহ্মাস্ত্র বানাও।

কমল মুখোপাধ্যায় : শব্দ, ব্রহ্মাস্ত্র (কালো অশ্বারোহী ও নীল তারা)

ভালবাসা, সততা, স্নেহ, দাম্পত্য জীবন—এইসব ছোট ছোট চার কি পাঁচ অক্ষরের শব্দগুলোর মধ্যে যে ধারণাগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু ছোট নয়। এরা প্রত্যেকেই এক একটা জগৎ। এবং বিভিন্ন মানুষের মনে এ জগৎ বিভিন্ন আকারের। কারুর ছোট, কারুর বড়।

বিমল কর : শূন্য

.........করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে ভার জটিল নিয়মসূত্রজালে
বার্তাবহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।
বল্গাবদ্ধ শব্দ অশ্বে চড়ি
মানুষ করেছে দ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জন্মদিনে—২০

আজও যে-সব মানুষ আদিম অবস্থায় আছে............
তারা শুধু শুধু শব্দ করতে ভালোবাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পয়লা নম্বর (গল্পগুচ্ছ)

ভাষার শব্দগুলো চলে অভিধানের আঁচল ধ'রে। এই গোলামি ঘটেছে ভাষার কলিযুগে। সত্যযুগে শব্দগুলো আপনি উঠে পড়ত মুখে। সঙ্গে সঙ্গেই মানে আনত টেনে।.....শব্দের আপন কাজই হচ্ছে বোঝানো, তাকে আবার বোঝাবে কে।.........নায়িকা যখন নায়ককে বলেছিল হাত নেড়ে 'দিন রাত তোমার ঐ হিদ্‌হিদ্ হিদিক্কারে আমার পাঁজঞ্জুরিতে তিড়িতঙ্ক লাগে', তখন তার মানে বোঝাতে পণ্ডিতকে ডাকতে হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গল্পসল্প। বাচস্পতি

'খিট্‌খিটে' শব্দের প্রতিশব্দ ইংরেজিতে আছে irritable, peevish, pettish ; কিন্তু 'খিট্‌খিটে' শব্দের মতো এমন তার জোর নেই। নেশায় চুরচুর্ হওয়া, কট্‌মট্ করে তাকানো, ধপাস্ করে পড়া, পা টন্ টন্ করা, গা ম্যাজ্ ম্যাজ্ করা ঃ ঠিক এ-সব শব্দের ভাব বোঝানো ধাতুপ্রত্যয়ওয়ালা ভাষার কর্ম নয়। ইংরেজিতে বলে creeping sensation, বাংলায় বলে 'গা ছম্‌ছম্ করা' ; আমার তো মনে হয় বাংলারই জিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা পরিচয়—২১

পরুষকঠিন সংসারতপ্ত পুরুষ চিত্তকে আনন্দের নিবিড় বন্ধনে বাঁধিতে বসনভূষণ ছলাকলামঞ্জুল অঙ্গনাজনের ললিতদেহের যে প্রয়োজন যে কোন অর্থ তথা ভাবকে রসের নিবিড়বন্ধনে বাঁধিতে তদনুরূপ ছন্দোধ্বনি অলঙ্কারসমৃদ্ধ বাণীরমণীর শব্দশরীরের প্রয়োজন।

রামজীবন আচার্য ঃ নজরুল এক বিস্ময়

শয়তান

সন্তান তার সুখী নয়, তারা লোভী, তারা শয়তান!
ঈর্ষায় মাতি করে কাটাকাটি রচে নিতি ব্যবধান!
ভগবান! ভগবান!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ফরিয়াদ (সর্বহারা)

সখার কাছেতে প্রেম
চান ভগবান,
দাসের কাছেতে নতি
চাহে শয়তান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্ফুলিঙ্গ—২৩১

শরণ

হে মহাজীবন, হে মহামরণ,
লইনু শরণ— লইনু শরণ!
আঁধার প্রদীপে জ্বালাও শিখা,
পরাও পরাও জ্যোতির টিকা,
করো হে আমার লজ্জা হরণ
লইনু শরণ— লইনু শরণ!
পরশরতন তোমারি চরণ,
লইনু শরণ— লইনু শরণ!
যা-কিছু মলিন, যা-কিছু কালো,

যা-কিছু বিরূপ হোক তা ভালো-
ঘুচাও ঘুচাও সব আবরণ॥
লইনু শরণ— লইনু শরণ!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নটীর পূজা—৩

রজনীর শশী গগনের কোণে
লুকায় শরণ মাগি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লজ্জিতা (কল্পনা)

শরৎ

শরৎ মানেই দুঃখের মুখে
সুখের হাসিটি ছড়ানো
শরৎ মানেই প্রিয়ার খোঁপাতে
যূথীর মালাটি জড়ানো।

অশোক রায়চৌধুরী : শারদীয় কবিতা

বুকে ভালবাসা-জাগানো শরৎ
সকালে সোনার, রোদের সেতার বাজায়!
পান্না-সবুজ ঘাসে ঘাসে জ্বলে
রাতে-ঝরা মণি-মুক্তো শিশির-কণারা।
প্রজাপতি গান গায়,......
প্রজাপতিটার ফুরফুরে পাখা থরথর কাঁপে বাতাসে।

বিমলচন্দ্র ঘোষ : খুকুর শান্তি

শরৎ-আকাশের নির্মল নীলে ছড়িয়ে আছে
কোন্ অনাদি নির্বাসনের গভীর বিষাদ।
মনের মধ্যে হুহু করে উঠছে,—
"ফিরে যেতে হবে"।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অমৃত (শ্যামলী)

আজি শরততপনে প্রভাত-স্বপনে
কী জানি পরান কী যে চায়।
ওই শেফালির শাখে কী বলিয়া ডাকে
বিহগ-বিহগী কী যে গায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আকাঙ্ক্ষা (কড়ি ও কোমল)

শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি। শেফালি

শরত-আলোর কমলবনে
বাহির হয়ে বিহার করে যে ছিল মোর মনে মনে॥
তারি সোনার কাঁকন বাজে আজি প্রভাতকিরণ মাঝে,
হাওয়ায় কাঁপে আঁচলখানি—ছড়ায় ছায়া ক্ষণে ক্ষণে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেফালি

শরৎ, তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি
ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি।

শরৎ, তোমার শিশির-ধোওয়া কুন্তলে
বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে
আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি-২৬

পূজায় স্তব্ধ শরৎপ্রাতের প্রশান্ত নিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নূতন শ্রোতা ২ (পরিশেষ)

জয়শঙ্খ উঠিল বাজিয়া। চন্দনতিলক ভালে
শরৎ উঠিল হেসে চমকিত গগনপ্রাঙ্গণে ;
পল্লবে পল্লবে কাঁপি বনলক্ষ্মী কিঙ্কণীকঙ্কণে
বিচ্ছুরিল দিকে দিকে জ্যোতিষ্কণা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রান্তিক-১৫

মেঘমুক্ত শরতের
দূরে চাওয়া আকাশেতে ভারমুক্ত চিরপথিকের
বাঁশিতে বেজেছে ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রান্তিক-৫

আমাদের শরৎ শিশুর মূর্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী-ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে। তার কাঁচা দেহখানি ; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি গায়ের গন্ধের মতো ; আকাশে আলোকে গাছ-পালায় যা কিছু রঙ দেখিতেছি সে তো প্রাণেরই রঙ, একেবারে তাজা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শরৎ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির মহলের যৌবনকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শরৎ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার এই হাসি, এই কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্যকারণের গভীরতা নেই, তাহা এমনি হাল্কাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগটুকু পড়ে না ; জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মতো যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শরৎ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আটকা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি চলি করে ; বর্ষার মতো সে অভিসারের বলা নয়, সে অভিমানের চলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শরৎ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

বর্ষাকে না জানলে শরৎকে চেনা যায় না।
আগে আবরণ তারপরে আলো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ বর্ষণ

বাদললক্ষ্মীর অবগুণ্ঠন খুলে দেখো। চিনতে পারবে সেই ছদ্মবেশিনীই শরৎপ্রতিমা। বর্ষার ধারায় যার কণ্ঠ গদগদ, শিউলিবনে তাঁরই গান, মালতী বিতানে তাঁরই বাঁশির ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ বর্ষণ

শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র সমাজের যে সব মিথ্যা, অনাচার ও নিষ্ঠুরতা এবং বহুদিনের পুঞ্জীভূত কুসংস্কারের স্তূপ দেখেছেন, তাদের কঠোর সমালোচনা করতে বা কশাঘাত করতে ছাড়েননি।

গোপালচন্দ্র রায় ঃ শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের রচনার একটি বড় গুণ, তাঁর লেখার মধ্যে অসাধারণ সংযম। তাঁর সাহিত্যে কোথাও অবান্তর বা বাহুল্য নেই। যেটুকু না বললে নয়, সেইটুকুই কেবল বলেছেন, তার বেশি বলেননি। কোন ঘটনাকে অহেতুকি ফেনিয়ে বড় করবার চেষ্টা তিনি মোটেই করেননি। কি প্রকৃতির বর্ণনায়, কি নরনারীর রূপ বর্ণনায়, আর কি মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণের সময়, তিনি কোথাও উচ্ছ্বাসের বশীভূত হননি। সর্বত্রই তাঁর রচনা সংযত ও পরিমিত।

গোপালচন্দ্র রায় ঃ শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয় রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন ক'রে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয়নি। অন্য লেখকেরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সার্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায়নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন, তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।.....

আজ তাঁর অভিনন্দন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত। শুধু কথা-সাহিত্যের পথে নয়, নাট্যাভিনয়ে চিত্রাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার সংস্রবে আসবার জন্যে বাঙালীর ঔৎসুক্য বেড়ে চলেছে। তিনি বাঙালীর বেদনার কেন্দ্রে আপন বাণীর স্পর্শ দিয়েছেন।.....কবির আসন থেকে আমি বিশেষভাবে সেই স্রষ্টা, সেই দ্রষ্টা শরৎচন্দ্রকে মাল্যদান করি। তিনি শতায়ু হয়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধিশালী করুন, তাঁর পাঠকের দৃষ্টিকে শিক্ষা দিন মানুষকে সত্য করে দেখতে, স্পষ্ট করে মানুষকে প্রকাশ করুন তার দোষে-গুণে ভালোয়-মন্দয়—চমৎকারজনক শিক্ষাজনক কোনো দৃষ্টান্তকে নয়, মানুষের চিরন্তন অভিজ্ঞতাকে প্রতিষ্ঠিত করুন তাঁর স্বচ্ছ প্রাঞ্জল ভাষায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শরৎচন্দ্রের জয়ন্তী উৎসবে অভিভাষণ

শরম

যদি বারণ কর তবে গাহিব না।
যদি শরম লাগে মুখে চাহিব না॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

মরমের আলো কপোলে ফুটিবে শরম-অরুণরাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'সখী বহে গেল বেলা' (গীতবিতান)

উষার রক্ত মেঘের মতন
আমার দীপ্ত শরমখানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পতিতা (কাহিনী)

নিমেষের তরে শরমে বাধিল,
মরমের কথা হল না।
জনমের তরে তাহারি লাগিয়ে
রহিল মরমবেদনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মায়ার খেলা—৫

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হল মরি লাজে।
শরমে জড়িত চরণে কেমনে চলিব পথের মাঝে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেফালি

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি
বক্ষে তুলি দিল,
আপনপানে নেহারি চেয়ে
শরমে শিহরিল।

....

চমকি মুখ দু হাতে ঢাকে,
শরমে টুটে মন—।
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
নিভে নি সেই ক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সুপ্তোত্থিতা (সোনার তরী)

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হল না,
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।

রাম বসু ঃ কবি গান

শরীর

শরীরকে অবেহলা করা, তাকে ক্ষয় হতে দেওয়া ভুল। শরীর হল সাধনার অবলম্বন, তাকে উপযুক্ত করে রাখতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ঃ যোগসাধনার ভিত্তি

এ শরীর দারুময় যজ্ঞের সমিধ,
নিজেকে পোড়াবে বলে তীব্র জাগরণে
হাজার জন্মের পারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উত্তম দাশ ঃ রুণুকে পুনর্বার

সংহত শরীরে
দ্রাক্ষার সিতাংশু কান্তি, নীলাঞ্জন চোখের গভীরে
তাচ্ছিল্যের দামিনী বিলাস ;

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ সংবর্ত

শরীরচর্চা

শারীরবিদ্যা সকল বিদ্যার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যাকে অবহেলা করলে জীবনের বাস্তব

সত্য মিথ্যা হতে পারে—তা হল শরীরচর্চা। রুচি অনুযায়ী জীবনের উন্নতিশীল অভিপ্রায়কে সফলতার উন্নত মান ও ধাপে পৌঁছতে গেলে মস্তিষ্কের ধীশক্তির সুস্থতা ও কর্মতৎপরতার প্রয়োজন। তার জন্য প্রথম দরকার শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রের প্রয়োজনীয় কুশলতা। এগুলি পুষ্ট ও তুষ্ট না থাকলে মস্তিষ্ক তার প্রত্যাশিত রসদপ্রাপ্তিতে অবহেলিত থাকে এবং তারই ফলশ্রুতি উর্বরশীল মনের অনুপস্থিতি। শারীরিক সুস্থতা নিজ নিজ রুচির দৃষ্টিভঙ্গীকে পরিচ্ছন্ন রাখে। তাই পরিচর্য্যা, পরিবেশ এবং জ্ঞানানুশীলন শরীরচর্চার সঙ্গে সঙ্গে আকাঙ্ক্ষার আদর্শে শৃঙ্খলায়ত রাখতে হয়। এই অকাট্য সত্যযুক্তির প্রতিবাদ নেই।

মনতোষ রায় : যোগ ও জীবন

শশী

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে ;
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায় ?

মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য

রজনীর শশী গগনের কোণে লুকায় শরণ মাগি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান—কেন যামিনী না যেতে

শহর

এত লোক গোপনসঞ্চারী
জীবন যে পথে বসিয়েছে জানিনি মানিনি আগে
পিঁপড়ের সারি
অগণন ভিড়াক্রান্ত হে শহর, হে শহর স্বপ্নভারাতুর!

বিষ্ণু দে : টপ্পা-ঠুংরি

আজকাল পৃথিবীর সর্বত্রই বড়ো শহর মাত্রই দেশের শহর নয়, কালের শহর। সবাই আধুনিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাভা-যাত্রীর পত্র-৬

উড়ো-জাহাজে চড়ে শহরগুলোকে দেখলে যেন মনে হয় পৃথিবীর চর্মরোগ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পারস্যে—৬

শাওন

শাওন আসিল ফিরে সে ফিরে এল না
বরষা ফুরায়ে গেল, আশা তবু গেল না।
ধানি রং ঘাঘরী, মেঘ রং ওড়না
পরিতে আমায় মাগো অনুরোধ করো না।....
অথৈ জলে মাগো মাঠ ঘাট থৈ থৈ,
আমার-হিয়ার আগুন নিভিল কৈ?
কদম-কেশর বলে "কোথা তোর কিশোর",
চম্পা ডালে দোলে শূন্য দোলনা॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (কাব্য-গীতি)

শাওন রাতে যদি স্মরণে আসে মোরে
বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে॥
ভুলিও স্মৃতি মম নিশীথ স্বপ্ন সম
আঁচলের গাথা মালা ফেলিও পথ 'পরে।

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (কাব্য-গীতি)

শান্ত

শান্ত যেই জন
যম তারে ঠেলে ঠেলে
নেড়ে চেড়ে যায় ফেলে,
বলে 'মোর নাহি প্রয়োজন।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তাসের দেশ—৪

ভদ্র মোরা, শান্ত বড়ো,
পোষ-মানা এ প্রাণ
বোতাম আঁটা জামার নীচে
শান্তিতে শয়ান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুরন্ত আশা (মানসী)

আঁধারের মসী-অবলেপে
স্বপ্নচ্ছবি-মুছে-যাওয়া সুষুপ্তির মতো শান্ত হল
চিত্ত মোর নিঃশব্দের তর্জনীসংকেতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—৮

শান্তি

শান্তি নয় যুদ্ধ চাই
যুদ্ধ বিনা শান্তি নাই।

কুন্তল মুখোপাধ্যায় ঃ শূদ্রায়ণ

আকাঙ্ক্ষার সমান আগুন আর নেই। শরীরের মত দুঃখময়ও আর কিছু নেই। শান্তি, শান্তির মত সুখও আর নেই।

কুন্তল মুখোপাধ্যায় ঃ কালচক্র

পৃথিবীতে শান্তি আসুক, অন্তরীক্ষে শান্তি আসুক। জলে শান্তি আসুক, স্থলে শান্তি আসুক, ওষধিতে শান্তি আসুক, বনস্পতিতে শান্তি আসুক। আবহ বা আমাদের চারপাশের পরিবেশ যেন নির্মল হয়, দূষণমুক্ত হয়, আমাদের অন্তরও যেন নির্মল হয়, দূষণমুক্ত হয়, অর্থাৎ আমরা যেন অন্তরে বাইরে দূষণ ও মালিন্যমুক্ত হয়ে এক সুখী ও সমৃদ্ধ সমাজে বাস করি এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীকে সকল জীবকে সকল মানুষকে সুস্থ দেহে, শান্তিতে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে দিই। সকলকে বাঁচতে দিই।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ ঃ পরমাণু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ঃ আশীর্বাদ না অভিশাপ

শান্তি চাই। নইলে কেবলই কাজের ঘর্ষণে......কাজের মধ্যেই দাবানল লেগে যেত,........কেউ দাঁড়াতে পারত না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অচলায়তন—২

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—১৮

শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্য যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিল্‌বিল্‌ করছে তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সে ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীরসর বাটি চেটে নিরাপদে খাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র (কালান্তর)

যত-কিছু ভালোমন্দ,
যত-কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব
কিছু আর নাই।.......
বলো শান্তি বলো শান্তি,
দেহ-সাথে সব ক্লান্তি
হয়ে যাক ছাই॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মৃত্যুর পরে (চিত্রা)

যে-শান্তি মৃত্যুর প্রান্তে বৈরাগ্যে নিভৃত,
আত্মসমাহিত ;
দিবসের যত
ধূলিচিহ্ন, যত কিছু ক্ষত
লুপ্ত হল যে শান্তির অন্তিম তিমিরে ;
সংসারের শেষ তীরে
সপ্তর্ষির ধ্যানপুণ্য রাতে
হারায় যে-শান্তিসিন্ধু আপনারি অন্ত আপনাতে ;
যে শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে-প্রেম শরীরমন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।
যে পরম শান্তি-মাঝে হ'ক তব অচঞ্চল স্থিতি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রী (পরিশেষ)

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ লেখা—১৫

পূর্ণতার শান্তি একদিন শূন্যতার শান্তি-আকারে ভারতবর্ষের সাধনাক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত বাসনাকে নিরস্ত করে, সমস্ত প্রবৃত্তির মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে, তবেই পরম শ্রেয়কে লাভ করা যায়, এই মত যেদিন থেকে ভারতবর্ষে তার সহস্র মূল বিস্তার করে দাঁড়ালো, সেই দিন থেকে ভারতবর্ষের সাধনায় সামঞ্জস্যের স্থলে রিক্ততা এসে দাঁড়ালো—সেই দিন থেকে প্রাচীন তাপসাশ্রমের স্থলে আধুনিক কালের সন্ন্যাসাশ্রম প্রবল হয়ে উঠল এবং উপনিষদের পূর্ণস্বরূপ ব্রহ্ম শঙ্করাচার্যের শূন্যস্বরূপ ব্রহ্ম-রূপে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদে পরিণত হলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সামঞ্জস্য (শান্তিনিকেতন)

শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি।

বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে ভাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল। বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে...মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি নষ্ট করে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পথের দাবী (২৫)

শাপ

দেহের সোহাগে
অন্তর জ্বলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

ভাবিতেছি অর্ধরাত্রি অনিদ্রনয়ান—
কে দিয়েছে হেন শাপ, কেন ব্যবধান?
কেন ঊর্ধ্বে চেয়ে কাঁদে রুদ্ধ মনোরথ?
কেন প্রেম আপনার নাহি পায় পথ?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মেঘদূত (মানসী)

শারদলক্ষ্মী (দ্র. শরৎ)

এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার
শুভ্র মেঘের রথে,
এসো নির্মল নীল পথে,
এসো ধৌত শ্যামল আলো-ঝলমল
বনগিরি-পর্বতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শারদোৎসব—২

ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল, মাধবী ঝরিল ভূমিতলে অবসন্ন,
সৌরভধনে তখন তুমি হে শালমঞ্জরী বসন্তে কর ধন্য।
সান্ত্বনা মাগি দাঁড়ায় কুঞ্জভূমি রিক্ত বেলায় অঞ্চল যবে শূন্য—
বনসভাতলে সবার ঊর্ধ্বে তুমি, সব-অবসানে তোমার দানের পুণ্য॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান—'ক্লান্ত যখন আম্রকলির কাল'

হে বনস্পতি শাল, অবসানের দিন থেকে তুমি অবসাদ ঘুচিয়ে দিলে। উৎসবের শেষ বেলাকে তোমার অক্লান্ত মঞ্জরী ঐশ্বর্যে দিল ভরিয়ে। নবীনের শেষ জয়ধ্বনি তোমার বীর কণ্ঠে।.....অরণ্যভূমির শেষ আনন্দিত বাণী তুমি শুনিয়ে দিলে যাবার পথের পথিককে, বললে 'পুনর্দর্শনায়'। তোমার আনন্দের সাহস কঠোর বিচ্ছেদের সমুখে দাঁড়িয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবীন (পরিশিষ্ট)—২

শালগ্রাম

তুমি শালগ্রাম শিলা ;—
শোওয়া বসা যার সকলি সমান, তারে নিয়ে রাসলীলা।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : ঘুমের ঘোরে—প্রথম

সুলক্ষণ শালগ্রাম,—বেশ চক্র থাকবে,—গোমুখী। আর সব লক্ষণ থাকবে—তাহলে ভগবানের পূজা হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

শাসক

দুনিয়ার সব শাসকদের একটাই চরিত্র—শোষণ করা।

দুলেন্দ্র ভৌমিক : আততায়ী

শাসকরা সব সময় নিরপেক্ষ জনতা পছন্দ করে।

দুলেন্দ্র ভৌমিক : আততায়ী

শাস্তি

হে চতুরানন, পাপের যেমন শাস্তিই বিধান কর যেন আর জন্মে ডাক্তারের ঘোড়া, মাতালের স্ত্রী এবং প্রবন্ধলেখকের বন্ধু হইয়া জন্মগ্রহণ না করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পঞ্চভূত। অখণ্ডতা

শাস্ত্র

শাস্ত্র নাই যার,
শাস্ত্রের উপদ্রব তার চতুর্গুণ—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজা ও রানী—১। ১

শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার! সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বরলাভের জন্য।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

বই বা শাস্ত্রের কি উদ্দেশ্য? ঈশ্বরলাভ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

শ্যালী

পত্নীর চাইতে শ্যালী বড়,
যে স্ত্রীর নাইক ভগ্নী,—
সে স্ত্রী পরিত্যজ্য ও তার
কপালেতে অগ্নি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : হাসির গান

বেদনায় সারা মন
করতেছে টনটন
শ্যালী কথা বলল না
সেই বৈরাগ্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : খাপছাড়া

স্ত্রীর, বোন চায়ে তার
ভুলে ঢেলেছিল কালি,
‘শ্যালী’ বলে ভর্ৎসনা
করেছিল বনমালী।
এত বড়ো গালি শুনে
জ্বলে মরে মনাগুনে,
আফিম সে খাবে কিনা
সাত মাস ভাবে খালি,
অথবা কি গঙ্গায়
পোড়া দেহ দিবে ডালি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : খাপছাড়া

শ্বশুরবাড়িতে শ্যালী অতি উত্তম জিনিষ, অমন জিনিষ আর হয় না, কিন্তু সেখান থেকে চ্যুত হয়ে হঠাৎ স্কন্ধের উপর এসে পড়লে সকলে সামলাতে পারে না।.......একে শ্যালী, তাতে নিখুঁত সুন্দরী, তাতে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন—ঘরে তো আর টেঁকা যায় না। চোখ মেলে চাইলে স্ত্রী ভাবে শ্যালীকে খুঁজছি। চোখ বুঁজে থাকলে স্ত্রীভাবে আমি শ্যালীর ধ্যান করছি। কাশলে মনে করে কাশির মধ্যে একটা অর্থ আছে। আবার.......প্রাণপণে কাশি চেপে থাকলে মনে করে তার অর্থ আরো সন্দেহজনক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৈকুণ্ঠের খাতা (১)

শিউলি

ঘাসে ঝরে পড়া শিউলির সৌরভে
মন-কেমনের বেদনা বাতাসে লাগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছুটির আয়োজন (পুনশ্চ)

শিউলি ফুল, শিউলি ফুল, কেমন ভুল, এমন ভুল॥
রাতের বায় কোন মায়ায় আনিল হায় বনছায়ায়,
ভোরবেলায় বারেবারেই ফিরিবারে হলি ব্যাকুল॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে॥
শিউলিতলার পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন ভুলানো এলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেফালি (গীতাঞ্জলি)

শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই ফুরোল শীতের বনে
এলে যে—
আমার শীতের বনে এলে যে সেই শূন্যক্ষণে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা-২

শিউলির গন্ধ এসে লাগে
যেন কার ঠাণ্ডা হাতের কোমল সেবা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছুটির আয়োজন

আশ্বিনের রাত্রিশেষে ঝরে-পড়া শিউলিফুলের
আগ্রহে আকুল বনতল ; তারা মরণকূলের
উৎসবে ছুটেছে দলে দলে ; শুধু বলে, 'চলো চলো'!
অশ্রুবাষ্পকুহেলীতে দিগন্তের চক্ষু ছলোছলো,
ধরিত্রীর আর্দ্র বক্ষে তৃণে তৃণে কম্পন সঞ্চারে—
তবু ঐ প্রভাতের যাত্রীদল বিদায়ের দ্বারে
হাস্যমুখে ঊর্ধ্ব-পানে চায় ; দেখে, অরুণ আলোর
তরণী দিয়েছে খেয়া, হংসশুভ্র মেঘের ঝালর
দোলে তার চন্দ্রাতপতলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রা (পূরবী)

সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি........কচি গায়ের গন্ধের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শরৎ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

আমার কৈশোরে পথের ওপর ঝরে পড়ে থাকা
শিশির মাখা শিউলির ওপর পা ফেললে
পাপ হতো
আমার পাপ কাটাবার জন্য প্রণাম করতাম।

……………………………………

দুহাত ভরা শিউলির ঘ্রাণ নিতে নিতে মনে হতো
আমার কোন গোপন দুঃখ নেই, আমার হৃদয়ের
কোনো দাগ নেই
পৃথিবীর সব আকাশ থেকে আকাশে বেজে উঠছে উৎসবের বাজনা
শাদা শিউলির রাশি বড় শুদ্ধ, প্রয়োজনহীন, দেখলেই
বলতে ইচ্ছে করতো,
আমি কারুকে কখনো দুঃখ দেবো না।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ আমার কৈশোরে

শিকল

এই শিকল-পরা ছল মোদের এই শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ এই শিকল-পরা ছল

শিকার

শিকারে দয়ার বিধি নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা-৭

শিক্ষক

যিনি রাজনীতিতে সম্পূর্ণভাবে লিপ্ত, খণ্ডসত্য তাঁর দলীয় সম্পত্তি ; তাই নিয়ে তাঁর লড়াই। যিনি বিজ্ঞানী এবং শিক্ষক, তিনি জানেন যে সম্পূর্ণ সত্য তাঁর আয়ত্তে নেই। খণ্ডসত্যকে অতিক্রম করতে তিনি সদা আগ্রহী, অতিক্রম করবার এই আগ্রহেই তিনি প্রকৃত বিজ্ঞানী এবং শিক্ষক।

অম্লান দত্ত ঃ শিক্ষার সমস্যা (গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ)

প্রকৃত শিক্ষার্থীই আদর্শ শিক্ষক।

ড. অশোক কুণ্ডু ঃ অশোক নিলয়

ছাত্রের উকিল-পিতা শিক্ষক-বন্ধুরে হেসে কন,
'তুমি ত চরাও গোরু হাতে লয়ে বেতের পাঁচন'।
শিক্ষক কহিল—গোরু চরানোর করি না বড়াই,
গোরু চরে আদালতে তাহাদের বাছুর চরাই'।

কালিদাস রায় ঃ গোরু ও বাছুর

রাজার অপেক্ষাও, যাঁহারা সমাজের শিক্ষক, তাঁহারা ভক্তির পাত্র।.....যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সহিত সমাজের শিক্ষায় নিযুক্ত, তাঁহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাহারাই যথার্থ রাজা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ধর্মতত্ত্ব

শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই মনুষ্য মনুষ্য হয় না। সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ধর্মতত্ত্ব

একজন শিক্ষক বা আচার্য কত বড় তাঁর ভাষার সরলতা থেকে তা বোঝা যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা (৫)

বেদান্ত বলে—এই মানুষের ভেতরেই সব আছে। একটি ছেলের ভেতরও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে, এইমাত্র শিক্ষকের কাজ।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা (১)

যাঁরা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাঁদের সারাজীবন চেষ্টা করা দরকার মনের সমস্ত কথা কি করে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ঃ মাতৃভাষা

শিক্ষকই ছাত্রের শূন্যতা ভরাট করে তোলেন।

সুদিন চট্টোপাধ্যায় ঃ বিচিত্র ভাবনা

প্রকৃত শিক্ষক তিনি, যিনি কোন বিশেষ বিষয়ের শিক্ষক নন—গোটা মানুষটিই শিক্ষক অর্থাৎ তাঁর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, কথাবার্তা, হাসি-খেলা, রুচি-মর্জি, তাঁর গুণগ্রাম, তাঁর মুদ্রাদোষ—সমস্ত মিলিয়ে যে ব্যক্তিত্বটি সেটিই তাঁর শিক্ষকচরিত্র। বাংলাদেশে শিক্ষকচরিত্রের সর্বোত্তম আদর্শ বিদ্যাসাগর—সে কি শুধু তাঁর অধ্যাপনার কৃতিত্বগুণে? তিনি সংস্কৃত কলেজে মেঘদূত কুমারসম্ভব পড়াতেন, না পাণিনির ব্যাকরণ পড়াতেন—সে খবর নিয়ে আজ কে মাথা ঘামায়? প্রতিদিনের বাক্যে, কর্মে, চিন্তায় তিনি যে মহান ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাতেই তাঁর শিক্ষকজীবনের পূর্ণ মহিমা প্রকাশ পেয়েছে।

হোসেনুর রহমান ঃ ৫০-মধ্যবিত্ত কোন পথে-(উদ্বোধন ৯৯/৯)

শিক্ষা

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছাত্রের চিত্তউদ্‌বোধন।

অনিন্দিতা দত্ত ঃ রবীন্দ্রপত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন

রাজনীতির নানা আক্ষেপ শিক্ষানীতিকে ক্রমাগত বিচলিত করে তুললে রাষ্ট্রনীতির তাতে শেষ অবধি কোন সুবিধা হয় কি না বলা কঠিন, কিন্তু শিক্ষার যে তাতে ক্ষতি হয় একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।......শিক্ষাকে রাজনীতির অধীনতা থেকে মুক্তি দেওয়া প্রয়োজন।

অম্লান দত্ত ঃ শিক্ষার সমস্যা (গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ)

আমরা বাল্যকাল হইতেই উপরচালাকি বা ফাঁকিদারি দ্বারা কাজ ফতে করিতে চাই। রীতিমত পরিশ্রম করিয়া বিদ্যার্জন করা যেন এখন রেওয়াজের বাইরে।........কোন শিক্ষক বা অধ্যাপক যদি একটু বেশি রকমের ব্যাখ্যা করেন, তাহা হইলে ছেলেরা অধৈর্য হইয়া উঠে এবং সে অধ্যাপক অপ্রিয় বা ছাত্রদের বিরাগভাজন হইয়া উঠেন।......যে-শিক্ষক যত নোট দিতে পারেন তিনি ছাত্রসমাজে তত প্রশংসার ভাজন হন। এইরূপে গোড়াতেই কাঁচা থাকার দরুন প্রকৃত শিক্ষা হয় না।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ বাঙালীর ভবিষ্যৎ

শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত।

প্রমথ চৌধুরী ঃ বই পড়া

সমস্ত জীবনের এক উদ্দেশ্য—শিক্ষা।

বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা খণ্ড-৮

মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ সাধনের নাম শিক্ষা।

বিবেকানন্দ ঃ পত্রাবলী (৬)

যাতে চরিত্র তৈরী হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে, এই রকম শিক্ষা চাই।

বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা (৯)

মনকে রাশি রাশি তথ্য দিয়ে ভরে রাখার নাম শিক্ষা নয়। মনরূপ যন্ত্রটিকে সুষ্ঠুতর করে তোলা এবং তাকে সম্পূর্ণ বশীভূত করা—এই হল শিক্ষার আদর্শ।

বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা (১)

যেমন পর্বত মহম্মদের নিকট না যাওয়াতে মহম্মদই পর্বতের নিকট গিয়াছিলেন, সেইরূপ দরিদ্র বালক যদি শিক্ষালয়ে না আসিতে পারে, তবে তাহাদের নিকট শিক্ষা পৌঁছাইয়া দিতে হইবে।

বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা (৬)

যদি বলি শিক্ষা হবে ধর্মহীন, তাহলে বুঝব ঐ শিক্ষায় মানুষ গড়বে না। ছাত্রছাত্রীদের মনুষ্যত্ব হবে না। শিক্ষায় ধর্ম থাকবে না, মানে, এ শিক্ষায় যাঁরা শিক্ষিত হবেন, তাঁরা মনুষ্যত্ব লাভ করবেন না।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী ঃ মানবধর্ম

শিক্ষা না পেলে মানুষের কার্যকরী শক্তি জেগে উঠতে পারে না, মানুষ সমাজের সেবায় লাগবার উপযুক্ত হয় না।

মেঘনাদ সাহা ঃ জাতীয় উন্নতির উপায়

শিক্ষার সকলের চেয়ে বড়ো অঙ্গটা—বুঝাইয়া দেওয়া নহে, মনের মধ্যে ঘা দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি

আমার মতে শিক্ষার প্রণালী হচ্ছে বৈরাগীর রাস্তায়। ছাত্রদের নিয়ে বিবাগী হয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়। চলতে চলতে নিয়ত নব নব বিস্ময়ে অজানার ভিতর দিয়ে জেনে চলাই হচ্ছে প্রাণবান শিক্ষা। প্রাণের ছন্দের সঙ্গে এই শিক্ষাপ্রবাহের তাল মেলে। বন্ধ ক্লাস হচ্ছে প্রাণধর্মী চিত্তের সহজ জ্ঞানের পথে কঠিন বাধা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

শিক্ষা জিনিষটা তো জীবনের সঙ্গে সংগতিহীন একটা কৃত্রিম জিনিষ নহে। আমরা কী হইব এবং আমরা কী শিখিব এই দুটি কথা একেবারে গায়ে গায়ে সংলগ্ন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথের সঞ্চয় (লক্ষ্য ও শিক্ষা)

জীবনের কোনো লক্ষ্য নাই অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনো অর্থই নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথের সঞ্চয় (লক্ষ্য, শিক্ষা)

অত্যাবশ্যক শিক্ষার সহিত স্বাধীন পাঠ না মিশাইলে ছেলে ভালো করিয়া মানুষ হইতে পারে না—বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধে সে অনেকটা পরিমাণে বালক থাকিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিক্ষার হেরফের

বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যাহা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনোমতে কাজ চলে মাত্র, কিন্তু বিকাশলাভ হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিক্ষার হেরফের

শিক্ষা সম্পন্নেরই জন্মগত অধিকার হয়ে রইল।

সুদিন চট্টোপাধ্যায় ঃ বিচিত্র ভাবনা

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল
        উদার হতে ভাই রে ;
কর্মী হবার মন্ত্র আমি
        বায়ুর কাছে পাই রে।

পাহাড় শিখায় তাহার সমান
হই যেন ভাই মৌন-মহান
খোলা মাঠের উপদেশে—
দিল-খোলা হই তাই রে।

সুনির্মল বসু : সবার আমি ছাত্র

শিক্ষার কার্যত লক্ষ্যই হল এই জীবন ও জগৎকে অসীম ভালবাসা ও শ্রদ্ধা নিয়ে চিনতে পারা, কেবল পরীক্ষায় ভাল ফল করা নয়, মুখস্থ করা নয়, এবং পরীক্ষায় সব সময় প্রথম হওয়া নয়। অর্থাৎ সত্যি সত্যি মানুষ হওয়া। আমাদের একটি শিক্ষানীতি চাই। যে শিক্ষানীতি ভারতীয় চেতনা ছাত্রদের মধ্যে জাগ্রত করবে। এবং দ্বিতীয় ছাত্ররা ভারমুক্ত হোক। এত বিষয়, এত বই, এত জটিলতা, কেন? এ বিষয়ে আজ দেশের মানুষ এক মহাসংকটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এ সংকট ভারতীয় সমাজের, সভ্যতার। শিক্ষার মুক্তি চাই।

হোসেনুর রহমান : রবিবারের প্রতিদিন

ছাত্রগণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাণ, শিক্ষকগণ বিবেক।

অশোক কুণ্ডু : অশোক নিলয়

শিব

ঐ খড়্গচিহ্নিত রক্ত-পথই শিব জাগাবার পথ।

কাজী নজরুল ইসলাম : পথিক। তুমি পথ হারাইয়াছ?

মৃত্যু জীবনের শেষ সার আবিষ্কার
আর
শিব নীলকণ্ঠ!

প্রেমেন্দ্র মিত্র : নীলকণ্ঠ (সম্রাট)

নাচে শিব নাচে সুন্দর নাচে
রুদ্রকাল!
জটায় গঙ্গা, ভালে শশী, গলে
অস্থিমাল।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত : শিবের গাজন (মরীচিকা)

মানুষের যিনি শিব
তিনি বিষ পান করেন বিষকে কাটাবেন বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কবির দীক্ষা (কালের যাত্রা)

অনার্যদেবতাকে বেদের প্রাচীন মঞ্চে তুলিয়া লওয়া হইল, বৈদিক রুদ্র উপাধি গ্রহণ করিয়া শিব আর্যদেবতার দলে স্থান পাইলেন।.....তথাপি তাঁহার সাধ্য আর্য ও অনার্য এই দুই মূর্তিই স্বতন্ত্র হইয়া রহিল। আর্যের দিকে তিনি যোগীশ্বর, কামকে ভস্ম করিয়া নির্বাণের আনন্দে নিমগ্ন, তাঁহার দিগ্‌বাস সন্ন্যাসীর ত্যাগের লক্ষণ ; অনার্যের দিকে তিনি বীভৎস রক্তাক্ত গজাজিনধারী গঞ্জিকা ও ভাং ধুতুরায় উন্মত্ত। আর্যের দিকে তিনি বুদ্ধেরই প্রতিরূপ এবং সেই রূপই তিনি সর্বত্র সহজেই বুদ্ধমন্দির সকল অধিকার করিতেছেন, অন্য দিকে তিনি ভূত প্রেত প্রভৃতি শ্মশানচর সমস্ত বিভীষিকা এবং সর্পপূজা, বৃষপূজা, লিঙ্গপূজা প্রভৃতি আত্মসাৎ করিয়া সমাজের অন্তর্গত অনার্যদের সমস্ত তামসিক উপাসনাকে আশ্রয় দান করিতেছেন। একদিকে প্রবৃত্তিকে শান্ত করিয়া নির্জনে ধ্যানে জপে তাঁহার সাধনা ; অন্যদিকে চড়কপূজা প্রভৃতি ব্যাপারে নিজেকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়া ও শরীরকে নানা প্রকারে ক্লেশে উত্তেজিত করিয়া নিদারুণভাবে তাঁহার আরাধনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা

শিব—ইনি ত্রিমূর্তির অন্যতম। প্রলয়ের তমোগুণে রুদ্রমূর্তিতে বিশ্বসংসার হরণ করেন, সেইজন্য ইনি 'হর', 'মহাকাল' এঁরই নামান্তর। ইনি বিরূপ নেত্র হেতু 'বিরূপাক্ষ', ত্রিনয়ন হেতু 'ত্রিলোচন'। মৃত্যুঞ্জয়ী বলে 'মৃত্যুঞ্জয়', অগ্নিনেত্রে কামদাহ হেতু 'স্মরহর'; পিনাক এঁর ধনু, তাই ইনি 'পিনাকী', মস্তকে জটাজুট হেতু ইনি 'কপর্দী:'। ডমরু এঁর প্রিয়বাদ্য, কৈলাস প্রিয় ধ্যান, প্রমথগণ প্রিয় সহচর। হলাহল পানে নীলকণ্ঠ হেতু ইনি 'নীলকণ্ঠ'।

সুধীরচন্দ্র সরকার : পৌরাণিক অভিধান

শিল্প

শিল্পের অর্থ মনের ভূলোকে বিধৃত, তার ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি অসজ্ঞান কল্পদেশের অনেক তলে, জড় বস্তুর উৎসে। শিশুর নিষ্পাপ দৃষ্টিতে দেখা জগৎ যা আদিমতম অভিজ্ঞতার তাৎপর্যে নিহিত তাঁরই প্রতিচ্ছায়া শিল্পের গড়নে। স্মৃতি, স্বপ্ন, অনুষঙ্গ বা 'মিথ' ঘিরে শিল্পের দ্বিতীয় ভুবন। ব্যক্তি ছাড়িয়ে গোষ্ঠীমানুষের অবচেতনে সে হয়ে উঠে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাই আপাতদৃষ্টিতে শিল্পের ভাষা যা মনে হয় অস্পষ্ট দুর্বোধ্য তা মূলত কিছু সংবেদনশীল সঙ্কেত, কিছু 'কোড' (code) বা চিহ্ন।

অসীম রেজ : একালে শিল্পের ভাষা (লা পয়েজি ১৪/৩)

শিল্পের আদিভূমি থেকে আজ পর্যন্ত যা কিছু আশ্চর্য, বিস্ময়কর তা ধরা পড়ে আমাদের মনের অজান্তে বেড়ে ওঠা কিছু রূপকল্পে (symbol) বা পুরাণ প্রতিমায় (Archetype)। অসমাপ্ত সময়ের দীর্ঘ প্রবহমানতায় সমষ্টি অবচেতনের ভূমি থেকে যেন চক্রাকারে উঠে আসে তারা ; কালে কালে আদল পাল্টায় ও সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের পোষাক বদলায়। এক এক কালে, এক এক বিশ্বাস জন্ম নেয় ; সে বিশ্বাস দানা বাঁধে, স্বপ্ন হয়, 'মিথ' হয়, শিল্পের গড়নে রূপ নেয়। তাই যা কিছু ইঙ্গিতময়, অনির্দিষ্ট শিল্প তাকে আধার দেয়, তাকে ধরে রাখে। আমরা স্বপ্নে বেড়ে উঠি ; শিল্প স্বপ্ন দেখতে শেখায় ; স্বপ্ন সত্য হয় ; আপাত অসম্ভবকে সম্ভব বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য করে।

অসীম রেজ : একালে শিল্পের ভাষা (লা পয়েজি ১৪/৭)

শিল্পবস্তু কেবল শিল্পীমনেরই প্রতিচ্ছায়া নয়—সমগ্র বিশ্বভুবনের একটি সত্যরূপ আমরা দেখতে পাই তাতে।

আবু সয়ীদ আইয়ুব : কবিতা ও প্রেম (পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা)

সময়ের দূরত্বে শিল্পকে খুঁটিয়ে নজর করলেই তার গা থেকে অনেক মোহিনী রাংতা বাহারি পালক ঝরে পড়ে।'

কিন্নর রায় : জলজল মৃন্ময় মুখ প্রবন্ধ

শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে আত্মিক ও বাহ্যিক সমস্যা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটা ভাবা দুষ্কর। একটি প্রাণ, অন্যটি দেহ।

খালেদ চৌধুরী : থিয়েটারে শিল্পভাবনা

এ কথা ভুললে চলবে না যে, বিশ্বাসের চিন্তার ও রুচির যত অদল বদলই হোক, সর্ব দেশে সর্বকালে শিল্পের উপাস্য দেবতা মানুষ।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা নাটক'

পপুলারিটি বা লোকপ্রিয়তা কোনো বড় শিল্পকলার মহত্ত্বের পক্ষে প্রামাণিক নয়।

দিলীপ কুমার রায় : কীর্তন

শিল্প হল কল্পনা। রেখায় রঙে রূপে রসানুভূতির প্রকাশ। রসের উদ্রেক করাতেই তার সার্থকতা।........শিল্প হল সৃষ্টি। স্বভাবের অনুকরণ নয়।......শিল্প হল শিল্পীর ধ্যান

বা 'চিন্তা'।.........শিল্প হল ছন্দ। ভাব, অনুভূতি, রূপ, রঙ, গতি, ছন্দিত হলে তবেই নন্দনীয়তা (aesthetic value) লাভ করে; রসের সুষ্ঠুতম প্রকাশ হল ছন্দে। শিল্প সৃষ্টিতে উদ্দেশ্য উপায় ও উপকরণ যখন একই ছন্দে গ্রথিত হয় তখনই শক্তির আর কোনো অপচয় ঘটতে পারে না।.............শিল্প হল ধ্বনি বা ব্যঞ্জনা। একটু রূপ একটু রেখা, এই দিয়ে ইঙ্গিতে অনেকখানি ভাবনা ও বেদনার অনুষঙ্গ জাগিয়ে তোলা তার কাজ।

নন্দলাল বসু ঃ শিল্পপ্রসঙ্গ

সমসাময়িক বাস্তবতা সব শিল্পের ভিত্তি। তবে নিছক বাস্তবতা নয় এবং নিছক সমসাময়িকতা নয়। তার মধ্যে একটা বিশ্বজনীনতা ও চিরকালীনতার ছোঁয়া লাগলেই তা সার্থক শিল্প হয়।

নীললোহিত ঃ ফুলমণি উপাখ্যান

শিল্পসৃষ্টি যদি জনগণের জন্য না হয় তা হলে সেই শিল্প জনগণ থেকে দূরে সরে যায়। শিল্প যত উচ্চস্তরের গুণসমন্বিত হোক না কেন ব্যবসায়ী মহলে তার মূল্য আর্থিক হিসাব ছাড়া আর কোন হিসাবে বিবেচিত হয় না। বড় অঙ্কের লাভ হলে 'বড় শিল্প' হয় আর লাভের অঙ্কে ঝুঁকি থাকলে শিল্প আদৌ শিল্প হয় না। সাধারণ ব্যবসায়ী নীতিরই এই হল জীবনদর্শন বা সমাজদর্শন।

পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় ঃ সাতের দশকের মুক্ত মন

যে-কোনো শিল্পই হবে রক্ত দিয়ে ফোটানো গোলাপ।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় ঃ যে কোনো শিল্পই হবে

মহৎ শিল্পকলামাত্রেই তো চেতন-অবচেতন নিয়ে নানা স্তরে কাজ করে। কত নাড়া দেয়। সব সঙ্গোপনে। তারই নাম তো শিল্পকলা।

শম্ভু মিত্র ঃ কাল বলে নাট্যকলা

বাহিরের পরিদৃশ্যমান বস্তু-জগৎ এবং ভিতরের অদৃশ্য মনোজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগৎ—এই দুইয়ে মিলিয়া মানুষকে যখন একাধারে রূপের অনুকৃতি এবং রূপের মাধ্যমে অরূপের অভিব্যক্তির জন্য উদ্বুদ্ধ করে, তখন হয় শিল্প সৃষ্টি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস

শিল্পী

যারা শিল্পী তারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আত্মীয়।

অচিন্ত্য বিশ্বাস ঃ কাব্যতত্ত্ব সমীক্ষা

সাধারণ মানুষ বেদনায় মূক। শিল্পী বেদনায় মুখর। সে তার একার বেদনা নয়। তার কণ্ঠধ্বনি হাজার হাজার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি।

নরেন্দ্রনাথ মিত্র ঃ শিল্পীর স্বাধীনতা

বড় মাপের মানুষ না হলে কি বড় শিল্পী হওয়া যায়?

নীললোহিত ঃ ফুলমণি উপাখ্যান

সার্থক শিল্পীকে সমাজসচেতন হতেই হয়। কেউ কেউ সমাজবিজ্ঞান সচেতনও হয়ে থাকেন।

বিষ্ণু বসু ঃ থিয়েটার ভাবনা

ভালবাসা না থাকলে শিল্পী সামাজিক দায়বদ্ধ হবেন কি করে? কিসের জোরে?....... আসল কথা হলো মানুষকে ভালোবাসা, তবে তো কেউ নাটককে ভালোবাসতে পারে। স্টান্ট দিয়ে সাময়িকভাবে দর্শকদের মুগ্ধ করা যায়, কিন্তু সেই অপলকা মুগ্ধতা

ভেঙে যাবে দুদিন বাদেই। যা নিছক মনোরঞ্জন নয়, যা স্টান্ট নয় যা চিরকালের যা আনন্দের সুন্দরের সত্যের তাই মানুষকে ধরে রাখবে। থার্ড থিয়েটার, ওয়ান-ওয়াল থিয়েটারের সাইন বোর্ড টানাতে হবে না।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য ঃ সাক্ষাৎকার (প্রয়াগ পত্রিকা—১৯৮৭)

লোকপ্রিয় হবার ইচ্ছে সকল শিল্পীরই থাকে, কিন্তু কেবলমাত্র প্রিয় হবার দিকেই যার লক্ষ্য তাকে বলা যায় ব্যবসায়ী।

শম্ভু মিত্র ঃ সন্মার্গ

শিল্পীরা সবসময় এক পথে চলতে ভালোবাসে না।

সত্যজিৎ রায় ঃ গণেশ মুৎসুদ্দির পোর্টেট

শিল্পীকে সমাজ বিবর্তনের অন্তর্নিহিত কারণ, বিবর্তনের ইতিহাস, বিবর্তিত সামাজিক অবস্থায় মানুষের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির বিশেষ রূপ, সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের প্রকৃতি—সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—জীবনাবেগের গতিপ্রকৃতি—সমস্ত কিছুই সম্যকরূপে অনুধাবন করতে হবে।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ নাটক লেখার মূলসূত্র

যে ধারণাটি সবচেয়ে মারাত্মক সেটি হচ্ছে—শিল্পী বিনা উদ্দেশ্যেই শিল্পসৃষ্টি করে থাকেন। এটিকেই নিছক রূপ সৃষ্টিই শিল্পীর উদ্দেশ্য, নিছক সৌন্দর্য সৃষ্টিই শিল্পীর উদ্দেশ্য এই ধরনের নানা আপাত-সত্যের সভ্যভব্য বেশে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দেখা যায়। এই মিথ্যা ধারণাটির মোহ দুর্বার।.....শিল্পের কোন উদ্দেশ্য থাকে না—একথা যত জোরে জাহির করতে পারা যায়, তত সহজেই লেখক পদবাচ্য হওয়া সম্ভব হয়। কয়েকটা অনর্থক শব্দের আড়ম্বর বা সমাবেশ করতে পারলেই 'কবি' হওয়া যায়, কোন ক্রমে ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে দৃশ্য পরম্পরা তৈরি করতে পারলেই নাট্যকার হওয়া যায়। এই কারণেই শিল্পের জন্য শিল্প মতবাদটি অল্পধী ও অল্প শক্তিদের কাছে খুব প্রিয়।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ নাটক লেখার মূলসূত্র

প্রত্যেক সৃষ্টিই উদ্দেশ্যমূলক।......শিল্পর উদ্দেশ্যই শিল্পর ভাগ্য বিধাতা।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ নাটক লেখার মূলসূত্র

শিল্পী-সাহিত্যিক

দুর্দিনে অত্যাচারিত মানুষ তাকিয়ে থাকে একদল ভাগ্যবানের দিকে—যাঁরা ঈশ্বরের করুণায় দশের মধ্যে দশম ঃ প্রতিভাবান। তাঁরা শিল্পী, সাহিত্যিক, কবি, নাট্যকার, প্রবন্ধকার, সাংবাদিক। নীল বাঁদরের অত্যাচার দেখে একদিন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দীনবন্ধু, মাইকেল, ফাদার লঙ, হরিশ মুখুজ্জে। অথচ আজ? ল্যালবাঁদর-সবুজবাঁদর-গেরুয়াবাঁদরদের অত্যাচার দেখে এগিয়ে আসছেন না কোন শিল্পী-সাহিত্যিক। তাঁরা দ্বিধাভিক্ত! হয় দক্ষিণপন্থী, নয় বামপন্থী! কেউ নয় ঃ সত্য-শিব-সুন্দরপন্থী।

নারায়ণ সান্যাল ঃ এমনটা তো হয়েই থাকে।

দলাদলি করিনে বটে কিন্তু দলের বৈচিত্র্যের দিকে মন টানচে। বৈচিত্র্যের ক্ষুধা মানুষের সহজাত। বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েই সে আন্তরিক আনন্দ পায়। প্রতি মুহূর্তেই সে কামনা করে নূতনতর জীবন, অভিনব চরিত্র, বিস্ময়কর ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত। শিল্পীর মন এম্‌নি। কোথাও সে বন্ধন স্বীকার করে না। স্নেহের কাছে নয়, প্রেমের কাছে নয়, অবস্থার কাছে নয়। সব কিছুকেই সে স্পর্শ করে এবং সমস্তই সে অতিক্রম করে চলে। সামাজিক বিধি-নিষেধ, নীতি ও ধর্মের বাধা-বিপত্তি, মনুষ্যত্বের মাপকাঠি,—

এ সমস্ত তার জন্য নয়। শিল্পী বাস করে এক বিচিত্র জগতে, মানব-সমাজে সে এক অমর্ত্য-দেবদূত।

প্রবোধকুমার সান্যাল : মহাপ্রস্থানের পথে

শিশির

এইসব শীতের রাতের আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে ;
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা,
কিংবা প্যাঁচার গান, সেও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো।

জীবনানন্দ দাশ : শীতরাত (মহাপৃথিবী)

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে।

জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন

কোন অমরার বিরহিণীরে চাহ নি ফিরে,
কার বিষাদের শিশিরনীরে এলে নাহিয়া॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতমালিকা

শিশিরের কণা নামধামহীন।....
এক বিন্দু স্বর্গ শুধু ভুলে ভূমিতলে পড়ে
গেছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিত্রাঙ্গদা—৮

শিশির কাঁদিয়া শুধু বলে,
"কেন মোর হেন ক্ষুদ্র প্রাণ—
শিশুটির কল্পনার মতো
জনমি অমনি অবসান।
.........হে বিধাতা, শিশিরের মতো
গড়েছ আমার এই প্রাণ,
শিশিরের মরণটি কেন
আমায় করনি তবে দান?"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শিশির (সন্ধ্যাসংগীত)

শিশিরে কান্নাহাসি একেবারে এক হইয়া আছে, আর শিশিরে ভোরবেলাটুকুর কথা সকালবেলায় আসিয়া ফুরাইয়া যায়। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :** হৈমন্তী (গল্পগুচ্ছ)

শিশু

শিশুরা আছে বলেই পৃথিবীটা এত সুন্দর।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় : তাজা গোলাপ [সৃষ্টি]

শিশুরা কি ফুল? নিছকই ফুল? ঝরে যাওয়াটি কি ওদের নির্ধারিত ভবিষ্যৎ? পাল্টাতে হবে, সব ধ্যানধারণা পাল্টে ফেলতে হবে ; শিশুরা শোভাবর্ধক, অ্যালিউর করার বস্তু মাত্র নয়। শিশুরা হাতিয়ার। শিশুরা অস্ত্র! যে অস্ত্র দিয়ে মাটি খুঁচিয়ে, চাপা পড়ে থাকা নবাঙ্কুরকে আলো-বাতাসের সামনে আনা হয়—সেই অস্ত্রের নামই মানবশিশু! যে অস্ত্রে মানুষখেকোদের দাঁত ভেঙে দেওয়া যায় তার নামই মানবশিশু। মানবশিশু হচ্ছে শ্রমিকদের হাতে হাতুড়ি, কৃষকের কাস্তে। সমস্ত মানবিক গুণ যাদের মধ্যে সঞ্চিত থাকে সেটাই শিশু। তাই তারা আধার।

আজিজুল হক : কারাগারে ১৮ বছর

সত্য-শিব-সুন্দরের সহজ সোপানই বুঝি বা শিশুমন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ গঙ্গাবতরণ

ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে।
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।

গোলাম মোস্তাফা ঃ কিশোর

রাজপথে কচি কচি এই সব শিশুর কঙ্কাল—মাতৃস্তন্যহীন,
দধীচির হাড় ছিলো এর চেয়ে আরো কি কঠিন?

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ ফ্যান

প্রত্যেক শিশুই অনন্ত ঈশ্বরীয় শক্তির আধারস্বরূপ।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বাণী ও রচনা (৫)

শিশু......নিত্যকালের ওরা হল যে মশালচী।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ স্মৃতির রেখা

শিশু হয়ে এসেছে চিরনবীন, কিশলয়ে তার ছেলেখেলা জমাবার জন্যে। দোসর হয়ে তার সঙ্গে যোগ দিল ওই সূর্যের আলো, সেও সাজল শিশু, সারাবেলা সে কেবল ঝিকিমিকি করছে। সেই তো তার কলপ্রলাপ। ওদের নাচে নাচে মুখরিত হয়ে উঠল প্রাণগীতিকার প্রথম ধুয়োটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবীন—১

বিধাতার মতো শিশু লীলা দিয়ে শূন্য দেয় ভরে—
শিশু বোঝে মোরে।
বিলুপ্তির ধূলি দিয়ে যাহা খুশি সৃষ্টি করে তাই,
এই আছে এই তার নাই।
ভিত্তিহীন ঘর বেঁধে আনন্দে কাটায়ে দেয় বেলা
মূল্য যার কিছু নাই তাই দিয়ে মূল্যহীন খেলা,
ভাঙাগড়া দুই নিয়ে নৃত্য তার অখণ্ড উল্লাসে,—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথ (পূরবী)

আমাদের চিত্ত শিশুর মধ্যে সৃষ্টির অহৈতুক আনন্দটি দেখতে পায়।.........শিশুকে যখন দেখি তখন কোনো প্রত্যাশার দ্বারা আচ্ছন্ন করে দেখি নে। সে-যে আছে এই সত্যটাই বিশুদ্ধ ভাবে আমাদের মনকে টানে। সেই অপরিণত মানুষটির মধ্যে একটি পূর্ণতার ছবি দেখা দেয়। শিশুর মধ্যে মানুষের প্রাণময় রূপটি স্বচ্ছ অনাবিল আকাশে সুপ্রত্যক্ষ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

বড়ো বড়ো শাল তাল তমালের কথাই কবিরা বড়ো করে বলেন—যে কচি-পাতাগুলো বন জুড়ে কোলাহল করে তাদের স্থান রাখেন অল্পই।.......ক্রিয়াকর্মের দিনে পাড়ার বুড়ো বুড়ো কর্তারা ভাঙা গলায় হাঁকডাক করে, কিন্তু উৎসব জমে ওঠে শিশুদের কলরবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্রাবণগাথা

কে এক বিলিতি কবি বলে গেছেন, ফাদার ইজ দি চাইল্ড অফ্ ম্যান?—নাঃ, ম্যান ইজ দি ফাদার অফ চাইল্ড? উঁহু ম্যান ইজ দি চাইল্ড অফ ফাদার? তাও বোধ হয় না!.....হ্যাঁ, বিলিতি কবির কথাটা মনে পড়ছে এবার—চাইল্ড ইজ দি এলডার ব্রাদার অফ হিজ ফাদার। ওর বাংলা হচ্ছে, শিশুরা এক একটা জ্যাঠামশাই। আস্ত অকালপক্ক। পাক্কা।

শিবরাম চক্রবর্তী ঃ শিশুশিক্ষার পরিণাম

ভেজালের এই যুগে নকল থরে থরে
শুধু শিশুর হাসি মুখে আসল সোনা ঝরে!!

শ্যামলী মহাপাত্র : ভেজাল যুগে (ছড়ার জলছবি)

শৈশব মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, শিশু স্বভাব-কবি। তাহার মন যে কল্পনা-বিলাসে মাতোয়ারা তাহা কবিত্বেরই সমধর্মী। বয়োবৃদ্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শৈশব-কল্পনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। তাহার মনে যে অপরূপ আলোর রংমশাল জ্বলিতে থাকে তাহা ক্রমশঃ সাধারণ জ্ঞানের ধূসর দিবালোকে পর্যবসিত হয়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : শিশু-মনের রহস্য

আদর্শবাদীরা শিশুকে দেবদূতের নিকটতম আত্মীয় বলিয়া মনে করেন ; আবার বৈজ্ঞানিক ও সমাজতত্ত্ববিদেরা তাহাকে বর্বরতার আদিম পর্যায়ভুক্ত করিয়া থাকেন। শেষোক্তদের মতে শিশু আধুনিক সভ্যসমাজে প্রাগৈতিহাসিক বর্বরতার প্রতীক—তাহাকে শিক্ষিত ও সংস্কৃত করিয়া যুগোপযোগী করিয়া লইতে হয়।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : শিশু-মনের রহস্য

যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন যে স্বর্গরাজ্য শিশুদের। তাঁহার এই উক্তিকে আরও একটু সম্প্রসারিত করিয়া বলা চলে যে, সাহিত্যরাজ্যও শিশুসুলভ মানস প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। তাই শিশুর হৃত স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধার করিলে শুধু শিশুই যে আনন্দলোকে প্রতিষ্ঠিত হইবে তাহা নয়, সমগ্র জাতীয় শিল্প-সাহিত্যই রসোচ্ছল ও আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : আধুনিক শিশুসাহিত্য

শিশুশিক্ষা

মাস্টার নিজে কথা বলে, আর ছেলেকে বলে, “চুপ”। শিশুর চুপ-করা মনের উপর বাইরের কথা বোঝার মতো এসে পড়ে, খাদ্যের মতো নয়। যে শিশুশিক্ষা বিভাগে মাস্টারের গলাই শোনা যায়, শিশুরা থাকে নীরব, সেখানে আমি বুঝি মরুভূমির উপর শিলাবৃষ্টি হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—১১।২।২৫

শিষ্য

শূন্যে অনন্ত গগনে
ধ্যানমগ্ন মহাশান্তি ; নক্ষত্রমণ্ডলী
সারি সারি বসিয়াছে স্তব্ধ-কুতূহলী
নিঃশব্দ শিষ্যের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ব্রাহ্মণ (কথা)

শীত

শীতের বেলা ফুরাইল ত একেবারে শেষ হইয়া গেল।

অদ্বৈত মল্লবর্মণ : তিতাস একটি নদীর নাম

এইসব শীতের রাতে আমার হৃদয়ে মৃত্যু আসে ;
বাইরে হয়তো শিশির ঝরছে, কিংবা পাতা
কিংবা প্যাঁচার গান ; সেও শিশিরের মতো, হলুদ পাতার মতো।

জীবনানন্দ দাশ : শীতরাত (মহাপৃথিবী)

জানু ভানু কৃশানু শীতের পরিত্রাণ।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চণ্ডীমঙ্গল

শীতটা বৈশ্য। তাহার পাকা ধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই যব ছোলার প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। প্রাঙ্গণে গোলা ভরিয়া উঠিয়াছে, গোষ্ঠে গোরুর পাল রোমন্থন করিতেছে, ঘাটে ঘাটে নৌকা বোঝাই হইল, পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠাপার্বণের উদ্‌যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আষাঢ় (বিচিত্র প্রবন্ধ)

শীতের বনে কোন সে কঠিন আসবে বলে
শিউলিগুলো ভয়ে মলিন বনের কোলে।।
আমলকি-ডাল সাজল কাঙাল, থামিয়ে দিল পল্লবজলে,
কাশের হাসি হাওয়ায় ভাসি যায় যে চলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

এল যে শীতের বেলা বরষ-পরে।
এবার ফসল কাটো, লও গো ঘরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবগীতিকা-২

শিউলি-ফোটা ফুরোল যেই ফুরোল শীতের বনে
এলে যে—
আমার শীতের বনে এলে যে সেই শূন্যক্ষণে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবগীতিকা-২

শীতের হাওয়ার লাগল নাচন আমলকির এই ডালে ডালে।
পাতাগুলি শিরশিরিয়ে ঝরিয়ে দিল তালে তালে।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবগীতিকা-২

প্রথম শীতের মাসে
শিশির লাগিল ঘাসে,
হুহু করে হাওয়া আসে,
হিহি করে কাঁপে গাত্র।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শীতে ও বসন্তে (চিত্রা)

এসেছে শীত গাহিতে গীত বসন্তেরি জয়,—
যুগের পরে যুগান্তরে মরণ করে লয়।
তাণ্ডবের ঘূর্ণিঝড়ে
শীর্ণ যাহা ঝরিয়া পড়ে,
প্রাণের জয়-তোরণ গড়ে
আনন্দের তানে,
বসন্তের যাত্রা চলে অনন্তের পানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শীতের উদ্বোধন (নটরাজ)

শুকতারা

নিবিড়-আঁধার-ঢালা আম-বাগানের ফাঁকে
অসীমের টিকা দিয়া বরণ করিয়া স্তব্ধতাকে
শুকতারা দিল দেখা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ঘরছাড়া (সেঁজুতি)

বিমল বিশাল বিস্মিত চোখে
দুটি শুকতারা উঠিল ফুটি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পতিতা (কাহিনী)

জানালার বাইরের আকাশে
দেখা যায় শুকতারা,
আশা-বিদায়-করা
যত ঘুমহারাদের সাক্ষী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ পহরে (শ্যামলী)

হে পণ্ডিতের গ্রহ,
তুমি জ্যোতিষের সত্য......
কিন্তু এও সত্য, তার চেয়েও সত্য
যেখানে তুমি আমাদেরি
আপন শুকতারা, সন্ধ্যাতারা,.......
প্রভাতে মানব-পথিককে
নিঃশব্দ সংকেত করেছ
জীবনযাত্রার পথের মুখে,
সন্ধ্যায় ফিরে ডেকেছ
চরম বিশ্রামে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক—আটাশ

সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদুর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষের কবিতা—১২

শুকনো

শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণি বায়।
জল-তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে সে যায়॥

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য-গীতি

ঘরে ঢুকতেই ক্লাসের বেঞ্চি টেবিলগুলো মনের মধ্যে যেন শুকনো কনুয়ের গুঁতো মারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছেলেবেলা—৯

শুকনো মুখ.......যেন বাজে-ছোঁওয়া পাতা-ঝলসানো গাছের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগাযোগ—৯

শুচি

বার বার রাত্রি দিয়ে দিন যদি মুছি,
হে পূষণ! কবে হবো শুচি?

প্রেমেন্দ্র মিত্র : পূষণ

সেই শুচি ধুয়েছে যে সংসারের ধুলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রকৃতির প্রতিশোধ—৩

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন
ধরো হাত সবাকার,
এসো হে পতিত করো অপনীত
সব অপমানভার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারততীর্থ (গীতাঞ্জলি)

শুচিতার সর্বপ্রধান সুখ.....পরকে খোঁটা দেওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—১২

শুদ্ধ

শুদ্ধ নিয়ম-মতে
মুরগিরে পালিয়া,
গঙ্গাজলের যোগে
রাঁধে তার কালিয়া ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খাপছাড়া—১২

শূদ্র

এমন সময় আসিবে যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হইবে, অর্থাৎ বৈশ্যত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়া শূদ্রজাতি যে প্রকার বলবীর্য বিকাশ করিতেছে তাহা নহে, শূদ্রধর্মকর্ম-সহিত সর্বদেশের শূদ্ররা সমাজে একাধিপত্য লাভ করিবে। তাহারই পূর্বাভাসচ্ছটা পাশ্চাত্য জগতে ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে এবং সকলে তাহার ফলাফল ভাবিয়া ব্যাকুল। সোসালিজম, এনার্কিজম, নাইহিলিজম প্রভৃতি সম্প্রদায় এই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বর্তমান ভারত

শূদ্রের অভ্যুত্থান প্রথমে ঘটবে রাশিয়ায় এবং পরে চীনে। ভারতের অভ্যুত্থান ঘটবে তার পরেই এবং ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে এই ভারত।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ স্বামী বিবেকানন্দ—ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

শুদ্ধ-সত্ত্ব পাবকের মত
জগতের গ্লানি শূদ্র দহে ;
মহামানবের গতি সে মূর্ত,
শূদ্র কখনো ক্ষুদ্র নহে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ শূদ্র (কুহু ও কেকা)

শেকসপীয়র

গভীর জীবনদর্শন নিশ্চয়ই উপস্থিত শেকসপীয়রের সৃষ্টিতে, কিন্তু তাঁর যুগের সামাজিক ভাঙা-গড়ার প্রতিফলনকে অতিক্রম করে নয়। যুগকে মেনে নিয়েই (তিনি) যুগোত্তীর্ণ।

উৎপল দত্ত ঃ শেকসপিয়ারের সমাজ চেতনা

সমুদ্র আর শেক্সপীয়র ঃ নির্বাসিত আত্মার পক্ষে চিরন্তন এই দুই আত্মীয়—বলিয়াছেন ভিক্তর হুগো।

গোপাল হালদার ঃ আর একদিন (ত্রিদিবা)

জনসমুদ্র আর শেক্সপীয়র—চিরন্তন আত্মীয় জাগ্রত মানবাত্মার।

গোপাল হালদার ঃ আর একদিন (ত্রিদিবা)

শেক্সপীয়রের নাটক আমাদের কাছে বরাবর নাটকের আদর্শ। তার বহুশাখায়িত বৈচিত্র্য ব্যাপ্তি ও ঘাতপ্রতিঘাত প্রথম থেকেই আমাদের মনকে অধিকাব করেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সূচনা (মালিনী)

শেক্সপীয়র মানবচরিত্রের চিত্রশালার দ্বারোদঘাটন করে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্যের মূল্য

অপরিমেয় সৃষ্টি-রহস্যের কৌশল যদি কোন মানুষ আয়ত্ত করিয়া থাকেন, তবে সেই মানুষ শেক্সপীয়ার। দুর্জ্ঞেয় মানব-হৃদয় তাঁহার নিকট স্ফটিক-স্বচ্ছ ; .....সৃষ্টি-যন্ত্রের

গোপন অক্ষরগুলি যেন সৃষ্টিকর্তা তাঁহার কানে কানে শুনাইয়াছেন। আবার অন্য এক দিক দিয়া এই মূক, বিরাট, অলক্ষিত, অথচ অভ্রান্তরূপে ক্রিয়াশীল প্রকৃতি দেবীর সঙ্গেও তাঁহার এক নিগূঢ় সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। শেকসপীয়ারের আর্ট বা শিল্পকলা এত নির্ভুল ও সূক্ষ্ম যে ইহা মানুষের কষ্টকৃত রচনা অপেক্ষা প্রকৃতির স্বতঃ উৎসারিত সৌন্দর্য সৃষ্টির কথাই বেশি মনে পড়াইয়া দেয়।.....শেকসপীয়ার-প্রতিভা নানা দিক দিয়াই লোকোত্তর বা অতিমানবিক।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস

শেষ

তোমার শেষ বিচারের আশায় বসে আছি।
তোমার রাজকাছারীর দেউড়ীতে বসে আছি।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ ডাকহরকরা

শেষ কহে, 'একদিন সব শেষ হবে,
হে আরম্ভ, বৃথা তব অহংকার তবে'।
আরম্ভ কহিল, 'ভাই, যেথা শেষ হয়
সেইখানে পুনরায় আরম্ভ-উদয়'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আরম্ভ ও শেষ (কণিকা)

শেষ গানেরই রেশ নিয়ে যাও চলে, শেষ কথা যাও বলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতবিতান

শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?
আঘাত হয়ে দেখা দিল, আগুন হয়ে জ্বলবে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলেখা ২

শেষ যাহা হবেই হবে, তারে
সহজে হতে দাও শেষ।
সুন্দর রেখে যাক স্বপ্নের রেশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চিত্রাঙ্গদা (নৃত্যনাট্য)

শোক

সব শোকের তীব্রতাই সময় চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে। পৃথিবীর নিয়মই এই।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ তারানাথ তান্ত্রিক

যা ছিল শোক, আজ তাই হয়েছে শান্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রথম শোক (লিপিকা)

মোর লাগি করিয়ো না শোক,
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিদায় (মহুয়া)

আমরা কি সত্যই চাই শোকের অবসান?
আমাদের গর্ব আছে নিজের শোককে নিয়েও।....
সকল অহংকারই বন্ধন ;
কঠিন বন্ধন আপন শোকের অহংকার।

ধন জন মান সকল আসক্তিতেই মোহ ;
নিবিড় মোহ আপন শোকের আসক্তিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক ১৮

শ্বশুর

অসার সংসারে সার শ্বশুরের ঘর।

ভারতচন্দ্র : অন্নদামঙ্গল

শ্মশান

শ্মশান তো ভালবাসিস মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি?
দেখসে হেথা কি হয়েছে,
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে,
কত ভূত বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি!

অশ্বিনীকুমার দত্ত : শাক্ত পদাবলী

শ্মশান অতি পবিত্র স্থান, সেখানে মানুষের সমস্ত পাপ শেষবারের মত মুছে যায়, তার উর্ধ্বলোকে প্রস্থানের পথ সুগম হয়। শ্মশানে ভয় কিসের?

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : তারানাথ তান্ত্রিক

শ্মশান ভালবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি ;
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
ও মা, চিতা-ভস্ম চারি ভিতে
রেখে মা আসিস যদি॥
মৃত্যুঞ্জয় মহাকালে, রাখিয়ে মা পদ-তলে,
নেচে আয় মা তালে তালে, হেরি আমি নয়ন মুদি॥

রামলাল দাস দত্ত : শাক্ত পদাবলী

শ্যামা (দ্র. কালী)

শ্যামা মা কি আমার কালো।
লোকে বলে কালী কালো আমার মন তো বলে না কালো।
কালো রূপে দিগম্বরী
হৃদি পদ্ম করে মোর আলো।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য : শ্যামাসঙ্গীত

কে পরালো মুণ্ডমালা
আমার শ্যামা মায়ের গলে।
সহস্রদল জীবন-কমল
দোলে রে যাঁর চরণ-তলে॥
কে বলে মোর মাকে কালো
মায়ের হাসি দিনের আলো
মায়ের আমার গায়ের জ্যোতি
গগন পবন জলেস্থলে।

কাজী নজরুল ইসলাম : ভক্তি-গীতি

বল রে জবা বল।/কোন সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল॥
মায়া তরুর বাঁধন টুটে/মায়ের পায়ে পড়লি লুটে,
মুক্তি পেলি, উঠলি ফুটে আনন্দ বিহ্বল।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভক্তি-গীতি

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন মা বলি
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী কালী।
হৃদয়-মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন করবে অন্তর্জলী।
তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে,
মিশায়ে ভক্তিচন্দনে পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি॥

দাশরথি রায় ঃ শাক্ত পদাবলী

যিনি শ্যামা, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁর রূপ, তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ, তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্ম শক্তি—শক্তি ব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মাতৃশ্রাদ্ধ (শান্তিনিকেতন)

গোচরে এবং অগোচরেও যার উপর আমার বিশ্বাস অটল তারই উপর আমার শ্রদ্ধা। মৃত্যুর অন্ধকারময় অন্তরালেও যাকে আমার সমস্ত চিত্ত সত্য বলে উপলব্ধি করছে তাকেই তো যথার্থ আমি সত্য বলে শ্রদ্ধা করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মাতৃশ্রাদ্ধ (শান্তিনিকেতন)

যে দাস, সে কখনো শ্রদ্ধা করতে পারে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

চোখ পাকিয়ে বা গলা জড়িয়ে শ্রদ্ধা আদায় করতে হয় না। চোখ পাকিয়ে বা কড়া কথা বলে যে আনুগত্য পাওয়া যায় তা শূন্যগর্ভ প্রাণহীন। সহজে যে শ্রদ্ধা পাওয়া যায় সেই শ্রদ্ধাই আন্তরিক।

সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা

শ্রাদ্ধ

শ্রাদ্ধদিনের ভিতরকার কথাটি—শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ বিশ্বাস।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মাতৃশ্রাদ্ধ (শান্তিনিকেতন)

প্রিয়জনেরই মৃত্যুর পরে প্রেমের আলোকে আমরা এই অনন্ত অমৃতলোককে আবিষ্কার করে থাকি। সেই তো আমাদের শ্রদ্ধার দিন—সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, অমৃতের প্রতি শ্রদ্ধা। শ্রাদ্ধের দিনে আমরা মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়িয়ে অমৃতের প্রতি সেই শ্রদ্ধা নিবেদন করি।.....সেই শ্রদ্ধাই প্রকাশ করার দিন শ্রাদ্ধের দিন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মাতৃশ্রাদ্ধ (শান্তিনিকেতন)

—শ্রাদ্ধ নাই বা হল।
—শোনো একবার।........ভূত যে না খেয়ে মরবে।
—সে তো মরেইছে, আবার মরবে কি করে।
—সেই তো আরও বিপদ। না খেয়ে মরা ভালো, কিন্তু মরে না খেয়ে বেঁচে থাকা যে বিষম দুগ্রহ।......
—ইংরেজের ভূত তাহলে খেতে পায় কী করে।

—তারা বেঁচে থাকতে যা খেয়েছে তাতেই তাদের সাত জন্ম অমনি চলে যায়। আমরা যা খাই তাতে বৈতরণী পার হবার অনেক আগেই পেট চোঁ-চোঁ করতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—৬

আমি বাংলা ভাষা ভালবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানিনে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে।

প্রমথ চৌধুরী : কথার কথা

শ্রমিক/শ্রমজীবী

ধনবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা আছে। তাই আছে ধনবাদী সমাজ। এই উৎপাদন ব্যবস্থার সামনাসামনি আসছে মানুষ। উৎপাদন ব্যবস্থা কিন্তু স্বাধীন বস্তুপুঞ্জ। এই বস্তুপুঞ্জ এবার গ্রাস করছে শ্রমিককে। বস্তুপুঞ্জের, উৎপাদনের যে ছন্দ আছে, তাল আছে, মাত্রা আছে, তা এবার আস্তে আস্তে কুহকী মায়া বিস্তার করে শ্রমিককে মোহমুগ্ধ করছে।

রাম বসু : সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ও মার্কসবাদ

ভবিষ্যতে শ্রমিকরা মাইনের জন্য নয়, বোনাসের জন্য নয়,
ইজ্জতের জন্য—সমগ্র রাষ্ট্রের মালিক হবার জন্য লড়াই করবে।

মণিভূষণ ভট্টাচার্য : নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ

ফুল বাগানের মালি কিংবা একজন রাজমিস্ত্রি কিংবা একজন বাসের চালক—তাঁকে কী বলব? বুদ্ধিজীবী না শ্রমজীবী? তাঁরা শ্রমজীবী ঠিকই কিন্তু সেই শ্রম বুদ্ধির দ্বারা প্রতিমুহূর্তে পরিমার্জিত হয়। প্রতিমুহূর্তেই তাঁকে বুদ্ধিপ্রয়োগ করতে হয়। একজন বাসের চালককে যদি বা শ্রমজীবী বলে উল্লেখ করতে পারি, এরোপ্লেন-চালককে শ্রমজীবী বলবার ঠিক ভরসা হবে না আমাদের।

সুমিতা চক্রবর্তী : জীবনানন্দ : সমাজ ও সমকাল

শ্রাবণ

ঝড়কে দিলাম তোমার হাসি
মেঘকে চোখের জল
আমার নিজের আকাশে তাই
শ্রাবণই সম্বল।
যেমন শ্রাবণ আঁচল ভরা
যেমন শ্রাবণ বুকে
শ্রাবণ আমায় দিল তোমার
হাসিকে অশ্রুকে।

অমিতাভ গুপ্ত : লীলা

শ্রাবণের ধারার মতো পড়ুক ঝরে, পড়ুক ঝরে
তোমারি সুরটি আমার মুখের 'পরে, বুকের 'পরে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : কেতকী

শ্রাবণের গগনের গায় বিদ্যুৎ চমকিয়া যায়।
ক্ষণে ক্ষণে শর্বরী শিহরিয়া উঠে, হায়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতবিতান

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে।
সেই আগুনের কালোরূপ যে আমার চোখের 'পরে নাচে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবগীতিকা ১

শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা,
আড়াল থেকে দেয় দেখা কোন্ পথ ভোলা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা ২

শ্রাবণ ঘরছাড়া উদাসী। আলুথালু তার জটা, চোখে তার বিদ্যুৎ। অশ্রান্ত ধারায় একতারায় একই সুর সে বাজিয়ে বাজিয়ে সারা হল। পথহারা তার সব কথা বলে শেষ করতে পারলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ বর্ষণ

শ্রাবণ হলো একটি জীবনের ঝরে পড়া আলোর উত্তাপ।

সৌমিত বসু ঃ শ্রাবণ কথা

শ্রী

প্রকৃতিতে যাহা সৌন্দর্য, মহৎ এবং গুণী লোকে তাহাই প্রতিভা এবং নারীতে তাহাই শ্রী, তাহাই নারীত্ব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অখণ্ডতা (পঞ্চভূত)

শ্রী কখন মুখের অংশ নহে, অন্তরের অংশ।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ মাধবীলতা

শ্রীক্ষেত্র

মহামানবের মিলনক্ষেত্র—শ্রীক্ষেত্র নাম তাই!
মহামিলনের পদধূলিপূত—তাই সে তীর্থ ঠাঁই,
নীতি ও আচার বিধি ও বিচার বিতর্ক সব ভুলি
নে রে নে মানব মাথায় তুলিয়া সেই পবিত্রধূলি

যতীন্দ্রমোহন বাগচী ঃ রথযাত্রা

শ্রুতিনাটক

যথার্থ শ্রুতিনাটক তো এই রেডিও নাটক। কিন্তু যখন দেখি শ্রুতি চরিত্রগুলি দৃশ্যমান, তখন আমাদের কল্পনা রূঢ় আঘাত পায়। আমাদের মানসনাটক বিপর্যস্ত হয়ে যায়। যাঁরা মুখে বলছেন শ্রুতিনাটক তাঁরা করছেন দৃশ্য নাটক। দৃশ্য অথচ দৃশ্যনাটক নয়। সাজসজ্জা নেই, কম্পোজিশন নেই, চলাফেরা নেই, পার্ট মুখস্থ নেই, একজায়গায় স্থাণুর মত বসে সামনে বই ধরে কথা বলে চলেছে। নাট্যপাঠ মানি, কিন্তু শ্রুতি নাটক বলে মানব কি করে? শ্রুতি নাটকে ভাবনা ও কল্পনার যে অবকাশ আছে, দৃশ্য নাটকে তা নেই। দৃশ্য নাটকে ঘটনা ও চরিত্রের বৈচিত্র্য, ক্রিয়া, গতি ও পরিণতি সব কিছুই আমাদের দৃষ্টিকে অধিকার ক'রে থাকে এবং ভাবনা কল্পনাকে অনেকখানি অবরুদ্ধ ক'রে রাখে। রেডিওর কাছে আমরা শ্রোতা আর টিভির সামনে আমরা দর্শক। কিন্তু দর্শক হ'লেও সেখানেও আমরা শ্রোতা। সংবাদ তো শুধু শ্রাব্য, টিভির পর্দায় শুধু বক্তার ছবি কিন্তু দৃশ্য মাধ্যমে সে শুধু বক্তা। সব ঘোষণা, সব তথ্য বিজ্ঞপ্তি শ্রবণীয়।

অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ

শ্রুতিনাটক নামটি নতুন এবং চমকপ্রদ। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা চরিত্রানুগ অভিনয়ই করবেন, তবে সে অভিনয় একান্তভাবে বাচিক অভিনয়, অর্থাৎ কণ্ঠস্বরই এখানে অভিনয়ের একমাত্র মাধ্যম।.......শ্রুতি নাটক চলচ্চিত্রের মতোই সর্বত্রগামী হতে পারে, এমন কি চলচ্চিত্রকেও ছাপিয়ে যেতে পারে। শুধুমাত্র আবহের পরিবর্তন ঘটিয়ে এক নিমেষে সমুদ্রের গভীর তলদেশ থেকে অনন্ত মহাকাশে পৌঁছে যেতে পারে কেবলমাত্র শ্রুতিনাটকই।.....মঞ্চে আমরা আদম-ইভ বা গুহামানব-মানবীদের আনতে পারি না রুচিবিকৃতির অভিযোগ ওঠার ভয়ে, এমন কি চলচ্চিত্রেও সে

সম্ভাবনা থেকে যায়, কিন্তু শ্রুতিনাটকে তা অনায়াস সাধ্য বিন্দুমাত্র অশালীনতা না এনেও। শ্রুতিনাটক মঞ্চের সীমিত পরিসরের গণ্ডি ভেঙে নাট্যকারের কল্পনাশক্তিকে বিস্তৃততর হবার সুযোগ এনে দিয়েছে।

অমল রায় : শ্রুতিনাটক : প্রসেনিয়াম থিয়েটার

শ্রুতিনাটক শ্রুতিপ্রধান হলেও এর সার্থক প্রযোজনা কেবল শ্রুতিনির্ভর নয়। দর্শকের চক্ষু, কর্ণ, মন, বুদ্ধি ও চিত্ত—এই সব কটি ইন্দ্রিয়ের কাছেই সে কম বেশি দায়বদ্ধ।

কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য : শ্রুতিনাটক ও 'শ্রুতি' নির্ভরতা

শ্রুতিনাটক বাচিক অভিনয়ের সর্বোত্তম প্রকাশ। যথার্থ নাট্য পাঠে বা শ্রুতিনাট্যের পরিবেশনে রসের অনির্বচনীয়তার আস্বাদ পাওয়া যায়।.....আপাত শ্রবণ নির্ভর শ্রুতি নাটক একাধিক ইন্দ্রিয়বোধ তৃপ্ত ও পূর্ণ করবে, আঙ্গিক ভাবনায় শিল্পরূপটি অপরূপ সৌন্দর্যময় হয়ে উঠবে, বহন করে আনবে অপরূপ নান্দনিক আবেদন।

সনাতন গোস্বামী : প্রসঙ্গ শ্রুতিনাটক

শ্রেণী

মন কারো ভালো নেই, সত্যি।
তবু বেঁচে থাকাটাই লক্ষ্য
ঈশ্বর নিশ্চয় দেখছেন—
দুটি শ্রেণী—ভক্ষক ও ভক্ষ্য।

হরপ্রসাদ মিত্র : বেয়াড়া

শ্রেণী সংগ্রাম

মানবসভ্যতার ইতিহাস শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস—শ্রমিক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যার চূড়ান্ত মীমাংসা সম্ভব।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : পুড়ে যায় নশ্বর জীবন

যেদিন জগতে সর্বপ্রথম ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি হয়েছে শ্রেণী-সংগ্রামের সৃষ্টি হয়েছে সেই দিন।

মুজফফর আহমদ : গণবাণী (প্রবন্ধ সংকলন)

সংগীত/সঙ্গীত (দ্র. গান)

সংগীতের একমাত্র ভাষা হচ্ছে সুর—কথা নয়।

প্রমথ চৌধুরী : বীণাবাই

সংগীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিত কলা এবং যাঁরা উহা বোঝেন তাঁদের নিকট উহা সর্বোচ্চ উপাসনা।

বিবেকানন্দ : পত্রাবলী (২য়)

সঙ্গীত এমনই জিনিষ, একবার যদি অন্তরে গেঁথে যায়, তাহলে এক-একজন লোক আর দিমাগ্ ঠিক রাখতে পারে না, একেবারে মাতোয়ারা হয়ে যায়। তাদের আর সংসারের অন্য কোন কিছুতেই মন বসে না।......এরা নিজেদের অন্তরের সুর নিয়েই মশগুল হয়ে থাকে।

নীললোহিত : তোমার তুলনা তুমি

খুব বড় সঙ্গীতশিল্পীরা কখনো রাগী হতে পারেন না, ওঁরা মহাপুরুষ।

নীললোহিত : তোমার তুলনা তুমি

সংগীতের দ্বারা যখন আমরা ভাব ব্যক্ত করিতে চাহি তখন কথাকে উপলক্ষ্যমাত্র করাই আবশ্যক ; কথার দ্বারাই যদি সকল কথা বলা হইয়া যায় তবে সংগীত সেখানে খর্ব হইয়া পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আর্যগাথা (আধুনিক সাহিত্য)

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত করো তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সংগীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছবির অঙ্গ (পরিচয়)

যা সুর নয়, তাল নয়, সুর-তালে ব্যাপ্ত হয়ে থেকে সুরতালের অতীত যা, সেই সংগীত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

বাস্তবের সভায় সংগীত মুজরা দিতে আসে না—যেখানে অখণ্ড অবকাশ সেখানেই সে সেলাম করিয়া বসিয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বর্ষা (পরিচয়)

শব্দকে কেবলই অত্যন্ত বাড়িয়ে দিয়ে এবং চড়িয়ে দিয়ে যে জিনিষটা পাওয়া যায় সেটা হল হুংকার ; আর শব্দকে সুর দিয়ে, লয় দিয়ে, সংযত সম্পূর্ণতা দান করলে যে জিনিষটা পাওয়া যায় সেইটেই হল সংগীত। ঐ হুংকারটা হল শক্তি, এর পরিমাণ পাওয়া যায় ; আর সংগীতটা হল অমৃত, হাতে বহরে ওকে কোথাও মাপবার জো নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাতায়নিকের পত্র (কালান্তর)

বিজ্ঞানে গণিতের যে-স্থান, আর্টে সংগীতের সেই স্থান, ইহা সম্পূর্ণ বস্তুনিরপেক্ষ। অভিব্যক্তির যেটুকু সার, তাহাই সংগীত। সংগীতের যে ঝংকার তাহা মুক্ত অবাধ......সংগীত যেন আমাদিগকে সকল জিনিসের আত্মার ভিতরে লইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সংগীতচিন্তা

যে মানুষে একটি বড় গুণ আছে, যেমন সঙ্গীতবিদ্যা, তাতে ঈশ্বরের শক্তি আছে বিশেষরূপে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সংগ্রাম

ব্যবস্থা বদলের সংগ্রাম, বিশ্ব শান্তির সংগ্রাম এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক দখল থেকে মুক্তির সংগ্রাম—পৃথক পৃথক নয়। সবকিছুর স্বার্থ একসূত্রে গাঁথা। একে অপরের পরিপূরক।

নন্দগোপাল ভট্টাচার্য ঃ এগারোর কৈফিয়ত

উঠছে সূর্য লাল সকাল
মানুষে মানুষে ঐক্য চাই।
সামনে সুদিন আগামীকাল
সংগ্রাম ছাড়া উপায় নাই॥

ভবতোষ শতপথী ঃ আগামীকাল (অরণ্যের কাব্য)

জনতার সংগ্রাম চলবেই।
আমাদের সংগ্রাম চলবেই॥
হতমানে অপমানে নয়, সুখ সম্মানে

বাঁচাবার অধিকার কাড়তে
দাসের নির্মোক ছাড়তে
অগণিত মানুষের প্রাণপণ যুদ্ধ
চলবেই চলবেই,
জনতার সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।

সিকান্দার আবু জাফর ঃ সংগ্রাম চলবেই

আমার ভয় হয় কখন বলে ফেলি প্রকাশ্য সংগ্রামের কথা
আমারোতো ঘর আছে।

সৌমিত বসু ঃ ভয় হয় অবিশ্বাসী.....(বর্ণহীন জন্ম প্রার্থনা)

সংলাপ

সংলাপ যেখানে চরিত্রের শুধু মুখের কথা নয়, সমগ্র সত্তার অভিব্যক্তি হয়, সেখানে সংলাপ সার্থক।

অজিতকুমার ঘোষ ঃ নাটকের কথা

সংলাপ কেবল চরিত্রানুগ রীতির হলেই চলে না। সংলাপ সৃষ্টি হবে চরিত্রের মন থেকে, বুদ্ধি থেকে, আবেগ থেকে, ইচ্ছাশক্তি ও প্রয়োজন থেকে। চরিত্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সংলাপেই বুঝতে হবে। জীবনে যেমন অগোছাল কথা হয়, নাট্যকলায় তা চলে না।

গৌরীশংকর ভট্টাচার্য ঃ প্রসঙ্গ নাটক থিয়েটার ও বেতার

সংসার

সংসার মানে কটা মানুষ নয়। কখানা ঘর বারান্দা অথবা কিছু রোজগার এবং তার বদলে পাওয়া কিছু স্বাচ্ছন্দ্য নয়। সংসার মানে কিছু মানুষের একসঙ্গে চলা, একটা লক্ষ্যকেই সবাই মিলে আঁকড়ে থাকা।

অমরেন্দ্র নাথ সান্যাল ঃ সন্ন্যাস

সংসার কি? যাহা ঈশ্বর হইতে তোমাদের দূরে রাখে, তাহাই সংসার।

আচার্য নগেন্দ্রনাথ ঃ উপদেশাবলী

সংসার কর্মভূমি। এখানে কর্ম করতে আসা। যেমন দেশে বাড়ি কলকাতায় গিয়ে কর্ম করে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সংসার আর মুক্তি দুই ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনিই সংসারে অজ্ঞান করে রেখেছেন ; আবার তিনি ইচ্ছা করে যখন ডাকবেন তখন মুক্তি হবে। ছেলে খেলতে গেছে খাবার সময় মা ডাকে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

যে সংসারী ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি রেখে সংসার করে, সে ধন্য, সে বীরপুরুষ।......সংসারে নির্লিপ্তভাবে থাকতে গেলে কিছু সাধন করা চাই। দিনকতক নির্জনে থাকা দরকার, তা একবছর হোক, ছয়মাস হোক, তিনমাস হোক বা একমাস হোক। সেই নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সংসারে কাম, ক্রোধ এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, নানা বাসনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়, আসক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়। যুদ্ধ কেল্লা থেকে হলেই সুবিধা। গৃহ থেকে যুদ্ধই ভাল ;—খাওয়া মেলে, ধর্মপত্নী অনেক রকম সাহায্য করে। কলিতে অন্নগত

প্রাণ—অন্নের জন্য সাত জায়গায় ঘুরার চেয়ে এক জায়গাই ভাল। গৃহে, কেল্লার ভিতর থেকে যেন যুদ্ধ করা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সংসার সরসী মাঝে, আমি যেন পানা
যথা ইচ্ছে ভেসে যাই নাহিক ঠিকানা।
প্রভুর যেদিন ইচ্ছা লবে মোরে তুলে.....
তাঁরি আছি, তাঁরি রব একূলে ওকূলে।

শিবনাথ শাস্ত্রী ঃ মুক্ত

সংস্কার

সংস্কারের মুক্তি তো যুক্তি দিয়ে হয় না, যেমন বুদ্ধি দিয়ে জয় হয় না ভূতের ভয়। সংস্কার রাতারাতি পরিহার করতে হলে চাই বিপ্লব, রয়ে সয়ে করতে হলে চাই অভ্যাস।

যাযাবর ঃ দৃষ্টিপাত

সংস্কার জিনিষটার মানে কি। ওটা ভাল কিছু নয়। সেটা খারাপ জিনিষ অনেকদিন চলে ধড়ধড়ে নড়চড়ে হয়ে পড়েছে—সেটা মেরামত করে আবার দাঁড় করানো।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ চন্দননগরে আলাপ সভায়

সংস্কার মানে মেরামত,—উচ্ছেদ নয়। গুরুভারে যে অপরাধ আজ মানুষের অসহ হয়ে উঠেছে তাকেই সুসহ করা ; যে যন্ত্র বিকল হয়ে এসেছে মেরামত করে তাকেই সুপ্রতিষ্ঠিত করার যে কৌশল, বোধ হয় তারই নাম শাসন সংস্কার।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পথের দাবী

সংস্কৃতি

সঠিক সংস্কৃতির অভাবে সভ্যতা ও প্রগতির ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ উৎসের দিকে ফেরা

সংস্কৃতি সমাজ-দেহের শুধু লাবণ্যছটা নয়, তাহার সমগ্র রূপ। তাই সমাজের পরিচয় দিয়াই সংস্কৃতির পরিচয়—এইটিই আসল কথা।

গোপাল হালদার ঃ সংস্কৃতির গোড়ার কথা

জাগরণ, সচেতনতা বা প্রবুদ্ধ হওয়ার অভিজ্ঞতাও সংস্কৃতি।

নৃপেন্দ্র সাহা ঃ ভূমিকা (সফদর হাশমি নাট্য সংগ্রহ)

সংস্কৃতির প্রকৃত উৎস আত্মজ্ঞানে, আত্মসংযমে এবং আত্মত্যাগে।

বনফুল ঃ বাংলা সাহিত্য

Culture বা সংস্কৃতি বলিলে বুঝি—উন্নত মানবসমাজের উন্নত জীবনের অন্তরঙ্গ বস্তুগুলি—তাহার আধিমানসিক আধ্যাত্মিক জীবন ; তাহার সামাজিক জীবনের সৌন্দর্যময় প্রকাশ ; তাহার সাহিত্য ও সৌন্দর্যবোধ ;—তাহার বাহ্য সভ্যতার প্রাণবস্তু। ...... সভ্যতা তরুর পুষ্প যেন সংস্কৃতি।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস

সকাল

রাত্রিকে ভয় পেও না,
রাত্রির গর্ভের মধ্যেই যে
ফুটফুটে একটা সকাল ধীরে ধীরে
তৈরী হয়ে ওঠে।......
এমন কোনও রাত্রি কখনও আসেনি,

যার পরেই
সুন্দর একটা সকাল ছিল না।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ঃ যখন রাত্রি (কবিতার বদলে কবিতা)

এই সকাল বেলার বাদল-আঁধারে
আজি বনের বীণায় কী সুর বাঁধা রে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা

আমার সকাল কি তোর সকালের মতো যে, গান শুনতে পাবো। এ যে ক্লান্ত রাত্তিরটারই ঝেঁটিয়ে ফেলা উচ্ছিষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

সবুজ ঘাসে কালো কাক সকাল আনে।

সমর সেন ঃ একটি কবিতা

সকালের এক-টুকরো রোদ্দুর—
এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ লেনিন

রঙিন সকাল এবং রঙিন সন্ধ্যাগুলি দিগ্‌বধূদের ছিন্ন কণ্ঠহার হতে এক একটি মাণিক্যের মতো সমুদ্রের জলে খসে খসে পড়ে যাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছিন্নপত্র

সঙ্কল্প

সঙ্কল্প শুদ্ধ তো সঙ্কল্প সিদ্ধ।

আচার্য নগেন্দ্রনাথ ঃ উপদেশাবলী

সঙ্গদোষ

সঙ্গদোষের ন্যায় আর ভয়ানক নাই। বাপ/মা ও শিক্ষক সর্বদা যত্ন করিলেও সঙ্গদোষে সব যায়, যে স্থলে ঐরূপ যত্ন কিছুমাত্র নাই, সে স্থলে সঙ্গদোষ কত মন্দ হয়, তাহা বলা যায় না।

প্যারীচাঁদ মিত্র ঃ আলালের ঘরের দুলাল

সঙ্গী

কোন রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে বারে বারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবগীতিকা ২

মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

সচ্চিদানন্দ

বেদে আছে—তিনি আনন্দ রূপ—সচ্চিদানন্দ শুকদেবাদি এই ব্রহ্মসাগর তটে দাঁড়িয়ে দর্শন স্পর্শন করেছিলেন। এক মতে আছে—তাঁরা এ সাগরে নামেন নাই। এ-সাগরে নামলে আর ফিরবার জো নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সঞ্চয়

সঞ্চয় বলতে কিছু নেই কেবল পুরোনো স্মৃতি।

কুমারেশ চক্রবর্তী ঃ রাস্তা পড়ে আছে খালি ৩৬

সঞ্চয়ের বড়ো দুর্জয় নেশা.........আমাদের দেশে ইহাকেই বলে নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বারোয়ারি মঙ্গল (ভারতবর্ষ)

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথপ্রান্তে ফেলে যেতে হয়।
নাই নাই, নাই যে সময়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শাজাহান (বলাকা)

সততা

সততাই তো লক্ষ্মীর সোনার পদ্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভাইফোঁটা

সতীবাক্য রক্ষা হেতু বিধিবাক্য নড়ে।

বাংলা প্রবাদ

সৎকথা হল অমৃত আর অসৎ কথা হল বিষ। বিষ খেলে আসে যম মরণ, অমৃত খেলে আসেন ভগবান। ভগবান দয়া করলে মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি লঙঘন করে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : নিশিপদ্ম

যে সৎসাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

সুবোধ ঘোষ : ফসিল

সত্ত্বগুণ

সত্ত্বগুণ থেকে দয়া হয়। দয়ার জন্য যে কর্ম করা যায়, সে রাজসিক কর্ম বটে—কিন্তু এ রজোগুণ—সত্ত্বের রজোগুণ, এতে দোষ নাই।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সত্ত্বগুণে অন্তর্মুখ হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

তমোগুণে বিনাশ হয়।.....রজোগুণে মানুষ সংসারে বদ্ধ হয়, নানা কাজে জড়ায়। রজোগুণ ঈশ্বরকে ভুলিয়ে দেয়। সত্ত্বগুণই কেবল ঈশ্বরের পথ দেখিয়ে দেয়। দয়া, ধর্ম, ভক্তি—এ-সব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ যেন সিঁড়ির শেষ ধাপ। তারপরেই ছাদ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

রজোগুণে একটু পাণ্ডিত্য দেখাতে লেকচার দিতে ইচ্ছা হয়। সত্ত্বগুণে অন্তর্মুখ হয়, আর গোপন। কিন্তু খুব লোক! ঈশ্বর কথায় এত উল্লাস!

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সত্য

সত্য স্বয়ং প্রকাশ। তাহাকে কোনো রক্ত-আঁখি রাজদণ্ড নিরোধ করতে পারে না।

কাজী নজরুল ইসলাম : রাজবন্দীর জবানবন্দী

আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা। আমি অজানা অসীম পূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি। এ আমার অহঙ্কার নয় আত্মউপলব্ধির আত্মবিশ্বাসের চেতনালব্ধ সহজ সত্যের সরল স্বীকারোক্তি। আমি অন্ধবিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না। তা হলে যে আমার দেবতা আমায় ত্যাগ করে যাবে।

কাজী নজরুল ইসলাম : রাজবন্দীর জবানবন্দী

সত্যের চেয়ে বড় আর কিছু নেই। ওই ধর্ম, ওই ভগবান।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (দাদামশাই) : দাদামশাই—বনফুল

সত্য সকল গুণের আয়তন—আধার। পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে যেমন ভ্রমর আসিয়া জুটে, তেমনি যে সত্যকে দৃঢ় আলিঙ্গনে ধরিয়া থাকে, তাহার অন্তরে দিন দিন নব নব গুণের বিকাশ হইতে থাকে।

স্বামী দয়ানন্দ : সত্যলাভ (উদ্বোধন ১৯।৩)

যে সত্য কেবলমাত্র বাক্যে নিবদ্ধ, তদপেক্ষা যে সত্য জীবনে পালিত হয় তাহা ঢের বেশী শক্তিশালী।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় : আত্মচরিত

সত্য যেখানে অনুপস্থিত, শিব সেখানে শব, সুন্দর সেখানে শ্রীহীন।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : মুখবন্ধ—নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা

সত্য যে আরো বড়। জীবনের চেয়েও বড়, মৃত্যুর চেয়েও বড়। পাপ, পুণ্য, ধর্ম, ইহলোক, পরলোক সব কিছুর চেয়েও যে সত্য বড়।

বিমল মিত্র : কড়ি দিয়ে কিনলাম

সত্যই মানুষের ধর্ম। ভাগবত শাস্ত্রের প্রথম শ্লোকে যেখানে ঋষি প্রণাম করেছেন—"সত্যং পরম ধীমহি"—সত্যই ভগবান। মহাত্মাজী বলতেন, 'সত্যই ঈশ্বর।' God is truth, truth is God,–সত্যই সব, সত্যের মধ্যেই সব।.......সত্যের চাইতে সুন্দর আর কোন বস্তু নেই।

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী : মানবধর্ম

সত্য যে বড়োই, ছোটোই তো মিথ্যা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অচলায়তন

সত্য থাকুন ধরিত্রীতে
শুষ্ক রুক্ষ ঋষির চিত্তে,
জ্যামিতি তার বীজগণিতে,
 কারো ইথে আপত্তি নেই—
কিন্তু আমার প্রিয়ার কানে
এবং আমার কবির গানে
পঞ্চশরের পুষ্পবাণে
 মিথ্যে থাকুন রাত্রিদিনেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অতিবাদ (ক্ষণিকা)

চিত্তদুয়ার মুক্ত রেখে
 সাধুবুদ্ধি বহির্গতা,
আজকে আমি কোনো মতেই
 বলব নাকো সত্য কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অতিবাদ (ক্ষণিকা)

পায়ের তলার মাটির কাছ থেকে পাই তথ্য, অর্থাৎ কেবল তথাকার খবর ; বিশ্বপৃথিবীর কাছ থেকে পাই সত্য, অর্থাৎ সমস্তটার খবর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আমার জগৎ (সঞ্চয়)

দ্বার বন্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি।
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : একই পথ (কণিকা)

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ। কিন্তু এই জ্ঞানময় অনন্তসত্য কিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন? আনন্দরূপমমৃতং যদ্‌বিভাতি—তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে তাহা তাঁহার আনন্দস্বরূপ, তাঁহার অমৃতরূপ, অর্থাৎ তাঁহার প্রেম। বিশ্বজগৎ তাঁহার অমৃতময় আনন্দ, তাঁহার প্রেম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ (উৎসব ধর্ম)

তোমাকে সবাই কুসমি বলে জানে। এই কথাটা খুবই সত্য ; তার হাজার প্রমাণ আছে।.....কিন্তু.......তুমি পরীস্থানের পরী। এটা হল আরও সত্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গল্পসল্প

গল্পই লোকের বিশ্বাস কাড়িবার জন্য সাবধান হইয়া চলে, সত্যের সে দায় নাই বলিয়া সত্য অদ্ভুত হইতে ভয় করে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চতুরঙ্গ

তথ্য খণ্ডিত, স্বতন্ত্র—সত্যের মধ্যে সে আপন বৃহৎ ঐক্যকে প্রকাশ করে। আমি ব্যক্তিগত আমি এই তথ্যটুকুর মধ্যে, আমি মানুষ এই সত্যটিকে যখন আমি প্রকাশ করি তখনই বিরাট একের আলোকে আমি নিত্যতায় উদ্ভাসিত হই। তথ্যের মধ্যে সত্যের প্রকাশই হচ্ছে প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তথ্য ও সত্য (সাহিত্যের পথে)

সত্যকে যেমন করিয়া হউক মানিতেই হইবে—কিন্তু সত্যকে যখন অন্তরের মধ্যে মানি তখনই তাহা আনন্দ, বাহিরে যখন মানি তখনই তাহা দুঃখ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পথের সঞ্চয়

করছি না exaggerate
কিছু সত্য আছে নিরেট,
        কবিত্ব সেও অল্প না।
বিরহ যে বুকে ব্যথা দাগে
সাজিয়ে বলতে গেলে লাগে
        পনেরো আনাই কল্পনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পলাতকা (প্রহাসিনী)

সত্যের রসই হচ্ছে আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি

আমার চোখের বিজুলি-উজল আলোকে
হৃদয়ে তোমার ঝঞ্ঝার মেঘ ঝলকে,
        এ কি সত্য?..............
কালো কেশ পাশে দিবস লুকায় আঁধারে,
মরণবাঁধন মোর দুই ভুজে বাঁধা রে।.......
তোমার প্রণয় যুগে যুগে মোর লাগিয়া
জগতে জগতে ফিরিতেছিল কি জাগিয়া?
        এ কি সত্য?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রণয়প্রশ্ন (কল্পনা)

এমন একান্ত করে চাওয়া
                এও সত্য যত

এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মতো।
এ দুয়ের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোনো মিল ;
নহিলে নিখিল
এতবড়ো নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসি মুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম এতদিনে হয়ে যেত কালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা ১৯

সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভাষা ও ছন্দ

সত্য তার সীমা ভালোবাসে
সেথায় সে মেলে আসি সুন্দরের পাশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভাষা ও ছন্দ

স্বপ্ন কয়, তুমি বদ্ধ অনন্ত শৃঙ্খলে।
সত্য কয়, তাই মোরে সত্য সবে বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সত্যের সংযম (কণিকা)

তথ্যের সংকীর্ণতার থেকে মানুষ যেমনি সত্যের অসীমতায় প্রবেশ করে অমনি তার মূল্যের পরিবর্তন হয় সেকি আমরা দেখি নে। রাখাল যখন ব্রজের রাখাল হয়ে দেখা দেয় তখন কি মথুরার রাজপুত্র বলে তার মূল্য। তখন কি তার পাচনির মহিমা গদাচক্রের চেয়ে কম। তার বাঁশি কি পাঞ্চজন্যের কাছে লজ্জা পায়। সত্য যে সে কি মণিমালা ফেলে দিয়ে বনফুলের মালা পরতে কুণ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৃষ্টি (সাহিত্যের পথে)

সত্য কথাই কলির তপস্যা।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সত্যেতে থাকবে তবেই ঈশ্বর লাভ হবে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সত্য গোপন করা, আত্মবঞ্চনারই সমান।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : আমার কথা

সত্য পালনের দুঃখ আছে, তাকে আঘাতের মধ্য দিয়ে বরঞ্চ একদিন পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু প্রবঞ্চনা প্রতারণার মিষ্ট পথ দিয়ে সে কোনদিন আনাগোনা করে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : পথের দাবী-২

সত্য বাক্য অনেক ক্ষেত্রেই অপ্রিয় হয় কিন্তু তাই বলে অপ্রিয় বাক্য মাত্রই সত্য নয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : শেষ প্রশ্ন

সত্য বাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সত্য ও মিথ্যা

এ কথা মনে রাখতে হবে, সত্যনিষ্ঠাই শক্তি, সত্যনিষ্ঠাই সমস্ত মঙ্গলের আধার এবং ইংরাজীতে যাকে বলে tenacity of purpose সে-ও এই সত্যনিষ্ঠারই বিকাশ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সত্যাশ্রয়ী

মিথ্যাই বাঙ্ময়
সত্য চুপ করে থাকে
অধিকাংশ সময়।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ ছবির শব্দ-১৩

মিথ্যার বোঝা ঘাড়ে লইয়া সমাজ গড়া অসম্ভব। সত্যই জীবনের ভিত্তি, মানব হৃদয়ের সাহস। ধর্ম বল, কাব্য বল, সবই সত্যের উপর নির্ভর করে। মিথ্যার হাটে মূর্তি কেনা চলিতে পারে, কিন্তু দেবী পাওয়া যায় না।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার ঃ নাট্য-সাহিত্যের মর্মকথা

সত্যবাদী

শতকোটী জন্ম তপ করে যেই জন।
সত্যবাদী সম কিন্তু না হয় কখন॥

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ (অযোধ্যাকাণ্ড)

সত্যবাদী দুই জন
মূর্খ ও বালকগণ।

বাংলা প্রবাদ

সত্যবাদী হইতে হইলে অকপট হইতে হইবে—মন মুখ এক করিতে হইবে। অকপট লোক সংসারে অতি বিরল।.....সত্যবাদীর হৃদয় দিন দিন শতদলের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। তাহার মন মিথ্যা দুদিনের বস্তু পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ-উচ্চতর চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে থাকে। কথায় কার্যে চিন্তায় প্রতি নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে সে কেবল সত্যকেই অনুভব করিতে চায় এবং দিন দিন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর সত্যের রাজ্যে প্রবেশ করিয়া নব নব রহস্য অবগত হইতে থাকে। তাহার মুখে সত্যের বিমল জ্যোতি ফুটিয়া উঠে। তাহাকে যে দেখে সেই মুগ্ধ হয়—যে তাঁহার সঙ্গ করে সেই পবিত্র হইয়া যায়।

স্বামী দয়ানন্দ ঃ সত্যলাভ

সত্যযুগ

আমাদের........ধারণা.......বুঝি সেকালে কেবলমাত্র হরিনাম এবং আত্মারই আমদানি ছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে যে-সকল পীতবর্ণ জীর্ণ বৈষয়িক এবং রসনিমগ্ন পরিপক্ক ভোগী বৃদ্ধ দেখা যায়, তাহাতে বুঝা যায় সত্যযুগ আমাদের অব্যবহিত পূর্বেই ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আহার সম্বন্ধে চন্দ্রনাথবাবুর মত (সমাজ)

সত্যযুগে মানুষ বই পড়ে শিখত না, খবর শুনে জানত না, তাদের জানা ছিল হয়ে-উঠে জানা।......

বোধ হয় তোমার বিশ্বাস তুমি আমাকে জান?......

জান, কিন্তু সে জানায় সাড়ে-পনেরো আনাই বাদ পড়ে গেছে। ইচ্ছে করলেই তুমি যদি ভিতরে ভিতরে আমি হয়ে যেতে পারতে, তা হলেই তোমার জানাটা সম্পূর্ণ সত্য হত।.....

সত্যযুগে মানুষ দেখার জানা জানত না, ছোঁওয়ার জানা জানত না, জানত একেবারে হওয়ার জানা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—১৪

যে রশ্মি বেগ্‌নির সীমা পেরিয়ে গেছে তাকে দেখা যায় না বলেই সে মিথ্যে নয়, সেও আলো। ইতিহাসের সেই বেগ্‌নি-পেরোনো আলোতেই মানুষের সত্যযুগের সৃষ্টি। তাকে প্রাগৈতিহাসিক বলব না, সে আল্‌ট্রা-ঐতিহাসিক।......—আচ্ছা, সত্যযুগ কি কোনোদিন আসবে।—যতদিন না আসে ততদিন ছবি আছে, কবিতা আছে। আপনাকে ভুলে গিয়ে আর-কিছু হয়ে যাবার ঐ একটা বড়ো রাস্তা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—১৪

সনাতন

যা সনাতন তা যুগে যুগে নূতন।

অন্নদাশঙ্কর রায় : নূতন

অবিচলিত সনাতন প্রথার বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, মানুষ নহে। আরও বেশি বড়াই যদি কেহ করিতে পারে তবে সে ধুলামাটিপাথর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ধর্মের অধিকার (সঞ্চয়)

সনেট

ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।

প্রমথ চৌধুরী : সনেট

সনেট গীতি-কবিতারই একটি প্রকার ভেদ। সুতরাং গীতি-কবিতায় যেমন, সনেটেও তেমনি একটি অনুভূতি, একটি হৃদয়াবেগ অখণ্ডভাবে সমগ্রভাবে প্রকাশ পায়। একটি আবেগ বা কল্পনা চতুর্দশটি পংক্তির মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া উহাকে নিঃশেষ করিতে হইবে। আরম্ভ হইতে সমাপ্তি পর্যন্ত ভাবের একটা সংহতি, একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সমগ্রতা বজায় রাখিতে হইবে।

শশাঙ্কশেখর বাগচী : ভূমিকা (চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মধুসূদন দত্ত)

একটি তরঙ্গ যেমন স্ফীত হইয়া ক্রমশ উচ্চ হইয়া উঠিতে থাকে এবং তাহার পর একটা সীমা পর্যন্ত উঠিয়া একটু স্থির থাকিয়া আবার ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া যায়, সনেটের মধ্যে যে আবেগ অভিব্যক্তি লাভ করে তাহার আকৃতিও অনেকটা সেই তরঙ্গের মত। এই তরঙ্গ সুরের তরঙ্গ ("A Sonnet is a wave of melody")

শশাঙ্কশেখর বাগচী : ভূমিকা (চতুর্দশপদী কবিতাবলী—মধুসূদন দত্ত)

সনেট শব্দটি ইটালীয়ান সনেটো (মৃদুধ্বনি) শব্দ হইতে উদ্ভূত। ইহা এক প্রকার মন্ময় কবিতা। একটি মাত্র অখণ্ড ভাবকল্পনা বা অনুভূতি কণা যখন ১৪ অক্ষর সমন্বিত (কখনো কখনো ১৮ অক্ষরও ব্যবহৃত হয়) চতুর্দশ পংক্তিতে একটি বিশেষ ছন্দোরীতিতে আত্মপ্রকাশ করে, তখন আমরা উহাকে সনেট নামে অভিহিত করি।

শ্রীশচন্দ্র দাশ : সাহিত্য-সন্দর্শন

সন্তান

সন্তানের ওপর যে টান সেটা স্বামী কিংবা প্রেমিকের টানের চেয়েও অনেক বেশি।

নীললোহিত : কৈশোর

আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে।

ভারতচন্দ্র রায় : অন্নদামঙ্গল

নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার,
সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্নেহগ্রাস (চৈতালি)

সন্ধান

তুমি কাহার সন্ধানে
সকল সুখে আগুন জ্বেলে বেড়াও কে জানে!
এমন ব্যাকুল করে
কে তোমার কাঁদায় যারে ভালোবাস॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (কোন আলোতে—গীতাঞ্জলি)

কাছে আছে দেখিতে না পাও।
তুমি কাহার সন্ধানে দূরে যাও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মায়ার খেলা—২য় দৃঃ

সন্ধ্যা

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা সোনার আঁচল খসা,
হাতে দীপশিখা,
দিনের কল্লোল'পর টানি দিল ঝিল্লিস্বর
ঘন যবনিকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অশেষ (কল্পনা)

ঐ-যে সন্ধ্যা খুলিয়া ফেলিল তার
সোনার অলংকার।
ঐ সে আকাশে লুটায়ে আকুল চুল
অঞ্জলি ভরি ধরিল তারার ফুল,
পূজায় তাহার ভরিল অন্ধকার।
.....ঐ-যে নয়ন অবগুণ্ঠনতলে
ভাসিল শিশিরজলে।
ঐ-যে তাহার বিপুল রূপের ধন,
অরূপ আঁধারে করিল সমর্পণ,
চরম নমস্কার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—৬১

মুদিত আলোর কমল-কলিকাটিরে
রেখেছে সন্ধ্যা আঁধার-পর্ণপুটে।
উতরিবে যবে নব-প্রভাতের তীরে
তরুণ কমল আপনি উঠিবে ফুটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতালি—১০৭

কেবল নীল আকাশ এবং ধূসর পৃথিবী—আর তারই মাঝখানে একটি সঙ্গীহীন গৃহহীন অসীম সন্ধ্যা, মনে হয় যেন একটি সোনার চেলি-পরা বধূ অনন্ত প্রান্তরের মধ্যে মাথায় একটুখানি ঘোমটা টেনে একলা চলেছে; ধীরে ধীরে কত শত সহস্র গ্রাম নদী প্রান্তর পর্বত নগর বনের উপর দিয়ে যুগযুগান্তরকাল সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলকে একাকিনী ম্লাননেত্রে মৌনমুখে শ্রান্ত পদে প্রদক্ষিণ করে আসছে। তার বর যদি কোথাও নেই তবে তাকে এমন সোনার বিবাহবেশে কে সাজিয়ে দিলে! কোন্ অন্তহীন পশ্চিমের দিকে তাঁর পতিগৃহ!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছিন্নপত্র ৬.১২.১৮৯৫

রবি অস্ত যায়।
অরণ্যেতে অন্ধকার আকাশেতে আলো।
সন্ধ্যা নত-আঁখি
ধীরে আসে দিবার পশ্চাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিষ্ফল কামনা (মানসী)

সন্ধ্যা হয়ে আসে,
শান্তির ইঙ্গিত নামে দিবসের প্রগল্‌ভ প্রকাশে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্রপুট—১৮

সংসারে সেরা লোকেরাই কুঁড়ে এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ের সম্মিলন হলেই মণিকাঞ্চনযোগ। এই কুঁড়ে-বেকারের মিলনের জন্যেই তো সন্ধ্যেবেলাটার সৃষ্টি হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকালবেলা, রোগীদের জন্যে রাত্রি, কাজের লোকের জন্যে দশটা-চারটে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রজাপতির নির্বন্ধ—৯

জীবনের শেষপাত্র উচ্ছলিয়া দাও পূর্ণ করি,
দিনান্তের সর্বদানযজ্ঞে যথা মেঘের অঞ্জলি
পূর্ণ করি দেয় সন্ধ্যা, দান করি চরম আলোর
অজস্র ঐশ্বর্যরাশি সমুজ্জ্বল সহস্ররশ্মির—
সর্বহর আঁধারের দস্যুবৃত্তি ঘোষণার আগে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রান্তিক—৬

ঐ-যে মরি মরি
তরঙ্গহীন স্রোতের 'পরে ভাসিয়ে দিল তারার ছায়াতরী ;
ঐ-যে সে তার সোনার চেলি
দিল মেলি
রাতের আঙিনায়,
ঘুমে অলস কায় ;
ঐ-যে শেষে সপ্তঋষির ছায়াপথে
কালো ঘোড়ার রথে
উড়িয়ে দিয়ে আগুন-ধূলি নিল সে বিদায় ;
.......এমন সন্ধ্যা হয়নি কোনোকালে
আর হবে না কভু।
এমনি করেই, প্রভু,
এক নিমেষের পত্রপুটে ভরি
চিরকালের ধনটি তোমার ক্ষণকালে লও যে নূতন করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—৩২

সন্ধ্যারাগে-ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল, যেন খাপে-ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার!
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে

দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি—
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বলাকা—৩৬

সেই সেকালের সন্ধ্যা মোদের সন্ধ্যা ছিল সত্যি,
দিন-ভ্যাঙানো ইলেকট্রিকের হয়নিকো উৎপত্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যোগীনদা (ছড়ার ছবি)

দিবসের অপরাধ সন্ধ্যা যদি ক্ষমা করে তবে
তাহে তার শান্তিলাভ হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

রূপকথা-শোনা নিভৃত সন্ধেবেলাগুলো
সংসার থেকে গেল চলে,
আমাদের স্মৃতি
আর নিবে-যাওয়া-তেলের প্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক—বত্রিশ

দিবা হল সমাপন,
সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী। তিমিরের তীরে
অসংখ্য-প্রদীপ-জ্বালা এ বিশ্বমন্দিরে
এল আরতির বেলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সন্ধ্যা (চিত্রা)

সন্ধ্যা যায়, সন্ধ্যা ফিরে চায়, শিথিল কবরী পড়ে খুলে—
......নীরবে-বিদায়-চাওয়া চোখে, গ্রন্থি-বাঁধা রক্তিম দুকূলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সন্ধ্যার বিদায় (কড়ি ও কোমল)

রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো।
এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো॥

রামপ্রসাদ সেন : শাক্ত পদাবলী

ওহে (হরি), দিন ত গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকছি হে, তোমারে॥
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম বসে
(ওহে, আমায় কি পার করবে না হে, আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে॥

হরিনাথ মজুমদার : (কাঙাল ফিকিরচাঁদ) : গান

সন্ধ্যাতারা

ঘোম্‌টা-পরা কাদের ঘরের বউ তুমি ভাই সন্ধ্যাতারা?
তোমার চোখের দৃষ্টি জাগে হারানো কোন মুখের পারা॥

কাজী নজরুল ইসলাম : সন্ধ্যাতারা

সন্ধ্যাতারা। অমন শান্তিতে ভরা, পান্নার মত সবুজ, কান্নার মত টলটলে তারা বুঝি আর নেই। দপ-দপ করে জ্বলবে। নিঃশব্দে কত কি কথা বলবে হাওয়ার সঙ্গে, বনের সঙ্গে।

বুদ্ধদেব গুহ : কোয়েলের কাছে

মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে ;
সন্ধ্যাতারা তাকায় তারি আলো দেখবে ব'লে ॥......
নামল সন্ধ্যাতারার বাণী আকাশ হতে আশিস আনি,
অমরশিখা আকুল হল মর্তশিখায় উঠতে জ্ব'লে ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিবীথিকা

সন্ধ্যাতারা দিগন্তের কোণে
শিরীষ পাতার ফাঁকে কান পেতে শোনে
যেন কার পদধ্বনি দক্ষিণ-বাতাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চাবি (পূরবী)

সন্ধ্যাদীপ

আমি সন্ধ্যাদীপের শিখা,
অন্ধকারের ললাট-মাঝে পরানু রাজটিকা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতমালিকা ১

সন্ধ্যাদীপ মনে দেয় আনি
পথচাওয়া নয়নের বাণী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্ফুলিঙ্গ—২৩৪

সন্ন্যাসী

যদি সন্ন্যাস জীবনে কোন শক্তি বা জ্ঞানের সঞ্চয় হয়েই থাকে, জগতের হিত-কাজে সেটা লাগানো—সে তো কর্তব্য, তাঁরই কাজ। এতে ধর্ম-জীবনের ব্যাঘাত হবার কোনো আশঙ্কা নেই। তবে, এ-কথাও ঠিক—লোকপ্রতিষ্ঠার মোহ সাধুদের জীবনেও একটা বড় অন্তরায়। অনেকেরই এতে পতন হয়। একে বলে রুদ্রগ্রন্থি—লোকৈষণা—এ ছেদ করা খুবই কঠিন।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় : হিমালয়ের পথে পথে

'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' সন্ন্যাসীর জন্ম। সন্ন্যাস গ্রহণ করে যারা এই ideal (উচ্চ লক্ষ্য) ভুলে যায়—'বৃথৈব তস্য জীবনং'. পরের জন্য প্রাণ দিতে—জীবের গগনভেদী ক্রন্দন নিবারণ করতে, বিধবার অশ্রু মোছাতে, পুত্র-বিয়োগ-বিধবার প্রাণে শান্তিদান করতে, অজ্ঞ ইতর সাধারণকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী করতে, শাস্ত্রোপদেশ বিস্তারের দ্বারা সকলের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গল করতে এবং জ্ঞানালোক দিয়ে সকলের মধ্যে প্রসুপ্ত ব্রহ্মসিংহকে জাগরিত করতে সন্ন্যাসীর জন্ম হয়েছে।

স্বামী বিবেকানন্দ : স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী

সন্ন্যাসী কামিনী-কাঞ্চন দুই-ই ত্যাগ করবে—যেমন মেয়ের পট পর্যন্ত দেখবে না। তেমনি কাঞ্চন-টাকা—স্পর্শ করবে না। টাকা কাছে থাকলেও খারাপ! হিসাব, দুশ্চিন্তা টাকার অহংকার, লোকের উপর ক্রোধ, কাছে থাকলে এই সব এসে পড়ে।—সূর্য দেখা যাচ্ছিল মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সবুজ

সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ-ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুল-মালাগাছা।
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সবুজের অভিযান (বলাকা)

নীল! নীল!
সবুজের ছোঁয়া কি না, তা বুঝি না,
ফিকে গাঢ় হ্‌রেক রকম
কম-বেশী নীল!
তার মাঝে শূন্যের আনমনা হাসির সামিল
কটা গাঙ চিল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : সাগর থেকে ফেরা (সাগর থেকে ফেরা)

পৃথিবী ঘুরপাক খায়
আগুনে আগুনে
সবুজের রস রঙ গন্ধ
বিবর্ণ পাথর হয়ে যায়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : সবুজ (দিন যায় রাত যায়)

সভ্য

সব সভ্যদেশে অর্থ ও আতঙ্ক পাল্লা দিয়ে বাড়ে।

অদীপ ঘোষ : সেই নদী (অলৌকিক চুম্বকের টান)

ক্ষুধাতুর আর ভূরিভোজীদের
ব্যাপ্ত হয়েছে পাপের দুর্দহন,
সভ্যনামিক পাতালে যেথায়
জমেছে লুটের ধন।....
  নিরর্থ হাহাকারে
দিয়ো না দিয়ো না অভিশাপ বিধাতারে।
  পাপের এ সঞ্চয়
সর্বনাশের পাগলের হাতে
  আগে হয়ে যাক ক্ষয়।
বিষম দুঃখে ব্রণের পিণ্ড
  বিদীর্ণ হয়ে, তার
কলুষপুঞ্জ ক'রে দিক্ উদগার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : প্রায়শ্চিত্ত (নবজাতক)

সভ্যতা

এই যে খুনে সভ্যতা
অনেক জনের অন্ন মেরে কয়েক জনের ভব্যতা,
এগোয় নাকো পেছোয় নাকো অচল গতি ত্রিশঙ্কুর—।

দিনেশ দাস : ডাস্টবিনে (ভুখ-মিছিল)

ধার করা সভ্যতা রক্ষা করতে শুধু ধার বাড়ে।

প্রমথ চৌধুরী : তেল নুন লকড়ি

ভালবাসা, বন্ধুত্ব, পবিত্রতা.......মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এই কথাগুলো এক একটি সম্পদ।

বিমল কর : শূন্য

মদমাংস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? একেই কি বলে সভ্যতা?

মধুসূদন দত্ত : একেই কি বলে সভ্যতা?

সভ্যতা কারে বলে ভেবেছিনু জানি তা—
আজ দেখি কী অশুচি, কী যে অপমানিতা।
মানুষের সাজে কে যে সাজিয়েছে অসুরে
আজ দেখি 'পশু' বলা গাল দেওয়া পশুরে।
মানুষকে ভুল করে গড়েছেন বিধাতা।
কত মারে এত বাঁকা হতে পারে সিধা তা।
দয়া কি হয়েছে তাঁর হতাশের রোদনে,
তাই গিয়েছেন লেগে ভ্রমসংশোধনে।
আজ তিনি নবরূপী দানবের বংশে
মানুষ লাগিয়েছেন মানুষের ধ্বংসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধ্বংস (গল্পসল্প)

বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আত্মশক্তি। ভারতবর্ষীয় সমাজ

বিলাতি সভ্যতা......অনেকটা ইস্কুলের জিনিস, পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর।......প্রাচ্য সভ্যতা ধর্মগত, তাহার পথ নিশ্চিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, তাহা ইস্কুলের পড়া নহে—তাহা জীবনের সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আত্মশক্তি। য়ুনিভার্সিটি বিল

পশ্চিমে হেনকালে পথে কাঁটা বিছিয়ে
সভ্যতা দেখা দিল দাঁত তার খিঁচিয়ে।
.....কলবল সম্বল সিভিলাইজেশনের,
তার সবচেয়ে কাজ মানুষকে পেষণের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গল্পসল্প—ধ্বংস

আগুনে কেবল ইন্ধন চাপানোই তো লক্ষ্য নহে, রন্ধনেই তাহার সার্থকতা।......সভ্যতাকে progress বলিয়া থাক, প্রোগ্রেস শব্দের অর্থই দাঁড়াইয়াছে যে, কেবলই পথে চলা, কোথাও ঘরে না পৌঁছানো। এইজন্য জীবনকে না-শেষের মধ্যে হঠাৎ শেষ করা, না-থামার মধ্যে হঠাৎ থামিয়া যাওয়া য়ুরোপের জীবনযাত্রা। Not the game but the chase—শিকার পাওয়া নহে, শিকারের পশ্চাতে অনুধাবন করাই য়ুরোপের কাছে আনন্দের সারভাগ বলিয়া গণ্য হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধর্ম—ততঃ কিম্

......হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৈবেদ্য—৬৪

এখনকার এই পরম সুন্দর অভ্রভেদী সভ্যতা দেখে মনে হয়, এও উপরে পাষাণ নিচে পাষাণ এবং মাঝখানে মানব-জীবন দিয়ে গঠিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য (সমাজ)

হিন্দু সভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা (ভারতবর্ষ)

য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক ; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহা মিলনমূলক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভারতবর্ষের ইতিহাস (ভারতবর্ষ)

মদ্য মাংস ও মুখরতাই সভ্যতার মুখ্য উপকরণ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলা জাতীয় সাহিত্য

এখনকার সভ্যতাটা দুঃশাসনের মতো হৃদয়ের বস্ত্রহরণ করতে চায়। অনুভব করবার পূর্বেই সেয়ানা করে তোলে চোখে আঙুল দিয়ে। গন্ধের ইশারা ওর পক্ষে বেশি সূক্ষ্ম, খবর নেয় পাপড়ি ছিঁড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মালঞ্চ—৪

চিরকালই মানুষের সভ্যতায় একদল অখ্যাত লোক থাকে, তাদের সংখ্যাই বেশি, তারাই বাহন ; তাদের মানুষ হবার সময় নেই ; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সব চেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে ; সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান।......তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাশিয়ার চিঠি—১

বর্তমান সভ্যতাকে.......অপটু দৈত্যের সাঁতার দেওয়ার মতো, তার হাত-পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে ; সে জানেও না এত বেশি হাঁসফাঁস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুশকিল এই যে দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত-পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিক্ষার বাহন (পরিচয়)

আজ
সভ্যতার কোনও শব্দ নেই, কোনও আলো নেই।
কোনও তাপ নেই
তবু সারাটা দিন পথের জন্যই বসে থাকা
হাঁ-করে সারাটা দিনমান!—!

শৈলেন্দ্রনাথ বসু ঃ পথের জন্যই বসে থাকা (জেব্রা ক্রসিং)

সভ্যতার ইতিহাসে সত্য ও বিশ্বাসের বিনাশ নেই।

সুদীন চট্টোপাধ্যায় ঃ জীবন নব নব

সময়

সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সময় নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবনের পরমায়ুর ন্যায়, কারুরই অপেক্ষা করে না।

কালীপ্রসন্ন সিংহ ঃ হুতোম প্যাঁচার নক্সা

যে সময় একবার চলিয়া যায় তাহা আর ফিরিয়া আসে না। সুতরাং, প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। যে সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে জানে তাহার কখনও কোন কাজে সময়ের অভাব হয় না। প্রতিটি মুহূর্তের যদি সদ্ব্যবহার করিতে পার, তবে দেখিবে, কত অল্প সময়ের মধ্যে কত বেশি উন্নতি হইয়াছে।

শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ ঃ শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ উপদেশ

সময় স্বয়ংক্রিয়-ঘড়ি অলৌকিক
যাকে কেউ বানায় নি।

জগন্নাথ চক্রবর্তী ঃ অলৌকিক ঘড়ি

সময় তো মানুষ নয় যে হার মেনে আক্রোশ পুষে রাখবে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ প্রতিধ্বনি ফেরে

সময়ের থলি শতচ্ছিদ্র, বিস্মৃতিকীট কাটে।

বিষ্ণু দে ঃ ক্রেসিডা

সময় আর নদী কখনো এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে না।—অবিরাম এগিয়ে চলাই তাদের চারিত্র।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ঃ কস্তুরীবাঈ ও কুমারটুলির মিত্রতা

কেউ বলে সময় বয়ে যাচ্ছে, কেউ বলে সময় হয়নি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ডাকঘর—২

সময়ের সমুদ্রে আছি, কিন্তু এক মুহূর্ত সময় নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাভা-যাত্রীর পত্র—২১

কেউ বলছেন সময় বুঝে কাজ, কেউ বলছেন কাজ বুঝে সময়। মাঝের থেকে সময় যাচ্ছে চলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তপতী-৩

সময়টা যে আপেক্ষিক, রসের ভাষায় সে কথা অনেকদিন থেকে বলা চলছে, বিজ্ঞানের ভাষায় আজ বলা হল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—৯.২.১৯২৫

সময়টা যে বড়ো সংকটের,.......
সেই জন্যেই এই তো উপযুক্ত সময়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মুক্তধারা

সবাই বলে, "সময়ের মূল্য আছে।" কেউ বলে না, "সময় অমূল্য"। "আর তো পারা যায় না" বলে সবাই আক্ষেপ করে, আর ভারি খুশি হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ভুল স্বর্গ (লিপিকা)

সময় অল্প। মরুপথে সঙ্গে আছে আধ-মশক মাত্র জল। যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান্তই করা চাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৬

সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্কচুয়াল হওয়া শোভা পায়। দেবতার হাতে সময় অসীম, তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে, ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্কচুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—৬

ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয়, ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কি করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১৫

এই একটা মুহূর্তের কথা যদি ধরি—এইমাত্র কত লক্ষ লক্ষ জন্ম ঘটল, মৃত্যু ঘটল। কাদের মধ্যে ভালবাসা জাগল, কাদের ভালবাসার বাতিগুলো গেল নিভে। হয়তো এই মুহূর্তেই কে কোথায় কার গলাটা পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে কাটছে—হয়তো ঠিক এখনই কার সময় হয়েছে বলার—তোমাকে ভালবাসি! আশ্চর্য, অদ্ভুত, বিচিত্র। এক-একটা মুহূর্তের মধ্যে লক্ষ লক্ষ ঘটনা—লক্ষ ভাবনার মালা গাঁথা। এই গভীর রহস্য আর সম্ভাবনা আর সত্য আর বাস্তবতা আর মায়া নিয়ে যার অস্তিত্ব—তার নাম সময়। সে একটি গতি। তবে বের্গর্স থাক—আইনস্টাইন বলেছেন—সময় চিরবর্তমান।

ছিল—আছে—থাকবে বলে আপেক্ষিক হিসেব মানুষের কাছে দরকারী—তার জীবনের জন্যে বা স্মৃতির জন্যে জরুরী ; কিন্তু আসলে—সবই 'আছে।' কল্পনা করা যেতে পারে একই সময়রেখায় দাঁড়িয়ে আদিম মানুষ আর আজকের সভ্য মানুষ ঘর-গেরস্থালী করছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ নিষিদ্ধ প্রান্তর

একালের বিজ্ঞানী বলছেন—সময়ের বাস্তব অস্তিত্ব আছে। আছে বইকি। অনুভূতি দিয়ে তাকে পাওয়া যায়। এদিক থেকে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের অনেক সিদ্ধান্তে চমকে যেতে হয়! কোটি-কল্প-কল্পান্ত যুগের কথাও ঋষিরা ভেবেছিলেন! সময়ের ওই বিশালতাময় ব্যাপ্তির ধারণা তো মানুষের চেতনাতেই বাস্তব ব্যবহার ব্যতিরেকে ধরা পড়েছিল! হ্যাঁ, অনুভূতির জানালা দিয়েও সত্যের আলো এসে পৌঁছতে পারে। প্রাচীন হিন্দুরা এ ব্যাপারে অসম্ভব বুদ্ধিমান।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ নিষিদ্ধ প্রান্তর

সমাজ

এমন একটি সমাজ আমার
অন্ধকারই চরিত্র যার।

মল্লিকা সেনগুপ্ত ঃ বিষ

সমাজকে আঘাত করা এবং সমাজের অবিচারকে আঘাত করা এক জিনিষ নয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পল্লীসমাজ

সমাজের অবিচার অত্যাচারের যে কেহ প্রথমে প্রতিবাদ করে, তাহাকেই দুঃখ পাইতে হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পত্র সঙ্কলন—হরিদাস শাস্ত্রীকে

যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাঙায় আর গলা চেপে ধরে, সে সমাজ আমার নয়, আমার মত গরীবেরও নয়, এ সমাজ বড়লোকের জন্যে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পরিণীতা

যা আর্তকে রক্ষা করে না, দুঃখীকে শুধু দুঃখের পথেই ঠেলে দেয়, তাকেই সমাজ বলে কল্পনা করার মহাপাপ আমাদের নিয়ত রসাতলের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ রমা ২।৬

যে সব নীতি হবে আমাদের সমাজ জীবনের ভিত্তি তা হল ন্যায়, সাম্য, স্বাধীনতা, শৃঙ্খলা ও প্রেম।

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ ভারতে সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্র

সমাজতন্ত্র যে টিকে থাকতে পারল না তার.....কারণ কেউ পরিবর্তিত বিশ্বকে বোঝার চেষ্টা করেনি।....ক্রমবিকশিত বিশ্ব আর ক্রমসংকুচিত মানবসত্তা হল আজকের দিনের বেসিক কনট্রাডিকশান। ব্যাপ্ত বিশ্ব, বদ্ধ মানুষ।

রাম বসু ঃ সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ও মার্কসবাদ

সমাজতন্ত্রের মানুষ ও রাষ্ট্র যখন আদিমতার স্তরে আছে, আরও উন্নত জীবনযাত্রার জন্য আরও উন্নত প্রয়োগবিদ্যা যন্ত্রপাতি দিয়ে আরও উৎপাদন এবং আরও অভাববোধ—এই পাপচক্র মানুষকে যেখানে নিয়ে যেতে পারতো—সেখানেই নিয়ে

গেছে। গ্রীড হয়েছে ক্রীড। গ্রীডকে কনজিউমারইজমে আনার জন্য ক্রীড হয়েছে নীড। অশ্রুপাতের কোন কারণ নেই।

রাম বসু ঃ সাম্প্রতিক অস্তিত্ব ও মার্কসবাদ

দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও ব্যাধি দূর করা সম্পর্কে, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত উৎপাদন ও বণ্টন সম্পর্কে আমাদের প্রধান প্রধান সমস্যাগুলিকে সমাজতান্ত্রিক উপায়েই যে কার্যত সমাধান করা যেতে পারে এবিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই।

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ নেতাজীর বাণী

সমালোচক/সমালোচনা

সমালোচনার কবিত্ব কাব্যের রস মনে সঞ্চার করতে পারে যদি সমালোচক হন একাধারে সমালোচক ও কবি। এ যোগ দুর্লভ।

অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ কাব্যজিজ্ঞাসা (রস)

প্রত্যেক সৎ কবিই তার নিজের কাব্যের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমালোচক ; সেই হিসেবে নিজের কাব্য বিশ্লেষণ করে এদের প্রত্যেকেরই দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা দরকার।

জীবনানন্দ দাশ ঃ সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লেখা পত্র (কবিতাসমগ্র)

সমালোচকসমাজে সাধারণত রক্ষণশীলতা বিদ্যমান। তার কারণ আছে। তাঁদের অধিকাংশই থাকেন কেতাবী বিদ্যার ওপর নির্ভরশীল। চলমান জীবন ও চিন্তার সঙ্গে অনেকেরই সম্পর্ক থাকে না। অধীত তত্ত্বজ্ঞানই তাঁদের প্রধান সম্বল। তার বাইরে কিছু দেখলেই তাঁরা তা অগ্রাহ্য করতে চান।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সর্বহারার মানবতা

সাধারণ রসবোধ ও সমালোচনা এক বস্তু নয়। রসবোধে বিচার গৌণ, আর সমালোচনায় বিচার মুখ্য। কিন্তু সমালোচককেও রসিক হতে হবে। সুতরাং সাধারণ রসবেত্তার চেয়ে সমালোচকের দায়িত্ব অধিক। রসিক রূপে তিনি লিপ্ত, আবার বিচারক রূপে তিনি নির্লিপ্ত। মনের এই দ্বৈতাবস্থা যুগপৎ ক্রিয়া করে সমালোচকের মধ্যে। এই দুই ভাবের সমন্বয় সাধন করাই সমালোচকের দায়িত্ব। তার অভাব ঘটলেই সমালোচনা ভারসাম্য হারায়।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ সর্বহারার মানবতা

কাঁচা আমের রসটা অম্লরস, কাঁচা সমালোচনাও গালিগালাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি—ভারতী

আগুন যে পোড়ায় তাহা ভালো করিয়া বুঝিবার জন্য কোনো সমালোচকের সাহায্য আবশ্যক করে না, তাহা নিজের বাম হস্তের কড়ে আঙুলের ডগার দ্বারাও বোঝা যায়, ভালো কবিতার ভালোত্ব যদি তেমনি অবহেলে না বুঝিতে পারি তবে আমি তাহার সমালোচনা পড়া আবশ্যক বোধ করি না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাঞ্জলতা (পঞ্চভূত)

রস জিনিষটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবলমাত্র নিজের জোরে নিজেকে সে সপ্রমাণ করিতে পারে না।.....সমালোচক বুক ফুলাইয়া তাল ঠুকিয়া বলেন, 'আমিই সেই রসিক'। প্রতিবাদ করিতে সাহস হয় না, কিন্তু অরসিক আপনাকে অরসিক বলিয়া জানিয়াছে সংসারে এই অভিজ্ঞতাটা দেখা যায় না।.....মূলধন না থাকিলেও দলাদলির কাজে নামিতে কাহারও বাধে না, তেমনি সাহিত্য সমালোচনার কোনোপ্রকার পুঁজির জন্য কেহ সবুর করে না। কেন না সমালোচকের পদটা সম্পূর্ণ নিরাপদ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাস্তব (সাহিত্যের পথে)

সমালোচকের প্রধান কর্তব্য কবির কাব্য সৌন্দর্য বিশ্লেষণ ও পাঠকের মনে সৌন্দর্যানুভূতির সঞ্চার।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা

সাহিত্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারমূলক সম্যক আলোচনাকে সাধারণভাবে 'সমালোচনা' নামে অভিহিত করা হয়। সম্যক আলোচনা বলিতে সাহিত্যের ভাব, বস্তু, রীতি, অলঙ্কার ও স্রষ্টার বিশিষ্ট মানস-দৃষ্টি প্রভৃতির সামগ্রিক আলোচনাকেই বুঝায়।......সহৃদয়তা, রসবোধ ও উদারতা সমালোচকের প্রধান গুণ।.....এতদ্ব্যতীত সমালোচককে শিক্ষিত, সংস্কৃতিমান ও সাহিত্যবোধসম্পন্ন হইতে হইবে।

শ্রীশচন্দ্র দাস : সাহিত্য-সন্দর্শন

প্রকৃত সমালোচনাকে সাহিত্যই বলা উচিত কারণ সেক্ষেত্রে সমালোচক তাঁর গৃহীত সাহিত্যসৃষ্টির এমন কিছু সৌন্দর্য আবিষ্কার করেন এবং পাঠককে তা দেখান যেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ পাঠক কখনই অবহিত থাকে না। সমালোচক Middleton Murray সমালোচনা সম্বন্ধে বলেছেন—........A good criticism is as much a work of art as a good poem.

হীরেন চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্য প্রকরণ

সমুদ্র

শুধু কি রাতের শব্দ?
আমি নিশ্চিত জানি ভোরবেলার যাত্রার আয়োজন
আমার শেষ সমুদ্রে।

অরুণ মিত্র : শুধু রাতের শব্দ নয়

চারদিককার অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠলো যেন ;
পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,
যেখানেই যাই আমি সেইসব সমুদ্রের উল্কায় উল্কায়
কেমন স্বাভাবিক, কী স্বাভাবিক!

জীবনানন্দ দাশ : আদিম দেবতারা (মহাপৃথিবী)

তোমার গান করেছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, সাদা রৌদ্র সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে, আবার তোমার গান
শৈলের গহ্বর থেকে অন্ধকার তরঙ্গেরে করিছে আহ্বান।

জীবনানন্দ দাশ : সিন্ধুসারস (মহাপৃথিবী)

অসহায় অনাবৃত সমুদ্র ফুলে ফেনিয়ে ফেনিয়ে সাদা হয়ে উঠছে।.....মনে হয় কী এক প্রকাণ্ড অন্ধ শক্তি বাঁধা পড়ে আস্ফালন করছে—আমরা নিশ্চিন্ত মনে তীরে দাঁড়িয়ে আছি—সমুদ্রের বিস্ফারিত গ্রাসের মুখেই আমরা ঘরবাড়ি বেঁধে বসে আছি। আমরা যেন সিংহের কেশর ধরে টানছি, অথচ অসহায় সিংহ কিছু বলতে পারছে না—একবার যদি সমস্ত সমুদ্র ছাড়া পায় তা হলে আমাদের আর চিহ্নমাত্র থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছিন্নপত্রাবলী—পরিশিষ্ট

যে জল মানুষের বন্ধু সেই জল ডাঙ্গার মাঝখান দিয়াই বহে। সেই নদীগুলি ডাঙ্গার ভগিনীদের মতো। তাহারা কত দূরের পাথর-বাঁধা ঘাট হইতে কাঁখে করিয়া জল

লইয়া আসে ; তাহারাই আমাদের তৃষ্ণা দুর করে, আমাদের অন্নের আয়োজন করিয়া দেয়। কিন্তু, আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের এ কী বিষম বিরোধ। তাহার অগাধ জলরাশি সাহারার মরুভূমির মতোই পিপাসায় পরিপূর্ণ।......সে যমরাজের নীল মহিষটার মতো কেবলই শিঙ তুলিয়া মাথা ঝাঁকাইতেছে, কিন্তু কিছুতেই মানুষকে পিছু হটাইতে পারিল না।......বিঘ্নের কাছে যে মাথা হেঁট করিয়াছে, ভয়ের কাছে যে পাশ কাটাইয়া চলিয়াছে, লক্ষ্মীকে সে পাইল না। এইজন্য আমাদের পুরাণকথায় আছে, চঞ্চলা লক্ষ্মী চঞ্চল সমুদ্র হইতে উঠিয়াছেন, তিনি আমাদের স্থির মাটিতে জন্মগ্রহণ করেন নাই। বীরকে তিনি আশ্রয় করিবেন, লক্ষ্মীর এই পণ। এইজন্যই মানুষের সামনে তিনি প্রকাণ্ড এই ভয়ের তরঙ্গ বিস্তার করিয়াছেন।.....যাহারা কূলে বসিয়া কলশব্দে ঘুমাইয়া পড়িল, হাল ধরিল না, পাল মেলিল না, পাড়ি দিল না, তাহারা পৃথিবীর ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জলস্থল (পথের সঞ্চয়)

সমুদ্রের অপ্সরনৃত্য ও মুক্ত ছন্দের নাচ। তার মৃদঙ্গে যে বোল বাজছে তার ছন্দ এমন বিপুল যে, তার লয় খুঁজে পাওয়া যায় না। তাতে নৃত্যের উল্লাস আছে, অথচ নৃত্যের নিয়ম নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপানযাত্রী—৬

তীরে দাঁড়িয়ে মানুষ সামনে দেখলে সমুদ্র। এত বড়ো বাধা কল্পনা করাই যায় না। চোখে দেখতে পায় না এর পার, তলিয়ে পায় না এর তল। যমের মোষের মতো কালো, দিগন্তপ্রসারিত একটা বিরাট নিষেধ কেবলই তরঙ্গ তর্জনী তুলছে। চিরবিদ্রোহী মানুষ বললে, 'নিষেধ মানব না।' বজ্রগর্জনে জবাব এল 'না মান তো মরবে', মানুষ তার এতটুকুমাত্র বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ তুলে বললে, 'মরি তো মরব।'......সাড়ে তিন হাত মানুষ স্পর্ধা করে বললে, 'এই সমুদ্রের পিঠে চড়ব।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাভা-যাত্রীর পত্র—৩

ঢেউয়ের সমুদ্র বাহিরতলের সমুদ্র ; ভিতরতলে যেখানে পৃথিবীর গভীর গর্ভশয্যা ঢেউ সেখানকার কথা গোলমাল করে ভুলিয়ে দেয়। ঢেউ যখন থামে তখন সমুদ্র আপন গোচরের সঙ্গে অগোচরের, গভীরতলের সঙ্গে উপরিতলের অখণ্ড ঐক্যে স্তব্ধ হয়ে বিরাজ করে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাণমন (লিপিকা)

সমুদ্র তো কাহারও তৈরী নহে, ইহাকে তো বেড়িয়া রাখিবার জো নাই। এইজন্য সমুদ্রের ধারে বোম্বাই শহরের এমন নিত্যোৎসব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বোম্বাই শহর (পথের সঞ্চয়)

সমুদ্রের বিশেষ মহিমা এই যে, মানুষের কাজ সে করিয়া দেয় কিন্তু দাসত্বের চিহ্ন সে গলায় পরে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বোম্বাই শহর (পথের সঞ্চয়)

অসীম সমুদ্র, স্বপ্নের-ঢেউ-তোলা নীল ঘুমের মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজপুত্তুর (লিপিকা)

সমুদ্র দেখেছি.....। এত ঢেউ জীবনের দিগ্বিদিকহীন পথের দু-পাশে পড়ে আছে।

সৌমিত্র বসু ঃ শ্রাবণকথা

সম্পত্তি/সম্পদ

মাটির বুকে যে ফসল উৎপন্ন হয় সে ফসল খেয়ে মানুষ বাঁচে, সকল প্রাণী বাঁচে।

এ মাটি কিছুতেই কেবলমাত্র সমাজের কতিপয় লোকের সম্পত্তি হয়ে থাকতে পারে না। যে মাটির ফসলে দেশের প্রত্যেক লোকের প্রয়োজন আছে, সে মাটি দেশের প্রত্যেক লোকেরই সম্পত্তি হবে। অর্থাৎ ভূমিকে দেশের জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে, এখনকার মত ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। যে কৃষক এ ভূমি থেকে ফসল উৎপাদন করবে একমাত্র তারি সাথে থাকবে ভূমির সাক্ষাৎ সম্বন্ধ।

মুজফফর আহমদ ঃ ভবিষ্য ভারত

এই আমার ভাঙা বোক্‌নো, থেলো হুঁকো আর এই বেড়াল ছানাটি। এর মধ্যে ও-দুটো পৈত্রিক সম্পত্তি, বেড়ালছানা আমার স্বোপার্জিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ একান্নবর্তী (হাস্যকৌতুক)

সম্পদ

ঘর অত্যাবশ্যক, বাগান অতিরিক্ত, না হইলেও চলে। সম্পদের উদারতা অনাবশ্যকেই আপনাকে সপ্রমাণ করে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** ঃ পনেরো-আনা (বিচিত্র প্রবন্ধ)

সম্পর্ক

সম্পর্ক এক জটিল শব্দ। সময় ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের ভাবনা বদলে যায়। সম্পর্কের মৃত্যু হয়, জন্ম হয়, রূপ বদলায়।

বিনতা রায়চৌধুরী ঃ অন্তবিহীন

সম্পূর্ণ

শংকর ত্যাগের এবং অন্নপূর্ণা ভোগের মূর্তি ; উভয়ে মিলিয়া যখন একাঙ্গ হইয়া যায় তখনই সম্পূর্ণতার আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ততঃ কিম্ (ধর্ম)

সম্প্রদায়

সমাজ যতই অগ্রসর হয় ততই অধিকারী এবং অনধিকারী, রসিক এবং অরসিক, এই দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হতে থাকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাঞ্জলতা (পঞ্চভূত)

সম্প্রদায় আপনার বাইরে আসতে চায় না ; সে নিজের ছাপ মেরে তবে আত্মীয়তা করতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রীর উৎসব (শান্তিনিকেতন)

সম্ভোগ

ভোগের মধ্যে কেবলমাত্রই পাওয়া, পশুর পাওয়া ; আর সম্ভোগের মধ্যে পাওয়া না-পাওয়া দুই-ই মিলেছে, সে হল মানুষের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—১১।২।২৫

সম্ভ্রম

সম্ভ্রম যাওয়ার পর পুরুষমানুষের বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা।

শরৎচন্দ্র ঃ শ্রীকান্ত ২য়

সম্মান

সম্মানের প্রথম শর্ত সততা।

অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় ঃ ভিক্ষে চাইনে হুজুর
(আনন্দবাজার পত্রিকা ২৮.৫.০২)

নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্মদিনে—১৮

সম্মান যাঁহার প্রাপ্য তাঁহাকেই সকল দিকে সর্বদা নিজের ইচ্ছাকে খর্ব করিয়া চলিতে হয়।.....গৃহকর্তা ও গৃহকর্ত্রীকেই সাংসারিক বিষয়ে অধিক বঞ্চিত হইতে হয়......সম্মানও পাইবে, অথচ তাহার কোনো মূল্য দিবে না, ইহা কখনোই চিরদিন সহ্য হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্রাহ্মণ (ভারতবর্ষ)

সরল

সম্পূর্ণভাবে সরল না হলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। যীশুখ্রীষ্ট সেজন্য বলেছেন ঃ 'যতক্ষণ তোমরা শিশুদের মতো সম্পূর্ণ সরল না হবে ততক্ষণ কিছুতেই ঈশ্বরকে লাভ করতে পারবে না।'

স্বামী অভেদানন্দ ঃ উপদেশমালা

সরল হলে শীঘ্র ঈশ্বর লাভ হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

উদার সরল না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। কপটতা থেকে অনেক দূর।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সরলতা

যতক্ষণ না সভ্যতার মাঝখানে......স্বচ্ছ সরলতার প্রতিষ্ঠা পায় ততক্ষণ সভ্যতা কখনোই সম্পূর্ণ এবং সুন্দর হবে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছিন্নপত্র ৯৬

সরলতাই মানুষের স্বাস্থ্যের একমাত্র উপায়—সে যেন গঙ্গার মতো, তার মধ্যে স্নান করে সংসারের অনেক তাপ দূর হয়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছিন্নপত্র ৯৬

সরলতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা পাটোয়ারী—এ সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সর্দার

কারও উপর হুকুম চালাবার চেষ্টা করো না—যে অপরের সেবা করতে পারে, সে-ই যথার্থ সর্দার হতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী ৫

সরস্বতী

মুসলমানও সরস্বতী বোঝে এবং এই দেবীকে সৌন্দর্যের আর বিদ্যার প্রতীক মনে করে।

আবুল বাশার ঃ রক্ত সরস্বতী

নমস্তে বীণা পুস্তক হস্তে দেবী বীণাপাণি।
শতদল-বাসিনী সিদ্ধি-বিধায়িনী সরস্বতী বেদবাণী॥
শুদ্ধ জ্ঞান দাও, শুভ্র আলোক অজ্ঞান-তিমির অপগত হোক।
মৃতজনে সঙ্গীত-অমৃত দাও মা বীণাতে মাভৈঃ ঝঙ্কার দানি।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ভক্তি-গীতি

দেবী সরস্বতী।......এঁর বীণার মঙ্গলঝঙ্কারে দেশে দেশে শিল্পীদের সৌন্দর্য তৃষ্ণা সৃষ্টিমুখী হয়ে উঠেছে, এঁর আশীর্বাদে দিকে দিকে সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, এঁরই

প্রাণের ভাণ্ডারে বিশ্বের সৌন্দর্যসম্ভার নিত্য অফুরন্ত রয়েছে, শাশ্বত এঁর মহিমা, অক্ষয় এঁর দান, চির নূতন এঁর বাণী।......
দেবী একা গান গাইছেন—সে গান পৃথিবীর মানুষের গান নয়, সে গান প্রাণধারার আদিম ঝরণার গান, সৃষ্টিমুখী নীহারিকাদের গান, অনন্ত আকাশে দিক্‌হারা কোন পথিক তারার গান।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ মেঘমল্লার

বিশ্ব-মহাপদ্ম-লীনা! চিত্তময়ী! অয়ি জ্যোতিষ্মতী!
মহীয়সী মহাসরস্বতী!
শক্তির বিভূতি তুমি। তুমি মহাশক্তি-সমুদ্ভবা ;
সপ্ত-স্বর্গ-বিহারিণী! অন্ধকারে তুমি উষা-প্রভা!
সূর্যে-সুপ্ত ভর্গদেব মগ্ন সদা তোমারি স্বপনে ;
সবিতৃ-সম্ভবা দেবী সাবিত্রী সে আনন্দিত মনে
বন্দে ও চরণে।
ছিন্ন-মেঘ অম্বরের নিষ্কল চন্দ্রমা।
তুমি নিরুপমা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঃ মহাসরস্বতী

যাহারা পুস্তক প্রণয়ন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করেন, তাঁহাদিগকে লোকে সরস্বতীর ভিক্ষাপুত্র বলে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ নূতন কথা গড়া

সর্বনাশ

প্রহরশেষের আলোয় রাঙা
সেদিন চৈত্রমাস,
তোমার চোখে দেখেছিলাম
আমার সর্বনাশ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ চার অধ্যায় ২

আমি সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়,
আমি তার লাগি পথ চেয়ে আছি পথে যেজন ভাসায়।
যেজন দেয় না দেখা, যায় যে দেখে,
ভালোবাসে আড়াল থেকে,
আমার মন মজেছে সেই গভীরের
গোপন ভালোবাসায়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নবীন

সহজ

সহজ জিনিষের গুণ এই যে, তাহার স্বাদ কখনোই পুরাতন হয় না, তাহার সরলতা তাহাকে চিরদিন নবীন করিয়া রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আবরণ

মনেরে আজ কহ যে,
ভালমন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ক্ষণিকা

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।
লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়তো কঠিন মোটে
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খাপছাড়া

সহজ হবি, সহজ হবি, ওরে মন, সহজ হবি—
কাছের জিনিষ দূরে রাখে তার থেকে তুই দূরে রবি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান

সমস্ত সহজ করিতে হইবে এই চেষ্টায় মানুষের জানাশোনা খাওয়াদাওয়া আমোদপ্রমোদ সমস্তই অসম্ভব শক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাঞ্জলতা (পঞ্চভূত)

সহজ নিশ্বাসে যখন বাধা পড়ে, তখনই মানুষ হাঁপিয়ে নিশ্বাস টানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা

হাতের উপর হাত রাখা খুব সহজ নয়
সারা জীবন বইতে পারা সহজ নয়
এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।......
সেই সনাতন ভরসাহীনা অশ্রুহীনা
তুমিই আমার সব সময়ের সঙ্গিনী না?
তুমি আমায় সুখ দেবে তা সহজ নয়
তুমি আমায় দুঃখ দেবে সহজ নয়।

শঙ্খ ঘোষ ঃ সঙ্গিনী

সাংবাদিক/সাংবাদিকতা (দ্র. জার্নালিজম)

সাংবাদিকতা। যার গ্ল্যামার আছে কিন্তু কৌলীন্য নেই। গণসমাজে যার কদর আছে, গুণীসমাজে যার আদর নেই। অনেকের মতে সাংবাদিকতা এক নৈর্ব্যক্তিক জীবন প্রবাহের খণ্ড বিচ্ছিন্ন রূপ মাত্র। 'টোটাল' নয়—একাংশ। তার আবেদন তাৎক্ষণিক প্রয়োজনের সীমার মধ্যে।

এত সত্ত্বেও একজন আমেরিকান সাংবাদিক বলেছেন, উনিশ শতক গেছে ঔপন্যাসিকদের যুগ—আর এই বিশ শতক সাংবাদিকতার যুগ। শিক্ষা-সংস্কৃতি বিনোদন—মানব সভ্যতা। বিকাশের মুল বাহন আজ সাংবাদিকতা। চিন্তার ক্ষেত্রে পরিবর্তন, ধ্যান-ধারণার বিবর্তন, সমাজ বিপ্লব ও সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারক ও বাহক হল সাংবাদিকতা।

আর একজন আমেরিকান সাংবাদিক বলেছেন,......সংবাদপত্র এক চলমান বিজ্ঞান।

পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঃ বিষয় ঃ সাংবাদিকতা

সাংবাদিকতা আর সাহিত্যের মধ্যে এমন কোন আড়াআড়ি নেই।.....আড়াআড়ি তো নেই-ই বরং জাতিসূত্রে দুটিতে যথেষ্ট মিল। দুটিরই বাস্তব নিয়ে কারবার। তবে সাংবাদিকতা আরও একটু প্রত্যক্ষ, আরও একটু মাটির কাছাকাছি। কিন্তু সাহিত্য

বিশেষ করে মহৎ সাহিত্য মাটিতে শিকড় ছড়িয়ে দিয়েও আলোয় আর বাতাসে ডালপালা মেলতে চায়।সাংবাদিক রচনা আবশ্যিকভাবে মূর্ত, সাহিত্য কখনও কখনও মূর্ত এমনকি অমূর্তও। তবে উভয়েরই মজ্জায় মজ্জায় আছে সত্য, অন্তত থাকা দরকার।

সন্তোষ কুমার ঘোষ ঃ ভূমিকা (বিষয় ঃ সংবাদিকতা-পার্থ চট্টোপাধ্যায়)

সাংস্কৃতিক

মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে দেখা গেছে যাদের সকলের চেয়ে অধিক পরিশ্রম তারাই সর্বাধিক বঞ্চিত ও লাঞ্ছিত।

অনিন্দিতা দত্ত ঃ রবীন্দ্র-পত্রাবলীতে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন

সাঁওতাল/সাঁওতালি

সাঁওতাল পুরুষ-নারী সব, সকলের সবল কালো দেহে সুস্থতার একটি স্নিগ্ধ আনন্দ। রুক্ষ চুলে জবা ফুল গোঁজা, দৃঢ় দেহের সরল লীলায়িত গতির সঙ্গে সঙ্গে জবার শীষগুলি তালে তালে নাচিতেছে। **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ** প্রেম ও প্রয়োজন

ওগো সাঁওতালি ছেলে,
শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূত কি এলে॥
ধানের ক্ষেতের পারে শালের ছায়ার ধারে
বাঁশির সুরেতে সুদূর দূরেতে চলেছ হৃদয় মেলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

সাকার

তিনি সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কূলকিনারা নাই। ভক্তিহিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে ; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞানসূর্য উঠলে সে বরফ গলে যায়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সাক্ষী

একজনকে শিখিয়ে দিয়েছিল তুই সাক্ষী দিবি যে—বইটার সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া আর মাথার ওপর লালকালির ছাপ। উকিল যেই তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, তুমি আসামীকে চেন? অমনি সে বলে উঠেছে—আজ্ঞে হ্যাঁ, সবুজ রঙের মলাট, কানের কাছে নীল চামড়া, মাথার উপর লাল কালির ছাপ।

সুকুমার রায় ঃ হযবরল

সাধক

বেদে যিনি অগ্নি, তন্ত্রে তিনি জননী, পরিণাম প্রদায়িণী, রূপান্তর সাধনী। ‘এই পৃথিবীর পথের পরে’ তাই ‘মায়ের পায়ের পরশ পুলক’ পেয়ে সাধকের জীবন-মুকুল কত রঙে ফুটে ওঠে, তার কতকালের ঘুম ভেঙে যায়। যে ছিল ‘মাটির সাথে মাটির মতো’ সে আজ শিখার মতো জ্বলে উঠেছে, কারণ সে যে ‘জ্বলবার মন্ত্র’ পেয়েছে সেই শিখাময়ীর কাছ থেকে।

সেই শিখা সোনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে নির্ঝরধারায় ঝরে পড়ে ধরণীর ধূলায়। তন্ত্রে তাই জাগরণ এই মহাশক্তির মাধ্যমে। সাধকের ব্রত হল তুচ্ছ জীর্ণ অন্ধকারময় জীবনকে আলোয় আলোয় ভরে তোলা, জীবন প্রদীপ জ্বালিয়ে মরণ-কালো অন্ধকারকে রাঙিয়ে তোলা।

সেই আলোর উৎস মাটির বুকে এই মা। 'তাম অগ্নিবর্ণাং যশসা জ্বলন্তীং......দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে।'

গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় : চেতনার আরোহিণী

যে সাধন-ভজন করছে—পূজা, জপ, ধ্যান, নাম গুণকীর্তন করছে—সে ব্যক্তি সাধক।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সাধক ঈশ্বরকে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়, আন্তরিক তাঁকে ডাকে, তাঁর নাম করে, তাঁকে সরল অন্তঃকরণে প্রার্থনা করে।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সাধনা

কর্ম মাত্রেই সাধনা। জীব মাত্রেই সাধক।

আনন্দময়ী মা : পরমযোগিনী আনন্দময়ী মা

সাধনা করতে হলে মন দেহ ও প্রাণশক্তি সবল থাকা দরকার। বিশেষত তমঃ যাতে বহিষ্কৃত হয়, আধারের মধ্যে আসে তেজ ও সামর্থ্য তার ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রীঅরবিন্দ : যোগসাধনার ভিত্তি

প্রাণকে উদবুদ্ধ করা, মনকে প্রবুদ্ধ করার নামই সাধনা।

প্রমথ চৌধুরী : বীণাবাই

সাধনা করলে অসীম শক্তি পাবি। কিন্তু সেই শক্তি নিজের স্বার্থে অপরের ক্ষতি করবার জন্য কাজে লাগালে সর্বনাশ হবে। তন্ত্রের এই নিয়ম।

তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : তারানাথ তান্ত্রিক

সাধনা তাহাকেই বলি, যাহাতে প্রকৃতিকে মানিয়া প্রকৃতির উপরে উঠিতে পারা যায়।....প্রকৃতির স্রোতের ভিতর দিয়াই আমাদিগকে জীবনতরী বাহিয়া চলিতে হইবে। আমাদের সমস্যা এ নয় যে, স্রোতটাকে কী করিয়া বাদ দিব ; সমস্যা এই যে, তরী কী হইলে ডুবিবে না, চলিবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চতুরঙ্গ (দামিনী)

রমণীর মন
সহস্রবর্ষেরই সখা, সাধনার ধন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বিদায় অভিশাপ

সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যেই বোধের দ্বারা অনুভব করা ভারতবর্ষের সাধনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শান্তিনিকেতন

জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের।.......শেষ সাধনার কথা বলনি ; সেটা হচ্ছে ত্যাগের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাধনা

সাধু হইও সাধু সাজিও না, সংসারী সাজিও সংসারী হইও না।

আচার্য নগেন্দ্রনাথ : উপদেশ

সাধুসঙ্গ সর্বদা দরকার, সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করে দেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

সাধুর হৃদয় সকলের চেয়ে বড়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে, তিনিই সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী তিনিই সাধু।.......সাধু সর্বদা ঈশ্বরচিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই কন না। আর সর্বভূতে ঈশ্বর আছে জেনে তাদের সেবা করেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

সামাজিক

সামাজিক কার্যসূত্র—যাহাতে অন্যের প্রতি তোমার নিজের সহানুভূতি সম্বর্ধিত হয়, কায়, মন, বাক্য, এবং ব্যবহারে এরূপ অভ্যাসই সামাজিক ধর্মে ঈশ্বরে পূজা।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ঃ কর্তব্য নির্ণয় (সামাজিক প্রবন্ধ)

সাম্প্রদায়িকতা

ধর্ম ও ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা কখনই এক বস্তু নয়। মানুষকে যা সত্যতত্ত্ব উপলব্ধি ও মুক্তিলাভে সমর্থ করে তাই ধর্ম।

স্বামী অভেদানন্দ ঃ উপদেশমালা

সাম্প্রদায়িকতা দ্বারা ধর্মজগতের কোনদিনই কখনও কল্যাণ হয়নি, বরং যথেষ্ট ক্ষতি ও অপকার হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবে মানুষ ধর্মের প্রকৃত আদর্শ ও সাধন-পদ্ধতি ভুলে যায়। ধর্মের নামে পৃথিবীতে যত নৃশংস ব্যাপার ঘটেছে তার মূল কারণ সাম্প্রদায়িকতা। **স্বামী অভেদানন্দ** ঃ উপদেশমালা

সম্প্রদায় থাকুক, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা দূর হোক।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী ৩

সঙ্গের দিক থেকে আজকাল হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে গিয়ে সাম্প্রদায়িক অনৈক্যকে বাড়িয়ে তুলেছে, মনুষ্যত্বের মিলটাকে দিয়েছে চাপা। আমি হিন্দুর তরফ থেকেই বলছি, মুসলমানের ত্রুটি বিচারটা থাক—আমরা মুসলমানকে কাছে টানতে যদি না পেরে থাকি তবে সেজন্যে যেন লজ্জা স্বীকার করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিন্দুমুসলমান (কালান্তর)

ভারতের ও বিশ্বের ইতিহাস পাঠ ও বিশ্লেষণ আমাদের মনে এই দৃঢ় ধারণারই জন্ম দিয়েছে যে ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িকতা ইতিহাসের সকল পর্বে বিভিন্ন দেশের ও বিশ্বের সমূহ ক্ষতিসাধনই করেছে, প্রগতির পথ রুদ্ধ করেছে। ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা দেশে দেশে রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধকেই ডেকে এনেছে, জাতীয় ঐক্য, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতাকেই বিপন্ন করেছে ধর্মনিরপেক্ষতা, পরধর্মসহিষ্ণুতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ভিত্তিতেই, মন্দির-মসজিদ-গুরুদ্বার-গীর্জার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তিতেই ভারত এক সমৃদ্ধ সমুজ্জ্বল রাষ্ট্র হিসাবে একবিংশ শতাব্দীর পথে এগিয়ে যেতে পারবে। তার বিকল্প ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ, বা সকল ধর্মের নরনারীর ও আমাদের মিলিত মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সমূহ সর্বনাশ করবে।

ঘোষণাপত্র ঃ পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসবিদদের সমাবেশ—১৯৯৩

১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট আমাদের কেবল সুখের দিন নয়, শোকেরও দিন। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা সেদিন থেকেই রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠা দিলাম।

সুদিন চট্টোপাধ্যায় ঃ জীবন নবনব

সাম্প্রদায়িক মূল্যবোধের বদলে আমরা চাই আধুনিক ও সাবলীল জীবনের নবীন ভাষা।

সেলিম আল দীন ঃ কিত্তনখোলা

সাম্য

গাহি সাম্যের গান—
যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান
যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।

কাজী নজরুল ইসলাম : সাম্যবাদী

আম্র কহে, একদিন, হে মাকাল ভাই,
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই ;
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি—
মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গৃহভেদ (কণিকা)

জগতে এসেছে নূতন মন্ত্র বন্ধন-ভয়-হারী
সাম্যের মহাসংগীত সব গাহ মিলি নরনারী।.....
মানি না গীর্জা, মঠ, মন্দির, কল্কি, পেগম্বর,
দেবতা মোদের সাম্য-দেবতা অন্তরে তাঁর ঘর।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : সাম্য-সামে (হোমশিখা)

সাম্যনীতি/সাম্যবাদ

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকারবিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাম্য

আমরা সাম্যনীতির এরূপ ব্যাখ্যা করি না যে, সকল মনুষ্য সমানাবস্থাপন্ন হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্থির করিতে হইবে। তাহা কখন হইতে পারে না। যেখানে বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির স্বাভাবিক তারতম্য আছে, সেখানে অবশ্য অবস্থার তারতম্য ঘটিবে—কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তবে অধিকারের সাম্য আবশ্যক—কাহারও শক্তি থাকিলে, অধিকার নাই বলিয়া বিমুখ না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সাম্য—উপসংহার

বাবুদের সাম্যবাদ বুর্জোয়াকে বাঁচাবার ছল।

রাম বসু : দিনলিপি থেকে—৪

সাম্যবাদী

ভগবান যদি সাম্যবাদী হতেন, তা হলে মেয়েদের চেহারায় এত বেশি উঁচু নিচু ঘটিয়ে রাস্তায় ঘাটে এরকম মনের আগুন জ্বালিয়ে দিতেন না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রবিবার (তিনসঙ্গী)

সাম্রাজ্যবাদ

সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনৈতিক ঘাঁটি রাজনৈতিক ঘাঁটি হতে বেশিদিন লাগে না। তারপর সেটা সামরিক ঘাঁটিও হয়ে উঠতে পারে। অর্থাৎ ছুঁচ হয়ে ঢোকা......ফাল হয়ে বেরোনো।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : স্বর্গের সিঁড়ি

সাহস

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু।
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস বিস্তৃত বক্ষপট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : এবার ফিরাও মোরে (চিত্রা)

হে বীর, সাহস অবলম্বন কর ; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।

স্বামী বিবেকানন্দ : বর্তমান ভারত

বোম্বেটের সাহস কি ভদ্রলোকের চেয়ে বেশি? দুষ্কর্ম করতে পারাকেই সাহস বলেনা।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চরিত্রহীন

সাহস বাড়া এবং নির্ভীকতা অর্জন কোনমতেই একবস্তু নয়। একটা দৈহিক, অন্যটা মানসিক। দেহের শক্তি ও কৌশল বৃদ্ধিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অকৌশলীকে পরাভূত করা যায়, কিন্তু নির্ভয়ের সাধনায় শক্তিমানকে পরাস্ত করা যায়,—সংসারে কেউ যাকে বাধা দিতে পারেনা, সে হয় অপরাজেয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : সত্যাশ্রয়ী

'সাহস' কথাটা কতো ছোট, কিন্তু কতো দুর্লভ।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় : **জলতরঙ্গ** (ক্রীড়াভূমি)

সারি গান

নৌকা চালাবার সময় সমবেত কণ্ঠে যে গান গাওয়া হয় তাকে সারি গান বলে।

গৌরী ভট্টাচার্য : বাংলার লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

সাহিত্য

সাহিত্যের সত্যের সঙ্গে কল্যাণ শব্দটি যুক্ত। কার কল্যাণ? শুধু নিজের কল্যাণ? না। মানুষের কল্যাণ, জগতের কল্যাণ?.......শ্রেণী শোষণে পিষ্ট, বঞ্চিত, নিঃস্ব দেশবাসীর বেদনাই আজকের দিনের নাট্যকারদের কাছে সবচেয়ে বড়ো সত্য এবং তাদের মুক্তির চিন্তাই হলো আসল কল্যাণবোধ। এই সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত যে কল্যাণবোধের দ্বারা নাট্যসাহিত্য সৃষ্টি হবে তারই মধ্যে ধরা দেবে সুন্দর।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : মুখবন্ধ—নাট্যচিন্তা : শিল্প জিজ্ঞাসা

সাহিত্যচর্চা যে শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রমথ চৌধুরী : বইপড়া

মানুষের মনকে সবল সচল সরাগ ও সমৃদ্ধ করবার ভার আজকের দিনে সাহিত্যের উপর ন্যস্ত হয়েছে। কেননা মানুষের দর্শন-বিজ্ঞান ধর্ম-নীতি অনুরাগ-বিরাগ আশা-নৈরাশ্য তার অন্তরের স্বপ্ন ও সত্য, এই সকলের সমবায়ে সাহিত্যের জন্ম। অপরাপর শাস্ত্রের ভিতর যা আছে, সে-সব হচ্ছে মানুষের মনের ভগ্নাংশ ; তার পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় শুধু সাহিত্যে।

প্রমথ চৌধুরী : বইপড়া

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে।

প্রমথ চৌধুরী : সাহিত্যে খেলা

সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুলমাষ্টারির ভার নেয় নি। এতে দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাষ্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

প্রমথ চৌধুরী : সাহিত্যে খেলা

সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিদ্যাপতি ও জয়দেব

সাহিত্য এবং ধর্ম একই জিনিষের এপিঠ-ওপিঠ। সাহিত্যে এবং ধর্মেই মানব নিজের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ আবিষ্কার করিয়াছে। যাহা কেবলমাত্র ভঙ্গিসর্বস্ব, দেহসর্বস্ব, সমাজসর্বস্ব বা কোনও বিশেষ মতবাদসর্বস্ব যাহা জীবনকে অবলম্বন করিয়াও জীবনাতীত, যাহা মানুষকে কোনো আর্থিক সম্পদ দান করে না, আনন্দই যাহার একমাত্র ধ্যেয় এবং একমাত্র পুরস্কার—এই আধ্যাত্মিকতাই সাহিত্য এবং ধর্মের লক্ষ্য। প্রথম শ্রেণীর ধার্মিক এবং প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক এই আধ্যাত্মিকতারই সাধনা করিয়া থাকেন। মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ আধ্যাত্মিকতায়, সাহিত্য এবং ধর্ম মানবমনের এই চরম বিকাশসাধন করিবার জন্য সতত উন্মুখ।

বনফুল : ছাত্রদের প্রতি (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

সাহিত্য সুসজ্জিত বাণীমূর্তি। এই বাণী বা ভাষা একইসঙ্গে জ্ঞাপক ও উদ্বোধক। কবিতার মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করার সময় এই ভাষা হয়ে ওঠে চিত্ররূপময়।

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় : চিত্ররূপময় কাব্যদেহ (সাহিত্যের মানচিত্র)

সাহিত্য নিতান্ত বাজারের জিনিষ নয়, তার আভিজাত্য আছে, দশের কাছে লোলুপভাবে আত্মঘোষণার চঞ্চলতায় তার জাত মারা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : চিঠিপত্র

এই যে আমার এক আমি, এ বহুর মধ্যে দিয়ে চলে চলে নিজেকে নিত্য উপলব্ধি করতে থাকে। বহুর সঙ্গে মানুষের সেই একের মিলনজাত রসের উপলব্ধিই হচ্ছে সাহিত্যের সামগ্রী। অর্থাৎ, দৃষ্ট বস্তু নয়, দ্রষ্টা আমিই তার লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপানযাত্রী ২

যাকে খাস সাহিত্য বলে সেটা হল সেই সৃষ্টিকর্তার এলাকায়, সেটা কেবল আপন-মনে।.....পদ্মফুলকে যদি জিজ্ঞাসা করো তুমি কেন হলে সে বলে, 'আমি হবার জন্যেই হলুম।' খাঁটি সাহিত্যেরও সেই একটিমাত্র জবাব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাভা-যাত্রীর পত্র

সাহিত্যভোগের অকৃত্রিম উৎসাহ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের চেয়ে অনেক বেশী দুর্লভ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি

শরীরের পিপাসা ছাড়া আর-এক পিপাসাও মানুষের আছে। সংগীত চিত্র সাহিত্য মানুষের হৃদয়ের সম্বন্ধে সেই পিপাসাকেই জানান দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তথ্য ও সত্য (সাহিত্যের পথে)

সাহিত্যে ও আর্টে কোনো বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। অর্থাৎ সে বস্তু যদি এমন একটি রূপরেখা গীতের সুষমাযুক্ত ঐক্য লাভ করে যাতে করে আমাদের চিত্ত আনন্দের মূল্যে তাকে সত্য বলে স্বীকার করে, তাহলেই তার পরিচয় সম্পূর্ণ হয়। তা যদি না হয়, অথচ যদি তথ্য হিসাবে সে বস্তু একেবারে নিখুঁত হয়, তা হলে অরসিক তাকে বরমাল্য দিলেও রসজ্ঞ তাকে বর্জন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তথ্য ও সত্য (সাহিত্যের পথে)

সাহিত্য.....কো-অপারেটিভ বাণিজ্য নয়, জয়েন্ট স্টক কোম্পানি নয়, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন নয়,.......সে নির্জনচর একলা মানুষের।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ (সাহিত্যের পথে)

সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দ দান করা, কিন্তু সে আনন্দটি গ্রহণ করাও নিতান্ত সহজ নহে ; তাহার জন্যও......শিক্ষা এবং সাহায্যের প্রয়োজন।......যদি কেহ অভিমান

করিয়া বলেন, যাহা বিনা শিক্ষায় না জানা যায় তাহা বিজ্ঞান নহে, যাহা বিনা চেষ্টায় না বোঝা যায় তাহা দর্শন নহে এবং যাহা বিনা সাধনায় আনন্দ দান না করে তাহা সাহিত্য নহে, তবে কেবল খনার বচন, প্রবাদবাক্য এবং পাঁচালি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রাঞ্জলতা (পঞ্চভূত)

মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠে।......সাহিত্যে মানুষ আপনার সেই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণতার জগৎ সৃষ্টি করে চলেছে। তার ইচ্ছার আদর্শে যা হওয়া উচিত ছিল, যা হয় নি, তাকে মূর্তিমান করে মেটাচ্ছে সে আপন ক্ষোভ। সেই রচনার প্রভাব ফিরে এসে তার নিজের সংসাররচনায় চরিত্ররচনায় কাজ করছে। মানুষের বড়ো ইচ্ছাকে যে সাহিত্য আকার দিয়েছে, এবং আকার দেওয়ার দ্বারা মানুষের মনকে ভিতরে ভিতরে বড়ো করে তুলছে, তাকে মানুষ যুগে যুগে সম্মান দিয়ে এসেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলা ভাষা পরিচয়-৫

যখন কলেজে পড়া মুখস্থ করতে তখন শিখেছিলে রসাত্মক বাক্যই কাব্য ; এখন সাবালক হয়েছ তবু ঐ কথাটা পুরিয়ে নিতে পারলে না যে, সত্যাত্মক বাক্য রসাত্মক হলেই তাকে বলে সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাঁশরি (১।১)

লোক যদি সাহিত্য হইতে শিক্ষা পাইতে চেষ্টা করে তবে পাইতেও পারে, কিন্তু সাহিত্য লোককে শিক্ষা দিবার জন্য কোনো চিন্তাই করে না। কোনো দেশেই সাহিত্য ইস্কুল-মাস্টারির ভার লয় নাই।....যদি কালিদাসের কাব্য ভালো হয় তবে সমস্ত মানুষের জন্যই তাহা সকল কালের ভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিল—আজকের সাধারণ মানুষ যাহা বুঝিল না কালকের সাধারণ মানুষ হয়তো তাহা বুঝিবে।.....কিন্তু, কালিদাস যদি কবি না হইয়া লোকহিতৈষী হইতেন সেই পঞ্চম শতাব্দীর উজ্জয়িনীর কৃষাণদের জন্য হয়তো প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী করে কখানা বই লিখিতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাস্তব (সাহিত্যের পথে)

সাহিত্যের কামড় কচ্ছপের কামড়—যাকে একবার ধরে.......তাকে সহজে ছাড়তে চায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বৈকুণ্ঠের খাতা

সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাজসিংহ

সাহিত্যে আমরা কিসের পরিচয় পাই? না, মানুষের যাহা প্রাচুর্য, যাহা ঐশ্বর্য, যাহা তাহার সমস্ত প্রয়োজনকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। যাহা তাহার সংসারের মধ্যেই ফুরাইয়া যাইতে পারে নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিশ্বসাহিত্য (সাহিত্য)

আমাদের জানা দু-রকমের, জ্ঞানে জানা আর অনুভবে জানা। অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্যকিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা ; শুধু বাইরে থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা। বাইরের পদার্থের যোগে কোনো বিশেষ রঙে বিশেষ রসে বিশেষ রূপে আপনাকেই বোধ করাকে বলে অনুভব করা।......

আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে-আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সাহিত্যতত্ত্ব (সাহিত্যের পথে)

বন্ধুকে দেখি অসীমে, তাই আপনি জেগে ওঠে ভাষায় অলংকার, কণ্ঠের সুরে অলংকার, হাসিতে অলংকার, ব্যবহারে অলংকার। সাহিত্যে এই বন্ধুর কথা অলংকৃত বাণীতে! সেই বাণীর সংকেত ঝংকারে বাজতে থাকে—'অলম', অর্থাৎ বাস আর কাজ নেই। এই অলংকৃত বাক্যই হচ্ছে রসাত্মক বাক্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যধর্ম (সাহিত্যের পথে)

বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যরূপ (সাহিত্যের পথে)

আমাদের......সাহিত্য য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। শরৎ চাটুজ্জের গল্প, বেতালপঞ্চবিংশতি, হাতেম-তাই, গোলেবকাওয়ালীর, অথবা কাদম্বরী-বাসবদত্তার মতো যে হয় নি, হয়েছে য়ুরোপীয় কথা সাহিত্যের ছাঁদে তাতে করে অবাঙালিত্ব বা রজোগুণ প্রমাণিত হয় না ; তাতে প্রমাণিত হয় প্রতিভার প্রাণবত্তা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যবিচার (সাহিত্যের পথে)

সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আর্শি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের বিচারক (সাহিত্য)

অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের বিচারক

সাহিত্যে উপস্থাপিত চরিত্রগুলি সমাজের মধ্যস্থ বিরোধ আর দ্বন্দ্বের প্রকাশিত রূপ। বিভিন্ন ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ও কালে সমাজে ভিন্নভিন্ন শ্রেণীস্বার্থ, মনোভাব (Motive) ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাই। কোনো একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ও নির্দিষ্টকালের সাহিত্য বিশ্লেষণে ঐ সমস্ত উপাদানকেও গভীরভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

লায়েক আলি খান : বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সমাজ ও চরিত্র (কথাসুমুখ)

বাড়িতে বসে আর্মচেয়ারে বসে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, অনুকরণ করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যিকার মানুষ না দেখলে সাহিত্য হয় না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : চন্দননগরে আলাপ সভায়

কোন দেশের কোন সাহিত্যই কখনো নিত্যকালের হয়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মত তারও জন্ম আছে, পরিণতি আছে, বিনাশের ক্ষণ আছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জন্মদিনের ভাষণাবলী (৫৩তম জন্মদিনে)

মানুষের মন ছাড়া ত সাহিত্যের দাঁড়াবার জায়গা নেই, মানব চিত্তেই ত তার আশ্রয় তার সকল ঐশ্বর্য বিকশিত হয়ে ওঠে। মানবচিত্তই যে এক স্থানে নিশ্চল হয়ে থাকতে পায় না। তার পরিবর্তন আছে, বিবর্তন আছে—তার রসবোধ ও সৌন্দর্য বিচারের ধারার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তাই এক যুগে যে মূল্য মানুষ খুশী হয়ে দেয়, আর এক যুগে তার অর্দ্ধেক দাম দিতেও তার কুণ্ঠার অবধি থাকে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : জন্মদিনের ভাষণাবলী (৫৩তম জন্মদিনে)

আমার দেশে আমার ভাষায় এতবড় সাহিত্যই জন্মলাভ করুক যার তুলনায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই যেতে পারে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্মদিনের ভাষণাবলী (৫৭তম জন্মদিনে)

ঋণ কি শুধু আমার পূর্ববর্তী পূজনীয় সাহিত্যাচার্যগণের কাছেই? সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষ যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,— এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ জন্মদিনের ভাষণাবলী (৫৭তম জন্মদিনে)

যা নিজের জীবনে নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সত্যি হয়ে উঠবে—অবিশ্যি কল্পনা থাকবে, তাই হবে সাহিত্য বস্তু। নিজের আয়কে অতিক্রম করে ব্যয় করতে যেয়ো না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ মুসলমান সাহিত্য

মানুষ যখন সাহিত্য রচনায় নিবিষ্ট চিত্ত তখন সে ঠিক হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। তখন সে তার সর্বজনপরিচিত 'আমি' টাকে বহুদূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্য সাধনা ব্যর্থ হয়। এইজন্যেই যেখানে কিছুই এক নয়, বাহ্যতঃ কিছুই মেলে না, সেখানে ম্যাকসিম গর্কীর মত সাহিত্য সেবকেরা আমাদের বুকের মধ্যে অনেকখানি আত্মীয়ের আসন জুড়ে বসে থাকেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ মুসলিম সাহিত্য সমাজ

সাহিত্য জাতীয় ঐশ্বর্য্য। ঐশ্বর্য্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত। বর্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙিয়ে খাওয়া চলে না। একথা কোনোমতেই ভোলা উচিত নয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি

সাহিত্যের নানা কাজের মধ্যে একটা কাজ হইতেছে জাতিকে গঠন করা। সকল দিক দিয়া তাহাকে উন্নত করা। Idea পশ্চিমের কি উত্তরের ইহা বড় কথা নয়, স্বদেশের কি বিদেশের তাহাও বড় কথা নয়, বড় কথা ইহা ভাষা ও জাতির কল্যাণ করে কি না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সাহিত্যে রীতি ও নীতি

ফরমাস দিয়া সাহিত্যসৃষ্টি হয় না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সাহিত্য সম্মেলনে বক্তৃতা

আমরা মশাই ব্যবসা করি, আপনি করেন সাহিত্য,
মোদের ঘাড়ে পড়ে গিয়ে প্রচার করার দায়িত্ব।
আপনারা ছাই নিয়েই খালাস, আমরা পড়ি ঠ্যালায় যে
চক্ষু ওঠে চড়ক গাছে লাভ খতাবার বেলায় যে।......
এখন বলুন কত টাকায় ছাড়তে পারেন এ বইটা?
উচিত মূল্য বলেন যদি, নগদ টাকায় দেবই তা।
কী বললেন? পঁচিশ টাকা? তাক লাগালেন মশাই যে,
সাহিত্যিকের ছদ্মবেশে আপনি দেখি কসাই যে।
অসম্ভব এ টাকার দাবী সাহিত্যিকের মানায় কি?
চোরাবাজার চালান বুঝি? খবর দেব থানায় কি?

সুনির্মল বসু ঃ অসম্ভব

সত্যের তেজোবলেই সাহিত্য শক্তিশালী হইয়া থাকে ; আবার সত্যের সহিত যদি সাহস সংযুক্ত হয়, তবে সে-সাহিত্য অমোঘবীর্য সৃজন করে।.....সত্য ও সাহসই সাহিত্যসেবার মূলমন্ত্র। সত্য প্রকাশ করিবার সাহস না থাকিলে সাহিত্য সেবায় অগ্রসর হওয়া বৃথা।

সুরেশচন্দ্র মজুমদার : নাট্য সাহিত্যের মর্মকথা (উদ্বোধন ৫।৪)

সাহিত্য সেনাপতি

যেমন কুলী-মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রবেশ পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিবিধ প্রবন্ধ—দ্বিতীয় খণ্ডের বিজ্ঞাপন

সাহিত্যিক

আশ্চর্য এক নতুন যুগান্তরের আশায় মানুষের মনের অভ্যাসের দাসত্ব মোচনে তাঁদের কাপট্যহীন কলম যদি তাঁরা নিয়োগ করতে পারেন, সাহিত্যিকের কাছে আজকের সমাজের বড় প্রত্যাশা তাহলেই পূর্ণ।

প্রেমেন্দ্র মিত্র : সাহিত্যিকের চোখে আজকের সমাজ

সাহিত্যিকেরও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা প্রয়োজন, বিশেষ করে বর্তমান যুগে, কারণ তাতে অধ্যাত্মবাদ ও ভাববাদের অনেক চোরা মোহের স্বরূপ চিনে সেগুলি কাটিয়ে ওঠা সহজ হয়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : লেখকের কথা

সিংহ

চৈতন্য সিংহের নবদ্বীপ অবতার।
সিংহগ্রীব সিংহবীর্য সিংহের হুঙ্কার॥
সেই সিংহ বসুক জীবের হৃদয় কন্দরে।
কল্মাষ দ্বিরদ নাশে যাঁহার হুঙ্কারে॥

কৃষ্ণদাস কবিরাজ : চৈতন্যচরিতামৃত

মূর্খ! অনুকরণ দ্বারা পরের ভাব আপনার হয় না, অর্জন না করিলে কোন বস্তুই নিজের হয় না ; সিংহ-চর্মে আচ্ছাদিত হইলেই কি গদর্ভ সিংহ হয়?

স্বামী বিবেকানন্দ : বর্তমান ভারত

শুনেছি আমরা যে-রকম খাঁচার ভিতরে সিংহ দেখে খুশী হই, সিংহটাও নাকি আমাদের দিকে কৌতূহলের সঙ্গে তাকায়, তার বিশ্বাস মানুষকে নাকি জড়ো করা হয় নিছক তাকে আনন্দ দেবার জন্য, যেদিন লোকের সংখ্যা কম হয় সেদিন নাকি সিংহ রীতিমত মনমরা হয়ে যায়।

সৈয়দ মুজতবা আলী : ফুটবল (ময়ূরকণ্ঠী)

সিগারেট

সিগারেট খাওয়াটা একটা স্টাইলের ব্যাপার। আমরা তো বুঝি ধূমপানের কাজ হচ্ছে শুধু ফুসফুসকে ঝাঁঝরা করে দেওয়া। স্যামুয়েল জনসন তাঁর লেকসিকোগ্রাফিতে সিগারেটের অর্থ করেছিলেন প্রায় এমন, এই কাগজ মোড়া তামাকের একদিকে করা হয় অগ্নিসংযোগ তার আরেকদিকে লাগানো থাকে এক গবেটের মুখ।

সমীরকুমার গুপ্ত : উড়ো মেঘ

সিঁদুর/সিন্দূর

তোমার ঠোঁটের সিঁদুর অক্ষয় হক।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) : স্বয়ম্বরা

সিন্দূর-বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্ন যথা!

মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য

আমার স্মরণ-শুভ-সিন্দূরে
একটি বিন্দু আঁকিয়ো—তোমার
ললাটচন্দনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : যাচনা (কল্পনা)

সীতা

সীতার কাহিনী, দুঃখ পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী। এই সতীচিত্র বাল্মীকি চিরজীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল আলেখ্য হিন্দুস্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও সুশোভিত। অলক্ষিতভাবে সীতার সতীত্ব হিন্দুস্থানের পত্নীকুলের মধ্যে অপূর্ব সতীত্ববুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে। নূতন সভ্যতার স্রোতে নূতন বিলাসকলা-ময় চিত্র দেখিয়া যেন, সেই স্থায়ী ও অমর আলেখ্যের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাহীন না হই। এস মাতা! তুমি সহস্র সহস্র বৎসর গৃহলক্ষ্মীর ন্যায় হিন্দুর গৃহে যে পুণ্যশক্তির সঞ্চার করিয়াছ—তাহার পুনরুদ্দীপন কর, আবার ঘরে ঘরে তোমার জন্য মঙ্গলঘট প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি ভারতবাসিনী-দিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈন্যে, তুমি তাঁহাদিগের কঠোর সহিষ্ণুতায়, প্রাণের প্রতি উপেক্ষায় ও পবিত্র আত্মসমর্পণের মধ্যে বিরাজ কর। তোমার সুকোমল অলক্তকরাগ-রঞ্জিত পাদযুগ্মের নূপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে স্বর্গীয় সতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত—তুমি কবির সৃষ্টি নহ, তুমি ভগবানের দান। আমাদিগের নানা দুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যে তোমারই প্রতিচ্ছায়া অলক্ষ্যে ভাসিয়া বেড়ায় ও তাহাতেই সমস্ত দৈন্য ঘুচিয়া আমাদের স্বল্প খাদ্য ও ছিন্ন কন্থার নিদ্রা পরম পরিতৃপ্তিকর হইয়া উঠে।

দীনেশচন্দ্র সেন : রামায়ণী কথা

সীতা পবিত্র, বিশুদ্ধ এবং সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত। ভারতবর্ষে যা কিছু কল্যাণকর, বিশুদ্ধ ও পবিত্র, সীতা বলতে তাই বুঝায় ; নারীর মধ্যে নারীত্ব বলতে যা বুঝায়—সীতা তাই। সীতা ধৈর্যশীলা, সহিষ্ণু, চির-বিশ্বস্তা, চির-বিশুদ্ধা পত্নী। তাঁর সমস্ত দুঃখের মধ্যে রামের বিরুদ্ধে তিনি একটাও কর্কশ বাক্য উচ্চারণ করেননি। সীতা কখনও আঘাতের পরিবর্তে আঘাত করেননি। 'সীতা ভব'—সীতা হও।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী-৬

'দশপুত্তল' বালিকাদের ব্রত। চৈত্র সংক্রান্তি এই ব্রতের কাল। ব্রতিনী এ ব্রতে কামনা জানায় : "সীতার মতো সতী হবো, রামের মতো পতি পাবো, লক্ষ্মণের মতো দেবর পাবো, কৌশল্যা শাশুড়ী পাবো, দশরথের মতো শ্বশুর পাবো।" সীতা ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ ; স্বামীসর্বস্বপ্রাণা। স্বামীর সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে কায়মনোবাক্যে স্বামীর অনুগতা। ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, তেজ ও সংকল্প-কঠোরতায় অতুলনীয়া তিনি। সীতা লোকবাংলার নারী সমাজের কাছে পত্নীত্বের চিরন্তন আদর্শ। উইনটারনিৎস

ঠিকই বলেছেন ঃ “the women love and praise Sita as the ideal of conjugal fidelity, the highest virtue of woman.”

মানস মজুমদার ঃ লৌকঐতিহ্যের দর্পণে

আদিকবি বাল্মীকি সেই কবে তার অমর কাব্য রামায়ণে সীতাহরণের কাহিনী বলে গেছেন।....‘সীতা’ রক্ত-মাংসের নারী নয় ; সে হলো সৃষ্টিশীল উর্বরা ভূমি। যে-ভূমি ক্ষুধায় কাতর মানুষকে অন্ন জোগায় ; দরিদ্র মানুষের আশার বার্তা বয়ে আনে ; বিড়ম্বিত নর-নারীর চোখে স্বপ্নের বীজ বপন করে উদ্যমশীল করে—সেই প্রাণময়ী ভূমির অপর নাম সীতা।

রতনকুমার ঘোষ ঃ নাট্যকারের নিবেদন—সীতাহরণ

সুখ

পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি,
এ জীবন মন সকলি দাও ;
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ,
‘সুখ’ ‘সুখ’ করি কেঁদো না আর ;
যতই কাঁদিবে, যতই ভাবিবে,
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।

কামিনী রায় ঃ সুখ

টাকা দিয়ে সুখ কেনা যায় না। তাহলে পয়সাওয়ালা লোকগুলো তাদের বাড়িতে সুখকে বন্ধ করে রেখে দিত, যখন খুশী সুখের ফোয়ারা ছেড়ে দিয়ে আনন্দস্রোতে গা ভাসিয়ে দিত। কিন্তু তা হয় না। টাকা দিয়ে তারা অসুখ কেনে, তখন আসে ডাক্তারবদ্যি, ওষুধ পত্তর। হয়ত রোগ সারে কিন্তু সুখ আসে না।

তরুণ রায় (ধনঞ্জয় বৈরাগী) ঃ আর হবে না দেরী

সুখের কথা বলো না আর, বুঝেছি সুখ কেবল ফাঁকি,
দুঃখে আছি, আছি ভাল; দুঃখেই আমি ভাল থাকি।
দুঃখ আমার প্রাণের সখা, সুখ দিয়ে যান চোখের দেখা,
দুদণ্ডের হাসি হেসে, মৌখিক ভদ্রতা রাখি।.....
চোখে বারি দেখলে পরে, সুখ চলে যান বিরাগ ভরে ;
দুঃখ তখন কোলে ধরে আদর করে মুছায় আঁখি।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ সুখের কথা বলো না আর (গান)

পরকে সুখী করেই প্রকৃত সুখ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ মেবার-পতন

অজস্র কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ভগবান একটি পরিপূর্ণ সুখী মানুষ তৈরি করতে পারেন নি। জীবনের একদিকে যার আলোয় ভরে গেছে, সাফল্যে ঝলমল করে উঠেছে, তারই জীবনের আর এক দিকে নিশ্চয়ই অন্ধকারের রাজত্ব।

নিমাই ভট্টাচার্য ঃ ডিপ্লোম্যাট

সকল সুখেরই সীমা আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র ঃ বিষবৃক্ষ

ঈশ্বরহীন এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষই স্বভাবে স্বতন্ত্র। তবু মানুষ নিঃসংশয়ে জানে একাকীর সুখ নেই। 'সুখ জনতার মাঝে'। আপন মুদ্রাদোষে শুধু নয়, সামাজিক ও আর্থিক কারণে প্রতিটি মানুষ বিচ্ছিন্নতার নির্জন দ্বীপে নির্বাসিত, যদি না বৃহত্তর সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের অমোঘ আকর্ষণে কেউ সাড়া দিতে পারে।

বিমল কুমার মুখোপাধ্যায় ঃ ঈশ্বরহীন পৃথিবী 'তবুও মানুষ বাঁচে'

মোহর এক জিনিষ, মনের সুখ আর এক জিনিষ।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ঃ তোতারাম

সুদূর

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসি।.....
আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী।
রৌদ্রমাখানো অলস বেলায়
তরুমর্মরে, ছায়ায় খেলায়,
কী মুরতি তব নীলাকাশশায়ী নয়নে উঠে গো আভাসি।
হে সুদূর আমি উদাসী।
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর, তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি—
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার, সে কথা যে যাই পাসরি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আমি চঞ্চল হে (গীতবিতান)

সুধাংশু

আবার গগনে কোন সুধাংশু উদয় রে!
কাঁদাইতে অভাগারে কেন হেন বারে বারে,
গগন-মাঝারে শশী আসি দেখা দেয় রে।
তারে যে পাবার নয়, তবু কেন মনে হয়,
জ্বলিল যে শোকানল, কেমন নিবাই রে!
আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ হতাশার আক্ষেপ

সুন্দর

যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধরে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে দূরে থাকেন—একথা একেবারেই বলা চললো না।......কালো দিয়ে যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এই যে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সুন্দর

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপরে জ্ঞানাঞ্জন শলাকা ঘষে ঘষে ক্ষইয়ে ফেললেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোনো গুরুর উপদেশ পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়নরঞ্জনকে চিনে গেলো।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সুন্দর

পরম সুন্দর যিনি তিনি লুকোচুরি খেলতে জানেন, তাই নিজে লুকিয়ে থেকে বাতাসের মধ্য দিয়ে তাঁর একটু রূপের পরিমল, আলোর মধ্য দিয়ে চকিতের মতো দেখা ইত্যাদি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আর্টিস্টদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান, আর্টিস্টের মনও সেইজন্যে এই খেলাতে সাড়া দেয়, খেলা চলেও সেইজন্যে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৌন্দর্যের সন্ধান

সুন্দর সব সময়ে সুখও দেয় না কাজও দেয় না—বিদ্যুৎশিখার মতো বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন বিদ্রুত বিষম এবং বিচিত্র আবির্ভাব সুন্দরের।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৌন্দর্যের সন্ধান

সুন্দর এই কথাই তো বলছে আমাদের—আমি এ নই তা নই, এজন্যে সুন্দর, ওজনে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সৌন্দর্যের সন্ধান

আমি যার নূপুরের ছন্দ বেণুকার সুর—কে সেই সুন্দর কে।
আমি যার বিলাস-যমুনা, বিরহ-বিধুর—কে সেই সুন্দর কে॥

কাজী নজরুল ইসলাম : কাব্য-গীতি

তুমি সুন্দর তাই চেয়ে থাকি প্রিয়, সে কি মোর অপরাধ?
চাঁদেরে হেরিয়া কাঁদে চকোরিণী, বলে না ত কিছু চাঁদ॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান—বুলবুল ২য়

সুন্দর অতিথি, এস এস কুসুম-ঝরা বন-পথে।
তোমার আশায় মুকুলগুলি চেয়ে আছে প্রভাত হতে॥

কাজী নজরুল ইসলাম : গান—বন-গীতি

আমি সুন্দরের হাতে বীণা, পায়ে পদ্মফুলই দেখিনি, তাঁর চোখে চোখ-ভরা জলও দেখেছি। শ্মশানের পথে, গোরস্তানের পথে, তাঁকে ক্ষুধাদীর্ণ মূর্তিতে, ব্যথিত পায়ে চলে যেতে দেখেছি। যুদ্ধ ভূমিতে তাঁকে দেখেছি, কারাগারের অন্ধকূপে তাঁকে দেখেছি, ফাঁসির মঞ্চে তাঁকে দেখেছি, আমার গান সেই সুন্দরকে রূপে-রূপে অপরূপ করে দেখার স্তবস্তুতি।'

কাজী নজরুল ইসলাম : প্রতিভাষণ (১৫.১২.১৯৩৯)

সুন্দর যে সে আরও সুন্দর দেখানোর জন্য সাজে। আর অসুন্দর যে, সে নিজেকে সুন্দর করে তোলার জন্য সাজে।

বিনতা রায়চৌধুরী : আকাশের রঙ নীল

সুন্দর? একদিন সুন্দরকে নিয়ে খেলতে গিয়েছিলুম, খেলা ভাঙল যেদিন, বুক ফেটে গেল, সেই দিন বুঝলুম সুন্দর কাকে বলে। একদিন তাকে ভয়ংকর বলে ভয় পেয়েছি, আজ তাকে ভয়ংকর বলে আনন্দ করি—তাকে বলি তুমি ঝড়, তাকে বলি তুমি দুঃখ, তাকে বলি তুমি মরণ, সব শেষে বলি আনন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন ১

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অশ্রু (মহুয়া)

ভ্রষ্ট যেই, ভগ্ন যেই, বিরূপ বিকৃত,
তারি লাগি সুন্দরের হাতের অমৃত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আরোগ্য ২৩

যদি তাকিয়ে দেখ তবে দেখবে সব সুন্দরই দুঃখের শোভায় সুন্দর।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ঋণশোধ

ওগো সুন্দর, একদা কী জানি কোন পুণ্যের ফলে
আমি বনফুল তোমার মালায় ছিলাম তোমার গলে॥
তখন প্রভাতে প্রথম তরুণ আলো
ঘুম-ভাঙা চোখে ধরার লেগেছে ভালো,
বিভাসে ললিতে নবীনের বীণা বেজেছে জলে স্থলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতবিতান)

ওহে সুন্দর মরি মরি
তোমায় কি দিয়ে বরণ করি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান (গীতপঞ্চাশিকা)

সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে
অরুণ-বরণ পারিজাত লয়ে হাতে।
নিদ্রিত পুরী, পথিক ছিল না পথে
একা চলি গেলে তোমার সোনার রথে,
বারেক থামিয়া মোর বাতায়ন পথে
চেয়েছিলে তব করুণ নয়নপাতে।
সুন্দর, তুমি এসেছিলে আজ প্রাতে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতাঞ্জলি

যে-জিনিস যথার্থ সুন্দর তার চারিদিকে মস্ত একটি বিরলতার অবকাশ থাকা চাই। ভালো জিনিসগুলিকে ঘেঁসাঘেঁসি করে রাখা তাদের অপমান করা—সে যেন সতী স্ত্রীকে সতীনের ঘর করতে দেওয়ার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জাপান যাত্রী ১৩

কুশ্রীর আত্মত্যাগে সুন্দরের সার্থকতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শাপমোচন (পুনশ্চ)

সুন্দরের জবাব সুন্দরই পায়, অসুন্দর যখন জবাব ছিনিয়ে নিতে চায়, বীণার তার বাজে না, ছিঁড়ে যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

মর্ত্যের অভিশাপে স্বর্গের করুণা যখন নামে তখনি তো সুন্দরের আবির্ভাব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শাপমোচন

সুন্দরের বন্ধন নিষ্ঠুরের হাতে ঘুচাবে কে।
নিঃসহায়ের অশ্রুবারি পীড়িতের চক্ষে মুছাবে কে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শ্যামা

লোকে তো জানে না কিছু, জানুক না, টেনে নিক পাপ,
ঝরে যায় নীল স্রোত, গাঢ় খাদে করুণার টান,
যদি বা নিজেরই ছায়া হঠাৎ জড়িয়ে ধরে বলে ঃ
'তুমি কি সুন্দর নও? বেঁচে আছো কেন পৃথিবীতে'?

শঙ্খ ঘোষ ঃ সুন্দর

তুমি সুন্দর তোমার মতই।

শৈলেন্দ্রনাথ বসু ঃ পালকের উজ্জ্বলতা

সুফি, সুফিবাদ

সুফিবাদ সম্পর্কে ইউরোপে প্রচণ্ড গবেষণা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। পণ্ডিতরা বিশ্বের তাবৎ দেশের প্রাচীন দর্শনভাবনা, অকাল্ট বা গুপ্তবিদ্যা, ভারতীয় বেদান্ত, ভক্তিবাদ, যোগ, তন্ত্রসাধনার মধ্যেও সুফিবাদ আবিষ্কার করেছেন। এমনকি শেক্সপীয়ার, ফ্রয়েড, যুং, চসার, দান্তে, হ্যানস অ্যান্ডারসন—সবেতেই সুফিতত্ত্বের নির্যাস খুঁজে পেয়েছেন। পাওয়ারই কথা। কারণ সুফিবাদের মূলে আছে মানুষের হাজার-হাজার বছরের পুরোনো একটা মৌলিক প্রশ্ন, যে-প্রশ্নে মানুষ নিরন্তর জর্জরিত—আমি কে? সুফিবাদী ওমরের কবিতায় আছে ঃ "প্রতিটি চক্রান্ত আমাকে ঘিরে—আমি তো আমারই। আমি যা, আমি তাই।" এই মৌলিক প্রশ্নেরই আরেকটি সাফ-সাফ জবাব রবীন্দ্রনাথে পাই ঃ "আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ।" আমি আছি, তাই বিশ্বজগৎ আছে। যা কিছু ঘটছে, তা আমাকে কেন্দ্র করে। অদ্বৈতবাদী দর্শনে তারই এক চরম উচ্চারণ ঃ "সোঽহম্"। এবং সুফি মনসুর হাল্লাজের মৃত্যুকালীন উক্তিতে তারই অবিকল প্রতিধ্বনি "আনাল্ল হক"। আমিই সত্য, আমিই ঈশ্বর। সুফি দার্শনিক ইবনে-আল-ফরিদ বলেছিলেন ঃ "দ্রাক্ষালতা সৃষ্টিরও আগে আমি দ্রাক্ষারস পান করেছি।" আমি—এই সত্তাকে শাশ্বত সত্যের প্রতীক করে তোলাই সুফিবাদের লক্ষ্য। কখনো সুফিদের দর্শনচিন্তায় 'আমি' উপনিষদের সেই পরমাত্মা জীবাত্মা এই মানবজীবন—দেশকালে বিধৃত এবং ঐতিহাসিক দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ওমর খৈয়ামের সাকি সে।

'সুফি' শব্দের উৎস বা ব্যুৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মতভেদ। কেউ বলেন, সুফিবাদের জন্ম ইসলাম প্রবর্তক হজরত মহম্মদের সমকালেই। ইসলামী অধ্যাত্মচিন্তার মধ্যে তার বীজ ছিল নিহিত। তাঁদের মতে, 'আসহাব-উস-সাফা' (Companions of the Bench বা সোজা কথায় সভাসদ্‌বর্গ) থেকে সুফি শব্দের জন্ম। হজরতের প্রায় সমকালীন সাধক হাসান বসরির অদ্বৈতবাদী ভাবনায় এর পরোক্ষ প্রমাণ মেলে। আবার কেউ বলেছেন, সুফ অর্থাৎ পশম থেকে সুফি। খ্রীস্টান সাধুরা মোটা পশমের আলখাল্লা পরতেন। মুসলিম সাধুরাও দেখাদেখি সুফের আলখাল্লা পরেন এবং তার ফলে সুফি আখ্যা পান।

আধুনিক পণ্ডিতরা কিন্তু 'সুফি'র উৎস সম্পর্কে অত্যন্ত যুক্তিবাদী অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন দুটি দিকে। একটি হলো সুপ্রাচীন গ্রীক দার্শনিক সফিস্টরা—Sophia বা Sophos (ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা) থেকে যে-সফিজমের উদ্ভব, তার প্রবক্তা ছিলেন তাঁরা। ঠাট্টা করে এদের বলা হয় তর্কবিলাসী। দ্বিতীয় উৎসটি হলো হিব্রু কাব্বালীয় তন্ত্রের Ain Sof—অর্থাৎ পরম অসীম। কাব্বালা-তন্ত্রের অনুগামীরা মনে করতেন, বাইবেলের বাক্যসমূহের অন্তর্নিহিত অন্য গোপন অর্থ আছে এবং সাধনায় সে অর্থ লভ্য। আশ্চর্য ব্যাপার, সুফিদেরও ধারণা কোরানের বাক্যসমূহেরও গভীরতর গোপন অর্থ আছে, যা সাধকদেরই লব্ধ।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ঃ সুফিদর্শন প্রসঙ্গে (উদ্বোধন ৮৫।৯)

গ্রীক Sophos—যা থেকে থিওসফি কথাটার উদ্ভব, 'সুফি' শব্দের জনক হওয়ার মধ্যে যুক্তি আছে। সফিস্টদের আচার-আচরণ এবং চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে প্রথম যুগের সুফিদের অসামান্য মিল দেখা যাবে। (ফিলসফার শব্দের উৎসেও ওই Sophos।)

তাঁরা গ্রীক দার্শনিকদের মতোই পথে-ঘাটে তত্ত্ব প্রচার করতেন। সুফিদের চিন্তাধারায় যে বিশ্বব্যাপী উপাদান সংগ্রহের নজির ছড়িয়ে আছে, তাতে ভুল নেই। সুফিরাই কেউ কেউ গ্রীক পিথাগোরাস এবং কিংবদন্তীখ্যাত সম্রাট সলোমন বা সোলেমান (বাইবেল ও কোরানে যাঁর কথা আছে)-কে গুরু বলেছেন। মোগল যুগে দারা শিকোহ্‌কে দেখা যাবে হিন্দু গুরুর কাছে বেদান্ত শিখতে। কারণ সুফিবাদে বেদান্তের প্রতিধ্বনি আছে এবং দারা ছিলেন সুফি মতবাদের অনুগামী। আবার সুফিগুরুদের অ-মুসলিম শিষ্যও কম ছিলেন না। রুমির শিষ্যরা কেউ ছিলেন খ্রীস্টান, কেউ জোরাস্ট্রিয়ান (জরথুষ্ট্রবাদী), কেউ ইহুদি। কিংবদন্তীখ্যাত খিজির, সুফিদের এক গুরু, ইহুদি ছিলেন বলে শোনা যায়। সুফি 'সোঽহং' বাদের প্রবক্তা মনসুর হাল্লাজ নিজেকে অনেকসময় খ্রিস্টান বলতেন। সুফিদের একটি গোষ্ঠীকে বলা হয় Spanish School এবং তাঁরা সবাই মুসলিম ছিলেন না। যেমন জুডা হালেভি, মোজেস বেন এজরা, যোশেফ বেন যাদিক, স্যামুয়েল বেন টিব্বন, সিমটব বেন ফালাকেরা। এঁরা ইহুদি এবং সুফিবাদী চিন্তাধারার প্রবক্তা ছিলেন। কাব্বালীয় তন্ত্র থেকে সুফিবাদে ঝুঁকেছিলেন।

সুফি আল-গজ্জালীর চিন্তাধারায় পণ্ডিতরা প্রতীক ব্যাখ্যায় ফ্রয়েডীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। কার্ল গুস্তাফ য়ুংয়ের 'আদিপ্রতিমা' (Archetype) তত্ত্বের প্রতিচ্ছবিও সুফিবাদে দেখা গেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : সুফিদর্শন প্রসঙ্গে (উদ্বোধন ৮৫।৯)

সুর

সুরে ও বাণীর মালা দিয়ে তুমি আমারে ছুঁইয়াছিলে।
অনুরাগ-কুমকুম দিলে দেহে, মনে বুকে প্রেম কেন নাহি দিলে?

কাজী নজরুল ইসলাম : গান (কাব্য-গীতি)

সঙ্গীতের একমাত্র ভাষা হচ্ছে সুর—কথা নয়। **প্রমথ চৌধুরী** : বীণাবাই

সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা—
মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা॥
মন্দাকিনীর ধারা, উষার শুকতারা,
কনকচাঁপার কানে কানে যে সুর পেল শিক্ষা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে
মোর প্রাণে
এ আগুন ছড়িয়ে গেল
সবখানে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতিমাল্য-৮৯

কথার মধ্যে যেখানে একটু হৃদয়াবেগের সঞ্চার হয় সেখানে আপনিই কিছু না কিছু সুর লাগিয়া যায়। বস্তুত রাগ দুঃখ আনন্দ বিস্ময় আমরা কেবলমাত্র কথা দিয়া প্রকাশ করি না, কথার সঙ্গে সুর থাকে। এই কথাবার্তার আনুষঙ্গিক সুরটারই উৎকর্ষসাধন করিয়া মানুষ সংগীত পাইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জীবনস্মৃতি—বাল্মীকি প্রতিভা

যে সুর অসীম হইতে বাহির হইয়া সীমার দিকে আসিতেছে তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, তাহাই নিয়মে বাধা, আকারে নির্দিষ্ট ; তাহারই যে প্রতিধ্বনি সীমা হইতে

অসীমের দিকে পুনশ্চ ফিরিয়া যাইতেছে তাহাই সৌন্দর্য তাহাই আনন্দ। তাহাকে ধরাছোঁয়ার মধ্যে আনা অসম্ভব, তাই সে এমন করিয়া ঘরছাড়া করিয়া দেয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি—প্রভাতসঙ্গীত

সুররিয়ালিজম/সুররিয়ালিস্ট

অবচেতন মানসের চিন্তালোকের যথার্থ উন্মোচনই হলো সুররিয়ালিজমের যথার্থ কর্ম।......নিজের মগ্ন চৈতন্যে ডুব দিয়ে অবচেতন মনের রহস্য উদ্ধার করার ব্যাপারটাই অধিবাস্তবতা।

শুদ্ধসত্ত্ব বসু ঃ বাংলা সাহিত্যের নানারূপ

সুররিয়ালিজমের মূল বক্তব্য, কবিকে হতে হবে স্রষ্টা, সে শুধু ভবিষ্যৎ দেখবে না—দেখবে নিজের অন্তঃকরণ, ছায়া, মগ্নচৈতন্য—হৃদয় খুঁড়ে জাগাবে বেদনা, স্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন, ললাটলিপির মতো যুক্তিহীনতা।......

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ অন্য দেশের কবিতা

কবিতার মুক্তি অলৌকিকে, রহস্যে, স্বপ্নের মত আপাত যুক্তিহীনতায়। সুররিয়ালিস্টরা এই জন্য আক্রমণ করেছিলেন ধর্মকে (খৃষ্টধর্ম)—নিৎসের 'ঈশ্বরের মৃত্যু' ও ঠাট্টা করে উড়িয়ে দিলেন—কারণ ঈশ্বরের মৃত্যু মানতে হলে—ঈশ্বরের অস্তিত্বও মানতে হয়, নচেৎ যা ছিলই না তার মৃত্যু হয় কি করে।.....সুররিয়ালিস্টের দল প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠা করলেন রহস্যের, স্বপ্নের, আলোছায়ার (যার প্রভাবে পাশ্চাত্যের বহু লেখক ঝুঁকেছেন হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে)—এবং ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলেন সাহিত্যের তথাকথিত বাস্তবকে এবং শুধু কবিতায় নয়—এই রহস্যময়তা ছড়িয়ে গেল চিত্রশিল্পে, ফিল্মে, নাটকে—সুররিয়ালিস্টদের অন্যতম প্রধান আন্টোনিন আর্তো আজ পৃথিবীর আধুনিক নাট্যকারদের—ব্রেখট, বেকেট, আয়োনেস্কো, জেনে—এঁদের পূর্বপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ অন্য দেশের কবিতা

সূর্য

দেখলাম দু-চক্ষু ভরে হে প্রভু ঈশ্বরমহাশয়
চৈতন্যে প্রসন্ন সূর্য,
খচিত রাত্রির দেয়া গান
রেডিও নক্ষত্রে বাজলো এই দেহে ঝিমঝিম দূরে
শিরায় জড়ানো নহবৎ।

অমিয় চক্রবর্তী ঃ এপারে

রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য
আমাকে নির্দেশ দিয়েছে ;
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের
আর্তনাদে উৎসব শুরু করে দিয়েছে।
হায়, উৎসব!
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি।

জীবনানন্দ দাশ ঃ অন্ধকার (বনলতা সেন)

মধ্যাহ্নসূর্যের কেউ সঙ্গী আছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রক্তকরবী

হে সূর্য
তুমি আমাদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে
উত্তাপ আর আলো দিও,
আর উত্তাপ দিও
রাস্তার ধারের ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ প্রার্থী (ছাড়পত্র)

সূর্যাস্ত

শরৎকালের পশ্চিম আকাশে
সূর্যাস্তের ক্ষণিক সমারোহে
রঙের সঙ্গে রঙের ঠেলাঠেলি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খোয়াই (পুনশ্চ)

সূর্যোদয়

ফুরিয়ে যেতে তো আসিনি—
যতবারই সূর্য অস্ত যাক না কেন
আমার সামনে সব সময়েই সূর্যোদয়।

নীলাঞ্জন কুমার ঃ কয়েকটি-১

রক্তিম আকাশে
আসন্ন অরণ্যগাথা নব সূর্যোদয় আশে
রয়েছে স্তম্ভিত,
পিঙ্গল আভায় দীপ্ত জটা বিলম্বিত
অরুণ সন্ন্যাসী
করযোড়ে আছে স্থির আলোকপ্রত্যাশী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হীনা (মহুয়া)

আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে—
মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে
আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে (দোলন চাঁপা)

সৃষ্টি

তোমার সৃষ্টি কত সুন্দর, কত সে মহৎ, পিতা!
সৃষ্টি-শিয়রে বসে কাঁদ তুমি জননীর মত ভীতা!

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ ফরিয়াদ (সর্বহারা)

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি চিরদিনই বেদনা সম্ভব।

চিত্তরঞ্জন মাইতি ঃ সত্যবতীর শাখা-প্রশাখা

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা ; আমাদেরি আন্তরিকতাতে
আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্ণার জলে দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হয়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়।

জীবনানন্দ দাশ ঃ ১৯৪৬-৪৭

সৃষ্টির প্রথম লক্ষণ অনন্যতা। যার জোড়া পৃথিবীতে কোথাও নেই, যা থাকে কেবল স্রষ্টার মানস লোকে, তা যখন প্রকাশিত হয় তখনই তাকে সৃষ্টি বলব। প্রকৃতির সৃষ্টিতেও এই। প্রকৃতির প্রতিটি সৃষ্টি অনন্য।

বনফুল : আর্ট (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

সৃষ্টির রহস্যটা সত্যিই এখনও রহস্য।......শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় স্রষ্টা যখন উদ্বুদ্ধ হন, তখন তিনি এমন একটা জগতে গিয়ে উত্তীর্ণ হন, যা সামাজিক পাপপুণ্য ভালোমন্দের অনেক ঊর্ধ্বে, যে লোকে তিনি নিজের বিশিষ্ট প্রতিভার আলোকে নিজের কল্পনাকে প্রত্যক্ষ করেন, যে লোকের নাম আনন্দলোক সত্যলোক।

বনফুল : আর্ট (প্রবন্ধ সংগ্রহ)

সৃষ্টিতে তব আনন্দ আছে
    মমত্ব নাই তবু,
ভাঙায় গড়ায় সমান তোমার লীলা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নমস্কার (বীথিকা)

মেয়েদের সৃষ্টির আলো......প্রেম, পুরুষের সৃষ্টির আলো কল্পনাবৃত্তি।......নারীর সৃষ্টি ঘরে, এইজন্যে সব কিছুকেই সে যত্ন করে জমিয়ে রাখতে পারে ; তার ধৈর্য বেশি কেননা তার ধারণার জায়গাটা বড়ো। পুরুষের সৃষ্টি পথে পথে, এইজন্যে সব-কিছুর ভার লাঘব করে দিয়ে সমগ্রকে সে পেতে ও রাখতে চায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি ৩০.৯.১৯২৪)

মানুষ নির্মাণ করে প্রয়োজনে, সৃষ্টি করে আনন্দে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলাভাষা পরিচয়-৫

আলো যবে ভালোবেসে মালা দেয় আঁধারের গলে.
    সৃষ্টি তারে বলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে সংকেত এল,
"খোলো আবরণ"।
বাষ্পের যবনিকা গেল উঠে,
রূপের নটীরা এল বাহির হয়ে ;
ইন্দ্রের সহস্র চক্ষু, তিনি দেখলেন।
তাঁর দেখা আর তাঁর সৃষ্টি একই।
চিত্রকর তিনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ সপ্তক-২

সেকাল

হায় রে সেকাল, হায় রে
    কখন চলে যায় রে—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নূতন (পরিশেষ-সংযোজন)

তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সম্পত্তি-সমর্পণ

সেঁজুতি

অগ্রাণ মাসে অনুষ্ঠেয় 'সেঁজুতি' কুমারী মেয়েদের ব্রত। ভালো স্বামী, পার্থিব সুখ-সম্পদ, আদর্শ সন্তান ইত্যাদির কামনায় এ ব্রত পালিত হয়।......পিটুলির বালা,

পিটুলির রান্নাঘর, পিটুলির গোহাল ইত্যাদি এঁকে তার উপর ফুল ধরে ব্রতিনী.....কামনা জানায়।

আমি পূজা করি পিটুলির বালা। আমার যেন হয় সোনার বালা॥ আমি পূজা করি পিটুলির রান্নাঘর। আমার যেন হয় কোঠার রান্নাঘর॥ আমি পূজা করি পিটুলির গোহাল। আমার যেন হয় কোঠার গোহাল॥

মানস মজুমদার : লোক ঐতিহ্যের দর্পণে

সেবা

পরের সেবা করা শুভকর্ম। এই শুভকর্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সবার ভেতরে যে শিব রয়েছে তিনি প্রকাশিত হন।

বিবেকানন্দ : রচনাবলী

পিতার ধৈর্য মানব—সেবা করব প্রতিদিন,
মাতার স্নেহ বিশ্বে দিয়ে শুধব মাতৃঋণ।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : সেবা-সাম (বিদায় আরতি)

সোজা

কোনো মানুষই সোজা নয়,
তাই বোঝা শক্ত।

সোজা কিছুই চোখে পড়ছে না।

জগন্নাথ চক্রবর্তী : সরলরেখার জন্য

সোজা লাইনটা মানুষের হাতের কাজের। তার ঘরের দেওয়ালে, তার কারখানা ঘরের চিমনিতে মানুষের জয়স্তম্ভ একেবারে সোজা খাড়া। বাঁকা রেখা জীবনের রেখা, মানুষ সহজে তাহাকে আয়ত্ত করতে পারে না। সোজা রেখা জড় রেখা, সে সহজেই মানুষ শাসন মানে ; সে মানুষের বোঝা বয়, মানুষের অত্যাচার সয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : জাপানযাত্রী-৬

তোমার আমার এই-যে প্রণয় নিতান্তই এ সোজাসুজি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সোজাসুজি (ক্ষণিকা)

সৌন্দর্য

সৌন্দর্য বস্তুটা তো কেবলমাত্র বাইরের ছাঁচের মধ্যেই আবদ্ধ নয়।

আশাপূর্ণা দেবী : মলাটের মুখ

সৌন্দর্যে পুণ্যের বাস।

কামিনী রায় : শাজাহান

সৌরভ

সমস্ত দিন তোমার সৌরভ আমায় ঘিরে আছে ;.....
গহন বনের অন্ধকারে—
　　চকিত মৃগ ঘুরে বেড়ায়,
　　তারি কস্তুরির সুবাস,
　　—পেলাম তোমার পরম রহস্যের সৌরভ! ......
　　তোমার সৌরভ
আমায় নিয়ে যাক সেই শূন্যতায়,
　　যেখানে পথ আর কোনো দিকে নেই।

যেখানে পরম নিষ্ফলতার
তীব্র মধুর হতাশা।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ সৌরভ

স্কুল/ইস্কুল

ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটের সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাষ্টার কলও তখন মুখ বন্ধ করেন ; ছাত্ররা দুই চার পাত কলে-ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যার যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শিক্ষা সমস্যা

স্টাইল

বক্তার নিজস্ব ব্যক্তিত্বের দ্বারা চিহ্নিত বাচন-ভঙ্গির বৈশিষ্ট্যকেই বলি 'স্টাইল'।

ভূদেব চৌধুরী ঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (২য়)

স্টার

স্টার মাত্রেই বড় অভিনেতা নন, আবার বড় অভিনেতা মাত্রেই স্টার নন। কখনো কখনো দুয়ের সংযোগও যে ঘটে না তাও নয়।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত ঃ বই নয় ছবি

স্ট্রিম অব্ কনশাস্নেস মেথড (দ্র. চেতনাস্রোত)

স্তালিন

স্তালিন জীবন হোক। আজ থেকে
মৃত্যুহীন জীবনের,
নাম হোক
কমরেড স্তালিন॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ কমরেড স্তালিন (ফুল ফুটুক)

স্ত্রী

যারা বোকা ; তারাই স্ত্রীকে টাকা পয়সা সব তুলে দেয়। মেয়েদের হাতের মুঠোয় রাখার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে, তার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া।

কণা বসুমিশ্র ঃ যজ্ঞশালা (বন্ধ দরজা)

স্ত্রী? সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্যায় দাসী।.....সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে কর্ম, কণ্ঠে অলংকার। আমার নয়নের তারা হৃদয়ে শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্বস্ব। আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিঃশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিষবৃক্ষ

পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল
—বলে সর্ব্বশাস্ত্রী।

কুমীর ধর্ম্মে ছাড়ে তবু
ধর্ম্মে ছাড়ে না স্ত্রী।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ হাসির গান

যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

হিন্দুধর্ম বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষ্মীরূপা মনে করিবে।......যেখানে স্ত্রী স্নেহে, ধর্মে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ সেখানে তাঁহারও স্বামীর ভক্তির পাত্র হওয়া উচিত বটে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ ধর্মতত্ত্ব

মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট—ইহাই সাম্যনীতি।......স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী। যে যে কার্য্যে পুরুষের অধিকার আছে। স্ত্রীগণেরও সেই সেই কার্য্যে অধিকার থাকা ন্যায়সঙ্গত।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ সাম্য

মাতাল বর নিয়ে ঘর করা যায়, কলহ করা যায় অন্যানুরাগী স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু উদাসীন ব্যক্তির স্ত্রী হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য নেই জগতে। প্রেম ভালো, বিদ্বেষ দুঃখের, কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক ইন্ডিফারেন্স—যে কাছেও টানে না, দূরেও ঠেলে না—শুধু ভুলে থাকে।

যাযাবর ঃ দৃষ্টিপাত

নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বীরত্ব করে লাভ কী। আঘাত করলেও কষ্ট। আঘাত পেলেও কষ্ট। তার চেয়ে তর্কের বেলায় গৃহিণীর মতকে সম্পূর্ণ অকাট্য বলে স্বীকার করে কাজের বেলায় নিজের মত চালানোই সৎপরামর্শ—গোয়ার্তুমি করতে গেলেই মুশকিল বাধে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কর্মফল

যে ভাল স্ত্রী বিদ্যাশক্তি, তার কাম ক্রোধ এসব কম, ঘুম কম ; ......যে বিদ্যাশক্তি তার স্নেহ দয়া ভক্তি লজ্জা এই সব থাকে। সে সকলেরই সেবা করে বাৎসল্য ভাবে, আর স্বামীর যাতে ভগবানে ভক্তি হয় তার সাহায্য করে। বেশী খরচ করে না, পাছে স্বামীর বেশী খাটতে হয়, পাছে ঈশ্বর চিন্তার অবসর না হয়।

রামকৃষ্ণ পরমহংস ঃ রামকৃষ্ণকথামৃত

কাহারো বা স্ত্রী দাসী, কাহারো বা বন্ধু, কাহারো বা প্রভু।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ চন্দ্রনাথ

তাঁহার স্ত্রী প্রথম শ্রেণীর ট্রামের পশ্চাতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রামের মতো সর্বদা স্বামীর অনুগামিনী ছিলেন।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ নিশীথে

স্ত্রীজাতি

স্ত্রীজাতি অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সামাজিক নিয়ম দোষে পুরুষজাতির নিতান্ত অধীন। এই দুর্বলতা ও অধীনতা নিবন্ধন, তাঁহারা পুরুষজাতির নিকট অবনত ও অপদস্থ হইয়া কালহরণ করিতেছেন। প্রভুতাপন্ন প্রবল পুরুষজাতি, যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, অত্যাচার ও অন্যায়াচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, এই সমস্ত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা সমাধান করেন। পৃথিবীর প্রায় সর্ব প্রদেশেই স্ত্রীজাতির ঈদৃশী অবস্থা। কিন্তু, এই হতভাগ্য দেশে পুরুষজাতির নৃশংসতা, স্বার্থপরতা, অবিমৃশ্যকারিতা প্রভৃতি দোষের আতিশয্যবশতঃ, স্ত্রীজাতির যে অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা অন্যত্র কুত্রাপি লক্ষিত হয় না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঃ বহুবিবাহ

তোমরা মনে কর, পতিবিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায় ; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না ; যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না ; দুর্জয় রিপুবর্গ এককালে নির্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।......এই অনবধানদোষে সংসারতরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়!

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : বিধবাবিবাহ—দ্বিতীয় পুস্তক

স্ত্রীলোক

স্ত্রীলোক বলকে ভক্তি করে, কিন্তু ভালোবাসে দুর্বলকে।

প্রমথ চৌধুরী : ছোটো গল্প

আমরা স্ত্রীলোককে নীচ, অধম, মহা হেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল আমরা পশু, দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র।

বিবেকানন্দ : বাণী ও রচনা (৬)

যেখানে স্ত্রীলোকের আদর নেই, স্ত্রীলোকেরা নিরানন্দে অবস্থান করে, সে সংসারের সে দেশের কখন উন্নতির আশা নেই।

বিবেকানন্দ : রচনাবলী

যত স্ত্রীলোক, সকলে শক্তিরূপা। সেই আদ্যাশক্তিই স্ত্রী হয়ে, স্ত্রীরূপ ধরে রয়েছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

যিনি জগতের মা, তিনিই এই মায়ার রূপ—স্ত্রীলোকের রূপ ধরেছেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংস : রামকৃষ্ণকথামৃত

স্ত্রৈণ

স্ত্রৈণতাও সংসারযাত্রার একটি মার্গ। জগতে কর্তাভজা বিস্তর আছে, তারা বিচারের ভার কর্তার ওপর ছেড়ে দিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্ত হয়ে থাকে।......তেমনি গিন্নীভজাও অনেক আছে। তারা বলে, আমার মতামতের দরকার কি, যা করেন গিন্নী।

পরশুরাম (রাজশেখর বসু) : অক্রূর সংবাদ

স্পনসর

গগাঁ, সেঁজান, ভ্যান গগ কোনদিন স্পনসরের পেছনে দৌড়ননি বলেই কালজয়ী শিল্পী হতে পেরেছিলেন। **অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল :** সন্ন্যাসি

স্বগুণ

স্বগুণ-কীর্তন—আত্মহত্যা
হতে ভিন্ন নহে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ : নর-নারায়ণ

স্বজন

শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা।

মধুসূদন দত্ত : মেঘনাদবধ কাব্য (৬)

স্বজাতি

স্বজাতির উপর পীড়ন করে হিন্দুর যত আনন্দ, এত আনন্দ তার আর কিছুতে নয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় : মেবার পতন

স্বপ্ন

যৌবন উত্তীর্ণ হলে স্বপ্ন মরে যায় না কি? স্বপ্ন মরে? স্বপ্ন তো মরে না
যার স্বপ্ন মরে যায় রাজলক্ষ্মী চলে যায় তার দেহশরীর বা সিংহাসন ছেড়ে
ইচ্ছে মরে যায় যার দুর্গন্ধ ছড়ায় তার শরীর। শরীর! তুমি আস্ফালন করো।
কিছুই যায় না, থাকে, জ্বলে ওঠে অনুকূল হাওয়ায় বৃষ্টির ছাটে প্রাণ জেগে ওঠে
মুমূর্ষু সাপের মতো শেষবার অক্সিজেন টেনে নিয়ে ফুঁসে ওঠো তুমি
যৌবন উত্তীর্ণ হলে রেখে যেতে পারো ফল, ফলের নিহিত স্বপ্নকণা।

পবিত্র মুখোপাধ্যায় : যৌবন উত্তীর্ণ হলে

স্বপ্ন আমার কবিতা,
অমাবস্যার দেয়ালি,
ধূম্রলোচন নিদ্রাহীন
মাঘ-রজনীর সবিতা।

বিষ্ণু দে : ক্রেসিডা (চোরাবালি)

আমার চোখে এখন যেহেতু অনেক অন্ধকার, আমাকে
স্বপ্ন দেখা শিখে নিতে হবে।

ভূমেন্দ্র গুহ : স্বপ্ন (ঋতুচক্র)

যদি আমাকে স্বপ্ন দেখাতে পারো
আমি তোমার ক্রীতদাস হয়ে থাকবো।

মৃত্যুঞ্জয় সেন : এ ভব সম্পাদিত সম্পদ

প্রেম এসেছিল নিঃশব্দচরণে।
তাই স্বপ্ন মনে হল তারে—
দিই নি তাহারে আসন।
বিদায় নিল যবে, শব্দ পেয়ে গেনু ধেয়ে।
সে তখন স্বপ্ন কায়াবিহীন
নিশীথতিমিরে বিলীন—
দূরপথে দীপশিখা রক্তিম মরীচিকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

স্বপনপারের ডাক শুনেছি, জেগে তাই তো ভাবি—
কেউ কখনো খুঁজে কি পায় স্বপ্নলোকের চাবি॥.....
খুঁজে যারে বেড়াই গানে প্রাণের গভীর অতল পানে
যেজন গেছে নাবি,
সেই নিয়েছে চুরি করে স্বপ্নলোকের চাবি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

স্বপনে দোঁহে ছিনু কী মোহে, জাগার বেলা হল—
যাবার আগে শেষ কথাটি বোলো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

তুমি এলে
মনে হয় স্বপ্ন বলে
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লজ্জা (সোনার তরী)

অর্থ চাই? রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি—
রাজস্বপ্নে অর্থ নাই যত মাথা খুঁড়ি।
নাই অর্থ, কিন্তু তবু কহি অকপট
শুনিতে কি মিষ্ট আহা—হিং টিং ছট।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিং টিং ছট (সোনার তরী)

স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মস্তিষ্ক বিকার,
এ কথা কেমন করে করিব স্বীকার
জগৎ-বিখ্যাত মোরা, 'ধর্মপ্রাণ' জাতি
স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে!—দুপুরে ডাকাতি!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিং টিং ছট (সোনার তরী)

জগতে সকলই মিথ্যা, সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিং টিং ছট (সোনার তরী)

মানুষ কারও শখের খেলনা নয়। কালের গতির সঙ্গে সব বদলে যায়। সুখের বিষয়, স্বপ্নগুলোকে রেখে যায়।

লীলা মজুমদার ঃ ধূপ

স্বপ্ন তো কখনও মরেনা।

সৌম্যেন্দু ঘোষ ঃ এখনও স্বপ্ন

স্বর্গ

কোথায় স্বর্গ? কোথায় নরক?
        কে বলে তা বহুদূর?
মানুষেরই মাঝে স্বর্গ নরক—
        মানুষেতে সুরাসুর।......
প্রীতি-প্রেমের পুণ্য বাঁধনে
        যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন
        আমাদেরই কুঁড়ে ঘরে।

ফজলুল করিম ঃ স্বর্গ ও নরক

স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিষবৃক্ষ

যারা স্বর্গগত তারা এখনো জানে
স্বর্গের চেয়ে প্রিয় জন্মভূমি
এসো স্বদেশব্রতের মহাদীক্ষা লভি
সেই মৃত্যুঞ্জয়ীদের চরণ চুমি।

মোহিনী চৌধুরী ঃ গান

পৃথিবী দ্রুতবেগে চলেছে কিন্তু স্বর্গ যেমন ছিল তেমনিই রয়েছে, কন্‌সার্ভেটিভ যতদূর হতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অরসিকের স্বর্গপ্রাপ্তি (ব্যঙ্গকৌতুক)

পৃথিবীতে যেটুকু স্বর্গ আছে সে কেবল রমণীতে বালকে প্রেমিকে ভাবুকে....। পৃথিবী যে পৃথিবীই এ কথা তাহারা অনেক সময় ভুলিয়া যায় বলিয়াই, সেই ভ্রমক্রমেই পৃথিবীতে দেবলোক স্খলিত হইয়া পড়ে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছেলেভুলানো ছড়া (লোকসাহিত্য)

.....স্বর্গলোক আবরণহীন—আয়োজনের দ্বারা সে আপনাকে আচ্ছন্ন করে নাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জীবনস্মৃতি—ঘর ও বাহির

মধুরাতে কত মুগ্ধ হৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ দেহখানি,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পতিতা (কাহিনী)

দিশাহারা মন কাকে জিজ্ঞাসা করছে, "কোথায় স্বর্গের রাস্তা।" আকাশে তার কোনো সাড়া নেই ; কেবল তারায় তারায় বোবা অন্ধকারের চোখের জল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রশ্ন (লিপিকা)

তুমি তো গড়েছ শুধু এ মাটির ধরণী তোমার
মিলাইয়া আলোকে আঁধার।
শূন্যহাতে সেথা মোরে রেখে
হাসিছ আপনি সেই শূন্যের আড়ালে গুপ্ত থেকে।
দিয়েছ আমার 'পরে ভার
তোমার স্বর্গটি রচিবার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা—২৮

বক্ষের নিচোলবাস যায় গড়াগড়ি
ত্যজিয়া যুগল স্বর্গ কঠিন পাষাণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিজয়িনী (চিত্রা)

যেখানে ধরণীর সীমার শেষে
স্বর্গ আসিয়াছে নামি
সেখানে একদিন মিলেছি এসে
কেবল তুমি আর আমি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মিলন (পূরবী)

কুঁড়েমির স্বর্গ সকল স্বর্গের উপরে। সেখানে যে ইন্দ্র বসে অমৃত খাচ্ছেন হাজার চক্ষু আধখানা বুঁজে, তিনি হলেন গল্পের দেবতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সে—৯

পৃথিবী যুগ যুগ ধরে তৈরী হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনও বাকি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৃষ্টির অধিকার (শান্তিনিকেতন)

স্বর্গীয়

চাঁদের পেয়ালা ছাপিয়ে দিয়ে উপচিয়ে পড়েছে
স্বর্গীয় মদের ফেনা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্রপুট—৩

স্বাধীন

পাহাড়ী লয়ে কয়েক শত
পাহাড়ে বনে ফিরিতে রত
মরুভূমির মরীচি-মতো
স্বাধীন ছিল রাজপুত!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মানী (কথা)

স্বাধীন জাত না হইলে স্বাধীনতার কদর বুঝে না।

প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ অন্নসমস্যায় বাঙ্গালীর পরাজয় ও তার প্রতিকার

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?
কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গসুখ তায়।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ পদ্মিনী উপাখ্যান

আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা কিন্তু আসলে, যেটা ইচ্ছে করেছি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিখিলেশের আত্মকথা (ঘরে-বাইরে)

স্বাধীনতার অপব্যয় করিবার যদি অধিকার না থাকে তবে তাহাকে স্বাধীনতাই বলা যায় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতচর্চা (জীবনস্মৃতি)

আমরা বাহিরে আসিয়াছি কিন্তু স্বাধীনতা পাই নাই। ছিলাম খাঁচায়, এখন বসিয়াছি দাঁড়ে—পায়ের শিকল কাটিল না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাহিরে যাত্রা (জীবনস্মৃতি)

স্বাধীনতার বিনিময়ে পরাধীন স্বর্গরাজ্যও দেশের যৌবন শক্তি কোনদিন প্রার্থনা করবে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ তরুণের বিদ্রোহ-১

স্বাধীনতা শুধু কেবল একটা নাম মাত্রই ত নয়। দাতার দক্ষিণ হস্তের দানেই ত একে ভিক্ষার মত পাওয়া যায় না—এর মূল্য দিতে হয়। কিন্তু কোথায় মূল্য? কার কাছে আছে? আছে শুধু যৌবনের রক্তের মধ্যে সঞ্চিত। সে অর্গল যতদিন না মুক্ত হবে, কোথাও এর সন্ধান মিলবে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ তরুণের বিদ্রোহ-১

কল্যাণ আমার কাম্য নয়, আমার কাম্য স্বাধীনতা। প্রতাপ চিতোরকে যখন জনহীন অরণ্যে পরিণত করেছিলেন, তখন সমস্ত মাড়বারে তার চেয়ে অকল্যাণের মূর্তি আর কোথাও ছিল না। সে আজ কত শতাব্দের কথা,—তবু সেই অকল্যাণই আজও সহস্র কল্যাণের চেয়েও বড় হয়ে আছে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পথের দাবী-২৮

স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এরা আরও বড়। এদের একান্ত বিকাশের জন্যই ত স্বাধীনতা, নইলে এর মূল্য ছিল কোথা?

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পথের দাবী-২৬

ওরে দুর্ভাগা দেশের শক্তিহীন নরনারী। ওই অশেষ ঐশ্বর্যময়ী জন্মভূমির প্রতি তোদের অধিকার কিসের? যে ভার যে গৌরব তোরা বহিতে পারিবি না তাহার প্রতি এই ব্যর্থ লোভ তোদের কিসের জন্য? স্বাধীনতার জন্মগত অধিকার আছে কেবল মনুষ্যত্বের, শুধু মানুষ বলিয়াই থাকে না।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ পথের দাবী-৭

দানের মত স্বাধীনতা কোনদিন কাহারও হাত হইতে গ্রহণ করা যায় না, গেলেও তাহা থাকে না, ইহাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জন করিতে হয়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ মহাত্মাজী

তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা, তোমাকে পাওয়ার জন্য
আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায়?
আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন?

শামসুর রাহমান ঃ তোমাকে পাওয়ার জন্যে হে স্বাধীনতা

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান।
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা—।

শামসুর রাহমান ঃ স্বাধীনতা তুমি

স্বাধীনতা......শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় বন্ধনমুক্তি নহে—ইহা অর্থের সমান বিভাগ, জাতিভেদ ও সামাজিক অবিচারের নিয়ন্ত্রণ এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামির বর্জনকেও সূচিত করে।

সুভাষচন্দ্র বসু ঃ স্বাধীনতার অর্থ

কি জানি স্বাধীনতা কিসের জোরে টিকে থাকে? রাইফেলের জোরে না বুকের জোরে।

সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ দেশে বিদেশে

স্বামী

নারীর গৌরব যত স্বামী সব জানে।
কি করিতে পারে পুত্র স্বামীর বিহনে॥.....
সর্ব ধর্ম কর্ম স্বামী নারীর বিধাতা।
কামিনীর স্বামী হয় সুখ-মোক্ষদাতা।
স্বামীসেবা করিবেক যদি হয় সতী।
স্বামী বিনে স্ত্রীলোকের নাহি আর গতি।।

কৃত্তিবাস ঃ রামায়ণ (কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড)

স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে ফাউণ্ডেশনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে সেটা হল পারস্পরিক বিশ্বাস। তা ছাড়া একজনের প্রতি আরেক জনকে সৎ থাকতে হয়।

প্রফুল্ল রায় ঃ রণসজ্জা

কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি, তাহাকে স্বামী বলা যায়।

ক) বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতিকে স্বামী বলা যায় না, কেন না, যদিও সে সকল অস্থাবর সম্পত্তি বটে, তথাপি সচল নহে।

খ) গোরু বাছুরও স্বামী নহে, কেন না, যদিও গোরু বাছুর সচল বটে, কিন্তু তাহাদের একটু স্বেচ্ছামতে কার্য করিবার ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাহারা কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন নহে।

গ) বিবাহিত পুরুষেরাই স্বেচ্ছাধীন কোন কার্য করিতে পারেন না, এজন্য গোরু বাছুরকে স্বামী না বলিয়া তাহাদিগকেই স্বামী বলা যাইতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন

বক্তা স্বামীর চেয়ে শ্রোতা স্বামী ঢের ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৌকাডুবি—২৯

নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চা করিয়া আসিতেছে। যে-স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শতলক্ষ বৎসরের শাণ-দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মণিহারা

সাধারণত স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাল লঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালবাসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মণিহারা

ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মণিহারা

আত্মীয়মহলে স্বামীর ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রাখার জন্যে বিবাহিত বাঙালি মহিলারা কেন যে এত উতলা হয়ে ওঠেন।

শংকর ঃ যাবার বেলায়

মেয়েমানুষ যাহার কাছে গাড়ী পাল্কী চড়িয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, স্বামী হিসাবে তাহাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ গৃহদাহ

ভাই বল আর বাপ-মাই বল, মেয়েমানুষের স্বামীর বড় আর কেউ নয়। ভাই বাপ-মা গেলে দুঃখ কষ্ট খুবই হয়, কিন্তু স্বামী গেলে যে সর্বস্ব যায়।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিরাজ বৌ - ২

স্বামী মানেই আসামী।

শিবরাম চক্রবর্তী ঃ স্বামী মানেই আসামী

স্বার্থ

স্বার্থই স্বার্থত্যাগের প্রধান শিক্ষক। ব্যষ্টির স্বার্থরক্ষার জন্য সমষ্টির কল্যাণের দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত। স্বজাতির স্বার্থে নিজের স্বার্থ ; স্বজাতির কল্যাণে নিজের কল্যাণ। বহুজনের সহায়তা ভিন্ন অধিকাংশ কার্য কোনও মতে চলে না, আত্মরক্ষা পর্যন্ত অসম্ভব।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ বর্তমান ভারত

স্বার্থশূন্যতাই ভগবান।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী (১।৮৭)

স্বার্থপরতা, সবার আগেই নিজের কথা ভাবা—এ এক মহাপাপ।.....স্বার্থশূন্যতাই হচ্ছে ধর্মের লক্ষণ। যার মধ্যে স্বার্থশূন্যতা যত বেশী, সে শিবের তত নিকটবর্তী।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী (৩/১৪৩)

স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ 'এবার ফিরাও মোরে (চিত্রা)

স্বার্থ থেকে যখন আমরা বহির্গত হই তখনি আমরা পরিপূর্ণরূপে স্বার্থকে লাভ করি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দ্বিধা (শান্তিনিকেতন)

স্বেচ্ছাচারী

তীরে কি প্রচণ্ড কলরব
জলে ভেসে যায় কার শব?
কোথা ছিলো বাড়ি?
রাতের কল্লোল শুধু বলে যায়, আমি স্বেচ্ছাচারী।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ আমি স্বেচ্ছাচারী (ধর্মেও আছো জিরাফেও আছো)

স্মরণ

স্মরণ তোমার হানে আজো তরবারি।

বিষ্ণু দে ঃ ক্রেসিডা (চোরাবালি)

সমুদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি
স্মরণে কি রবে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রতীক্ষা (সোনার তরী)

হিমালয়কে স্মরণ রাখিবার জন্য কি চাঁদা করিয়া তাহার একটা কীর্তিস্তম্ভ স্থাপন করার প্রয়োজন আছে?

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বারোয়ারি মঙ্গল (ভারতবর্ষ)

স্খলিত পালক ধুলায় জীর্ণ
পড়িয়া থাকে,
আকাশে ওড়ার স্মরণ চিহ্ন
মনে না রাখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

আমার জাগর স্বপ্নলোকে
এক মাত্র সত্তা তুমি, সত্য শুধু তোমারি স্মরণ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ তুমি

স্মৃতি

হে স্মৃতি, কোন দুঃখের দিন তুমি
নিজের করেছ এতকাল,
আমার ভিতর জ্বেলেছ আগুন
তাপহীন শোকহীন
যেন সব মুছে গেছে
অন্তিম শয়নের আগে।

অসীম রেজ ঃ বাক্যহীন তুমি স্তব্ধ একা (আগুন শেষের বেলা)

স্মৃতির দর্পণ যেন গোষ্পদে আকাশ।

কবিরুল ইসলাম ঃ সমস্তই স্মৃতি হয়ে যায়

সমস্তই স্মৃতি হয়ে যায়।.....
যে যায় সে যায় তাকে স্মৃতির পাহারা
বুকে তুলে রেখে দেয় যেমন জননী
এবং সস্নেহে
সমস্ত শরীরে তার বোলায় দুহাত
স্মৃতি বড় প্রিয়বস্তু।

কবিরুল ইসলাম ঃ সমস্তই স্মৃতি হয়ে যায়

অনেকদিন দেখা হয় না। অনেকদিন কথাও হয় না।
তবু আমাদের ভিতরে ভিতরে তৈরি হয়
অলক্ষ্য অজেয় সাক্ষাৎ
স্মৃতিতে স্মৃতিতে।

প্রমোদ বসু : আড়ালে (সানন্দা ১.১.৯৯)

তোমার বিপুল স্মৃতি বর্ষার মেঘের মতো
আমাকে আচ্ছন্ন করে রাখে
ডাকে বেদনার থেকে আরো বেদনায়।

বাসুদেব দেব : পূজা (হেমন্ত সন্ধ্যার গান)

স্মৃতিরে আকার দিয়ে আঁকা
বোধে যার চিহ্ন পড়ে ভাষায় কুড়ায়ে তারে রাখা,
কি অর্থ ইহার মনে ভাবি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : আকাশপ্রদীপ (ভূমিকা)

পুরানো স্মৃতিগুলো মদের মতো—যত বেশি দিন মনের মধ্যে সঞ্চিত হয়ে থাকে, ততই তার বর্ণ এবং স্বাদ এবং নেশা যেন মধুর হয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ছিন্নপত্র

একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ দিলো অবারিত করে॥

স্মৃতিপিপীলিকা তাই পুঞ্জিত করে
আমার রন্ধ্রে মৃত মাধুরীর কণা ;
যে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিবো না, আমি কভু ভুলিবো না॥

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : শাশ্বতী

স্মৃতি
বহে চলে অনন্ত আকাশজোড়া পাথরের ভার।

সুনীলকুমার নন্দী : অন্তহীন পাথরের ভার

স্মৃতি বড় দুষমন। স্মৃতির এক হাতে বেহেশত্ অন্য হাতে জাহান্নাম। তার এক হাতে জেব্রিলের মাটি—যা দিয়ে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন, অন্য হাতে ইস্রাফিলের শিঙ্গা—যার আওয়াজে সৃষ্টি বিধ্বস্ত হয়।
কিংবা স্মৃতি নদনদীর মতো—মৃত্যুর সাগরগামী। এককূলে তাকিয়ে দেখি ভরে উঠেছে উর্বরতা—শস্যসম্ভার-সমৃদ্ধ জনপদ—কত ঐশ্বর্য। অন্যদিকে শুধু ভয়ঙ্কর ভাঙন। সব ভেঙেচুরে পড়ে গেছে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : নিষিদ্ধ প্রান্তর

স্মৃতি নিয়ে থাকলে তো এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকাই যায় না।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ : নিষিদ্ধ প্রান্তর

স্মৃতি ধুলোবালিতে মলিন হয়ে এলে
আমারই বেদনার বোঝা ভারী হতে থাকে
যার স্মৃতি
তার কী আর আসে যায়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় : স্মৃতি ধুলোবালিতে ('ভালোবাসা' পত্রিকা শারদ ১৪০৯)

হজরত মহম্মদ/মহম্মদ

মহম্মদ ছিলেন সাম্যের নবী বা মহাপুরুষ। তিনি বলেছেন মানুষের সৌভ্রাতৃত্বের কথা, মুসলমানদের সৌভ্রাতৃত্বের কথা।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুগণ

যে-কালে এবং যে পরিবেশে মহানবী মুহাম্মদ স জন্মগ্রহণ করেন, সেই বিষাক্ত পরিবেশে মানবতার বিকাশ ঘটা সম্ভব ছিল না, বরং তার অপমৃত্যুই ছিল অনিবার্য। হিংসা-দ্বেষ, হানাহানি, গৃহযুদ্ধ-হত্যা-রক্তপাত, ব্যভিচার-লুণ্ঠন-মদ্যপান-জুয়া—নৈরাজ্যবাদের চূড়ান্ত অবস্থা! আল্লাহর নির্দেশ সম্বল করে হযরত মুহাম্মাদ স এই অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।....অনেক জটিল পথ অতিক্রম করে এগিয়ে চলল তাঁর মানবতার সাধনা।.....তাঁর লক্ষ্য ছিল মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ এবং অনন্ত জীবন—তাঁর ধর্মীয় এবং পার্থিব সহজ-সরল বিধানগুলি আমাদের সেই গন্তব্যের দিকেই এগিয়ে নিয়ে যায়। এই কল্যাণপ্রসূ নীতিগুলি দিয়েই তিনি আমাদের খণ্ড জীবনের বিচিত্র ধারাগুলিকে সংযত ও সংহত করে মানবিকতার বিকাশের মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দিলেন। বহু যুগ পর আরব মরুতে পুনরায় মানবিকতা তার পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হল, ধর্মজীবনের পূর্ণ বিকাশ আমাদের বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত হল জ্যোতির্ময় এক বিশাল আধ্যাত্মিক জগত—যে জগতের সন্ধান ইতিপূর্বে অজ্ঞাত ছিল।

রফিকউল্লাহ্ ঃ হাদীস শারীফ

হঠকারিতা/হঠকারি

হঠকারীর দল। তিনটে মাস নিজের ছেলেকে অনাহারে রাখতে পারে না, এমনই অধৈর্য এরা।

উৎপল দত্ত ঃ তীর

হঠকারিতা দুর্বলতারই নামান্তর।

প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী ঃ সবলতা ও দুর্বলতা

হত্যা

রক্তের অক্ষরে
অবিশ্রাম লিখিতেছে বৃদ্ধ মহাকাল
বিশ্বপত্রে জীবের ক্ষণিক ইতিহাস।
হত্যা অরণ্যের মাঝে, হত্যা লোকালয়ে,
হত্যা বিহঙ্গের নীড়ে, কীটের গহ্বরে,
অগাধ সাগর-জলে, নির্মল আকাশে,
হত্যা জীবিকার তরে, হত্যা খেলাচ্ছলে,
হত্যা অকারণে, হত্যা অনিচ্ছার বশে—
চলেছে নিখিল বিশ্ব হত্যার তাড়নে
ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণপণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বিসর্জন—২/১

হনুমান

অশোক বনে এসেছিল হনুমান,
সেদিন সীতা পেয়েছিলেন নবদূর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্রের খবর।

আমার হনুমান আসত বছরে বছরে আষাঢ় মাসে
আকাশ কালো করে
সজল নবনীল মেঘে।
আনত তার মেদুর কণ্ঠে দূরের বার্তা,
যে দূরের অধিকার থেকে আমি নির্বাসিত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বালক (পুনশ্চ)

ত্রেতাযুগের হনুমান আজও আছে বেঁচে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—২

হর

হরকী প্যারীর জলে আশ্চর্য বিশ্বাস ভেসে যায়।
সন্ধ্যার মন্দ্রবাতাসে দুলে দুলে জ্বলন্ত প্রদীপ—
কী মদির নক্ষত্র মায়ায় ভাসে............
হরকী প্যারীর জলে মানুষের পাপ ভেসে যায়
হরকী প্যারীর জলে মানুষের পুণ্য ভেসে যায়
হরকী প্যারীর জলে মানুষের প্রবৃত্তি ভাসে না!

দীপশিখা পোদ্দার : না (চ্যুতরাত্রি আমাকে জাগায়)

হরি

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?
আমার মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হয়ে রবে—কবে?
আমার সকল সুখে সকল দুখে
তোমার চরণ ধরব বুকে,
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই হবে।

অতুলপ্রসাদ সেন : গীতিগুঞ্জ

আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিণামে 'লুচি'
আমি ভোজনের লাগি করি ভজন।

কাজী নজরুল ইসলাম : হাসির গান

হরি হরি আর কবে এমন দশা হব।
ছাড়িয়া পুরুষ দেহ   কবে বা প্রকৃতি হব
দোঁহারে নূপুর পরাইব॥

নরোত্তম দাস : বৈষ্ণব পদাবলী

তিমির দিগভরি   ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে   কৈছে গোঞায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

বিদ্যাপতি : বৈষ্ণব পদাবলী

হরির লুঠ

.....দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুঠ ছড়াইতেছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (স্বাদেশিকতা) জীবনস্মৃতি

হরিণ/হরিণী

স্বপ্নের ভিতরে বুঝি—ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার ভিতরে
দেখিলাম পলাশের বনে খেলা করে
হরিণেরা ; রূপালি চাঁদের হাত শিশিরে পাতায়,
বাতাস ঝড়িছে ডানা—মুক্তা ঝরে যায়
পল্লবের ফাঁকে ফাঁকে—বনে বনে—হরিণের চোখে ;
হরিণেরা খেলা করে হাওয়া আর মুক্তার আলোকে।

জীবনানন্দ দাশ ঃ হরিণেরা (বনলতা সেন)

আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী।

বড়ু চণ্ডীদাস ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী

ভুসুকুপাদ ঃ চর্যাপদ

তোরা যে যা বলিস ভাই, আমার সোনার হরিণ চাই।
ও সেই মনোহরণ চপলচরণ সোনার হরিণ চাই॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান

হে হরিণী,
আকাশ লইবে জিনি
কেন তব এ অধ্যবসায়।.....
একান্ত উৎসুক তব প্রাণ
আকাশেরে করে ঘ্রাণ—
কর্ণ করিয়াছে খাড়া,
বাতাসে বাতাসে আজি অশ্রুত বাণীর প্রায় সাড়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হরিণী (বীথিকা)

হস্ত

রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দুই বিঘা জমি (কাহিনী)

হাউই

হাউই কহিল, মোর কী সাহস, ভাই,
তারকার মুখে আমি দিয়ে আসি ছাই!
কবি কহে, তার গায়ে লাগে নাকো কিছু,
সে ছাই ফিরিয়া আসে তোরি পিছু পিছু।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ স্পর্ধা (কণিকা)

হাওয়া

আমরা যে কোনো হাওয়ার পক্ষেই সুকণ্ঠ গায়ক।

তাপস রায় ঃ যুদ্ধের ব্যাণ্ডবাদকদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত

হাওয়া বয় সন্‌ সন্‌
তারারা কাঁপে।
হৃদয়ে কি জং ধরে
পুরানো খাপে!

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ জং (চীনা তর্জমা)

নিত্য-স্নান-করা সেখানকার হাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অমৃত (শ্যামলী)

ফিস্‌ফিস্ করে পাতায় পাতায়,
উস্‌খুস্ করে হাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অস্পষ্ট (নবজাতক)

কুয়াশা-ভিজে হাওয়া
দোমনা করে বইছে আমলকীর কচি ডালে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ একজন লোক (পুনশ্চ)

চেঁচানির চোটে
তাই বাংলার হাওয়া
রাতদিন যেন
হিস্‌টিরিয়ায় পাওয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গরঠিকানি (প্রহাসিনী)

পাগল হাওয়া বুঝতে নারে
ডাক পড়েছে কোথায় তারে—
ফুলের বনে যার পাশে যায়
তারেই লাগে ভালো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গান—চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে (গীতবিতান)

মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাকে
হাওয়ার হাঁপানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ জন্মদিনে—২৪

সংজ্ঞাপ্রাপ্ত মূর্ছিতের দীর্ঘশ্বাসের মতো গ্রীষ্মের দক্ষিণ-হাওয়া বহিতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নৌকাডুবি—৫

তীক্ষ্ণ হাওয়া সাঁই সাঁই শান দিচ্ছে আর চালাচ্ছে ছুরি
অন্ধকারের পাঁজরের ভিতর দিয়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পত্রপুট—৯

দখিন হাওয়ায় যেন কোন্ দেবতার স্বপ্ন ভেসে এল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বসন্ত

বাউল উত্তরে-হাওয়া
ধেয়েছে দক্ষিণ মুখে, মরণের রুদ্র-নেশা পাওয়া ;
বাজায় অশান্ত ছন্দে তাল পল্লবের করতাল,
ফুকারে বৈরাগ্যমন্ত্র ; স্পর্শে তার হয়েছে মাতাল
প্রান্তরের প্রান্তে প্রান্তে কাশের মঞ্জরী, কাঁপে তারা
ভয়কুণ্ঠ উৎকণ্ঠিত সুখে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ যাত্রা (পূরবী)

বাদলার হাওয়া খুঁতখুঁতে ছেলের মতো কিছুতেই শান্ত হতে চাচ্ছে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি—২৪।৯।২৪ (যাত্রী)

আকাশের নীল
বনের শ্যামলে চায়।
মাঝখানে তার
হাওয়া করে হায় হায়॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

দক্ষিণসমুদ্রের হাওয়ার হাহাকার-মূর্তি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শাপমোচন (পুনশ্চ)

বাদল হাওয়ার দীর্ঘশ্বাসে
যূথীবনের বেদন আসে,
ফুল-ফোটানোর খেলায় কেন ফুল-ঝরানোর ছল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষ বর্ষণ—আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে

হুহু করে বইছে হাওয়া,
পেঁপে গাছগুলোর যেন আতঙ্ক লেগেছে,
উত্তরের মাঠে নিমগাছে বেধেছে বিদ্রোহ,
তালগাছগুলোর মাথায় বিস্তর বকুনি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সুন্দর (পুনশ্চ)

সে-দিনও এমনই ফসল বিলাসী হাওয়া—
মেতেছিলো তার চিকুরের পাকা ধানে ;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজে ছিলো তার আনত দিঠির মানে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ঃ শাশ্বতী

হাট

নূতন করিয়া বসা আর ভাঙা পুরানো হাটের মেলা ;
দিবসরাত্রি নূতন যাত্রী, নিত্য নাটের খেলা!
খোলা আছে হাট মুক্ত বাতাসে,
বাধা নেই ওগো—যে আয় যে আসে,
কেহ কাঁদে, কেহ গাঁটে কড়ি বাঁধে ঘরে ফিরিবার বেলা।
উদার আকাশে মুক্ত বাতাসে—চিরকাল একই খেলা!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ হাট

হাত

কোথায় রাখব হাত ভোরের পাপড়ির গন্ধ নিয়ে।

অমিত কাশ্যপ ঃ হাত ১ (আকাশী রঙের দিকে)

হাত দিয়ে পেতে হবে কী আছে আনন্দ—
হাত পেতে পাওয়া যাবে সেটাই পছন্দ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ খাপছাড়া—সংযোজন-১৪

হাত যে সৃজন করেছে বিধি,
নেবার জন্যে, জান তো দিদি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লক্ষ্মীর পরীক্ষা (কাহিনী)

হাতের মধ্যে প্রাণের কতো ইশারা! ভালোবাসার যত কিছু আদর, যত-কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ওই হাতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ শেষের কবিতা—১০

হাত যদি পাততেই হয় মহতের দ্বারে হাত পাতাই শাস্ত্রের বিধান।

শরৎচন্দ্র ঃ বিপ্রদাস ২৩

হাতিয়ার

উপর মহলে ঠুংরী গজল গান।
নীচের মানুষ হাতিয়ারে দেয় শান॥

ভবতোষ শতপথী : আসামী হাজির (অরণ্যের কাব্য)

নতুন সূর্য, পুব আকাশে
আঁধার কেটে যাবে ওরে,
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল,
হাতিয়ার, হাতিয়ার, হাতিয়ার।

রবীন্দ্র ভট্টাচার্য : আর এক তরঙ্গ

হাদীস

ইসলাম ধর্মের মূল গ্রন্থ কুরআন শারীফ—হাদীস হল সেই মহাগ্রন্থের ব্যাখ্যা। ইসলাম ধর্মের যাবতীয় বিধি-বিধান কুরআন এবং হাদীস শারীফ থেকে এসেছে। কুরআন এবং হাদীস জানা হলেই ইসলাম ধর্ম জানা হয়।

রফিকউল্লাহ : হাদীস শারীফ (নিবেদন)

হাদীস এই আরবী শব্দের সাধারণ অর্থ বাণী বা উপদেশ—শাস্ত্রীয় অর্থ নাবী স এর বাণী, তাঁর কাজ এবং অন্যের কাজের প্রতি তাঁর সমর্থন। আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে প্রত্যাদেশ পেয়ে মহানাবী মুহাম্মাদ স অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের দ্বারে গিয়েছেন, সত্যের আলো জ্বেলে তাদের সরল পথে চলার জন্য কত উপদেশ দিয়েছেন, কিভাবে সরল পথে চলতে হয় নিজে যথাযথভাবে চলে সে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আবার কখনো বা সৎকর্মশীল মানুষের ন্যায়সঙ্গত পথচলাকে সমর্থন করে তাঁর আদর্শ ও উদাহরণকে পরিস্ফুটতর করেছেন। উপদেশ ও আদর্শ উদাহরণের মাধ্যমে দ্বীন ইসলাম দিনে দিনে দৃপ্ত গতিতে অগ্রসর হয়েছে। নাবী স-এর এই উপদেশবাণী, আদর্শ কার্যধারা এবং অন্যের কাজের প্রতি সমর্থনের ঐতিহাসিক বর্ণনার নামই 'হাদীস শারীফ'।

রফিকউল্লাহ : হাদীস শারীফ (ভূমিকা)

হায়

কোথা হতে শুনতে যেন পাই—
আকাশে আকাশে বলে 'যাই'॥
পাতায় পাতায় ঘাসে ঘাসে
জেগে ওঠে দীর্ঘশ্বাসে
'হায়, তারা নাই, তারা নাই'॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান—গীতবিতান

তোমার বীণায় গান ছিল আর আমার ডালায় ফুল ছিল গো।
একই দখিন হাওয়ায় সে দিন দোঁহায় মোদের দুল দিল গো॥
......সে দিন আমার মনে হল, তোমার গানের তাল ধরে
আমার প্রাণে ফুল-ফোটানো রইবে চিরকাল ধরে।
গান তবু তো গেল ভেসে, ফুল ফুরালো দিনের শেষে
ফাগুনবেলার মধুর খেলায় কোন্‌খানে হায় ভুল ছিল গো॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান—গীতবিতান

হায়গো, ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায়, যায় গো—
সুর হারালেম অশ্রুধারে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নবগীতিকা—১

হায় রে, ওরে যায় না কি জানা।
নয়ন ওরে খুঁজে বেড়ায় পায় না ঠিকানা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শাপমোচন

হার/হারা

পৃথিবীর সব কিছু সব সময় তুমি হাতের মুঠোয় ধরে রাখবে, কিছুই হারাবে না—হারাতে দেবে না, এ হয় না, হওয়া উচিত নয়।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : ম্যাজিক

হার-মানা হার পরাব তোমার গলে—
দূরে রব কত আপন বলের ছলে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতলেখা—১

মেনেছি, হার মেনেছি।
ঠেলতে গেছি তোমায় যত
আমায় তত হেনেছি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতাঞ্জলি—৬৩

যারা মাতব্বর সেনাপতি তারা কত খুচরো হারের ভিতর দিয়ে মোটের উপর মস্ত করেই জেতে। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** : যোগাযোগ—৪৫

শাসনের মুগুর মেরে আর কতকাল চুপ করিয়ে রাখবে......
আমরা হেরে যাবো না
আমরা মরে যাবো না
আমরা ভেসে যাবো না
নিঃস্বতার সমুদ্রে একটা দ্বীপের মতো আমাদের বিদ্রোহ
আমাদের বিদ্রোহ মৃত্যুর বিভীষিকার বিরুদ্ধে—
এস বাইরে এস
আমার হাত ধর
পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে।

রাম বসু : পরাণ মাঝি হাঁক দিয়েছে

হারিয়ে যাওয়া

যেদিন আমি হারিয়ে যাব, বুঝবে সেদিন বুঝবে,
অস্তপারের সন্ধ্যাতারায় আমার খবর পুছ্‌বে—
বুঝবে সেদিন বুঝবে!

কাজী নজরুল ইসলাম : অভিশাপ

একটি মেয়ে। একদিন ভর দুপুরবেলা তার হারিয়ে যেতে ইচ্ছে হল। কিন্তু হারিয়ে যাওয়া কি অতই সোজা?.....গল্পে, উপন্যাসে পুরুষ চরিত্ররা প্রায় 'ভবঘুরে' হয়ে ঘুরে বেড়ায়, এখান থেকে ওখান। প্রতি অনুষঙ্গে একটা করে আধো প্রেমের গল্প তৈরি হয়, সেই গল্প মুছে দিয়ে তৈরি হয় নতুন কোনও গল্প। কিন্তু যদি একটা মেয়ে সত্যি সত্যিই এইভাবে নানা ঘাটে একটু একটু পা ভিজিয়ে আসে? বাস্তব হল, কল্পনাতেও সে বেশি দূর যেতে পারে না। মনের গতি স্তিমিত হয়ে আসে। চিন্তার সামান্য দৌড়েও সেই মেয়ে হাঁফিয়ে ওঠে, ক্লান্ত হয়। 'অস্থির' বিশেষণ কিংবা এই শব্দের মধ্যে নিহিত চারিত্রিক স্খলনকে স্বীকার করার ঝুঁকি নিতেই ভয় লাগে। অস্থিরতা আসে, কোষে কোষে চারিয়ে যায় তীব্র গতির টান। শেষ পর্যন্ত বিশ্বসংসারের সহস্র ছবি স্রেফ ধূসর মানচিত্র থেকে যায়।

মউলি মিত্র : হারাবার পথ নেই (আনন্দবাজার পত্রিকা ১৬.৩.২০০৩)

কোথাও আমার হারিয়ে যাবার নেই মানা
মনে মনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রূপকথায় (সানাই)

হাল

দুলিতেছে তরী, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ কাণ্ডারী হুঁশিয়ার

হাল ছেড়ে আজ বসে আছি আমি,
ছুটি নে কাহারো পিছুতে।
মন নাই মোর কিছুতেই, নাই
কিছুতে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ উদাসীন (ক্ষণিকা)

ওরে ভীরু, তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার।
হালের কাছে মাঝি আছে, করবে তরী পার॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলেখা

আমি হাল ছাড়লে তবে
তুমি হাল ধরবে জানি।
যা হবার আপনি হবে
মিছে এই টানাটানি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতিমাল্য—৬

হাল ফ্যাশন

শুক্ল একাদশীর রাতে
কলিকাতার ছাতে
জ্যোৎস্না যেন পারিজাতের পাপড়ি দিয়ে ছোঁওয়া,
গলায় আমার কুন্দমালা গোলাপ জলে ধোওয়া,—
এইটুকু যেই লিখেছি সেই হঠাৎ মনে প'ল
এটা নেহাৎ অসাময়িক হল।
হালফ্যাশানের বাণীর সঙ্গে নতুন হল রফা,
একাদশীর চন্দ্র দেবেন কর্মেতে ইস্তফা।
শূন্যসভায় যত খুশি করুন বাবুয়ানা,
সত্য হতে চান যদি তো বাহার-দেওয়া মানা
তাছাড়া ঐ পারিজাতের ন্যাকামিও ত্যাজ্য,
মধুর করে বানিয়ে বলা নয় কিছুতেই ন্যায্য।
বদল করে হল শেষে নিম্নরকম ভাষা—
'আকাশ সেদিন ধুলোয় ধোঁয়ায় নিরেট করে ঠাসা,
রাতটা যেন কুলিমাগি কয়লাখনি থেকে
এল কালো রঙের উপর কালির প্রলাপ মেখে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ মাল্যতত্ত্ব (প্রহাসিনী)

হাঁস

বুনো হাঁস পাখা মেলে—শাঁই শাঁই শব্দ শুনি তার ;
এক-দুই-তিন-চার—অজস্র—অপার—

রাত্রির কিনার দিয়ে তাহাদের ক্ষিপ্র ডানা ঝাড়া
এঞ্জিনের মতো শব্দে ; ছুটিতেছে ছুটিতেছে তারা।

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সবধ্বনি সব রঙ মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

জীবনানন্দ দাশ ঃ বুনো হাঁস (বনলতা সেন)

নয়টি হাঁসকে রোজ চোখ মেলে ভোরে
দেখা যায় জলপাই পল্লবের মতো স্নিগ্ধ জলে ;.......
সহসা নদীর মতো প্রতিভাত হয়ে যায় সব,
নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে।

জীবনানন্দ দাশ ঃ হাঁস (সাতটি তারার তিমির)

আকাশটা হাঁস হয়ে চরে বেড়ায়
মেঘলা দিঘিতে
বারোমাস
আকাশ না হাঁস
কাকে ফেলে কাকে দেখি।

পরেশ মণ্ডল ঃ দিঘি

হাসি/হাস্য

সাধুটি হাসতে থাকেন। স্নিগ্ধ হাসি। সঙ্গীতের মতই মধুর। তপস্যার ক্ষেত্র থেকে বয়ে আনা আনন্দের ফসল। স্বর্গপ্রভ। দিব্যগন্ধী।

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ হিমালয়ের পথে পথে

হাসি যেন মানুষের মনের ছবি, মানুষের সত্তার দীপ্তি।.....শুধু হাসিতেই বা কেন? কথায়, চলায়, ভ্রূভঙ্গে—মানুষের সত্তা এইসব বহিরাবরণের মধ্যেও তাহার ছাপ রাখিয়া দেয়।

গোপাল হালদার ঃ একদা (ত্রিদিবা)

হেসে নেও—এ দুদিন বৈ ত নয় ;
কার কি জানি কখন সন্ধ্যে হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ঃ হাসির গান

অনেকগুলো হাসিকে এক জায়াগায় জড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া
হোলো মাঠে। সেই থেকে মাঠ হাসছে তো হাসছেই।

জহর সেনমজুমদার ঃ ডাকিনী ও কর্পূর (প্রণয়-পালকি)

সোনালি হাসির ঝরনা তোমার ওষ্ঠাধরে।
প্রাণকুরঙ্গ অঙ্গে ছড়ায় চপলমায়া।
মুখর সে গান ভেঙে গেল। আজ স্তব্ধ তমাল।
হালকাহাসির জীবনে কি এল ফসলের কাল?

বিষ্ণু দে ঃ ক্রেসিডা

দাঁতে আমার দোষ আছে, তাই অলওয়েজ হাসি।

মোহিত চট্টোপাধ্যায় ঃ স্বদেশী নকশা

নীরব হাসির সোনার বাঁশির ধ্বনি
করবে ঘোষণ প্রেমের উদ্বোধনী,—।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ অর্ঘ্য (মহুয়া)

মেঘ-মুখে হাসিটি উষার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আবছায়া—ছবি ও গান

হাসি তার ললাটে ফুটিত,
হাসি তার ভাসিত নয়নে,
হাসি তার ঘুমায়ে পড়িত
সুকোমল অধরশয়নে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আমি-হারা (সন্ধ্যাসংগীত)

প্রণয়ীর শ্মশানেতে   একেলা বিরলে আসি
প্রণয়ী যেমন কেঁদে যায়,
নিজের সমাধি ’পরে   নিজে বসি উপছায়া
যেমন নিশ্বাস ফেলে হায়,
কুসুম শুকায়ে গেলে   যেমন সৌরভ তার
কাছে কাছে কাঁদিয়া বেড়ায়,
সুখ ফুরাইয়া গেলে   একটি মলিন হাসি
অধরে বসিয়া কেঁদে চায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আমি-হারা (সন্ধ্যাসংগীত)

.....ওষ্ঠে কারো সরল সাদা হাসি,
কারো হাসি আঁখির কোণে কোণে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কবির বয়স (ক্ষণিকা)

পুরুষজাতিকে পক্ষপাতী বিধাতা বিনা কৌতুকে হাসিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু মেয়েরা হাসে কী জন্য তাহা দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কৌতুকহাস্য (পঞ্চভূত)

হাসির মায়ামৃগীর পিছে
ভাসি নয়ন-নীরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতালি—৮৬

জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ড ঢাকিতে আঁধার হৃদি
অনিবার হাসিতেই রহে,
যত হাসে ততই সে দহে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ তারকার আত্মহত্যা (সন্ধ্যাসংগীত)

কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে
কাহারো হাসি আঁখিজলেরই মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিদ্রিতা (সোনার তরী)

ছাপার অক্ষরে যে-সব কথা পড়িলে দুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে, এ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ নিশীথে (গল্পগুচ্ছ)

উষার মতো অমল হাসি জাগবে তোমার আঁখির নীলাম্বরে
গভীর অনুভাবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ প্রকাশ (পূরবী)

বর্ষার মেঘ শরতে শিউলিফুলের হাসি শিখে নিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লিপিকা

নীদ-মেঘ 'পর স্বপন-বিজলী-সম রাধা বিলসত হাসি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী—১২

হাসিখানি স্থির
অশ্রুশিশিরেতে ধৌত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : মানসসুন্দরী (সোনার তরী)

সুকোমল বিম্বৌষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণ প্রখর হাসি....টুকটুকে মখমলের খাপের ভিতরকার ঝক্‌ঝকে ছোরার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : রাজটিকা **(গল্পগুচ্ছ)**

না হাসিয়া করিব কী? অরণ্যে ক্রন্দন
সে তো বালকের কাজ। দিবসরজনী
বিলাপ না হয় সহ্য, তাই মাঝে মাঝে
রোদনের পরিবর্তে শুষ্ক শ্বেত হাসি
জমাট অশ্রুর মতো তুষারকঠিন। **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর :** রাজা ও রানী—১।৯

অজানা ফুলের গন্ধের মতো
তোমার হাসিটি, প্রিয়,
সরল মধুর, কি অনির্বচনীয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : লেখন

সেই কলমধুর কণ্ঠের হাসি, আমার মনে যেন দুনো লয়ের ঝংকারে সেতার বাজিয়ে দিলে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শেষ কথা (তিন সঙ্গী)

শুনেছি তোমার উচ্চ হাসি।
বুঝেছি, মন্দমধুর হাসি এ যুগের নয় ;
এ-যে নয় অবন্তী, নয় উজ্জয়িনী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সম্ভাষণ (পত্রপুট)

জাঁতার ভিতর হইতে যেমন বিমল শুভ্র ময়দা পিষিয়া বাহির হইতে থাকে, তেমনি.....চাপা ঠোঁটজোড়ার মধ্য হইতে হাসিরাশি ভাঙিয়া বাহির হইতে লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সরোজিনী-প্রয়াণ (বিচিত্র প্রবন্ধ)

অধরেতে স্খলিতচরণা
মদিরহিল্লোলময়ী হাসি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সুখের স্মৃতি (ছবি ও গান)

পিতামহের দুই জাতের হাসি আছে—একটা দন্ত্য, একটা মূর্ধন্য। আমাতে লেগেছে মূর্ধন্য হাসি, ইংরেজিতে তাকে বলে উইট্‌।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—১

বিশুদ্ধ হাসি, তাতে বুদ্ধির ভেজাল নেই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সে—৩

বুঝিয়াছি আজি
বহুকর্মকীর্তিখ্যাতি আয়োজনরাজি
শুষ্ক বোঝা হয়ে থাকে, সব হয় মিছে

যদি সেই স্তূপাকার উদ্‌যোগের পিছে
না থাকে একটি হাসি ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : স্মরণ—২৩

দ্বিধায় ছোঁওয়া তোমার মৌনীমুখে
কাঁপতেছিল সলজ্জ কৌতুকে
আঁচল-আড়ে দীপের মতো একটুখানি হাসি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হঠাৎ মিলন (সানাই)

সুখীরা হাসিতে জানে, সরল ও উদার ব্যক্তিরা বিলক্ষণ হাসিতে পারে, প্রণয়ীরা চমৎকার হাসে, শোকাকুল ব্যক্তিরা ম্লান হাসি হাসে কিন্তু কুটিল ব্যক্তিরা হাসিতে পারে না।

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় : মাধবীলতা

হাসছি মোরা হাসছি দেখ, হাসছি মোরা আহ্লাদী,
তিনজনেতে জটলা করে ফোকলা হাসির পাল্লা দি।
হাসতে হাসতে আসছে দাদা আসছি আমি আসছে ভাই,
হাসছি কেন কেউ জানে না, পাচ্ছে হাসি হাসছি তাই।

সুকুমার রায় : আহ্লাদী

ভাবছি মনে, হাসছি কেন? থাকব হাসি ত্যাগ করে,
ভাবতে গিয়ে ফিকফিকিয়ে ফেলছি হেসে ফ্যাক করে।....
উঠছে হাসি ভসভসিয়ে সোডার মতন পেট থেকে।

সুকুমার রায় : আহ্লাদী

হাসি কি আর গল্পে ঠাসা থাকে, হাসি থাকে খুশদিলে।

সৈয়দ মুজতবা আলী : দেশে বিদেশে

হাসিকান্না

হাসিকান্না হীরাপান্না দোলে ভালে,
কাঁপে ছন্দে ভালো মন্দ তালে তালে।
নাচে জন্ম, নাচে মৃত্যু পাছে পাছে
তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ, তাতা থৈথৈ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : অরূপরতন (মমচিত্ত)

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিস, হৃদয়ের জিনিস নহে। প্রাণ জিনিসটা ছিপের নৌকার মতো ছুটিয়া চলে তাতে মাল বোঝাই নাই ; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসিকান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিসটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে,—তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মতো নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : শরৎ (পরিচয়)

হাসির নাটক

হাসির নাটকে বক্তব্য নেই, যুগ-সমস্যার আলোচনা নেই, বাণী নেই, এ সব কথা যদি মেনেও নিই, তবু হাসি বা হাসানোর মূল্য আমার কাছে কমে না। আমরা বাঙালীরা কাঁদতে ভালোবাসি আর হাসতে লজ্জা পাই, এ কথাটাও আমার মানতে ইচ্ছে করে না। আমার বরং বলতে ইচ্ছে করে—আমরা চরম দুঃখেও হাসতে পারি, চূড়ান্ত ট্র্যাজেডিও হাসি দিয়ে ফোটাতে পারি, জটিলতম সমস্যাও হাসির মাধ্যমে উপস্থিত করে হেসে তার মোকাবিলা করতে পারি। তাই হাসির দাম আমার কাছে কম নয়। হাসি যদি সুস্থ হয়, নিছক ভাঁড়ামি, মুদ্রাদোষ বা মুখবিকৃতির সাহায্য না

নিয়ে যদি হাসানো যায়, তবে সে হাসি উদ্দেশ্যহীন বলে আমার মনে হয় না। অন্তত এখন অবধি।

বাদল সরকার : নাট্যকারের বক্তব্য (কবি কাহিনী)

হাহাকার

নিজস্ব হাহাকারগুলো গান হয়ে যায়।

কমল মুখোপাধ্যায় : এক এক দিন (ভালবাসার নীরব শব্দেরা)

বাতাসে ফুলের গন্ধ,
আর কিসের হাহাকার।

সমর সেন : একটি রাত্রের সুর

হিংসা

হিংসার জয়কে চরম বলে স্বীকার করলে সভ্যতার পরাজয়কেই চরম বলে মেনে নেওয়া হবে।

অম্লান দত্ত : হিংসার জয় কি নিশ্চিত? (দেশ : ১৮.৪.২০০৩)

ক্রোধ হিংসা যারা করে, আপনি আপনি কেঁদে মরে।

বাংলা প্রবাদ

দয়ার পর ধর্ম নাই, হিংসার পর পাপ নেই।

বাংলা প্রবাদ

সংসারে তোমাকে কেউ হিংসে না করলে তোমার মাথাই বা উঁচু থাকবে কি করে?

বিমল মিত্র : আসামী হাজির

হিংসার উৎসবে আজি বাজে
অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
তুলেছে কুটিল ফণা চক্ষের নিমিষে
গুপ্ত বিষদন্ত তার ভরি তীব্র বিষে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : নৈবেদ্য—৬৪

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি,
        নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার,
        লোভজটিল বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : পরিশেষ-সংযোজন (বুদ্ধজন্মোৎসব)

হিংসা বেশ স্মার্ট শব্দ, মডেল রমণীদের মতো।
আমাদের চোখে ঘোর লাগে
কখন যে গোপন ইচ্ছার মধ্যে ঢুকে পড়ে বিমোহন
জানতেই পারি না।

সৈয়দ কওসর জামাল : হিংসা

হিংস্র

  চারি দিকে ক্ষিপ্তোন্মত্ত জল
আপনার রুদ্রনৃত্যে দেয় করতালি
লক্ষ লক্ষ হাতে। আকাশেরে দেয় গালি
ফেনিল আক্রোশে। এক দিকে যায় দেখা

অতিদূর তীরপ্রান্তে নীল বনরেখা,
অন্য দিকে লুব্ধ ক্ষুব্ধ হিংস্র বারিরাশি
প্রশান্ত সূর্যাস্ত-পানে উঠিছে উচ্ছ্বাসি
উদ্ধতবিদ্রোহভরে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দেবতার গ্রাস (কাহিনী)

আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তুলবই।

সুকান্ত ভট্টাচার্য ঃ বোধন

হিত

নদী নাহি পান করে আপনার জল।
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,
ময়রারা নাহি খায় নিজ নিজ মিঠে
ঘোড়া কভু নাহি চড়ে আপনার পিঠে,
মুরগীরা নাহি খায় নিজ নিজ আণ্ডা,
না খায় পুলিশ কভু আপনার ডাণ্ডা,.....
ছাত্ররা দেয় না মন নিজ নিজ পাঠে,
গাঁটকাটা আপনার গাঁট নাহি কাটে,
মহাত্মারা নিজেরে না দেন উপদেশ,
পরের হিতার্থে মন করহ নিবেশ॥

অজিতকৃষ্ণ বসু ঃ পরার্থে

মানুষ কোনো দিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে।.....হিত করিবার একটিমাত্র ঈশ্বর দত্ত অধিকার আছে, সেটি প্রীতি। প্রীতির দানে কোনো অপমান নাই, কিন্তু হিতৈষিতার দানে মানুষ অপমানিত হয়। মানুষকে সকলের চেয়ে নত করিবার উপায়—তাহার হিত করা অথচ তাহাকে প্রীতি না করা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লোকহিত (কালান্তর)

কেহ তাহার আশ্রয় স্বীকার না করিলে সেই ঔদ্ধত্য সে কোনো মতেই সহ্য করিতে পারিত না। লোকের হিত করিবার শখ তাহার এতই প্রবল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ রাসমণির ছেলে (গল্পগুচ্ছ)

হিতবাক্য

আমার শাস্ত্রে লেখে এই যে, হিতবাক্য লোকের মনোহারী হইবে কি হইবে না তাহা ভাবিবার কোন প্রয়োজন করে না—চোখ কান বুজিয়া তাহা বলিয়া ফেলাই ভাল ; যে শোনে সে শুনিবে, যে না-শোনে না শুনিবে ; তুমি তো বলিয়া খালাস্!

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ দেখিয়া শিখিব কি ঠেকিয়া শিখিব।

হিতৈষী

হিতৈষী যে সুদটি আদায় করে সেটি মানুষের আত্মসম্মান ; সেটিও লইবে আবার কৃতজ্ঞতাও দাবি করিবে, সে যে শাইলকের বাড়া হইল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লোকহিত

হিতৈষীর স্বার্থহীন অত্যাচার যত
ধরণীরে সবচেয়ে করেছে বিক্ষত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ লেখন

হিন্দু

‘হিন্দু’ অভিধাটি উন্মেষকালে ব্যবহৃত হয়েছিল দেশ ও তার ভৌগোলিক অবস্থান বোঝানোর জন্য, ঠিক কোনো একমাত্রিক ধর্মীয় বিশ্বাসকে চিহ্নিত করার জন্য নয়। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সিন্ধুনদের নাম থেকে উদ্ভূত (যে নদের অববাহিকা ধারণ করেছিল খ্রিস্ট জন্মের তিন হাজার বছর আগে বিকশিত সিন্ধু সভ্যতা), এবং ‘ইন্ডিয়া’ শব্দটির উৎসও ওই নদের নামের সাথে সম্পৃক্ত। প্রাচীন গ্রিক ও পারস্যবাসীদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয়েছিল ‘ইন্ডাস’ নদের চারপাশে অবস্থিত এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হিসেবে, এবং তাঁদের চোখে হিন্দুরা ছিলেন ওই ভূখণ্ডের অধিবাসী।

অমর্ত্য সেন ঃ সংকটের মুখে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা

হিন্দু বলতে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বৌদ্ধ ইত্যাদি পরস্পরবিরোধী ধর্ম বা মতবাদের এক দুর্দান্ত ইকেবানা।.....হিন্দু এমন ধর্ম যা পৃথিবীর অন্য সব ধর্মকে এক-এক করে মিলিয়ে সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে এক সমাজতান্ত্রিক চেহারা নিয়েছে।

পি. সি. সরকার ঃ সংবাদ প্রতিদিন ২৪.১০.২০০১

হিন্দুধর্মের মতো আর কোন ধর্মই এত উচ্চতানে মানবাত্মার মহিমা প্রচার করে না, আবার হিন্দুধর্ম যেমন পৈশাচিকভাবে গরীব ও পতিতের গলায় পা দেয়, জগতে আর কোন ধর্ম এরূপ করে না।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী ৫।১৫

মুসলমান একটি বিশেষ ধর্ম কিন্তু হিন্দু কোনো বিশেষ ধর্ম নহে। হিন্দু ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি জাতিগত পরিণাম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ আত্মপরিচয় (পরিচয়)

হিন্দু বললেই হিন্দু হওয়া যায় না। মুসলমান হওয়া সোজা, খৃস্টান যে সে হতে পারে। কিন্তু হিন্দু!—বাস রে! ও বড়ো শক্ত কথা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা

হিন্দু তো কোনো দল নয়। হিন্দু একটা জাতি। এ জাতি এত বৃহৎ যে কিসে এই জাতির জাতিত্ব, তা কোনো সংজ্ঞার দ্বারা সীমাবদ্ধ করে বলাই যায় না। সমুদ্র যেমন ঢেউ নয়, হিন্দু তেমনি দল নয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গোরা-৫৭

আমরা হিন্দু, পৃথিবীতে আমাদের মতো উদার, আমাদের মতো সহিষ্ণু জাতি আর নাই। আমরা পরের মতের উপর কোনো হস্তক্ষেপ করিতে চাহি না। অতএব আমাদের সর্বপ্রধান যুক্তি বাপান্ত, অর্ধচন্দ্র এবং ধোপা-নাপিত-রোধ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ব্যঙ্গকৌতুক। প্রত্নতত্ত্ব-২

......যাহাতে বাংলার হিন্দুত্ব দূষিত হয় তাহাতে পাঞ্জাবের হিন্দুত্ব দূষিত হয় না। যাহা দ্রাবিড়ের হিন্দুর পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে তাহা কান্যকুব্জের হিন্দুর পক্ষে লজ্জাজনক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ পরিচয় (আত্মপরিচয়)

ঘরের ভিতরেই যে বিপদ মাথাচাড়া দিয়েছে, ওপর ওপর বহুত্ববাদের কথা বলে তাকে প্রতিহত করা যাবে না। আজ সামাজিক সম্পর্ক ও জাতীয় সহমর্মিতা জঙ্গি হিন্দুত্ববাদের হাতে আক্রান্ত। আগ্রাসী হিন্দুত্ব আজ ভারত ও ভারতীয়ত্বের ধারণাকে এক বৃহত্তর বিপন্নতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

সুনন্দকিশোর দত্তরায় ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা ২২.৩.২০০৩

গভীরতর অর্থে এই হিন্দুত্বের রাজনীতির আরও বড় অপরাধ হইল এই যে, তাহা ভারতীয় সমাজ এবং অর্থনীতিকে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতে দিতে চাহে না, পিছনে টানিয়া রাখিতে চাহে। ত্রেতাযুগের কল্পনায়কের জন্মভূমির সন্ধানে কলিকালের ভক্তরা পাতালপ্রবেশ করিতেছেন—ইহার মধ্যে 'পিছন দিকে আগাইয়া' যাইবার একটি ভয়ঙ্কর এবং করুণ পরিহাস রহিয়াছে বইকী।

সম্পাদকীয় ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা—২২.৩.২০০৩

হিন্দুধর্ম

উত্তরোত্তর সঞ্চীয়মান উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট নূতন পুরাতন আর্য ও অনার্য অসম্বদ্ধতাকে হিন্দুধর্ম নামক এক নামে অভিহিত করিয়া এই সমস্তটাকেই আমাদের চিরকালীন জিনিস বলিয়া গৌরব করিতেছি ;

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ধর্মের অধিকার (সঞ্চয়)

হিন্দুসমাজ

হিন্দুসমাজের পূর্ণ বিকাশের মূর্তি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ ব্যাপার নহে।.....পাঁজিতে যে সংক্রান্তির ছবি দেখা যায় আমাদের কাছে হিন্দুসভ্যতার মূর্তিটা সেই রকম। সে কেবলই যেন স্নান করিতেছে, জপ করিতেছে, এবং ব্রত উপবাসে কৃশ হইয়া জগতের সমস্ত কিছুর সংস্পর্শ পরিহার করিয়া অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু একদিন এই হিন্দুসভ্যতা সজীব ছিল, তখন সে সমুদ্র পার হইয়াছে, উপনিবেশ বাঁধিয়াছে, দিগ্‌বিজয় করিয়াছে, দিয়াছে এবং নিয়াছে ; তখন তাহার শিল্প ছিল, বাণিজ্য ছিল, তাহার কর্মপ্রবাহ ব্যাপক ও বেগবান ছিল ;......সেই বৃহৎ বিচিত্র, জীবনের-বেগে-চঞ্চল, জাগ্রত চিত্তবৃত্তির তাড়নায় নবনব অধ্যবসায়ে প্রবৃত্ত হিন্দু সমাজ......সেই সমাজকে আজ আমরা হিন্দুসমাজ বলিয়া স্বীকার করিতেই চাই না ; যাহা চলিতেছে না তাহাকে আমরা হিন্দুসমাজ বলি ; প্রাণের ধর্মকে আমরা হিন্দুসমাজের ধর্ম বলিয়া মানিই না, কারণ প্রাণের ধর্ম বিকাশের ধর্ম, পরিবর্তনের ধর্ম, তাহা নিয়ত গ্রহণ বর্জনের ধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় (পরিচয়)

হিন্দুস্থানি

হিন্দুস্থানিকে ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবহারের জন্যে এক ভাষা বলে গণ্য করা যেতে পারে। তার মানে, বিশেষ কাজের প্রয়োজনে কোনো বিশেষ ভাষাকে কৃত্রিম উপায়ে স্বীকার করা চলে, যেমন আমরা ইংরেজি ভাষাকে স্বীকার করেছি।.....রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস সফল ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না। দেউড়িতে একটা সরকারি প্রদীপ জ্বালানো চলে, কিন্তু একমাত্র তারই তেল জোগাবার খাতিরে ঘরে ঘরে প্রদীপ নেবানো চলে না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বাংলাভাষা-পরিচয়

হিন্দু-ইসলাম/হিন্দু-মুসসলমান

আমাদের নিজের মাতৃভূমির পক্ষে—হিন্দুধর্ম ও ইসল্লামধর্ম-এই দুই মহান মতের সমন্বয়—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক এবং ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী-৬

সেই মহাপুরুষ কবে আসছেন কাঁচি হাতে করে।.....সেই কাঁচি দিয়ে সামনের দাড়ি ছেঁটে দেবেন, পেছনের টিকি কেটে দেবেন। সব চুরমার করে একাকার করে দেবেন। হিন্দু মুসলমান আর কতদিন এরকম আলাদা হয়ে থাকবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ সৈয়দ মুজতবা আলীর
'গুরুদেব ও শান্তিনিকেতন গ্রন্থে' কথিত

মুড়ার কুল্যা গরু আর গাঙর কুল্যা বাড়ী,
মোসলমানের বিবি আর হেঁদুর গালর দাড়ী।
এ সগলের কোন দিন ন থাকে ঠিকানা।

অজ্ঞাত কবি ঃ নছর মালুম পালা

এ ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলিমের হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে বাজে একটাই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সুর। অত্যাচারী যদি মাথা তোলে, তবে তরবারি ধরো। তরবারির জোরেই কুরুক্ষেত্রের ধর্ম্মযুদ্ধ।

উৎপল দত্ত ঃ সন্ন্যাসীর তরবারি

মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ॥
এক সে আকাশ মায়ের কোলে
যেন রবি-শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তুলে, এক সে নাড়ীর টান॥

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ দেশাত্মবোধক গান (সুরসাকী)

মরিছে হিন্দু মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ মরণে নাহি লাজ।
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্র নব জানাজানি!
আজি পরীক্ষা—কাহার দস্ত হয়েছে কত দরাজ!
সে মরিবে কাল সম্মুখ-রণে, মরিতে কারা নারাজ।

কাজী নজরুল ইসলাম ঃ হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ

বাংলার পল্লীগীতি, ভাটিয়ালী, কবি গান কি শুধু হিন্দুদের, না মুসলমানেরও? আমরা লড়াই করেছি, ঝগড়া করেছি, মারামারি করেছি, কিন্তু তাই বলে কি বাংলার হিন্দু মুসলমানদের দেহে একই রক্ত বইছে না? বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবের জন্য পলাশীর মাঠে হিন্দু-মুসলমানের কি মিলিত রক্তপাত হয়নি?

নিমাই ভট্টাচার্য ঃ পার্টিশান (শ্রেষ্ঠ গল্প)

কে হিন্দু কে মোছলমান।
হিন্দু পুজন্তি কাষ্ঠ পাষাণ॥
মুসলমান পুজন্তি খোদায়
পূর্ণরূপ রেক নাই।

রামাই পণ্ডিত ঃ শূন্যপুরাণ

বাংলা শুধু হিন্দুর নয়, বাংলা শুধু মুসলমানের নয়—মিলিত হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভূমি গুলবাগ এই বাংলা।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ সিরাজদ্দৌলা

বাংলার ভাগ্যকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আলপনা, জাতির সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী ; শুধু সুপ্ত সন্তান-শিয়রে রুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাঁকে আশা দেবে? কে তাঁকে ভরসা দেবে? কে শোনাবে জীবনের গান? ওঠো মা ওঠো মোছ তোমার অশ্রুজল, আজ সাত কোটি সন্তান হিন্দু মুসলমান জীবন দিয়েও রোধ করব মরণের অভিযান।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ সিরাজদ্দৌলা

যুক্ত বাংলায় এতকাল হিন্দু মুসলমান পাশাপাশি থাকলেও কিছুতেই যেন সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটেনি ! তার জন্য অনেকটাই দায়ী ফাঁকা হিন্দু উন্নাসিকতা! বাঙালি হিন্দুরা বহুকাল ধরে গোপনে বলে এসেছে—আরেঃ, ঐ লোকটা তো মুসলমান, ও আবার বাঙালি নাকি? যেন মুসলমানরা বাঙালি হতে পারে না। অধিকাংশ হিন্দুই জানে না কিংবা খেয়াল করে না যে, বাংলা ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য যাবতীয় লড়াই বাঙালি মুসলমানরাই করেছে। একটু আগে থেকে শিক্ষা পাবার সুযোগে হিন্দুদের মধ্যে অনেক বড় বড় লেখক জন্মেছেন বটে, কিন্তু সঙ্ঘবদ্ধভাবে বাঙালি হিন্দুরা বাংলাভাষার জন্য কিছুই করেনি। মুসলমানরা সেটা করতে শুরু করেছে পাকিস্তানী আমলেরও অনেক আগে, সেই উনিশ শো সাঁইত্রিশ সাল থেকে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঃ বাঙালি সংস্কৃতির উত্তরাধিকার (দেশ ঃ ১৪.৪.৮৯)

হিন্দুধর্ম ভিন্নধর্মাবলম্বীকে আপন ধর্মে গ্রহণ করে না। কাজেই অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তার ঔৎসুক্য নেই। মুসলমান বিধর্মীকে মুসলমান করতে চায়। উভয়ের মিলনের চিন্তা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত কিংবা মুসলমান মৌলবী কেউ করেন না। হিন্দু পণ্ডিত মুসলমানকে বলেন, 'তুমি দূরে থাকো'। মুসলমান মৌলবী হিন্দুকে বলেন, 'এসো, তুমি মুসলমান হবে'। তৃতীয় পন্থাও যে থাকতে পরে সেটা কারো মনে উদয় হয় না। হিন্দু হিন্দু থাকবে, মুসলমান মুসলমান থাকবে, অথচ উভয়ের মধ্যে মিলন হবে, হৃদ্যতা হবে। এপন্থার চিন্তা করেছিল জনগণ। এটাতে ছিল তাদের প্রয়োজন। তাই এলেন ধর্মের জগতে জননেতা, জনাবতার কবীর দাদু নানক ইত্যাদি।

সৈয়দ মুজতবা আলী ঃ বঙ্গে মুসলিম সংস্কৃতি

'তুমি আমাকে স্পর্শ করলে অপবিত্র হবে কেন? তুমি যবন আর আমি হিন্দু বলে? বলি, হিন্দু আর যবনে পার্থক্য কি? হিন্দুগণ যে জল পান করেন, যবনেও সেই জল পান করেন, হিন্দুগণ যে অন্ন ভোজন করেন, যবনেও সেই অন্ন ভোজন করেন, তোমরাও যাঁকে ঈশ্বর বল, আমরাও তাঁকে ঈশ্বর বলি ; তবে ভাষাগত প্রভেদ, তোমরা আল্লা বল, খোদা বল, রহিম বল, আর আমরা দুর্গা বলি, হরি বলি, বিধাতা বলি ; আল্লা শব্দের অর্থ কি? আল শব্দে নদী, আর লা শব্দে নৌকা, অর্থাৎ যিনি চরণতরী দিয়ে এই ভবসাগর পার করেন, তিনিই হচ্ছেন আল্লা ; আর আমাদের পার করেন কে? না, তিনি হরি......তার পরে ত খোদা, তা আমাদের খোদিত করেছেন কে? না সেই সৃষ্টি কর্তা বিধাতা ; তবে খোদা আর বিধাতা, কিছু মাত্র প্রভেদ নাই, তারপর রহিম আমরা কি রহিম বলি না....বলি দুর্গাপুজার বীজমন্ত্র কী? না, হ্রীং, ঐ হ্রীং শব্দটা পৃথক কর দেখি, কেমন রহিম হয় কি না, আগে র হবে মধ্যে হি হবে, শেষে অনুস্বর বাচক ম হবে.....।'

ধর্মদাস রায় ঃ মথুরা বর্জ্জন (যাত্রা পালা)

হিমাচল/হিমালয়/হিমাদ্রি

অসীম নীরদ নয় ; ওই গিরি হিমালয়!
উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত জলধি ;
ব্যেপে দিগদিগন্তর, তরঙ্গিয়া ঘোরতর,
প্লাবিয়া গগনাঙ্গন জাগে নিরবধি।

বিহারীলাল চক্রবর্তী : সারদামঙ্গল

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মতো। স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ়-ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জনে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ ২৭

হে হিমাদ্রি, দেবাতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারম্বার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরেছেন বিচিত্র মুরতি।
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
দুর্গম দুঃসহ মৌন—জটাপুঞ্জতুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্তরবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল।.......
গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উৎসর্গ ২৮

হিয়া

হিয়ার ভিতর হৈতে কে হৈল বাহির।
তেঞিং বলরামের পহুঁ চিত নহে থির॥

বলরাম দাস : পদাবলী

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়েছিলে দেখতে আমি পাই নি।
তোমায় দেখতে আমি পাই নি।
বাহির-পানে চোখ মেলেছি, আমার হৃদয়-পানে চাইনি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গীতলেখা ৩

নাম-না-জানা প্রিয়া
নাম-না-জানা ফুলের মালা নিয়া হিয়ায় দেবে হিয়া।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : তাসের দেশ

হুজুগ/হুজুক

হুতুম বলেন "হুজুকে কলকেতা"। হেথা নিত্য নতুন হুজুক, সকলগুলিই সৃষ্টিছাড়া ও আজগুব।

কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম) : হুতোম প্যাঁচার নক্সা

হৃদয়

হৃদয়ের মধ্য দিয়াই ঈশ্বর কথা বলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ : রচনাবলী ২

হৃদয় অবশ্য খুব বড় জিনিষ—হৃদয়ের ভিতর দিয়াই জীবনের মহৎ প্রেরণাগুলির স্ফুরণ হয়। যাহার হৃদয় আছে, তাহারই যথার্থ জীবন......., কিন্তু যাহার এতটুকু হৃদয়

নাই, কেবল মস্তিষ্ক আছে, সে শুষ্কতায় মরিয়া যায়।.....আমরা চাই হৃদয় ও মস্তিষ্কের মিলন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনন্ত হৃদয়ানুভূতি থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারবুদ্ধিও থাকুক।

স্বামী বিবেকানন্দ ঃ রচনাবলী ২

হৃদয় এমন বস্তু যেখানে শিকড় গেড়ে কিছু বসে না। খুব সুন্দর নকশা করা আয়না বৈ হৃদয় আর কি!

বিমল কর ঃ শূন্য

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে।
শত বরনের ভাব উচ্ছ্বাস কলাপের মতো করেছে বিকাশ,
আকুল পরাণ আকাশে চাহিয়া উল্লাসে কারে যাচে রে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ক্ষণিকা

হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে।
বেদন-বাঁশি উঠল বেজে বাতাসে বাতাসে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলেখা ২

হৃদয়ে তোমার দয়া যেন পাই।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ গীতলিপি ২

হায় রে হৃদয়,
তোমার সঞ্চয়
দিনান্তে নিশান্তে শুধু পথ প্রান্তে ফেলে যেতে হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ বলাকা ৭

হৃদয়ের খানাখন্দ ঢাকে না কিছুতে
নতুন চাদর কিংবা ফুলের নকশায়!

সন্তোষ দত্ত ঃ ক্ষতচিহ্ন (দরজা খোলো ভেতরে যাবো)

হেঁয়ালি

জগৎ একটা হেঁয়ালি—
যত বা নিয়ম তত অনিয়ম গোঁজামিল খামখেয়ালি!

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ঃ ঘুমের ঘোরে, প্রথম ঝোঁক (মরীচিকা)

এখানকার স্কুলের সেকেন্ড মাস্টার আমার হেয়ালি নাট্যের বিশেষ ভক্ত। তিনি বললেন, আমার 'হেঁইলি নাট্য' বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ নূতন—পড়্যা আমরা হেস্যা কুটপাট'।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ ছিন্নপত্রাবলী, জানুয়ারী ১৮৯০

হেমন্ত

সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে ; চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—।

জীবনানন্দ দাশ ঃ দুজন (বনলতা সেন)

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন—
পথের পাতার মত তুমি ত তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে?—অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন

সেদিন তোমার! তোমার আকাশ—আলো—জীবনের ধার
ক্ষয়ে যাবে সেদিন সকল?

জীবনানন্দ দাশ : নির্জন স্বাক্ষর (ধূসর পাণ্ডুলিপি)

সে দিন আমায় বলেছিলে আমার সময় হয় নাই
ফিরে ফিরে চলে গেলে তাই॥.....
আজি এল হেমন্তের দিন
কুহেলীবিলীন, ভূষণবিহীন।
        বেলা আর নাই বাকি, সময় হয়েছে নাকি—
        দিনশেষে দ্বারে বসে পথপানে চাই॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (নবগীতিকা ২)

হায় হেমন্তলক্ষ্মী, তোমার নয়ন কেন ঢাকা—
হিমের ঘন ঘোমটাখানি ধূমল রঙে আঁকা॥
        সন্ধ্যাপ্রদীপ তোমার হাতে   মলিন হেরি কুয়াশাতে,
        কণ্ঠে তোমার বাণী যেন করুণ বাষ্পে মাখা॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতবিতান)

হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে
হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে॥
ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো—'দীপালিকায় জ্বালাও আলো,
জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (গীতিচর্চা ২)

হেমন্তে কোন্ বসন্তেরই বাণী   পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি॥
বকুল ডালের আগায়   জ্যোৎস্না যেন ফুলের স্বপন লাগায়।
কোন্ গোপন কানাকানি   পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি॥
আবেশ লাগে বনে   শ্বেতকরবীর অকাল জাগরণে।
ডাকছে থাকি থাকি   ঘুমহারা কোন্ নাম-না-জানা পাখি।
কার   মধুর স্মরণখানি   পূর্ণশশী ওই-যে দিল আনি॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গান (নবগীতিকা ২)

হোঁৎকা

কোঁৎকা খেয়ে হোঁৎকা এঁড়ে হাম্বা বলে ছুটে।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : গ্রন্থাবলী

যেমন ক্রমাগত পড়া-শুনা করিলে পড়া-শুনা ভাল হয় না, তেমন ক্রমাগত খেলাতেও বুদ্ধি হোঁতকা হয়।

প্যারীচাঁদ মিত্র : আলালের ঘরের দুলাল

মানুষের বয়স হলে এমন হোঁৎকা হয়ে যায়, কিছুতেই কোনো কথা বিশ্বাস করতে চায় না।

সুকুমার রায় : হ য ব র ল

হোরি/হোরী/হোলি/হোলী

        [illegible]ন মনে লাগে হোরী।
        [illegible] হোরী॥

কাজী নজরুল ইসলাম : ভক্তি-গীতি

ব্রজ গোপী খেলে হোরী খেলে আনন্দ নব ঘন-শ্যাম সাথে।
রাঙা অধরে ঝরে হাসির কুমকুম অনুরাগ আবীর নয়ন-পাতে॥
পিরীতি-ফাগ-মাখা গোরীর সঙ্গে হোরী খেলে হরি উন্মাদ-রঙ্গে,
বসন্তে এ কোন কিশোর দুরন্ত রাধারে জিনিতে এল পিচকারী হাতে॥

কাজী নজরুল ইসলাম : ভক্তি-গীতি

হোলী উৎসবটি অতি প্রাচীন। এই চিত্তবিনোদনকারী মহামিলনোৎসব সম্বন্ধে সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে বাৎস্যায়ন তাঁহার “কামসূত্রে” উল্লেখ করিয়াছেন। কিম্বদন্তী আছে যে একদা অসুররাজ হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী হোলীকা কৃষ্ণভক্ত প্রহ্লাদকে বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ বাহুবেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া অগ্নিতে ঝম্পপ্রদান করে। প্রজ্বলিত হুতাশন হোলীকা এবং প্রহ্লাদকে ত্বরায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ইহাতে হিরণ্যকশিপু যদিও ভগ্নীর অনিবার্য্য মৃত্যুর আশঙ্কায় দুঃখিত হইলেন তবুও প্রহ্লাদের অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের আশায় ততোধিক উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অগ্নি প্রহ্লাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করি না। কিন্তু সেই দাবানলে হোলীকার ধ্বংস হইল। এই হোলীকার নামানুসারেই “হোলী” এবং নর-নারীগণ পুণ্যের দ্বারা পাপের পরাজয়ের এই অবিনশ্বর স্মৃতি যুগে যুগে হোলী-উৎসব দ্বারা অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছে।

বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর : হোলী

কামশাস্ত্রে নিপুণ ও নিপুণা—এমন রসিক ও রসিকার, নায়ক ও নায়িকার জন্যই যেন হোলী সৃজিত হইয়াছে বলিয়া প্রথমে মনে হয় কিন্তু, এই বসন্তোৎসব শুধু পার্থিব জগতে নায়ক নায়িকার প্রেমলীলা ও রস আস্বাদনের সুযোগ ও সাধারণতঃ কণ্টকময় প্রেম-অভিসার-পথকে যেন কণ্টক-বিহীন করিতেছে তাহাই নহে পরন্তু, এই মহোৎসব অতি উচ্চ—অতি মহান্।

নব জলধরসম অপূর্ব্বকান্তি মনোরম ময়ূরপুচ্ছ যাঁহার শিরোভূষণ, যিনি পীতবসন পরিধানে ত্রিভুবন সুন্দর, যিনি সুমধুর বেণুবাদ্যে বিশ্বকে উন্মাদিত করেন, সেই সকল রসের আকর প্রেমসাগর রসিক কৃষ্ণ ও কৃষ্ণপ্রেমে দেহ যাঁহার চিররঞ্জিত, যাঁহার কনকচম্পক নিন্দিত বরণ, যাঁহার পদ্মনয়নে মৃগচাহনি নবপ্রসূত খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল—যাহা নিত্য উপজাত ভঙ্গীতে প্রেমরসিক কৃষ্ণহৃদয় হরণ করে—যিনি নানাহ মনোজ্ঞরূপ ধারণে রসনাগর কৃষ্ণহৃদয়ে নিয়ত বিলাসপরা—সেই কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-নম্রা, সদা কৃষ্ণচিন্তায় নিমগ্না শ্রীরাধাকে কেন্দ্রীভূত করিয়া দোলযাত্রায় রাধাকৃষ্ণের লীলাসঙ্গীতে নর-নারী উৎফুল্ল হইয়া উঠে এবং এই আনন্দে তাহারা শ্রীভগবানের উপস্থিতি অনুভব করিতে পারে। হোলী উৎসবটি যেন নর-নারীর প্রচেষ্টা, প্রেমকে পার্থিব জগত হইতে বহু উচ্চে লইয়া যাওয়া—প্রেমপূর্ণ প্রাণের আবেগকে যেন ভগবানে নিবেদিত করা—ভগবান—যিনি স্বয়ং প্রেমের প্রতিরূপ।

রসসৃজনকারী, রসানুভূতির সুখদায়ক, চিত্তবিনোদনকারী মধুবসন্তে মহামিলনোৎসব হোলীর জয় হউক!

বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর : হোলী

রঙ্গময়! এ কী রঙে রাঙাইলে এ নব ভুবন!
কোথায় সে রসলীলা, কোথা সে আনন্দ-বৃন্দাবন?
চির-সুন্দরের সাথে চির-সুন্দরীর হোরিখেলা—
নবীন বসন্তে আজি কই সেই সুন্দরের মেলা?.......
চেয়ে দেখি আজি চারিধারে

ব্যথাতুরা বসুন্ধরা ভরিয়া উঠেছে হাহাকারে।
সবল দুর্বলে হানে ; শক্তিসুরামত্ত দৈত্য দল
নিত্য নব অত্যাচারে বঞ্চিতেরে লাঞ্ছিছে কেবল!
নগ্নিকা কালিকা নাচে তাথৈ তাথৈ চারিধারে,
ধূমায়িত ধূমাবতী বিষবাষ্প-আচ্ছন্ন আঁধারে,
রঙ্গময়! এ কী রঙ্গ? কই সে আনন্দ-বৃন্দাবন?
এ যে সর্বনাশা হোলি! এ কী লীলা হেরি, নারায়ণ।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী : দোলের দিনে

শুরু হল হোরির, মাতামাতি,
        উড়তেছে ফাগ রাঙা সন্ধ্যাকাশে।
নব বরণ ধরল বকুলফুলে
রক্তরেণু ঝরল তরুমূলে,
ভয়ে পাখি কূজন গেল ভুলে
        রাজপুতানির উচ্চ উপহাসে।
কোথা হতে রাঙা কুজ্ঝটিকা
        লাগল যেন রাঙা সন্ধ্যাকাশে॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : হোরিখেলা (কথা)

হোলী উৎসবের কথা আমরা প্রাচীন বাৎস্যায়নের কামসূত্রেও পাইয়া থাকি। পৌরাণিক সত্যযুগে দৈত্যকুলপতি হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণুভক্তপুত্র প্রহ্লাদের বিনাশ সাধনের উদ্দেশ্যে ভগিনী হোলিকাকে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। হোলিকা এই বর পাইয়াছিলেন যে তিনি কখনোই অগ্নিতে দগ্ধ হইবেন না। প্রহ্লাদকে কোলে লইয়া প্রজ্বলিত লেলিহান হোমাগ্নিতে প্রবেশ করামাত্র হোলিকা দগ্ধ হইলেন। কিন্তু বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদের কেশাগ্রও অগ্নিদেব স্পর্শ করিলেন না।

সেইদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব দিবসের সায়াহ্নকাল ছিল। সেই তিথিকে স্মরণীয় করার জন্য দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু ঘোষণা করিলেন তৎপর তাঁহার সমগ্র রাজ্যে এই দিনটিতে পবিত্র বহ্নিগৃহ রচনা করিয়া হোলিকার স্মৃতিদিবস রূপে সর্বত্র যেন পালিত হয়।

দ্বাপর যুগে এই তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ মেঘাসুরকে নিহত করিয়া এই উৎসবটিকে আরও গুরুত্ব দিয়াছিলেন। বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সখিগণ এই উৎসবটি বসন্ত উৎসব বা মদন উৎসব রূপে পালন করিতে লাগিলেন। তৎকালে দোলমঞ্চ প্রস্তুত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকাকে বসাইয়া দক্ষিণাবর্তে দোলাইয়া তাঁহারা এই উৎসবটি উদ্‌যাপন করিতে লাগিলেন। তদবধি দোলপূর্ণিমা সর্বত্র উৎসব রূপে প্রচলিত হইতে থাকে।

সহদেব বিক্রমকিশোর দেববর্মন : প্রস্তাবনা—হোলী

শীতের অন্তে বসন্ত আসে। তখন মানুষের চারদিকে আকীর্ণ উদ্ভিদ-জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত, নতুন যৌবন আবির্ভূত হয়। গৃহীর ঘরে সংবৎসরের সম্বল সঞ্চিত হয়েছে। গ্রামের দিগ্‌বিদিকে সবুজ-লাল-হলদে-সাদার জৌলুস ফুটেছে। সেকালের মানুষদের কাছে তাই বসন্তের উৎসব ছিল নব-জীবন, নব-যৌবনের হুল্লোড়। এখন পর্যন্ত তাই এই উৎসবের উৎসমূলে জৈব-জীবনের হুল্লোড়ই চলে এসেছে। হুড়োহুড়ি (পুরানো

'হুড়োহুড়ি', 'হোড়' 'হোলাহোল') হুলোহুলি (পুরানো 'হুলাহুলি') দোলের হিন্দি সমার্থক 'হোলি' বা 'হুলি'র সমগোত্রীয়। বসন্ত উৎসবের এই নামটি অর্বাচীন সংস্কৃত অভিধানেও গৃহীত হয়েছে। চতুর্বিধরূপে—হোলি, হোলা, হোলাকা, হোলিকা।

বসন্ত-উৎসবের একটা অঙ্গ ছিল—এখনও বোধকরি কোথাও কোথাও আছে—খড়কুটো দিয়ে ঘরের বা মন্দিরের মতো করে পুড়িয়ে দেওয়া। হয়ত এই সূত্র ধরেই অর্বাচীন কোন কোন স্মৃতিকার 'হোলি' শব্দটির মূলে এক রাক্ষসী হোলিকার কল্পনা করেছেন। এই রাক্ষসীকে পুড়িয়ে মারার স্মরণেই এই উৎসবের এমন নাম হয়েছে। ভারতবর্ষের চিন্তারীতির একটা বড় বিশেষত্ব হল ভাব-কল্পনায় নিয়ে আসা এবং সে কল্পনাকে আবার দেব না দানব (অর্থাৎ ভালো বা মন্দ) ছাপ দিয়ে কাহিনী রচনা। এখানে তেমনি ঘটে থাকতে পারে। অথবা আরও একটা ব্যাখ্যা দিতে পারা যায়। বেদে যজ্ঞ বিঘ্নকারিণী দীর্ঘজিহ্বীর কাহিনী আছে। তাকে ইন্দ্রিয়ভোগের দ্বারা পরাভূত করে ইন্দ্র ঋষিদের যজ্ঞরক্ষা করেছিলেন। এই কাহিনীর আধারে পুরাণে অহল্যা কাহিনী গড়ে উঠেছে। হোলিকা কল্পনায় দীর্ঘজিহ্বী কাহিনীর সূত্র থাকতে পারে। অথবা তাড়কার মতো আর এক বিঘ্নকারিণী রাক্ষসীর কল্পনা থাকতে পারে।

সুকুমার সেন : দোলের কথা (বিচিত্রা)

লেখক সূচি

অ

ড. অচিন্ত্যকুমার বসু — ২০২, ২৭০, ৩২২
ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস — ৫৯৮
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত — ২৫, ৯৪, ৩৮৮, ৩৯২, ৪৭৩, ৪৮৯, ৫২৮, ৫৩৪
অজিত বাইরী — ২৩৮, ২৬৬, ২৮১
অজিত দত্ত — ২৫৬, ৩৭৩, ৪৭৩
অজিত পান্ড়ে — ১৬০, ৪৭৩, ৫১১
ড. অজিতকুমার ঘোষ — ২৭, ৮০, ১০০, ১১৩, ২২০, ২৫৬, ৩১৯, ৩৮৮, ৪১৯, ৫৬৩, ৬১০, ৬১৩
অজিত কৃষ্ণ বসু — ৬৮৩
অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৬৫, ২৭০, ৬১৪
অজ্ঞাত কবি — ৬৮৬
অঞ্জন বসু — ৩৬৯
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৮৩, ৬০০
অতুলচন্দ্র গুপ্ত (অতুল গুপ্ত) — ৩৬, ৮৯, ১৪৭, ৬৩১
অতুলপ্রসাদ সেন — ১০৯, ২২৯, ২৩০, ২৭৩, ৪১৯, ৪৬৬, ৪৭৩, ৬৭১
অদীপ ঘোষ — ৪৭, ৯৪, ১০০, ৩১৯, ৬২৬
অদ্বৈত মল্লবর্মন — ২৬, ২৯৫, ৩১৪, ৩৯২, ৪০৩, ৪৪৭, ৬০২
অনন্ত দাশ — ২৬৩, ৩৯৯
ড. অনাদিনাথ দাঁ — ৯২
অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায় — ২৭৪, ৩৬৯, ৪৪২, ৬৩৪
অনিল সরকার — ১২১, ২৭৫, ৩৮৭, ৪১১
ড. অনিন্দিতা দত্ত — ৩৭৭, ৫৯৪, ৬৩৮
অনীশ ঘোষ — ৫৩৯
অনুরাধা রায় — ৪২১
অন্নদাঠাকুর — ৩৪, ২০৫, ২৩৮, ২৬৮, ২৭৫, ২৭৬, ৩৬০, ৫০১
অন্নদাশঙ্কর রায় — ১২১, ১৩৮, ২০৮, ২২০, ২২১, ২৩১, ৩৪৫, ৩৬৬, ৪৪১, ৪৫৬, ৪৮৫, ৪৯৪, ৪৯৭, ৫০৯, ৫৩২, ৫৩৫, ৬২১
অপর্ণা সেন — ৪৫, ৮৯, ৪২৬
ড. অপূর্ব দে — ২৭২
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — ৭২, ৭৩, ২২৩, ২৮৭, ৫৭০, ৬৫০, ৬৫১
অবন্তীকুমার সান্যাল — ২১৬, ৪৫৯
ড. অভিজিৎ তরফদার — ৭৪, ৫২৮
স্বামী অভেদানন্দ — ৫৪, ৯৪, ৩০২, ৫৩৬, ৬৩৫, ৬৪০
অমর ঘোষ — ৭৯
অমর মিত্র — ২৫২, ৫৩২
অমরনাথ রায় — ৩৪৭

ড. অমরেন্দ্রনাথ সান্যাল — ১৮১, ৫০৪, ৬১৩, ৬৬১
ড. অমর্ত্য সেন — ৯২, ৬৮৪
অমল দত্ত — ২৩৮
অমল রায় — ১৩১, ৪০২, ৪৩৮, ৫২১, ৫৬৯, ৬১১
অমল সাহা — ৪০২
অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৪৭, ৪৩৩
অমলেশ ত্রিপাঠী — ৮৯, ৪৩৮
অমিত কাশ্যপ — ৬৭৪
অমিতাভ গুপ্ত — ১৬, ১২৬, ২৬৮, ৫৬১, ৫৭১, ৬০৯
অমিতেশ মাইতি — ১০৮, ১৮৭, ৫২১
অমিয় চক্রবর্তী — ৫, ৯৪, ২৩৬, ২৯০, ৪১১, ৪৪৮, ৬৫৫
অমিয় চট্টোপাধ্যায় — ৬২
অমিয়কুমার মুখোপাধ্যায় — ২১২
অমিয়ভূষণ মজুমদার — ৩৮৪
ড. অমূল্যভূষণ চক্রবর্তী — ৫৪১
অমৃতলাল বসু — ২৯৪, ৩১২, ৩৪৭
অম্লান দত্ত — ৩৫৭, ৫২১, ৫৫৯, ৫৯৩, ৫৯৪, ৬৮২
অযোধ্যানাথ পাকড়াশী — ৩৩২
ঋষি অরবিন্দ (শ্রী অরবিন্দ/অরবিন্দ ঘোষ) — ৫৫, ৮৬, ২৯২, ৩৮১, ৪৩২, ৫৮৬, ৬৩৯
ড. অরুণ দত্ত — ২০৬, ৩৯৯
অরুণ মিত্র — ১২৫, ২৩৩, ৬৩২
ড. অরুণ সান্যাল — ১০১
অরুণ মুখোপাধ্যায় — ২৯, ৩২৪
অরুণকুমার চট্টোপাধ্যায় — ১৩৮, ২৮৪, ৫৬৮
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — ৫২, ১০১
অরুনকুমার সরকার — ৩২৭, ৩৯৩
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত — ৫৯, ৩৮৭
ড. অশোক কুণ্ড — ৪০২, ৫৯৩, ৫৯৬
অশোক পালিত — ৬২
অশোক মুখোপাধ্যায় — ২৭, ২৯
অশোক রায়চৌধুরী — ১৩০, ২২১, ৫৮৩
ড. অশোক কুমার মিশ্র — ৩৮৮, ৫৪২
অশ্বিনীকুমার দত্ত — ৬০৭
ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ৫০, ১০১, ১৫৫, ১৫৯, ১৭৪, ১৮৭, ৩৪৮, ৪১৫
অসীম রায় — ৪৫
অসীম রেজ — ৩৪৮, ৫১১, ৫৯৭, ৬৬৮
অহীন্দ্র চৌধুরী — ২৭, ৩২২, ৩২৩
অলক সান্যাল — ৫৪১

আ

আখতার হুসেন — ২৭৫
আজকাল — ১৯৯
আজিজুল হক — ৯০, ১৩১, ১৬৭, ২৮৯, ৩০৭, ৩১১, ৩৬৯, ৪২৩, ৪৩৮, ৬০০
আনন্দবাজার পত্রিকা — ৭০, ৯৪, ১৩৭, ১৬৬, ২০৬, ২০৭, ২২৭, ৩১৬, ৬৮৫
আনন্দময়ী মা — ৩০২, ৩২৬, ৩৯০, ৪৬১, ৫৫৩, ৬৩৯
আফরোজা খাতুন — ৩২৭, ৫১৭
আবদুল জব্বার — ১৭৮, ২৫২, ২৭৯, ৪৪৮, ৪৫৪
আবদুল গাফফার চৌধুরী — ১১০
আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ — ২৮১
আবু সয়ীদ আইয়ুব — ৫৮, ১২৬, ৩৯৩, ৩৯৭, ৫৯৭
আবুল বাশার — ১৩৯, ১৫৭, ১৭৮, ২৭৯, ৩৬৩, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৯৩, ৪৭৩, ৫৬৬, ৬৩৫
আবুল মনসুর আহমদ — ৪৩, ১১৬, ৫৩২
আলাওল — ৪৮১
আলোক সরকার — ৫৭, ৯৯, ৪৫৩
আশাপূর্ণা দেবী — ৪৫, ১৪০, ৩৩২, ৩৬৭,৩৭৩, ৪৩৪, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩২, ৬৫৮
আশিস সান্যাল — ৪৭৩
ড. আশিস কুমার দে — ৫৯
ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য — ১৮৩, ২৩৭
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় — ২৮৫, ৫৭৩

ই

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৩১, ৩৫০, ৫৩৫

ঈ

ড. ঈশিতা মুখোপাধ্যায় — ৩৪৪
ঈশ্বর ত্রিপাঠী — ৩৪, ৪৭, ৯৪, ১০৫, ১২২, ১২৫
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত — ১৯৫, ২২৫, ২৩৪, ২৫২, ২৮৪, ৪৩৭, ৪৫৯, ৫০৩, ৫০৫, ৬৯০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর — ১, ৯, ১২, ২৫, ৬২, ৯৪, ২০৬, ২১২, ২৭২, ৩৫৪, ৩৮০, ৩৮১, ৫০৪, ৫২০

উ

উৎপল দত্ত — ২৭, ২৮, ২৯, ৪২, ১০৮, ১১১, ১৭৩, ১৮৯, ২৩১, ২৫৭, ৩১১, ৩১৯, ৩২২, ৩৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৭৩, ৬০৫, ৬৭০, ৬৮৬
উৎপল কুণ্ডু — ৬২
উৎপলকুমার বসু — ৪৯৩,
ড. উত্তম দাশ — ৫৪, ৫৮৬
উৎসে মানুষ — ২৪৭
উপেন কিসকু — ২৭৫

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় — ৪০২,৪৩০
ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — ৫৬৩
স্বামী উমানন্দ — ৪৪০
উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — ৩৪, ১০৮, ১৭২, ১৭৮, ২৬৫, ২৯২, ৩৫৫, ৩৭২, ৪৫৪, ৫৩৫, ৫৩৭, ৬০১, ৬২৫, ৬৭৮

ঊ

ঊষা গাঙ্গুলী — ২৭০, ৩৩১

ঋ

ঋত্বিক ঘটক — ৫০৫

এ

এ. মান্নাফ — ২৩৪, ৫০৫
এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় — ০
এন্টনী ফিরিঙ্গী — ২৮৪
এস ওয়াজেদ আলী — ২৫৬

ক

কনক মুখোপাধ্যায় — ২৫৩, ৪৩৩, ৫২৯
কণা বসুমিশ্র — ২৩৮, ৩৯৩, ৪০৮, ৪০৯, ৪৮৯, ৫২৯, ৬৫৯
কবিতা সিংহ — ৪৩৬, ৪৪৩
কমল মুখোপাধ্যায় — ৫৮১, ৬৮২
কমলাকান্ত (কমলাকান্ত ভট্টাচার্য) — ৫৫, ৬১, ১৫২, ৬০৭
কমলেশ সেন — ১৬৭, ৩১১, ৪৬৪, ৪৬৫
করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় — ৪০৮
ড. কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় — ৭, ১১, ২৪৫
কাজী আবদুল ওদুদ — ১৬৩
কাজী নজরুল ইসলাম — ৬, ৭, ৮, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ২১, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৬, ৪৭, ৫০, ৮০, ৯২, ৯৩, ৯৯, ১০০, ১২২, ১৪৬, ১৫০, ১৫২, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ১৮৩, ১৯১, ১৯২, ১৯৮, ২০১, ২১০, ২১৭, ২২৬, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৪, ২৬৪, ২৬৬, [illegible], ২৮৫, ২৯৫, ৩০২, ৩০৯, ৩১২, ৩১৪, ৩১৬, ৩২৭, ৩৩৬, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫৯, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৭৯, ৩৮৬, ৩৯১, ৩৯৯, ৪০০, ৪২৩, ৪৩২, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৪৮, ৪৬১, ৪৭৪, ৪৮৩, ৪৮৯, ৪৯৪, ৪৯৯, ৫০৫, [illegible], ৫১৮, ৫২১, ৫২৫, ৫৩৮, ৫৪১, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৮২, ৫৮৭, ৫৯৩, ৫৯৬, ৬০৪, ৬০৭, ৬০৮, ৬১৬, ৬২৪, ৬৩৫, ৬৪১, ৬৫১, ৬৫৪, ৬৫৬, ৬৭১, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৮৬, ৬৯০, ৬৯১
ড. কাননবিহারী গোস্বামী — ২১৬
কামিনী রায় — ২৩২, ৬৪৯, ৬৫৮

কালিদাস রায় — ২২৫, ২২৬, ৪৪৭, ৫০৫, ৫৯৩
কালীপ্রসন্ন ঘোষ — ৩৮, ২৭২
কালীপ্রসন্ন সিংহ (দ্র. হুতোম) — ২, ৪৬, ২৫৯, ৪২১, ৪৪৮, ৫৪৩, ৬২৮, ৬৮৮
কাশীরাম দাস — ২, ৩৭, ১২০, ১৫০, ২৯৮, ৩৭৯, ৫০০
কাহ্নুপাদ — ২৬১
কিন্নর রায় — ৪৫০, ৫৭৩, ৫৯৭
ড. কুন্তল মুখোপাধ্যায় — ৫৫২, ৫৮৮
কুবীর — ২৬১
কুমারেশ চক্রবর্তী — ৩৫৪, ৫৫১, ৬১৫
ড. কুমারেশ চক্রবর্তী — ৫৫৯
কুসুমকুমারী দাসী — ২২৮
কৃত্তিবাস — ১, ৭৪, ১৩৩, ১৯১, ৩১৭, ৩১৮, ৩৬১, ৪৪৪, ৫৫৬, ৬২০, ৬৬৬
কৃষ্ণ ধর — ১৯৬, ২৩৮, ২৭০, ৪৮৭
কৃষ্ণচন্দ্র ভূঞা — ৫০৩
কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার — ১০৫
কৃষ্ণদাস কবিরাজ — ২, ১১৪, ১৫০, ১৬০, ১৬২, ৩২৬, ৩৪৩, ৩৫৩, ৩৮৮, ৪৪২, ৪৫১, ৪৫৬, ৫৫৫, ৬৪৭
কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৫২
কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য — ৬১১
ড. কৃষ্ণা বসু — ৩৩১, ৫২৯, ৫৩০
কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ — ১২১
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৪৪৫, ৫০২, ৬১৭
কেশবচন্দ্র সেন — ১১, ১৯৪
ক্ষিতিমোহন সেন — ৩৫৪, ৪১৫
ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ — ১০, ২৪, ১৮৭, ২০৫, ২৯৫, ৩৩৪, ৩৫৪, ৬৬১

খ

খগেন্দ্রনাথ' মিত্র — ৪৫২
খনার বচন — ১০৫
খালেদ চৌধুরী — ৫৯৭
খোন্দকার সিরাজুল হক — ৫৬৪

গ

গঙ্গাপদ বসু — ১১,
গঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী —
গণশক্তি — ৪৪.২,
গিরিশচন্দ্র ঘোষ — ১২১, ৩১২, ৩৮৪, ৫৫১
গিরিশংকর — ২৯৮, ৫০০
গোপাল হালদার — ৫৯, ১৩১, ১৫১, ৩৪৮, ৪০০, ৪৩৮, ৪৫৪, ৫১৭, ৬০৫, ৬১৪, ৬৭৮

গোপালচন্দ্র রায় — ৫৮৫
গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু — ৪১৭
গোবিন্দদাস — ৪, ৩১, ৩৩৯
গোবিন্দ ভট্টাচার্য — ৩৬৫, ৫২০, ৫৫৩, ৫৬০
গোবিন্দচন্দ্র রায় — ৪৬৬
ড. গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় — ৬৩৯
গোলাম মোস্তাফা — ৩৫৭, ৪২১, ৫৮১, ৬০১
ড. গৌরী ভট্টাচার্য — ২৫৫, ৪৬৪, ৬৪২
ড. গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য — ৬১৩

ঘ

ঘনরাম চক্রবর্তী — ১৫৭
ঘোষণাপত্র — ৬৪০
(ইতিহাসবিদদের সমাবেশ — '৯৩)

চ

স্বামী চণ্ডিকানন্দ — ৪৪৩
চণ্ডীদাস — ১৫, ৭১, ১৩৭, ১৯৬, ২০১, ২৮৪, ৩৬৪, ৪০৪, ৪৬২, ৫০৫, ৫৩৮, ৫৫৬
চন্দন সেন — ৫৫১
চন্দ্রাবতী — ১২১
চন্দ্রিল ভট্টাচার্য — ২৪৪, ৫৪৬
চাঁদ কাজী — ৪২৪
চারু মজুমদার — ৪২, ১৩২, ১৬০, ২৪৪, ৩৬৩, ৪৩৮
চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৪৪
চিত্তরঞ্জন মাইতি — ৫২১, ৫৭৬, ৬৫৬
ড. চিত্তরঞ্জন লাহা —
চিদানন্দ দাশগুপ্ত — ২০৩, ৬৫৯
চিন্তামণি কর — ২২৮
চিররঞ্জন দাস — ৩৫০
চুনী গোস্বামী — ৪০০
চৈতন্যময় নন্দ — ৫৪৪

ছ

ছবি বিশ্বাস — ২৮, ৫৪২

জ

জগদানন্দ রায় — ২৯৬
জগদীশচন্দ্র ঘোষ — ৪৮৮
ড. জগদীশচন্দ্র বসু — ৩২, ১৮১, ৪৫০, ৪৮২

ড. জগন্নাথ চক্রবর্তী — ৬৫৮
জগন্নাথ বসু — ২৯
জয় গোস্বামী — ১৮১, ১৮৭, ২৬৬, ২৯৭, ৪৬১, ৫৬৩
জয়ন্ত বসু — ৩৫৪
জয়ন্ত সুকুল — ৪৭৪
জয়ন্তী চট্টোপাধ্যায় — ২৭৩, ৪৮৫
জসীমউদ্দিন —
জরাসন্ধ — ৩০
জলধর সেন — ৩৫১
ড. জহর সেন মজুমদার — ৪৭, ৬৭৮
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী — ১৫৭, ১৭২, ২৬১, ২৬২, ৩০৬, ৩০৭, ৩৬৭, ৫৫৮, ৫৭৮
জিয়া হায়দার — ১১৩
জীবনানন্দ দাশ— ৩, ১৬, ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৭, ৭০, ৭১, ৭৪, ১২২, ১২৬, ১৫৮, ১৬৬, ১৯০, ১৯৭, ১৯৮, ২১১, ২১৩, ২৫৬, ২৬৫, ২৬৬, ৩১৭, ৩২৭, ৩৭৬, ৩৭৯, ৪৬৪, ৪৯৭, ৫২১, ৫২২, ৫৪৩, ৬০০, ৬০২, ৬৩১, ৬৩২, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৭২, ৬৭৮, ৬৮৯, ৬৯০
জেলেপাড়ার সঙ — ২৫৩
জ্যোৎস্নাময় ঘোষ — ৪০৮, ৫৭৪
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর — ৪৬৭
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী — ৩২৭, ৬৭৬
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র — ৫১৪
জ্ঞানদাস — ৪, ১০৬, ৪০৪, ৪২৪, ৫৬১
জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস — ১, ২০, ২৬, ৫০, ৮৬, ১০৩, ২৩৭, ২৮৫, ৪৩৩
জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় — ১৭৩

ঠ

ঠাকুরদাস চট্টোপাধ্যায় — ১০৫, ৪৮৯
ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় — ২৪৫

ত

তরুণ রায় (দ্র. ধনঞ্জয় বৈরাগী) — ৬৩, ৬৪৯
ড. তাপস রায় — ২৩৩, ২৫৫, ৩০৩, ৬৭২
তাপস সেন — ৫১৯
তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় — ৩৬৯, ৫১৭
তারাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৩, ৮৯, ২৩৫, ২৬৫, ৪৫৯, ৬০৬, ৬০৭, ৬৩৯
তারাপদ রায় — ৪৪১
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — ৭, ৩৩, ৪৬, ৫১, ৫৬, ৭২, ৯৪, ৯৫, ৯৯, ১০৯, ১৫৪, ১৫৫, ১৮৩, ১৮৭, ১৯৬, ২২৮, ২৩৮, ২৫৯, ২৭২, ২৯৩, ৩০৩, ৩২৭, ৩৫৪, ৩৮৯, ৩৯৩, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৪১, ৪৭৪, ৪৯৪, ৫২২, ৫৯৭, ৬০৬, ৬১৬, ৬৩৮

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় — ৪৬৫, ৫৭৫
তুষার রায় — ৫২২
স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ — ৫৩, ৪৮২
ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় — ২৯০, ৩৮৯

দ

স্বামী দয়ানন্দ — ৬১৭, ৬২০
দাশরথি রায় — ১০৬, ১৩০, ১৫২, ২৯৭, ৩৫৯, ৪৮২, ৬০৮
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৪৯, ১৭৩, ৩১৯, ৩২০, ৩২৩, ৫১০, ৬১৭, ৬৩১, ৬৪১, ৬৪২
দিনেশ দাস — ২১৯, ৪৭, ১২২, ১৫৪, ৪১৫, ৪৩১, ৫৫৪, ৫৬০, ৬২৬
ড. দিনেশচন্দ্র সরকার — ৯০
দিলীপকুমার গুপ্ত — ৪৫১
দিলীপকুমার রায় — ৫৯৭
দিব্যেন্দু পালিত — ৫০৫
ড. দীনেশচন্দ্র সেন — ৪৫২
ড. দীপক চন্দ্র পোদ্দার — ২০২, ৩১৯
ড. দীপঙ্কর রায় — ১১৩, ১৪১, ৪৫৫
দীপশিখা পোদ্দার — ৬৭১
দীপ্তিময় রায় — ১৫৩
দুলেন্দ্র ভৌমিক — ৫, ৩৩৫, ৫২২, ৫৩০, ৫৯১
দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৭২
দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায় — ৬২
দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩৫৭, ৪৪৬, ৫৭৭
দেবী রায় — ২৩৮, ৩৯৭
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় — ১১, ৪৩৩, ৫৭৬
দেবেন্দ্র মিত্র — ৬০১
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — ৯৫, ২৪৫, ৩৫৬, ৩৭০, ৩৭১
দেবেন্দ্রনাথ সেন — ২১০, ৩৪৩, ৩৪৫, ৫১৭, ৫৬১
দেবেশ রায় — ২৭৫
দেশ — ৪১
দৌলত কাজী — ৫২২
দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় — ৪৬৬
দ্বিজ চণ্ডীদাস — ৪০৪
দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৭০, ৫৫২
দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর — ৮৮, ২৪৭, ৬৮৩
দ্বিজেন্দ্রলাল রায় — ৮২, ১০০, ১১৫, ১৩২, ১৫০, ১৭২, ২০৩, ২৩৩, ২৬৬, ৩০৩, ৩২৮, ৩৪৭, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৪০৫, ৪১২, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৬২, ৪৬৮, ৫১৮, ৫৪৫, ৫৯১, ৬৪৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৭৮
দীনবন্ধু মিত্র — ৪৪৮, ৪৮৮

ধ

ধনঞ্জয় বৈরাগী (দ্র. তরুণ রায়) — ৩৬০

ধর্মদাস রায় — ৬৮৭
ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে — ৫৭
ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় — ৩৬৭, ৪০৫
ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় — ৪২

ন

আচার্য নগেন্দ্রনাথ — ৫০০, ৬১৩, ৬১৫, ৬৩৯
নগেন্দ্রনাথ বসু — ৫৩৪
নচিকেতা ভরদ্বাজ — ২৬৬
নন্দগোপাল ভট্টাচার্য — ৫৩২, ৬১২
নন্দগোপাল সেনগুপ্ত — ২০৮, ৫২২
নন্দলাল বসু — ২২৩, ৫৯৮
নলীনীকান্ত গুপ্ত — ১২৬
নবকুমার শীল — ৫৭১
নবনীতা দেবসেন — ৩৯৩
নবীনচন্দ্র সেন — ৪১, ৮০, ১৪২, ১৫৮, ৩৫৭, ৩৬৪, ৪৯২
নরহরি সরকার — ১৯৩
নরোত্তম দাস — ১৯২, ৬৭১
নার্গিস সাত্তার — ১৯৪, ৩৯০
ড. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় — ১৬৭, ২২৮, ২৯২, ৪১৮, ৪৫৪
নারায়ণ চৌধুরী — ২২, ২১০, ৫৭৩
নারায়ণ সান্যাল — ১৬৫, ২৭৯, ৪১৬, ৫৯৯
নিমাই ভট্টাচার্য — ৬৪৯, ৬৮৬
নিমাইচন্দ্র পাল — ২০৮
ড. নিমাইসাধন বসু — ২০৭
ড. নির্মল দাশ — ৪৭৮
নিরূপ মিত্র — ১৩, ২২, ২৩৮, ২৫৭, ৩২০, ৩৮৬, ৩৯৩, ৪০৯, ৪৩৯, ৪৪৯, ৪৭৪
নিশিকান্ত বসু রায় — ১৫, ২৫
নীতিশ বিশ্বাস — ২৭৫
নিরঞ্জন গোস্বামী — ৫১৯
নীরদচন্দ্র চৌধুরী — ৩৫, ১৩৫, ৩৫৩, ৪২১, ৪২৩
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী — ৫৯, ১০৫, ১২৩, ১২৬, ২৭৯, ৪৬১, ৪৭৪, ৫২২, ৫৬৫, ৬১৫
নীলকণ্ঠ সেনগুপ্ত — ২৭০, ৫৫২
নীলমণি দাস — ৫৩৯
নীললোহিত (দ্র. সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়) — ২০৫, ২৫৭, ৪৫৩, ৪৭৪, ৫০৫, ৫০৮, ৫৯৮, ৬২১
নীলাচার্য — ৬৫, ৪৯৪
নীলাঞ্জন কুমার — ৬৫৬
ড. নীহাররঞ্জন রায় — ৫২০, ৫৪৬
নৃপেন্দ্র সাহা — ৩২২, ৩৬৩, ৬১৪

প

ড. পঞ্চানন চট্টোপাধ্যায় — ২২, ৫৯৮
পবিত্র মুখোপাধ্যায় — ৯৫, ১৪৬, ১৬২, ২৮১, ৩৯৪, ৫২৩, ৫৯৮, ৬৬২
ড. পবিত্র সরকার — ২২২, ৪৭৮
পরমানন্দ — ১৯৩
পরশুরাম (দ্র. রাজশেখর বসু) — ২০, ১৬৫, ১৯০, ২৫৯, ৩৬৯, ৩৯৪, ৪০৬, ৪১৭, ৬৪৮, ৬৬১
পরিতোষ সেন — ২২২, ২২৩, ৩০৭, ৫৪০
পরিমল হেমব্রম — ৫৭
পরেশ মণ্ডল — ৪৭, ৫২৩, ৬৭৮
ড.পল্লব সেনগুপ্ত — ৩৮৫
পাঁচু রায় — ৪৪৫
ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় — ৬৩৭
পার্থ ঘোষ — ৬২
ড. পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় — ২০৫
পি. সি. সরকার (জুনিয়র) — ২৩৫, ২৩৯, ২৮৫, ৪৫৩, ৫৩৩, ৬৮৪
ড. পীযূষকান্তি মহাপাত্র — ১৯৪
স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ — ২৪, ৩২৮, ৪৬১, ৫৮৮
পূর্ণেন্দু পত্রী — ১৩৫, ২৩০, ৪২৩, ৫৩৩
পূর্বা সেনগুপ্ত — ২৮৫
প্যারীচাঁদ মিত্র — ২০৫, ২২৮, ৪৪২, ৫৭৪, ৬১৫, ৬৯০
স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ — ৪৪৩
প্রজ্ঞানানন্দ স্বরস্বতী — ৬৭০
প্রণব রায় — ২৪৬, ৫৮১
ড. প্রণবকুমার নায়ক — ২২৯
প্রণবরঞ্জন ঘোষ — ৪৬৯
প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় — ১২৭
শ্রীশ্রীপ্রণবানন্দ — ৫৬, ২৪৫, ৩৩২, ৪৫৭, ৬২৮
প্রণবেশ চক্রবর্তী — ৫৪৪
ড. প্রতাপচন্দ্র চন্দ — ৯০, ৯১
প্রদীপ ঘোষ — ৬৩
ড. প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় — ৩৫৮
প্রফুল্ল রায় — ১৬৯, ৪৮৯, ৫৬৯, ৬৬৬
ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ — ৪৬৯
ড. প্রফুল্লচন্দ্র রায় — ৫৩, ২২৬, ২৪৬, ৩৬১, ৩৮৯, ৪২১, ৪২২, ৫৯৪, ৬১৭
ড. প্রবোধকুমার ভৌমিক — ৫৭, ২৫৫
প্রবোধকুমার সান্যাল — ১৭২, ২৯০, ৩১৪, ৩২৮, ৪৮৯, ৫২৩, ৫৫৫, ৬০০
প্রমথ চৌধুরী — ২৭, ৪০, ৫৯, ৭৩, ১৮৩, ১৮৭, ২২৮, ২৪৬, ৪০২, ৪২২, ৫৪০, ৫৪৯, ৫৭৩, ৫৭৭, ৫৯৪, ৬০৯, ৬১১, ৬২১, ৬২৬, ৬৩৯, ৬৪২, ৬৬১
প্রমথনাথ বিশী — ২, ১০১, ১০৬, ১৭১, ২০৭, ২০৮, ২৩৬, ২৫৩, ২৫৯, ৩০৩, ৩০৯, ৩৫১, ৩৫৩, ৩৬০, ৩৬৯, ৩৭৭, ৪৫০, ৫৪২, ৫৬৫

স্বামী প্রমেয়ানন্দ — ৭১
প্রমোদ বসু — ৬৬৯
প্রেমেন্দ্র মিত্র — ৩, ৪৭, ৫৫, ১১৩, ১১৯, ১২৩, ১২৬, ১৪১, ২২০, ২২৭, ২২৮, ২৪৪, ২৪৮, ২৫৭, ২৬৭, ২৯৪, ২৯৮, ৩১২, ৩১৩, ৩৪০, ৩৪৮, ৩৯৯, ৪৩৭, ৪৫৫, ৪৯৮, ৫০৫, ৫১৬, ৫২৩, ৫৩৪, ৫৬০, ৫৯৬, ৬০১, ৬০৪, ৬২৬, ৬২৯, ৬৪৭, ৬৫৯, ৬৭২

ফ

ফজলুল করিম — ৩১৭, ৬৬৩
ফাদার দ্যতিয়েন — ৩০, ২৮২, ৩৪৬, ৪৩১

ব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ১, ৩, ৪, ৭, ১০, ১২, ১৩, ৩৬, ৩৯, ৪৬, ৫৬, ৮১, ৯২, ৯৫, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০৩, ১০৯, ১৪৫, ১৪৭, ১৬০, ১৬১, ১৭৯, ১৮০, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯১, ১৯৭, ২০৭, ২২০, ২৪৩, ২৪৬, ২৪৭, ২৫১, ২৫৩, ২৫৭, ২৬৫, ২৬৮, ২৭২, ২৭৪, ২৮২, ২৮৫, ৩০৩, ৩০৯, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৪৪, ৩৫৭, ৩৬০, ৩৭১, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৩, ৪০৫, ৪১৫, ৪৩০, ৪৩৪, ৪৩৯, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৫১, ৪৫৮, ৪৭৫, ৪৮২, ৪৯২, ৫০২, ৫২০, ৫৫৩, ৫৯৩, ৬৪১, ৬৪৭, ৬৪৯, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬৩, ৬৬৬
বর্তমান — ২৮৭
বদরুদ্দিন উমর — ৪৩৫, ৫১৮
বনফুল — ২, ১৩৫, ১৫২, ১৫৬, ১৮৯, ২০৫, ২৫৩, ২৬০, ২৭৯, ৪৫৪, ৫৬৫, ৬১৪, ৬৪৩, ৬৫৭
ড. বরুণ চক্রবর্তী — ৫৭১
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় — ২৭৯
বলরাম দাস — ৫০, ৩৬৪, ৬৮৮
বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর — ৩৮০, ৩৮৮
বড়ু চণ্ডীদাস — ৩৮৫, ৪২৪, ৬৭২
বহুরূপী — ৩২০
বাংলা প্রবাদ — ৫, ১৯, ৪৩, ৫৫, ৮১, ৯৮, ১০৮, ১১৭, ১৪০, ১৫২, ১৯৮, ২৫৩, ২৬১, ২৬৪, ২৭৩, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩৭৫, ৪০৪, ৪০৭, ৪৪০, ৪৫০, ৪৫৮, ৪৬১, ৪৬৫, ৪৭১, ৪৯২, ৫০২, ৫২০, ৬২০, ৬৮২
বাংলা ছড়া — ৪০৩
বার্ণিক রায় — ৩২৮
বাণী বসু — ৩০৩, ৫২৩, ৫৩০
বাদল সরকার — ৬৮২
বাসব সরকার — ১১০
ড. বাসন্তী চাকী — ২৮, ৩০, ৫৭৫
বাসুদেব ঘোষ — ১৯৩
বাসুদেব দেব — ১১৯, ৪৮৩, ৬৬৯
বিজন ভট্টাচার্য — ১৭৩, ১৭৮, ৩৮৯, ৪৮৭, ৫৫১

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী — ৪৫১
বিদ্যাপতি — ১০৬, ১৯০, ২৬৫, ৫০৩, ৫১২, ৬৭১
বিধায়ক ভট্টাচার্য — ৪৩৫, ৪৭৫, ৪৮৭, ৫৬১
ড. **বিনতা রায়চৌধুরী** — ৬৩৪, ৬৫১
বিনয় ঘোষ — ১১৪, ৪৩৪, ৫৪৪
বিনয় মজুমদার — ২৪৫
বিপিনচন্দ্র পাল — ২৪৩
স্বামী বিবেকানন্দ — ১৩, ১৯, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৮৫, ৯৩, ৯৫, ১০৪, ১১৭, ১৪৭, ১৭৮, ১৮৭, ১৮৮, ১৯৪, ২০২, ২১৬, ২৪৬, ২৬৮, ২৮৫, ২৯০, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৭, ৩০৮, ৩২৮, ৩৪২, ৩৫৩, ৩৫৬, ৩৭৯, ৪০০, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৬১, ৪৬৭, ৪৮৩, ৫০০, ৫০৫, ৫১৮, ৫৩৬, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬৫, ৫৭৯, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৬০১, ৬০৫, ৬১১, ৬২৫, ৬৩৫, ৬৪০, ৬৪২, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৫৮, ৬৬১, ৬৬৭, ৬৭০, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৮, ৬৮৯
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৭, ১২, ৩৩, ১৫৫, ২৬৭, ২৭৪, ২৯২, ৩৩৬, ৩৯৪, ৪০৮, ৪০৯, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৫১৪, ৫৩৭, ৬০১, ৬৩৬
বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় — ৫৩০
বিমল কর — ২০, ১৬৮, ২৩৯, ৪৭১, ৫৮১, ৬২৬, ৬৮৯
বিমল মিত্র — ৪৩, ৫২, ১৩৮, ১৪৫, ১৪৫, ১৯৮, ২০৫, ২৮২, ৪২৯, ৫০০, ৫২৩, ৬১৭, ৬৮২
ড. **বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়** — ৩৯, ৪২, ২৪৬, ৩৯৭, ৬৪৩, ৬৫০
বিমলচন্দ্র ঘোষ — ১৭৩, ৩৬৩, ৫৮৩
বিষ্ণু দে — ৪, ৫৯, ৮৩, ২০১, ২২৯, ২৩৯, ২৫৬, ৩৭১, ৩৯২, ৩৯৮ ৪২৬ ৫৪৩, ৫৭২, ৮৭, ৬২৯, ৬৬২, ৬৬৮, ৬৭৮
ড. **বিষ্ণু বসু** — ২৭০, ৩৫০, ৫৯৮
বিশ্বজিৎ ঘোষ — ৫১৬
বিশ্বজিৎ রায় (আ. বা. পত্রিকা) — ১৬৪
বিশ্বজিৎ রায় — ১৬৭
বিহারীলাল চক্রবর্তী — ৪৪৯, ৬৮৮
বীর বিক্রমকিশোর মাণিক্য বাহাদুর — ৬৯১
বীরেন সাহা — ১৯৭, ৩১৪, ৪৭৫
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ১৯, ৪৩, ১২৭, ২৮২, ৪৮২, ৫৫১, ৫৫৪
বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩৫০
স্বামী বীরেশ্বরনন্দ — ২৬৮, ৪৩৯, ৫০৩
বুদ্ধদেব গুহ — ৪৬, ৯১, ২৫৪, ৪৩৪, ৬২৪
বুদ্ধদেব বসু — ৫৩, ৫৯, ৯২, ৯৫, ১০৫, ১৫০, ২১৩, ৩৩১, ৩৩২, ৩৫১, ৩৮৫, ৩৯৪, ৪০৭, ৪৩১, ৪৩৪, ৫০৬, ৫২৯, ৫৪৭, ৫৫৫, ৫৬০, ৫৭২
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য — ১২৭, ৩২০, ৫৫২, ৬১১, ৬২৬
ড. **বেলা দত্তগুপ্ত** — ৫৪
ড. **বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়** — ৬২৯
বোরিয়া মজুমদার — ১৬৫
ব্রজেন্দ্রকুমার দে — ৪১৮

ব্রত চক্রবর্তী — ৫৯, ৩৬৬, ৪০৯, ৫২৩
ব্রহ্মচারিণী বেলাদেবী — ৪৬৩
স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ — ২৬২, ৫৫৭

ভ

ভক্তমাল গ্রন্থ — ৪১
ভবতোষ শতপথী — ৪৮৫, ৬১২, ৬৭৫
ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৪৩০
ভবানীপ্রসাদ মজুমদার — ৫৪, ৫০৬
ভবানীপ্রসাদ সাহু — ৯৫, ২৪৭
ভানু চট্টোপাধ্যায় — ৪৩
ভারতচন্দ্র রায় — ৩১, ৫২, ৮৬, ৯৮, ১৫৮, ১৬৩, ২০৪, ২৫৭, ২৯২, ২৯৮, ৩১১, ৩২৮, ৩৪৭, ৩৬৪, ৪৪৮, ৫১১, ৫১৩, ৫১৬, ৫৬৫, ৬০৭, ৬২১
ড. ভারতী মুখোপাধ্যায় — ৩৬
ভুবনেশ্বর চক্রবর্তী — ১৯৪
ভুসুকুপাদ — ৬৭২
স্বামী ভূতেশানন্দ — ৪৬০
ড. ভূদেব চৌধুরী — ৫৮, ১০২, ১৭৫, ১৭৬, ২১৬, ২২৯, ৩৮৫, ৬৫৯
ভূদেব মুখোপাধ্যায় — ১৫৭, ৩৬৩, ৪২৬, ৪৭০, ৫০৯, ৫১৮, ৬৪০
ড. ভূমেন্দ্র গুহ — ৬৬২

ম

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় — ২৩০
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত — ৩০৪, ৪৮৬, ৫২৩
মতি মুখোপাধ্যায় — ২৬৫, ৩৪২
মদন মাস্টার — ১৫৩
মদনমোহন তর্কালঙ্কার — ৩৬০
মধুছন্দা মিত্র ঘোষ — ৫৩০
মধুসূদন দত্ত — ৫, ৩৮, ৮১, ১২৩, ১৩৭, ১৫০, ১৫৯, ১৯০, ২২৫, ২৬৪, ৩০১, ৩৩৯, ৩৪৩, ৩৮৩, ৪০৭, ৪৩৫, ৪৩৭, ৫০০, ৫১২, ৫২০, ৫৫৩, ৫৮৭, ৬২৬, ৬৪৮, ৬৬১
মনোতোষ রায় — ৫৩৭
মণিভূষণ ভট্টাচার্য — ৮৫, ৬০৯
মণীশ ঘটক — ৩৩, ৫৬০, ৫৮০
মণীশ মিত্র — ২৭১
মনোজ মিত্র — ৩২০, ৩২৬, ৪৩৯
মনোহর বিশ্বাস — ২৭৫
মন্মথ রায় — ৩২২, ৫৫২, ৫৫৩
মমতাজউদ্দীন আহমেদ — ৩২০
মল্লিকা সেনগুপ্ত — ১৫০, ৩৩১, ৬৩০
ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ — ৩৫৮

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী — ৩০৪, ৪৯২, ৫৯৫, ৬১৭
মহাশ্বেতা দেবী — ১৯৭, ৫৭৩
মহেন্দ্র গুপ্ত — ২৪৪
মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য — ১৫৩
মাওলানা মোবারক করীম জওহর — ১৬৩, ১৬৪
ড. মানস মজুমদার — ২৩৫, ২৫১, ৪৮৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৬৪৯, ৬৫৮
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩৪, ৮১, ৯২, ৯৪, ২৪৪, ৩৮২, ৪০৭, ৫৬৯, ৬৪৭
মান্নান হীরা — ৪২৭
মীর মশাররফ হোসেন — ৩৫
মুকুন্দ দাস — ৩৪৩, ৪৩০
মুকুন্দরাম চক্রবর্তী — ৩০, ৮৩, ৮৪, ৯৮, ১০২, ১২১, ১৭১, ১৮৮, ২৬৭, ৩৭৬, ৪৫১, ৪৮৮, ৪৯২, ৫৩৮, ৬০২
মুজফফর আহমদ — ১৩১, ৩০৪, ৩০৮, ৬৩৪
মৃণাল বসুচৌধুরী — ২১৮, ৫৩৫
মৃত্যুঞ্জয় সেন — ৬৬২
ড. মেঘনাদ সাহা — ১২৭, ১৬৮, ২৪৭, ৩৪৪, ৪২২, ৪৩৪, ৫৯৫
মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায় — ২৭৪, ৩৩১
মৈমনসিংহ গীতিকা — ৪৪১
মোহিত চট্টোপাধ্যায় — ২৫৭, ২৮২, ৩৬২, ৩৭৩, ৫৫১, ৫৫৪, ৬৫০, ৬৭৮
মোহিতলাল মজুমদার — ৩৩, ১৫০, ১৫২, ১৭৬, ২৯৪, ৩২৮, ৩৫২, ৩৭৭, ৪০৮, ৫৩৩, ৫৪৭
মোহিনী চৌধুরী — ৫১৪, ৬৬৩
মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় — ৪০০
মৌলি মিশ্র — ৬৭৬

য

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত — ১৭, ৮৪, ১৬২, ১৬৫, ১৭০, ১৭২, ২০১, ২১৪, ২২৫, ২৩৪, ৩৬১, ৩৭৮, ৩৮৯, ৩৯৪, ৪০৬, ৪১৫, ৫০৬, ৫৯০, ৫৯৬, ৬৭৪
যতীন্দ্রমোহন বাগচী — ২৪, ১৪৫, ১৫৪, ১৬২, ১৬৫, ২৮১, ৫৪৫, ৫৬৬, ৬৯২
যশোধরা বাগচী — ৩৩১
যাযাবর — ২৮৭, ৩৯৪, ৪০৩, ৪৩৪, ৪৪১, ৪৪৯, ৬১৪, ৬৬০
যোগেশ দত্ত — ৫১৯
যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় — ২১২, ২৯০

র

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৭৩, ৬৬৫
রজনীকান্ত সেন — ১৪৭, ৪৪৪, ৪৮৭, ৫০৩
রতনকুমার ঘোষ — ১৭, ৬৪৯
রফিকউল্লাহ — ৬৭০
রবীন সুর — ১২৩
রবীন্দ্র ভট্টাচার্য — ৩৬৯, ৫৯৯, ৬৭৫

রমানাথ রায় — ৩৫

ড. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত — ২৯৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — প্রায় সব পৃষ্ঠাতেই আছেন। তাই স্বতন্ত্রভাবে উল্লিখিত হলনি।

রমেশ শীল — ২০০, ৪৮৫

রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরী — ৭২

রাজশেখর বসু (দ্র. পরশুরাম) — ১৬৫, ১৮০, ১৯০, ৩৫১, ৩৮৭, ৪০৪, ৫০৪

রাজ্যেশ্বর মিত্র — ২৫২

রাম বসু — ১৫, ৭০, ১২৮, ৩৯৭, ৪৯২, ৫০৮, ৫৮৬, ৬০৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৪১, ৬৭৬

রামলাল দাসদত্ত — ৬০৭

রামকৃষ্ণ পরমহংস — ১৯, ২১, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৭৯, ৯৬, ৯৭, ১৫৩, ১৫৮, ১৮৫, ১৮৮, ২০৯, ২৪৬, ২৫৩, ২৫৪, ২৬০, ২৬৮, ২৭৩, ২৭৭, ৩১১, ৩৪০, ৩৪৬, ৩৬১, ৩৮৩, ৩৯১, ৪৩৫, ৪৪০, ৪৪২, ৪৪৫, ৪৫৬, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৭২, ৪৯৪, ৫০০, ৫০১, ৫১০, ৫১২, ৫৩১, ৫৩৮, ৫৪১, ৫৪৯, ৫৭৩, ৫৭৯, ৫৯০, ৫৯১, ৬০৮, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৯, ৬২৫, ৬৩৫, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৬১

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩৭০, ৪৭৭, ৫০১, ৫৫৩

ড. রামজীবন আচার্য — ৩৯৭, ৫৮২

রামদুলাল নন্দী — ৮৯

রামনিধি গুপ্ত — ২৯৭

রামপ্রসাদ সেন (রামপ্রসাদ) — ১৯, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৯, ১৬০, ২৬১, ২৬৫, ২৮৩, ২৯৭, ৩৪০, ৪৪০, ৫০১, ৫০২, ৫০৪, ৫৩৮, ৬২৪

রামমোহন রায় — ৮৩

রামাই পণ্ডিত — ৬৮৬

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — ৩৩৫, ৫০০

রামেশ্বর (রামেশ্বর ভট্টাচার্য)—১, ৩৬৫, ৪২৭

ড. রামেশ্বর শ' — ১৪ ৪৮১

রায় রামানন্দ — ৫৪৭, ৫৫০

রেজাউল করিম — ৫১৯

ল

লক্ষ্মীদেবীর ব্রতকথা ও পাঁচালী — ৫৪, ১৩১, ৫৬৭

ড. লায়েক আলি খান — ৬৪৫

লালন ফকির (সাঁই) — ৭২, ২৩৫

ড. লিলি দত্ত — ২০২, ৩৮৫

লীলা মজুমদার — ৬৬৩

লোকনাথ ব্রহ্মচারী — ৯৮, ৫১০, ৫৩৮

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ — ২৪৭, ৫৫৯

লোপামুদ্রা মিত্র — ৫৩১

শংকর— ১১, ১০৩, ১৯৮, ৩৬৩, ৩৭০, ৩৯১, ৩৯৮, ৪৩৩, ৬৬৭
শক্তি চট্টোপাধ্যায় — ৯৭, ১৮২, ২৪৫, ৩৯৯, ৪০১, ৪৩৯, ৪৪৮, ৫৬৯, ৬৬৮
শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত — ৬৮৬, ৬৮৭
শঙ্খ ঘোষ — ১৩৬, ২৬৭, ৪৬৫, ৬৩৭, ৬৫২
শম্ভু মিত্র — ২৮, ৩০, ৩২১, ৩২৪, ৫৯৮, ৫৯৯
শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় — ১৬৯, ৪৯৩
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ৭, ১০, ১৩, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৬, ৪৫, ৫৬, ৮৩, ৯৭, ১০১, ১০২, ১২৪, ১৩৩, ১৪৪, ১৪৭, ১৫৪, ১৫৮, ১৫৯, ১৮৭, ২২৮, ২৫৪, ২৮৩, ২৮৬, ২৯৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩১৯, ৩২৬, ৩৩০, ৩৩১, ৩৪৩, ৩৫৭, ৩৬৮, ৩৯৭, ৪০৫, ৪০৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৭৭, ৪৮৭, ৪৯২, ৫০২, ৫১৮, ৫৪৫, ৫৫৫, ৫৭৪, ৫৯০, ৬১৪, ৬১৯, ৬৩০, ৬৩৪, ৬৪২, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৬০, ৬৬৫, ৬৬৭, ৬৭৪
শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর) — ১৯৮, ২৫৪, ৩৪২, ৩৪৬, ৩৭৫, ৪০৭, ৪৮৬, ৫০৩, ৫৩৩
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় — ৬৬০
শশাঙ্কশেখর বাগচী — ৬২১
ড. **শশিভূষণ দাশগুপ্ত** — ৪৪৫, ৫৪৯
শাঁওলী মিত্র — ৭৯, ৩২৩
শামসুর রাহমান — ২৫১, ৬৬৬
শামসুল ইসলাম — ৪২৭
ড. **শিপ্রা দে** — ৫৯
শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৭৩, ৪৭০
শিবনারায়ণ রায় — ৫৮
শিবনাথ শাস্ত্রী — ৯৭, ২০২, ৬১৪
শিবরাম চক্রবর্তী — ৬৩, ৪৫৩, ৪৮৫, ৫৩১, ৫৭১, ৬০১, ৬৬৭
শিবের গান — ৩৭৫
শিশির সেন — ৩৫০
শিশিরকুমার ভাদুড়ি — ৩১২, ৩২২
ড. **শীলা বসাক** — ৩৫৬, ৪৫৬
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় — ৩৮, ১৩৯, ২১০, ২৩১, ২৫৪, ২৬৮, ৩৩২, ৩৭০, ৪২৭, ৪৩২, ৪৮২, ৫৩১, ৬৪২
ড. **শুদ্ধসত্ত্ব বসু** — ৫০, ১৬৪, ১৮৭, ৫১২, ৬৫৫
শুভ বসু — ২৭৭
শৈবাল মিত্র— ২৩১, ২৭৪, ৪৩৯
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় — ২৪৪, ৩৭৭, ৪৫৪
শৈলেন্দ্রনাথ বসু — ৫১০, ৬২৮, ৬৫৩
ড. **শোভন সোম** — ১৬৪
শ্যামল চক্রবর্তী — ২৫৫, ৪০৩
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় — ১৪৬
শ্যামলতনু দাশগুপ্ত — ১৬২, ২৫৪, ২৬৪

শ্যামলী মহাপাত্র — ৬০২

শ্যামমোহন চক্রবর্তী — ৫১৯

শ্যামাপদ চক্রবর্তী — ৩৭, ৩৫৩, ৪৫৩

ড. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৪৯, ২২৯, ৬০২, ৬০৬, ৬৩২

শ্রীধর কথক — ৪৭৮

শ্রীপান্থ (নিখিল সরকার) — ৩৪৭

শ্রীশচন্দ্র দাস — ৬২১, ৬৩২

স

সংবাদ প্রতিদিন — ২০৭, ৩৭০

সঙ্কর্ষণ রায় — ৪৯৬, ৪৯৭

সজল বন্দ্যোপাধ্যায় — ১৯৭, ৩৬৪, ৫৬৪

সঞ্জয় ভট্টাচার্য — ৫৫৫

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় — ১৭৪, ১৮২, ২৬০, ২৯২, ৩৪৩, ৩৮১, ৪০৪, ৪০৭, ৪১০, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৮৫, ৪৯৩, ৪৯৪, ৫০৩, ৫১১, ৫৫১, ৬৮১

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — ২৪, ৩৮, ১৬৮, ৩৭১, ৩৮২, ৪০৮, ৫৫০, ৫৬৩, ৬১০

সতী ঘোষ — ৪৭০

সতীশচন্দ্র ঘটক — ১৩৪, ১৭৮, ২৫৪, ৩৪৬

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৭১, ৩২১

সত্যজিৎ রায় — ৭৪, ২০৩, ৪৯৪, ৫৩৬, ৫৪১

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর — ৫৬, ৪৬৮

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত — ৮২, ১৫৬, ১৫৮, ১৮৮, ২০১, ২৬৫, ২৯৮, ৩০৭, ৪০৬, ৪২০, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩৬, ৫০৮, ৬০৫, ৬৩৬, ৬৪১

সত্যেন্দ্রনাথ বসু — ২২৬, ৪৪২, ৫৯৪

সত্যেন্দ্রনাথ রায় — ১৮৬, ৩২১, ৪৮১

সনৎ মিত্র —

সনৎকুমার মিত্র — ৫৭৪

ড. সনাতন গোস্বামী — ৩১, ১৯৩, ৬১১

স্বামী সন্তদাসজী — ২১, ২৮০

সন্তোষ দত্ত — ৪৯, ৯৭, ৬৮৯

ড. সন্তোষকুমার ঘোড়ই — ২৪৭

সন্তোষকুমার ঘোষ — ৬৩৮

সমর সেন — ১৮, ৪৯, ৭০, ১০৫, ১৪১, ২৮০, ৩৬৪, ৪০৭, ৫০১, ৫৪৩, ৬১৫, ৬৮২

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত — ১৪১, ২৩০, ৩৬৪, ৬২০

সমরেশ বসু — ৮১, ২৭৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৭০, ৪৩৬, ৫০১

সমরেশ মজুমদার — ১৩৬, ২৩৪, ৩০৭, ৪৭৮

সমীর রক্ষিত — ৩৫, ৩১৫

ড. সমীরকুমার গুপ্ত — ১৮৬, ৬৪৭

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় — ১০২

সলিল চৌধুরী — ৩৫, ৩৫০, ৩৮১, ৪৯২

ড. সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় — ৩২২
সলিল সরকার — ২৭১, ৩২১
সিকান্দার আবু জাফর — ৫৪২, ৬১৩
সহদেব বিক্রম কিশোর দেববর্মণ — ৬৯২
ড. সাধনকুমার ভট্টাচার্য — ৩৫৪, ৩৮২, ৪২৬, ৫৯৯, ৬০৮
সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় — ৩৫৮
সারদা দেবী — ২৭৩
সুকান্ত ভট্টাচার্য — ২০, ১২১, ১৫৪, ১৬৮, ১৮৬, ১৯৫, ১৯৮, ২০৯, ২১১, ৩১১, ৩৭৩, ৩৭৪, ৪২০, ৪৩৬, ৫০১, ৫১১, ৫৩২, ৫৪৬, ৫৬০, ৫৬৪, ৫৭৫, ৬১৫, ৬৫৬, ৬৮৩
সুকুমার রায় — ১৬৯, ১৮৬, ১৮৮, ১৯০, ১৯৯, ২৫২, ৩২৬, ৩৫৩, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৭, ৪৫৫, ৪৭২, ৪৯৭, ৫০৪, ৫৩২, ৬৩৮, ৬৮১, ৬৯০
সুকুমার রায়চৌধুরী — ৪৮৬
ড. সুকুমার সেন — ২৯৭, ৪৮১, ৫৪৭, ৬৯২
সুখবিলাস বর্মা — ৪৬৩
সুচিত্রা ভট্টাচার্য — ৪০১, ৪৮৯, ৫২৫
সুচিত্রা মিত্র — ৩৫৩, ৫৩২, ৫৫১
সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় — ৫২০
সুজিত সরকার — ৪৯, ১২৮, ২০৬, ৪৭৭
সুদিন চট্টোপাধ্যায় — ২৪২, ২৮০, ৫৩২, ৫৯৪, ৫৯৫, ৬২৮, ৬৪০
ড. সুদেষ্ণা চক্রবর্তী — ১৪
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত — ১৬, ১৫৪, ২৪২, ৩০৯, ৫৮৬, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭৪
সুধীর চক্রবর্তী — ৫৬৩
সুধীরচন্দ্র সরকার — ১৩১, ১৬৩, ৫৯৭
সুনন্দ সান্যাল — ৫৫৯
সুনন্দকিশোর দত্তরায় — ৬৮৪
সুনির্মল বসু — ২২৬, ৪২২, ৫০৪, ৫৯৬, ৬৪৬
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (দ্র. নীললোহিত) — ১৪, ৩০, ৩৪, ১২৯, ১৫৫, ২৩২, ৩৭৮, ৩৯৭, ৪৭৭, ৪৮১, ৫৯৩, ৬৫৫, ৬৮৭
সুনীলকুমার নন্দী — ৩৯৭, ৬৬৯
সুফিয়া কামাল — ২২২, ৩৯৭
সুবাসচন্দ্র মিত্র — ১০, ১৫৮, ১৭৩, ৪৫০, ৪৫৭
সুবোধ ঘোষ — ২০২, ২৩০, ৩৭৫, ৬১৬
সুবোধ সরকার — ১৩০, ১৩৬, ৫৫১
ড. সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় — ১৯৪
ড. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত — ২৭
সুভাষ ভট্টাচার্য —
সুভাষ মুখোপাধ্যায় — ১২১, ১২৫, ১২৯, ১৪৬, ১৫৮, ১৭৩, ২০৪, ২২৮, ২৩০, ২৫৫, ২৭৪, ২৯৩, ৩০০, ৩০৯, ৪০২, ৪১৫, ৪২০, ৪৮৮, ৪৯৪, ৫২৫, ৫৪২, ৫৭১, ৫৭৫, ৫৮১, ৬৫৯
সুভাষচন্দ্র বসু — ২২৬, ৪৩৯, ৪৪২, ৪৭০, ৫৩৬, ৫৬৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৬৬

ড. সুমিতা চক্রবর্তী — ৫৮, ৪৪২, ৬০৯
ড. সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় — ৭১, ৯৯, ১৩৯, ১৫৫, ১৬৬, ২০৯, ২১৪, ৩১৫, ৩৪৮
সুরাইয়া খানম — ২৬৭
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৫৬৭
সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য — ৩৬৯
সুরেশচন্দ্র মজুমদার — ৬২০, ৬৪৭
ড. সুশোভন সরকার — ৯২
সেলিম আল দীন — ৬৪০
সৈয়দ আলাওল — ১২৫
সৈয়দ কওসর জামাল — ৬৮২
সৈয়দ মুজতবা আলী — ৮৭, ৯৭, ১১৭, ১৮৭, ২৯৩, ৩০৬, ৪০৩, ৪৭০, ৬৪৭, ৬৬৬, ৬৮১, ৬৮৭
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ — ৭৪, ৯৭, ১৩৫, ২৪৩, ২৯৭, ৩০৬, ৫০৮, ৬৩০, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৬৯
ড. সোমনাথ মিত্র — ৪৬
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় — ৪৩৭, ৬৬৯
সৌমিত বসু — ৭০, ৫৩৫, ৬১০, ৬১৩, ৬৩৩
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর — ৫৩৫
সৌম্যেন্দু ঘোষ — ২৪৭, ৬৬৩
স্বপন দাস — ৩৫৫, ৪৬২, ৪৭১, ৫৫৩
ড. স্বপন কুমার গোস্বামী — ২৬১
স্বপ্নময় চক্রবর্তী — ৪৪৭

হ

ড. হরপ্রসাদ মিত্র — ১৬৬, ২১০, ৫৬৬, ৬১১
হরপ্রসাদ রায় — ৩৮২
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী — ২৬৮, ৬৩৬
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — ৫, ২৮, ১৬৩, ১৯৩, ২৮৫
হরিনাথ মজুমদার — ৫৬, ১৫৬, ৩৭০, ৬২৪
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় — ১৫৬, ৩২৭
হর্ষ দত্ত — ৪৯, ৫১, ৫২, ৪৭৮, ৫০২, ৫১৫
হীরেন বসু — ৫৮০
ড. হীরেন চট্টোপাধ্যায় — ৫২, ৬৩২
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় — ৪৪১
হুতোম (দ্র. কালীপ্রসন্ন সিংহ) — ১৩৬, ১৫১
ড. হুমায়ুন কবীর — ১৩০
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় — ১০১, ২৪৩, ৩৭৮, ৪৬৮, ৪৯৯, ৬৫০
ড. হোসেনুর রহমান — ৫৩, ২৯৩, ৪১৬, ৪৮৮, ৪৮৯, ৫০৯, ৫৯৪, ৫৯৬

উদ্ধৃতি-অভিধান

ড. দিলীপ কুমার মিত্র

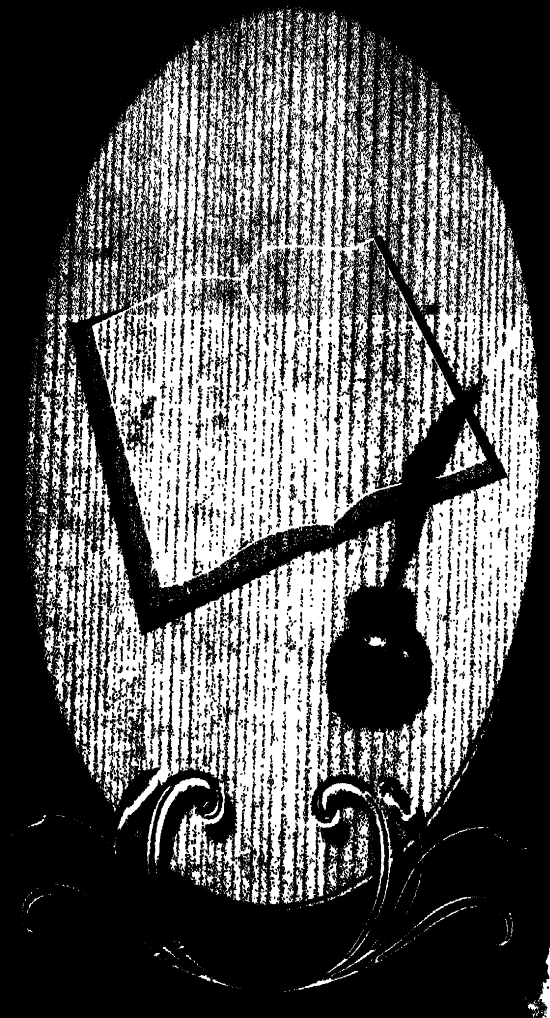

পারুল প্রকাশনী